গজেন্দ্রকুমার মিত্র
রচনাবলী

নবম খণ্ড

প্রকাশকাল : ১৩৬৪

সম্পাদক

সবিতেন্দ্রনাথ রায়   মণীশ চক্রবর্তী

প্রচ্ছদপট

অঙ্কন : পূর্ণেন্দু রায়
মুদ্রণ : সিল্ক স্ক্রীন

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩
হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও নিউ নিরালা প্রেস, ৪ কৈলাস
মুখার্জী লেন, কলিকাতা-৬ হইতে ধীরেন্দ্রনাথ বাগ কর্তৃক মুদ্রিত

সূচীপত্র

পুরুষ ও রমণী

উৎসর্গ

শ্রীমান ভূপেন্দ্রনাথ বসু

কল্যাণবরেষু—

১

সুকুমারের বিবাহের ইতিহাসটা যেমন বিচিত্র, তেমনি কুৎসিত।

সে বড়লোকের ছেলে, লেখাপড়া শেষ করিলে পাছে দেশে গিয়া জমিদারীর কাজ শিখিতে হয়, এই ভয়ে সে আজ কয়েক বৎসর যাবৎ আইন পড়িবার নাম করিয়া হার্ডিঞ্জ হোস্টেলে পড়িয়া আছে, আর নানা অজুহাতে পরীক্ষাটাকে এড়াইয়া যাইতেছে। হাতখরচা পায় প্রচুর এবং বলাই বাহুল্য, তাহা বন্ধুবান্ধবদের আনন্দ দিতেই প্রায় সবটা খরচ করে। সে যখনই সিনেমায় যায় বা চাঙ্গুয়ায় ভোজের আয়োজন করে, তখনই অন্তত সাত-আটটি বন্ধু তাহার সঙ্গে থাকে।

এই সব নানা কারণে বন্ধুবান্ধব মহলে তাহার প্রতিপত্তির সীমা ছিল না, তাই সকলেই যখন-তখন তাহাকে মুরুব্বি ধরিত। সব সময় ঠিক যে তাহাকে খুশী করিবার জন্য তা নয়, কতকটা অভ্যাসেও দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। এমনি একটা সংস্কারের বশবর্তী হইয়াই সতীশ আসিয়া সেদিন তাহাকে চাপিয়া ধরিল, সুকুমারকে তাহার সহিত মেয়ে দেখিতে যাইতে হইবে। যাইতেই হইবে, নহিলে সতীশের দেখিতে যাওয়ার কোন অর্থ থাকিবে না, কারণ আর কাহারও মতামতের কোন মূল্য নাই।

সুকুমার এ অনুরোধে বিস্মিত হইল না, সে জানিত যে এসব অনুরোধই তাহার প্রাপ্য। তবে সে সহজে রাজীও হইল না, হাতঘড়িটা চোখের সামনে তুলিয়া ধরিয়া কহিল, কিন্তু তুই যে বলছিস এগারোটায় গাড়ী, তার মানে তো এখনই বেরোতে হবে। যেটুকু সময় আছে, কামানো আর চান করার পক্ষেও যথেষ্ট নয়। অথচ বিনোদও একবার বিশেষ ক'রে সকালে যেতে বলেছিল, কী যেন তার দরকার আছে, না গেলে কি মনে করবে বল্ দেখি?···আমি বলি কি, তার চেয়ে আজ বরং তুই একাই যা, আমি না হয় সেই পাকা দেখার দিন যাব'খন—

কিন্তু সতীশ ছাড়িল না, তাহার হাত দুইটা চাপিয়া ধরিয়া কহিল, সে হয় না সুকুমার, হাজার হোক তোরা হলি আর্টিস্ট লোক, তোরা একটা ওপিনিয়ন না দিলে কিছু ঠিক করতেই পারব না। বিনোদের দরকার না হয় সন্ধ্যেবেলাই হবে।

সুকুমার বাল্যকালে স্কুল ম্যাগাজিনে গুটিকতক কবিতা ও গল্প লিখিয়াছিল এবং নিতান্ত বড়লোকের ছেলে বলিয়া সেগুলা ছাপাও হইয়াছিল। কিন্তু আজকাল আর সে-সব কোন বালাই-ই নাই, তবু তাহার বন্ধুরা, যাহারা চিরকাল তাহার পয়সায় সিনেমা দেখিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও দেখিবার আশা রাখে, তাহারা সবাই জানে যে, 'আর্টিস্ট' আখ্যাতেই সুকুমার খুশী হয় সবচেয়ে বেশী। এক্ষেত্রেও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হইল না, সতীশের এক চালেই সুকুমার মাত হইল, তাহার কাঁধটা চাপড়াইয়া কহিল, আচ্ছা,

আচ্ছা, তাই হবে। ফিরে এসেই বিনোদের সঙ্গে দেখা করবখন্।…তুই যা তাহ'লে চট ক'রে সেরে আয়, আমিও তৈরী হয়ে নি—

সতীশ লাফাইতে লাফাইতে চলিয়া গেল, কিন্তু সুকুমার সাময়িক দুর্বলতায় এমন একটা শ্রমসাধ্য ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিয়া ফেলিয়াই অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়া উঠিল। মেয়ে সে ইতিপূর্বে আরও বহুবার দেখিতে গিয়াছে, সুন্দরী মেয়ে কোথাও দেখিতে পায় নাই, বাঙলাদেশে ও বস্তুটি নাই বলিয়াই তাহার বিশ্বাস। সুতরাং এই রৌদ্রে বৃথা এতখানি পথ যাইবার কল্পনাতে সে মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল এবং নিজেকে ও সতীশকে, উভয়কেই নির্বোধ বলিয়া গালি দিতে লাগিল।

এমন কি পাশের ঘরের বিজয় আসিয়া যখন প্রশ্ন করিল, 'কিরে, এত সকাল সকাল কামাচ্ছিস কেন?' তখনও তাহার বিরক্তি যায় নাই, সে মুখখানা বিকৃত করিয়া জবাব দিল, আর বলিস কেন, আমার রিপন কলেজের এক ফ্রেণ্ড মেয়ে দেখতে যাবে, আমাকে ধরে টানাটানি—যেতেই হবে সঙ্গে। এ সব কি পোষায়?

বিজয় অর্থপূর্ণ একটা চোখের ইঙ্গিত করিয়া কহিল, ভালই তো, আজ তাহ'লে তো তোর দিন ভালই যাবে দেখছি, একটি সুন্দরী কিশোরীর দর্শন পাবি, এ কি কম-ভাগ্যের কথা?

সুকুমার অবজ্ঞাভরে জবাব দিল, হ্যাঁ, তুইও যেমন! ওসব কাব্য কেতাবেই ভাল, তা ছাড়া সে জায়গা যে কি এখনও তো তা শুনিস নি। মার্টিন কোম্পানীর গাড়ীতে চেপে কোন্ এক অজ স্টেশনে নামতে হবে, আবার সেখান থেকে হাঁটতে হবে মাইলখানেক। একে তো ঐ বনদেশের মেয়ে, তায় আবার বাপের শুনলুম বিড়ির দোকান আছে; সে যে কি মেয়ে হবে তা বুঝতেই পারছি। মিছিমিছি কষ্টভোগ অদৃষ্টে আছে আর কি!

বিজয় বিস্মিত হইয়া কহিল, তাই নাকি! তা সে ভদ্রলোকেরও তো সখ কম নয়, সেইখানে যাচ্ছেন মেয়ে দেখতে?

গালের উপর সাবানটা ঘষিতে ঘষিতে সুকুমার জবাব দিল, ঐ বলে কে! সতীশটার বরাবরই ঐ রকম বুদ্ধি। ঘটক বলেছে সুন্দর মেয়ে, ও অমনি বিশ্বাস ক'রে বসে আছে। ঘটক যখনই বলে পরমা সুন্দরী, আমি তো তখনই গিয়ে দেখি যে সে সব মেয়ের দিকে চাওয়া যায় না।…কিন্তু ওকে সে কথা কে বোঝাবে বল! ··না গেলে মনে কষ্ট পাবে, তার চেয়ে আমিই না হয় কষ্ট করলুম একটু, এই ভেবে যাওয়া।

কিন্তু সুকুমারের যাহাতে কষ্ট না হয়, সতীশ সেজন্য আগেই সতর্ক হইয়াছিল, সে ট্যাক্সী লইয়াই হাজির হইল এবং কদমতলা স্টেশনে গিয়াও একেবারে ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কিনিয়া বসিল। এ ব্যবস্থায় সুকুমার খুশী হইল বটে, কিন্তু মুখে পরিহাস করিতেও ছাড়িল না, আচ্ছা এত পয়সা কার জন্যে খরচ কচ্ছিস বল্ তো? যাচ্ছিস তো বিড়িওলার মেয়ে দেখতে। সেই বনগাঁয়ে যদি না একটা কালো ভূত মেয়ে এনে হাজির হয় তো কি বলেছি!

চুলগুলো টেনে ওপরঝুঁটি ক'রে বাঁধা, দুই রগে সর্ষের তেল গড়িয়ে পড়ছে, খাটো কাপড় আর তার ওপর মন-ভোলাবার জন্যে মধ্যে মধ্যে এক খাব্‌লা ক'রে পাউডার, নয়ত এরারুট মাখানো—সে ছবি আমি পরিষ্কার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি!

সতীশ লজ্জিত হইয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল, পয়সা কি আর তার জন্যে খরচ করছি? তোর কষ্ট হবে তাই, এই ঠিক দুপুরবেলা টেনে আনলুম তোকে!

তাহার পর একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, কি জানি ভাই, ঘটক তো বাজী রেখেছে, যদি পছন্দ না হয় তো এই সমস্ত খরচা সে দেবে—

তাচ্ছিল্যের সুরে সুকুমার কহিল, হ্যাঁ, তুইও যেমন। ঘটকেরা আবার কবে সত্যি কথা বলে?

কিন্তু সুকুমারকে কষ্ট না দিবার জন্য সতীশ এধারে যত আয়োজনই করুক, সমস্তই ব্যর্থ হইয়া গেল স্টেশনে পা দিতেই। ঘটক ভরসা দিয়াছিল হাঁটিতে হইবে না, স্টেশনে অন্তত পাল্কী পাওয়া যাইবে নিশ্চয়ই, কিন্তু নামিয়া দেখা গেল সে সব কিছুই নাই। কন্যার ভাই অভ্যর্থনার জন্য স্টেশনে আসিয়াছিল, সে এবং ঘটক বার বার ক্ষমা চাহিতে লাগিল, কিন্তু তখন সেই রৌদ্রে দেড় মাইল পথ মাঠের মধ্য দিয়া হাঁটিবার প্রস্তাব সুকুমারের সর্বাঙ্গে যেন বিষ ছড়াইয়া দিল। অথচ উপায়ই বা কি? সে মনে মনে সতীশের প্রতি বিশুদ্ধ ইংরেজী গালাগালগুলি প্রয়োগ করিতে করিতে অগত্যা হাঁটিতেই শুরু করিল।

এই ব্যাপারে সতীশেরও লজ্জার সীমা রহিল না। বিশেষত এত কষ্টের পর গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়া যখন দেখা গেল যে বাড়িটার চালা ঘরগুলি প্রায় সবই পড়ো-পড়ো অবস্থায় পৌঁছিয়াছে এবং তাহারা ঘরে গিয়া বসিতেই যে-সব ছেলেমেয়ের দল আসিয়া তাহাদের ঘিরিয়া দাঁড়াইল, তাহারা প্রত্যেকেই ম্যালেরিয়াগ্রস্ত—যেমন শীর্ণ, তেমনি পাণ্ডুর—শ্রী তাহাদের কাছেও কোন দিন যায় নাই।

সুকুমার চুপি চুপি সতীশকে কহিল, নমুনা দেখছিস তো?···আর তা ছাড়া, ঘটক যে কেমন সত্যিকথা বলেছে তার নমুনা তো স্টেশনেই পেলি!

সতীশ অত্যন্ত দমিয়া গেল। এখনও পর্যন্ত একটু ক্ষীণ আশা ছিল মনের মধ্যে, কিন্তু উপস্থিত ছেলেমেয়েগুলির দিকে চাহিয়া সত্যই সে হতাশ হইল। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কন্যার ভাইকে বলিল, এই তিনটের ট্রেন মিস্ করলে চলবে না, খুব চট্‌পট্ ব্যবস্থা ক'রে ফেলুন।

কন্যাপক্ষ যথাসাধ্য জলযোগের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, সেগুলি সবিনয় অনুরোধ সত্ত্বেও কেহ গ্রহণ করিল না, শুধু দুইজনে দুই গ্লাস ডাবের জল মাত্র খাইয়া কঠিন হইয়া বসিয়া রহিল।

কিন্তু একটু পরেই যখন পাত্রী আসিয়া পৌঁছিল, তখন দুইজনেরই বিস্ময়ের সীমা রহিল না। এ যেন বিশ্বাস করা কঠিন। দুইজনেই মূঢ়

বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, ব্যাপারটা যেন কাহারও মাথার মধ্যেই প্রবেশ করিল না।

একখানা পুরাতন শান্তিপুরী কাপড় পরা—পরা কেন, তাহাকে জড়ানো বলাই উচিত—চুলগুলিও, সুকুমারের ভাষায় টানিয়া ওপরঝুঁটি করিয়া বাঁধা এবং রগ দিয়া টিক তেল গড়াইয়া না পড়িলেও কোনরূপ প্রসাধনের চেষ্টা মাত্র যে করা হয় নাই তাহা বোঝা যায় ; এমন কি একটু এরারুটও বোধ হয় জোটে নাই। কিন্তু এই অযত্নও তাহার স্বাভাবিক রূপকে ম্লান করিতে পারে নাই—সেদিকে চাহিয়া সুকুমারের মনে হইল যেন জ্যোৎস্নার সুষমা মূর্তি ধরিয়া মর্ত্যে নামিয়া আসিয়াছে, কোন মতেই কোন ভাষাতেই সে রূপ বর্ণনা করা যায় না। মুখশ্রী বা গঠনে কোথাও যে খুঁত নাই তাহা নয়, কিন্তু সেদিকে চাহিলেই পলকে মুগ্ধ হইয়া যাইতে হয়, চোখের আড়াল না হইলে কোন ত্রুটিই নজরে পড়ে না।

কন্যার পিতা আশংকা ও আশায় বিবর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া, ছেলেমেয়েগুলিও নিস্তব্ধ, কন্যা নতমুখী আর ইহাদের এই বিহ্বল অবস্থা! কিছুক্ষণ পরে ঘটকই সে স্তব্ধতা ভঙ্গ করিল, গলাটা একটু কাশিয়া পরিষ্কার করিয়া লইয়া কহিল, বাবু, তাহ'লে কি জিগ্যেস-টিগ্যেস করবেন করুন—

সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল সতীশেরই প্রথম। সে সুকুমারের হাঁটুতে একটা আঙুলের গোঁজা দিয়া চুপি চুপি কহিল, নাম জিগ্যেস কর্ না—

সুকুমারের যেন তন্দ্রা ভাঙিল। সে অকারণে একবার রুমালটা মুখের উপর বুলাইয়া লইয়া কহিল, আপ—তোমার নাম কি ?

মেয়েটির বয়স কম। ষোলর বেশী হইবে না, যদিও দেখায় আরও অল্প। সুতরাং তাহাকে আপনি বলিতে গিয়া সঙ্কোচে বাধিল।

সে কিন্তু প্রথমটা জবাব দিতে পারিল না। কোলের উপর জোড়-করা হাত দুইটি থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল, গলাতেও সহজে স্বর বাহির হইল না। ঘটক বলিল, বলো মা, নাম বলো, লজ্জা কি ? এঁরা সব রাজপুত্র এসেছেন, এঁদের দয়া কত। এঁদের কাছে কি ভয় করতে আছে ?

কোন মতে সে বলিয়া ফেলিল, শ্রীইন্দিরা দেবী।

সামান্য দুটি শব্দ, ঠিক বোঝা গেল না, কিন্তু তবু মনে হইল কণ্ঠস্বর মধুরই। কেমন একটা মিষ্ট অস্পষ্টতা, তাহার সহিত কিছু যেন আবেগের সুর মিশানো।

আবার কিছুক্ষণ সকলেই চুপচাপ। তখন ঘটকই পুনশ্চ সুকুমারকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, বাবু, আর কিছু জিজ্ঞাসা করুন—

সুকুমার ঘাড় নাড়িল। সতীশও মাথা নাড়িয়া কহিল, না, আর কি জিগ্যেস করব !

ইন্দিরা কোন মতে ঘাড় নীচু করিয়া একটা নমস্কার সারিয়া চলিয়া গেল। সতীশও একবার হাত-ঘড়িটায় চোখ বুলাইয়া লইয়া কহিল, তাহ'লে তো এইবার উঠতে হয়, গাড়ীর তো আর বিশেষ দেরী নেই—

সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইল। ইন্দিরার বাবা আসিয়া হাত কচ্‌লাইতে কচ্‌লাইতে প্রশ্ন করিলেন, তাহ'লে আমরা কি আশা রাখতে পারি ?

সতীশ একবার সুকুমারের মুখের দিকে চাহিল। কিন্তু সে মুখ যেন পাথর, তখন নিজেই একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, আচ্ছা আমি আচায্যিকে দিয়ে খবর দেব এখন। একটু ভেবে দেখি—

ঘটক ছাতিটা বগলে চাপিয়া ধরিয়া কহিল, সে তুমি ভেবো না ভাই, আমি যখন আছি তখন ঠিক ক'রে দেবই—

তাহার পর যথারীতি শিষ্ট সম্ভাষণের পালা শেষ করিয়া সকলেই বাহির হইয়া পড়িল। ইন্দিরার বাবা কিছুদূর পর্যন্ত সঙ্গে আসিয়া আর একদফা ভিক্ষা জানাইয়া বিদায় লইলেন।

২

সুকুমার ভিতরে যতক্ষণ ছিল একটিও কথা বলে নাই। এখন বাহিরে আসিয়াও, সেই খর-রৌদ্রের মধ্যেই, এমন দ্রুত হাঁটিতে শুরু করিল যে, ঘটক তো পিছাইয়া পড়িলই, সতীশও তাহার সঙ্গ রাখিতে গিয়া হাঁপাইয়া উঠিল।

খানিকটা পরে সতীশ কহিল, কি রে, কেমন দেখ্‌লি ?

সুকুমার আরও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, মন্দ নয়, তবে নাকটা যেন কেমন টেপা, আর—

সতীশ বলিল, আর কি ?

—আপার লিপ্‌টাও একটু যেন বেশী উঁচু।

সতীশ একটু ক্ষুণ্ন হইল। কারণ সে সত্যই মুগ্ধ হইয়াছিল। একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, তবু মোটের ওপর মন্দ নয়, কি বলিস ?

সুকুমার কহিল, না তা নয়। তবে কী জানিস—এ সব একটু ভেবে-চিন্তে ঠিক করাই দরকার। শুধু মেয়ের চেহারাটাই তো বড় কথা নয়। অবস্থা তো দেখলি—ও মেয়ে বিয়ে করা মানে ঐ সমস্ত ফ্যামিলিটি তোর ঘাড়ে চাপ্‌বে।

সতীশ বলিল, তা বটে। তবে আমার একটা সুবিধে আছে, আমি বোধ হয় শীগ্‌গিরই বাইরে একটা চাকরি পাব। সেখানে নিয়ে গিয়ে যদি রাখি, তাহ'লে এরা আর নাগাল পাবে কি ক'রে? এখানে বেশী না পাঠালেই চলবে, বুঝছিস না ?

সুকুমার চুপ করিয়া রহিল। খানিকটা পরে সতীশ বলিয়া ফেলিল, আমার কিন্তু ভাই বেশ লেগেছে, যাই বলিস্‌!

সুকুমারের ওষ্ঠ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, সে কহিল, তোর কথা ছেড়ে দে, যা বিয়ে-পাগলা হ'য়ে উঠেছিস তুই! নইলে এইখানে কেউ মেয়ে দেখতে আসে—

তাহার পর একটু গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, অত চট্‌ ক'রে কিছু ঠিক করিস্‌নি সতীশ, ভাল ক'রে ভেবে দেখ্‌। তোর আত্মীয়-স্বজনদের জানা, তাঁদের মত নে আগে, তবে কথা দিস্‌—

সতীশ কহিল, আত্মীয় আর আমার বিশেষ কই, থাকবার মধ্যে মা আর মামা। মামা অত মাথা ঘামাবে না, আমি যা বলব তাতেই রাজী হবে। আর মা-ই বা এসব কি বুঝবে বল্‌?······তবু দেখি ব'লে একবার—

সুকুমার আর কথা কহিল না। গাড়ীতে উঠিয়াও সে সেই যে গাড়ির কোণে মাথা রাখিয়া চোখ বুজিল, কদমতলার আগে আর একবারও চোখ খুলিল না। রৌদ্রে তাহার খুব কষ্ট হইয়াছে মনে করিয়া সতীশও অপ্রস্তুতভাবে চুপ করিয়া রহিল, কথা কহিতে তাহার সাহস হইল না। তা-ছাড়া পাত্রীর অলোকসামান্য রূপ তাহাকে দস্তুরমত বিভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল, সে তখন ব্যাপারটা একটু মনে মনে অনুভব করিতে চায়।······

কদমতলায় নামিয়াই সতীশ তাড়াতাড়ি গাড়ি দেখিতে গেল। সেই অবসরে সুকুমার শুধু সহসা একবার ঘটককে কানে কানে বলিয়া দিল, হার্ডিঞ্জ হোস্টেলের ঊনপঞ্চাশ নম্বর ঘরে একবার সন্ধ্যেবেলা দেখা করবে ঠাকুর!

ততক্ষণে সতীশ মোটর ঠিক করিয়া ফেলিয়াছে। সে দূর হইতে ইহাদের হাতছানি দিয়া ডাকিল। সুকুমার চলিতে চলিতে একটা টাকা পকেট হইতে বাহির করিয়া ঘটকের হাতের মধ্যে গুঁজিয়া দিয়া শুধু কহিল, গেলে আরও পাবে!

ঘটক পাকা লোক। সে বিস্মিত হইলেও বিস্ময় প্রকাশ করিল না। তেমনিভাবেই চুপি চুপি কহিল, কিছু ভাববেন না, ঊনপঞ্চাশ নম্বর আমার মনে আছে।

হোস্টেলে পৌঁছিয়া সুকুমার সটান্‌ নিজের ঘরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া শুইয়া পড়িল। শারীরিক ক্লান্তিও যথেষ্ট ছিল, কিন্তু আসল কারণ সেটা নয় —প্রচণ্ড মানসিক চাঞ্চল্যই তাহাকে যেন অবসন্ন করিয়া তুলিয়াছে। মেয়ে সে অনেক দেখিয়াছে, মিশিয়াছেও অনেকের সহিত—টাকার জোর আছে বলিয়া বালিগঞ্জী মেয়ের বাপেরা তো দ্বার মুক্ত করিয়াই রাখিয়াছেন—কিন্তু এমনটি তাহার আর কখনও ঘটে নাই। কোন মেয়েই, না রূপে না বিদ্যাবুদ্ধিতে, চমক লাগানো কখনও এমনভাবে তাহার সমস্ত মনকে নাড়া দিতে পারে নাই। এ যেন কী এক রকমের আঘাত, যাহার কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, হয়ত বা ভাল করিয়া তাহা বোঝাও যায় না, অথচ দেহমন অবসন্ন হইয়া পড়ে।

বহুক্ষণ সময় লাগিল তাহার আজিকার সমস্ত ঘটনাটা মনের মধ্যে ধারণা করিয়া লইতে। কী যে ঘটিল, তাহাই যেন মনে আসে না—শুধু মনে পড়ে প্রচণ্ড একটা বিস্ময়, যাহার জন্য কোন আয়োজনই ছিল না মনের মধ্যে। অবশেষে, অনেকক্ষণ পরে, যখন আর সমস্ত ঘরেই আলো জ্বলিয়া গিয়াছে, সন্ধ্যা প্রায় রাত্রির দিকে ঢলিয়া পড়িয়াছে—তখন সে এক সময়ে মনে মনে সহসা স্থির করিয়া ফেলিল, ঐ মেয়েটিকে আমারই চাই, যেমন ক'রে হোক!

মন স্থির করার সঙ্গে সঙ্গে যেন সে অনেকটা সুস্থ হইয়া উঠিল। বিছানা

হইতে উঠিয়া কলঘরে গিয়া স্নান সারিয়া ফেলিল, তাহার পর যথারীতি প্রসাধনের পালা শেষ করিয়া ঘটকের আগমনের অপেক্ষা করিতে লাগিল।

অবশ্য বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না। মিনিট-পনেরো পরেই ঘটক আসিয়া উপস্থিত; দারোয়ানকে বলাই ছিল, সে একেবারে সঙ্গে করিয়া আনিয়া ঘরে পেঁছাইয়া দিয়া গেল। ছাতা ও লাঠিটা এক কোণে রাখিয়া সাবধানে কপাট বন্ধ করিয়া দিয়া ঘটক একটা চেয়ারে বসিল, তাহার পর একান্ত আত্মীয়ের মত প্রশ্ন করিল, রোদ্দুরে ঘুরে বাবুর শরীর কিছু খারাপ-টারাপ হয়নি তো?

সুকুমার মাথা নাড়িয়া কহিল, না; সে-সব কিছু নয়, তোমার সঙ্গে অন্য কথা আছে।

ঘটক সামনের দিকে একটু ঝুঁকিয়া বসিল, ব্যাপারটা কী বলুন দেখি!

একটু ইতস্তত করিয়া সুকুমার সোজাসুজিই কথাটা পাড়িল। কহিল, ওদের যা সব শুনলুম, ওরা আমাদেরও পাল্‌টি ঘর। তোমাকে এই বিয়েটি ভেঙে ঐ মেয়েটির সঙ্গে আমার বিয়ের ব্যবস্থা ক'রে দিতে হবে।

ঘটক বোধ হয় এতটার জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে কিছুক্ষণ নির্বাক অবস্থায় তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। একবার তাহার এমনও সন্দেহ হইল যে, সুকুমার বোধ হয় পরিহাস করিতেছে। কিন্তু অনেকক্ষণ সেদিকে চাহিয়া থাকিয়া যখন পরিহাসের কোন চিহ্নই খুঁজিয়া পাওয়া গেল না, তখন সে ঢোঁক গিলিয়া কহিল, তা আর কী ক'রে হয় বাবু, সতীশবাবুরও খুব পছন্দ, ওদের সঙ্গে সব বলা-কওয়া ঠিক—এখন কি আর কথা পাল্‌টানো যায়?

বোঝা গেল যে, এ উত্তরের জন্যও সুকুমার প্রস্তুতই ছিল। সে পকেট হইতে খান-পাঁচেক দশ টাকার নোট বাহির করিয়া কহিল, কী ক'রে হয় তা আমি জানি না, তবে যদি ক'রে দিতে পারো তো এখন এই—পরে আরও দুশ' টাকা।

এই অকাট্য যুক্তিতে ঘটক বিচলিত হইল। সে নোট-কয়খানি ভাঁজ করিয়া ট্যাঁকে গুঁজিতে গুঁজিতে কহিল, বলছেন যখন, তখন যেমন ক'রেই হোক্ ক'রে দিতে হবে। তবে কাজটা ভাল নয়, বড় নোংরা কাজ। এতে ক'রে আচায্যিদের বড় বদনাম হয়।·····যাহোক—দেবেন খুশী ক'রে—এই কথা!

ইহার পরের ইতিহাস খুবই সংক্ষিপ্ত। প্রবীণ কুলাচার্য এমন সুকৌশলে কয়েকটি মিথ্যা কথা ব্যবহার করিলেন যে, সতীশের সহিত সম্বন্ধটা অবিলম্বে কাঁচিয়া গেল এবং সেই সঙ্গেই সুকুমারের সহিত সেটা পাকিয়া উঠিল। সুকুমার শ্বশুরের নিকট হইতে একটি পয়সাও লইল না, বরং খান-দুই অবশ্য প্রয়োজনীয় অলঙ্কার ও ঘর-খরচা বাবদ তাঁহার হাতে শ-পাঁচেক টাকা ধরিয়া দিল। এই অভাবনীয় সৌভাগ্যে পাত্রীপক্ষ আনন্দে দিশাহারা হইয়া উঠিলেন, পাত্রবদল লইয়া কোন কথাই উঠিল না। আর বেচারী সতীশ! সে মনের

দুঃখে দুই-একদিন পরেই দার্জিলিং চলিয়া গেল এবং সেইখান হইতেই বিহারের কোন্ এক শহরে একটা চাকরি যোগাড় করিয়া লইল, কলিকাতাতে আর ফিরিলই না।

সুকুমারের বাবা প্রবোধবাবুও ইহার বিন্দু-বিসর্গ জানিতেন না। সে নিজেই বিবাহের দিন স্থির করিয়া ঠিক আগের দিন এক দীর্ঘ চিঠি লিখিল এবং চার-পাঁচজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ও একজন ঠিকা পুরোহিত সঙ্গে করিয়া বিবাহ করিতে গেল।

প্রবোধবাবু চিঠিখানা পাইয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। প্রথমটা তাঁহার বিশ্বাসই হইল না, তাহার পর রাগে ও অপমানে জ্বলিয়া উঠিলেন। আত্মীয়-পরিজনরাও ছি-ছি করিয়া উঠিল, চারিদিকে ধিক্কারের একটা সাড়া পড়িয়া গেল। কিন্তু এধারেও আর দিন নাই। বিবাহ তো আজ হইয়াই গেল, কাল সে সস্ত্রীক আসিয়া পড়িবে। বাধা দিবার সময় হিসাব করিয়াই সুকুমার চিঠি দিয়াছিল, সুতরাং সে উপায় আর নাই। এখন হয় বধূকে বরণ করিয়া ঘরে তুলিতে হইবে, নয়ত সস্ত্রীক ছেলেকে সেই মুখেই বিদায় দিতে হইবে!

প্রবোধবাবু অবশ্য প্রথম রাগের ঝোঁকে সেই প্রস্তাবই করিয়াছিলেন, কিন্তু স্নানের জল ও গৃহিণীর চোখের জল অনেক খরচ হইবার পর মাথা ঠাণ্ডা হইল। ভাবিয়া দেখিলেন যে, বংশের জ্যেষ্ঠ পুত্র সে, বিদ্বান, বুদ্ধিমান, সুশ্রী ছেলে, তাহাকে কেন্দ্র করিয়া অনেকদিন হইতে অনেক আশাই গড়িয়া তুলিয়াছেন—আজ তাহাকে চিরকালের মত বিদায় দেওয়া অসম্ভব। বিশেষ সে যখন অজাত-কুজাতে বিবাহ করে নাই, তখন চায়ের পেয়ালায় তুফান তুলিয়া লাভ নাই; তাহাতে নিজেদের কেলেঙ্কারিটাই বাহিরে বড় হইয়া উঠিবে।

অতএব একটা ঢোঁক গিলিয়া অপমানটা গলাধঃকরণ করিলেন, এবং সরকারকে ডাকিয়া উৎসবের আয়োজন করিতে আদেশ দিলেন।

চারিদিকে ছুটাছুটি পড়িয়া গেল। গরীবের ঘরের মেয়ে, হয়ত নিরাভরণ অবস্থাতেই আসিবে, সুতরাং একজন লোক টাকা লইয়া কলিকাতাতে চলিয়া গেল, কাল সকালে গহনা কিনিয়া স্টেশনেই বর-বধূর সহিত দেখা করিবে। প্রজাদের কাছে মান বাঁচানো চাই তো! এ ধারে জেলে-গোয়ালা-তাঁতী মহলে লোক আনাগোনা করিতে লাগিল, কয়েকজন লোক যে ক'খানা সম্ভব মোটর সংগ্রহ করিয়া ছুটিল আত্মীয়-কুটুম্বদের লইয়া আসিতে, দরকারী অদরকারী বহু জিনিস আসিয়া স্তূপীকৃত হইল—এক কথায় প্রচুর অর্থব্যয় করিবার পর ব্যাপারটা কোনমতে চলনসই হইয়া উঠিল।

বরবধূ আসিবার সময়-নাগাদ উৎসবের আয়োজনটা সম্পূর্ণ হইয়া আসিল বটে, ধিক্কারের সুরটা বাড়ি হইতে তখনও কিন্তু যায় নাই। কর্তা ট্রেনের সময় দেখিয়া গম্ভীর মুখে উপরে উঠিয়া গেলেন, গৃহিণী বরণের আয়োজনের ফাঁকে ঘন ঘন চোখ মুছিতে লাগিলেন, প্রবীণদের চোখে চোখে তিরস্কারের ভাষা ফুটিয়া উঠিল, তরুণেরা প্রকাশ্যেই ফিস্‌ফাস্ করিতে লাগিল।

এমনিই একটা আবহাওয়ার মধ্যে বরবধূ আসিয়া পৌঁছিল। কিন্তু ইন্দিরা পাল্কী হইতে নামিয়া দুধে-আলতায় দাঁড়াইতে সকলে স্তম্ভিত হইয়া গেল। দৃষ্টি হইতে ধীরে ধীরে সে ধিক্কার মুছিয়া গেল, সে জায়গায় ফুটিয়া উঠিল বিস্ময়। সকলেই নির্বাক—এমন কি বরণের কাজও সকলে যেন ভুলিয়া গেলেন। অবশেষে অনেকক্ষণ পরে সম্বিৎ ফিরিয়া আসিতে সুকুমারের ছোট বোন সরমা ছুটিতে ছুটিতে প্রবোধবাবুর ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়া কহিল, বাবা, বাবা, শীগ্‌গির নীচে আসুন, দাদা পরী বিয়ে ক'রে এনেছে—

সে ভুলিয়াই গিয়াছিল যে প্রবোধবাবু রাগ করিতে পারেন। প্রবোধবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, আচ্ছা, আচ্ছা, হয়েছে—তুই নীচে যা!

তবু কৌতূহলও সংবরণ করিতে পারিলেন না। শেষ পর্যন্ত নীচে নামিয়া আসিলেন এবং বরবধূ প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতেই তিনি সুকুমারকে একেবারে ছেলেমানুষের মত বুকে চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, আগে বললি না কেন, পাজী হতভাগা! এ দেখার পরও কি আমি আপত্তি করতুম? মিছিমিছি বদনাম কিন্‌লি, আমার মাথাটাও হেঁট হ'ল!

সুকুমার নিশ্চিন্ত হইল। ইহার পর উৎসব আর কোথাও বাধা পাইল না, এমন কি সুকুমারের এক বিলাতফেরৎ কাকা মনে মনে পুত্রের কর্তব্য সম্বন্ধে একটা দীর্ঘ বক্তৃতা ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন, তিনিও তাহা ভুলিয়া গিয়া তাহার সহিত নানারকম প্রগল্‌ভ রসিকতা শুরু করিয়া দিলেন।

৩

তাহার পর হাস্য-পরিহাস, গান-বাজনা উৎসব ও ভোজনের মধ্য দিয়া কী করিয়া যে দুইটা দিন কাটিয়া গেল, তাহা সুকুমার টেরও পাইল না। অবশেষে এক সময়ে দেখিল মানবজীবনের দুর্লভতম মুহূর্তটি তাহার সম্মুখে উপস্থিত, যে মুহূর্তটির জন্য সে গত দুই সপ্তাহ প্রতিক্ষণ স্বপ্ন দেখিয়াছে। তাহার ফুলশয্যা!

সুকুমারের বুক কাঁপিতে লাগিল। বিবাহের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সে আশা করিতে পারে নাই যে ইন্দিরাকে সে সত্যই পাইবে—এমন একান্তভাবেই সে তাহাকে চাহিয়াছিল—অত্যুগ্র কামনার সে ভয় এখনও যায় নাই, এখনও যেন বিশ্বাসই হয় না ইন্দিরা তাহার স্ত্রী হইয়াছে, সে এখন সম্পূর্ণ-রূপে তাহারই।

ফুলশয্যার অনুষ্ঠান চলিয়াছে ধীরভাবে, কাহারও কোন তাড়া নাই। অকারণ উচ্ছল হাসিতে সবাই ভরপুর, আজিকার দিনে সকলে দেখাইতে চায় নিজেকেও, তাই হাস্য-পরিহাসে কাজ চলে মন্থরগতিতে। সুকুমার ইহারই ফাঁকে একবার ইন্দিরাকে দেখিয়া লইল। পল্লীগ্রামে যে রূপ দেখিয়া সে মুগ্ধ হইয়াছিল, এ রূপ তাহার চেয়ে সহস্রগুণে উজ্জ্বল। সভ্যতার ঘষামাজা ও ঐশ্বর্যের আড়ম্বরে তাহাকে সাক্ষাৎ ইন্দিরার মতই দেখাইতেছিল, ইহাকে যেন

স্পর্শ করিতেও ভয় করে। অযত্ন ও দারিদ্র্যের মধ্যে রূপ ঢাকে নাই সত্য কথা, কিন্তু ভস্মাচ্ছাদিত ছিল যেন, আজ সে ভস্মের আবরণ খসিয়া পড়িয়াছে, সেদিকে চাহিলে নিজেরই দৃষ্টিকে অবিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করে।

শুধু তাই নয়—এই দুইদিনেই সে এ বাড়ির সকলকে বশ করিয়া ফেলিয়াছে। ছোট ছোট ভাই-বোনেরা তো আহার-নিদ্রা ভুলিয়াছে, তাহারা একটি মিনিটও বৌদিদিকে ছাড়িতে চায় না—খাস শাশুড়ী পর্যন্ত মুগ্ধ, তিনি এই গোলমালের মধ্যেও চুপি চুপি সুকুমারকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, এধারে বলছিস্ গরীবের ঘরের মেয়ে, লেখাপড়াও দেখলুম প্রায় কিছুই জানে না—এমন সব সহবৎ কোথা থেকে শিখলে বল্ দেখি? আর কী মিষ্টি কথাবার্তাই বা বাছার, যেন একটি দণ্ড চোখের আড়াল করতে ইচ্ছা করে না।

অর্থাৎ সুকুমারের সুখের পাত্র কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে। নিশ্চিতরূপে সকলের কাছেই প্রমাণ হইয়া গিয়াছে যে, এ বিবাহে সে ভুল করে নাই। এখন শুধু এই সৌভাগ্যটা নিশ্চিন্তভাবে উপভোগ করার অপেক্ষা।...সে একবার অধীরভাবে ঘড়িটার দিকে তাকাইল। তাহার দৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া খুড়িমা তাড়া লাগাইলেন, ওলো ছুঁড়িরা, তোদের হ'ল না এখনও? সারারাত এমনি ক'রে কাটাবি নাকি?

অপাঙ্গে বিদ্যুৎ হানিয়া একটি তরুণী জবাব দিল, বাবা, বাবা! যাচ্ছি গো, যাচ্ছি! ছেলের আর তর সয়না!·· তোমার তো সারা জীবনই রইল ভাই ঠাকুরপো, এই তিনটে মিনিট আমরা আছি তা-ও সইছে না?...নে রে তোরা, সব চট্‌পট ক'রে সেরে নে—

কাজও আর বেশী ছিল না। একটু পরেই সকলে বাহির হইয়া গেল। সুকুমার সঙ্গে সঙ্গে দরজাটায় খিল লাগাইয়া আসিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল, তাহার পর আপন মনেই কহিল, একটা বাঁচোয়া, এদিক দিয়ে কেউ আড়ি পাততে পারবে না।...যা দলটি, বাব্বা, দেখলেই ভয় করে—

কিন্তু আড়ে একবার ইন্দিরার মুখের দিকে চাহিয়া সে স্তব্ধ হইয়া গেল। সে তেমনি নতমুখে খাটের এক পাশে পা ঝুলাইয়া বসিয়া আছে। দৃষ্টি তাহার দূরে বাতিদানের উপর আবদ্ধ; সমস্ত দেহ যেন পাথরের মত কঠিন ও নিশ্চল, এমন কি মুখও। প্রথম অনুরাগ, আশা ও আশঙ্কার সে আবেশটি কোথায় গেল—লজ্জা ও সুখের সেই অপূর্ব লালিমা?

কেমন যেন একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় সুকুমারের বুক কাঁপিয়া উঠিল। সে মিনিটখানেক ইতস্তত করিয়া নিজের চাদর ও ফুলের মালাটা খুলিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিল, তাহার পর কাছে গিয়া বসিয়া পড়িয়া কহিল, তোমার ঐ ফুলের গহনাগুলো খুলে দিই, কি বলো!...নইলে স্বস্তি পাবে না···ওগুলো পরে বড় আড়ষ্ট হয়ে থাকতে হয়।

স্ত্রীকে প্রথম সম্ভাষণের মত আর কোন কথাই সে যেন খুঁজিয়া পাইল না, কিন্তু ইন্দিরাও তো নিভৃতে প্রথম স্বামীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া অকারণে লাল হইয়া উঠিল না! এমন কি সে লজ্জাতে আর একটু ঘাড়ও নামাইল না,

তেমনি ভাবলেশহীন মুখেই একটি একটি করিয়া ফুলের গহনাগুলি খুলিতে লাগিল। সুকুমার নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। সে আশা করিতেছিল যে, হয়ত সবগুলি ইন্দিরা খুলিতে পারিবে না, সলজ্জভাবে তাহার শরণাপন্ন হইবে, কিন্তু সেসব কিছুই হইল না, ইন্দিরা নিজেই সবগুলি খুলিয়া ফেলিল।

আরও কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। সে মুখে কঠোর কিছু নাই সত্য কথা, কিন্তু সেদিকে চাহিলে মনে মনে ভরসাও পাওয়া যায় না। একটু পরে কোনমতে সাহস সঞ্চয় করিয়া সুকুমার ইন্দিরার একখানি কোমল উষ্ণ হাত নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া চুপি চুপি প্রশ্ন করিল, তুমি অমন ক'রে রয়েছ কেন ইন্দু, আমাকে কি তোমার পছন্দ হয়নি ?

ইন্দিরা জবাব দিল না। একটু পরে সুকুমার আবারও কহিল, বলো লক্ষ্মীটি, জবাব দাও—

এবার ইন্দিরা কথা কহিল। তেমনি ভাবে বাতিদানটার দিকে চাহিয়াই অতি মৃদু কণ্ঠে উত্তর দিল, ও কথা শুনে এখন কি কিছু লাভ আছে ?

সুকুমারের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিতা মেয়ের নিকট হইতে সে এমন সম্ভাষণের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না বোধ হয়। সে বিহ্বল কণ্ঠে শুধু প্রশ্ন করিল, তার মানে ?

এইবার ইন্দিরার ওষ্ঠপ্রান্তে সামান্য একটু হাসির আভাস দেখা গেল। কিন্তু সে কৌতুকের কিংবা বিদ্রূপের—তাহা বোঝা গেল না। মুক্তার মত দাঁতে ওষ্ঠ চাপিয়া সে যেন হাসিটা সামলাইয়া লইয়া জবাব দিল, বিয়ে তো হয়েই গেছে, সেটা তো আর ফিরিয়ে নেওয়া যাবে না, তখন আর ওসব জেনে লাভ কি ?

সুকুমার নিতান্ত গতানুগতিকভাবেই পছন্দ হওয়ার প্রশ্নটা করিয়াছিল, তাহার উত্তরে ইন্দিরা লজ্জিত নতমুখে, মধুর হাস্যে সম্মতি জানাইবে এই ছিল তাহার আশা। অকস্মাৎ যে ও-পক্ষ হইতে এমন প্রশ্ন উঠিবে, তাহা সে ধারণাও করিতে পারে নাই। ইহার পিছনে কত কী অর্থ থাকিতে পারে তাহা বুঝিতে না পারিয়া বিবর্ণ হইয়া উঠিল। কহিল, সে উপায় থাকলে কি তুমি ফিরিয়ে নিতে এ বিয়ে ?

ছোট্ট একটা হাই তুলিয়া ইন্দিরা তেমনি মৃদু কণ্ঠেই কহিল, কে জানে, ও কথা তো ভেবে দেখিনি। আর তা ছাড়া দরকারই বা কি ভাববার !

এ যেন কোথা হইতে কী হইয়া গেল। একটু আগেই মনে হইতেছিল যে অমৃতের পাত্র বুঝি কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে, এখন যেন সমস্তটা কেমন বিস্বাদ, বিষাক্ত হইয়া উঠিল। হয়ত ইহার সমস্তটাই পরিহাস—ইচ্ছা করিয়া, মজা দেখিবার জন্যই সে এমন বাঁকা কথা কহিতেছে—কিন্তু তবু নিশ্চিন্ত হইতে পারা যায় কই ? অস্বস্তি মনে থাকিয়াই যায় !

দু'জনেই চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। একটু পরে ইন্দিরা আস্তে আস্তে কহিল, আমার বড্ড কষ্ট হচ্ছে, শোব আমি ?

মুহূর্ত-মধ্যে সুকুমার সব ভুলিয়া গেল। অতিশয় ব্যস্ত হইয়া কহিল, হ্যাঁ হ্যাঁ, তাইতো, ইস্, বড্ড অন্যায় হচ্ছিল আমার। নাও নাও, আর এক মিনিট দেরী নয়—শিগ্‌গির শুয়ে পড়ো।···যা কষ্ট গেল সারাদিন—

ইন্দিরা প্রশস্ত শুভ্র শয্যার এক পাশে কোনমতে সঙ্কুচিতভাবে শুইয়া পড়িতেছিল, সুকুমার সস্নেহে তাহাকে জোর করিয়া সরাইয়া ভালভাবে শোয়াইয়া দিল। ইন্দিরা কোন প্রকার বাধা দিল না, কিন্তু মধুর সেই সলজ্জ বাধাটিই সুকুমার আশা করিতেছিল বোধ হয়। যাহা হউক, সে সমস্ত রকম ক্ষোভকে মনের মধ্য হইতে দূর করিয়া নিজেও পাশে শুইয়া পড়িল এবং মাথার শিয়র হইতে একটা ফুলের পাখা তুলিয়া লইয়া ইন্দিরাকে বাতাস করিতে লাগিল। ইন্দিরা শুইয়াই চোখ বুজিয়াছিল, এখনও চোখ খুলিল না, কিন্তু হাত বাড়াইয়া পাখাখানা সুকুমারের হাত হইতে কাড়িয়া লইল।

সুকুমারের মনের মধ্যে যে আকুল প্রেম প্রকাশের পথ খুঁজিয়া মাথা কুটিতেছিল, সে আর বাধা মানিল না, এই সামান্য প্রশ্রয়টুকুতেই একেবারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সে অকস্মাৎ ইন্দিরাকে সবেগে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বনে চুম্বনে তাহার ওষ্ঠ, কপোল, কণ্ঠ ভরাইয়া দিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে রূঢ় সত্যে যেন তাহার চমক ভাঙিল, ওপক্ষ হইতে সাড়া মিলিতেছে কই! বাধা নাই বটে, কিন্তু আগ্রহও নাই তো! সুখের আবেশে বিগলিত হওয়ার লক্ষণ কই!···এ যে নিতান্ত কাঠের পুতুল!

নিজের আবেগের জন্য নিজেই লজ্জিত হইয়া সুকুমার আবার শুইয়া পড়িল। তারপর কতকটা অনুশোচনার সুরেই বলিল, না, এইবার তুমি ঘুমোও, আর বিরক্ত করব না।······যা ঝড় ব'য়ে গেল তোমার ওপর দিয়ে—

এ যেন ইন্দিরার হইয়াই কৈফিয়ৎ দেওয়া!

ইন্দিরা কথা কহিল না। তেমনিভাবেই চুপ করিয়া শুইয়া থাকিতে থাকিতে এক সময় বোধ হয় ঘুমাইয়াই পড়িল। কিন্তু সুকুমারের চোখে কিছুতেই ঘুম আসিল না। মনে মনে আশা ও আশঙ্কার দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হইয়া সে খানিকটা পরে উঠিয়া ঘরে পায়চারি করিতে শুরু করিল। প্রায় আধঘণ্টাকাল পায়চারি করিবার পর খাটের পাশে টিপাইতে রাখা রূপার গ্লাস হইতে খানিকটা জল লইয়া মুখে-চোখে দিয়া আবার আসিয়া শুইয়া পড়িল।

তবু চোখে ঘুম আসিল না। বাতিদানে বাতির শিখাটা কাঁপিয়া কাঁপিয়া নিঃশব্দে পুড়িতে লাগিল, খাটের ছত্রিতে ছত্রিতে বাঁধা গোলাপ ও রজনীগন্ধা ফুলগুলি নীরবে গন্ধ ছড়াইতে লাগিল; চারিদিকে আনন্দের সমস্ত উপকরণই প্রস্তুত অথচ তাহার কিছুই সুকুমারের কাজে আসিল না। বরং সবগুলি মিলিয়া যেন নীরবে তাহাকে পরিহাসই করিতে লাগিল। সে প্রাণপণে চক্ষু বুজিয়া রহিল।

ভোরের আলো জানলার খড়খড়িগুলি স্পর্শ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই ইন্দিরা উঠিয়া পড়িল। খোঁপাটা ঠিক করিয়া লইয়া উঠিয়া বসিতেই চোখ পড়িল তাহার নিদ্রিত সুকুমারের দিকে। ততক্ষণে সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাহার মুখ সত্যই সুন্দর, ঘুমন্ত অবস্থাতে আরও সুন্দর দেখাইবার কথা, কিন্তু দুশ্চিন্তার কালিমা ঘুমের মধ্যেও তাহাকে ছাড়ে নাই। প্রশস্ত সুন্দর ললাটে ভ্রূকুটি যেন এখনও লাগিয়া আছে। সেদিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিতে থাকিতে কী মনে করিয়া ইন্দিরা একবার শিহরিয়া উঠিল। তাহার পর তাড়াতাড়ি কাপড়-জামা ঠিক করিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

কিন্তু বাহিরে যাইবার জন্য পা বাড়াইয়া সহসা মনে পড়িল পিসিমার উপদেশ—সকালে উঠে রোজ একবার ক'রে সোয়ামীকে পেন্নাম করবি, ওঁয়ারাই হলেন এ জন্মের দেবতা।

কিন্তু ঘুমন্ত মানুষকেই বা প্রণাম করা যায় কি করিয়া! অকল্যাণ হয় যে! সে একটু ইতস্তত করিয়া ঘরের মাঝামাঝি দাঁড়াইয়া ঘাড় নীচু করিয়া উদ্দেশে একটা নমস্কার করিল, তাহার পর বাতিদানের বাতি কয়টা নিভাইয়া দিয়া নিঃশব্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ইন্দিরা যখন নমস্কার করিতেছে ঠিক সেই সময়েই সুকুমারের সহসা ঘুম ভাঙিয়া গেল। ঘুমের ঘোরেও একটা অতৃপ্তি, একটা দুশ্চিন্তা লইয়াই সে চোখ মেলিয়াছিল, কিন্তু চোখ মেলিতেই প্রণামরতা ইন্দিরার সুন্দর ভঙ্গীটি তাহার চোখে পড়িল। একসঙ্গে আনন্দ ও বিস্ময় তাহাকে ধাক্কা দিল। যাক্—তাহা হইলে ব্যাপারটা অত কিছু নয়! হয়ত কোন কারণে তাহার মনে কোন অভিমান হইয়াছিল কাল, কিংবা হয়ত মাথা-ধরাই—রাত্রিটা ঘুমাইবার সঙ্গে সঙ্গেই সে সব চলিয়া গিয়াছে।...

মনের মেঘ কাটিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই সুকুমার আনন্দে অস্থির হইয়া উঠিল। বার-কতক এপাশ ওপাশ করিয়া ইন্দিরার মাথার বালিশটার মধ্যে কিছুক্ষণ মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল, তাহাতে এখনও নববধূর কেশের সৌরভ লাগিয়া আছে—এ যেন একরকম ইন্দিরাকেই অনুভব করা! কিন্তু সেভাবেও বেশীক্ষণ সে শুইয়া থাকিতে পারিল না, এক সময় সহসা উঠিয়া পড়িল। তখনও বাড়ির অনেকে ঘুমাইতেছে, কর্মক্লান্ত চাকররাও সকলে ওঠে নাই। শুধু উঠিয়াছেন তাহার মা, অত সকালেই স্নান সারিয়া পূজার ঘরে ঢুকিয়াছেন। সারা বাড়িটাতে চোখ বুলাইয়াও ইন্দিরাকে দেখা গেল না, অনুমান করিল সে বোধ হয় স্নান করিতে গিয়াছে—সুকুমার তখন টুথব্রাসটা লইয়া বাগানের দিকে বাহির হইয়া পড়িল।

ঝলমলে প্রভাত, মধুর হাওয়া—সমস্ত বিশ্বটাই মধুর আজ। অনেকক্ষণ যেন নেশার ঘোরে ঘুরিয়া বেড়াইবার পর যখন সে ফিরিয়া আসিল তখন

সকলেই উঠিয়া পড়িয়াছেন। মা ঠাকুরঘরের সামনের দালানে বসিয়া ছিলেন, অনুযোগ করিয়া কহিলেন, কোথায় ছিলি এতক্ষণ খোকন? তিনবার চা করালুম, তিনবার ঠাণ্ডা হয়ে গেল!

সেদিকে অবশ্য তাহার মন ছিল না। সে দেখিতেছিল, স্নান সারিয়া চমৎকার একখানি শাড়ী পরিয়া আসিয়া ইন্দিরা বসিয়াছে তাহার মায়ের কাছে, শ্বশুরের জন্য ফল কাটিয়া নিপুণভাবে একটি সাদা পাথরের রেকাবীতে সাজাইতেছে। এ যেন এক অভিনব রূপ, দেখিলে আর চোখ ফেরানো যায় না। প্রবোধবাবুও সেখানে দাঁড়াইয়া মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া-ছিলেন, এখন কৃত্রিম ভর্ৎসনার সুরে বলিলেন, এরি মধ্যে ওকে খাটাতে শুরু করেছ সব!

সুকুমারের মা ঝঙ্কার দিয়া কহিলেন, যা পাগ্‌লী বৌ তোমার! ও কিছুতেই চুপ ক'রে থাকবে না, সাফ ব'লে দিলে,—কাজ আমার চাই, আমি এম্‌নি ব'সে থাকতে পারব না। যেমন কুঁড়ে খোকা, ঠিক তার উল্‌টোটি হয়েছে।

মা সস্নেহে সুকুমারের দিকে চাহিলেন। সুকুমার ঘাড় নীচু করিয়া চায়ের বাটীতে চুমুক দিতে লাগিল, কথা কহিল না। তাহার মন তখন অপূর্ব এক সুরে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। কথা কহিতে ভরসা হয় না—পাছে আনন্দ উপ্‌চাইয়া উঠে কণ্ঠস্বরে। সারাদিনেও তাহার সে সুর কাটিল না। বার বার নানা ছলে সে অন্তঃপুরের আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়ায়, আর প্রতিবারই চোখে পড়ে ইন্দিরার নব নব মূর্তি। তাহার ভাইবোন, বাপ-মা, কাকা-কাকীমা সকলে মিলিয়া যেন সেই একটি মানুষকেই কেন্দ্র করিয়া উৎসবের সমারোহ শুরু করিয়াছেন। ছোটরা হুড়াহুড়ি করিতেছে, বড়রা সাজাইতেছেন। ইন্দিরাও যেন একেবারে এ বাড়ির সহিত মিশিয়া গিয়াছে, সকলের স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের দিকে তাহার দৃষ্টি। দুপুরবেলা প্রবোধবাবু জোর করিয়া তাহাকে নিজের কাছে বসাইয়া খাওয়াইলেন। মা একবার সজল নেত্রে আসিয়া বলিয়া গেলেন, কী শান্তিই যে দিলি বাবা! এ আমার স্বপ্নেরও অতীত ছিল।

আনন্দে ও গর্বে সুকুমারের বুক ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। এ তাহারই বিজয়গর্ব। বোঝা গেল যে পাকা জহুরীর দৃষ্টি তাহার আছে। কোথাও সে বিন্দুমাত্র ভুল করে নাই।...

সারাদিন সে যেন দাক্ষিণাবাতাসে উড়িয়া বেড়াইল। মনে হইল, সমস্ত প্রকৃতি তাঁহার আনন্দের ভাণ্ডার আজ তাহারই জন্য বিশেষভাবে সাজাইয়া বসিয়া আছেন। শুধু দয়া করিয়া গ্রহণ করার অপেক্ষা। সমস্তক্ষণ সে একা-গ্রমনে অপেক্ষা করিতে লাগিল রাত্রির জন্য, আজ আর সে কোন বাধা মানিবে না, ইন্দিরাকে একান্তভাবে বুকের মধ্যে পাইতেই হইবে।...কেমন করিয়া সে আজ তাহার বধূর সহিত প্রণয়-সম্ভাষণ করিবে, মনে মনে তাহারও একটা মহড়া দিয়া রাখিল।

কিন্তু রাত্রে অবশেষে যখন তাহার অধীর প্রতীক্ষার সত্যই অবসান হইল, ইন্দিরা তাহারই জলের গ্লাস হাতে করিয়া প্রবেশ করিল, তখন তাহার সে আনন্দময়ী মূর্তি কোথায় চলিয়া গিয়াছে, আবার সেই ভাবলেশহীন মর্মর প্রতিমার মত মুখ। তাহার সৌন্দর্য কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই, কিন্তু ভিতরের প্রাণটি যেন বিদায় লইয়াছে।

তবু, ইন্দিরা যখন জলের গ্লাসটি টিপাইয়ের উপর রাখিয়া খাটের একেবারে এক কোণে গিয়া বসিল, তখন সে সমস্ত দ্বিধা, সমস্ত আশঙ্কা মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া তাহাকে জোর করিয়া টানিয়া কাছে বসাইল এবং সবেগে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া কহিল, অত দূরে কেন ইন্দু, তোমার স্থান কোথায় জানো না?

ইন্দিরা কোন বাধা দিল না, কিন্তু কথাও কহিল না। তেমনি অবিচলিত মুখে মেঝের দিকে চাহিয়া রহিল। এই নিঃশব্দ প্রত্যাখ্যানের অপমান চাবুকের মতই সুকুমারের বুকে আঘাত করিল, কিন্তু তবু সে ধৈর্য হারাইল না, জোর করিয়া ইন্দিরার মুখখানা তুলিয়া ধরিয়া কহিল, তুমি কাল থেকে অমন ক'রে আছ কেন রাণী? একটিবার ভাল ক'রে আমার দিকে চাও দিকি! আমাকে কি তোমার ভালো লাগে না?

তবু ইন্দিরা জবাব দিল না।

তখন যেন একটু অধীরভাবেই সুকুমার কহিল, তুমি কি এমনি চুপ ক'রেই থাকবে? আমার বুকের মধ্যে কি হচ্ছে তা একবারও ভাবছ না! মুখ তোল লক্ষ্মীটি, জবাব দাও!

এবার ইন্দিরা মুখ তুলিল। তাহার আয়ত চক্ষুর প্রশান্ত স্থির দৃষ্টি সুকুমারের মুখের উপর রাখিয়া কহিল, কিসের জবাব দেব বলো!

সুকুমার যেন এ সম্ভাষণের জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, ঐ তো বল্লুম, তুমি অমন পাথরের মত হয়ে যাচ্ছ কেন আমার সামনে, আমাকে কি তোমার পছন্দ হয়নি?

ইন্দিরা ধীরকণ্ঠে বেশ স্পষ্টভাবেই জবাব দিল, সে তো কালই বললুম তোমাকে যে আমি ও-কথা ভেবে দেখিনি, ভাববার দরকারও নেই।

সুকুমার ঈষৎ উষ্ণ-কণ্ঠে কহিল, কিন্তু আমার যে ওটা জানা দরকার।

ইন্দিরা পুনশ্চ মুখ তুলিয়া কহিল, কেন?

কেন? তার মানে?

খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া ইন্দিরা জবাব দিল, পছন্দ-অপছন্দর কথাটা আগেই ওঠে জানি। তোমাকে আমার পছন্দ হয়েছে কিনা সেটা বিয়ের আগে জিজ্ঞাসা করলে বরং তার মানে বুঝবে পারতুম। এখন আর ও-কথায় লাভ কি!

সুকুমার কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর তিক্তকণ্ঠে কহিল, লাভ নেই, তার মানে অপছন্দ হ'লেও বিয়ে আর ফিরবে না, এই তো? সেটা ফেরানো সম্ভব হ'লে কি ফিরিয়ে নিতে? সেইটেই আমি জানতে চাইছি—

ইন্দিরা কহিল, ওসব কথা আমাদের শুনতে নেই। বিয়ে কোন দিনই কারুর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না······আর তা ছাড়া আমার পছন্দ অপছন্দর আছেই বা কি! তুমি জমিদারের ছেলে, বড়লোক, তোমার কাছে ভাল থাকব জেনেই তো বাবা তোমার হাতে দিয়েছেন, আমি কি আর তাঁর চেয়ে বেশী বুঝি?

সুকুমার মুহূর্ত-কয়েক বিস্মিতভাবে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, ও, আমি বড়লোকের ছেলে, এই আমার অপরাধ! কিন্তু বড়লোকরা কি মানুষ নয়?

ইন্দিরা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, মিছিমিছি ও-কথা কেন তুলছ! আমি তো তা বলিনি!

তীক্ষ্ণকণ্ঠে সুকুমার কহিল. না, সোজা ক'রে বলোনি, তবে ঘুরিয়ে বলেছ।······তাহ'লে কি বুঝব বড়লোকের ঘরে এসে তোমার বড্ডই কষ্ট হচ্ছে? এ ঘরে না এলে কোথায় গিয়ে পড়তে হ'তো তা কোনদিন ভেবে দেখেছ কি? তোমাদের ঐ পাড়াগাঁয়ের হয়ত কোন তাড়িখোর বিড়িওয়ালার হাতে পড়ে দু'বেলা মার খেতে হ'ত!

ইন্দিরা কিন্তু এ আঘাতে বিচলিত হইল না। বরং বেশ সহজ শান্ত কণ্ঠে কহিল, সে তো জানি। তুমি অনেক দয়া করেছ, এ আমরা সকলেই জানি। পাছে তোমার গরীব বন্ধুর হাতে পড়লে আমার কষ্ট হয়, সেই ভয়ে যে তুমি অনেক কষ্ট ক'রে সে বিয়ে ভেঙে দিয়েছ তাও জানি!

সহসা যেন সুকুমার ছিট্‌কাইয়া উঠিল। ইন্দিরার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া দাঁতে দাঁত দিয়া কহিল, ও, এতক্ষণে বোঝা গেল যে দরদটা কোথায়! ······তাই এত রাগ আমার ওপর!······একথা আগে বলোনি কেন যে সতীশকে তুমি ভালোবাসো, তাহ'লে আমি যেমন ক'রেই হোক্ সে ব্যবস্থা ক'রে দিতুম!

ইন্দিরার দুই চক্ষু সহসা যেন জ্বলিয়া উঠিল। সে একটা কি জোর উত্তর দিতে গিয়াও যেন চাপিয়া গেল। তাহার ঠোঁট-দুইটি অব্যক্ত উত্তরে মুহূর্ত-দুই থর থর করিয়া কাঁপিয়া চুপ করিল। তাহার পর সে সংযতকণ্ঠেই কহিল, এ যে কত বড়ো মিথ্যে কথা তা তো তুমিই ভালো জানো!

সুকুমার কহিল, মিথ্যে কথা?

ইন্দিরা দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, নিশ্চয়ই মিথ্যে কথা। তুমি আর তোমার বন্ধু যে একসঙ্গেই দেখতে গিয়েছিলে তা ভুলে যাচ্ছ কেন! তা ছাড়া তখন আমি কাউকেই দেখিনি, দেখবার মত অবস্থাও আমার ছিল না। আমার কাছে তখন তুমি, তিনি বা অন্য যে কেউ সমান!

সুকুমার তখন যেন কতকটা অসংলগ্ন ভাবেই কহিল, তবে—, তবে তুমি অমন করছ কেন?

স্থিরদৃষ্টি স্বামীর মুখের উপর মেলিয়া ধরিয়া ইন্দিরা জবাব দিল——কি করেছি আমি? আমি কি তোমার কোনরকম অবাধ্য হয়েছি?

উত্তেজিতভাবে সুকুমার কহিল, অবাধ্য! কিন্তু বাধ্যবাধকতাই কি সব? স্ত্রীর কাছ থেকে স্বামী কি খালি ঐটুকুই আশা করে?

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া ইন্দিরা কহিল, কি জানি, আমি পাড়াগাঁয়ের মেয়ে—সব কথা বুঝতে পারি না! কি করলে তুমি খুশী হও বলো, তাই করব!

সুকুমার আরও জ্বলিয়া উঠিল। কহিল, তুমি পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, লেখাপড়া জানো না, সরল—এই কথাই ঘটক বলেছিল বটে, কিন্তু এখন দেখছি সে মিছে কথা বলেছিল। দশটা শহরের পাশ-করা মেয়ে এলেও তোমার মনের তল পাবে না।...... উঃ, কি সাংঘাতিক!

সে উত্তেজিতভাবে পায়চারি করিতে লাগিল। খানিকটা পরে সহসা আবার ইন্দিরার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া যেন কৈফিয়তের সুরেই বলিল, দুজনে একসঙ্গে দেখতে গিয়েছিলুম। তেমন আরও কেউ যেতে পারত, এর আগেও তো কত লোক দেখতে গেছে। তোমার বাবা পছন্দ করলেন আমাকেই, তা আমি কি করব! আমি তো এমনিও দেখতে যেতে পারতুম—এতে এমন কী গুরুতর অপরাধ হয়েছে!

ইন্দিরা চুপ করিয়া রহিল।

সুকুমার বোধ হয় উত্তরের আশাতেই খানিকটা নিস্তব্ধ হইয়া থাকিয়া কহিল, যাক্—সে যা হবার তা হয়েছে, এখন বলো আমি আমি কি করতে পারি! কি করলে তুমি সুখী হও বলো—আমি সেই ব্যবস্থাই ক'রে দিচ্ছি!

ইন্দিরা এবার জবাব দিল, নীচের দিকে চাহিয়াই কহিল, আমি না বুঝে কি ব'লে ফেলেছি, তুমি আমায় মাপ করো—

সুকুমার বিস্মিত হইয়া চাহিল। কহিল, তুমি ঠাট্টা করছ আমাকে?

ইন্দিরা কহিল, সত্যিই আমি মাপ চাইছি। আমি অত ভেবে কিছু বলিনি—

সুকুমার এইটাই বিশ্বাস করিতে চায়। সে সঙ্গে সঙ্গে অপেক্ষাকৃত শান্ত হইল। নিজের উত্তেজনার জন্য একটু লজ্জিতও হইল। আরও বার-দুই ঘরের মেঝেতে পায়চারি করিয়া এক নিঃশ্বাসে জলের গ্লাসটা শেষ করিল, তাহার পর খাটের উপর বসিয়া পড়িয়া কহিল, তুমিও আমাকে মাপ করো ইন্দু, মনের দুঃখে অনেক কটু কথা বলেছি তোমাকে।...কিন্তু এত আরাধনার পর তোমাকে কাছে পেয়েও না পাবার যে কি দুঃখ তা যদি তুমি বুঝতে!...

ইন্দিরা স্বামীর দিকে ফিরিয়া বসিয়া কহিল, কাল রাত্রে তোমার ভাল ঘুম হয়নি, আজও সারাদিন ঘুমোওনি। তুমি এইবার শুয়ে পড়ো, আমি বরং বাতাস করছি—

এত দুঃখের পর এই মিষ্ট কথাতে যেন সুকুমারের চোখে জল আসিয়া পড়িল। তৎক্ষণাৎ সুবোধ বালকের মত শুইয়া পড়িয়া কহিল, তুমিও আমার কাছে এস তাহ'লে রাণী, একেবারে আমার বুকের কাছে—

ইন্দিরা কাছে সরিয়া আসিল বটে, কিন্তু সে শুইল না। মাথার শিয়র

হইতে পাখাটা তুলিয়া লইয়া সুকুমারকে বাতাস করিতে লাগিল। সুকুমার কিছুক্ষণ চোখ বুজিয়া প্রিয়তমার হাতের এই মধুর সেবাটুকু উপভোগ করিল, তাহার পর মনের আবেগ আর সামলাইতে না পারিয়া ইন্দিরাকে একেবারে টানিয়া লইল নিজের বুকের উপরে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মনে হইল যেন ইন্দিরা আবার সেই আগের মত পাথর হইয়া গেল, সে স্বামীর উচ্ছ্বাসে কোনরূপ বাধা দিল না বটে কিন্তু মনে হইল, যেন সুকুমারের প্রেমের এই উদ্দাম প্রকাশে সে অপমানিত বোধ করিতেছে।

সুকুমার তাহাকে আস্তে আস্তে মুক্ত করিয়া অতি সন্তর্পণে পাশে শোয়াইয়া দিল, তাহার পর ছোট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল, আমারই ভুল ইন্দু, আমি একদিনেই ভালবাসা পেতে চাই!···আমরা যেমন একদিনেই ভালবাসতে পারি, তোমরা তা পারো না—এইটেই ভুলে গিয়েছিলুম।···না, তুমি ঘুমোও, তোমাকে আর বিরক্ত করব না—

কিন্তু তাহার এ করুণ আবেদনও ব্যর্থ হইল। ইন্দিরা কোন উত্তর দিল না।

৫

তাহার পর হইতে এ অভিনয় প্রত্যহই চলিতে লাগিল। সুকুমার দূর হইতে লক্ষ্য করে যে, তাহাকে বাদ দিয়া সমস্ত সংসারটাই ইন্দিরার প্রাণের স্পর্শে যেন উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। সকলেই তাহার অন্তরের মাধুর্য ও বাহিরের দাক্ষিণ্য এবং সেবায় কৃতার্থ হইতেছে, কেবল এ সমস্তর উপরে যাহার অধিকার ও দাবী সকলের চেয়ে বেশী সেই ব্যক্তিটিই দিনের পর দিন বঞ্চিত হইতেছে। শ্বশুরগৃহের সকলেই ইন্দিরার আত্মীয়, খালি যে লোকটিকে উপলক্ষ করিয়া এ আত্মীয়তার সূত্রপাত সেই স্বামীই তাহার রহিয়া গেল বহু দূরে—কিছুতেই, কোনমতেই সে সেই কঠিন ব্যবধান দূর করিতে পারিল না।

কিন্তু তাই বলিয়া স্বামীর সেবায় তাহার ত্রুটি নাই। সকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত তাহার প্রত্যেকটি প্রয়োজনের দ্রব্য ঠিক যন্ত্রের মত হাতের কাছে আগাইয়া দেয়। তাহার সমস্ত স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে ইন্দিরার প্রখর দৃষ্টি। সেই সেবার জন্য যেটুকু কথা বলা প্রয়োজন তাও সে অত্যন্ত সহজভাবেই বলে, কোথাও সঙ্কোচ বোধ করে না। অথচ সেইটাই যেন সুকুমারের আরও অসহ্য বোধ হয়। প্রথম দিককার বিক্ষোভ তাহার আর নাই, সে উগ্রতা কমিয়াছে, তাই ভালবাসার দৃষ্টি এখন আরও অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে। সে বুঝিতে পারিয়াছে যে ইন্দিরা গুরুজনের উপদেশ ভোলে নাই, স্বামীর প্রতি সমস্ত কর্তব্যই তাহার জানা আছে এবং সবগুলিই সে নির্ভুলভাবে পালন করে। কিন্তু যতবারই সেই কর্তব্যকে প্রেম বলিয়া সুকুমার ভুল করিয়াছে, ততবারই ইন্দিরার হৃদয়ের শীতল বর্মে প্রতিহত হইয়া তাহাকে

লজ্জিত হইতে হইয়াছে। স্ত্রীর অন্তরলোকে তাহার কোন অধিকার নাই—এই কথাটাই শুধু বার বার নূতন করিয়া বুঝিয়াছে।

কিন্তু কেন?

এ প্রশ্নের কোন উত্তরই সুকুমার পায় না। ইন্দিরা এ বিষয়ে একেবারে নীরব। তাহাকে ব্যঙ্গ করিয়া, বিদ্রূপ করিয়া, আঘাত করিয়া কোন রকমেই কোন সদুত্তর পাওয়া যায় নাই। শুধু সে প্রশ্ন করে, আমার কি কোন অপরাধ হচ্ছে? কী করতে হবে বলো—

এক এক সময়ে সুকুমার যেন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে যে সে আবার কলিকাতায় চলিয়া যাইবে, পড়াশুনায় মন দিবে। কিন্তু সে সময় যখন সত্যই কাছে আসে তখন আর যাইতে পারে না। এই মেয়েটি যেন তাহাকে জাদু করিয়াছে; তাহাকে প্রতিনিয়ত কী এক অমোঘ আকর্ষণে টানে, অথচ কাছে গেলে কঠিন প্রত্যাখ্যানে ফিরাইয়া দেয়!

এক এক সময় সুকুমার ভাবে যে, এ বোধ হয় সতীশেরই অভিশাপ। তাহাকে আশার ধন হইতে বঞ্চিত করিয়াছে বলিয়াই বোধ হয় সুকুমার এমন করিয়া তাহার শতজন্মের সাধনার ধনকে কাছে পাইয়াও পাইতেছে না। অমৃতের পাত্র চোখের সামনে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, অথচ পিপাসা মিটাইবার কোন উপায় নাই।······

সুকুমারের মাও কিছুদিন পরে ব্যাপারটা লক্ষ্য করিলেন। একদিন একান্তে বধূকে কাছে ডাকিয়া, কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া প্রশ্ন করিলেন, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব বৌমা, ঠিক ঠিক জবাব দেবে?

ইন্দিরা ঘাড় নাড়িল। তাহার ভাবে বোধ হইল প্রশ্নটা সে অনুমানই করিয়াছে।

সুকুমারের মা কহিলেন, আমি কিছুদিন ধ'রেই লক্ষ্য করছি খোকার মনে সুখ নেই। তোমার মত লক্ষ্মীকে পেয়েও সে অসুখী কেন মা?

ইন্দিরা জবাব দিল না, বরং ঘাড় আরও নীচু করিল।

একটু পরে শাশুড়ী কহিলেন, চুপ ক'রে থেকো না মা, আমার মায়ের প্রাণ, বোঝো তো? ও আমার বড় আদরের প্রথম সন্তান, ওর শুকনো মুখ দেখলে বড্ড কষ্ট হয়।

ইন্দিরা নতমুখেই ধীরে ধীরে কহিল, কিন্তু আমি তো জেনেশুনে কোন ত্রুটিই করি না মা।

হরিপ্রিয়া সস্নেহে কহিলেন, তা জানি মা।···কিন্তু তবু কেন অমন ক'রে বেড়ায় ও?···আমার কাছে লজ্জা ক'রো না বৌমা, ঠিক ক'রে বলো দেখি, তুমি কি ওকে ভালবাসতে পারো নি?

ইন্দিরা একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, কিন্তু উনিও তো আমাকে ভালবাসেন নি।

বিস্মিত হইয়া হরিপ্রিয়া কহিলেন, সে কি বৌমা! তুমি তাহ'লে ওর দিকে ভালো ক'রে চেয়ে দ্যাখো নি।···তুমি বড্ড ভুল করেছ মা। ও যে

তোমাময় হয়ে আছে—

ইন্দিরা ধীরে ধীরে কহিল, আমাদের গাঁয়ের জমিদার হরেনবাবুকেও আমি চোখে দেখেছি মা। খুব সুন্দরী বৌ তাঁর, নিজে দেখে পছন্দ ক'রে এনেছিলেন। প্রথম প্রথম তিনিও একটি মিনিট তাঁকে না দেখে থাকতে পারতেন না। তারপর এক বছর যেতেই যেমন নেশা কেটে গেল, তিনি অমনি কলকাতায় চলে গেলেন। শুনেছি সেখানে তাঁর বাইজী আছে। আর তাঁর সেই বৌয়ের সোনাদানার মধ্যে থেকেও চোখের জল শুকোয় না।...তাই আমার বড্ড ভয় করে—

হরিপ্রিয়া খানিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া কহিলেন, তুমি লেখাপড়া কতদূর শিখেছ বৌমা?

ইন্দিরা লাল হইয়া উঠিল। কহিল, আমার বাবা বড্ড গরীব জানেন তো মা, ভিখিরী বললেই হয়, বই কোথায় পাব? এমনি আমার এক বৌদির কাছে কিছু কিছু অক্ষর-পরিচয় হয়েছিল, তারপর ঐ হরেনবাবুর স্ত্রীর কাছ থেকেই দু'একখানা বই এনে পড়বার চেষ্টা করেছিলুম—

হরিপ্রিয়া কহিলেন, তোমার কথাবার্তা চালচলন সবই কিন্তু লেখাপড়া জানা মেয়ের মতই।...আশ্চর্য!...সব চেয়ে দুঃখের কথা বৌমা, তোমার মনটাও ঐ আজকালকার মেয়েদের মত হয়ে উঠেছে, তাই অত ভয় পাচ্ছ। আমরা বুঝি যে মেয়ে দুঃখ পাচ্ছে স্বামীর কাছে, সে মেয়ে কখনই স্বামীর মন পায়'নি। স্বামীর মন যে সত্যি সত্যি কেড়ে নিতে পারে বৌমা, তার আর কখনও কোনদিনই ভয় নেই।

হরিপ্রিয়া যেন আরও কি বলিতে গিয়া চুপ করিলেন। তিনি আবারও হয়ত কিছু বলিবেন মনে করিয়া ইন্দিরা মুহূর্ত-দুই অপেক্ষা করিল, তাহার পর ধীরে ধীরে কহিল, বেশ তো, সেই অবসরই আমাকে দিন না মা!

হরিপ্রিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন, ছেলের মুখ তাঁহার চোখের সামনে ভাসিতেছিল। হয়ত আরও কিছু বলিতেন, কিন্তু সে সুযোগ মিলিল না। সুকুমারের সেই বিলাতফেরৎ কাকা আসিয়া পড়িলেন; কহিলেন, বৌমাকে একটু আমাদের ওখানে নিয়ে যাই বৌদি—গাড়িটা এসেছে যখন, আবার রাত্রে ফিরিয়ে দিয়ে যাব'খন, খাওয়া-দাওয়ার পর—

তিনি তিন চার মাইল দূরেই হাকিমী করেন, মোটরে যাওয়া-আসা চলে। ইতিপূর্বেও বধূকে তিন-চারদিন লইয়া গিয়াছেন। সুতরাং হরিপ্রিয়া আপত্তি করিতে পারিলেন না, বরং তাহাকে সাজাইতে বসিলেন। কাকা খোঁজ করিয়া সুকুমারের ঘরে আসিয়া কহিলেন, তোর কাকীমা ব'লে দিয়েছে, বৌমাকে নিয়ে যাচ্ছি। তুই-ও কেন চল্ না—বরং খাওয়া-দাওয়া ক'রে তুই-ই নিয়ে চলে আসবি।

অকস্মাৎ যেন সুকুমার বিরক্ত হইয়া উঠিল। কহিল, আমার জন্যে তো আর আয়োজন নয়! যাকে তোমরা চাও, তাকেই নিয়ে যাও। আমি যাব না—

কাকা ইহাকে একটা রসিকতা মনে করিয়া হো-হো করিয়া হাসিয়া

উঠিলেন, কহিলেন, হ্যাঁ, প্রায় তাই হয়ে দাঁড়িয়েছে! বৌমা আসতে যেন তুই ব্যাকগ্রাউণ্ডে পড়ে গেছিস্!…নে, চট্ ক'রে তৈরী হয়ে নে এখন—

সুকুমার ততক্ষণে নিজেকে সংবরণ করিয়া লইয়াছে। একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া সে কহিল, না ছোট্কা, সত্যিই আমার শরীরটা ভাল নেই আজ।

ও, আচ্ছা আচ্ছা, থাক তা'হলে। আমিই বৌমাকে নিয়ে যাই—আবার পৌঁছে দিতে হবে আর কি!

তিনি চলিয়া গেলেন। সুকুমার আগে কী একটা বই পড়িতেছিল, পুনরায় সেটায় মন দিল কিন্তু আর যেন পড়া গেল না। অক্ষরগুলি চোখের সম্মুখে একাকার হইয়া যাইতে লাগিল। তাহার দুই চোখও যেন জ্বালা করিতেছিল। বইটা বৃথা চোখের সামনে মেলিয়া খানিকটা বসিয়া থাকিবার পর সে উঠিয়া পড়িল এবং অন্যমনস্ক ভাবেই বারান্দাটা পার হইয়া বাহিরের দিকে আসিয়া হাজির হইল।

কিন্তু সহসা সেখানে পা দিয়াই চমক ভাঙ্গিয়া দেখিল, ইন্দিরা তাহার কাকার সহিত বাহির হইয়া যাইতেছে। নীল বেনারসী কাপড় একখানা পরণে, সর্বাঙ্গে মণিমুক্তার অলঙ্কার। সহসা মনে হইল, যেন চোখের সামনে একটা বিদ্যুদ্দীপ্তি খেলিয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইয়া ও-পাশের সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গেল।…

প্রথম প্রথম সে চেষ্টা ছাড়ে নাই। স্ত্রীর মন জয় করিবার যত রকম উপায় বইয়ে পড়া ছিল এবং বন্ধুবান্ধবদের মুখে শোনা ছিল তাহার সবগুলিই সে একে একে প্রয়োগ করিয়াছে, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। তাহার সেবাপরায়ণা এবং একান্ত বাধ্য বধূকে সে কিছুতেই জয় করিতে পারে নাই। সে চাহিলে ইন্দিরা সব কিছুই করিতে প্রস্তুত কিন্তু তাহাতে সুকুমারের মন ওঠে না, সে চায় ও-পক্ষ হইতে একটা সাড়া, একটা আবেগ—তাই প্রতি দিন এবংপ্রতি রাত্রি তাহার কাছে বিষাক্ত হইয়া যাইতেছে, কিছুতেই সে সাড়া মিলিতেছে না।…

সেদিন বহু রাত্রি পর্যন্ত বাগানে পায়চারি করিয়া সুকুমার স্থির করিয়া ফেলিল যে সে ইন্দিরাকে উপেক্ষাই করিবে। সম্পূর্ণভাবে সব রকমেই তাহার দিকে পিছন ফিরিয়া সে বুঝাইয়া দিবে নিজের মূল্য। সাধ্যসাধনা অনেক করিয়াছে সে, আর না—

সেই প্রতিজ্ঞামত সে সেদিন রাত্রে আহারের পর মাথার শিয়রে আলোটা রাখিয়া একখানা মাসিকপত্র লইয়া শুইয়া পড়িল, এবং রাত্রে ইন্দিরা যখন তাহারই জন্য জল ও পান লইয়া প্রবেশ করিল তখন একবারও মুখ তুলিয়া চাহিল না কিংবা কোন সম্ভাষণও করিল না। ইন্দিরা একটু বিস্মিত হইল, কিন্তু সে-ও কোনও কথা কহিল না। জানালাগুলো ভাল করিয়া খুলিয়া দিয়া একটা জানালার সম্মুখে অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর বেশ সহজভাবেই আসিয়া বিছানার এক পাশে শুইয়া পড়িল।

সুকুমার আরও অনেকক্ষণ সেইভাবে কাগজখানা চোখের সামনে ধরিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। গত এক ঘণ্টার মধ্যেও তাহার পাতা ওল্টাইবার

দরকার হয় নাই, সে প্রয়োজন আর হইলও না, খানিকটা পরে সেও আলো নিভাইয়া শুইয়া পড়িল।

কিন্তু ঘুম তাহার হইল না। অথচ যাহার জন্য তাহার চোখে সারারাতেও তন্দ্রা নামিল না, সে মানুষটি ঠিক তাহার পাশেই শুইয়া অগাধে ঘুমাইতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি এপাশ-ওপাশ করিয়া একেবারে ভোরের দিকে ঘুমাইয়া পড়িয়া সুকুমার স্বপ্ন দেখিল সতীশকে, সে যেন ম্লানমুখে তাহারই পাশে পাশে দীর্ঘরাস্তা চলিয়াছে অথচ কেহ কাহারও সহিত কথা কহিতেছে না।

৬

আরও দুই-তিনটা দিন এইভাবে গেল। দিনে বা রাত্রে সুকুমার কখনই ইন্দিরার সহিত কথা কহিবার চেষ্টা করে না, সামনাসামনি দেখা হইলেও না। ইন্দিরাও চুপ করিয়াই থাকে। সে যেমন দেবর-ননদদের সহিত হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইত তেমনিই বেড়ায়। বাড়ীর ছোট ছেলেমেয়ের দল তাহার জন্য পাগল, বড়দের তো কথাই নাই। এইভাবে সকলের স্নেহের কেন্দ্র হইয়া ইন্দিরার দিন ভালই কাটে, স্বামীকে জীবন হইতে সম্পূর্ণ বাদ দিলেও তাহার ক্ষতি হয় না!

দূর হইতে তাহার এই আনন্দ-সমারোহ, এই ঔদাসীন্য সুকুমার দেখে আর পুড়িতে থাকে। এ যেন বেড়াজাল, যেখানে পথ বলিয়া মনে হয় সেই-খানেই বাঁধন আরও শক্ত করিয়া পায়ে আঁটিয়া ধরে। তিন-চারদিন মনে মনে জ্বলিয়া অবশেষে একদিন সুকুমার অকারণে ফাটিয়া পড়িল। সহসা আপন মনেই কটূক্তি করিয়া কহিল, কুকুরকে 'নাই' দিলে মাথায় ওঠে, এ তো জানা কথা।···বন্ধু-বান্ধবরা দু'শোবার বারণ করেছিল যে, ও বিড়িওলার ঘরের মেয়ে নিয়ো না, তোমাদের ঘরে ওকে একদম মানাবে না—তাদের কথা না শুনেই এই হাল আমার!···হাঘরের মেয়েকে কুড়িয়ে এনে ঘরে ঠাঁই দিয়েছি, ব্যস, আর যাবে কোথায়! একেবারে মাথায় চড়ে বসে আছে!···পড়ত কোন কুলি-মিস্ত্রির পাল্লায়, দু'বেলা চুলের ঝুঁটি ধরে ঘা-কতক ক'রে দিত তো বেশ থাক্‌ত। আমাদের কাজ নয় এসব মেয়ে চরানো—

ইন্দিরা তখন আলমারীর সামনে বসিয়া তাহারই কতকগুলা কাচা কাপড় জামা সাজাইয়া তুলিতেছিল। কথাটা আরম্ভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে সে একবার মুখ তুলিয়া চাহিয়াছিল, কিন্তু তাহার পর আবার সে তেমনি সহজভাবেই নিজের কাজ করিয়া যাইতে লাগিল। সুকুমার নিজেই কথা বলিয়া ফেলিয়া কী যেন একটা আতঙ্কে বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল কিন্তু ইন্দিরা নির্বিকার, তাহার মুখের একটি রেখাও বিচলিত হইল না। সেদিকে চাহিলে একথা মনেই হয় না যে তাহার কাছে অন্য কোন মানুষ দাঁড়াইয়া আছে বা সে কোন কথা কহিয়াছে।

সুকুমারের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। এতবড় অপমানেও যে ইন্দিরা চুপ

করিয়া থাকিবে, ইহা সে কখনও কল্পনা করে নাই। নিজেরই অপমানের আঘাতে বিহ্বল হইয়া সুকুমার কিছুক্ষণ শূন্যদৃষ্টিতে নতমুখী ইন্দিরার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর একপ্রকার ছুটিয়াই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সারাদিন আর সে লজ্জায় কিছুতেই ইন্দিরার কাছাকাছি আসিতে পারিল না। অপরাহ্ণের দিকে যখন দূর হইতে দেখিবার মত সাহস ফিরিয়া আসিল তখনও দেখিল, ইন্দিরা প্রতিদিনকার মতই হাসিখুশির মধ্য দিয়া শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবার খুচরা কাজগুলো করিয়া যাইতেছে। তাহার শান্ত প্রসন্ন মুখের দিকে চাহিয়া কোনমতেই বুঝিবার উপায় নাই যে, এতবড় একটা ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে।

সুকুমার স্তম্ভিত হইয়া গেল। ইহা গুণ না দোষ, মনুষ্যত্বের—না ঐ বস্তুটির অভাবের পরিচায়ক, তাহা সে বুঝিতে পারিল না। শুধু বার বার একটা অদ্ভুত প্রশ্ন তাহার মনের মধ্যে উঁকি মারিতে লাগিল—এত কাণ্ড করিয়া, বন্ধুর সঙ্গে প্রতারণা করিয়া তাহা হইলে কি একটা পাষাণ-মূর্তিই সে বিবাহ করিয়া আনিয়াছে? উহার মধ্যে কি কোথাও কোন প্রাণ নাই?

সে রাত্রিটা সে ইন্দিরা আসিবার আগেই ঘুমের ভান করিয়া এড়াইয়া গেল। পরদিনও প্রায় সেই অবস্থা। অথচ দেখে ও-পক্ষের কোন দিকেই কোন মাথা-ব্যথা নাই। দোষ যে করে নাই, সে-ই যেন চোরের মত শাস্তিভোগ করিতেছে—যে অপরাধিনী তাহার আনন্দলীলার কোথাও কোন ব্যতিক্রম নাই। এ যেন অসহ্য বোধ হয়, কিন্তু উপায় কি? নিজের বিষ নিজেরই সর্বাঙ্গে জ্বালার সৃষ্টি করে।

তাহার আরও অসহ্য বোধ হয় এই দেখিয়া যে, আর সকলেই বেশ আছে। তাহার পরেই যে ভাই, সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ে, সে তো ক্ষুদ্র নবাব বনিয়া গেছে। তাহার প্রত্যেকটি কাজ বৌদিদির করিয়া দেওয়া চাই, নহিলে কিছুই তাহার পছন্দ হয় না। অবশ্য এজন্য তাহার সাধনাও বড় কম নয়। হঠাৎ একদিন সুকুমার আবিষ্কার করিল যে, সে একরাশ ভাল বিলাতী চকোলেট পুকুরপাড়ে ফেলিয়া দিতেছে। অনেকক্ষণ ধরিয়া জবাবদিহির পর কারণটা শোনা গেল যে, বৌদিদি নাকি একদিন চকোলেটের সঙ্গে যে ছবিগুলি থাকে তাহার প্রশংসা করিয়াছিলেন, ফলে তাঁহাকে ছবি যোগাইবার জন্যই এত চকোলেট কেনা হইয়াছে! চকোলেট সে নিজে খায় না, ইন্দিরা তো নয়ই—সুতরাং এগুলি ফেলিয়া দেওয়া ছাড়া উপায় কি? সুকুমার হিসাব করিয়া দেখিল যে, এই ক-মাসে যত টিফিনের পয়সা সে পাইয়াছিল সবগুলিই এই চকোলেট কিনিতে ব্যয় করিয়াছে।

ছোট দু'টি বোন তো সর্বদা ছায়ার মত বৌদিদিকে জড়াইয়া আছে। দিনের বেলা একটু ফাঁক কোথাও পাইবার উপায় নাই। কাকা আগে কদাচিত বাড়ি আসিতেন, এখন কাছারী শেষ করিয়াই আসিয়া হাজির হন, এবং বাড়িতে পা দিয়াই 'আমার বৌমা কোথায় গো?' বলিয়া হাঁক্ দেন। কোনদিন সঙ্গে

করিয়া তাঁহার নিজের বাসায় লইয়া যান, কোনদিন ন'টা দশটা পর্যন্ত এখানে কাটাইয়া বিদায় লন্। আর উপহার যে কত রকমের কত জিনিস তিনি দিয়াছেন এবং দিতেছেন, তাহার বোধ করি হিসাবও নাই। কর্তা স্বয়ং তো আজকাল 'মা-মণি' ভিন্ন ডাকেন না, একটি মুহূর্ত চোখের আড়ালে গেলে অস্থির হইয়া ওঠেন। এমন কি দাসী-চাকররা পর্যন্ত যেন কোন্ জাদুতে এই মেয়েটির কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। কর্তা-গিন্নীর কথা বরং তাহারা অবহেলা করে, কিন্তু এই একফোঁটা মেয়ের একটি অস্ফুট অনুরোধ তাহাদের কাছে যেন বেদবাক্য।

অবশ্য ইন্দিরা আসিবার পর সমস্ত বাড়িটায় যে একটা অদ্ভুত শৃঙ্খলা আসিয়াছে, একথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আগে উপকরণ ছিল যথেষ্টই কিন্তু তবু স্বাচ্ছন্দ্য মিলিত না—এখন প্রত্যেকেরই প্রত্যেকটি জিনিস হাতের কাছে যোগানো থাকে। চারিদিকেই চমৎকার একটি নিপুণতার ছাপ, সেদিকে চাহিলে যেন চোখ জুড়াইয়া যায়। গৃহিণী প্রায়ই নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলেন, মা-লক্ষ্মী আসবার আগে যেন ভূতের বাসা হয়ে ছিল—

এ সবই সুকুমার দেখে। সকলেই সুখী, সে ছাড়া। অথচ সে যেদিন ইন্দিরাকে সকলের অজ্ঞাতে বিবাহ করিয়া আনিয়াছিল, সেদিন ঠিক উল্টাটাই ভাবিয়াছিল। পিতার ক্রুদ্ধ মুখ, মাতার অশ্রু, ভাইবোনের বিদ্রূপ ও তিরস্কার—আর এই সকলের বিপক্ষে দাঁড়াইবার মত সম্বল একখানি সুন্দর মুখের সপ্রেম দৃষ্টি, এই ছিল সেদিনকার কল্পনা। এ যেন বিদ্যাপতির নায়িকার অবস্থা, 'দারিদ্র্য বলিয়া লছমী সেবিতে মাণিক হারানু হেলে।'... বেশী সুখের আশায় শান্তিটা গেল নষ্ট হইয়া!

সে দেখে আর জ্বলে। সহস্র উপায় ভাবে স্ত্রীর চিত্ত জয় করিবার। কোনটা পরীক্ষা করিয়া ব্যর্থ হয়, কোনটা পরীক্ষা করিবার পূর্বেই হাল ছাড়িয়া দেয়। কখনও বা মনকে প্রবোধ দেয় যে সবই ঠিক আছে, যেমন স্বাভাবিক জীবনে ঘটে তেমনিই ঘটিতেছে, তাহারই একটা কেমন বিকৃত মনোবৃত্তি-প্রসূত কল্পনা ছিল, জীবনে সত্য যা ঘটে তাহার সহিত সে কল্পনা খাপ্ খাইতেছে না। এ তাহার অতিরিক্ত নভেল পড়ার ফল, কিংবা লিভারের অসুখ। কিন্তু মনকে যতই বোঝায়, মন বলে, 'নহে নহে, নহে—'

এমনিভাবে অন্তরে অন্তরে ক্ষতবিক্ষত হইতে হইতে একদিন সুকুমার মন স্থির করিয়া ফেলিল, সে কলিকাতাতেই ফিরিয়া যাইবে। হঠাৎ যে কারণে এ বাসনা হইল তাহার, তাহারও একটা ইতিহাস আছে।

সেদিন মনটা সকাল হইতেই খারাপ হইয়া ছিল তাহার। চার-পাঁচদিন যাবৎ সে ইন্দিরার সহিত কথাবার্তাই বন্ধ করিয়া দিয়াছিল, আশা ছিল ইন্দিরা অন্তত ইহাতে একটু ক্ষুণ্ণ হইবে, হয়ত বা ভয়ও পাইবে, কিন্তু সে আশাও সফল হয় নাই। ইন্দিরা প্রয়োজনমত-যাচিয়া কথা বলে, প্রয়োজন না থাকিলে বলে না। আগেও যেমন ছিল এখনও তেমনি আছে, সুকুমারের অভিমান লক্ষ্যই করে না যেন। এই ব্যর্থতার ইতিহাসটা ভাবিতে ভাবিতে

সেদিন দুপুর বেলা হঠাৎ বৈঠকখানা ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়া দেখে যে প্রবোধবাবু একজন হিন্দুস্থানীর সহিত নিবিষ্টচিত্তে কি আলাপ করিতেছেন। এ হিন্দুস্থানীকে সুকুমার চিনিত। এ জহুরী, প্রবোধবাবু ইহার মারফতই হীরা-জহরৎ ক্রয় করিতেন।

বাড়িতে কোন ক্রিয়াকলাপ নাই, অকস্মাৎ জহুরীকে কি দরকার থাকিতে পারে বুঝিতে না পারিয়া সুকুমার কাছে আসিয়া দেখিল হাতের তালুতে একটা হীরা রাখিয়া তাহার বাবা হেঁট হইয়া লেন্স্-এর সাহায্যে তাহাকে পরীক্ষা করিতেছেন। হীরাটি একটু বড়ই, এবং দামও যে কম নয় তাহা পাথরটার অস্বাভাবিক দীপ্তির দিকে চাহিলেই বোঝা যায়।

সে বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল, ও পাথরটা কি হবে বাবা, কিনবেন নাকি?

প্রবোধবাবু মাথা তুলিয়া স্মিতমুখে কহিলেন, হ্যাঁ রে, মনে করছি আসছে পুজোয় বৌমাকে একটা কণ্ঠি গড়িয়ে দেব। মুক্তার কণ্ঠি, মাঝে এইটে ধুকধুকি হবে। কী বলিস—মা-মণিকে বেশ মানাবে না!

অকস্মাৎ যেন সুকুমারের মাথায় খানিকটা উত্তপ্ত রক্ত উঠিতে শুরু করিল। মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত দ্বিধা-সঙ্কোচ মন হইতে চলিয়া গেল। এতদিন যেটা মনের মধ্যে জল্পনা-কল্পনার মধ্যেই ঘুরিতেছিল, সহসা সেটা স্থির প্রতিজ্ঞার রূপে বাহির হইয়া আসিল। সে প্রবোধবাবুর প্রশ্নের জবাব না দিয়া বলিয়া ফেলিল, আমি আজ সন্ধ্যার গাড়িতেই কলকাতায় যাব বাবা।

বিস্মিত হইয়া প্রবোধবাবু প্রশ্ন করিলেন, সে কি? কেন রে?

হীরাটার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া সুকুমার উত্তর দিল, 'ল'-টা তো সবই পড়া রয়েছে, মিছিমিছি ওটা পচিয়ে রেখে লাভ কি! মনে করছি—ফাইনালটা দিয়ে দেব এবার।

প্রবোধবাবু ঈষৎ আশ্বস্ত হইয়া কহিলেন, ও! তা আজই যাবি একেবারে?...দিনটা আবার কেমন আছে আজ—

সুকুমার দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, হ্যাঁ, আজই ভালো। অনেকদিন থেকেই মনে করছি, আজ নয় কাল ক'রে অনর্থক দেরী হয়ে যাচ্ছে। ফাইনালের আর বেশী দেরী তো নেই; এরপর গেলে আর তৈরী হ'তে পারব না।

প্রবোধবাবু কহিলেন, কিন্তু দিনটা কেমন দেখলে হ'ত না—অশ্লেষা-মঘা নেই তো!

তাচ্ছিল্যের সহিত সুকুমার জবাব দিল, হ্যাঁ, এই তো দু-ঘণ্টার পথ—তার আবার দিন দেখা—

সে উপরে চলিয়া গেল। প্রবোধবাবুও হীরাখানা জহুরীর হাতে ফেরৎ দিয়া কহিলেন, তুমি কাল একবার এস তারাচাঁদ, আজ আর দেখবার সময় হবে না।

তারাচাঁদ চলিয়া গেল। প্রবোধবাবু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া একাই বসিয়া রহিলেন। সুকুমারের এই সহসা-জাগরিত কর্তব্যবুদ্ধির মধ্যে কোথায় একটা গলদ আছে সেইটাই বোধ করি চিন্তা করিতেছিলেন। খানিকটা পরে বাড়ির

মধ্যে আসিয়া বধূর উদ্দেশে হাঁক দিলেন, আমার মা-মণি কোথায় গো!

ইন্দিরা ছুটিয়া আসিল, বাবা, ডাকছেন?

তাহাকে দেখিয়াই প্রবোধবাবুর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সস্নেহে হাসিয়া কহিলেন, হ্যাঁগো মা-লক্ষ্মী, ব'সো এখানে—

তাহার পর প্রশ্ন করিলেন, মা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, বেহায়া ভাববে না?

বলুন না, কী বলবেন—

গলা নামাইয়া প্রবোধবাবু কহিলেন, মা, খোকার সঙ্গে কি তোমার কোন ঝগড়া-ঝাঁটি হয়েছে?…আমাকে লুকিও না, ঠিক ক'রে বলো। আমার কাছে কোন লজ্জা নেই মা—

ইন্দিরা তাহার আয়ত চক্ষু তুলিয়া স্থির দৃষ্টিতেই শ্বশুরের দিকে চাহিল, কই না তো!

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া প্রবোধবাবু কহিলেন, তবু ভাল, আমি ভাবলুম রাগারাগি ক'রেই বুঝি চলে যেতে চাইছে—

ইন্দিরা যেন এক মুহূর্তের জন্য একটু চমকিয়া উঠিল। তাহার পরই আবার চক্ষু নত করিয়া যেমন বসিয়াছিল তেমনি বসিয়া রহিল।

প্রবোধবাবু কিছুক্ষণ স্নিগ্ধদৃষ্টিতে নতমুখী বধূর দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, এই জন্যেই ডাকছিলুম। আচ্ছা তুমি যাও মা, এখন বিশ্রাম করোগে—

ইন্দিরা উঠিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

৭

সুকুমারের এবারের প্রতিজ্ঞার আর নড়চড় হইল না। সে যথাসময়ে বৈকালিক চা-পানের পর স্যুটকেস গুছাইয়া লইয়া কলিকাতা রওনা হইল। হোস্টেলের ঘর সে ছাড়ে নাই, বিছানাপত্রও সেখানে প্রস্তুতই আছে, সুতরাং এমন কিছু উদ্যোগ-আয়োজন নাই কিংবা কোন দুর্ভাবনারও কারণ ছিল না।

যাত্রার আগে সুকুমার ইন্দিরাকে দেখিবার আশা করে নাই। কিন্তু হরিপ্রিয়া পান দিবার অছিলায় একরকম জোর করিয়াই তাহাকে পাঠাইয়া দিলেন। সে আসিয়া পানের ডিবাটা মেলিয়া ধরিয়া কহিল, মা ব'লে দিলেন খুব সাবধানে থাকতে—

সুকুমার চকিতে একবার ইন্দিরার মুখটা দেখিয়া লইল, বোধ হয় তখনও সে মুখে সে একটু বেদনার ছায়া আশা করিতেছিল, কিন্তু তাহার ভাবলেশ-হীন মুখ হইতে অনুরোধটা বাহির হইয়া আসিল কতকটা যান্ত্রিক ব্যাপারের মতই। একটা পান তুলিয়া লইয়া সুকুমার ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল, কথাটার উত্তর দিবারও প্রবৃত্তি রহিল না।

গাড়ীর সময় তখন আসন্ন, সে আর অন্তঃপুরেও কোথাও দাঁড়াইল না, হনহন করিয়া নামিয়া একেবারে ঘোড়ার গাড়ীতে চড়িয়া বসিল। বার বার নিজের অভিমানের কাছেই প্রতিজ্ঞা করিতে লাগিল, আর বহুদিন এ-মুখো হইব না, আমাকে বাদ দিয়া আর সকলেই যদি সুখী হয় তো হোক—

কিন্তু দৈব বিরূপ। সুকুমারের আদেশে কোচম্যান একটু জোরেই গাড়ী চালাইয়াছিল, স্যাকরাদের আমবাগানের বাঁকে যে একটা গরুর গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল তাহা সে দেখিতে পায় নাই। যখন দেখিল, তখন প্রাণপণে রাশ টানিয়া ধরিয়াও ঘোড়াকে সামলাইতে পারিল না, গাড়ী একেবারে গিয়া পড়িল গরুর গাড়ীর ঘাড়ে।

তাহার পরের ব্যাপার সাধারণ। গাড়ীটা পাশের খানায় উল্টাইয়া পড়িল। খানার ধারে স্যাকরাদের একটা সজনে গাছ থাকায় একেবারে উপুড় হইয়া পড়িল না, কাৎ হইয়া লাগিয়া রহিল। কোচম্যান, ঘোড়া এবং গরুর গাড়ীর চালক সাংঘাতিক জখম হইল, অতি অদ্ভুত উপায়ে শুধু গরু দুটা বাঁচিয়া গেল।

সুকুমারের রক্তপাত খুব বেশী না হইলেও চোট লাগিয়াছিল দারুণ, সে কতকটা অজ্ঞানের মতই হইয়া পড়িয়া ছিল। চারিদিক হইতে যখন হৈ হৈ করিয়া লোকজন আসিয়া পড়িয়া তাহাকে টানিয়া বাহির করিল, তখন ব্যাপারটা কতকটা বুঝিতে পারিলেও তাহার নড়িবার বা কথা বলিবার সামর্থ্য ছিল না। দৈবক্রমে স্কুলের তখন ছুটির সময়, ছেলেরা কাছেই ছিল, তাহারা স্কুলেরই একটা চেয়ারের উপর তাহাকে বসাইয়া সকলে মিলিয়া ধরাধরি করিয়া বাড়ীতে লইয়া আসিল।

ঐ অবস্থাতে সুকুমারকে ফিরিতে দেখিয়া হরিপ্রিয়া কোন প্রশ্ন না করিয়াই চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। প্রবোধবাবুর মাথা ঝিম্-ঝিম করিতে লাগিল, তিনি গোলমাল শুনিয়া বৈঠকখানা ঘর হইতে বাহিরের উঠানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, সেইখানেই বসিয়া পড়িলেন। কথা কহিবার, প্রশ্ন করিবার বা কোন নির্দেশ দিবার মত তাঁহার অবস্থা রহিল না।

শুধু ইন্দিরা ভিতরে কী কাজে ব্যস্ত ছিল, সে বাহির হইয়া আসিয়া ব্যাপারটা দেখিয়াও কিছুমাত্র বিচলিত হইল না, একেবারে সামনে আসিয়া ছেলেদের সম্বোধন করিয়া বলিল, আপনারা যখন এতই করেছেন, তখন দয়া ক'রে ওঁকে একেবারে ওপরে নিয়ে আসুন, শোবার ঘরে। ঠাকুরপো, আমি ওঁকে দেখছি, তুমি ভাই বাবাকে একটু দেখো, ওঁর মাথায় একটু হাওয়া করো। আর ক্ষীরিকে বলো, এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল এনে দিক। লক্ষ্মী ভাইটি, আর দাঁড়িয়ে থেকো না—

তাহার পর ছেলেদের পথ দেখাইয়া সে একেবারে নিজেদের শয়নকক্ষে লইয়া আসিল এবং খাটের উপর সুকুমারকে সযত্নে শোয়াইয়া দিয়া প্রথমেই জামাগুলা কাঁচি দিয়া কাটিয়া খুলিয়া দিল। ছেলেরা এমনিই খুলিতে যাইতেছিল, সে বাধা দিয়া কহিল, দরকার নেই আর অনর্থক নাড়াচাড়া

ক'রে—একটা জামার দাম কতই বা! আপনারা বরং দয়া ক'রে কেউ একজন ডাক্তারবাবুকে খবর দিন, এখনো হয়ত তিনি আমাদের ডাক্তারখানাতেই আছেন—

একটি ছেলে তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া গেল। ইন্দিরা খানিকটা ঠাণ্ডা জল আনিয়া প্রথমে মুখে-চোখে অল্প একটু জলের ঝাপ্টা দিল, তাহার পর নিজের আঁচলটা ভিজাইয়াই সুকুমারের সর্বাঙ্গে বুলাইতে লাগিল।

ইতিমধ্যে প্রবোধবাবু, হরিপ্রিয়া দুজনেই আসিয়া পড়িয়াছেন। কাজের মজাই এই যে, কেহ একবার আরম্ভ করিয়া দিলে বাকী সকলেই নিজেদের কর্তব্য বুঝিতে পারে। তাঁহারা আসিয়া কতকগুলা জিনিসপত্র সরাইয়া বিছানার পাশে খানিকটা জায়গা করিয়া দিলেন, জানলাগুলা সব খুলিয়া ঘরে আরও আলো-বাতাসের ব্যবস্থা করা হইল। তাহার পর প্রবোধবাবু ছেলেদের ঘরের অপর প্রান্তে সরাইয়া বসিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন এবং হরিপ্রিয়া ইন্দিরার নির্দেশমত একটা পাখা লইয়া ছেলের শিয়রে বসিয়া বাতাস করিতে লাগিলেন।

একটু পরে ডাক্তারবাবু আসিয়া পড়িলেন। সকলে আতঙ্কে স্তব্ধ হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। ডাক্তারবাবু নানাভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া অপেক্ষাকৃত প্রফুল্ল মুখে বলিলেন, না, ভয়ের কোন কারণ নেই। শুধু শক্‌টাতেই অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন, নইলে এমন কোথাও লাগেনি।

পকেট হইতে একটা কাগজ বাহির করিয়া খস্‌খস্ করিয়া একটা প্রেসক্রিপসান লিখিয়া চাকরের হাতে দিলেন, সে ডাক্তারখানায় দৌড়িল, তাহার পর তিনি নিজেই কী একটা ঔষধ ব্যাগ হইতে বাহির করিয়া তুলার সাহায্যে, অল্প অল্প করিয়া যে স্থানগুলি কাটিয়া গিয়াছিল, সেগুলি পরিষ্কার করিয়া মুছিয়া দিতে লাগিলেন। কিন্তু এই সমস্ত কাজের মধ্যে কখন যে ইন্দিরা তাহার জমিদার-বধূর সম্ভ্রম এবং লজ্জা ত্যাগ করিয়া তাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া নীরবে ঔষধে তুলা ভিজাইয়া হাতের কাছে যোগাইয়া দিতেছিল, তাহা এমন কি ডাক্তারবাবুও বুঝিতে পারেন নাই। প্রবোধবাবু বা হরিপ্রিয়া দেখিয়াছিলেন, কিন্তু তখন তাঁহাদের তাহা লক্ষ্য করিবার কথা নয়।

প্রথম লক্ষ্য করিল রোগীই। এইসব শুশ্রূষার মধ্যেই এক সময়ে সে চোখ মেলিয়াছিল, কিন্তু তখনও তাহার চৈতন্য ভাল করিয়া ফিরিয়া আসে নাই, মিনিট দুই পরে যখন ব্যাপারটা দৃষ্টি ভেদ করিয়া মস্তিষ্কে পৌঁছিল তখন সে চমকিয়া উঠিয়া দেখিল, ইন্দিরা ডাক্তারের পাশে দাঁড়াইয়া তাহার সেবা করিতেছে, ইন্দিরার মুখে উদ্বেগের ছায়া—

সুকুমার নড়িয়া উঠিতেই সকলের চমক ভাঙ্গিল। হরিপ্রিয়া একেবারে মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন, প্রবোধবাবু হেঁট হইয়া প্রশ্ন করিলেন, এখন কেমন বুঝছ বাবা? কষ্ট হচ্ছে না তো?

ইন্দিরা মুখের উপর ভাল করিয়া ঘোমটা টানিয়া দিল, কিন্তু কাজ বন্ধ করিল না।

সুকুমারের ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। ইন্দিরা তাহার সেবা করিতেছে, ইন্দিরা তাহার জন্য উদ্বিগ্ন, এই ব্যাপারটার মধ্যে এমনই নূতনত্ব, এমনই বিস্ময় আছে যে দৃশ্যটা মুহূর্তের মধ্যেই তাহার মনে মোহের সৃষ্টি করিয়াছিল, সেই অনুভূতিতে ব্যাঘাত ঘটায় সে বিরক্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু মুখে শুধু ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, ওগুলো কি দিচ্ছেন ডাক্তারবাবু, বড্ড জ্বালা করছে যে!

ডাক্তারবাবু ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, না, এই যে হয়ে গেছে—আর জ্বালা করবে না।···মোদ্দা আপনি এখন একদম নড়বেন না, কিংবা কথাও বলবেন না। আর একটু যাক্—

সুকুমার আর কথা কহিল না। তাহার এ অবস্থার সমস্ত ইতিহাসটা ভাল করিয়া মনেও পড়ে নাই তখনও পর্যন্ত, সবটা সে বুঝিতেও পারিতেছিল না, শুধু তাহার অর্ধ-জাগ্রত চৈতন্যের মধ্যে একটা কথা বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল ইতিমধ্যেই যে সে গুরুতরভাবে পীড়িত হইয়াছে এবং ইন্দিরা তাহার সেবা করিতেছে। এই নূতন তথ্যটাই সে চোখ বুজিয়া মনে মনে অনুভব করিতে লাগিল—এই অপ্রত্যাশিত সংবাদটা।

ঔষধ আসিয়া পৌঁছিল। ডাক্তারবাবু কাঁচের গ্লাসে ঢালিয়া নিজে এক দাগ খাওয়াইয়া দিলেন এবং চেয়ারে জাঁকিয়া বসিয়া ঘোষণা করিলেন যে, আরও খানিকটা না দেখিয়া তিনি নড়িবেন না। হরিপ্রিয়া শিয়রে বসিয়া তেমনি বাতাস করিতেছেন, সুতরাং আপাতত কোন কাজ নাই। প্রবোধবাবু কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়া বাহির হইয়া আসিলেন।

ভয়ের বিশেষ কোন কারণ নাই কিংবা প্রয়োজনও নাই বলিয়া ছেলেগুলিও একে একে বাহির হইতে শুরু করিল। ইন্দিরা মিনিটখানেক বোধ হয় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, এখন এই সব নড়া-চড়ায় যেন তাহার সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল, সে চট্ করিয়া আর একটা দরজা দিয়া বাহিরে আসিয়া প্রবোধবাবুকে চুপি চুপি কহিল, বাবা, এঁরা এত কষ্ট করলেন, এমনি এমনি চলে যেতে দেওয়া কি ঠিক হবে?···

প্রবোধবাবু ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, তাই তো, সে তো ভারি অন্যায় হবে, কিন্তু কী করা যেতে পারে তাও তো বুঝতে পারছি না।

মৃদুকণ্ঠে ইন্দিরা জবাব দিল, আপাতত একটু মিষ্টিমুখ করিয়ে দিলে হ'ত না?

ঠিক। ঠিক। বাবা, তোমরা এক মিনিট দাঁড়াও—না না, তোমরা ঐ বৈঠকখানায় বসবে চলো। মা মণি, তুমি তাহ'লে—

ইন্দিরা মুচকি হাসিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার পর ডাক্তার বিদায় লইতে প্রবোধবাবু আসিয়া তাঁহার পরিত্যক্ত চেয়ারটায় বসিলেন। সুকুমার তখন চোখ বুজিয়া পড়িয়া আছে। বোধ করি ঘুমাইয়াই পড়িয়াছে। হরিপ্রিয়া তখনও তাহার মাথায় বাতাস করিতেছিলেন,

তাঁহাকেই সম্বোধন করিয়া প্রবোধবাবু ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া প্রশ্ন করিলেন, খোকা বোধ হয় ঘুমোল, না?

হরিপ্রিয়া মাথা নাড়িয়া জানাইলেন, হ্যাঁ।

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া প্রবোধবাবু তেমনি চুপিচুপিই কহিলেন, বিপদে না পড়লে কার কি দাম—বোঝা যায় না। উঃ, আজ বৌমা না থাকলে কী কাণ্ডই হ'তো তাই ভাবছি!...যেমন তুমি, তেমনি আমি, দুজনেই তো বসে পড়লুম...ঐটুকু মেয়ের কি উপস্থিত বুদ্ধি বলো দিকি! এক লহমা ভাবলে না কিংবা হৈ-চৈ কান্নাকাটি কিছু করলে না—একেবারে কাজে লেগে গেল, আশ্চর্য!

প্রবোধবাবু চুপ করিলেন। সমস্ত কথাগুলি মনে করিয়া হরিপ্রিয়ার চোখে বোধ করি জল আসিয়া গিয়াছিল, তিনি আঁচলে চোখ মুছিয়া গাঢ়স্বরে কহিলেন, মা আমার সাক্ষাৎ ভগবতী। খোকা বেঁচে থাক আর বৌমা বেঁচে থাক—আর কিছু চাই না, আর কিছু ভাবতেও হবে না তাহ'লে।

সহসা তিনি চুপ করিয়া গেলেন, কারণ সুকুমার এই সময় একটু নড়িয়া-চড়িয়া উঠিল। পাছে ঘুম ভাঙ্গে এই আশঙ্কায় হরিপ্রিয়া মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন, প্রবোধবাবুও উৎকণ্ঠ হইয়া চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু সুকুমার আর বিশেষ নড়াচড়া করিল না। হরিপ্রিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িলেন।

সুকুমার জাগিয়াই ছিল, সে ভাবিতেছিল ইন্দিরার কথা। বাবা-মার কথা কানে যাইতে অকস্মাৎ তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া গিয়াছিল বলিয়াই সে মুখটা বালিশের দিকে আরও গুঁজিয়া দিয়াছিল, শুধু দুর্বলতা ঢাকিবার জন্যই। সে-ও ঐ কথাটাই ভাবিতেছিল, বিপদে না পড়িলে কাহারও যথার্থ মূল্য বোঝা যায় না! এই ইন্দিরাকে সে এতদিন কী ভুলই না বুঝিয়াছিল! বেচারী ইন্দু, তাহাকে কটু কথা বলিতেও ইতস্তত তো করেই নাই, এমন কি তাহার পিতার দারিদ্র্যকে উপলক্ষ করিয়াও কত অপমান করিয়াছে! বেচারী একটি প্রতিবাদ করে নাই, রাগ করে নাই, নীরবে সমস্ত সহিয়াছে, উপরন্তু পরক্ষণে সুকুমারেরই স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করিয়াছে, শান্ত স্মিত মুখে—

যে প্রেম বক্ষ ভরিয়াই ছিল শুধু প্রকাশের অপেক্ষায়, এইবার তাহাই যেন উদ্বেল হইয়া উঠিল। সে ইন্দিরার কাছে ক্ষমা চাহিতে চায়, আর এখনই —এক মিনিটও যেন সবুর সহিতেছে না।

সে আবারও নড়িয়া-চড়িয়া উঠিল। হরিপ্রিয়া মুখের কাছে মুখ আনিয়া উদ্বিগ্ন সস্নেহে প্রশ্ন করিলেন, কী বাবা, কষ্ট হচ্ছে কিছু?

সুকুমার মাথা নাড়িয়া জানাইল, না।

তাহার পর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, তুমি আর কতক্ষণ বসে থাকবে মা এমন ক'রে! তুমি আহ্নিক-পুজো করগে, আমি এমনিই ঘুমোব এখন, বাতাস লাগবে না।

বোধ হয় আসল কথাটা হরিপ্রিয়া বুঝিলেন, বিশেষ প্রতিবাদ না করিয়া

কহিলেন, তুই কি খাবি এখন কিছু? ডাক্তার বার্লি দিতে বলেছে, পাঠিয়ে দেব বৌমাকে দিয়ে একটু?

প্রথমটা 'না' বলিতেই যাইতেছিল, কিন্তু শেষের কথাটা শুনিয়া সুকুমার কহিল, দাও একটু না হয়—

হরিপ্রিয়া ও প্রবোধবাবু দুজনেই উঠিয়া পড়িলেন। একটু পরেই আঁচলের উপর বার্লির বাটি বসাইয়া ঘরে ঢুকিল ইন্দিরা। বাটিটা টিপয়ের উপর রাখিয়া কাছে গিয়া মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, এখনও গরম আছে একটু। এখনি খাবে, না ঠাণ্ডা ক'রে দেব?

সুকুমার বাঁ হাতখানা বাড়াইয়া তাহার একটা হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, ইন্দু, তোমার কাছে অপরাধ আমার কখনও ঘুচবে না।···মাপ চাইব যে সে মুখও বোধ হয় নেই।

ইন্দিরার ভাবশূন্য মুখ বোধ হয় এই প্রথম আরক্ত হইয়া উঠিল। সে হয়ত একটু বিস্মিতও হইল। মৃদুকণ্ঠে কহিল, ওসব কথা এখন থাক— দুর্বল শরীর তোমার···এই বার্লিটুকু এবার খেয়ে নাও।

ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হইলেও সুকুমার আর কথা কহিল না, ইন্দিরার হাতখানা ছাড়িয়া দিয়া এক নিঃশ্বাসে বার্লিটা খাইয়া ফেলিল। ইন্দিরা বাটি ধরিয়া রহিল, খাওয়া শেষ হইলে নিজের আঁচল দিয়াই মুখ মুছাইয়া দিল। এ যেন এক বিস্ময়কর অনুভূতি। সুকুমার স্তব্ধভাবে ইন্দিরার এই সেবাপরায়ণা মূর্তির দিকে চাহিয়া রহিল। সে বাটিটা বাহিরে রাখিয়া আসিল, তাহার পর টেবিলের আলোটা সুকুমারের চোখে লাগিতে পারে এই আশংকায় একটা খবরের কাগজ চিম্‌নির গায়ে আড়াল করিয়া দিয়া শিয়রে আসিয়া বসিল বাতাস করিতে।

কিন্তু পাখাটা তুলিয়া লইতেই সুকুমার কহিল, ওখানে বসলে তোমায় যে দেখতে পাবো না ইন্দু, তুমি এইখানে এসে ব'সো—

সে তাহার পাশটা দেখাইয়া দিল।

ইন্দিরা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না। তোমার এখন ঘুমোনো দরকার। আমি মাথায় বাতাস করছি, তুমি ঘুমিয়ে পড়ো। ওখানে বসলে তুমি ঘুমোতে দেরী করবে।

তাহার কণ্ঠস্বর দৃঢ়। সুকুমারের আর প্রতিবাদ করিতে সাহস হইল না। কে জানে, হয়ত আর বেশী বলিতে গেলে এখনই আবার একেবারে সুর কাটিয়া যাইবে। তাহার চেয়ে এই শাসন উৎকণ্ঠাপ্রসূত, এই কথা কল্পনা করাই ভাল। সে আস্তে আস্তে পাশ ফিরিয়া শুইয়া একটা হাত ইন্দিরার হাঁটুর উপর তুলিয়া দিল, তাহার পর চোখ বুজিয়া থাকিতে থাকিতে কোন এক সময় সত্যই ঘুমাইয়া পড়িল।

সুকুমারের ঘুম ভাঙ্গিল অনেক রাত্রে। সহসা যেন গালের উপর কাহার একটা উষ্ণ নিঃশ্বাস লাগার সঙ্গে সঙ্গে তাহার আচ্ছন্নতা কাটিয়া গেল। চোখ মেলিয়া দেখিল ইন্দিরা তখনও তেমনি শিয়রে বসিয়া আছে, কিন্তু বোধ করি বাতাস করিতে করিতেই এক সময়ে তাহার তন্দ্রা আসিয়াছিল, সে ঢুলিয়া সুকুমারেরই বালিশের উপরমুখ গুঁজিয়া পড়িয়াছে। হাতে তাহার তখনও পাখাটা ধরা, কতকটা উপুড় হইয়া পড়িয়াছে—ঘাড়টা বাঁকিয়া সুকুমারের দিকে মুখটা ফেরানো, সেই অবস্থাতেই অঘোরে ঘুমাইতেছে।

কতখানি শারীরিক ক্লান্তিতে ইহা সম্ভব হইয়াছে ভাবিয়া সুকুমারের বুক স্নেহে ও মমতায় ভরিয়া উঠিল, কিন্তু কনুইতে ভর দিয়া একটু উঠিয়া বসিতেই টেবিলের আলোর একটা রেখা ইন্দিরার মুখে আসিয়া পড়িয়া তাহার ঘুমন্ত মুখটা এতই সুন্দর দেখাইল যে, কিছুক্ষণ পর্যন্ত সে মোহাবিষ্টের ন্যায় শুধু তাহার মুখের দিকেই চাহিয়া বসিয়া রহিল, তাড়াতাড়ি কোন স্বাচ্ছন্দ্য দিবার কথা ভাবিতেও পারিল না। ঠোঁট দুটি একটু ফাঁক হইয়া আছে, তাহার মধ্য দিয়া সাদা দাঁতগুলির আভাস পাওয়া যাইতেছে, চোখের সুদীর্ঘ পক্ষ্মরাজি শুভ্র রক্তিম গণ্ডের উপর অনেকখানি ছায়া বিস্তার করিয়াছে, সুন্দর মসৃণ কপালের উপর একটি সিঁদুরের ফোঁটা—সবটা মিলিয়া যেন নিমেষে তাহাকে মুগ্ধ করিয়া দিল।

মিনিট দুই তিন নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিবার পর তাহার নিজেরই ক্লান্তি-বোধ হইল। কনুইয়ের উপর ভর দিয়া ঐভাবে বসিয়া থাকিতে কষ্টও হইতেছিল। সে উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিল কিন্তু ভাল লাগিল না, শুইয়া পড়িয়া অত্যন্ত সন্তর্পণে ইন্দিরাকে সোজা করিয়া শোয়াইবার চেষ্টা করিল, তাহাতেও সুবিধা হইল না। কাজটা যত সহজ মনে হইয়াছিল, দেখা গেল ততটা সহজ নয়। তখন আবার উঠিয়া বসিয়া ইন্দিরাকে একেবারে নিজের পাশে টানিয়া লইল। সে এমনই গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন ছিল যে, অত টানাটানিতেও আগে তাহার ঘুম ভাঙ্গে নাই, ভাল করিয়া মাথায় বালিশটা টানিয়া দিবার সময় শুধু একবার চোখ মেলিল ; ঘুমের ঘোরে কী বুঝিল কে জানে, কেমন একটা বিহ্বলভাবে হাসিয়া সে সুকুমারকে নিবিড়ভাবে জড়াইয়া ধরিল। পরক্ষণেই তাহার বুকে মুখ গুঁজিয়া আবার ঘুমাইয়া পড়িল।

ইহা হয়ত স্বপ্ন, ইহা হয়তো ঘুমের ঘোর—তবু সুকুমারের সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। সে ঘটনাটা অনুভব করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সমস্তটা যেন মাথার মধ্যে তাল পাকাইতে লাগিল। তাহার সমস্ত কল্পনা আজ হয়ত বা মিথ্যার মধ্য দিয়াই সম্ভব হইয়াছে, তবু তো তাহা ঘটিয়াছে, তবু তো সে ইন্দিরার নিবিড় বাহুবন্ধন অনুভব করিতেছে ! সে যেন ভরসা করিয়া জোরে নিঃশ্বাসও ফেলিতে পারিতেছিল না। পাছে এই মিথ্যা সুখটুকুও চলিয়া যায়।…

এমনি করিয়াই সারারাত্রি কাটিয়া গেল। ইন্দিরার ঘুম ভাঙ্গিল একেবারে

ভোরের দিকে। সে প্রথমটা ঘুম ভাঙ্গিয়া ব্যাপারটা কিছুই বুঝিতে পারিল না, তাহার পর তাহার মনে পড়িল যে, সুকুমারের মাথায় সে বাতাস করিতেছিল, খুব সম্ভব সেই অবস্থাতেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে এবং—। মুহূর্ত দুই তিন মাত্র, তাহার পরই প্রবল লজ্জায় তাহার গণ্ড, কপোল, কণ্ঠ লাল হইয়া উঠিল, সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল। বসিতে বসিতেই সুকুমারের সহিত তাহার চোখোচোখি হইল। সুকুমার তখনও জাগিয়া ছিল, সারারাত্রি জাগরণে তাহার চোখ দুইটি রক্তিম, চোখের কোলে কালিমা, ইন্দিরার লজ্জা ও বিস্ময় লক্ষ্য করিয়া সে ক্লান্তভাবে হাসিল।

ইন্দিরা অপ্রস্তুত হইয়া মাথার খোঁপাটা ঠিক করিতে করিতে কহিল, তুমি কি সারারাত ঘুমোও নি ?

না রাণী, তোমাকে দেখছিলাম। এমন ক'রে কাছে পাবার ভাগ্য তো হয় না!

ইন্দিরার কান, মাথা গরম হইয়া উঠিল। কহিল, ছি ছি! তোমার অসুখ শরীর, এমন ক'রে রাত জাগা কি ঠিক!…আমায় ডেকে দাওনি কেন ?

সুকুমার উত্তর দিল না। আঘাতের বেদনা তো ছিলই, তাহার উপর সারারাত একভাবে শুইয়া থাকিবার ফলে তাহার সারাদেহ তখন আড়ষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, রীতিমত যন্ত্রণাও শুরু হইয়াছে। সে সোজা হইয়া ভাল করিয়া শুইবার চেষ্টা করিতে গেল, কিন্তু পারিল না, বরং যন্ত্রণায় তাহার মুখ চোখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল।

ইন্দিরা উদ্বিগ্ন হইয়া তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া কহিল, পাশ ফিরিয়ে দেব ?…দাঁড়াও দাঁড়াও—

ক্ষীণ কণ্ঠে সুকুমার কহিল, বড় ব্যথা ইন্দু, সারাদেহে যেন কি কামড়াচ্ছে—

সে আর কথাও কহিতে পারিল না। গভীর ক্লান্তি ও অবসাদে চোখ বুজিল। ইন্দিরা কিন্তু তাহার যন্ত্রণার কারণটা অনুমান করিয়া লইয়াছিল, সে তাড়াতাড়ি তাহার বাঁ হাতটা ভাল করিয়া টিপিয়া টিপিয়া রক্তচলাচলের ব্যবস্থা করিয়া দিল, তাহার পর সাবধানে সুকুমারকে পাশ ফিরাইয়া দিয়া একরকম ছুটিয়াই বাহির হইয়া আসিল।

বাহিরে পা দিতেই প্রথম যাঁহার সহিত দেখা হইল, তিনি হইলেন হরিপ্রিয়া। পুত্রবধূর মুখের রক্তিমাকে তিনি লজ্জা বলিয়া ভুল করিলেন। ছেলের ব্যথা একমাত্র তিনিই জানিতেন, সেইজন্য কাল রাত্রে দ্বারপথে উঁকি মারিয়া দু'জনকে অত কাছাকাছি ঘুমাইতে দেখিয়া, বধূ উপবাসী আছে জানিয়াও, তিনি ডাকেন নাই। পুত্রের জন্য উদ্বেগ থাকা সত্ত্বেও তাঁহাকে তাই কিছু উৎফুল্লই দেখাইতেছিল।

কিন্তু সে ভুল তাঁহার শীঘ্রই ভাঙ্গিল।

ইন্দিরা উদ্বিগ্ন হইয়া কহিল, মা, ওঁর যন্ত্রণা আবার বেড়েছে, গা-ও যেন একটু গরম বোধ হ'ল—ডাক্তারবাবুকে একবার ডাকতে হবে।

সে কি! হরিপ্রিয়া একরকম তাহাকে ঠেলিয়াই ঘরে ঢুকিলেন। সত্যই সুকুমারের গা গরম, সে অবসাদে একেবারে তখন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, ডাকাডাকিতেও চোখ খুলিল না, কিংবা কথা কহিল না।

তুমি রাত্রে কিছু টের পাওনি বৌমা?—এই সব ব্যাপার, একটু সাবধানে থাকতে হয়!

তাঁহার কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ন, কোথায় যেন তিরস্কারের সুর লুকাইয়া ছিল।

ইন্দিরা মাথা হেঁট করিয়া পায়ের আঙ্গুল দিয়া খাটের পায়াটা খুঁটিতে খুঁটিতে জবাব দিল, বড্ড ঘুমিয়ে পড়েছিলুম মা, উনিও ডাকেন নি—

তুমি জেগে থাকবে ব'লেই আমি নিশ্চিন্ত ছিলুম মা। অতই যদি ঘুম পেয়েছিল, আমাকে ডাকোনি কেন?

ইন্দিরা এ কথার উত্তর দিল না, কিন্তু তিরস্কারে ভাঙ্গিয়াও পড়িল না, কারণ উহার ভিতরের খোঁচাটার মধ্যে সত্য ছিল না। সে শুধু কহিল, আগে ডাক্তারকে খবর দিন মা।

হরিপ্রিয়া রুষ্টস্বরে জবাব দিলেন, তুমিই যাও, শ্বশুরকে বলগে। আমি এখন খোকাকে ছেড়ে যাই কী ক'রে!

তিনি একেবারে সুকুমারের শিয়রে গিয়া বসিলেন।

৯

ইন্দিরা কোনমতে শ্বশুরকে খবর দিয়া পাশের একটা ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়া ভিতর হইতে দুয়ার বন্ধ করিয়া দিল। লজ্জায় যেন তাহার মাথা খুঁড়িয়া মরিতে ইচ্ছা করিতেছিল। এ কী কাল-ঘুম তাহাকে কাল পাইয়া বসিয়াছিল? সুকুমারের উপর রাগ হইতেছিল ভীষণ। সে না হয় ঘুমাইয়াই পড়িয়াছিল, অমন করিয়া তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া সারারাত জাগিবার প্রয়োজন কি ছিল? শুধু শুধু পৃথিবীসুদ্ধ লোকের কাছে তাহাকে লাঞ্ছিত করা!

কিন্তু লজ্জার প্রথম বেগ কাটিয়া গেলে সে মনে মনে উপলব্ধি করিল যে, লজ্জার সঙ্গে সঙ্গে সে এই ব্যাপারে একটু গর্বও অনুভব করিতেছে যেন! স্বামীর যে ভালবাসা সে চাহে না, তাহারই এই আতিশয্যে তাহার গৌরববোধের কারণ কি? তবে কি, তবে কি সে তাহার অজ্ঞাতসারে সুকুমারের কাছে ধরাই পড়িয়াছে?...

সন্দেহটা মনে দেখা দিবার সঙ্গে সঙ্গেই সে শিহরিয়া উঠিল। দুই কান এবং কপালের খানিকটা যেন আগুন হইয়া উঠিয়াছে। সুকুমার তাহা হইলে তাহাকে সত্যই জয় করিল নাকি?

ইন্দিরা পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, লেখাপড়া বিশেষ শেখে নাই, কিন্তু তাহার

তীক্ষ্ণ সহজ বুদ্ধিতে সে প্রেম ও রূপজ মোহের ব্যবধানটা অল্পবয়সেই বুঝিতে পারিয়াছিল। সে যেদিন শুনিল যে, সুকুমার বন্ধুর জন্য মেয়ে দেখিতে আসিয়া বন্ধুকে বঞ্চিত করিয়া নিজেই তাহাকে বিবাহ করিতেছে, সেইদিনই সে যে ভয়ে ও ঘৃণায় শিহরিয়া উঠিয়াছিল তাহার সে ভয় ও ঘৃণা আজও একেবারে যায় নাই। পুরুষের কলুষিত কামনার এই বীভৎস আত্মপ্রকাশে তাহার সমস্ত মন স্বামীর সম্বন্ধে সঙ্কুচিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং সে সংকোচ এখনও কাটে নাই। তাহার ধারণা ছিল যে, প্রথম তৃষ্ণা যখন মিটিবে, তখনই তাহার স্বামী তাহাকে পুরাতন পাদুকার মতই ত্যাগ করিবেন। স্বামীর মনোরাজ্যে আর তাহার অধিকার থাকিবে না, পার্থিব রাজ্যে যদিবা থাকে।

অবশ্য এতদিন ঘর করিতে করিতে স্বামীর রূপ, শিক্ষা, ভদ্রতা প্রভৃতি তাহাকে যে সুকুমারের দিকে মধ্যে মধ্যে আকৃষ্ট করে নাই তাহা নহে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সে মনকে আবার দৃঢ় করিয়াছে, নিজেকে বুঝাইয়াছে—'এখনো সময় নহে!' তবু সে ছিল আকর্ষণের সন্দেহ—কিন্তু আজ, আজ মনে হইতেছে যে, পরাজয়ই বুঝি ঘটিয়াছে!

ইন্দিরা কিছুক্ষণ বিহ্বল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার যে বয়স, সে বয়সে মেয়েরা পুরুষের কাছে নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন করিতেই চায়, সুতরাং এই পরাজয়ের সংবাদটাও মনের উপর যেন একটা প্রথম বসন্তের দখিনা হাওয়ার প্রলেপ বুলাইয়া দিল। সে ছিল ঘরের ঠিক মাঝখানে দাঁড়াইয়া, সম্মুখের দর্পণে তাহার যে ছবি প্রতিফলিত হইয়াছিল, তাহাতে লজ্জা, সুখ ও ভয়ের একটা মিলিত চিত্র ফুটিয়া উঠিয়া মুহূর্তের জন্য যেন তাহাকেই মোহগ্রস্ত করিল।

কিন্তু সে অল্পক্ষণই।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ইন্দিরা ওপাশের জানলাটার ধারে সরিয়া দাঁড়াইল। না, তাহাকে কঠিন হইতেই হইবে। এত সহজে এত শীঘ্র স্বামীর কাছে পরাজয় স্বীকার করা চলিবে না, সে পরাজয় যত সুখস্বপ্নই বহন করিয়া আনুক না কেন!

সে লজ্জা ও ভয়ের সমস্ত চিহ্ন মুখ হইতে মুছিয়া ফেলিয়া আবার সহজ-ভাবেই দ্বার খুলিয়া বাহির হইয়া আসিল।···

ততক্ষণে ডাক্তার আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। সুকুমারের জ্বর সামান্যই, ভয়ের কোন কারণ নাই—গায়ের ব্যথাও শীঘ্র আরাম হইবে, তিনি ভরসা দিয়া গেলেন। এখন শুধু একটু বিশ্রাম এবং লঘু পথ্য প্রয়োজন।

হরিপ্রিয়া সেদিন আর ছেলের শয্যাপার্শ্ব হইতে নড়িলেন না। সুকুমারের আকুল দৃষ্টি বার বার বৃথাই দ্বারপথের দিক হইতে ধাক্কা খাইয়া ফিরিয়া আসিল। ইন্দিরা বার দুই-তিন পথ্য বহন করিয়া আনিল বটে, কিন্তু সে মুহূর্ত কয়েকের জন্য। তা-ও তাহার মুখে এমনই একটা কাঠিন্যের আবরণ

যে, কাল রাত্রের স্বপ্নটা জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে একেবারে মিলাইয়া গিয়াছে, না ইন্দিরার মনে কিছু ছাপ রাখিয়া গিয়াছে—তাহা বোঝা গেল না।

সন্ধ্যার দিকে সুকুমার বিরক্ত হইয়া উঠিল। প্রবোধবাবু ছেলের মনোভাব বুঝিয়া গৃহিণীকে কহিলেন, তুমি এইবার একটু বিশ্রাম করতে গেলে না কেন! বৌমাকে না হয়—

হরিপ্রিয়া কঠিন কণ্ঠে শুধু কহিলেন, না।

সুকুমার কহিল, তুমি যাও না মা, আমি একলা বেশ থাকব। আমাকে একটু শান্তিতে ঘুমোতে দাও—

হরিপ্রিয়া অগত্যা জল, ঔষধ প্রভৃতি হাতের কাছে টেবিলের উপর গুছাইয়া রাখিয়া উঠিয়া গেলেন, কিন্তু তবু সুকুমারের উৎসুক চোখের প্রতীক্ষা বৃথাই হইল। ইন্দিরা আসিল না। হয়ত মা-ই নিষেধ করিয়াছেন—সুকুমার মনকে বোঝাইবার চেষ্টা করিল—কিন্তু তবু মন অবসন্ন হইয়া আসিল।…কিছুই পাইল না সে, এ দুর্লভ ধন বুঝি কোন সাধনাতেই তাহার হস্তগত হইল না!…

রাত্রেও হরিপ্রিয়া ছেলের ঘরেই রহিলেন। সুকুমারের বিরক্তিও তাঁহাকে কোমল করিতে পারিল না। তিনি ছেলের শিয়রে একটি ছোট বিছানা পাতিতে বলিয়া পাখা লইয়া সুকুমারের বিছানাতেই বসিলেন।

সুকুমার ক্ষীণকণ্ঠে একবার শুধু কহিল, তোমার আবার হার্ট ট্রাবল্‌স্ আছে, রাত জাগলে বাড়বে যে মা—

তুই কি পাগল হয়েছিস খোকা, রাত কে জাগছে? একটু পরেই আমি এইখানটায় শোব—কিছু দরকার হ'লেই ডাকিস্।

অগত্যা ছেলে চোখ বুজিল। বোধ হয় একটু তন্দ্রাও আসিয়াছিল, কিন্তু খানিকটা পরেই সচকিত হইয়া উঠিল ইন্দিরার কণ্ঠস্বরে। সে চোখ খুলিয়া দেখিল, ইন্দিরা একটা বালিশ ও মাদুর লইয়া আসিয়া ঘরের ওপাশে মেঝের উপর শয়নের উদ্যোগ করিতেছে—

হরিপ্রিয়া কহিলেন, আমি তো আছি বৌমা, তুমি আবার অনর্থক কষ্ট করতে এলে কেন?

ইন্দিরা শান্তকণ্ঠে জবাব দিল, আপনার শরীর খারাপ মা, রাত্রে যদি কিছু দরকার হয়, আপনি কাঁহাতক কি করবেন! আমি রইলুম, দরকার হ'লেই আমাকে ডেকে দেবেন—

হরিপ্রিয়া যেন একটু বিব্রত হইয়া উঠিলেন, তা হ'লে না হয় তুমিই—। অন্তত বীরুর মা'কে বললে না কেন মা, একটা বিছানা ক'রে দিয়ে যেতো—

কিচ্ছু দরকার নেই মা। এই বেশ থাকব—

সে শুইয়া পড়িল। বধূর এই দৃঢ় ইচ্ছাটিকে শাশুড়ী ইদানীং চিনিতে শুরু করিয়াছিলেন, অগত্যা তিনি চুপ করিয়া গেলেন। কিন্তু সুকুমারের চিত্ত আবার উদ্বেল হইয়া উঠিল। এ কি শুধু শাশুড়ীর প্রতি কর্তব্যবোধ, না তাহার সান্নিধ্য, সুকুমার একাগ্রচিত্তে কামনা করিতেছে জানিয়া সুকুমারের

প্রতিই অনুগ্রহ ? ইন্দিরার মুখের সেই পুরাতন ভাবলেশহীন আবরণ দেখিয়া সে কিছুই বুঝিতে পারিল না। শুধু আশা ও আশঙ্কায় সেদিনও সে অনেকক্ষণ ঘুমাইতে পারিল না।

সুকুমার তিন-চারদিনের মধ্যেই অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়া উঠিল। কিন্তু প্রথমদিনের স্বপ্ন স্বপ্নই রহিল, সে স্বপ্নের আবেশ ইন্দিরাকে স্পর্শ করিয়াছে কিনা ·কিছুই বোঝা গেল না। সেবা-যত্নের ত্রুটি নাই সত্য কথা—বরং তাহার মধ্যে, অন্তত সুকুমারের ব্যাকুল হৃদয় তাহাই মনে করে, আজকাল যেন একটু আন্তরিকতারই সুর বাজে। কিন্তু মুখের উপর তাহার তেমনি শান্ত কঠিন আবরণ। সে আবরণ ভেদ করিয়া ভিতরের কোন আগুনের সংবাদই আসিয়া পৌঁছে না।

হরিপ্রিয়া অবশ্য আর প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ান নাই, কিন্তু ইন্দিরা তাহার স্বতন্ত্র শয্যাই বহাল রাখিল। কিছুতে কোনমতেই—সুকুমারের শত আবেদনেও সে আর নিজের শয্যাতে ফিরিয়া গেল না। সুস্থ হইয়া উঠিবার পর সুকুমার একদিন বলিতে গেল, এখন তো ভাল আছি বেশ, তবে আর অত দূরে থাকছ কেন ?

তাহাতে ইন্দিরা যেন একটু পরিহাসের ভাবেই জবাব দিল, ভাল আছ, সেটা বুঝি আর সহ্য হচ্ছে না! আবার রোগ বাড়াতে চাও ?···তোমার সে সখ থাকলেও আমাদের আর ভোগবার সখ নেই—

অগত্যা সুকুমার চুপ করিয়া গেল। বরং কৃতজ্ঞচিত্তে ভাবিবার চেষ্টা করিল যে, তাহার পীড়ায় ইন্দিরা সত্যই চিন্তিত হইয়াছিল।···

দিনসাতেক পরে সুকুমার যখন আবার কলিকাতায় যাওয়ার কথাটা পাড়িতে গেল তখন প্রবোধবাবু একেবারে বাঁকিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, না। এখন তো নয়ই, আর যাবারই দরকার আছে কিনা তাই ভেবে দেখছি।

সুকুমার মাথা নত করিয়া কহিল, সবটা পড়া রইল যখন, একটুর জন্য পরীক্ষাটা দেব না ?

দরকার কি ? তুমি তো আর ওকালতি করতে যাচ্ছ না! জমিদারী চালানোর জন্য যেটুকু আইন জানা প্রয়োজন ছিল, তা তো হয়েই গেছে—

আশ্চর্যের কথা এই যে, সুকুমার আর কোন প্রতিবাদ করিল না। তাহার সেদিনের সে অদম্য জেদের যেন আর বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট ছিল না।

সে চলিয়া যাইতেই প্রবোধবাবু সরকারকে ডাকিয়া কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন—সুকুমারের সমস্ত দেনা শোধ করিয়া বাসার জিনিসপত্র লইয়া যেন চলিয়া আসে, হোস্টেলে আর ঘর রাখিবার দরকার নাই। এবং সেদিন সন্ধ্যার সময় ইন্দিরা তাঁহার জলখাবার লইয়া ঘরে প্রবেশ করিতেই সংবাদটা তাহাকে দিলেন, মা-মণি, খোকা তো আবার কলকাতায় ফিরে যেতে চাইছিল,—

মুহূর্তের জন্য একটু উদ্বেগের ছায়া ইন্দিরার মুখে ফুটিয়া উঠিল।

মৃদু হাসিয়া প্রবোধবাবু কহিলেন, ভয় নেই মা, আমি মানা করেছি।

শুধু তাই নয়, সরকারকে আজই পাঠিয়ে দিয়েছি কলকাতাতে, ও পাপ একেবারে চুকিয়ে দিয়ে আসবে। বাসা থাকলেই আবার কোন্ দিন যেতে চাইবে। ওকে এখন দিনকতক একটু সাবধানে রাখা দরকার, বাইরেটা সারলেও শরীরের ভেতরটা সারেনি এখন...কেমন যেন অবসন্ন হয়ে থাকে, না ?

ইন্দিরা পাখাখানা হাতে করিয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে জবাব দিল, দিনকতক একটু বাইরে গেলেই কিন্তু ভাল হ'তো হয়তো—

প্রবোধবাবু সহসা উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, ঠিক, ঠিক, ও কথাটা আমার মনেই হয়নি। একটু চেঞ্জে যাওয়াই দরকার ওর। ঠিক বলেছ মা—

তখনই তিনি গৃহিণীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কহিলেন, দেখ খোকাকে দিনকতক চেঞ্জেই পাঠিয়ে দিই, কি বলো ?...আমার ও কথাটা মনেই ছিল না, মা-মণিই মনে করিয়ে দিলেন—

হরিপ্রিয়া যেন একটু বিস্মিত ভাবেই লজ্জাবনতা বধূর দিকে চাহিলেন। তাহার পর কহিলেন, বেশ তো। কোথায় পাঠাতে চাও ?

কেন, মধুপুর ! বাড়ীটা তো পড়েই আছে—ঐখানেই যাক্ না।

হরিপ্রিয়া কহিলেন, সামনে গরম, সহ্য করতে পারবে ?

প্রবোধবাবু জবাব দিলেন, খুব খুব। গরমের এখনো ঢের দেরী। তাছাড়া সেবার আমার অসুখের সময় মনে নেই, জ্যৈষ্ঠ মাসেই ছিলুম তো ! কী আর এমন কষ্ট হ'তো—

হরিপ্রিয়া কহিলেন, তা হ'লে ঠাকুরমশাইকে বলো একটা দিন দেখে দিতে। কে কে যাবে ?

প্রবোধবাবু মাথার পিছনটা বার-দুই চুলকাইয়া কহিলেন, আমার আবার সামনে কিস্তি, এখন তো যাওয়া মুস্কিল।...অবশ্য দরকারও নেই বিশেষ—পুরোনো মালী রয়েছে, সে-ই একা-একশ'। তাছাড়া এখান থেকে একটা ঝি, একটা চাকর নিয়ে গেলে আর তোমাদের কোন অসুবিধা হবে না।

হরিপ্রিয়া কহিলেন, কিন্তু আমিই বা যাই কি ক'রে ? অন্নপূর্ণা পুজো, তারপর সার-সার ব্রত আসছে—সে অগঙ্গার দেশে কি ক'রে কী করব ? তুমিই যাও—

প্রবোধবাবু বিব্রতভাবে কহিলেন, তাই তো ! তুমিও যেতে পারবে না, মা-মণি ছেলেমানুষ, একা—তাই তো !

হরিপ্রিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, মা-মণি তোমার পাকা গিন্নী।...তবে ওরাই যাক্। কটা দিনই বা—

প্রবোধবাবু উদ্বিগ্ন ভাবে আর একটা কি বলিতে গেলেন, হরিপ্রিয়া জোর করিয়া বলিলেন, সেজন্যে তুমি কিছু ভেবো না। ওরা দু'জনেই যাক্—

এই ব্যাপারটা এতই আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিত যে, ইন্দিরা প্রথমটা স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল, কোন কথাই কহিতে পারে নাই, কিন্তু সে মূঢ় ভাবটা কাটিবার সঙ্গে সঙ্গেই সে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। এ কী হইল, এ কেমন করিয়া হইবে! যেমন করিয়াই হউক, ইহা বন্ধ করিতে হইবে যে! সুকুমারেরই কল্যাণ-কামনায়, কতকটা নিজের অজ্ঞাতসারেই, তাহাকে একটু বাহিরে পাঠাইবার কথা বলিয়াছিল, তখন স্বপ্নেও ভাবে নাই যে এই জাঁতিকলে সে নিজেই ধরা পড়িবে! সে যে মনে মনে একটু দুর্বল হইয়াই পড়িয়াছে, একথা আর নিজের কাছে অন্তত স্বীকার না করিয়া উপায় ছিল না। যেটুকু সন্দেহ ছিল এতদিন, আজ স্বামীর স্বাস্থ্যের জন্য তাহার এই উদ্বেগেই দূর হইয়া গেল। এক্ষেত্রে একা দীর্ঘদিন বিদেশে শুধু স্বামীর সহিত ঘর করা ভীষণ বিপজ্জনক যে!

অবশ্য ইহাতে এমন যে কী ক্ষতি হইবে তাহা ইন্দিরার পক্ষে সেদিন কাহাকেও বোঝানো কঠিন হইয়াছিল, কিন্তু ব্যাপারটা দাঁড়াইয়াছিল তাহার কাছে কতকটা জেদের মত, এখন কোনমতে কোন কারণেই সুকুমারের কাছে ধরা দেওয়া যেন তাহার পক্ষে বিষম লজ্জার কথা। একপ্রকারের নেশাতে তাহাকে পাইয়া বসিয়াছিল যেন, আঘাত ফিরিয়া আসিয়া নিজের বুকে বাজা সত্ত্বেও সে-আঘাত করার নেশা সে তাই ছাড়িতে পারিতেছিল না।...

সে সন্ধ্যার সময় হরিপ্রিয়ার কাছে বসিয়া তাঁহার পায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল, মা, আমি একা যেতে পারবো না—

একা কেন যাবে মা, মোক্ষদা যাবে, সুন্দর যাবে, সেখানে মালী আছে। ডাক্তার-বদ্যিরও অভাব নেই সেখানে, ভয় কি!

ইন্দিরা অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, আপনি সঙ্গে না থাকলে আমার ভরসা হয় না।

দূর পাগলী! হরিপ্রিয়া হাসিয়া কহিলেন, এতদিন দায়িত্ব আমার ছিল, আমি বয়েছি। এখন এ ভার তোমার যে মা, এখন আমার চেয়ে মাথাব্যথা তোমার ঢের বেশী।...কিছু ভয় নেই, খোকা আমার এমন কিছু অসহায় হয়ে পড়েনি তো। এমনি একটু সময়ে ভাত-জলটা যাতে পায়, তাই শুধু লক্ষ্য করা। এ আর পারবে না? খুব পারবে।

ইন্দিরার মাথা আরও নত হইয়া আসিল, সে কহিল, বড্ড ভয় করে মা। আমি তো কখনও বাইরে কোথাও যাইনি। একা, কী করব তাই ভাবি—

বিদেশ হ'লেও সেও তোমারই বাড়ি যে মা! ভয় কি?...আমি কি আর চিরকাল থাকব? তোমার সংসার, তুমি বুঝে পড়ে নাও আস্তে আস্তে।

ইন্দিরা ইহার আর কোন জবাব খুঁজিয়া পাইল না। চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া থাকিয়া একসময়ে উঠিয়া গেল।

'সেজ'-এর প্রায়ান্ধকার আলোতে হরিপ্রিয়ার মুখ দেখা গেল না তাই, নহিলে ইন্দিরা লক্ষ্য করিত, সে মুখে অর্থপূর্ণ একটা হাসি। ছেলের দুঃখ

দূর করার উপায় এতদিনে তিনি খুঁজিয়া পাইয়াছেন।...

সুকুমার কিন্তু কথাটা শুনিয়া প্রথমটা যেন বিশ্বাসই করিতে পারিল না। সে আর ইন্দিরা শুধু থাকিবে! নিভৃতে, নির্জনে—তাহাদের সেই বিস্তৃত গোলাপবাগানের মধ্যে? স্বপ্ন বটে, কিন্তু এ স্বপ্ন আনন্দের সহিত অনেকখানি বেদনাও বহন করিয়া আনিল। এখানে যে দুঃখ তাহাকে মর্মান্তিক পীড়া দিতেছে, সেখানে কি তাহা আরও অসহ হইয়া উঠিবে না?...

সে একবার শুষ্ক স্বরে প্রবোধবাবুকে বুঝাইবার চেষ্টা করিল, দরকার কি ছিল বাবা, আমি এখানেই বেশ সেরে উঠতুম! মিছিমিছি হাঙ্গামা—

প্রবোধবাবু হাসিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন, না রে পাগলা, মিছিমিছি নয়। আমার মা-মণি কোন কথা না ভেবে বলেন না। তিনি যখন বলেছেন যে তোর বাইরে যাওয়া দরকার, তখন আর কোন কথাই নেই। তাছাড়া আমিও ভেবে দেখলুম যে, মাসখানেক ওখানে কাটিয়ে আসতে পারলে আর কোন দুশ্চিন্তা থাকে না। 'শক্'-টা তো কম গেল না।

ইন্দিরা বলিয়াছে বাহিরে যাওয়ার কথা! তাহা হইলে এ ব্যবস্থা তার? তবে... তবে কি এই একা যাওয়ার প্রস্তাবও ইন্দিরারই?

বহুদিনের বন্ধ ঘরের ভিতর দিয়া যেন এক ঝলক দখিনা বাতাস বহিয়া গেল। সে যেমন স্নিগ্ধ, তেমনি নির্মল। অত্যধিক সুখের আশাতেই যেন তাহার মাথার স্নায়ুগুলি দপ্‌দপ্‌ করিয়া উঠিল। সে ক্লান্তভাবে নিজের শয়নগৃহের সামনের বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে শুইয়া পড়িল।

অনেকক্ষণ পরে, রাত্রি তখন গভীর হইয়া আসিয়াছে, ইন্দিরা আসিয়া পিছনে দাঁড়াইল। যতদূর সম্ভব নিস্পৃহ কণ্ঠে, যেন অন্যদিকের থামকে উদ্দেশ করিয়াই কহিল, তোমার কি কি নিতে হবে, বললে ভাল হ'তো। ঠাকুরমশাই পাঁজি দেখেছেন, কাল ছাড়া নাকি সাতদিন আর যাত্রা নেই। মা বলছেন কালকেই—

ইন্দিরার কণ্ঠে যতই নিরাসক্তি থাক, এত তাড়াতাড়ি যাওয়ার প্রস্তাবেও সুকুমার তাহারই কিছু কৌশল কল্পনা করিল। ফলে তাহার বুকে বহুদিনের জমাটবাঁধা প্রেম গলিয়া যেন উদ্বেল হইয়া উঠিল। সে গাঢ়কণ্ঠে কহিল, আমার যে কী চাই তা তো আমি ভুলেই গিয়েছি ইন্দু, আমার সব কিছু ভাল-মন্দ, চাওয়া-পাওয়া, সবই তো নিঃশেষে তোমাকে সঁপে দিয়েছি। তুমি যা ভাল বুঝবে তাই নেবে—

ইন্দিরা মনকে যতটা সম্ভব উদাসীন ও কঠিন করিয়াই আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল কিন্তু অকস্মাৎ সুকুমারের এই করুণ কণ্ঠ তাহার মনকেও প্রবলভাবে একটা নাড়া দিয়া গেল, তাহার গলার কাছে যেন কী একটা ঠেলিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

সে মুহূর্ত-দুই সহজভাবে কথা কহিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া দ্রুতবেগে সেখান হইতে চলিয়া গেল। সুকুমার তাহার অপসরণ প্রথমটা লক্ষ্য করে

নাই, নিজের চিত্তের মাধুর্য-রসে নিজেই বিভোর হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর আরও কি একটা বলিতে গিয়া যখন লক্ষ্য করিল, তখনও এই অপসৃতিকে লজ্জা বলিয়াই মনে করিয়া অধিকতর স্নেহার্দ্র হইয়া উঠিল। ··

ইন্দিরা সেদিন অনেক রাত্রি পর্যন্ত ঘুমাইতে পারিল না। স্বামীর কাছে সে যে ক্রমেই দুর্বল হইয়া পড়িতেছে তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু এত সহজে সে কিছুতেই পরাজয় স্বীকার করিবে না। কিছুতেই না। এত কাণ্ডের পর এমনভাবে ধরা দিলে আর কোন দিনই স্বামীর কাছে নিজেকে উঁচু করিয়া রাখিতে পারিবে না।

না না, সে বড় লজ্জার কথা। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল যে মধুপুরে গিয়া নিজেকে সে স্বামীর কাছ হইতে প্রাণপণে দূরে রাখিবে। নহিলে আর রক্ষা নাই। যতদিন নিজের মন সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ছিল, যতদিন সুকুমার ছিল পরস্যাপি পর, ততদিন সে স্বাভাবিক ভাবেই তাহার পরিচর্যা করিয়া গেছে —কিন্তু এখন আর তাহা চলিবে না। দৈহিক ব্যবধানকে বড় করিয়া তুলিতেই হইবে।

১১

গুরুজনদের আশীর্বাদ মাথায় লইয়া পরদিন সুকুমার বেশ প্রফুল্ল মনেই যাত্রা করিল। তাহাদের জন্য সেকেণ্ড ক্লাস টিকিট করা হইয়াছিল, দাসী চাকর ছিল অন্য কামরায়। একটার প্যাসেঞ্জার ট্রেন মন্থরগতিতে যাইবে, পৌঁছিবে প্রায় সন্ধ্যার সময়, যদিও 'ফাস্ট প্যাসেঞ্জার' নাম। ইহার আগেই দ্রুতগামী এক্সপ্রেস ছিল কিন্তু ভীড়ের অছিলায় সুকুমার তাহা কাটাইয়া দিয়াছিল। ইন্দিরার সহিত একা ট্রেনযাত্রার অপূর্ব অভিজ্ঞতাটা সে দীর্ঘকাল ধরিয়া অনুভব করিতে চায়।

তাহারা যখন উঠিল তখন গাড়ি একেবারে খালি। চাকর বিছানা পাতিয়া বসিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া গিয়াছিল, দু'জনে পাশাপাশিই বসিল। কিন্তু চাকর নামিয়া যাইতেই ইন্দিরা সুকুমারের দিকে একেবারে পিছন ফিরিয়া জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল।

সুকুমার ইহাতে ঈষৎ ব্যথিত হইল সত্য, কিন্তু তাহার এই কয়দিনের অভিজ্ঞতাতেই সে বুঝিতে পারিয়াছিল যে জোর করিয়া, টানাটানি করিয়া কিছুই মিলিবার সম্ভাবনা নাই। সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, মনকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল যে ইহা লজ্জা, ধীরে ধীরে কাটিয়া যাইবার অবসর দিতে হইবে।

ইন্দিরা পাশ ফিরিয়া বসিল বটে কিন্তু নির্জন গাড়ির মধ্যে এই সান্নিধ্য তাহারও বক্ষ-স্পন্দন বাড়াইয়া দিয়াছিল। আশ্চর্য, কিছুদিন আগে ইহার অপেক্ষাও নির্জন সান্নিধ্য তাহাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে পারে নাই। কিন্তু আজ তাহার বুক যেন কোন এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় ঢিপ-ঢিপ করিতেছিল। তাহার জীবনে এই প্রথম বিদেশযাত্রা, বাহিরের ক্রমাগত এবং

ক্রমবিলীয়মান ঘাট-মাঠ-প্রান্তর-পল্লী তাহার দৃষ্টির সম্মুখে এক অভূতপূর্ব বিস্ময়ের রূপ ধরিয়া দেখা দিয়াছে। সেই অনাস্বাদিত অনুভূতিতে তাহার আনন্দে মাতিয়া উঠিবার কথা, কিন্তু সে সেদিকে ভাল করিয়া মন দিতেও পারিল না, পিছনের একটি দুর্বল, সহনশীল, অপরাধী মানুষের উপস্থিতিই তাহার সমগ্র মনকে সেদিন যেন ভীত, জড় করিয়া তুলিয়াছিল।...

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর সুকুমার একটি সহজ প্রশ্নে সেই অসহ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল, তুমি এর আগে আর এদিকে কখনো আসোনি, না ?

ইন্দিরা যেন চমকিয়া উঠিল। তাহার পর মাথা নাড়িয়া কহিল, না।

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া সুকুমার আবার প্রশ্ন করিল, এদিকে তোমার কোন আত্মীয়ের বাড়ী নেই ? কখনও আসবার দরকার হয়নি ?

এবার ইন্দিরা কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করিয়া লইয়া জবাব দিল, তেমন কোন আত্মীয়ের কথা কখনও শুনিনি। তাছাড়া আত্মীয়স্বজনের খোঁজ নেবার মত অবস্থা তো বাবার ছিল না।

সুকুমার লজ্জিত হইয়া চুপ করিয়া গেল।

খানিক পরে ইন্দিরাই কথা কহিল, অনেকক্ষণ একভাবে বসে রয়েছ, তুমি না হয় শোও, আমি ওধারে গিয়ে বসছি—

সুকুমার প্রবলভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, না না, আমি এখন শোবো না। তুমি এখানেই বসো। যদিও তুমি বিরূপ, তবু কাছে তো আছো।

ইতিমধ্যে শ্রীরামপুর স্টেশন আসিয়া পড়িল। একটি ভদ্রলোক তাঁহার স্ত্রী ও একটি শিশুকন্যা লইয়া তাহাদের গাড়িতেই উঠিলেন। বছরখানেকের মেয়ে, ফুটফুটে, মোটাসোটা, দেখিলেই আদর করিতে ইচ্ছা করে। মেয়েটিও, কে জানে কেন, ইন্দিরার আশ্চর্য রূপ দেখিয়াই হউক বা অন্য যে কারণেই হউক—গাড়িতে উঠিয়াই ইন্দিরার দিকে দুই হাত বাড়াইয়া দিল। ইন্দিরা প্রথমটা একটু বিস্মিত হইয়া মুহূর্তখানেক বোধহয় ইতস্তত করিল, তাহার পর মেয়েটিকে সস্নেহে এবং সযত্নে কোলে টানিয়া লইল। মেয়েটির বাবা প্রসন্ন ও অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে সুকুমারের দিকে চাহিলেন, তাঁহার স্ত্রীও ঈষৎ লজ্জিত ভাবে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

মেয়েটি অত্যন্ত চঞ্চল। প্রথমটা সে ইন্দিরার আদর বেশ প্রশান্ত ভাবেই সহ্য করিয়াছিল কিন্তু একটু পরেই এমন অস্থির হইয়া উঠিল যে, ইন্দিরার ছোট ছেলেমেয়ে সম্বন্ধে স্বাভাবিক প্রীতি ও অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও, সে বিব্রত হইয়া পড়িল। মেয়ের মা ব্যাপার দেখিয়া হাত বাড়াইয়া কহিলেন, দিন ভাই আমার কাছে, বড্ড জ্বালাতন করছে আপনাকে।

ইন্দিরা সবেগে খুকীকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া কহিল, থাক আমার কাছেই, এ আমার অভ্যাস আছে—

ভদ্রমহিলা যেন ঈষৎ বিস্মিত ভাবে দু'জনের দিকে চাহিয়া কহিলেন, ভাইবোন আছে বুঝি অনেক ?

মেয়েটা ততক্ষণ ইন্দিরার রেশমের মত নরম কালো চুল মুঠা করিয়া

ধরিয়াছে ; আস্তে আস্তে তাহার মুঠি খুলিতে খুলিতে ইন্দিরা জবাব দিল, হ্যাঁ—সাতটি।

ইহার পর আলাপ জমিয়া উঠিল। স্বামীর সহিত স্বামীর সামান্য দু-একটি বাক্যবিনিময় হইল কিন্তু স্ত্রী দুইজন নিম্নস্বরে দ্রুত গল্প জমাইয়া তুলিলেন। ভদ্রলোক যাইবেন বর্ধমান, সেখানেই তিনি কাজ করেন, শ্বশুর-বাড়ি হইতে স্ত্রীকে লইতে আসিয়াছিলেন। ভদ্রলোকের বয়স একটু বেশী হইলেও ইনিই প্রথম পক্ষ এবং এইটিই প্রথম সন্তান।

বৌটি চুপি চুপি কহিলেন, বাস্তবিক আপনাদের কী চমৎকার জোড় মিলেছে, দেখলে যেন চোখ জুড়িয়ে যায়। সাধারণত হয় স্বামী সুন্দর তো স্ত্রী কুচ্ছিত, আর স্ত্রী সুন্দর তো স্বামী একেবারে লোহার কার্তিক।...উনি ওধারের খালি গাড়ীতে উঠছিলেন, আমিই ভাই আপনাকে দেখে এই গাড়িতে উঠতে বললাম। তবু দু'দণ্ড তো চোখে দেখতে পাবো—

ইন্দিরার মুখে যেন কে সিন্দুর ঢালিয়া দিল। সে মাথা নত করিয়া খুকীকে আদর করিতে লাগিল, কথা কহিল না।

খুকীর বাবাও সুকুমারকে চুপি চুপি বলিতেছিলেন, বাস্তবিক আপনাদের যেমন মিলেছে এমন কদাচিৎ দেখা যায়। আপনারা দু'জনেই পূর্বজন্মে দু'জনের জন্যে তপস্যা করেছিলেন।

সুকুমারের মুখ আনন্দ-বেদনায় রক্তবর্ণ ধারণা করিল, সে আড়ে চাহিয়া দেখিল ইন্দিরার মাথা আরও নত হইয়া পড়িয়াছে—

ইতিমধ্যে ব্যাণ্ডেল স্টেশন আসিয়া পড়িল। খুকী ইন্দিরার হারের মুক্তাখচিত থামিখানা লইয়া খেলা করিতেছিল, তখন সেটা ফেলিয়া প্ল্যাটফর্মের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। খাবারওয়ালা, পাখাওয়ালা, চা-ওয়ালা যে যায় তাহাকেই হাতছানি দিয়া ডাকে এবং নামিয়া যাইতে চায়। ইন্দিরা প্রাণপণে তাহাকে সামলাইতে লাগিল, বিব্রত হওয়া সত্ত্বেও কাহারও কোলে দিল না।

কিন্তু অবস্থা চরমে পৌঁছিল পুতুলওয়ালা দেখা দিতে। মেয়েটি আর কোন কথাই শুনিতে চাহে না, দুর্বার হইয়া ওঠে। খেলনাওয়ালা ইন্দিরার বেশভূষা ও মেয়েটির রকম দেখিয়া সুবিধাজনক খরিদ্দার বুঝিয়া একেবারে জানলার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল এবং একটা ঝুমঝুমি তুলিয়া প্রাণপণে বাজাইতে লাগিল।

ইন্দিরা বিষম অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। তাহার টাকার দরকার হইতে পারে এ খেয়াল তাহার ছিলই না কখনো। বাপেরবাড়িতে কিছুই পাইবার সম্ভাবনা ছিল না, এখানে আসিয়া না চাহিতেই সব জিনিস পায়—সুতরাং কাছে তাহার টাকা-পয়সা কিছুই ছিল না। শ্বশুর অবশ্য তাহাকে এই তিনমাসে হাতখরচ বলিয়া কয়েকটাকা করিয়া দিয়াছেন কিন্তু সে তেমনি আলমারীতেই পড়িয়া আছে, কোনদিনই তাহার দরকার পড়ে নাই। অথচ এখন এমন অবস্থা যে অন্তত একটা কিছু না কিনিলে মান থাকে না—।

সে মুহূর্ত দুই ইতস্তত করিয়া লজ্জারক্তিম মুখ তুলিয়া অবশেষে বিপন্ননেত্রে সুকুমারের দিকেই চাহিল। সুকুমার নিমেষে অবস্থাটা কল্পনা

করিয়া লইয়া একেবারে সরিয়া তাহার কাছে আসিয়া বসিল; কহিল, নাও না কী নেবে নাও—এই খেলনাওয়ালা, ঐ বাঁশিটা দেখি—

তাহার পর সে প্রায় তাহার ডালা উজাড় করিয়া খুকীর জন্য খেলনা কিনিল। পুতুল, বাঁশি, ঝুমঝুমি, বেলুন—আরও কত তাহার ইয়ত্তা নাই। খুকীর বাবা ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, মা অনুযোগ করিতে লাগিলেন—'এ অন্যায়' 'অত্যন্ত অশোভন' ইত্যাদি বলিয়া, কিন্তু সুকুমার কোন কথাই শুনিল না। ইন্দিরা এই প্রথম তাহার কাছে কিছু চাহিয়াছে, হউক্ সে পরের জন্য, কিন্তু তবু তো চাহিয়াছে! সে আনন্দে দিশেহারা হইয়া খেলনার পর খেলনা বাছিয়া লইতে লাগিল। আরও তিন ডালা পাইলে সে কিনিত বোধ করি!...

ব্যাণ্ডেল হইতে ট্রেন ছাড়িল। মেয়েটির বাবা ক্ষুণ্ণকণ্ঠে কহিলেন, এ কি করলেন বলুন দেখি!

সুকুমার কহিল, তাতে কি হয়েছে! কয়েকটা পুতুল কিনেছি বৈ তো নয়—

মেয়ের মা ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিলেন, এখন সারতে যাচ্ছেন যান—ফেরবার পথে কিন্তু একবার কর্তাকে নিয়ে বর্ধমানে নামতে হবে। বলুন যাবেন—আমাকে কথা দিতে হবে, নইলে ছাড়ছি না।

ইন্দিরা ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল। কে জানে কেন তাহার তখন দুই চোখ ভরিয়া জল আসিয়াছিল, সে কথা কহিল না।...

ভদ্রলোকেরা আরও বহু আপ্যায়নের পর বর্ধমানে নামিয়া গেলেন। যাইবার সময়ে মেয়েটি ইন্দিরাকে দুই বাহু দিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া ছিল, ফলে তাহার মনটা ভার হইয়াই রহিল, ঐ অপরিচিতা ক্ষুদ্র মানবিকা অকস্মাৎ যেন তাহার হৃদয়কে আলোড়িত করিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

সুকুমার মৃদু কণ্ঠে পিছন হইতে বলিল, তোমার কোলে ওকে যে কী চমৎকার দেখাচ্ছিল কি বলব! ভারী সুন্দর মানিয়েছিল কিন্তু—

ইন্দিরার মাথা আরও একটু নত হইল। কিন্তু সে লজ্জিতই হইল শুধু, রাগ করিল না।

১২

মধুপুর স্টেশনে গাড়ি পোঁছিল সন্ধ্যার কিছু পূর্বে। মালী স্টেশনে উপস্থিত ছিল, সে ঠাকুর-চাকরের সাহায্যে মালপত্রের তদারক করিতে লাগিল, সুকুমার ইন্দিরাকে লইয়া একটা ছোট খোলা গাড়িতে বাড়ির দিকে রওনা হইল।

নূতন দেশ, খেলাঘরের মত গাড়ি, সমস্তটা জড়াইয়া ইন্দিরার অদ্ভুত লাগিতেছিল। প্রথম বসন্তের ঈষৎ শীত-মেশানো মধুর হাওয়া উঁচু গাছ-গুলির উপর দিয়া সর্‌সর্ করিয়া বহিয়া যাইতেছে, চারিদিকের ফুলবাগান হইতে অসংখ্য বেল-গোলাপের গন্ধ দূরের একটা মহুয়াগাছের গন্ধের সঙ্গে

মিশিয়া কেমন যেন মোহের সৃষ্টি করে। ইন্দিরাও কোন্ এক অজ্ঞাত পুলকানুভূতিতে শিহরিয়া উঠিল।...

তখন অধিকাংশ ঘরেরই বাবুর দল হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছেন। তাঁহারা সকলেই এই সুন্দর দম্পতিটির দিকে অবাক নয়নে চাহিতেছিলেন এবং আপোষে মৃদু সমালোচনা করিতেছিলেন।

সুকুমার রকম দেখিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, তোমাকে দেখে এদের সকলকারই মাথা ঘুরে গেছে, তা দেখছ!

ইন্দিরা আরক্তমুখে একটু ঘোমটা টানিয়া দিল। কিন্তু মোটের উপর এই সব অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা তাহার ভালই লাগিতেছিল।

যাহা হউক—কালীপুর টাউনের প্রান্তে সুকুমারদের বাড়ি, সেখানে পৌঁছিতে বেশী সময় লাগিল না। মালী-বৌ আসিয়া তাড়াতাড়ি ফটক খুলিয়া দাঁড়াইল।

সুকুমার গাড়ি হইতে নামিয়া হাত ধরিয়া ইন্দিরাকে নামাইতেছেন, এমন সময় দূর হইতে এক বাঙালী সাহেব উচ্চকণ্ঠে "হ্যাল্লো, সকুমার না!" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। সুকুমার বিস্মিতভাবে ফিরিয়া দেখিল—তাহার স্কুল-জীবনের বন্ধু আনন্দ। ছেলেটি বড়লোকের ছেলে এবং বরাবরই একটু সাহেবীভাবাপন্ন, তবু সুকুমার তাহাকে পছন্দই করিত। অনেকদিন পরে একজন বন্ধুকে পাইয়া তাহারও মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

আনন্দ লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া কাছে আসিয়া একেবারে সুকুমারকে জড়াইয়া ধরিল, কহিল, মাই গুডনেস, মিসেস সুদ্ধ হাজির দেখ্ছি যে! জাস্ট ইন্‌ট্রোডিউস্ মি, ওল্ড ফেলো!

সুকুমার যথারীতি তাহাদের পরিচয় করাইয়া দিল,—আমার বন্ধু আনন্দ মুখার্জি—আমার স্ত্রী ইন্দিরা দেবী।

তাহার পর ইংরেজীতে আনন্দকে কহিল, তোমার ইংরেজীটা কমাও, উনি একবর্ণও জানেন না। বিব্রত বোধ করবেন—

আনন্দ আর এক দফা তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, সো লাকী! এই দু'বৎসর, বিলেত থেকে ফিরে এসে অবধি বিলিতি বাঙালীদের মধ্যে থেকে ডিসগাস্টেড হয়ে উঠেছি। এখানে এসেছি বলতে গেলে নির্জন বাসের জন্যে। ভালই হ'লো তোদের পেলুম। বৌদি, এ অধম দেওর আপনার জ্বালাবে কিন্তু মধ্যে মধ্যে এসে, তখন মোদ্দা রাগ করতে পারবেন না! এক-আধ দিন আপনার শ্রীহস্তের চা-ও খেয়ে যাবো! এখানে চাকরের ভরসায় আছি, বুঝতেই তো পারছেন—চায়ে অরুচি ধরে যাবার উপক্রম হ'লো—

ইন্দিরা নতমুখে অর্ধস্ফুট কণ্ঠে কহিল, এখনই আসুন না, চা ক'রে দিচ্ছি।

তাহার পর মালী-বৌয়ের অনুসরণ করিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

আনন্দ পিছন হইতে উচ্চকণ্ঠে কহিল, একেবারে অতটা প্রশ্রয় দেবেন না বৌদি, তা'হলে আর নড়ব না—

তাহার পর সুকুমারের পিঠে একটা চাপড় মারিয়া কহিল, মাই গুডনেস্—এঁকে তুই অশিক্ষিতা বলছিলি ? এ তো দিব্যি ফরওয়ার্ড—

পত্নীগর্বে সুকুমারের মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সে কহিল, অশিক্ষিতা, তাছাড়া একেবারে পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, অজ পাড়াগাঁ যাকে বলে—

আনন্দ বিস্ময়ে শিষ দিয়া উঠিল। বলিল, বলিস কি! স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি! রূপে, গুণে—যাকে বলে স্ত্রীরত্ন! পাড়াগাঁয়ের হ'লো তো কি হ'লো ? বালিগঞ্জে তো তুইও কম যাস্‌নি, আমার তো না হয় অরুচি ধরে গেছে—এমত তো সেখানেও নজরে পড়ে না—

সুকুমার কহিল, সে কথা থাক্—এখন চল্ ভেতরে—চা খেয়ে যাবি—

দুজনে গল্প করিতে করিতে ভিতরে আসিয়া বসিল। ততক্ষণে মালপত্র লইয়া ভৃত্যের দল আসিয়া পৌঁছিয়াছে। উনুন ধরানোই ছিল, ইন্দিরা চায়ের জল চড়াইয়া দিয়া বাথরুমে চলিয়া গেল।

চা প্রস্তুত করিয়া কলিকাতা হইতে আনীত বিস্কুট, সন্দেশ এবং চা একটা থালায় সাজাইয়া লইয়া ইন্দিরা যখন ফিরিয়া আসিল তখন তাহার দিকে চাহিয়া আনন্দের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। আগেকার সিল্কের শাড়ি আর নাই, সামান্য একখানা আসমানী ও সাদার শান্তিপুরে ডুরে মাত্র পরণে, অলঙ্কারেরও কোথাও বাহুল্য নাই—অথচ রূপ যেন জ্বলিতেছে, সেদিকে চাহিলে চোখ ধাঁধিয়া যায়।

মাথার কাপড় সামান্য একটু কপালের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, তাহারই মধ্য হইতে সুন্দর শুভ্র ললাটের যেটুকু আভাস পাওয়া যাইতেছে, তাহার দীপ্তি অসামান্য। তাহার সেই ঈষৎ স্বেদবিজড়িত, লজ্জারক্ত, আনত মুখের দিকে চাহিয়া আনন্দ অস্ফুটস্বরে বলিয়া উঠিল, গুডনেস্ গ্রেসাস্—আই এন্‌ভি ইউ, ওল্‌ড্ বয়!

ইন্দিরা কথাগুলার শব্দার্থ না বুঝিলেও ভাবার্থটা অনুমান করিতে পারিয়াছিল, ফলে তাহার মুখ আরও নত হইয়া গেল।

সে কোনমতে তাহাদের সামনে টেবিলের উপর চা ও খাবার সাজাইয়া দিয়া যখন চলিয়া যাইতেছে, তখন আনন্দের চমক ভাঙ্গিল, বৌদি, আপনি খাবেন না ?

অর্ধস্ফুটস্বরে ইন্দিরা জবাব দিল, আমার বিশেষ চা খাওয়ার অভ্যাস নেই, আপনারা খান—

আনন্দ ব্যস্ত হইয়া কহিল, তা আপনি একটু বসুন অন্তত, খাবেনও না, আমাদের সঙ্গে বসবেনও না, এমন ক'রে চলে কি ক'রে! বসুন—

ইন্দিরা বিপন্নমুখে একবার সুকুমারের দিকে চাহিল, দেখিল তাহার মুখে কৌতুকের হাসি—তখন অগত্যা খানিকটা দূরে একটা 'সোটি'র উপর বসিয়া পড়িল।

চায়ের বাটিতে তাড়াতাড়ি একটা চুমুক দিয়া আনন্দ কহিল, আঃ—ডিলিসাস্! আপনি তো চা খান্ না, তবে এমন সুন্দর চা করতে কেমন ক'রে

শিখলেন ?

ইন্দিরা মৃদু হাসিল, কথার জবাব দিল না।

আনন্দ তাহার দৃষ্টি ও রসনা এতদিন পরে অভাবনীয় ভাবে তৃপ্ত হওয়ার আনন্দে অনর্গল বকিয়া চলিল। সুকুমারও বন্ধুকে পাইয়া যেন বাঁচিয়া গিয়াছে, বহুদিন পরে তাহারও মনের একদিককার বন্ধদ্বার খুলিয়া গিয়াছে, সে-ও হাসিখুশীতে ভরপুর হইয়া উঠিল। আর ইন্দিরারও এই প্রগল্‌ভ প্রিয়দর্শন ছেলেটিকে মন্দ লাগিতেছিল না, সে চুপ করিয়া বসিয়া দুই বন্ধুর হাস্যপরিহাসবিজড়িত কথাবার্তা শুনিতেছিল এবং অপেক্ষা করিতেছিল চায়ের পর্ব শেষ হওয়ার।

কিন্তু সহসা তাহার সুখস্বপ্ন যেন এক রূঢ় আঘাতে ভাঙ্গিয়া গেল। তাহার কানে গেল আনন্দ বলিতেছে, আমাদের সেই সতীশকে মনে আছে তোর ? সে তো কলেজেও তোর সঙ্গে পড়েছিল। বহুদিন পরে তার সঙ্গে সেদিন হঠাৎ দেখা। আমার দিদিরা শিমুলতলায় এসে রয়েছেন কিনা পুজোর সময় থেকেই, গত রবিবার আমিও গিয়েছিলুম ওখানে তাঁদের দেখতে। ছেলেমেয়েগুলোকে নিয়ে বাজারে বেরিয়েছি—সতীশের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ও নাকি জলপাই-গুড়িতে কি এক ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর অর্গানাইজার হয়ে গিয়েছিল। শরীর খারাপ হয়ে মাস দুইয়ের ছুটি নিয়ে ওখানে এসে আছে।...বিশ্রী চেহারা হয়ে গেছে দেখলাম, তবে শরীরের চেয়ে দেখলাম মনই ওর বেশী খারাপ। সে এক মজার ব্যাপার, বুঝলি সুকুমার, ওর নাকি কোন্ এক মেয়েকে দেখে খুব পছন্দ হয়েছিল, তাকে বিয়ে করবার জন্য পাগল হয়ে ওঠে—তারপর হঠাৎ ওর সম্বন্ধে মেয়েদের কানে কি সব কথা গিয়ে পৌঁছয়, ও নাকি মদ খায়, ও চরিত্রহীন, ওর কুলেও কি গোলমাল আছে—এই সব। মেয়ের বাপ ওকে তখন, যাকে বলে ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট, তাই দেখাতে বলেন অর্থাৎ ও যে সৎপাত্র, তারই একটা প্রমাণ চান। তার ফলে ওর সঙ্গে একটু বচসা হয়ে বিয়ে ভেঙ্গে যায়। ও মনের দুঃখে চাকরি নিয়ে জলপাইগুড়ি চলে গেল।...

একটু থামিয়া একটা পাইপ ধরাইতে ধরাইতে আনন্দ আবার বলিল, কিন্তু মেয়েটি ওকে পেয়ে বসেছিল, তাই মাসখানেক পরে মাথা ঠাণ্ডা হয়ে আবার ফিরে এল বেচারী, কিন্তু সে মেয়ে ততদিনে আর কোন্ ভাগ্যবানের গলায় মালা দিয়ে তারই ঘর করতে চলে গেছে—তার আর পাত্তা মিলল না। সেই দুঃখ বেচারী আজও ভুলতে পারে নি—বুঝলি না, হাঃ, হাঃ, হাঃ—

নিজের বলার ঝোঁকে আনন্দ এতক্ষণ অনর্গল বকিয়া গিয়াছিল, সহসা এখন মুখ তুলিয়া চাহিয়া বিস্মিত হইয়া গেল। দেখিল সুকুমারের মুখ একেবারে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং ইন্দিরাও আরক্ত মুখে উঠিয়া ভিতরে চলিয়া যাইতেছে।

সে ঈষৎ ভীতকণ্ঠে কহিল, কি হ'লো রে তোর, অসুখ-বিসুখ করছে

নাকি ?

সুকুমার কোনমতে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না।

কিন্তু বৌদিই-বা অমন ক'রে বেরিয়ে গেলেন কেন ? আমার এই গল্পে কিছু গোলমাল হ'লো নাকি ? উনি চিনতেন নাকি সতীশকে ?

সুকুমার ক্ষীণকণ্ঠে কহিল, ওঁর সঙ্গেই সতীশের বিয়ের কথা হয়েছিল—

মাই গড্ ! এ যে একেবারে নাটক !…তারপর ওঁর সঙ্গে পূর্বরাগ, অনুরাগ কিছু—?

না, না ! উনি দেখেনইনি তাকে ভাল ক'রে।

তা হ'লে উনি অমন ক'রে উঠে গেলেন কেন ? এর ভেতরে তোর কোন হাত ছিল নাকি ?

ঈষৎ বিরক্তকণ্ঠে সুকুমার কহিল, এর ভেতরে হাত থাকবার কি আছে ! ও বিয়ে করলে না, গোলমাল হ'লো, ওরা তো অন্য পাত্রে দিতই, না হয় আমি করেছি।…

সো সরি—কিছু মনে করিস নি !…প্রসঙ্গটা না উঠলেই ভাল হ'তো। বৌদিও বোধ হয় বিরক্ত হলেন—ছি, ছি !

সুকুমার কহিল, না, না। সে এমন কিছু নয়। তবে ও সম্বন্ধে আর ঘাঁটাঘাঁটি না করাই ভালো—

এই সময়ে পর্দা সরাইয়া আবার ইন্দিরা দেখা দিল। সে ইতিমধ্যেই নিজেকে সামলাইয়া লইয়াছিল। তাহার মুখ একেবারে ভাবলেশহীন, সে মুখ দেখিয়া কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। সে নতমুখে অন্যদিকে চাহিয়া কহিল, আপনি তা হ'লে রাত্রে এখানেই খেয়ে যাবেন। আপনার বাসাটা আমাদের মালীকে বুঝিয়ে দিলে ও আপনার চাকরকে খবর দিয়ে আসতে পারে—

আনন্দ ঈষৎ যেন বিব্রত হইয়া উঠিল। কহিল, চাকরকে খবর না দিলেও চলবে, কিন্তু আজই কেন বৌদি, সবে আপনারা এলেন, নতুন ঘর-কন্না একটু গুছিয়ে নিলে ভাল হ'তো না ? কাল-পরশু একদিন যখন হোক—

ইন্দিরা মৃদুকণ্ঠে কহিল, আমাদের কোন অসুবিধা হবে না।

তাহার পর আবার ভিতরে চলিয়া গেল।

আনন্দ একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, যাক বাবা, দেবী রুষ্টা হননি বোঝা গেল। কি বলিস্ ?

কিন্তু সুকুমার জবাব দিল না। ইন্দিরার মুখের এই চেহারাটা সে চিনিত।

ইহার পর রাত্রের আহারাদির পর্ব পর্যন্ত বেশ সহজভাবেই কাটিল। কিন্তু ইন্দিরার এই কয়েকদিনের ব্যবহারে এবং ট্রেনের ব্যাপারে সুকুমারের মনে যেটুকু আশার সঞ্চার হইয়াছিল, সেটুকুর যেন আর চিহ্ন পর্যন্ত রহিল না। অপরাহ্নের সেই কুৎসিত ও বেদনাময় কথাগুলির পর, কে জানে কেন, কেবলই তাহার মনে হইতে লাগিল যে ইহার পর তাহার ও ইন্দিরার মধ্যেকার

ব্যবধান আরও বাড়িয়া যাইবে। তাহার যে আচরণটা ইন্দিরা একটু একটু করিয়া ভুলিতে শুরু করিয়াছিল, তাহারই স্মৃতি আজ আবার নূতন করিয়া ব্যবধান রচনা করিয়া দিয়া গেল।

হইলও তাহাই—

আনন্দ বিদায় হইলে ক্লান্ত সুকুমার শয়নঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, যে দুইটা তক্তাপোষ ঘরের মধ্যে জোড়া দিয়া ইতিপূর্বে বিছানা করা হইত তাহাদেরই দুই পাশে সরাইয়া দুইটি ভিন্ন শয্যা প্রস্তুত করা হইয়াছে।

সে মুহূর্ত-দুই স্তম্ভিতভাবে সেখানেই দাঁড়াইয়া রহিল। আশা ছিলই না, কিন্তু আশার অতীত আশাও মানুষ কখনো কখনো করে—আর বোধ হয় সে আশা একেবারে কখনই তাহার মন হইতে মুছিয়া যায় না। সুকুমারও তাহার মনের প্রচ্ছন্ন অন্তঃপুরে কোথায় একটা আশা পোষণ করিয়াছিল যে, প্রকাশ্য বিদ্রোহ আর ইন্দিরা করিবে না। কিন্তু—

ইন্দিরা ওপাশের একটা জানালার রেলিং ধরিয়া স্তব্ধভাবে বাহিরের বাগানের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বোধ হয় সে সুকুমারের নিকট হইতে কিছু অনুযোগই আশা করিতেছিল, কিন্তু সুকুমার কোন কথাই কহিল না, দীর্ঘনিঃশ্বাসটাও চাপিয়া বিছানায় আসিয়া বসিল। এই কয়দিনে সে বুঝিয়াছিল যে টানাটানিতে কিছুই পাওয়া যায় না, নিজের মনের ক্ষতটাই শুধু বাড়ে। সে বলিলে হয়ত ইন্দিরা এখনই শয্যা একত্র করিবে। হুকুম করিলে পাশেও আসিয়া শুইবে—কিন্তু তাহাতে লাভ কি?

না, সুকুমার জোর করিয়া আর কিছুই চাহিবে না।...

একবার মনে হইল ইন্দিরার পিছনে গিয়া দাঁড়ায়, মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করে, একটা সামান্য অপরাধও আমার মাপ করতে পারলে না ইন্দু? ভেবে দেখো সে অপরাধ তো তোমার জন্যেই করেছি, তোমাকে পাবার জন্যেই—তবুও মাপ করতে পারলে না?

কিন্তু কথাগুলা নিজের কাছেই কেমন যেন নাটকের মত ঠেকিল, সে কিছুই বলিতে পারিল না, নীরবে শুইয়া পড়িল।

ইন্দিরা কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়া এমনিই কোন অনুযোগের আশা করিতেছিল হয়তো, বা তাহার জন্য নিজেকে প্রস্তুতও করিতেছিল, কিন্তু সুকুমারের কাছ হইতে প্রতিবাদ বা অনুযোগের একটি শব্দও না আসাতে সে একটু বিস্মিতই হইল।...আরও খানিকটা তেমনি ভাবে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবার পর সেও আলোটা নিভাইয়া দিয়া শুইয়া পড়িল।

সেটা শুক্লপক্ষ। সামনেই অবারিত মাঠ—সেই তৃণলতাহীন, কঠিন কঙ্করময় বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডের উপর চাঁদের আলো পড়িয়া চক্‌চক্‌ করিতেছে, তাহারই প্রতিফলিত আলো খানিকটা ঘরের মধ্যেও আসিয়া পড়িয়াছে। সুকুমারদের বহুদূরবিস্তৃত বাগানে অসংখ্য গোলাপ-বেল-জুঁই-চামেলি-হেনা ফুটিয়া আছে, তাহাদের মিশ্রিত উগ্র সৌরভে যেন নেশা লাগে। সে গন্ধ অবিরাম প্রবাহিত দক্ষিণা বাতাসের সহিত ভাসিয়া আসিয়া বার বার দুটি

নরনারীকে উতলা করিয়া তুলিতে লাগিল। উপভোগের সমস্ত উপকরণই প্রস্তুত, অথচ সেই মধুর রজনীতে এই নবীন বয়স্ক স্বামী স্ত্রী দুইজন দুইটি পৃথক শয্যায় নীরবে ঘুমের ভান করিয়া পড়িয়া রহিল। সেরাত্রে তাহাদের ঘুমানো সম্ভব নয়, কেহ ঘুমাইতে পারিলও না।

চৈত্র মাসের শুক্লা ত্রয়োদশীর সেই মধুযামিনী সুকুমার ও ইন্দিরার জীবনে ব্যর্থ হইয়া গেল।

১২

আনন্দ পরের দিন সকালবেলাই আসিয়া হাজির হইল।

'বৌদি কোথায় ?' বলিয়া একটা হাঁক দিয়া বাহিরের টেবিলটার উপর টুপিটা ফেলিয়া বারান্দার ইজিচেয়ারেই লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িল।

সারারাত্রি জাগিয়া সুকুমার ভোরের দিকটায় একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়াছিল, তাহার কণ্ঠস্বর কানে যাইতে তাড়াতাড়ি মুখে-চোখে জল দিয়া বাহির হইয়া আসিল। কিন্তু তাহার সেই আরক্ত চক্ষু এবং শুষ্ক মুখের দিকে চাহিয়া আনন্দ ভুল বুঝিল। ঈর্ষাতুর কণ্ঠে কহিল, ইস্—করেছিস কি! দেহটার দিকেও একটু নজর রাখিস্!

ম্লান হাসিয়া সুকুমার কহিল, তাই বটে। কিন্তু তুই শুনলে অবাক হয়ে যাবি যে, আমরা পৃথক শয্যাতেই কাল রাত কাটিয়েছি। ঘুমোতে পারিনি অন্য কারণে—শরীরটা ভাল ছিল না।

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া আনন্দ প্রশ্ন করিল, পৃথক শয্যা কেন? কাল আমারই অবিমৃষ্যকারিতার ফল নাকি?

প্রসঙ্গটাই বেদনাদায়ক, সুকুমার তাড়াতাড়ি কথাটা চাপা দিয়া কহিল, না, না—এমনি, স্বাস্থ্যের অনুরোধে।...তারপর চা খেয়ে এসেছিস, না খাবি এখানে?

দেখ্, চা এক কাপ খেয়েই এসেছি। কিন্তু তাই ব'লে বৌদির হাতের চা একটু খাবো না, এ যদি মনে ক'রে থাকিস তো বিষম ভুল করবি।

সুকুমার মৃদু হাসিল তাহার পর ভৃত্যকে ডাকিয়া কহিল, তোর বৌদিকে বল্‌গে যা, আনন্দবাবু এসেছে, দু'পেয়ালা চায়ের ব্যবস্থা করতে—

অল্পক্ষণ পরে খুচরা দুই-একটা কথা কহিতে কহিতেই ইন্দিরা চা লইয়া দেখা দিল। তাহারও চক্ষু আরক্ত, চোখের কোলে কালি—দেখিয়া সুকুমার একটু বিস্মিত হইল, কিন্তু ঠিক কারণটা অনুমান করিতে না পারিয়া স্বস্তি পাইল না। বরং মনে মনে যেন একটু অকারণ ঈর্ষাই বোধ করিতে লাগিল।

আনন্দ বেচারা এত কথা কিছুই জানে না—সে ততক্ষণে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। কহিতেছে, বৌদি, এখানে এসে ঘরে বসে থাকলে তো চলবে না, বেড়াতে হবে—তবে স্বাস্থ্য! সকালে বিকেলে বেড়াতে হবে। চলুন দেখি, বেরিয়ে পড়া যাক্!

সুকুমার কহিল, এখন কোথায় যাবি রে ? বেলা আটটা বাজে যে—

তাচ্ছিল্যের সুরে আনন্দ জবাব দিল, এখানে আবার আটটা কি, এখানে কি আর অফিস আছে ? তাছাড়া আজ হাটবার, চল্, হাটেই যাওয়া যাক্ ! বৌদি, আপনি তৈরী হয়ে নিন—

ইন্দিরা নতমুখে জবাব দিল, আপনারা ঘুরে আসুন, আমি ততক্ষণে বরং রান্নার যোগাড় দেখি—

আনন্দ সজোরে জবাব দিল, এ্যাব্সার্ড এরি মধ্যে রান্নার যোগাড় কি ? তা ছাড়া হাট না এলে যোগাড় দেবেনই বা কিসের ? চলুন চলুন, তৈরী হয়ে নিন !

কিন্তু ইন্দিরা তবু চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াই রহিল দেখিয়া আসল কথাটা এতক্ষণে আনন্দর মাথাতে গেল, কহিল, ও, আসলে আপনার হাটে যেতেই আপত্তি বুঝি ! মাই গুডনেস্—এ কি আপনাদের দেশ, না কলকাতা শহর, যে মেয়েরা বাজারে গেলে নিন্দে করবে ! এখানে মেয়েছের হাটে যাওয়াই চল—না গেলেই লোকে অবাক হয় । তা ছাড়া এখানে মেয়েরাই তো বাজার করে । আর বেড়াবার জায়গাই বা এমন কোথায় আছে বলুন যে রোজ দু'বেলা গেলে অরুচি হবে না ? তার চেয়ে সকালটা হাটবাজারের জন্যেই রাখুন—

কিন্তু তবু ইন্দিরা ইতস্তত করিতেছে দেখিয়া আনন্দ পুনশ্চ কহিল, আচ্ছা, ফর ওআন্স আমাকে বিশ্বাস করুন ! সেখানে গিয়ে দেখবেন যে কত সম্ভ্রান্ত মহিলারা এসেছেন কর্তাদের সঙ্গে—এ যদি মিলিয়ে না পান তো আমাকে যা তা বলবেন বরং । দেখুন না, কেমন মনোরম পথ ধরে নিয়ে যাই । ওই ওধারের ঐ উঁচু-নীচু মাঠটা পেরিয়ে, একটা গোরস্থানের পেছন দিয়ে, পুষ্পিতা মহুয়া গাছের নীচে দিয়ে যেতে যেতে একসময় দেখবেন যে হাটের কাছে গিয়ে পড়েছেন । পথটি ভারি চমৎকার—চলুন, চলুন !

তাহার আগ্রহকে আর এড়ানো গেল না । ঈষৎ আরক্ত প্রসন্ন মুখে ইন্দিরা কাপড় বদলাইতে গেল ।

সুকুমারও আনন্দের সাহচর্য ও চাপল্যে গতকল্যকার মেঘটা কাটিয়া যাইতে পারে মনে করিয়া প্রফুল্ল হইয়া উঠিল । সে আনন্দের পিঠ চাপড়াইয়া কহিল, নে, শেষ পর্যন্ত তোরই জয়-জয়কার । চল্—কোথায় হাটে বাজারে যাবি !

বাস্তবিকই পথটি ভারি চমৎকার । শেষ পর্যন্ত শহরের পথে পড়িতে হয় বটে, কিন্তু তবু অনেকখানি নির্জন রাস্তায় চলা যায় । নিমগাছ ও মহুয়া গাছের ছায়ায় পথটি শীতল ও ফুলের গন্ধে মদির । সেই পথে চলিতে চলিতে আনন্দ যেন আরও প্রগল্ভ হইয়া উঠিল । সে যে আপনমনে কত কথাই অনর্গল বকিয়া গেল তাহার ইয়ত্তা নাই । কতক বা ইন্দিরার কানে গেল, কতক বা গেল না, তবু সমস্তটা জড়াইয়া তাহার বেশ ভালোই লাগিতেছিল ।

আলোঝলমল প্রভাত, দিগন্তবিস্তৃত মাঠ, ছায়াশীতল এই পথটি এবং ভ্রমণের আনন্দ সবগুলি মিলিয়া তাহার মনে যেন এক নেশা ধরাইয়া দিয়াছিল, আর তাহারই রঙীন অস্পষ্টতায় এই প্রিয়দর্শন যুবকটির অবিশ্রাম গুঞ্জন ভালো লাগিতেছিল।

পথেই একটা বাঁধানো কুয়া পড়ে, কতকগুলি সাঁওতালী ও হিন্দুস্থানী মেয়ে সেখানে দাঁড়াইয়া জল তুলিতেছিল, তাহাদের দিকে চাহিয়া ইন্দিরার মনে হইল, বাঃ ইহারা তো বেশ! রেল কোয়ার্টারের বাগানে ফিরিঙ্গীদের ছেলেমেয়েগুলি ছুটাছুটি করিতেছে, সেদিকে চাহিয়াও ইন্দিরা চোখ ফিরাইতে পারে না। এ যেন কোন্ এক স্বপ্নরাজ্য, এখানে সবই নূতন, সবই মধুর। এমনটি সে কখনও দেখে নাই—তাই তাহার কাছে সবই ভাল লাগিতেছিল।

আনন্দ কথা কহিতে কহিতে তাহার উত্তেজিত মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, কি বৌদি, পথটি ভাল না?

ইন্দিরা বেশ একটু জোর দিয়াই কহিল, ভারী চমৎকার!

তাহার কণ্ঠস্বরে যে আবেগ ধ্বনিত হইল তাহা একেবারেই অপরিচিত।

সুকুমার বিস্মিত হইয়া চাহিয়া দেখিল, আনন্দে ও উত্তেজনায় ইন্দিরার মুখ আরক্ত, বিস্ময়ে দৃষ্টি বিস্ফারিত—এ যেন নূতন ইন্দিরা। সঙ্গে সঙ্গেই মনে হইল, আনন্দ তো বেশ জমাইয়াছে, বাহাদুরি আছে ছোক্‌রার!...

অবশ্য হাটের কাছে আসিয়া ইন্দিরা একটু প্রকৃতিস্থ হইল। লোকের ভীড়ে অসংখ্য লুব্ধদৃষ্টির মধ্যে সংকুচিত না হইয়া উপায়ও ছিল না। সুকুমার মনে করিয়াছিল, বাজারের কাছে গিয়া ইন্দিরা ভীড় দেখিলে কিছুতেই ভিতরে যাইতে চাহিবে না; কিন্তু ইন্দিরা মাথায় কাপড়টা আর একটু টানিয়া দিলেও শেষ পর্যন্ত সে হাটের মধ্যেই ঢুকিয়া পড়িল। অতি শৈশবে বাপের সহিত সে হাটে যাইত, আজ তাহার স্মৃতি ঝাপসা হইয়া গিয়াছে, তবু মনে হইল যেন সেই শৈশবেরই একটা আনন্দের আভাস এতদিন পরে আবার দেখা দিয়াছে।

আনন্দ কহিল, কী বৌদি, কিনুন কিছু!

ইন্দিরা স্মিতমুখে জবাব দিল, আসবারই কথা ছিল, কেনবার তো ছিল না!

আনন্দ কহিল, বাঃ তাই কি হয়! বলুন, কি কিনবেন?

ইন্দিরা লজ্জিতভাবে কহিল, আমি আর কি কিনব বলুন, আপনারা কিনুন আমি দেখি—

আনন্দ প্রবলবেগে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, সে হয় না। আপনি হুকুম করুন অন্তত, আমরা কিনতে রাজী আছি।

কৌতুকপূর্ণ কণ্ঠে ইন্দিরা জবাব দিল, যা হুকুম করবো তাই কিনবেন!...দেখবেন এরপর না বিপদে পড়েন!

কিছু না। আপনি বলুন না, আমি হাটসুদ্ধ কিনে ফেলছি—

অগত্যা ইন্দিরাকেও দুই-একটা ফরমাস করিতে হইল। সুকুমার দাম

দিতে যাইতেছিল, আনন্দ কিছুতেই তাহাতে রাজী হইল না, উপরন্তু একরাশ আনাজ ও মাছ কিনিয়া ফেলিল।...

ফিরিবার পথে গাড়ি ভাড়া করা হইল। ফিরিতে ফিরিতে ইন্দিরা কহিল, কিনলেন তো যা মনে এল তাই, ওগুলি কিন্তু সব খেতে হবে! এবেলা, ওবেলা, কাল—যতদিন না শেষ হয় এখানেই খাবেন!

আনন্দ কি একটা জবাব দিল তাহা সুকুমারের কানে গেল না। সে অবাক হইয়া ইন্দিরার মুখের দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিল যে এ কেমন করিয়া সম্ভব হয়, একদিনের এই সামান্য পরিচয়ে আনন্দ কেমন অনায়াসে ইন্দিরাকে চটুল ও মুখর করিয়া তুলিয়াছে, অথচ সুকুমার শত চেষ্টা করিয়াও সেই পাষাণপ্রতিমাকে এতটুকু উত্তপ্ত করিতে পারে না কেন?...

সুকুমার একটু অন্যমনস্কই হইয়া পড়িয়াছিল। গাড়ি যখন বাড়িতে আসিয়া পৌঁছিল তখন সে সহসা সচেতন হইয়া ভাবিয়া দেখিল, মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা ঈর্ষার সুরই বাজিতেছে। ছি ছি, সে কি ছেলেমানুষ হইয়া গেল ছিঃ!

সে জোর করিয়া আনন্দর কাঁধে একটা চাপড় মারিয়া কি একটা রসিকতা করিয়া উঠিল।

ঠাকুর সঙ্গে আসা সত্ত্বেও ইন্দিরা নিজেই রান্নাঘরে গিয়া রন্ধনকার্যে লাগিয়া গেল। শ্বশুরবাড়িতে স্নেহ যথেষ্ট পাইলেও সম্ভ্রমের খাতিরে সেখানে স্বাধীনতা থাকে খর্ব হইয়া। সহসা এখানে আসিয়া ইন্দিরা সব দিক দিয়াই স্বাধীনতা পাইল। এখানে সে-ই গৃহিণী, তাহার উপর কথা কহিবার কেহ নাই। তা ছাড়া এটা বিদেশ, এখানে এমনিই মনটা চটুল হইয়া উঠে, গতিবিধি হইয়া পড়ে স্বেচ্ছাচারী।

আনন্দও আহারের নিমন্ত্রণ পাইয়া একেবারে জাঁকিয়া বসিল। নিজের বাসা হইতে চাকরকে দিয়া ঢিলা পায়জামা আনাইয়া লইয়া সেখানেই বেশ পরিবর্তন করিল, তাহার পর একটা চেয়ার টানিয়া আনিয়া একেবারে রান্না-ঘরের দুয়ারের কাছে ভর করিল। সে একাই বকিয়া যায় অনর্গল, ইন্দিরা স্মিত প্রসন্ন মুখে তাহার বকুনি শোনে আর হয়তো মধ্যে মধ্যে একটা মন্তব্য করে। এই পাগল তরুণটিকে তাহার ভালোই লাগিতেছিল। ইহার কাছে গম্ভীর হইয়া যেন থাকাই যায় না, যেখানেই থাকে চারিপাশে যেন চটুল আবহাওয়া একটা তৈরী করিয়া লয়।

সুকুমার এত বকিতে পারেও না, তাহার তখন সেরকম মানসিক অবস্থাও নয়। সে তাহার বকুনি শুনিতে শুনিতে ভাবিতেছিল তাহার বিবাহের পূর্বের দিনটির কথা। কেমন অবাধ স্বচ্ছন্দ গতি ছিল তাহার, এতটা মুখর না হইলেও সে ফুর্তিবাজই ছিল। বন্ধুদের লইয়া আনন্দ করিয়া দিন কাটিত একটানা একটা উৎসবের মত। মিছিমিছি এ কী করিল সে, একূলও পাইল না, ওকূলও গেল!

সহসা একসময়ে তাহাকে একটা ঠেলা দিয়া আনন্দ ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া কহিল, লাকী ডগ! এ যে একেবারে অমূল্য রত্ন! জুয়েল! সতীশ বেচারীর জন্য দুঃখ হচ্ছে!

সতীশের নামটা কানে যাইতেই সুকুমার যেন শিহরিয়া উঠিল। আড়-চোখে ইন্দিরার দিকে চাহিয়া দেখিল, পরিশ্রমে ও তাপে তাহার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে, ললাটে সুন্দর স্বেদবিন্দু, আনন্দ ও উত্তেজনায় সমস্ত দেহ যেন উদ্ভাসিত—সেদিকে চাহিলে সমস্ত বাসনা নিমেষে অত্যুগ্র হইয়া ওঠে।...

চাহিয়া চাহিয়া সুকুমারের বুকটা জ্বালা করিয়া উঠিল সে কোনমতে, প্রায় টলিতে টলিতে উঠিয়া গিয়া শুইয়া পড়িল।

১৩

আনন্দর সেই যে প্রতিষ্ঠা হইল এ বাড়িতে, তাহা আর নষ্ট হইল না। সে না থাকিলে এই নব-বিবাহিত তরুণ দম্পতীর দিন কি করিয়া কাটিত বলা কঠিন, নির্জন স্থানে তাহাদের এই ব্যবধান হয়ত অসহ হইয়াই উঠিত। কিন্তু আনন্দর প্রগল্‌ভ মুখরতা তাহাদের সমস্ত গ্লানিকে ঢাকিয়া জীবনযাত্রাকে চলনসই করিয়া তুলিল। সে-ই জোর করিয়া তাহাদের ঠেলিয়া বাহির করে বিকালবেলা, সকালে লইয়া যায় হাটে, নয়তো এমনি বেড়াইতে লইয়া যায়।

আনন্দ যে এমনি করিয়া কীভাবে তাহাদের জীবনের সঙ্গে একেবারে মিশিয়া গেল তাহা না সুকুমার, না ইন্দিরা কেহই বুঝিতে পারিল না।

অথচ আনন্দকে ইন্দিরা ঠিক বুঝিতে পারে না। তাহাকে যতই দেখে, ততই যেন একটা সমস্যায় পড়ে। সে নিভৃত পল্লীগ্রামের মেয়ে, সেখানে সমস্ত পুরুষ জাতটাকে অপর কয়েকটি স্ত্রীলোকের চোখের মধ্য দিয়া তাহাকে দেখিতে হইয়াছে। শিক্ষাও নামমাত্র, গোনা কয়েকখানি বই পড়িতে পাইয়াছে সে। শ্বশুরবাড়িতে আসিয়াই তাহার যাহা কিছু পরিচয় সংসারের সঙ্গে, বলিতে গেলে সে-ই তাহার প্রথম পৃথিবীর পথে পা দেওয়া। সুতরাং তাহার সহজ বুদ্ধি যতই থাক, আনন্দর চমক লাগানো বিদ্যাবুদ্ধিতে তাহার চোখ ধাঁধিতে বাধ্য। তবু যেন ঠিক ভালও লাগে না। কোথায় একটা খট্‌কা বাধে। একই সঙ্গে সে আনন্দর প্রতি একটা সহজ আকর্ষণ এবং গোপন বিতৃষ্ণা অনুভব করে।

আনন্দ আসিয়া প্রত্যহ যখন কথা বলিতে থাকে, তাহার সরস কথাবার্তা, কথা বলার উদ্দীপ্ত ভঙ্গী এবং বিলাতী বিদ্যা ও অভিজ্ঞতার ঝাঁজে ইন্দিরা আকৃষ্ট না হইয়া পারে না। সে নিজে ঠিক পুরাপুরি সে-গল্পে যোগ না দিলেও, শুনিতে শুনিতে মুখ চোখ তাহার উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে। তাহার প্রথম বয়সের হরেনবাবুর স্ত্রীর নিকট হইতে চাহিয়া পড়া ডিটেক্‌টিভ গল্পের কথা মনে পড়ে, এমনই উত্তেজনা হয় তখন।

সে উদ্দীপনা সুকুমারও দেখে এবং ভুল বোঝে। কিন্তু মনে মনে ব্যথা

পাইলেও সে ইন্দিরাকে দোষ দেয় না, বরং আনন্দর বক্তৃতায় ইন্ধন যোগায়। তাহাকে বিকশিত হইবারই সুযোগ দেয় সে। মনে মনে মন্ত্রের মত জপ করে 'ইহাই উচিত, ইহাই আমার প্রাপ্য।'

কিন্তু আনন্দ চলিয়া যাওয়ার পরই ইন্দিরা কেমন একটা অস্বস্তি অনুভব করিতে থাকে। মনে হয় এতক্ষণ ইহার সাহচর্যে কাটানোর মধ্যে কোথায় একটা অন্যায়, অশোভনতা আছে। এই সমস্ত উজ্জ্বল কথাবার্তার মধ্যে কেমন করিয়া বক্তার অন্তরের একটা নীচতা প্রকাশ পায় তাহা ইন্দিরা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না, শুধু মনে মনে পীড়িত হয়। মনে হয় এ লোকটি ভাল নয়—ইহার এই সমস্ত দীপ্তি এবং ভদ্রতার অন্তরালে কোথায় একটা অত্যন্ত গ্লানিকর বৃত্তি আছে, তাহা সুযোগ পাইয়া যখন একসময়ে আত্ম-প্রকাশ করিবে তখন এতটা প্রশ্রয় দেওয়ায় জন্য অনুশোচনার আর অন্ত থাকিবে না।

শুধু তাই নয়—আনন্দর পাশে শান্ত, ভদ্র, সহনশীল সুকুমারকে যেন মানুষ হিসাবে অনেক বড় বলিয়া মনে হয়। কেন তাহা বোঝা যায় না। তবু মনে হয় এ লোকটার চেয়ে তাহার স্বামী অনেক উঁচুতে, অনেক বেশী শ্রদ্ধার যোগ্য। অথচ এই সুকুমারকে তো সে মানুষ হিসাবে ছোট জানিয়াই শ্বশুরবাড়িতে আসিয়াছে এবং এখনও সেই বিশ্বাসেই সে তাঁহাকে ছোট করিয়া দেখে। নিজের অন্তরের স্বত-উৎসারিত প্রেম ও শ্রদ্ধাকে জোর করিয়া সংহত করে সে।'

হয়তো ঠিক এমনভাবে গুছাইয়া ইন্দিরা ভাবিতে পারে না, এমনভাবে হিসাব করিয়া মানুষের পরিচয় লইতে শেখে নাই, তবু সমস্ত ব্যাপারটা কেমন একটা খচ্‌খচ্‌ করিতে থাকে মনের মধ্যে—মনে মনে অস্বস্তির অবধি থাকে না। যদিও কি করা উচিত তাহাও ভাবিয়া পায় না।

কিন্তু আনন্দ এ সমস্তর ধার দিয়াই যায় না। বিলাতে সে মেয়েদের বশ করিয়াছে অন্য উপায়ে। সেখানকার সমাজ সংস্কার ভিন্ন রকমের, সে মেয়েরাও ভিন্ন ধাতুতে গড়া। এখানে যে সে মন্ত্র কার্যকরী হইবে না, তাহা আনন্দর সুচতুর ও অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে অনেকদিনই ধরা পড়িয়াছিল।

অবশ্য ঠিক বশ করা বলিতে যাহা বোঝায় সে রকম কোন ইচ্ছাও হয়তো তাহার ছিল না, বন্ধুত্বের মর্যাদা সে জানিত এবং রাখিবার চেষ্টাও করিত। এই মেয়েটিকে তাহার ভাল লাগিয়াছিল, তাই সে চাহিত তাহার সাহচর্য। এবং কেমন করিয়া সে বুঝিয়াছিল যে এই মেয়ের শ্রদ্ধা অর্জন করার মধ্যেই যথেষ্ট বাহাদুরি আছে। হয়তো এতদিন যে খেলা সে মেয়েদের সঙ্গে খেলিয়াছে তাহাতে তাহার আর প্রবৃত্তিও ছিল না—তাই ইন্দিরার শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জনের জন্যই প্রাণপণে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল।

স্নেহ আদায় করিতেও সে জানে। প্রতিদিন নূতন নূতন আহারের আব্‌দার ছিল তাহার ইন্দিরার কাছে। নিজের সাহেবীয়ানায় দুর্দশার বিবরণ দিয়া সে সহানুভূতি আকর্ষণ করিত, এবং কত পয়সা খরচ করিয়াও যে কী

অস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে তাহার দিন কাটে, চাকর-খানসামারা যে কী পর্যন্ত হৃদয়হীন ইহারই নিত্য নূতন কাহিনীতে ইন্দিরার মনে উদ্রেক করিত করুণা। সেই সব মুহূর্তগুলি আনন্দ সম্বন্ধে সমস্ত সংশয় চলিয়া যাইত, সে প্রসন্ন হাসিমুখে আনন্দর সমস্ত উপদ্রব সহ্য করিত।

সহসা একদিন হয়তো বলিয়া বসিত, পাটিসাপ্টা করতে জানেন বৌদি ?

ইন্দিরা ঘাড় নাড়িয়া জানাইত, হাঁ।

এটা সে শাশুড়ীর কাছে সম্প্রতি শিখিয়াছে।

উৎসাহে আনন্দ লাফাইয়া উঠিত, কি কি চাই বলুন তো বৌদি, এখনই আমি গিয়ে নিয়ে আসছি !

তখন বলা ছাড়া আর কোন উপায় থাকিত না।

ইন্দিরা যদি বলিত 'আমিই আনাচ্ছি চাকরকে দিয়ে'—সে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইত। বলিত, আমাকে বললে কি কোন দোষ হ'ত ? আপনি আমাকে এমনিই পর ভাবেন বটে ! জানেন, আমি সুকুমারের একেবারে ছেলেবেলার বন্ধু ?

অগত্যা ইন্দিরাকে বলিতে হইত, বলার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনের চারগুণ বেশী মাল আনিয়া হাজির করিত। ক্ষীরই আনিত হয়ত চারসের।

সুকুমার আর ইন্দিরা দুজনেই অনুযোগ করিত কিন্তু সেসব কথা আনন্দ উড়াইয়া দিত। বলিত, ও এক-আধটু বেশী আনলে ক্ষতি কি ! না হয় কিছু ফেলা যাবে। কম পড়লে কী বিপদ হ'ত বলুন দেখি !

এমন মানুষকে কি পারা যায় ?

আর একদিন কী কথায় ইন্দিরা হঠাৎ প্রশ্ন করিয়া ফেলিয়াছিল, এদেশে পদ্ম হয় না বুঝি ?

আনন্দ জবাব দিয়াছিল, না। এখানে জল কৈ, দেখছেন না চারদিকে মাটি ফেটে আছে ! আপনাদের দেশে হয় বুঝি খুব ?

তাহার পিত্রালয়ের কথা উঠিতেই ইন্দিরা কেমন যেন সংকোচ বোধ করিত। সেদিনও একটু কুণ্ঠিত ভাবে মাথা নামাইয়া জবাব দিয়াছিল, খুব না, তবে হয়।

নিতান্ত সাধারণ প্রশ্ন এবং সাধারণ উত্তর। সে কথা আর কাহারও মনে নাই। তিন চার দিন পরে কিন্তু সহসা কলিকাতা হইতে এক নার্শারীর লোক আসিয়া হাজির। একঝুড়ি পদ্ম তাহার সঙ্গে। বলে, এই ঠিকানাতেই পৌঁছে দেবার কথা আছে—

সুকুমার এবং ইন্দিরা দুজনেই স্তম্ভিত। সে কি ! কে অর্ডার দিয়েছে ?

তাহা সে লোকটি জানে না। অর্ডার এবং টাকা, মায় তাহার গাড়ীভাড়া পর্যন্ত এখান হইতে মণি অর্ডারে গিয়াছে—একঝুড়ি পদ্মফুল এখানে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য।

ব্যাপারটা দুজনেরই বুঝিতে বাকী রহিল না। ইন্দিরা লজ্জায় মরিয়া গেল। মনে মনে বার বার প্রতিজ্ঞা করিল যে আর জীবনে সে আনন্দর সহিত

কথা কহিবে না, কিছুতেই না। এমন লোক সে!...কিন্তু সুকুমার একেবারে হাসিয়া উড়াইয়া দিল, ও ছোঁড়া এমনিই পাগল—বরাবর!

তবু ইন্দিরা রাগ করিয়া রহিল এবং দেখা হইলে বেশ গম্ভীর ভাবেই তাহাকে শাসন করিবে স্থির করিয়া রাখিল কিন্তু আনন্দ সেদিন সে দিক দিয়াই গেল না। বরং সন্ধ্যাবেলা চাকরকে পাঠাইয়া দিল; সে আসিয়া জানাইল, বাবুর জ্বর হয়েছে, একটু ভাল ক'রে সাবু তৈরি ক'রে দিতে বলেছেন।

অগত্যা সাগু প্রস্তুত করিয়া দিতে হইল এবং পরের দিন রুক্ষচুল ও শুষ্ক মুখ লইয়া আসিয়া যখন অপরাধী হাজির হইল তখন কুশল প্রশ্নও করিতে হইল, শাসন করা আর ঘটিয়া উঠিল না।

ইন্দিরা আর সুকুমারের মধ্যেকার সম্পর্কটা আছে সেই রকমই। প্রয়োজন মত ইন্দিরা সহজভাবেই কথা বলে, কিন্তু শুধু প্রয়োজনমতই। রাত্রে বসন্তের পুষ্পিত প্রলাপের মধ্যে, পাগলকরা দক্ষিণা বাতাসের সমারোহের মধ্যে দু'জনে শুইয়া থাকে দুইটি পৃথক শয্যায়, নিঃশব্দে, নীরবে।

সুকুমার কিছুই বলে না, বৃথা টানা-হেঁচড়াতে আর তাহার প্রবৃত্তি নাই, একতরফা প্রেম নিবেদন করিতে যেন তাহার ঘৃণা বোধ হয়। সে সঙ্গে থাকে, বেড়াইতেও যায়, কথাবার্তাতেও যোগ দেয়, তবু যেন কিছুতেই তাহার উৎসাহ নাই। শীতল স্নিগ্ধ সরোবরের তীরে দাঁড়াইয়াও অসহ্য তৃষ্ণায় সে দিন দিন শুকাইয়া যাইতে লাগিল।

একদিন অপরাহ্নে সে বসিয়া এই কথাই ভাবিতেছে, এমন সময় অত্যন্ত লঘুপদে ইন্দিরা ঘরে প্রবেশ করিল। কহিল, আনন্দ ঠাকুরপো বলছেন আজ পাথরোল যাবার কথা, তিনি গাড়িও ঠিক করেছেন,—

অকস্মাৎ যেন সুকুমারের সমস্ত মনটা তিক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু তবু সে প্রাণপণে চিত্তদমন করিয়া কহিল, বেশ তো, যাও না—

সহজ কথা, কিন্তু কণ্ঠস্বরে কোথায় একটা গোলমাল ঠেকিল। ইন্দিরা একটু ইতস্তত করিয়া প্রশ্ন করিল, তোমার কাপড়-জামা এইখানে এনে দেব?

সুকুমার তাহার মুখের উপর ক্লান্ত দৃষ্টি মেলিয়া কহিল, কেন আমাকে এমন টানাটানি করো ইন্দিরা, আমাকে দুঃখ দিয়ে কি তোমার সাধ মিটছে না? এখানে এইভাবে তোমার সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া এ যে কি প্রাণান্ত দুঃখ তা কি বোঝ না? এতে তোমার লাভ কি? তার চেয়ে তুমিই যাও, তুমি সুখে থাকো, আনন্দ পাও, যা খুশী তাই করো—আমায় শুধু রেহাই দাও।

অব্যক্ত যন্ত্রণার এমনই একটা আকৃতি ফুটিয়া উঠিল সুকুমারের কণ্ঠে যে নিজের অজ্ঞাতসারেই ইন্দিরার মুখে বেদনার ছায়া দেখা দিল।

সে চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু সুকুমার চুপ করিল না, তেমনি একটা চাপা অথচ তীব্রকণ্ঠে বলিয়া চলিল, এই বিদেশে আমি সর্বদাই তোমার সঙ্গে রয়েছি, তবু আমি তোমার কাছে ঐ মালির চেয়েও বোধ হয় পর। অথচ বাইরে সব সময়ে সেই কথাটাই ঢেকে রাখবার চেষ্টা করতে হয়। ঢাকাও থাকে না, শুধু

শুধু এই টানাটানি, এই উঞ্ছবৃত্তি—এ আর আমি সইতে পারছি না। আমি অপরাধ যতই করে থাকি, তোমার কাছে তো করিনি, আমাকে তুমি ছেড়ে দাও—

আরও কি বলিতে যাইতেছিল সে, কিন্তু সহসা ইন্দিরার বিবর্ণ নতমুখের দিকে নজর পড়িতেই থামিয়া গেল। ইন্দিরা স্তব্ধ হইয়া ঘরের ঠিক মাঝখানে তেমনিভাবেই দাঁড়াইয়া রহিল।

সুকুমার রহিল নিঃশব্দে দূরে আকাশের দিকে চাহিয়া।

এইভাবে মিনিট কয়েক কাটিয়া গেল, আরও কতক্ষণ এইভাবে কাটিত কে জানে, হঠাৎ একটা দমকা বাতাসের মত প্রবেশ করিল আনন্দ।

কহিল, কি বৌদি, এখনও তৈরী হয়ে নেন্‌নি? ফিরতে দেরী হবে যে!

প্রাণপণে কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক করিয়া লইয়া ইন্দিরা জবাব দিল, ওঁর বড্ড মাথা ধরেছে ঠাকুরপো, আজ থাক্—

আনন্দের কণ্ঠে পরিষ্কার হতাশা ফুটিয়া উঠিল, মাথা ধরেছে নাকি রে? কখন ধরল? একটু বাইরের হাওয়ায় গেলে বোধহয় ভালই হ'তো—

চলিয়া যাইতে যাইতে দ্বারপথ হইতে ইন্দিরাই জবাব দিয়া গেল, না, সে হয় না। শরীর খারাপ থাকলে কিছু ভাল লাগে না, বরং সামনের মাঠে একটু পায়চারি করেন তো করুন।

ইন্দিরা চলিয়া গেল, আনন্দও 'তাই তো, গাড়িও'লাটা আবার'—বলিয়া শীস্ দিতে দিতে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু ইন্দিরার এই সামান্য কথাতেই সুকুমারের চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছিল। ইন্দিরা তাহার মানসিক অবস্থাকে সম্মান করিয়াছে, তাহার জন্য মিথ্যা বলিয়া তাহার দৈন্যকে ঢাকিয়া লইয়াছে, তাহার জন্য উৎকণ্ঠাও দেখাইয়াছে—এই সব তুচ্ছ ছোট ছোট কথাতেই তাহার চিত্ত উদ্বেল হইয়া উঠিল, ইন্দিরার ইচ্ছাকে এমনভাবে নষ্ট করিয়া দিবার জন্য অনুতাপেরও সীমা রহিল না।

একটুখানি ইতস্তত করিয়া সে উঠিয়া পড়িল। ভিতরের বারান্দায় বসিয়া ইন্দিরা তখন অপরাহ্নের জলখাবারের জন্য ফল কাটিতেছিল, দাসী-চাকর কাছে কেহ নাই দেখিয়া সুকুমার তাহার পাশে বসিয়া পড়িয়া কহিল, আমার মাথার ঠিক ছিল না, কি বলতে কি ব'লে ফেলেছি, তুমি কিছু মনে ক'রো না। চলো আমরা বেরিয়ে পড়ি—

বোধহয় অতি ক্ষীণ একটা হাসির রেখা ইন্দিরার ওষ্ঠপ্রান্তে ফুটিয়া উঠিল। সে মাথা নাড়িয়া শুধু কহিল, আজ থাক্—

সুকুমার মিনতি করিয়া বলিল, চলো না লক্ষ্মীটি, অন্তত নদীর ধারেই একটু যাওয়া যাক।

মাথা নাড়িয়া ইন্দিরা কহিল, সে হয় না। ঠাকুরপো কি ভাববেন তা হ'লে! জল খেয়ে তুমিই একটু ঘুরে এসো।

সেদিন আর কোন কথা হইল না। সুকুমার হয়ত আশা করিয়াছিল ইন্দিরাই রাত্রে আর কিছু বলিবে, হয়ত বা অনুতাপের সুর তাহার কণ্ঠে ধ্বনিত হইবে কিন্তু সে সব কিছুই হইল না, ইন্দিরা প্রতিদিনের মতই নিঃশব্দে

আসিয়া তাহার পৃথক শয্যাতে শুইয়া পড়িল।...

পরের দিন সুকুমারই উপযাচক হইয়া পাথরোল যাত্রার ব্যবস্থা করিল। কিন্তু এইভাবে বেড়াইতে যাওয়া সত্যই তাহার আর ভাল লাগিতেছিল না। আনন্দ তাহার সঙ্গ ঠিক চায়ও না, ইন্দিরার দিকেই তাহার মনোযোগ, বেড়াইতে বাহির হইয়া সে তাহাকে লইয়াই ব্যস্ত থাকে। অনর্গল বকিয়া, হাস্য-পরিহাসে ইতিহাসে-কল্পনায় সে ইন্দিরাকে মাতাইয়া তুলিতে চায়।

পাথরোল যাত্রাও সুতরাং সুকুমারের কাছে ব্যর্থ হইয়া গেল। সে গাড়িতে সমস্তক্ষণই চুপ করিয়া রহিল, কারণ কথা বলার ভূমিকা আনন্দ এবং সায় দেওয়ার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল ইন্দিরা—তাহার মধ্যে সুকুমার যেন অতিরিক্ত। কালীবাড়িতে পূজো দিবার সময় দু-একটা কি পরিহাস করিবার চেষ্টা করিয়া সে আবার নিঃশব্দেই উহাদের সঙ্গে বাড়ি ফিরিল। যে সুন্দরী কিশোরীর উপস্থিতি আনন্দকে অত মুখর করিয়া তুলিয়াছিল সেই মেয়েটির পাশে বসিয়া তাহার উষ্ণ কোমল দেহের সংস্পর্শ প্রতিনিয়ত পাইয়াও তাহার স্বামীর কণ্ঠে কোন প্রকার কথা ফুটিল না। সে যেন ইহাদের অপরিচিত, পর।

সেই দিনই বাড়ি ফিরিয়া সুকুমার প্রতিজ্ঞা করিল যে, আর নয়, এ অভিনয়ের এইখানেই শেষ করিতে হইবে, আর সে এমন করিয়া নিঃশব্দে পুড়িতে পারিবে না—

সেদিন সারারাত্রি ভাল করিয়া ঘুমাইতে পারিল না, শুধু এই কুৎসিত অবস্থা হইতে প্রাণপণে মুক্তির উপায় খুঁজিতে লাগিল। উপায় একটা পাইলও—

পরের দিন অপরাহ্নে আনন্দ আসিবার আগেই সে ইন্দিরাকে ডাকিয়া কহিল, ওগো শুনছ, আমার আজ একটা জরুরী লেখা আছে, একটা মাসিকপত্রে আগে আমি লেখা দিতুম, তারা অনেক ক'রে একটা লেখা চেয়ে পাঠিয়েছে—আজকে শেষ না করলেই নয়। তোমরা দু'জনেই আজ বেড়িয়ে এসো, আমি আজ আর যেতে পারবো না।

ইন্দিরা বিস্মিত হইয়া সুকুমারের মুখের দিকে চাহিল, কিন্তু সে মুখে রাগ বা অভিমানের কোন চিহ্নই খুঁজিয়া পাইল না। তবু সে অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, বেশ তো, আজ না হয় বেড়ানো নাই হ'ল—

ব্যস্ত হইয়া সুকুমার কহিল, না না, সে হয় না। তাহ'লে আবার আমার মনটায় খচ্‌খচ্‌ করতে থাকবে। মনে হবে, আমার জন্যে তোমাদের বেড়ানো হচ্ছে না—ফলে বেড়ানোও হবে না, লেখাও হবে না। তোমরাই যাও লক্ষ্মীটি, আমি যখন বলছি তখন কোন দোষ হবে না, না হয় অল্প একটু ঘুরে এস—

ইন্দিরার যেটুকু সন্দেহ ছিল, এই শেষের পাঁচ-ছয়টি শব্দে তাহা দূর হইয়া গেল। তাহা ছাড়া এখানে আসিয়া পর্যন্ত এই বেড়াইতে যাওয়া যেন

নেশার মতই পাইয়া বসিয়াছিল তাহাকে, না গেলে তাহার কষ্টই হইত। তাই আনন্দ আসিতে সুকুমার যখন আবার এই অনুরোধই করিল, তখন সে দু-একবার ক্ষীণ প্রতিবাদ করিয়া শেষ পর্যন্ত রাজীই হইয়া গেল।

কিন্তু রাজী হইলেও, ঠিক বাহির হইবার সময় আর একা বাহির হইতে পারিল না, ঝিকে ডাকিয়া সঙ্গে লইল। ফলে সেদিন আর ভ্রমণটা জমিল না। বয়স্থা দাসীর সঙ্গটা আনন্দকে ভিতরে ভিতরে পীড়া দিতে লাগিল, সে আর বেশী কথা কহিল না। অধিকাংশ সময়ে চুপ করিয়াই রহিল। আর ইন্দিরারও কেমন যেন অস্বস্তিবোধ হইতে লাগিল, সে নদীর ধার পর্যন্ত গিয়াই 'চলুন ফেরা যাক্'—বলিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিল।

সুকুমার সত্যই কি একটি লিখিতেছিল। ইন্দিরাদের অত সকালে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া তাহার মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তবু সে সহজ কণ্ঠেই বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল, তোরা এরি মধ্যে ফিরে এলি যে, কতটুকু বেড়ালি!

আনন্দ ভাল করিয়া সে কথার উত্তর দিল না। গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল।

সুকুমার ব্যাপারটাকে আস্তে আস্তে সওয়াইয়া লইতেছিল। পরের দিন সে উহাদের সঙ্গে বাহির হইল বটে, কিন্তু তাহার পরের দিন আবার একটা ছুতা করিল। অথচ ইন্দিরাকে যাইবার জন্য বার বার অনুরোধ করিতে লাগিল। ইন্দিরাও এ ব্যবস্থায় অসুবিধা বোধ করা সত্ত্বেও, একেবারে 'না' বলিতে পারিল না। ঝিকে সঙ্গে যাইবার জন্য ডাকিতে সে স্পষ্টই মুখের উপর বলিয়া দিল, না বৌদি, সে আমি পারব না। এ পাহাড়ে দেশে হাঁটা আমার কর্ম নয়—সেদিন হেঁটেই আমার গায়ে ব্যথা হয়ে গেছে।

অগত্যা ইন্দিরা একাই বেড়াইতে গেল আনন্দর সঙ্গে। কিন্তু সেদিন সে ইচ্ছা করিয়াই বাহিরের নির্জন প্রান্তরের দিকে না গিয়া অপেক্ষাকৃত জনবহুল পল্লীতে বেড়াইতে গেল এবং সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিয়া আসিল। সুকুমার যদিও নীরবে থাকে, তবু তাহার সঙ্গে থাকিলে ইন্দিরা যেন অনেকটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে, সে না থাকিলে যেন কিছুতেই জমে না।

১৪

ইহার পরে দিন-দুই সুকুমার যথারীতি উহাদের সাহচর্যে কাটাইল, কিন্তু তাহার পরই আবার এক ছুতায় ডুব মারিল। আনন্দ কোথা হইতে একখানা মোটরগাড়ি সংগ্রহ করিয়াছিল, কথা ছিল তাহারা ঐ গাড়িতে করিয়া সেদিন গিরিডির দিকে বেড়াইতে যাইবে। অমন প্ল্যানটা মাটি হইয়া যায় দেখিয়া আনন্দর মুখ শুকাইয়া উঠিল, কিন্তু সুকুমার কিছুতেই যাত্রাটা নাকচ করিতে দিল না, একরকম জোর করিয়াই ইন্দিরাকে গাড়িতে তুলিয়া দিল। কহিল

লাহিড়ী মশাই বুড়ো মানুষ, ধরেছেন আজ আমাকে তাঁর নাটক শোনাবেনই। না গেলে বড্ড মনঃক্ষুণ্ণ হবেন। তোরা যা, যদি কোনমতে বুড়োকে ঠাণ্ডা করতে পারি তো এই সাড়ে পাঁচটার ট্রেনে চেপে বসব। আসবার সময়ে একবার স্টেশনটা হয়ে আসিস বরং—যদি যাই তো ঐখানেই থাকব।

ইহার পর আর অন্য সন্দেহ থাকে না। ইন্দিরা নিশ্চিন্ত হইয়াই মোটরে উঠিল, যদিও এতটা পথ আনন্দর সহিত একা যাওয়াতে কেমন যেন তাহার সংস্কারে বাধিতেছিল। শেষ পর্যন্ত মনকে সে প্রবোধ দিল, ড্রাইভার তো আছে।···

অবারিত মাঠ, দূরে পাহাড়ের নীল রেখা। মোটর চলিয়াছে হু হু করিয়া যেন শূন্য দিগন্তেরই দিকে। অপূর্ব দৃশ্য। এমন সোনার দেশ যে হয় তাহা ইন্দিরা কখনও কল্পনা করে নাই। সে প্রাণপণে দুই চক্ষু ভরিয়া এই দৃশ্যটিকে যেন পান করিতেছিল, ইহার শালবন, উঁচুনীচু মাঠ, ঢেউ খেলানো রাস্তা, শুষ্ক বাতাস, দূরে পাহাড়ের ছবি সবই তাহার ভালো লাগে। হয়তো নূতন বলিয়া—তবু লাগে।

আনন্দও যেন আজ অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। এমনিতেই তাহার কথাবার্তা অত্যন্ত সরস, এ ধরনের কথাবার্তা পাড়াগাঁয়ের মেয়ের কাছে বিস্ময়—তাহার উপর সেদিন সে যেন তাহার স্বাভাবিক ক্ষমতাকেও লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছিল। সে বিলাতফেরত, য়ুরোপটা ভাল করিয়াই দেখিয়াছে, তাহারই বিচিত্র অভিজ্ঞতা সে গল্প করিতেছিল।

বিলাত, ফ্রান্স, সুইৎসার্লাণ্ড—কত দেশ, কত মানুষ, কত ঘটনার মজাদার গল্প! ইন্দিরা মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনিয়া যাইতেছিল; চক্ষু ও কর্ণ দুইই তাহার ব্যস্ত, তাই সে বুঝিতে পারে নাই যে গাড়িটার গতি কখন মন্থর হইয়া আসিয়াছে; যাওয়া-আসার এই পথকে দীর্ঘতর করিবার যে কোন ইঙ্গিত থাকিতে পারে তাহার মধ্যে, তাহাও সে কল্পনা করে নাই।

সহসা তাহার চমক ভাঙ্গিল গিরিডি স্টেশনে পৌঁছিয়া। আনন্দ নীচে নামিয়া খানিকটা ঘুরিয়া আসিয়া কহিল, না, সে ছোঁড়া আসেনি! জানি সে আসবে না, আমাদের এড়িয়ে যাবারই মতলব ছিল তার!

হঠাৎ যেন একটা রূঢ় আঘাত লাগিল ইন্দিরার। সুকুমার ইচ্ছা করিয়াই এড়াইয়াছে? কিন্তু কেন?

সে মুখ বাড়াইয়া অনুযোগের সুরে কহিল, ইস্, এ যে একেবারে সন্ধ্যা হয়ে গেল ঠাকুরপো, বাড়ি ফিরবো কখন?

আনন্দ কি যেন একটা গোলমাল করিয়া জবাব দিল, তাহার পর কহিল, একটু চা খাবেন বৌদি?

ব্যাকুলভাবে ইন্দিরা কহিল, না না, কিচ্ছু দরকার নেই। আমি তো চা খাই না, জানেনই। এখন একটু তাড়াতাড়ি গাড়িটা ছাড়ুন—

হ্যাঁ, এই যে—

তাড়াতাড়িতে একথা ইন্দিরার মনে হইল না যে, সে না খাইলেও আনন্দর

চা খাইবার প্রয়োজন থাকিতে পারে। আনন্দরও সে কথাটা স্মরণ করাইয়া দিতে, কে জানে কেন, সঙ্কোচে বাধিল।

আবার গাড়ি ছাড়িল। অন্ধকার পথ, বাহিরে দেখিবার কিছু নাই, ইন্দিরা গাড়ির কোণে মাথা রাখিয়া চোখ বুজিয়া ভাবিতে লাগিল সুকুমারেরই কথা। তাহার এ আচরণের অর্থ কি, সে কোনমতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। কিন্তু সে যে ইচ্ছাপূর্বকই তাহাদের বেড়াইতে পাঠাইয়া দিয়া নিজে দূরে সরিয়া থাকে সে বিষয়ে আজ আর সন্দেহের অবকাশ নাই। এ কি শুধু অভিমান?

ইন্দিরার মনে তাহার বিবাহিত জীবনের প্রতিটি দিনের ইতিহাস যেন ভীড় করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। লেখাপড়া সে শিখুক না শিখুক, সুকুমারের ভালবাসার তীব্রতা বুঝিবার মত জ্ঞান তাহার হইয়াছে,—সেই মানুষ এমন করিয়া আর একজনের সঙ্গে তাহাকে পাঠাইয়া দিয়া নিজে নিশ্চিন্ত থাকে কি করিয়া! হউক না কেন সে বন্ধু, তবু পর তো!…

আনন্দরও ফিরতি বেলায় কথোপকথনের উৎস যেন শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। সে চুপ করিয়াই বাহিরের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল, খানিকটা পরেই যেন একরকম মরিয়া হইয়াই, অতি সন্তর্পণে ইন্দিরার একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে মুঠা করিয়া ধরিল।

বিলাতে সে অনেক মেয়ের সহিত ফ্লার্ট্ করিয়াছে, এ বিষয়ে তাহার নামই ছিল, কিন্তু এই সরলা, পল্লীগ্রামের মেয়েটি সম্বন্ধে তাহার যেন সঙ্কোচের অবধি নাই। আজও সে কিছু ভাবিয়া-চিন্তিয়া আসে নাই। এখনও সে কতকটা অভিভূতের মতই ইন্দিরার হাতখানা টানিয়া লইল—কতকটা নিজের অজ্ঞাতসারেই।

ইন্দিরার ব্যাপারটা ভাল লাগিল না। তবু সে হাতখানা তখনই জোর করিয়া টানিয়া লইতে পারিল না, কেমন যেন লজ্জা করিতে লাগিল। তা ছাড়া ইহার মধ্যে যে দোষাবহ কিছু থাকিতে পারে তাহা ইন্দিরার পক্ষে জানা সম্ভবও না—

সে ভাবিতেছিল সুকুমারেরই কথা। বয়স তাহার অল্প হইলেও, সে পাড়াগাঁয়ে ঈর্ষার অনেক কুৎসিত রূপই দেখিয়াছে, পুরুষের এমন নির্বিকার চেহারা তাহার কল্পনারও বাহিরে। সুকুমার কি চায়, সে এমন ইচ্ছা করিয়া তাহাকে দূরে সরাইয়া দিতেছে কেন?

তবে কি…তবে কি…

সমস্ত অন্তর ক্ষত-বিক্ষত হইয়া এই সন্দেহটাই ইন্দিরার মনে আত্মপ্রকাশ করিল, তবে কি সুকুমারের আর তাহার সম্বন্ধে কোন মোহ নাই? সে আর তাহার সঙ্গ, তাহার সাহচর্য কামনা করে না, বরং বিরক্তই হয়, তাই এ অবহেলা? তাই সে এত নির্বিকার?

ইন্দিরার ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। এইবার সে মনে মনে

স্বীকার করিতে বাধ্য হইল যে, এতদিন সে আত্মপ্রবঞ্চনাই করিয়া আসিয়াছে, সুকুমারের কাছে তাহারই বহুদিন আগে পরাজয় ঘটিয়াছে—। আজ সে-ই সুকুমারের ভালবাসার ইতিহাস জানিবার জন্য ব্যগ্র, যেমন ব্যগ্র একদিন ছিল সুকুমার নিজে—

....

সহসা আনন্দর দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দে ইন্দিরার চমক ভাঙ্গিল। তাহার হাতখানায় মৃদু চাপ দিয়া ঈষৎ কম্পিতকণ্ঠে আনন্দ কহিল, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব বৌদি, সত্যি জবাব দেবেন ?

তাহার প্রশ্নে যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইলেও ইন্দিরা কোন কথা কহিল না, শুধু ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। আনন্দ তবু একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, বলা আমার উচিত নয়, কিন্তু আমি আপনার কথা ভেবে স্থির থাকতে পারছি না ব'লেই জিজ্ঞাসা করছি, সুকুমার কি আপনাকে সুখী করতে পারেনি ?···না না, আপনি যতই গোপন করার চেষ্টা করুন, আমি বেশ বুঝতে পেরেছি যে আপনি এখানে সুখে নেই—

ইন্দিরা বহুক্ষণ পর্যন্ত তাহার কথার মর্মোদ্ধার করিতে পারিল না। তাহার পর যখন বুঝিল তখন হাতখানা সজোরে আনন্দর মুঠা হইতে টানিয়া লইয়া কহিল, এ সব কি বলছেন ঠাকুরপো ? আমি ওঁর কাছে সুখে নেই এমন কথা কে আপনাকে বললে ? ওঁর মত স্বামীর কাছে যে সুখে থাকতে না পারে সে আর কোথায় সুখ পাবে ?···ছি, ছি, এ সব কথা আর বলবেন না কখনো, শুনলেও যে পাপ হয় !

হয়তো এতটা উত্তেজনার কারণ ছিল না, কিন্তু এটা কতকটা ইন্দিরার আত্মগ্লানিরই তাপ।

আনন্দ অপ্রতিভ হইয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, মাপ করবেন, আমি অতটা বুঝতে পারিনি।

গাড়ি যখন মধুপুরে তাহাদের বাড়ির সামনে পৌঁছিল তখন রাত্রি দশটা বাজে। সুকুমার বাহিরের বারান্দায় বসিয়া একখানা বই পড়িতেছিল, সে মুখ তুলিয়া চাহিয়া হাসিমুখেই বলিল, এসো। আমার আর যাওয়া হ'লো না, লাহিড়ী মশায় যা পাকড়াও করলেন, কার সাধ্যি নাটক শেষ হবার আগে ওঠে !

ইন্দিরা আশা করিয়াছিল যে অন্তত এতখানি রাত করার জন্য সামান্য কিছু অনুযোগও সুকুমার করিবে, কিন্তু সে ওদিক দিয়াই গেল না। বরং ক্লান্তমুখে আনন্দকে বসিয়া পড়িতে দেখিয়া কহিল, আমায় খুব খোঁজাখুঁজি করেছিলি নাকি ? আমি আবার ভাবছিলুম যে মিছিমিছি তোরা হয়রান না হোস্—

ইন্দিরা আর শুনিতে পারিল না। তাড়াতাড়ি বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। কিন্তু কাপড় ছাড়ার নাম করিয়া ঘরে ঢুকিলেও তখনই সে কাপড় ছাড়িতে পারিল না, সেই অবস্থাতেই মিনিট দশেক স্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিল।

ঝি আসিয়া—রান্না শেষ হইয়াছে, এই সংবাদ দিতে তবে তাহার চমক ভাঙ্গিল, সে তাড়াতাড়ি কাপড়-জামা বদলাইয়া বাহির হইয়া আসিল।

সুকুমার বেশ সহজভাবেই আসিয়া আহারে বসিল। বলিল, আনন্দটার কি হলো আজ? ভয়ানক শরীর খারাপ ব'লে বাড়ি চলে গেল। কিছুতেই খেতে রাজী হলো না।—

ইন্দিরার মনে হইল ইহার চেয়ে তিরস্কার করাও ভাল ছিল। এমন অনিশ্চয়তা অসহ্য। তিরস্কার করিলে, রাগ করিলে তবু তাহার অর্থ পাওয়া যাইত—কিন্তু এই নির্বিকার অবস্থায় যেন দম বন্ধ হইয়া আসে। সে কিছুতেই সেদিন মুখ তুলিয়া কাহারও পানে চাহিতে পারিল না। সে যেন কি একটা কঠিন অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছে—দাসী চাকরদের সহিত চোখাচোখি হইলেও পাছে সেখানে নীরব তিরস্কারের ভাষা দেখিতে পায়, সেই ভয়ে সেদিন সে সাধ্যমত সকলকারই দৃষ্টি এড়াইয়া গেল। আহারের কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না, তবু আনন্দর না খাওয়ার সহিত তাহার না খাওয়ার কোন অর্থ হইতে পারে এই ভয়ে নিয়মমত আহারে বসিল কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত অভিমান ও বেদনায় তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল, প্রাণপণে চোখের জল চাপিয়া কোনমতে দুই-এক গ্রাস খাদ্য মুখে পুরিয়াই উঠিয়া পড়িল।···

রাত্রে বিছানায় শুইয়া কিছুতেই চোখে ঘুম আসিল না। স্বামীকে সে এ পর্যন্ত যত দুঃখ দিয়াছে আজ তাহার সবগুলিই যেন ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিয়াছে—এ অবস্থা অসহ্য। আজ সে বুঝিতে পারিল যে এতদিন সে স্বামীর ভালবাসাকে অবহেলা করিতে পারিয়াছে তাঁহার প্রেমের গভীরতা সম্বন্ধে নিশ্চিত ছিল বলিয়াই—তাহার দম্ভ, অভিমান সব কিছু নির্ভর করিতেছে তাঁহারই উপর। কিন্তু সেই ভালবাসার দম্ভে উন্মত্ত হইয়া আজ বুঝি সে মূলধনই হারাইতে বসিয়াছে। আসল মুহূর্তটিকে চিনিতে পারে নাই—যে মুহূর্তে তাহার আত্মসমর্পণ করা উচিত ছিল। আজ যদি উনিই অবহেলা করিতে শুরু করেন?

তাহার সমস্ত বুক ভাঙ্গিয়া যেন কান্না বাহির হইতে চাহিতেছে, অথচ সে কাঁদিবেই বা কাহার কাছে? কোন সহানুভূতির দরজাই তো সে খোলা রাখে নাই। তখন যদি শাশুড়ীর কথা সে শুনিত!···

সে আর শুইয়া থাকিতে পারিল না। বহুক্ষণ ছটফট করিয়া অবশেষে উঠিয়া পড়িল। আস্তে আস্তে উঠিয়া আসিয়া সুকুমারের শয্যাপ্রান্তে বসিয়া পড়িয়া তাহার পায়ের উপর হাত রাখিল।

সুকুমারও জাগিয়া ছিল। বাহিরে সে যতই নির্বিকার থাক, অন্তরটা তাহার জ্বলিয়া যাইতেছিল। সে-ও মানুষ, অত রাত্রে স্ত্রী ও বন্ধুকে বেড়াইয়া ফিরিতে দেখিলে, বিশেষত তাহারা যদি অপরাধীর মত কুণ্ঠিতভাবে ফেরে, কোন মানুষই স্থির থাকিতে পারে না। এই কয়দিন ধরিয়াই সে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, আজিকার তো কথাই নাই; তবু সে মনকে প্রাণপণে

বুঝাইতেছে যে ইহাই তাহার ন্যায্য প্রাপ্য। সতীশের প্রতি যে অন্যায় সে করিয়াছে, এ দাহন তাহারই প্রায়শ্চিত্ত—কঠিন পাপের কঠিন শাস্তি—এ ভোগ করিতেই হইবে। আর তাহাতে, তাহাতে যদি ইন্দিরা সুখী হয় তো হোক—

কিন্তু মনকে প্রবোধ দেওয়া এক বস্তু আর প্রবোধ পাওয়া আর এক বস্তু। তাই সে অত রাত্রেও ঘুমাইতে পারে নাই। ওপাশে যে ইন্দিরাও জাগিয়া আছে তাহাও সে বুঝিয়াছিল কিন্তু অন্য কারণ অনুমান করিয়াছিল, তাহাতে তাহার অন্তর্দাহ বাড়িয়াছে বই কমে নাই। এখন ইন্দিরাকে তাহারই শয্যায় আসিয়া পায়ে হাত দিতে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল।

এ কি ইন্দু! কি হয়েছে রাণী, ভয় পেয়েছো?

সে উঠিয়া বসিয়া তাড়াতাড়ি তাহাকে কাছে টানিয়া লইল।

অশ্রুবিকৃত কণ্ঠে ইন্দিরা চুপি চুপি কহিল, আমি অত রাত ক'রে ফিরলুম, বকলে না কেন?

এ কি অদ্ভুত প্রশ্ন!

বিস্ময়ে সুকুমারের মুখ দিয়া কিছুক্ষণ কথাই বাহির হইল না। তাহার পর কহিল, বকব কেন? ওখান থেকে ফিরতে দেরি হবে তা তো আমি জানতুমই—

তবে পাঠালে কেন? কেন তুমি অমন ক'রে আমাকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছ?

তা বটে!

গভীর দুঃখের মধ্যেও সুকুমারের হাসি আসিল। এ অনুযোগ তাহারই প্রাপ্য বটে!

সে অভিমানরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, তা নইলে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না যে রাণু! যে পাপে তোমাকে পেলুম না, সে পাপের শেষ হওয়া চাই তো!

অকস্মাৎ তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া ইন্দিরা তাহার বুকে মাথা রাখিয়া হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সুকুমারের বুক দুলিয়া কাঁপিয়া যেন বন্ধ হওয়ার উপক্রম হইল। একি সত্য, না সে স্বপ্ন দেখিতেছে?

কী হয়েছে রাণী, কেন অমন করছ? বলো আমাকে কি হয়েছে, লক্ষ্মীটি—

ইন্দিরা প্রায়-রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, আর কখনও অমন করব না, তুমি এই বারটি আমাকে মাপ করো—

কিন্তু তোমার কোন অপরাধই হয়নি যে। অপরাধ যে আমারই, তাই আমি এত শাস্তি পেলুম। তুমি শান্ত হও, অমন ক'রো না!

প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া ইন্দিরা কহিল, না না, তোমার কোন অন্যায় নেই। আমার কাছে তোমার কোন পাপ থাকতে পারে না। তুমি আমাকে এইবারটি শুধু কাছে টেনে নাও, আর কখনও আমি ভুল করব না।

কঠিন বাহুবন্ধনে তাহাকে প্রায় নিষ্পেষিত করিয়া তাহার কানের কাছে মুখ রাখিয়া চুপি চুপি সুকুমার কহিল, আমি তো টেনে নিতেই চাই গো,

তুমিই যে এতদিন কঠিন হয়ে ছিলে! কি ক'রে যে আমার দিন কেটেছে তা তুমি কোনদিন বুঝবে না।

ইন্দিরার বক্ষ তখনও কান্নার বেগে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল। সে শুধু মুখ তুলিয়া নিজেই সুকুমারের মুখে গালটা চাপিয়া দিয়া কহিল, আমি অহংকারে পাগল হয়ে গিয়েছিলুম, তুমি আমায় তখন শাস্তি দাওনি কেন?

সুকুমার কহিল, ও সব কথা এখন থাক্।

তাহার পর ফিস ফিস করিয়া কহিল, চলো আমরা কাল বাড়ি ফিরে যাই। যাবে?

ইন্দিরা কহিল, তুমি যেখানে নিয়ে যাবে সেইখানেই যাবো। আমি আর কিছু জানি না।

———

কান্তাপ্রেম

শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব-পঞ্চশতক পূর্তি স্মরণে

চৈতন্যদেবের সার্থক জীবনীকার

স্বামী সারদেশানন্দ—

পূজনীয় গোপেশ মহারাজের

করতলে—

নিবেদন

কান্তাপ্রেম প্রকাশিত হওয়ার পর অনেক ভক্ত ও সুধীপাঠক আমার কাছে নানা প্রশ্ন করে পত্র পাঠিয়েছিলেন। তার মধ্যে কিছু অধ্যাপক, শিক্ষকও আছেন। এঁদের আমি যথাসাধ্য উত্তর দিয়েছি, মধ্যে কিছুদিন অসুস্থতা নিবন্ধন অনেককে দিতে পারিনি। তবে সে সব উত্তর বইটির মধ্যেই আছে—নানাভাবে নানা পাত্রপাত্রীর মুখে। পাঠকরা দয়া করে একটু মনোযোগ দিয়ে পড়লেই তা খুঁজে পাবেন। মানুষ যেমন ঈশ্বরকে ভক্তি করে ভালবেসে পূজা করে আনন্দ রসাস্বাদ করে—ভগবানও তেমনি ভক্তের এই প্রেমপূজা আস্বাদ করে আনন্দলাভ করেন, তৃপ্ত হন—এ বিশ্বাস দীর্ঘকালের। নানা পুরাণে বা তৎ-সদৃশ গ্রন্থে কাহিনীছলে বা উপদেশের মধ্যে বলা হয়েছে। বৈষ্ণব ভক্তদের বিশ্বাস শ্রীরাধার শতবর্ষব্যাপী বিরহের ব্যথা ও আনন্দ উপভোগের জন্য শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার কান্তি ও তাঁর আকৃতি নিয়ে গৌর রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কান্তাপ্রেমের নায়কও দয়িতরূপে প্রিয়তমরূপে ঈশ্বর তথা শ্রীকৃষ্ণকে পেতে চেয়েছিলেন—তার জন্যই তাঁর জীবনপণ কঠোর সাধনা। ভগবানও এই শ্রেষ্ঠ ভক্তের সঙ্গ সাহচর্য লাভের জন্য, ভক্তকে সেবা করার আনন্দলাভের জন্যই এসেছেন, বালকরূপে—সেই সঙ্গে ওঁকে সে বিষয়ে সচেতন করার জন্যও। লেখকের এই প্রতিপাদ্য। প্রেম ভালবাসা চরমে পেঁাছলে স্ত্রীপুরুষ বা অন্য সম্পর্কে ভেদ জ্ঞান থাকে না—সবাই এক হয়ে যায়। এও তো বহুশ্রুত বহু কথিত। গ্রন্থের মধ্যেও সে কথা পরিষ্কার করা হয়েছে। পরিশেষে তাঁর কথাই স্মরণ করি—

> "যেষামহং প্রিয়, আত্মাসুতশ্চ
> সখা, গুরু, সুহৃদো দৈবমিষ্টং।" (শ্রীমদ্ভাগবত)

—লেখক

'হে জগদীশ! আমি ধন জন কবিতা বা সুন্দরী কিছুই কামনা করি না, হে ঈশ্বর তোমার প্রতি জন্মে জন্মে যেন আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে!'

—শ্রীচৈতন্য

"সুরতবর্ধনং শোকনাশনং স্মরিতবেণুনা সুষ্ঠুচুম্বিতং
ইতররাগবিস্মারনং নৃণাং বিতর বীর নস্তেঽধরামৃতম্ ॥"

[একবার মাত্র যদি সেই অধরের চুম্বন লাভ করা যাইত! যাহাকে তুমি একবার চুম্বন করিয়াছ, চিরদিন ধরিয়া তোমার জন্য তাহার পিপাসা বাড়িতে থাকে, তাহার সকল দুঃখ চলিয়া যায়, অন্যান্য সকল বিষয়ে তাহার ঈপ্সা চলিয়া যায়। কেবল তুমিই তাহার কামনা প্রীতির বস্তু থাকো।]

—শ্রীমদ্ভাগবত

"জিতেন্দ্রিয় হওয়া যায় কি রকম করে? আপনাতে মেয়ের ভাব আরোপ কর্তে হয়। আমি অনেকদিন সখীভাবে ছিলাম। মেয়েমানুষের কাপড় গয়না পরতুম, ওড়না গায়ে দিতুম। ওড়না গায়ে দিয়ে আরতি করতুম!"

"প্রেম মানে ঈশ্বরেতে এমন ভালবাসা যে জগৎ তো ভুল হয়ে যাবে, আবার নিজের দেহ যে এত প্রিয়, তা পর্যন্ত ভুল হয়ে যাবে। চৈতন্যদেবের হয়েছিল।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস

'প্রেমের অত্যদ্ভুত বিকাশ যাহা সেই বৃন্দাবনের মধুর লীলায় রূপকভাবে বর্ণিত হইয়াছে, প্রেম মদিরাপানে যে একেবারে উন্মত্ত হইয়াছে সে ব্যতীত আর কেহই তাহা বুঝিতে অক্ষম। কে সে গোপীদের প্রেমজনিত বিরহ-যন্ত্রণার ভাব বুঝিতে সমর্থ, যে প্রেম চরম আদর্শ স্বরূপ, যে প্রেম আর কিছু চাহে না, যে প্রেম স্বর্গ পর্যন্ত আকাঙ্ক্ষা করে না, যে প্রেম ইহলোকের পরলোকের কোন বস্তু কামনা করে না! আর হে বন্ধুগণ, এই গোপীপ্রেম দ্বারাই সগুণ নির্গুণ ঈশ্বরবাদের একমাত্র সামঞ্জস্য সাধন হইয়াছে।'···

—বিবেকানন্দ

॥ প্রারম্ভিক ॥

এ কাহিনী যখনকার তখন গৌড়বঙ্গের গৌরব বলতে, শিক্ষা-সংস্কৃতি-জ্ঞান চর্চার কেন্দ্রবিন্দু বলতে নবদ্বীপকেই বোঝাত। সেন বংশের সঙ্গেই হিন্দু রাজশক্তি বিলুপ্ত হয়েছে, এই নবদ্বীপের রন্ধ্রপথেই এসেছে বিদেশী মুসলমান শক্তি, ইখতিয়ার-উদ্দীন মুহম্মদ বক্তিয়ার বিনাযুদ্ধে দখল করেছেন এই গৌরবনগরী, সেই সঙ্গে প্রায় সম্পূর্ণ গৌড়বঙ্গই। গেছে তথাকথিত পাঠানরা, এসেছে মুঘলরা। গৌড়বঙ্গে দু-একটা সামান্য সাময়িক অভ্যুত্থান ছাড়া রাজ-শক্তি পুনরায়ত্ত করার কোন চেষ্টা করেন নি কেউ।

নবদ্বীপের বিদ্বজ্জনমণ্ডলী এসব নিয়ে মাথা ঘামান নি। তাঁরা জ্ঞান ও শিক্ষা-সংস্কৃতির রাজ্যবিস্তারকেই শ্রেয় বোধ করেছেন। তাঁরাও দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছেন বৈকি। তখন মিথিলা বা কাশী থেকে উপাধি না নিয়ে এলে কেউ কোন শাস্ত্রে পারঙ্গম বিবেচিত হতেন না। বাঙালী, নৈয়ায়িক রঘুনাথ মিথিলার পক্ষধর মিশ্রকে পরাজিত ক'রে—কবির ভাষায় 'পক্ষধরের পক্ষ পাতন' ক'রে সে স্বীকৃতির অধিকার নবদ্বীপে এনেছেন। নবদ্বীপের আর এক পণ্ডিত গদাধর তর্কের শক্তিতে ভুলকে নির্ভুল প্রমাণ করেছেন। তাঁর পুঁথির লিপিকার অনবধানতাবশত একটি শব্দ ভুল লিখেছিল, অপর কোন ঈর্ষী পণ্ডিত পুঁথির সেই পৃষ্ঠাটি কুকুরের গলায় বেঁধে রাস্তায় ছেড়ে দিয়ে-ছিলেন—গদাধর লিপিকারের ভুল জেনেও মাথা নত করেন নি, বিচারসভা ডেকে তর্কের দীপ্তিতে অপরের জ্ঞান আচ্ছন্ন ক'রে সে শব্দও যে ওখানে প্রযুজ্য হতে পারে তা প্রমাণ ক'রে দিয়েছেন।

এই ছিল নবদ্বীপ, পণ্ডিত আর পাণ্ডিত্যাভিমানীদের নিয়ে যেন এক পৃথক পৃথিবী রচনা ক'রে। ধরাতলের রাজশক্তি ও পরলোকের ঐশীশক্তির সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক সীমাবদ্ধ ছিল পুঁথির পাতায় আর তর্কের কোলাহলে।

তবে কি সেখানের অধিবাসীরা ঈশ্বরকে বাদ দিয়েছিলেন জীবন থেকে?

না, তা কেন? আচার অনুষ্ঠান সবই যন্ত্রবৎ পালিত হ'ত। গৃহদেবতার নিত্যপূজার কোন ত্রুটি ঘটত না। আর যেটা হ'ত—জীর্ণ রোগগ্রস্ত বৌদ্ধ-ধর্মের উত্তরাধিকার হিসেবে কিছু তথাকথিত তন্ত্রসাধনা—সাধনার নামে সুরা ও ব্যভিচারের উন্মত্ত ও উৎসব। ঈশ্বর বা ইষ্ট ছিলেন শাস্ত্রের আর তর্কের জালে আচ্ছন্ন, তাঁকে লাভ করার যেটুকু প্রচেষ্টা—তা ছিল একমাত্র জ্ঞানের মধ্য দিয়ে—তাঁকে ভালবাসার কথা কেউ ভাবত না, তাঁকে অন্তরে পাবার আকুতিও না। দু-একজন সাধুসন্ত আসতেন নবদ্বীপের গৌরবদ্যুতিতে আকৃষ্ট হয়ে—তাঁদের সেবা-যত্নের কোন অভাব ঘটত না—কিন্তু সেইখানেই সে পর্বের সমাপ্তি ঘটত।

তবু, একদা এই নবদ্বীপের জ্ঞানের পঙ্কেই সেই-প্রেম-সাধনার কমলটি বিকশিত হয়েছিল। ঈশ্বরকে যে ভালবাসা যায়, বিরহিণী নারীর মতো তাঁকে উগ্র কামনায় আকর্ষণ করা যায়, নরদেহধারীর মতো তাঁকে সেবা ক'রে তৃপ্তি ও সার্থকতা লাভ হয়—সে কথা জনৈক নবদ্বীপবাসীর কাছেই শুনল মানুষ।

কতকটা তারই কাহিনী এ। সেই এক অত্যাশ্চর্য সাধনার, সেই অবিশ্বাস্য উপলব্ধির, সেই পরম পিপাসার। তবে এ কাহিনী—কাহিনীই, উপন্যাস মাত্র। ইতিহাস নয়।

গ্রন্থারম্ভ

॥ ১ ॥

নবদ্বীপের প্রশস্ত গঙ্গার উপরে অস্তসূর্যের রক্তিমাভা-রঞ্জিত একখণ্ড মেঘের ছায়া দক্ষিণা বাতাস লেগে নদীজলের দর্পণে বার বার কেঁপে ভেঙে চূর্ণ হয়ে যাচ্ছিল। বাতাস বন্ধ হয়ে নদীজলে প্রশান্তি ফিরে এলে সে চিত্র আবার সংহত অখণ্ড রূপে ফিরে আসে কিনা, সুদূর আকাশের প্রতিচ্ছবি এই মর্ত্যের নদীতে পূর্ণরূপে দেখা দেয় কিনা—একাগ্র, বলা উচিত যেন আত্মবিস্মৃত হয়ে সেইটিই লক্ষ্য করছিলেন তরুণ অধ্যাপক বিশ্বেশ্বর আচার্য।

অন্তত তাঁর ভ্রূবদ্ধ ললাট ও নিশ্চল দৃষ্টিতে তাই মনে হয়। যেন তাঁর আর কোন কর্ম নেই, উদ্দেশ্য নেই, লক্ষ্য নেই—ঐ খণ্ড খণ্ড, ইতস্তত বিসর্পিত চূর্ণীভূত প্রতিবিম্বের পুনঃ অখণ্ড রূপ ধারণ করার উপরই তাঁর জীবনমরণ নির্ভর করছে।

আসলে বিশ্বেশ্বর তাঁর বর্তমান মানসিক অবস্থাটারই প্রতিফলন মিলিয়ে পাচ্ছিলেন—মেঘের এই ছায়াচিত্রের মধ্যে।

স্বচ্ছল ও সম্ভ্রান্ত পণ্ডিত বংশের সন্তান, উচ্চশিক্ষিত,—অবিশ্বাস্যরূপ স্বল্পসময়ে চতুষ্পাঠীর সর্বোচ্চ পরীক্ষাগুলিতে উত্তীর্ণ হয়ে গুরুর দ্বারা সর্বশাস্ত্রে পারঙ্গম বলে স্বীকৃত হয়েছেন। সুপুরুষ, কান্তিমান, স্বাস্থ্যবান—গৃহে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপিণী সুন্দরী বধূ—জীবন ঐ বর্ণোজ্জ্বল মেঘখণ্ডের অনুরূপ কৃষ্ণছায়ালেশহীন লঘুপক্ষীবিহঙ্গমের মতোই অবাধ আনন্দে আকাশে ভেসে যাওয়ার কথা। কিন্তু কেন কে জানে, কোথা থেকে এক চিন্তা-অস্থিরতা এসে অকারণেই তাঁর চিত্তকে বিক্ষিপ্ত ক'রে তুলেছে—একটা অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠেছে। সে অস্বস্তি বা অস্থিরতা খুব প্রবল বা প্রকট না হ'লেও সর্বক্ষণ-স্থায়ী—নিদ্রায়-জাগরণে, গৃহকর্মে-অধ্যাপনায়—সর্বসময়ের সঙ্গী হয়েছে, যেন তাঁর অস্তিত্বের সঙ্গেই বিজড়িত হয়ে পড়েছে।...

'বিশ্যাই!'

অকস্মাৎ এক পরিচিত কণ্ঠের এই অন্তরঙ্গ সম্বোধনে চমক ভাঙল বিশ্বেশ্বরের।

যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠলেন। একটু যেন অপ্রতিভও বোধ করলেন সেই সঙ্গে। কোন গোপন অনুষ্ঠানের মধ্যে আকস্মিক এক বহিরাগতের আগমন ঘটলে যেমন হয় তেমনিই।

যিনি ডাকলেন তিনি বিশ্বেশ্বরের সতীর্থ, অধুনা—অতি তরুণ বয়সেই—বিখ্যাত নৈয়ায়িক হিসাবে পরিচিত—রঘুবীর।

স্বপ্নের ঘোর বিদূরিত হতে বা তন্দ্রাভঙ্গে মন ও বাক্‌শক্তিকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনতে বিলম্ব হয়। বিশ্বেশ্বরেরও হ'ল। সেই সঙ্গে ভ্রূকুটি

আরও একটু ঘনীভূত হয়ে উঠল।

তাঁর নাম বিশ্বেশ্বর, সাধারণত পরিচিত বন্ধুরা ডাকেন 'বিশু' বলে—বিশাই নামটি তাঁর মাতার নিজস্ব ডাক, এ নামকে অপর কেউ উচ্ছিষ্ট করে, সর্বজনসমক্ষে তাকে সাধারণের ব্যবহার্য ক'রে তোলে—এটা রুচিকর নয় বিশ্বেশ্বরের। কিন্তু এখন তাঁর সতীর্থ ও বন্ধুরা অনেকেই এই নামে ডাকছেন। ভাল লাগে না অথচ বাধাও দিতে পারেন না—এ এক অদ্ভুত অবস্থা।

তবু, বেশীক্ষণ সে বিরক্তির চিহ্ন স্থায়ী হ'ল না। স্মিত প্রসন্ন মুখেই ডাকলেন, 'কে, রঘুবীর! এসো ভাই, এসো এসো।'

'অমন একাগ্রচিত্তে কি এত চিন্তা করছিলে?' বলতে বলতে নদীর পাড় বেয়ে নেমে আসেন রঘুবীর, 'ন্যায়ের কোন বিশেষ সূত্র? না পাণিনির কোন সূত্রের খণ্ডন-যুক্তি? তোমার তো এখন আবার বেদান্তের দিকে বেশী মন গেছে!'

'না, ওসব কিছু না!' হেসেই উত্তর দিলেন বিশ্বেশ্বর, 'মন যত নানা তুচ্ছ চিন্তায় বাসনায় বিক্ষিপ্ত হয়—ততই শরীর স্থির হয়ে সেই সব চিন্তাকে সংহত করতে চেষ্টা করে বা বিশেষ চিন্তায় নিবদ্ধ করতে চায়। সাধারণ লোকে সে নিশ্চলতাকে তন্ময়তা বলে ভুল করে, তুমি করবে কেন? তুমি পণ্ডিত, মনকে একাগ্র করা কত কঠিন—তুমি জান না?'

'তা বটে। যাক গে ওসব কচকচি। অতি মধুর দক্ষিণা বাতাস বইছে, এমন সময়ে এসব গুরুগম্ভীর আলোচনা করা অন্যায় শুধু নয়, অপরাধ। চলো, গঙ্গাগর্ভে গিয়ে একটু এই সন্ধ্যা উপভোগ করা যাক। অনুকূলের ডিঙিখানা তো ঘাটে বাঁধাই আছে, এটাই নিয়ে বেরিয়ে পড়ি এসো।'

'তারপর অনুকূল?'

'সন্ধ্যার আগে অনুকূলের দ্বিপ্রহরে নিদ্রা ভঙ্গ হয় না, তার পরেও বহুক্ষণ যায় জড়তা কাটতে—আমরা তার পূর্বেই ফিরে আসতে পারব।'

বিশ্বেশ্বর আর দ্বিরুক্তি করলেন না। 'চলো' বলে একেবারে ছোট্ট নৌকা-খানিতে উঠে বসলেন।

রঘবীর স্বাস্থ্যবান, নৌকা চালনায় তাঁর দক্ষতা সর্বজনস্বীকৃত। তিনিই দুহাতে দুটো দাঁড় বেয়ে অতি অল্পক্ষণেই নৌকাখানাকে নদীমধ্যে নিয়ে গেলেন এবং আশ্চর্য কৌশলে একখানি মাত্র দাঁড়ের সাহায্যে সেই মাঝগঙ্গাতেই নৌকো-খানাকে স্থির রাখলেন। দুদিকের ছায়া-সুনিবিড় তীরভূমির শোভা দেখা আর অপরাহ্নের বসন্ত বাতাস উপভোগ করাই তাঁর উদ্দেশ্য, এ সময়ে অতিরিক্ত পরিশ্রম ক'রে ঘর্মাক্ত হতে চান না।

দু-একটি লঘু হাস্য-পরিহাসের পর হঠাৎই রঘুবীরের লক্ষ্য পড়ল—বিশ্বেশ্বরের হাতে একখানি পুঁথি, এতক্ষণ উত্তরীয়ে আবৃত ছিল বলে দেখা যায় নি।

'ও গ্রন্থটি কি বিশাল? কার লেখা? কিসের ওপর?' সাগ্রহে সামনের

দিকে ঝুঁকে পড়ে প্রশ্ন করলেন রঘুবীর।

'ও কিছু না।' বিশ্বেশ্বর কুণ্ঠিত হয়ে পড়েন, দ্রুত পুঁথিখানির উপর উত্তরীয় টেনে দেন।

'কিছু না, তার অর্থ ? একটি বস্তুর অস্তিত্ব চোখে দেখতে পাচ্ছি—প্রত্যক্ষ সত্য—তুমি মায়াবাদীর মতো দৃষ্টিগোচর পদার্থকেও উড়িয়ে দিতে চাইছ ! না, আমার সন্দেহ হচ্ছে পুঁথিখানি তোমারই, স্বরচিত।'

অপ্রতিভের হাসি হেসে বিশাই বলেন, 'না ভাই, গঙ্গাগর্ভে মিথ্যা বলতে পারব না, তোমার অনুমান যথার্থ !'

'বা বা ! তোমার মতো অপ্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিত যখন গ্রন্থ রচনা করেছ তখন তার বিষয়বস্তুও অসামান্য নিশ্চয়। তা কোন্ শাস্ত্রে তোমার প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে ইচ্ছা হ'ল একটু জানবার সাধ জাগছে যে মনে !'

'বলতে লজ্জা বোধ করছি ভাই, তুমি এই বয়সেই দিগ্বিজয়ী নৈয়ায়িক বলে বিখ্যাত হয়েছ—যথার্থ অর্থে দিগ্বিজয়ী—সেখানে প্রবেশ করার চেষ্টা শুধু অনধিকার-চর্চা নয়,—বোধ করি ধৃষ্টতাই। এ ন্যায়েরই একটি টীকা রচনার সামান্য চেষ্টা।'

'তাই নাকি !'

অকস্মাৎ কি রঘুবীরের মুখ বিবর্ণ হয়ে ওঠে ! সূর্য বহুক্ষণ বৃক্ষবিটপীর অন্তরালে আত্মগোপন করেছেন কিন্তু তাঁর দীপ্তিভৈরব একেবারে বিলুপ্ত হয় নি, দিকচক্ররেখা থেকে উর্ধোৎক্ষিপ্ত সে রশ্মিছটা আকাশের মেঘে প্রতিফলিত হয়ে এক অপূর্ব, প্রায় অনৈসর্গিক আলোকের সৃষ্টি করেছে। কৃত্রিমও নয় অথচ স্বাভাবিকও নয় সে আলোক। তাকে আবরিত এমন কি ম্লানও করতে পারে নি সন্ধ্যাদেবীর কৃষ্ণচেলাঞ্চল।

সেই লোহিতাভ বর্ণাভায় যতটুকু দেখা যায়—বিশ্বেশ্বরের মনে হ'ল যেন রঘুবীরের স্বভাব-উজ্জ্বল মুখকান্তিকে কে ভস্মাচ্ছাদিত ক'রে দিল।...

প্রায় কয়েক পল পরে রঘুবীর স্বর খুঁজে পেলেন। কণ্ঠে অভ্যস্ত কৌতুক-প্রিয়তার আভাস আর নেই, বরং কেমন একপ্রকার মিনতির ভাবই প্রবল। অনুনয়ের ভঙ্গীতে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন, 'কি লিখেছ একটু পড়বে ? পড় না ভাই !'

'যাঃ ! তোমার কাছে আমি পড়ব ন্যায়ের গ্রন্থ !'

'বার বার ও কথা বলে কি আমাকে পরিহাস করছ !' রঘুবীরের কণ্ঠ অন্যরূপ চেষ্টা সত্ত্বেও তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে, 'কে না জানে সকল পরিচিত শাস্ত্রেই তোমার অবাধ স্বচ্ছন্দ গতিবিধি ! তুমি যদি আমাকে না শোনাও তো বুঝব আমাকে তোমার রচনার মর্মগ্রহণের যোগ্য বলে বিবেচনা করো না !'

এর পরে আর পলায়নের পথ কোথায় ? বিশ্বেশ্বরকে কতকটা অনন্যোপায় হয়েই পড়তে হয়।

আর, হয়ত মনের নিভৃত গোপনে একটু ইচ্ছাও ছিল নিজের সদ্যসমাপ্ত রচনাটি শোনাবার। নিজের শক্তি স্বীকৃত হোক, নিজের সৃষ্টি, প্রচেষ্টা যোগ্য

সমাদর ও সম্মান লাভ করুক—এ কোন্ গ্রন্থকার না চান ! এবং যে শাস্ত্রে তিনি নূতন আলোকপাত করতে চাইছেন এ গ্রন্থে—সে শাস্ত্রে রঘুবীরের তুল্য শ্রোতা বা পাঠক আর কে আছে !

তিনি বৃথা আর বাক্যব্যয় না ক'রে পুঁথির বস্ত্রবন্ধন মোচন ক'রে পাঠ আরম্ভ করলেন।

সুদ্ধমাত্র অন্যমনস্ক ভাবে একটি দণ্ড সঞ্চালন ক'রে নৌকাখানিকে একস্থানে রাখার চেষ্টা চলতে লাগল—তদ্ব্যতিরেকে কোন চাঞ্চল্য কি অস্থিরতা নেই শ্রোতার, মুখভাবেরও কোন পরিবর্তন লক্ষিত হয় না—তিনি স্থির ভাবেই বসে একাগ্র মনে শুনতে লাগলেন বিশাই পণ্ডিতের টীকা, স্বীয় মতের স্বপক্ষে তীক্ষ্ণ ও অকাট্য যুক্তি।

কোন চাঞ্চল্য নেই, বোধ করি চোখের পলকও পড়ছে না—কেবল মনের মধ্যে যে প্রবল ঝটিকাবর্তের সৃষ্টি হয়েছে তার প্রমাণ কেউ লক্ষ্য করলেই দেখতে পেত—ললাটে প্রথম স্বেদাভাস, পরে ঘর্মবিন্দুর গঠন—সে বিন্দু ক্রমে একত্রিত হয়ে জলধারায় পরিণত হচ্ছে, স্কন্ধের ও পৃষ্ঠের উত্তরীয় স্বেদার্দ্র হয়ে দেহের সঙ্গে লিপ্ত হচ্ছে ; সেই সঙ্গে মুখ বিবর্ণ থেকে বিবর্ণতর হয়ে উঠছে।

তবে রঘুবীরের সৌভাগ্যবশত, তা লক্ষ্য করার মত কেউ ছিল না।

বিশ্বেশ্বরের পাঠ আরম্ভ করার পূর্বে যে পরিমাণ সঙ্কোচ ও জড়তাই থাক না কেন—পরে আর তার চিহ্নমাত্র ছিল না। তিনি নিজের রচনার লিপিকৌশলে, যুক্তিজালের অভিনবত্বে যেন আবিষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন ; সাফল্যের তৃপ্তি ও আনন্দে উত্তেজিতও হয়ে উঠেছিলেন একটু। তিনি নূতন ক'রে অনুভব করছেন—তাঁর যুক্তি খণ্ডন করার মতো কোন প্রতিপক্ষ আর নেই।...

দিবসের আলোকচিহ্ন ম্লান হ'তে হ'তে ক্রমে অন্তর্হিত হয়। গঙ্গাবক্ষে নেমে আসে অন্ধকারের আস্তরণ। আকাশে একটি একটি ক'রে তারকার আবির্ভাব ঘটে। দুপাশের দেবালয়ে ও গৃহস্থাবাসে শঙ্খধ্বনির দ্বারা সন্ধ্যাকে স্বাগত জানানো হ'তে থাকে।

অবশ্য, শীতের কুহেলি আর নেই, বাতাস স্নিগ্ধ, বায়ু নির্মল। নির্মেঘোজ্জ্বল আকাশে তারকাগুলিকেও উজ্জ্বলতর দেখায়, তারও কিছু আলোক এসে পৌঁছয় ; প্রথম শুক্লপক্ষের এক কলা চন্দ্রও পশ্চিম আকাশে স্পষ্ট হয়ে উঠছে ক্রমশ। অর্থাৎ পরিবেশ একেবারে মসীঘন তমসাবৃত নয়।

তবে আলোর বিশেষ প্রয়োজনও ছিল না। পুঁথির পত্র একটি একটি ক'রে সরিয়ে যাচ্ছেন বিশ্বেশ্বর কিন্তু তা দেখে পড়ার কোন প্রয়োজন হচ্ছে না। এ বই তাঁর কণ্ঠস্থ। যাঁর কোন পুঁথি একবার মাত্র পাঠ করলে বা শ্রবণ করলেই তা মুখস্থ হয়ে যায়—সেইজন্যই গুরু যাঁকে 'শ্রুতিধর' আখ্যা দিয়েছিলেন—নিজের রচনা তাঁকে পুস্তকের পৃষ্ঠা দেখে পড়তে হবেই বা কেন ?

নিবিষ্টচিত্তে পাঠ ক'রে যাচ্ছিলেন বিশ্বেশ্বর, গ্রন্থ সমাপ্ত হ'তে পুনশ্চ

পুঁথি বন্ধন করতে করতে মুখ তুলে একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে প্রশ্ন করলেন, 'কেমন শুনলে বলো ? পণ্ডিত সমাজ এ গ্রন্থ গ্রহণ করবেন ?'

উত্তর দিতে সময় লাগবে, এ তো স্বাভাবিক।

অবশেষে বিশেষ চেষ্টায় রঘুবীর বলে উঠলেন, 'অপূর্ব ! অপূর্ব ! এর তুলনা নেই। বিশেশ্বর তুমি ধন্য, সত্যই তুমি পণ্ডিতচূড়ামণি। এর ওপরে কেউ যেতে পারবে না। যাওয়া সম্ভব নয়।'

কিন্তু কণ্ঠস্বরটা এমন কেন ? যেন করুণ, অতীব ব্যথাতুর ; অশ্রুবিকৃত বলে মনে হচ্ছে।

চমকিত হয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন বিশেশ্বর বন্ধুর মুখের দিকে। এতক্ষণের অন্ধকারে অভ্যস্ত দৃষ্টি সেই যৎসামান্য প্রকৃতিদত্ত আলোকেই দেখতে পেল রঘুবীরের দুই চক্ষুর কোল বেয়ে নিঃশব্দে দরবিগলিতধারে জল গড়িয়ে পড়ছে। স্বেদধারাও যথেষ্ট, তবু অক্ষিপল্লব সিক্ত ক'রে যা নেমে আসছে তা অশ্রুই, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

বিশেশ্বর ব্যস্ত ও ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।

'এ কি ভাই রঘুবীর, তোমার চোখে জল, কণ্ঠস্বর গাঢ় !...তুমি—তুমি কি দুঃখ পেলে ? কিন্তু কেন ভাই ? আমার এই গ্রন্থের বক্তব্যে ? এটি কি খুব কুলিখিত বলে মনে হ'ল তোমার ? আমি কি তবে শাস্ত্রের অমর্যাদা করেছি ? তুমি যে এইমাত্র প্রচুর প্রশংসা করলে সে কি তবে ব্যঙ্গার্থক ? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না !'

'তুমি বুঝতে পারবে না ভাই', গাঢ়স্বরে বলেন রঘুবীর, 'তুমি বিরাট, তুমি মহান। তুমি বিপুল শক্তিধর। তোমার প্রজ্ঞা-ঐশ্বর্যের সীমা নেই। আমার মতো জ্ঞান-দরিদ্রের দুঃখ তুমি অনুমানও করতে পারবে না। আমার বস্তুত এক কানাকড়ির মূলধন, তারই ভরসা ক'রে একখানি গ্রন্থ রচনা করেছি—ন্যায়দীধিতি—আমার সাধ্যমতো অবশ্য তাকে পূর্ণাঙ্গ ও ত্রুটিহীন করার চেষ্টা করেছি, বার বার দেখেছি, মার্জনা করেছি। তার ফলে আমার ধারণা হয়েছিল যে, এই একটিমাত্র গ্রন্থেই আমি অমর হয়ে থাকতে পারব। যাবচ্চন্দ্রার্কমেদিনী—যতদিন অধ্যায়ন অধ্যাপনা বা শাস্ত্রচর্চা চলবে ততদিনই ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করবে লোকে—আর ততদিনই আমার এই পুস্তক ছাত্ররা শ্রদ্ধার সঙ্গে সম্মানের সঙ্গে পাঠ করবে।...আজ তোমার এই গ্রন্থের পাঠ শুনে—'

আবারও স্বর রুদ্ধ হয়ে এল রঘুবীরের।

বিশেশ্বর বলে উঠলেন, 'তুমি, তুমি এ বিষয়ে কৃতবিদ্য শুধু নয়—ন্যায়-শাস্ত্রে পারঙ্গম—এ কথা কে না জানে। তোমার কাছে আমার মতামত অবশ্যই অর্বাচীনের ধৃষ্টতা বলে বোধ হবে—তুমি এ শাস্ত্র ভালবাস তাই এত দুঃখ পেলে—'

'বিশাই, বিশাই, তুমি কি আমার বক্তব্য এখনও বুঝতে পারো নি ! তোমার গ্রন্থের মর্মোপলব্ধির পর আমি কি প্রলাপ লিপিবদ্ধ করেছি—কী তুচ্ছ

অকিঞ্চিৎকর গ্রন্থ রচনা করেছি—তা পরিষ্কার হয়ে গেছে। তোমার এই রচনার পাশে কেন, কাছাকাছিও দাঁড়াতেও পারবে না আমার রচনা। নিজের যুক্তিকে নিজেরই অক্ষম পঙ্গু বলে বোধ হচ্ছে। যাকে কীর্তি বলে মনে হচ্ছিল আজ তাকেই অপকীর্তি বলে বুঝতে পারছি। লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছা করছে।…এতদিন ধরে যে প্রাসাদ গড়ে তুলেছি তা পাষাণ এমন কি ইষ্টকনির্মিতও নয়, নিতান্তই বালুকা দিয়ে তৈরী। অথচ এও জানি, আমি অবহেলা করি নি বিন্দুমাত্রও, এর থেকে অধিক বিদ্যা বা বুদ্ধি আমার নেই। আসলে তোমার শক্তি ও প্রতিভার পরিচয় জানা সত্ত্বেও এ প্রচেষ্টায় প্রবৃত্ত হওয়াই আমার মূর্খতা হয়েছে।'

যেন নিশ্চিন্ত হলেন বিশ্বেশ্বর। বালকের প্রচণ্ড অভিমানের তুচ্ছ কারণ অবগত হয়ে যেমন অভিভাবকরা নিশ্চিন্ত হন তেমনিই। হেসে বললেন, 'এই! এর জন্যে তুমি এত দুঃখিত হচ্ছ! তোমার ন্যায়দীধিতি অক্ষয় হোক, অমর করুক তোমাকে—আমার এ বিষয়ে প্রশংসা বা স্বীকৃতিতে কিছুমাত্র লোভ নেই!'

বলতে বলতে—গ্রন্থের আবরক বস্ত্রে গ্রন্থিবন্ধন তখন শেষ হয়ে গিয়েছিল—তিনি পুঁথিখানি বহু দূরে গঙ্গায় নিক্ষেপ করলেন। একটি মাত্র সামান্য শব্দ ক'রে এতদিনের পরিশ্রম জাহ্নবীর গর্ভে বিলীন হয়ে গেল।

'হাঁ হাঁ, করলে কি! করলে কি! এই অমূল্য গ্রন্থ—'

রঘুবীর পুঁথিটি পুনরুদ্ধার করার উদ্দেশ্যে জলে ঝাঁপ দেবার উপক্রম করছেন দেখে বিশ্বেশ্বর চোখের নিমেষে সবলে তাঁকে চেপে ধরলেন। তাঁদের সেই ধস্তাধস্তিতে ক্ষুদ্র নৌকা একদিকে হেলে প্রায় নিমজ্জিত হবার উপক্রম হচ্ছিল— রঘুবীরই তা বুঝে দক্ষ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সে বিপদ সামলে নিলেন।

'তুমি এই অমূল্য রত্ন জলে ফেলে দিলে! আমার জন্যে! ছি ছি, করলে কি?'

'ভাই, লিখেছিলাম বটে, একটু তৃপ্তিও পেয়েছিলাম, মিথ্যা বলব না। কিন্তু তোমার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হচ্ছি জানলে সে চেষ্টাও করতুম না। এ অফল শাস্ত্রের কি মূল্য—যে সে শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য প্রতিপন্ন করতে গিয়ে বন্ধুকে দুঃখ দেব! ধিক! তুমি নিশ্চিন্ত হও, এ গ্রন্থ নষ্ট করার জন্য আমার কখনই, কোন দিনই পশ্চাত্তাপ হবে না।'

'তুমি একে অফল শাস্ত্র বলছ!' রঘুবীরের কণ্ঠে একটা বক্রতা দেখা দেয়, 'তোমার মতে কোনটা সফল শাস্ত্র তা'হলে!…এতদিনের এত বিদ্বজ্জনের জ্ঞানচর্চার ফল, কত লোকের আজীবন চিন্তালব্ধ ঐশ্বর্য, অক্লান্ত পরিশ্রম অতন্দ্র গবেষণার এই বিপুল সঞ্চয়—এর কোন মূল্যই নেই তোমার কাছে!'

'রঘুবীর, তুমি অনন্যমনা হয়ে এই শাস্ত্রচর্চা করছ, একে অফল বললে তোমার আঘাত লাগবারই কথা—সেই কারণেই উত্তেজিত হয়েছ কিন্তু এসব কোন্ শাস্ত্র কোন্ জ্ঞান তোমাকে বহু দূরে চরমতম সত্যে নিয়ে যেতে পারে বলো তো! আমি এতদিন মন দিয়ে বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছি, বহু

পণ্ডিতের বহু বিতর্ক যুক্তি প্রতিযুক্তি পাঠ করেছি, হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করেছি ; তুমিই আমাকে মহাপণ্ডিত বলেছ, সর্বশাস্ত্রপারঙ্গম বলেছ, মায়াবাদীও বলেছ—হ্যাঁ, চেষ্টা করেছি বোঝার কিন্তু দেখেছি এই সব পণ্ডিতের জ্ঞান বুদ্ধি কিছুদূর পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে—চরম প্রশ্নের সত্য উত্তর দিতে পারে না। শেষ পর্যন্ত নীরন্ধ্র এক অন্ধ প্রাচীরে ধাক্কা খেয়ে থামতে হয়েছে সকলকেই, যে অন্ধকারের অপর পারে সত্যলোক আছে সে তমসাবৃত নদী পার হতে পারেন নি কেউ।'

'কি সে সত্য ?'

'সেইটেকেই তো খুঁজছি। মনে হয় এসব শাস্ত্রচর্চা কেবলই যেন কথা দিয়ে কথা কাটা—সূক্ষ্ম যুক্তিতর্কের যুদ্ধ ; এ সবই অসার। সৃষ্টির অমৃত চতুর্দিকে থরে থরে সাজানো, আনন্দের প্রস্ফুট কমল ফুটে আছে তার মধুর সম্ভার নিয়ে—সেখানে সে পদ্মের আকৃতি, গঠন, সৌরভের পরিমাণ নিয়েই তর্ক করব, সেই হিসাবে জীবন কাটাব—মধু আস্বাদ করব না !'

'সে মধু তুমি কাকে বলছ ? তোমার কিসের পিপাসা, কিসের অন্বেষণ—কোন্ সে শাশ্বত বস্তু ? এতখানি পাণ্ডিত্য আয়ত্ত ক'রেও তোমার কোন অভিমান নেই, অহঙ্কার নেই—এত বড় সম্মানকে তুচ্ছ করছ কিসের জন্যে ? কী চাও তুমি ?'

'তা জানি না।' যেন উন্মনার মত বলে ওঠেন, 'এখনও ঠিক যেন বুঝতে পারছি না। সেইটেই জানতে চাই—যা জানলে এ জীবনে আর কিছু জানার থাকে না। এক-একসময় মনে হয় এই বিপুল সৃষ্টিরহস্যকে জানাই বুঝি সেই জানা ; এর ওপরে আর কোন জ্ঞান নেই, থাকতে পারে না। আবার মনে হয় এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁর ধ্যানে কল্পনায় ইচ্ছায় সম্ভব হয়েছে তাঁকে জানার চেষ্টা না ক'রে এই সৃষ্টির মায়ারণ্যে ঘুরে বেড়াই কেন !'

'তা যদি বলো', রঘুবীর বলেন, 'সামনে বিরাট হিমবন্ত থাকতে কে আর বল্মীক স্তূপ নিয়ে মাথা ঘামায় !'

'কিন্তু তাই কি !' বিশ্বেশ্বরের ললাটে ভ্রূকুটি ঘনবদ্ধ হয়ে ওঠে, "মনে হয় ঈশ্বর কি তাঁর এই সৃষ্টির মধ্যেই প্রকট নন ! তাঁর ইচ্ছায় যা হয়েছে—তাঁর লীলা এটা—এর মধ্যেই তাঁকেও খুঁজে পাওয়া যাবে। তিনি আমার মধ্যেই অবস্থান করছেন—শাস্ত্রকাররা বলেন। তিনিই জীবাত্মা তিনিই পরমাত্মা। কিন্তু এ ছাড়াও কি তাঁর অস্তিত্ব নেই ? কেউ কেউ বলেন, তাও আছে। সে ক্ষেত্রে কি ভাবে কেমন ক'রে তাঁকে পাওয়া যাবে, তাঁকে পেয়েছি কিনা তাই বা কেমন ক'রে বুঝব !' যেন নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করেন বিশ্বেশ্বর।

'কী বলছ তুমি কিছুই বুঝি না। তোমার বক্তব্য যেন তোমার কাছেও স্পষ্ট নয় !'

'ঠিকই বলেছ ভাই। আমার মার আশঙ্কা অধিক অধ্যয়নে আমার মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটেছে। তিনি আমাকে দীক্ষা নিতে বলেন তাই। কি খুঁজছি—কোন্‌টা সেই পরম সত্য, কোন্‌টা পরম প্রাপ্তি—তা কি জানাও এত সহজ !

তা জানতে পারলে আর এত অস্থিরতা কেন, এত অশান্তিই বা কিসের !'

বলতে বলতে মৌন হয়ে যান বিশ্বেশ্বর। তারপর কিছুক্ষণ স্থির নিস্তব্ধ থাকার পর সহসাই যেন তন্দ্রাচ্ছন্নতা থেকে জাগ্রত বাস্তবে নেমে এসে বলে ওঠেন, 'নাও ভাই, এবার নৌকো ফেরাও। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ, রাত্রি এসে গেছে। গৃহ-দেবতার আরতি হ'ল না এখনও, মা নিশ্চয় অস্থির হচ্ছেন, অদৃষ্টে তিরস্কার আছে। এসব অলস চিন্তা—এর শেষ নেই। এর জন্যে কর্তব্যে ত্রুটি ঘটা উচিত নয়।'

রঘুবীর সবলে নৌকা চালনা করেন ঘাটের দিকে।

॥ ২ ॥

বিশ্বেশ্বরের জননী ইন্দ্রাণী দেবী সত্যই উদ্বিগ্ন হয়ে গৃহদ্বারে অপেক্ষা করছিলেন।

মাধবী সন্ধ্যাকৃত্য— যা তাঁর দ্বারা সম্ভব ঃ তুলসীমঞ্চ মার্জনা, সেখানে এবং ঠাকুরঘরে প্রদীপদান, গৃহদ্বারে জলসিঞ্চন, শঙ্খধ্বনি—সমস্তই সমাপন করেছেন। কিন্তু দেবসেবা তো তাঁর দ্বারা সম্ভব নয়। সে কর্তব্যে বহু বিলম্ব ঘটছে—সেজন্য তাঁরও ব্যাকুলতার অন্ত নেই, একটু দুশ্চিন্তাও যোগ হয়েছে সেই সঙ্গে। তাঁর স্বামী তো কর্তব্য বিষয়ে উদাসীন নন এমন—শ্রীশ্রীজানকী-নাথ এখনও অনর্চিত ঃ সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হতে বসেছে, তাঁর আরতি হ'ল না এখনও—বোধ করি নৈশ ভোগ নিবেদন করারও সময় পার হয়ে এল—তবু তিনি ফিরছেন না কেন ?

ইদানীং দুই বেলাই গঙ্গাতীরে গিয়ে অনেকটা সময়ক্ষেপ করছেন—এটা লক্ষ্য করেছেন মাধবী। কী যেন এক কুটিল চিন্তা অহরহ তাঁকে পীড়িত করছে—তাও বুঝতে পারেন। এ অবস্থায়—অন্যমনস্ক হয়ে স্নান করতে নেমে কোন বিপদ বাধান নি তো !

সম্ভাবনাটা মনে আসার সঙ্গে সঙ্গেই শিউরে ওঠেন তিনি।

অবশ্য তখনই মনে পড়ে—বহু চিন্তার ফল সদ্য-সমাপ্ত গ্রন্থখানিও সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছেন বিশ্বেশ্বর। হয়ত নিজেই কোথাও নির্জনে বসে পরিমার্জনা করার ইচ্ছা, কিংবা বন্ধু কেশব গুপ্তকে গিয়ে দেখাবেন বলেই নিয়ে গেছেন। সেজন্যও বিলম্ব হ'তে পারে। তবু—

না, মনের অস্থিরতা যায় না কিছুতে।

ইন্দ্রাণীর মতো মাধবীর বহির্দ্বারে যাওয়া সম্ভব নর, অগত্যা দাওয়াতেই একটি খুঁটি ধরে বিবর্ণ মুখে অপেক্ষা করছেন। প্রকাশ্যে কোন চাঞ্চল্য নেই—অন্তরে নানা আশঙ্কার উত্তাল তরঙ্গ।

ইন্দ্রাণী অকারণেই প্রদীপ হাতে দরজা পেরিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। অকারণ এই জন্য যে, বাতাসে প্রদীপ নিভে যাওয়ার মতো হবে—সে তো জানা কথাই, সেজন্য হাত দিয়ে তার শিখাকে আড়াল করতে হয়েছে। সে আলোতে

বাইরে কিছু দেখা যায় না, বিশেষত কিছু দূরের পথে দৃষ্টি কাজ করে না। বরং অন্ধকার যেন আরও ঘন বোধ হয়।

'মা!'

অতি পরিচিত মধুর গম্ভীর কণ্ঠের ডাক।

মা ও তাঁর বধূ দুজনেই চমকে উঠলেন। বধূর রোমাঞ্চ হ'ল। মা আর একটু এগিয়ে যেতে যেতে বলে উঠলেন, 'বিশাই, এলি!'

তারপর উৎকণ্ঠা দূর হ'তে উষ্মা দেখা দিল।

'দিন দিন তোর এ কি হচ্ছে বিশাই! সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে রাত্রির প্রথম প্রহরও যেতে বসেছে, জানকীনাথ আর কতক্ষণ অপেক্ষা করবেন! এতই যদি অনিচ্ছা, একজন পূজারীর ব্যবস্থাই করো না! গৃহদেবতার অর্চনায় অবহেলা করলে সেবা-অপরাধ লাগে—শুধু একজনের উপর নয়, সেবকের বংশেই। এত লেখাপড়া করেছ, এটা জানো না?'

সময়ের হিসাবে অতিশয়োক্তি নিয়ে তর্ক করার এ সময় নয়। বিশ্বেশ্বর একেবারেই দুই হাত জোড় করলেন, 'অপরাধ হয়ে গেছে মা। আর কখনও যাতে এমন না হয়—এবার থেকে তা স্মরণে রাখব।'

তারপর বহিরাঙ্গনে আসতে আসতে হেসে বললেন, 'কিন্তু মা, আমাদেরই দিন আসে, রাত্রি হয় এই মর্তের মানুষদের—জানকীনাথের দিনই বা কি, রাত্রিই বা কি? ঈশ্বর কি এ হিসাবের বাইরে নন? ব্রহ্মার পলকপাতে আমাদের বর্ষ পার হয়ে যায়—পুরাণে বলে, তাঁর একদিনে আমাদের চার যুগ, এমন বহু হিসেব বহু পুরাণকার দিয়েছেন—তাই না?'

'তাতে কি!' ইন্দ্রাণী ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন, 'আমাদের আত্মবৎ সেবা। আমরা আমাদের মতোই সেবা করব।'

'আমি তো সেই কথাই বলতে চাইছি মা! আত্মবৎ সেবা, আমরা কি প্রত্যহ প্রহর দণ্ড পল ধরে আহার নিদ্রা সারি? প্রতিদিন একই সময় তুমি আমাদের খেতে দাও? আর তাহলে আরতিই বা কেন? কই, আমরা তো গুরুজনকে আরতি করি না—ঠিক সন্ধ্যা ধরে? তাহলে জানকীনাথের সঙ্গে তোমাকেও আরতি করা উচিত আমার!'

'ঐ! আরম্ভ হয়ে গেল পাগলামি! যা দেখি—যা করতে হবে সেরে নে। ভগবানের সঙ্গে আমাদের একত্র নাম করলে অপরাধ হয়। ওসব কথা পরিহাস-ছলেও বলতে নেই।'

বিশ্বেশ্বর মার ক্রুদ্ধ—অথচ পুত্রের পাণ্ডিত্যগর্বে উদ্ভাসিত—মুখের দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে দাওয়ায় উঠে যান।

মাধবী পূর্বেই স্বামীর পট্টবস্ত্র, চীনাংশুকের উত্তরীয় প্রস্তুত রেখে-ছিলেন, সেই সঙ্গে দাওয়ারই একপ্রান্তে মার্জনা-উজ্জ্বল কাটোয়ার একটি ছোট ঘড়ায় হাত-পা ধোবার জল।

'আমি খুব ভাবছিলাম।' ঘড়া থেকে স্বামীর হাতে জল ঢেলে দিতে দিতে মৃদুকণ্ঠে বলেন মাধবী।

'কেন ?' একটু বিস্মিত হয়েই তাকান স্ত্রীর আনত মুখের দিকে।

'আপনি আজকাল যা অন্যমনস্ক হয়ে থাকেন সর্বদা! দিবারাত্রিই যেন কিসের চিন্তায় ডুবে থাকেন!...এই অবস্থায় যদি জলে নামেন—'

কথা শেষ করা যায় না। অবসিত আশঙ্কাতেও—মহাবিপদের সম্ভাবনা স্মরণে পড়ে কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে আসে।

ততক্ষণে বিশ্বেশ্বরের হাত ধোয়া শেষ হয়ে গেছে।

মাধবী নিজেই অতি প্রিয় এবং আকাঙ্ক্ষিত পা দুটি ধুয়ে অঙ্গমার্জনী দিয়ে মুছিয়ে দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন বলে তাঁর চোখের জলটা বিশাইয়ের চোখে পড়ল না, তবে সেটা তিনি অনুমান করতে পারলেন। সস্নেহকণ্ঠে বললেন, 'পাগল! আমি কি স্নানের বেশে গেছি ? আর এ সময়ে স্নান করিও তো কদাচিৎ!'

'না, তবু মন যে মানে না। তবে—' বলতে বলতেই, যে আশ্বাস ধরে এতক্ষণ মনকে শান্ত রাখার চেষ্টা করেছেন, সে তথ্যটা মনে পড়ে যায়, 'আপনার পুঁথি ?'

'সে কথা পরে বলব।' সংক্ষেপে উত্তর দেবার দায়িত্ব এড়িয়ে বিশ্বেশ্বর পুজার ঘরে গিয়ে আসনের উপর থেকে পট্টবস্ত্র তুলে নেন। এমনিতেই পুজার বহু বিলম্ব হয়ে গেছে বুঝে মাধবীও আর পীড়াপীড়ি করেন না। তা ছাড়া পণ্ডিত স্বামী সম্বন্ধে নববধূর ভীতি-মিশ্রিত সম্ভ্রমবোধ এখনও বিদূরিত হয় নি। সে অবসরও দেন নি স্বামী—একই প্রসঙ্গে তাঁর উত্তরের উপর প্রতিপ্রশ্ন করতে সাহসে কুলোয় না।

আরতি ও নিজের সান্ধ্য গায়ত্রী শেষ ক'রে বিশ্বেশ্বর ধ্যানে বসলেন।

রঘুকুলতিলক জানকীনাথের মূর্তি তাঁর সম্মুখে, তা ছাড়াও পিছনের প্রাচীরগাত্রে সীতা-রামের একটি পটও বিলম্বিত আছে। এই পটে অঙ্কিত মূর্তিটিই বিশ্বেশ্বরের বেশী পছন্দ। পটুয়া সুনিপুণ হস্তে নবদূর্বাদল-শ্যাম-কান্তি ফুটিয়ে তুলেছেন। কোন্ উপাদানে এই রঙ প্রস্তুত করেন কে জানে—ঠিক বাল্মীকিবর্ণিত বর্ণই প্রকাশ পেয়েছে। অঙ্কিত মূর্তির দৃষ্টিতে একই সঙ্গে যেন বর ও অভয় ফুটে উঠেছে। প্রসন্ন মুখে লাবণ্যর সঙ্গে দার্ঢ্য ও শক্তির এক অবর্ণনীয় মিলন ঘটেছে।

বিশ্বেশ্বর সাধারণত এই মূর্তিটিই ধ্যানে আনার চেষ্টা করেন, এক-একদিন সে প্রয়াসের একাগ্রতায় ঐ পটাঙ্কিত মূর্তি তাঁর মানসভূমিতে জীবন্ত হয়ে ওঠে। আবার কোন কোন দিন কিছুতেই সে তন্ময়তা আসে না।

আজও এল না। বহু চেষ্টাতেই সে ধ্যানমূর্তিকে ধারণায় ধরতে পারলেন না।

কেন এমন হয় ? ইদানীং যেন এই ব্যর্থতার ঘন ঘন পুনরাবৃত্তি ঘটছে। এ কী হ'ল তাঁর ?

ধ্যানে আনতে পারলেন না, সেটাই যথেষ্ট ক্ষোভের কারণ—কিন্তু তার সঙ্গে

আর একটা তীব্র অপরাধবোধের কারণও যোগ হচ্ছে এই সব দিনগুলিতে।

সে তীব্রতা বেদনায় পরিণত হয়, ধ্যান-প্রচেষ্টা বিসর্জন দিয়ে আসন পরিত্যাগ করার পরও তাঁকে পীড়ন করতে থাকে।

ভগবদ্ভক্তি চিত্তে প্রভাসিত হচ্ছে না—সেটাই যথেষ্ট অন্যায়, তাঁর মতো ব্যক্তির পক্ষে অপরাধ তো বটেই, তার সঙ্গে একটা বৃহত্তর অন্যায়—যা পাপেরই নামান্তর—তা হ'ল, সে স্থানে একটি মানুষের মূর্তিই ফুটে উঠছে। অতি সাধারণ একটি মানুষ।

কিন্তু সে মানুষটি বিশ্বেশ্বরের বড় প্রিয়।

বড় দুর্বার আকর্ষণে ওঁকে টানে ঐ মানুষটি।

ওঁর সহাধ্যায়ী কেশব গুপ্ত।

ওঁর থেকে বয়োজ্যেষ্ঠ, ভাল ছাত্র হ'লেও বিশ্বেশ্বরের মতো মেধা, শাস্ত্র-মর্মার্থ আয়ত্ত বা হৃদয়ঙ্গম করার শক্তি কি সাধ্য তাঁর নেই; অপর নির্বোধ বা স্মৃতিশক্তিহীন ছাত্র থেকে ঈষৎ উচ্চস্তরের—এই মাত্র।

এ আকর্ষণের হেতু অন্য।

শ্যামবর্ণ মানুষটি, দোহারা আকৃতি, বক্ষ ও স্কন্ধ সুগঠিত, চক্ষু দুটি আয়ত, তার দৃষ্টিতে এক অতল গভীরতা।

একদিন সহসাই মনে প্রশ্ন জেগেছিল, শ্রীরামচন্দ্র বা শ্রীকৃষ্ণ কি এই রকমই দেখতে ছিলেন না?

নিশ্চয়ই তাই—অন্তত রামায়ণে বা শ্রীমদ্ভাগবতে তো এই রকমই বর্ণনা পাওয়া যায়। নবদূর্বাদল-শ্যাম বা নবীননীরদকান্তি—কবিরা তো এই উপমাই দিয়েছেন।

ইদানীং বহুশাস্ত্র অধ্যয়ন করারপর বিশ্বেশ্বর বুঝেছেন শ্রীভগবানের ধারণার মধ্যে একটা অনতিক্রম্য অন্ধকারময় ব্যবধান আছে। মানুষের প্রজ্ঞা-অনুভূতি-অধ্যয়ন, বিচার-বিশ্লেষণ শক্তি—ঈশ্বরের চিন্তা বা তাঁকে ধারণা করার, তাঁর সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করার যতই সাধনা বা চেষ্টা করুক, সে প্রচেষ্টা যতই উগ্র যত একাগ্র হোক—কিছুদূরে গিয়ে তা যেন কোন এক নিরন্ধ্র পাষাণপ্রাচীরে প্রতিহত হয়, শেষ পর্যন্ত তা সেই পরম লক্ষ্যে, সার্থকতায় পৌঁছতে পারে না; অর্থাৎ সেই এক অদৃশ্য শক্তি যা অনাদি বা অনন্ত,—যাকে কেউ 'পুরুষ' কেউ 'প্রকৃতি' কেউ বা দুইয়ের সমন্বয় বলে বর্ণনা করেছেন, কেউ বা বলেছেন এ সকলের অতীত নিরাকার ব্রহ্ম—তার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের, রূপের—মানুষের ক্ষুদ্র ধারণার মধ্যে ধারণ করার মতো কোন আকৃতির (মানুষের) বুদ্ধিগ্রাহ্য প্রমাণ উপস্থাপিত করতে পারেন নি।

না, কোন পণ্ডিতই পারেন নি। স্বয়ং শঙ্করও পারেন নি। তাঁকেও এক জায়গায় গিয়ে বাগ্‌জাল-বিস্তারের আশ্রয় নিয়ে থামতে হয়েছে।

বহু যুক্তি, ক্ষুরধার, গভীর চিন্তাপ্রসূত বাক্য রচনা করেছেন এই সব মহান শক্তিধর মানুষরা, কিন্তু তার দ্বারা সেই অচিন্ত্য ঈশ্বর চিন্তাগ্রাহ্য হতে পারেন নি, তাঁকে প্রত্যক্ষ করাতে পারেন নি। পারেন নি তার কারণ সে সব মানুষেরই

চিন্তা, তা ঐ দেহ ও মস্তিষ্ক-কোষের মধ্যেই সীমিত। পুরুষ বা প্রকৃতি—সেও তো মানুষেরই বর্ণনা, নয় কি? তিনি তাঁর বিশাল সৃষ্টির মধ্যে, সীমাহীন অনন্তের মধ্যে ওতঃপ্রোত হয়ে আছেন, না তাঁর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে—কে বলতে পারে?

এক-একজন নিজের মতো ক'রে যুক্তিজাল দিয়ে, সে যুক্তিকে বিশ্বাস ক'রে নিশ্চিন্ত হয়েছেন বা নিশ্চিত হয়েছেন। তাঁরা সেই সিদ্ধান্তকেই বিশ্বাস করাতে চেয়েছেন—কিন্তু সে বিশ্বাসকে বিশ্বেশ্বর কিছুতেই গ্রহণ করতে পারেন নি।

মানুষ সে অনন্তকে, নিরাকারকে ধারণা করতে পারে না বলেই এক এক লোকোত্তর চরিত্রের মহান মানুষকে অবতার বা মানুষের দেহধারী ঈশ্বরের অংশ বলে ভাবতে চেয়েছে, তাঁদের পুজো ক'রে ঈশ্বর সেবার সাধ মেটাতে চেয়েছে।

সেই ভাল। সেই অনেক অনেক ভাল।

আজকাল এই কথাটাই মনে হয় ওঁর—ভগবানের এই সৃষ্টির মধ্যে তাঁর যে রূপ প্রকট, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য—তাঁর অস্তিত্বের কণামাত্র হয়ত, অণু-পরমাণু বা তার চেয়েও ক্ষুদ্র কোন ভগ্নাংশ—তার মধ্যেই তাঁকে পাবার চেষ্টা করা ভাল। আর সে সৃষ্টির মধ্যে মানুষ অপেক্ষা সার্থকতর আর কি আছে? সেই মানুষকে ভালবাসলে, তাকে পুজো, তার সেবা করতে পারলে হয়ত সকল মন-বুদ্ধি-বিচারের অতীত সেই পরমসাধ্য পরমারাধ্যকে পাওয়া যেতে পারে, সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে একদিন স্রষ্টার কাছে পৌঁছনো—এই বুঝি তাঁকে পাবার একমাত্র পথ।

তবু এই কি কেশবকে এত ভালবাসবার একমাত্র কারণ?

এইভাবে যুক্তি দিয়ে, এত বিচার-বিবেচনা ক'রে ভালবেসেছেন উনি?

কে জানে! কিছুই যেন বোঝেন না এই উদগ্র আকর্ষণের কারণ। শুধু মনে হয় ঐ অতি সাধারণ মানুষটি প্রতিদিন প্রিয় থেকে প্রিয়তর হয়ে উঠছে। যেন ওঁর মনের মধ্যেকার ইষ্টর আসনটি অধিকার করতে চাইছে। এ কী হ'ল তাঁর?

সত্যিই কি তিনি পাগল হয়ে যাবেন? যাচ্ছেন?

না হলে এসব মাথামুণ্ডু ভাবছেন কেন ইদানীং! ঐ যে যারা বলে অতিরিক্ত অধ্যয়নে আর শাস্ত্রচর্চায় তাঁর মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছে—তাদের কথাই কি তা'হলে সত্য!...

অস্থির হয়ে উঠে পড়তে যাচ্ছেন—পরিবেশ পরিস্থিতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনবহিত হয়েই—ইন্দ্রাণী দেবী নৈশভোগ বা শীতলের উপকরণ নিয়ে উপস্থিত হলেন। কখন মাধবী গঙ্গাজলে সে স্থান মার্জনা ক'রে গেছেন, তা বুঝতেও পারেন নি বিশ্বেশ্বর, এখন ইন্দ্রাণীকে ভোগ নামাতে দেখে বুঝলেন।

দুধ, ফল ও বাতাসা। এর বেশী আয়োজনের ক্ষমতা তাঁদের নেই। পণ্ডিতের বংশ তাঁদের—পাণ্ডিত্যের খ্যাতি যে পরিমাণ, আর্থিক সঙ্গতি সেই পরিমাণই স্বল্প। কোন কালেই তেমন ছিল না, এখন তো বরং আরও

কমেছে। কারণ বিশ্বেশ্বর সাংসারিক বা বৈষয়িক বিষয়ে একেবারেই উদাসীন। উত্তর-পূর্ববঙ্গে তাঁদের কিছু শিষ্য আছে, ব্রহ্মোত্তর জমিও আছে—সেখানে ঘুরে এলে কিছু প্রাপ্তি হ'তে পারে—সেই কদিনের সময়ও বিশ্বেশ্বর ক'রে উঠতে পারছেন না।...

মনে মনে জানকীনাথের কাছে মার্জনা ভিক্ষা ক'রে অনুতপ্ত বিশ্বেশ্বর পুনশ্চ আচমন ক'রে নিয়ে দেবার্চনায় মন দিলেন।

ভোগ নিবেদন—শয়ন আরতি শেষ হলে ইন্দ্রাণী প্রসাদ সরিয়ে সে স্থান মুছে নিলেন। বিশ্বেশ্বরও শয়নের মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে ঠাকুরঘরের দরজা বন্ধ ক'রে একেবারে প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ালেন।

আকাশের দিকে চেয়ে নক্ষত্রাদির অবস্থান দেখে বুঝলেন এখনও প্রথম প্রহর উত্তীর্ণ হ'তে বিলম্ব আছে। ইন্দ্রাণী দেবসেবার কাজ শেষ ক'রে এইমাত্র রন্ধন-গৃহে ঢুকেছেন। এ ভার তিনি এখনও বধূকে ছেড়ে দিতে প্রস্তুত নন। প্রথমত তাঁর ধারণা বিশাইয়ের মনোমতো ব্যঞ্জন তিনি ছাড়া কেউ রাঁধতে পারবে না; দ্বিতীয়ত বধূ এখনও বালিকা—তাকে আগুনের কাছে যেতে দেওয়া উচিত নয়। অর্থাৎ এখনও ভোজনের বহু বিলম্ব। এমনিই প্রত্যহ ঘটে থাকে। অন্যদিন এই সময়টা গ্রন্থ পাঠ বা রচনায় অতিবাহিত করেন। ইদানীং মধ্যে মধ্যেই তার অন্যথা হচ্ছে, এক-একদিন সহসাই কেশবের গৃহে চলে যান, হয়ত তাঁর কাজের ক্ষতি হয়, তা বুঝেও না গিয়ে থাকতে পারেন না।

ঘরে গিয়ে পট্টবস্ত্র ত্যাগ ক'রে সুতীর উত্তরীয়খানা কাঁধে ফেলে স্ত্রীর দিকে না চেয়েই বলেন, 'আমি একটু ঘুরে আসছি—'

'কোথা থেকে?' প্রশ্নটা যেন আপনিই বেরিয়ে যায়, 'বৈদ্য বড়ঠাকুরের বাড়ি থেকে?'

অনাত্মীয় হ'লেও—বড়ঠাকুর সম্বন্ধ পাতালে আর নাম ধরা যায় না।

বিশ্বেশ্বর ভাবেন অন্য কথা।

স্ত্রীর কণ্ঠস্বরে কি ব্যঙ্গ? না অনুযোগ?

স্বাভাবিক যে নয় তা বোঝা গেল অন্তত।

এর যে কারণ আছে তাও তিনি জানেন। বহু কথাই নিশ্চয় মাধবীর কানে এসে পৌঁছয়। এবং সে কি শ্রেণীর কথা তাও অনবগত নন বিশ্বেশ্বর।

সে জন্যেই মাধবীর কণ্ঠস্বরের তীক্ষ্ণতা বা বক্রতা লক্ষ্য করেন। আর কতকটা সে জন্যেই—সেই অশ্রুত অব্যক্ত ধিক্কারের প্রতিবাদেই বিশ্বেশ্বর সহসা রূঢ় হয়ে ওঠেন।

'হ্যাঁ, তাই যাচ্ছি! কেন? কোন বাধা আছে যেতে?'

মাধবী সে রূঢ়তায় ম্লান হয়ে যান। রৌদ্রতপ্ত পুষ্পের মতোই—শুধু মুখখানি নয়, যেন সমস্ত দেহ শুষ্ক সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে। ভীতিও বোধ করেন। নিরুত্তরে অপরাধিনীর মতো দ্রুত পাকশালার মধ্যে গিয়ে আত্মগোপন করেন।

॥ ৩ ॥

কেশবের গৃহে যাওয়ার উদ্দেশ্যেই রওনা দিয়েছিলেন, যে কথা এই মাত্র কঠিন কণ্ঠে স্ত্রীর কাছে ঘোষণা ক'রে এলেন তা মিথ্যা নয়—তবু, ঠিক তখনই, কে জানে কেন, সে দিকে গেলেন না। অথবা যেতে পারলেন না।

বহুক্ষণ অবধি পথে পথেই ঘুরলেন। পথ তখনও একেবারে জনবিরল হয় নি, দু-চারজন পরিচিত পথিক তাঁর দিকে বিস্মিত নেত্রে চেয়েও দেখলেন—কিন্তু সে সব তথ্য তখন বিশ্বেশ্বরের লক্ষ্যে পড়ার কথা নয়।

মনে বিপুল ঝড় উঠেছে। একটি নয়—একাধিক।

মাধবীর অব্যক্ত অভিযোগটা তাঁকে একটু বুঝি আঘাতও করেছে। যে বালিকা তাঁর সম্বন্ধে এখনও সম্ভ্রম-মুগ্ধ—সম্ভ্রম-সন্ত্রস্ত বললেও অন্যায় হয় না—তার কণ্ঠে ঐ, অনুযোগ কেবল নয়—অভিযোগেরও স্বর ফুটে উঠতে দেখেই বিস্মিত হয়েছেন, আহত হয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গেই আত্মচিন্তা আত্মবিশ্লেষণ আরম্ভ হয়েছে মনে মনে।

কেশব সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব যে আসক্তির পর্যায়ে পৌঁচেছে—সে বিষয়ে তিনি একেবারে অনবহিত নন।

আজকাল নিভৃতে কোন কথা চিন্তা করতে গেলে—বিশেষ সে চিন্তা ঈশ্বরে নিবদ্ধ করতে গেলে প্রায়ই একটি মানুষের—কেশবের মূর্তিই মানসপটে জেগে ওঠে। এ জন্যে কুণ্ঠা ও অপরাধ বোধের সীমা নেই, সঙ্গে সঙ্গেই সে বিষয়ে সচেতন ও সক্রিয় হয়ে ওঠেন, অন্য চিন্তায় নিবিষ্ট হতে চেষ্টা করেন। কিন্তু আবারও, ঐ একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। মনকে শাসন করেন কিন্তু আয়ত্তে আনতে পারেন না।

এক এক সময় মনে হয়, ঐ মানুষটি দিবারাত্র তাঁর সহচর বা সঙ্গী হয়ে থাকলেই তাঁর মনের ইদানীংকার শূন্যতা দূর হ'তে পারে। একান্ত ভাবে কেশব ওঁর হোন, ওঁর অন্তরের মধ্যে উনি একক, নিঃসপত্ন হয়ে বিরাজ করুন—তাহলেই হয়ত উনি শান্তি পাবেন। আর কাউকে প্রয়োজন হবে না।

আবার কখনও কখনও—প্রায় ঐ মনোভাব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই—পরিতাপের সীমা থাকে না। এ কি করছেন তিনি, ঈশ্বরের প্রাপ্য ও নির্দিষ্ট স্থানে মানুষকে বসাতে চাইছেন! ধিক!

দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেন, নবদূর্বাদলশ্যাম জানকীনাথকেই সে আসনে চির-প্রতিষ্ঠিত করবেন, অপর কারও সাধারণ সামান্য মানুষের সেখানে প্রবেশাধিকার থাকবে না।

কিন্তু পারেন না সে প্রতিজ্ঞা রাখতে।

আবারও সেই সাধারণ মানুষটিই এক দুর্বার বলে ওঁকে আকর্ষণ করেন, তার সান্নিধ্যে না গিয়েও থাকতে পারেন না।

আর গেলেই সব চিন্তা, সব বিচার-বিবেচনা-প্রতিজ্ঞা কোথায় আবেগের বন্যায় ভেসে যায়।

কেশবকে না দেখে থাকতে পারেন না, দেখেও সাধ মেটে না। আর শুধুই

কি দেখা ?

তাঁর ললাটে স্বেদকণা দেখা দিলে বিশ্বেশ্বর নিজে তালবৃন্ত দিয়ে বাতাস করেন, অপর কাউকে করতে দেন না। কোন কোন দিন দ্বিপ্রহরেই অধ্যয়ন-অধ্যাপনার চেষ্টা পরিত্যাগ ক'রে কেশবের গৃহে উপস্থিত হন। কেশবকে নিদ্রিত দেখলে তাঁকে ডাকেন না, শুধু একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন মুখের দিকে।

আবার কখনও বা আবেগ অসম্বরণীয় হ'লে গাত্রসেবা, এমন কি পদসেবা করতে যান। কেশব ব্যস্ত হন, বাধা দেন। বলেন, 'করো কি, করো কি! তুমি কি পাগল হলে!'

'কেন, তা বলছ কেন ? এতে দোষ কি ? তুমি আমার থেকে বয়সে বড় নও ?'

'তাতে কি হয়। তুমি বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, আমি বৈদ্য।'

অধীর বিশ্বেশ্বর বলেন, 'তা জানি না। তোমার সেবা করতে পারলে আমার আনন্দ হয়। আর বর্ণ সৃষ্টি হয়েছিল তো গুণ-কর্ম ভেদে, এ একটা কৃত্রিম ব্যবধান—তাই নয় কি ? তুমি তো ন্যায়-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, এটা বোঝো না ?'

এ ধরনের আবেগ হয়ত প্রাত্যহিক নয়, পূর্ণিমার জোয়ারের মতোই সাময়িক। তবু তা ঐ জোয়ারের মতোই প্রবল, উদ্দাম, ও বুঝি উন্মত্তও—তাও অস্বীকার করার উপায় নেই। এক এক সময় যখন কেশবকে দেখার ইচ্ছা অদম্য হয়ে ওঠে—তখন যেন কোন জ্ঞানই থাকে না।

কিন্তু আজকের এ ভাবান্তর অন্য দিনের সচেতনতার মতো সাময়িক অনুতাপ কি আত্মতিরস্কার নয়—আজ মন একটা প্রচণ্ড নাড়া পেয়েছে।

তবে শুধু স্ত্রীর আবারিত তিরস্কারই তার কারণ নয়।

মনে অন্য একটা চিন্তা অতিমাত্রায় বেগবান হয়ে উঠেছে। কত যে বেগবান —তা আজ এইমাত্র কিছু পূর্বে, এই সংধ্যাতেই অনুভব করলেন। বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করতে-করতেই।

ঈশ্বরকে পেতে হবে। তাঁকে ভালবাসতে হবে।

সেই ভাবেই পেতে চান উনি। ভালবেসে। যেমন ভাবে রক্তমাংসের মানুষ আর একটা মানুষকে ভালবাসে।

মনুষ্য রূপে, দেহধারী রূপে।

বেদান্তবাদীদের সিদ্ধান্তে পৌঁছনো সহজ নয়। আদৌ সম্ভব কিনা সন্দেহ। সে সিদ্ধান্ত তো শুধুই তর্কবিতর্ক, পাণ্ডিত্যের আস্ফালন। নিরাকার, নির্গুণ অনাদি ও অনন্ত ঈশ্বরকে ঠিক মনের মধ্যে কি ওঁরাই অনুভব করতে পারেন ? ঐ পণ্ডিত আর মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা ?

হয়ত পারেন কেউ কেউ। হয়ত শঙ্কর পেরেছিলেন।

কিন্তু সে কজন!

না, তাতে ওঁর মন ভরবে না। উনি চানও না সে ভাবে বুঝতে ভাবতে। উনি চান ভালোবাসতে, প্রেমময় রূপে, রক্ষাকর্তা রূপে চান। ভালবাসবেন, ভালবেসে ভালবাসা আদায় করবেন। পিতারূপে, জননীরূপে, ভার্যারূপে,

দয়িতরূপে, সন্তানরূপে—নানা রসের সরোবর রয়েছে চারিদিকে, সবগুলি ভালবাসার অমৃতে পূর্ণ—তাতে অবগাহন না করে—শুধু তা সত্য কিনা সে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা তর্কবিতর্ক কেন করতে যাবে মানুষ!

ঈশ্বরই বা কেন তাঁর সৃষ্ট মানুষের মধ্যে সেই রূপ ধরে এসে ধরা দেবেন না? তাঁরই সৃষ্টি—প্রেম, স্নেহ—যার তুল্য মধুর কিছু কল্পনা করা যায় না—যা জননীরূপে মানুষকে জীবনধারায় লালন করে, সঞ্জীবনী শক্তি দেয়; পুরুষ ও নারীর জীবনে যা এক অবর্ণনীয় সেতু রচনা করে, অনির্বচনীয় মাধুর্য এনে জীবনকে আকর্ষক, অর্থবহ ক'রে তোলে—পুরুষ থেকে পুরুষান্তরে যা সৃষ্টিকে প্রবাহিত ক'রে দেয়? মানুষের জীবনের সেই প্রেমের লীলা ও রস তিনি নিজে উপভোগ করবেন না কেন?

এ-ই ভাবেই পেতে হবে তাঁকে। তিনি পাবেনও।

এমনিই একটি পুরুষ চাই তাঁর। মহান কোন মানুষ। মহত্তর—না, মহত্তম। যাকে ভালবেসে তাঁর এ দেহ ধারণ সার্থক হবে, তিনি ধন্য হবেন। সে ভালবাসার মধ্যে কোন ফাঁক কি ফাঁকি থাকলে চলবে না, কোন খাদ তিনি মিশতে দেবেন না।

সেই নিখাদ ভালবাসার আকর্ষণে তিনি ঈশ্বরকে ধরবেন।

হ্যাঁ, ঈশ্বরকেই চাই তাঁর।

সেই তাঁর লক্ষ্য। আচারে নয়, আচরণে নয়; অনুষ্ঠান কি শাস্ত্রের কচকচিতে নয়—তর্কবিতর্কে ঈশ্বর বহু দূরে চলে যান—লক্ষ্যে পৌঁছবেন তিনি ভালবাসার পথেই।

বহু রাত্রি পর্যন্ত পথে পথে ঘুরে বেড়ালেন বিশ্বেশ্বর। গঙ্গার ধারেও গেলেন একবার। কোথাও শান্তি পেলেন না। শান্ত হ'তে পারলেন না। এ কী প্রবল অস্থিরতা, মাথার মধ্যে মনের মধ্যে এ কি আলোড়ন, এ কি প্রচণ্ড আবর্ত!

তিনি কি সত্যিই পাগল হয়ে যাচ্ছেন? যাবেনও?

হে ঈশ্বর, যদি পাগল হনই—যেন তোমার জন্যে, তোমার প্রেমে পাগল হ'তে পারেন।

অবশেষে একসময়, প্রায় প্রহরকাল উত্তীর্ণ হ'লে ক্লান্ত পা দু'টি তার অভ্যস্ত পথই ধরল। সহসাই চেয়ে দেখলেন তিনি কেশবের গৃহেই এসে পৌঁছেছেন। বিভ্রান্ত বা উদ্‌ভ্রান্ত মস্তিষ্কের কাছ থেকে কোন নির্দেশ না পেয়ে পদযুগল তাদের অভ্যস্ত পথই ধরেছে—উনি বুঝতেও পারেন নি।

না, উচিত হয় নি আর এখানে আসা, এত রাত্রে। আপন মনেই ভ্রূকুটি ক'রে যেন মনকে শাসন করেন বিশ্বেশ্বর। ইন্দ্রাণীদেবী নিশ্চয় এতক্ষণ রন্ধন-পর্ব শেষ ক'রে উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঁর অপেক্ষা করছেন।

বোধ করি ওঁরই সৌভাগ্যক্রমে কেশব তখন বাড়িতে ছিলেন না। কোথায় এক আত্মীয় অসুস্থ হয়ে পড়েছেন শুনে তাকে দেখতে গিয়েছেন—সন্ধ্যারও

কিছু পরে। অন্তত এক ক্রোশ পথ—কেশবের জননী জানালেন, ফিরতে বিলম্ব হবে। মধ্যরাত্রির পূর্বে ফিরতে পারবেন বলে মনে হয় না।

আর অপেক্ষা করার কোন কারণ নেই। ইচ্ছাও না।

বিশ্বেশ্বর কেশবের মাতৃদেবীর সঙ্গে আর অল্প দু-একটি কথা বলে নিজ গৃহের পথই ধরলেন। কথা বেশি বলতেও সাহস হচ্ছে না তখন, কি জানি—যদি অপ্রাসঙ্গিক বা পারম্পর্যহীন কিছু বলে ফেলেন!

কেশবের গৃহ থেকে ওঁর গৃহের ব্যবধান বেশি নয়, কিন্তু পথ গিয়েছে অনেকটা ঘুরে। অথচ কেশবদের বাগানের মধ্য দিয়ে গেলে ওঁদের বাড়ির পিছন দিকের বাগানে গিয়ে পড়া যায় খুব সহজে। এদিকটা জনবিরলও বটে। এত রাত্রে, এই ক্রমাগত অকারণ পথে পথে ঘোরার ফলে ক্লান্তিও বোধ করছেন—এখন আর ঘুরে যেতে ইচ্ছা হ'ল না। অন্যদিনও আলাপ-আলোচনায় রাত গভীর হয়ে এলে এই বিজন এবং সংক্ষিপ্ত পথই ধরেন।

ভালও লাগে বিশ্বেশ্বরের।

কয়েক বিঘা ভূখণ্ডব্যাপী এই বাগানটি দীর্ঘকালের। বিশাল প্রাচীন কতকগুলি বৃক্ষ চারিদিকে অনেকখানি ছায়াঘন ক'রে রেখেছে। কতকাল ধরে ওরা এইভাবে আছে কে জানে, কত পুরুষ ধরে লোকে এর সুমিষ্ট ফল খেয়ে তৃপ্ত হয়েছে। আজও এরা নীরবে বিনা প্রতিবাদে ঈশ্বরের করুণা বহনের দায়িত্ব পালন ক'রে যাচ্ছে।

এ বিশ্বাস বিশ্বেশ্বরের আবাল্য। উনি মনে করেন না—এ যেন উনি অনুভব করেন—এইখানেই তাঁর করুণা প্রত্যক্ষ। সূর্যের তাপ, চন্দ্রের আলো, নদীর সুপেয় জলের মতোই এই ফলবহ পাদপগুলি তাঁরই সৃষ্ট মানুষকে শান্তি, তৃপ্তি, স্নিগ্ধতা এনে দিচ্ছে। জীবনও।

এখানের বৃক্ষতল দিয়ে যেতে যেতে প্রায় প্রতিদিনই এই চিন্তা মনে আসে তাঁর—সঙ্গে সঙ্গে একটা অপরিসীম শান্তি বোধ করেন, ঈশ্বরের করুণাকে মাতারই স্নেহ বলে মনে হয়।

আজও তার অন্যথা হ'ল না। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, সবে চন্দ্রোদয় ঘটেছে, তবু তারই আলো এই ছায়াচ্ছন্নতার মধ্যে যেন এক বিচিত্র কারুকার্য রচনা ক'রে চলেছে, পত্রপল্লবের আন্দোলনে। তার কারণ শুধু চন্দ্রের অবস্থান পরিবর্তনই একমাত্র নয়, বাতাসও। মৃদু, খুবই মৃদু, তবু তাঁর পরিশ্রমস্বেদার্ত দেহের শ্রান্তি দূর করার পক্ষে যথেষ্ট—কিন্তু সেটা তাঁর কাছে বড় কথা নয়, সেদিকে লক্ষ্যও নেই—এই বাতাসেই শাখাপত্রগুলি হিল্লোলিত হয়ে তৃণাচ্ছন্ন ভূমির উপর আলোছায়ার আলিম্পনকে মুহূর্তে মুহূর্তে যেন নব নব রূপ এনে দিচ্ছে। তিনি সেই পরমাশ্চর্য শিল্পকর্মের মধ্যে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পীর শক্তি দেখে চলেছেন দুই চোখ ভরে।

অকস্মাৎ কিন্তু সেই জাগ্রত স্বপ্নে, সে অনন্যসাধারণ পরম সৌন্দর্যানুভূতিতে ব্যাঘাত ঘটল।

একটি শ্বেত বস্ত্রাবৃত ছায়ামূর্তি যেন পাশের বিরাট পনসবৃক্ষের ছায়া

থেকেই রূপ পরিগ্রহ ক'রে এসে তাঁর পথ রোধ ক'রে দাঁড়াল।

ভয় পাবারই কথা।

অন্য যে কেউ হলেই ভয় পেত, কিন্তু ঐ অনুভূতিটি বিশ্বেশ্বরের স্বভাবে নেই, ওঁর স্নায়ু যেন একেবারে স্বতন্ত্র ধাতুতে গঠিত। দেহী বা বিদেহী, মানুষ বা হিংস্র পশু কি সরীসৃপ—কাউকে ভয় করেন না তিনি কখনও।

যে এসেছিল সে অবশ্য বেশীক্ষণ অনুমান কি বিস্ময়-বোধের অবকাশও দিল না। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সেই তৃণপত্রাবৃত উদ্যানভূমিতে নতজানু হয়ে বসে ওঁর পায়ে প্রণাম জানাল।

সেও সাধারণ কোন প্রণাম নয়, দুটি পাদুকাহীন পায়ে মাথা রেখে বহুক্ষণ ধরে প্রণাম জানাল।

আর তাতেই—পলকপাত মাত্রে বিশ্বেশ্বর এই ছায়ামূর্তির পরিচয় পেয়ে গেলেন। এমন প্রণাম, শুধু পায়ে মাথা রেখেই নয়, ধূলিধূসর পায়ে মুখ ঘষে প্রণাম জানায় ওঁকে একটিই মাত্র প্রাণী—কেশবের বিধবা ভগ্নী, লক্ষ্মীমণি।

॥ ৪ ॥

বিশ্বেশ্বর তখনই কোন বাধা দেন না, ওকে নিরস্ত করার জন্য ব্যস্ত হন না। স্থির হয়ে থেকে লক্ষ্মীমণির এই আবেগ প্রশমিত হবার সময় দেন।

তিনি নিরতিশয় ক্লান্ত, দেহে ও মনে, দুই-ই।

চিন্তা যুক্তি আবেগের সংঘাতে কিছুটা বিভ্রান্তও। কি ঘটছে তাই যেন বুঝতে বিলম্ব হচ্ছে। তাছাড়া এমন ঘটনা এই নতুন নয়। লক্ষ্মীমণি যখনই ওঁকে প্রণাম করে তখন এই ভাবেই করে। করে সর্বসমক্ষেই। এর মধ্যে যে কোন সঙ্কোচের কারণ থাকতে পারে তা যেন ওর মাথাতেই যায় না।

লক্ষ্মীমণি বাল্যবিধবা। মাত্র পাঁচ বৎসর বয়সে সে বিধবা হয়েছে। তখন অত বোঝে নি কিছুই। শিশু কন্যার সঙ্গে শিশু পাত্রের বিবাহ হয়েছিল, মাত্র তিন-চার দিনের দেখাশুনো পরিচয়। এমন কি খেলার সাথী হয়ে ওঠারও অবসর মেলে নি।

বিবাহ মনে কোন রেখাপাত করতে না পারলেও বয়স তার কাজ করে গেছে। দেহধর্ম তার কার্যে বিরত থাকবে কেন? ফলে বয়স বেড়েছে, যৌবন পূর্ণ বিকশিত হয়ে উঠেছে। নিজের পারিবারিক গণ্ডীর মধ্যে এবং বাহিরে—সংসারের পূর্ণ চিত্র, নরনারী সম্পর্ক তার মনে বিরাট শূন্যতাবোধ, ঈর্ষা ঈপ্সাও জাগাবে এও স্বাভাবিক।

গুরুজনরা সে স্বাভাবিক বৃত্তিগুলিকে শিক্ষায় উপদেশে অবদমিত করে রাখার চেষ্টা করেছেন বৈকি। তার ফলও কিছু হয়েছে। সে নিত্যপূজায়, দীর্ঘায়িত জপে, ধর্মগ্রন্থ পাঠে—নিজের চিত্তকে স্থির রাখার চেষ্টা করেছে, করছেও। হয়তো বা সেই কারণেই অন্তরের বাসনা ও আবেগ এই ভগবৎ-চিন্তার মধ্যেই নিজ ইষ্টকে খুঁজে পেয়েছে। বিশ্বেশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা—শ্রদ্ধা কেন

—পূজার মধ্যে দিয়েই নিজের ব্যথা বেদনা অন্তরের অস্থিরতা সে নিঃশেষে নিবেদন করতে চায়। তার অন্তরালে আর কোন আবেগ কাজ করে যাচ্ছে কিনা তা ভেবে দেখে নি। সে অভিজ্ঞতা নেই বলেই ভাবে নি।

বিশ্বেশ্বর এ সমস্তই বোঝেন। তাই এই প্রণাম বা পূজা দৃষ্টিকটু হয়ে উঠলেও ওকে বাধা দেন না। আবাল্য লোক-মত ও লোক-লজ্জার ঊর্ধ্বে মানবতাবোধকেই স্থান দেন তিনি। এবং কেউ লোকলজ্জা লোকনিন্দা রীতি সংস্কার—এসবের দোহাই দিলে ক্ষুরধার অখণ্ডনীয় যুক্তিতে তাকে নীরব করে দেন।

আজও তাই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে এ পূজা গ্রহণ করলেন তিনি—এক সর্বরিক্তা তরুণীর ব্যথার পূজা, বেদনার ডালি।

অনেক, অনেকক্ষণ পরে মুখ তুলল লক্ষ্মীমণি।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল। ইতিমধ্যে সেই মুহূর্তে ক্রমোর্ধ্বগতির প্রাকৃতিক নিয়মেই চন্দ্রকিরণের একটি সঙ্কীর্ণ রেখা পনসবৃক্ষের শাখা-প্রশাখার এক অন্তরাল থেকে ওঁর মুখে এসে পড়েছিল। দৃষ্টি নিরুদ্ধ অশ্রুতে অস্পষ্ট হ'লেও ওঁর মুখের অপরিসীম ক্লান্তির ভাব ও ললাটে প্রচুর স্বেদ—লক্ষ্মীমণির লক্ষ্যে পড়তে অসুবিধা হ'ল না।

সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাকুল কণ্ঠে প্রায় যেন আর্তনাদ করে উঠল সে।

'আপনার এ কী অবস্থা প্রভু? আপনি কোথায় গিয়েছিলেন? খুব দূর পথে কোথাও? আপনি যে বিষম ক্লান্ত!'

'হ্যাঁ, সত্যিই এখন বড় ক্লান্তি বোধ করছি। দূরে কোথাও যাই নি, এইখানেই বহুক্ষণ ঘুরেছি। তবে এ কিছু না, এবার গৃহেই ফিরব, তাই এ পথ ধরেছি। সামান্য বিশ্রাম নিলেই এ ক্লান্তি দূর হবে।'

বলতে বলতেই বিশ্বেশ্বর গমনোদ্যত হলেন কিন্তু তখনই যাওয়া গেল না।

যা কখনও করে নি লক্ষ্মীমণি. এ পর্যন্ত কোন দিন করে নি—তাই করে বসল। 'সামান্য একটুখানি দয়া করুন—' বলে অকস্মাৎ নিজের অঞ্চলপ্রান্ত দিয়ে ওঁর শ্রমবারি মুছে নিতে লাগল। ললাটে হাত দিতে সাহস হ'ল না—গুরুজনদের ললাটে মস্তকে হাত দেওয়া ধৃষ্টতা, দিতে হ'লে অনুমতি নিতে হয়—সে কণ্ঠ, বক্ষ, এমন কি পৃষ্ঠদেশের ঘর্মও যতটা সম্ভব মুছে নেবার চেষ্টা করল।

আর সেই সময়ই—যেন এক অতর্কিত মুহূর্তে—এতদিনের অবরুদ্ধ আবেগ ও অতৃপ্ত তৃষার উপরকার চেষ্টাকৃত ছদ্ম-আচ্ছাদন খসে পড়ল। সহসা নির্লজ্জা ভ্রষ্টার মতো সবেগে ওঁকে দুহাতে জড়িয়ে ধরল। কঠোর সে আলিঙ্গন। মনে হ'ল বুঝি সে তার দেবতাকে পিষ্ট চূর্ণ ক'রে নিজের মধ্যে লীন করতে চায়।

হয়ত এই আকস্মিক ও অনভিপ্রেত স্পর্শে, এই প্রকারের আলিঙ্গনে বিশ্বেশ্বর শিহরিত হয়ে উঠলেন কিন্তু তাঁর আচরণে তেমন কোন ভাবই প্রকাশ পেল না। অরুচি কি বিতৃষ্ণার কোন লক্ষণই না। তিনি রূঢ় ভাবে সরিয়ে

দিলেন না, কঠোর ভাষায় তিরস্কারেও প্রবৃত্ত হলেন না—বরং পূর্ববৎ তেমনি অবিচল, তেমনি স্থির হয়েই এই ভাগ্যবঞ্চিতা মেয়েটিকে তার বহু দিনের বহু বারের অতৃপ্ত সেবার সাধ মিটিয়ে নিতে দিলেন। অবশ্য এই সামান্য সময়ে যেটুকু সম্ভব…

অকস্মিক আবেগ আবার অকস্মাৎই সম্বরিত হ'ল বৈকি!

সম্বিৎ ফিরতেই নিদারণ লজ্জা ও নিজের ঘৃণায় অস্ফুট কণ্ঠে 'ছি ছি' এই দুটি শব্দ উচ্চারণ ক'রে বাহুবন্ধন শিথিল করল লক্ষ্মীমণি। তখনই সে স্থান ত্যাগ করা উচিত, কিন্তু তাও পারল না।

ওর যে কিছুই বলা হয় নি ওর এই জীবন্ত ইষ্টকে, পুঞ্জীভূত ব্যথা নিবেদনের কার্যটাই যে অসমাপ্ত। এমন নিভৃত বিজন অবকাশ কি আর কোন দিন পাওয়া যাবে!

বিশ্বেশ্বরও ওকে পরিহার ক'রে তখনই চলে যাবার জন্য ব্যস্ত হলেন না। বরং যেন সস্নেহে—অবুঝ ভগ্নীকে যেমন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা সান্ত্বনা দেয়, সেই ভাবে—লক্ষ্মীমণির মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে মিষ্ট কণ্ঠেই বললেন, 'শান্ত হও লক্ষ্মী, তোমার দুঃখ আমি বুঝি, এ দুঃখ এই ভাবে বিদূরিত হবে না। হয় না। এ বিধাতার দেওয়া দুঃখ, অবিচার কি না জানি না—তবে তোমাকে এ সহ্য করতেই হবে। তুমি আমাকে ভালবাসো। কিন্তু এ ভালবাসা যে আমার পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয়—তাও তুমি জানো। বহু শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ বা শ্রবণ করেছ। যা ব্যর্থ হ'তে বাধ্য সে আশা বা আকাঙ্ক্ষা অন্তরে বহন করলে শুধু আঘাতই পাবে।…তুমি চেষ্টা করো এই ভালবাসা ঈশ্বরকে দিতে, প্রাণপণে চেষ্টা করলে তা পারবেও। চেষ্টার অসাধ্য কিছু নেই। প্রাণপণ ঐকান্তিক চেষ্টাই তো সাধনা। সিদ্ধি না হোক, সাধনায় মন স্থির হ'লেই শান্তি পাবে। শান্তি থেকেই সুখ। কোন ব্যর্থতার বেদনাই তখন এমনভাবে অহরহ পীড়ন করবে না।'

বহুক্ষণ থেকেই লক্ষ্মীমণির দুই চোখ থেকে লজ্জা, অনুশোচনা ও বেদনার ধারা নেমেছিল, তবু তার মধ্যেই—বোধ করি ওঁর এই সস্নেহ সপ্রশ্রয় কণ্ঠস্বরেই সাহস সঞ্চয় করল। বাষ্পবিকৃত কণ্ঠে বলল, 'তুমিই আমার ঈশ্বর, ইষ্ট। তুমিই আমার গুরু। আমি অন্য কোন ইষ্ট বা ঈশ্বর জানি না।'

'তা হয় না লক্ষ্মীমণি, ঈশ্বরের প্রাপ্য কি মানুষকে দেওয়া যায়?'

'কেন যাবে না! আমি তোমাকে সেই ভাবেই দেখি, আমার পূজা আমার ধ্যান ঈশ্বর তোমার মধ্যে দিয়েই গ্রহণ করবেন না কেন!'

'তা হয় না। মানুষকে ঠিক ঈশ্বররূপে দেখা সম্ভব নয়।'

'কেন নয়? মাটি বা পাথরের বিগ্রহকে যদি ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করা যায়—তবে মানুষকে, যে মানুষ আমার চোখে শ্রেষ্ঠ, তাকে কেন যাবে না? আমি সেই ভাবেই তাকে সেবা করব, পূজা করব না কেন? তুমিই আমার ভগবান, তুমি ছাড়া অন্য কোন ভগবানের কথা আমি ভাবতে পারি না, তুমি সেই ভাবেই আমার পূজা নাও।'

অকস্মাৎ কি একটা প্রবল আলোড়ন অনুভব করলেন বিশ্বেশ্বর ?

বেশ কিছুক্ষণ নীরবে নিমীলিত নেত্রে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর শুধু বললেন, 'তুমি এখন গৃহে যাও লক্ষ্মীমণি, আমি আজ বড়ই ক্লান্ত। মাও নিশ্চয় ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন এতক্ষণে, হয়ত নিজেই চলে আসবেন। আমি যাই।'

তিনি আর সত্যই দাঁড়ালেন না। দ্রুত গৃহের পথ ধরলেন।

খুবই পরিশ্রান্ত, এতক্ষণের পদচারণায় হয়ত ক্রোশাধিক ভূমি অতিক্রম করার কাজ হয়ে গেছে—দুই পা এবার ভেঙে আসতে চাইছে। অন্তরাবেগের সংঘাতেই আরও—যেন পর্বতপ্রমাণ অবসাদ নেমে এসেছে দেহেও। তবু সে রাত্রিতে লেশমাত্র তন্দ্রা নামল না তাঁর চোখে।

বধূ ওঁর মুখ দেখে যথেষ্ট উদ্বেগ বোধ করলেও ওঁর প্রায় উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি দেখে কোন প্রশ্ন করতে সাহস করেন নি তখন, বিশেষ জননীর অনুযোগোদ্যত রসনা সহসা স্তব্ধ হয়ে যেতে নিজের সতর্কতার একটা সমর্থন পেয়েছিলেন যেন। এমন কি উনি যে নামমাত্রই আহার করলেন—আহার্যের সামনে বসেই উঠে পড়লেন—সেজন্যও কোন প্রশ্ন করতে পারেন নি। রাত্রে শয্যায় এসেও—সেই কারণেই নির্বাক স্বামীকে কোন প্রশ্ন করেন নি, শুধু নীরবে বাতাস করে গেছেন বহুক্ষণ ধরে।

তাতেও, বিস্ময়ের ও তজ্জনিত দুশ্চিন্তার ন্যূনতা ঘটল না।

অন্য দিন এই ভাবে বাতাস করলে বিশ্বেশ্বর নিবৃত্ত করেন, জোর করে পাশে শুইয়ে দেন—ভয় দেখান, যে তাহলে তিনিও বসে বসে স্ত্রীকে ব্যজন করবেন—কিন্তু আজ সে সব কিছুই করলেন না, নীরবে স্থির হয়ে শুয়েই রইলেন, দুই চোখ চেয়েই—তবে সে দৃষ্টি বা মন কি অনুভূতি যে এখানে কোথাও নেই তাও বুঝতে অসুবিধা হ'ল না।

কারণ তাহলে কথা কইতেন, হাত থেকে পাখা টেনে নিতেন, এই অপরিসীম ক্লান্তির কারণও বিবৃত করতেন নিজেই।

তবে কি রুষ্ট হয়েছেন ওঁর প্রতি ? ঐ ইঙ্গিতটা বা অনুযোগের জন্য ?

এমন আশঙ্কাও হতে লাগল।

কিন্তু পরক্ষণেই মনে হ'ল উনি তো জননীর সঙ্গেও কোন বাক্যালাপ করেন নি, ভোজনে বসে বা তার পরেও।

অতিশয় পরিশ্রান্ত বিশেষ পথশ্রান্ত বুঝেই—শ্রমজনিত ঘর্ম অপগত হয়েছে দেখে ব্যজন রেখে মাধবী তাঁর ক্ষুদ্র কোমল হাতে পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে, একটু চাপ দিয়ে টিপেও দিতে লাগলেন। প্রথমটা খুব সন্তর্পণে, ভয়ে ভয়েই হাত দিয়েছিলেন, কারণ এই ধরনের ব্যক্তিগত সেবা নিতে খুবই আপত্তি বিশ্বেশ্বরের—বিশেষ নিতান্ত-বালিকা বধূকে দিয়ে সেবা করানোকে তিনি লজ্জাজনক বিবেচনা করেন।

হয়তো জানেন—মানসিক বা দৈহিক কোন দিক দিয়েই যখন তিনি স্ত্রীর যা

প্রাপ্য ততটা প্রেম বা মনোযোগ দিতে পারছেন না, তখন অকারণে স্বামীর প্রাপ্যই বা দাবী করবেন কেন! সে তো এক রকমের অপরাধ।

আজ কিন্তু এ সেবাতেও যেন বিশ্বেশ্বরের সচেতনতা ফিরল না। তিনি তেমনি স্থির হয়েই শুয়ে এই সেবা নিতে লাগলেন। এতে আরামই বোধ করছিলেন সম্ভবত, প্রয়োজন তো ছিলই, তাই নিজের অজ্ঞাতসারেই পাদুটি স্ত্রীর কোলের আরও কাছে সরিয়ে দিলেন—এই সেবাকার্যের মধ্যেই।

সচেতনতা ফিরল গভীর রাত্রে, যখন মাধবী শ্রান্ত হয়ে তন্দ্রায় ঢুলে পড়লেন ওঁর পায়ের ওপরই।

চমকে চেয়ে দেখে নিমেষে ঘটনাটা অনুমান ক'রে নিলেন, অনুতপ্ত চিত্তে উঠে বসে সস্নেহে ও সযত্নে নিদ্রাতুর স্ত্রীকে পাশে শুইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেবার মতো ক'রে বহুক্ষণ তার ললাটে হাত বুলিয়ে দিলেন।

কিন্তু তাঁর নিজের দুটি চোখে অপরিসীম শ্রান্তি বা এতক্ষণের দুটি কোমল হাতের স্নেহসিক্ত সশ্রদ্ধ সেবাও তন্দ্রা আনতে পারল না।...

আজ কিশোরী লক্ষ্মীমণির কথাগুলোই তাঁর মনের মধ্যে এই প্রচণ্ড তুফান তুলেছে।

এক-একবার এমনও মনে হচ্ছে, তাঁর সংশয় বা দ্বিধা নিরসনের জন্য ঈশ্বরই ঐ মেয়েটার মুখ দিয়ে ঐ কথাগুলো বলিয়েছেন।

মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরকে কল্পনা—না, কল্পনাও নয়—অনুভব করা যায়।

কোন একটি মানুষকে তীব্রভাবে, ঐকান্তিক ভাবে ভালবাসলে সে ভালবাসা ঈশ্বরই বুঝি নিজে থেকে গ্রহণ করেন।

মানুষের মধ্যে দিয়ে ভগবানকে ভালবাসা, তাঁর সেবা করা—তাঁর মহিমা তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করা অবাস্তব অসম্ভব কিছু নয়। এমন হয়, হতে পারে।

তাহলে কেশবের প্রতি তাঁর এই যে উন্মত্ত ভালবাসা—এও কি ঐ রকমই? সেই ভালবাসাই ঈশ্বরে পৌঁছতে পারে?

না, না।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই—কথাটা চিন্তায় আসা মাত্র যেন শিহরিত হয়ে ওঠেন। নিজের মনেই প্রতিবাদ ধিক্কারের আকার নেয়—না, না। ছিঃ!

কেশব সে মানুষ নয়। নিতান্তই সাধারণ সে।

ভদ্র, শিক্ষিত—কিন্তু তর্কপ্রিয়, সংশয়প্রিয়। বৈষয়িক বুদ্ধিবিশিষ্ট। প্রিয়ভাষী, প্রিয়দর্শন—কিন্তু এ সবই তো জৈবিক গুণ।

উনি যে ভালবাসেন—তাঁর মনের তীব্র আবেগ, কাউকে ভালবাসার সুতীব্র ইচ্ছা, আধার খুঁজে বেড়াচ্ছে এখনও, কেশব সেই খোঁজার পথে পড়েছে মাত্র; ক্ষণিকের ভ্রান্তিতে তাকে আধার মনে হয়েছে।

যাকে ঈশ্বর বলে কল্পনা করা যায়—তার মধ্যে অতি-মানবিক গুণ থাকা চাই। সে হবে, মহৎ নয়—এমন কি মহত্তরও নয়—মহত্তম।

লক্ষ্মীমণির শিক্ষাদীক্ষা, সংস্কার, পরিবেশ—এর মধ্যে যে ধারণা গড়ে উঠেছে

তাতে হয়ত ওঁকেই সে এ বিশ্বের সকলের চেয়ে শ্রেয় ও প্রেয় ভাবতে পারে, হয়ত তেমন কোন গুণের বিকাশ দেখে থাকবে সে, নিজের দৃষ্টির শক্তি-সীমার মধ্যে যতটা দেখা সম্ভব। কিংবা নিতান্তই জৈবিক আকর্ষণে, রূপজ মোহেই ওঁর মধ্যে সে শ্রেষ্ঠত্ব আরোপ করেছে।

অত সহজে ওঁর মন ভরবে না।

তবে কোথায় সে পাত্র? সে আধার?

ভাবতে ভাবতে এক সময় মনে হয়—জানকীনাথই তো গৃহে আছেন। তিনিও তো মনুষ্যদেহ-ধারীই ছিলেন। তাঁকে কেন ভালবাসতে পারেন না? কেন কোথায় একটা অতৃপ্তি দেখা দেয় মনে? সে কি সীতাকে ত্যাগ করেছিলেন বলে, না একটা সংস্কারের বশে শম্বুককে বধ করেছিলেন বলে, না নিজের স্বার্থের জন্য—বালিকে নিহত করেছিলেন বলে?

পুরাণকাররা, রামায়ণ-প্রণেতা অবশ্যই এ সব কাজের যুক্তি দিয়েছেন। তবু ওঁর মনে কেন সে অনুরাগ জন্মে না—তাঁকেই সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ বলে মনে হয় না?

শ্রীকৃষ্ণ আছেন।

সম্প্রতি শ্রীমদ্ভাগবত ও মহাভারত পড়ে মনে হয়েছে—কেউ কেউ যে বলেন শ্রীকৃষ্ণই পূর্ণ অবতার, অন্যান্য অবতারদের মতো খণ্ডাংশ মাত্র নন, তা একেবারে অমূলক অযুক্তিগ্রাহ্য নাও হতে পারে।

দেহধারণ করলে দেহীর দোষ গুণ কিছু—স্বভাবজ দেহজ—থাকতে বাধ্য। তবু তা সত্ত্বেও, অথবা সব জড়িয়েই, তাঁকে মহত্তর মনে হয়।

কিন্তু সে শ্রীকৃষ্ণ কৈ? কোথায় তিনি? কেমন তিনি?

কী তাঁর রূপ, কি ভাবে তাঁকে ধ্যান করবেন, ধারণায় আনবার চেষ্টা করবেন? কার মধ্য দিয়ে ভালবাসবেন? ওঁর এই সেবা-করার, মন প্রাণ আবেগ দিয়ে ভালবাসার সাধ মেটাবেন?

কিছুই স্থির হয় না। অশান্ত মন মস্তিষ্কের রুদ্ধ কারায় বৃথাই মাথা কুটে মরে।

দুই চোখ অনিদ্রায় জ্বালা করতে থাকে। হয়ত রক্তবর্ণই হয়ে উঠেছে। ললাটের দুই পাশ দপদপ করে, মাথার মধ্যে যেন যন্ত্রণা বোধ হয়। রাত্রিশেষের স্নিগ্ধতাও তাপ প্রশমন করতে পারে না। মানসিক অস্থিরতাতেই পুনঃ পুনঃ স্বেদার্ত হয়ে ওঠে দেহ।

অবশেষে একসময় দূরে পাখী ডাকার শব্দ ওঠে। প্রতিবেশী যুগল আচার্য তাঁর অভ্যাসমতো শেষ-রাত্রের স্তোত্রপাঠ আরম্ভ করেন।

অর্থাৎ ঊষা সমাগত, প্রভাতের বিলম্ব নেই।

চকিতে বিশ্বেশ্বর উঠে বসেন।

রাত্রে ঘুমের মধ্যেই কখন মাধবী ওঁর দেহে একটা হাত রেখেছিলেন, বিশ্বেশ্বর তা বুঝতে পারেন নি। এখন উনি উঠে বসতেই সে হাত স্থানচ্যুত হতে মাধবীরও ঘুম ভেঙে গেল। তিনিও সঙ্গে সঙ্গেই উঠে পড়লেন। বেশবাস

অসম্বৃত হওয়ার অবকাশ পায় নি, সুতরাং তার জন্য মুহূর্তকালও বিলম্ব ঘটল না, বিশ্বেশ্বর শয্যাত্যাগ করার পূর্বেই উনি খাট থেকে নেমে ওঁর দু পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করলেন, যেমন নিত্যই করেন।

আজ কিন্তু অন্য দিনের মতো তখনই চলে যেতে পারলেন না।

সহসাই বিশ্বেশ্বর দু হাতে স্ত্রীর দুটি হাত ধরে নিজের দিকে ঈষৎ আকর্ষণ ক'রে কতকটা যেন উদ্‌ভ্রান্তের মতো প্রশ্ন করেন, 'মাধবী, তুমি কখনও ঈশ্বরের কথা চিন্তা করেছ ? করো ?'

বেশ বিস্মিত হ'লেও বিচলিত বোধ করলেন না মাধবী, শান্ত কণ্ঠেই উত্তর দিলেন, 'করি বৈকি ! প্রত্যহই করি ! তাঁর চিন্তাতেই তো সারাদিন কাটে আমার। আপনিই যে আমার ঈশ্বর। তাই চিন্তা কি ভাবনায় তো অসুবিধা ঘটে না !'

॥ ৫ ॥

সেদিন শয়নকক্ষ থেকে বেরিয়ে এলেন বিশ্বেশ্বর অত্যন্ত লঘু বা ভারমুক্ত মন নিয়ে।

অনেকখানিই সহজ হয়ে গেছেন তিনি। এই অত্যাশ্চর্য অরুণোদয়, এই প্রভাতী স্নিগ্ধ বায়ু, নিশিগন্ধী জানা-অজানা পুষ্পের সুবাস—বহু দিন পরে তিনি যেন এ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলেন, এর নির্মল আনন্দ উপলব্ধি করলেন আবার।

দুটি অল্পবয়সী মেয়ে—বধু মাধবী তো কিশোরী মাত্র—তাঁর গুরুর কাজ করেছে।

অসংখ্য কুটিল সন্দেহের, এই কদিনের নিদারুণ অন্তরবিরুদ্ধ বেদনার অস্থিরতার নিরসন করেছে।

করেছে তাদের অকপট বিশ্বাসে, তাদের প্রেমে। আন্তরিক নির্দ্বিধা-প্রীতি ও ভালবাসার দ্বারা ঈশ্বরকে সহজে কাছে পাওয়া যায়। কোন মানুষকেও ঐকান্তিক ভাবে ভালবাসলে—যাকে শ্রেষ্ঠ মানুষ বলে মনে হয়—তার মধ্যেই ইষ্টোপলব্ধি হয়। এ যদি ওদের কাছে এত সত্য হয়—ওঁর কাছেই বা হবে না কেন ?

নিজের মধ্যে যে বিশ্বাসটা ধারণাটা অস্পষ্ট হয়ে ছিল, যাকে অবলম্বন করতে সাহস হচ্ছিল না ঠিক—সেইটেকেই ঐ স্বল্পশিক্ষিতা দুটি মেয়ে কত অনায়াসেই না অবলম্বন করেছে। নিজেদের বিশ্বাসে নিজেরা শান্তি পেয়েছে—শান্ত হয়েছে।

এই বিশ্বাসটুকুর অভাবেই কি অশান্তি ও অস্থিরতাই না অনুভব করেছেন এই গত কয়েক মাস।

জ্ঞানের পথে শাস্ত্রের পথে বিচার করলে এ বিশ্বাস হয়ত অসমসাহসিক, বা শুধু তাও নয়—ধৃষ্টতা বা মূর্খতাও।

এ কথা পণ্ডিত সমাজে উপস্থাপিত করলে—এই অত্যাশ্চর্য দৃঢ় অথচ সহজ বিশ্বাসের কথা—তিনি নিশ্চয়ই উপহাসাস্পদ হবেন। বাতুল বলবেন বিদ্বজ্জন সমাজ।

কিন্তু ঐ জ্ঞানী পণ্ডিতরাই বা কি পেয়েছেন?

বিস্তর পুঁথি পড়ে, পর্বতপ্রমাণ দুষ্প্রাপ্য দুর্লভ গ্রন্থ সংগ্রহ ক'রে—জীবনের তিন-চতুর্থাংশ তর্ক-বিচার-মীমাংসায় অতিবাহিত ক'রে কি পেলেন ওঁরা?

যশ, প্রতিষ্ঠা?

এসবই তো শূন্যগর্ভ।

কী তার মূল্য, কত দিনেরই বা।

এ সম্মান-প্রতিষ্ঠা তো প্রায় পদ্মপত্রের জল।

পেলেই সদা ভয়—ঐ বুঝি গেল, বুঝি হারালাম। ঐ বুঝি অমুক ব্যক্তি আমাকে লঙ্ঘন ক'রে অধিকতর প্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে গেল।

তাহ'লে এর মূল্য কি? কেন এর জন্য ওঁরা জীবনপাত করেন, অন্য কিছু না ভেবে, আর কারও দিকে না তাকিয়ে—যাঁর ইচ্ছায় এই বিপুল অত্যাশ্চর্য বিশ্ব সৃষ্ট হয়েছে—তাঁর কথা না ভেবে শুধু শুষ্ক জ্ঞান আহরণ ক'রে ক্ষণস্থায়ী প্রতিষ্ঠাকে আঁকড়ে ধরে থাকেন?

কে যেন বলেছেন না—প্রতিষ্ঠা শূকরী বিষ্ঠা, গৌরব রৌরব নরকসম, দম্ভপ্রকাশ সুরামত্ততার মতো।

অতি সত্য কথাই বলেছেন—যিনিই বলে থাকুন।

এই তো এ পাড়ারই বৃদ্ধ আচার্য মশাই।

বিশাই আজন্মই ওঁকে দেখছেন। আগে মধ্যে মধ্যে ওঁদের বাড়িতে যেতেন। বসে বসে কথা বলেছেন। শাস্ত্র সম্বন্ধে ওঁর ব্যাখ্যা শুনতেই যেতেন, পাঠ নেবারও চেষ্টা করেছেন কিন্তু সেদিক দিয়ে কোন শুভ ফলই লাভ হয় নি।

অথচ বিরাট পণ্ডিত। নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজ ওঁকে একদা সর্বশাস্ত্র-পারঙ্গম উপাধি দিয়ে সম্মানিত, অভিনন্দিত করেছেন।

গুরুবংশের সন্তান। ওঁর ছাত্রও যেমন অসংখ্য, তেমনি শিষ্যও অগণিত।

কিন্তু কী পেলেন উনি?

ঈশ্বরের ধারে কাছেও যেতে পারেন নি, বোধ হয় তেমন ঈপ্সাও ছিল না। সম্ভবত সে চিন্তাই করেন নি কখনও।

আগেও দেখেছেন। যখন মর্যাদার সর্বোচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠিত তখনও—মনে কোন শান্তি ছিল না।

কে পুরোপুরি ওঁর প্রাপ্য সম্মান দেয় নি; কে কার কাছে কি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করেছে; ওঁর নিজের পুত্র ওঁর চেয়ে বিদ্যায় জ্ঞানে অনেক ন্যূনতা সত্ত্বেও কেন অনেক বেশী জনপ্রিয়তা বা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, অনেক যশস্বী হয়েছে—কেবল এই নিয়ে ক্ষোভ আর অশান্তি, ঈর্ষা আর বিদ্বেষ। কটূক্তি ঈর্ষা দম্ভ—এ ছাড়া কোন সমালোচনা শোনেন নি ওঁর মুখে।

এটা চিরকালই বিস্ময়কর মনে হয়েছে বিশ্বেশ্বরের।

জীবনের সার্থকতা কি তা নিয়ে কোন চিন্তাও করেন নি কখনও। যথার্থ তৃপ্তি বা শান্তি—যা মনকে শান্ত করে, মাধুর্য এনে দেয় জীবনে—অন্বেষণ করেন নি। অভিমানেরই সেবা করে গেছেন চিরকাল, ঈর্ষার বারি নিষেকে তাকে পুষ্ট করেছেন।

জীবনসায়াহ্নে পৌঁছে তার পুরস্কারও পেয়েছেন—অপরিসীম দুর্গতি। সম্পূর্ণ অসমর্থ হয়ে পড়েছেন দেহে ও মনেও। পূর্ণ ভীমরতি প্রাপ্ত হয়েছেন। নিজের বিষ্ঠা পরমানন্দে নিজের দেহে লেপন করেন। সর্বদা আহারের চিন্তা। একবার আহারের পরমুহূর্তেই সে কথা বিস্মৃত হয়ে আহার্যের জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, না পেলে কুৎসিত গালিগালাজ করেন, স্ত্রী পুত্রবধূ সকলকে, ইতর কদর্য শব্দ ব্যবহার করেন। পাণ্ডিত্য ইতিপূর্বেই ওঁকে শান্তি দিতে পারে নি, এখনও পারছে না। উপরন্তু জীবনধারণে যেটুকু সুখের ভাগ তা থেকেও বঞ্চিত হচ্ছেন।

সযত্ন আহরিত জ্ঞান, যা প্রাণ ধরে নিজের সন্তানকেও দিতে পারেন নি সম্পূর্ণটা—এখন কোন কাজেই লাগছে না।

বিশ্বেশ্বরও কি এই ভাবেই শুষ্ক পাণ্ডিত্যের সেবা করে যাবেন সারা জীবন, মূল্যহীন অভিমানের মূলে জীবনবারি নিষেক করবেন?

'না না, হে ভগবান, এ দুর্দশা থেকে আমাকে রক্ষা করো, আমাকে তোমার কাছে টেনে নাও। তোমাকেই আমি চাই, আর আমার কোন কামনা নেই।'

মনে মনে বার বার ব্যাকুলভাবে উচ্চারণ করেন কথাগুলো।

প্রভাতের কুসুম মধ্যাহ্নের পূর্বেই মলিন ও নির্গন্ধ হয়।

বিশ্বেশ্বরের মনের শান্ত-মাধুর্যও দিবারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবের আতপ-তাপে বিগত দিনের শুষ্ক মালিকার রূপ ধারণ করে—স্বপ্নসুষমা দূর দিগন্তে বিলীন হয়।

জননী ইতিপূর্বেও মধ্যে মধ্যে মৃদু অনুযোগ করেছেন; আজ সে অনুযোগের ভাষা বড় কঠোর শোনাল। বোধ করি তিনি ধৈর্যের শেষ সীমায় এসে পৌঁচেছেন তাই অনুযোগ যেন ধিক্কারের রূপ ধারণ করল।

এর জন্য যে তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না, তা বিশ্বেশ্বরও জানেন। সে কথা কখনও তাঁর মনেও আসে নি। দেবী-সমা জননীর কোন ত্রুটির কথা চিন্তা করা সুদূর কল্পনার অতীত। এই সংসার পরিচালনার, তাদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করা—যা নাকি একান্ত ভাবে তাঁরই করণীয়—তার পূর্ণ দায়িত্ব তো ইন্দ্রাণী দেবীই বহন করছেন।

তবু মনে হ'ল আজকের এই পরমাশ্চর্য নবলব্ধ অভিজ্ঞতার প্রভাতটি তাঁকে যদি আর একটু উপলব্ধি করতে দিতেন মা।...

ইন্দ্রাণীর বক্তব্য— স্বামী গেছেন, তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রও নিরুদ্দেশ, সম্ভবত সন্ন্যাসীই হয়ে গেছে, এখন বিশ্বেশ্বরই এ গৃহের, সংসারের কর্তা। সে

আপন অধ্যয়ন অধ্যাপনা নিয়ে থাকে—তাঁর আপত্তি নেই—কিন্তু সংসারটা চলে কিসে—সে চিন্তায় যদি দিনের এক দণ্ড মাত্র সময়ও সে দিত, তো আজ তাঁকে এমন বিপন্ন হ'তে হ'ত না। এও তো তাঁর অবশ্যকর্তব্যের মধ্যে। নয় কি ?

অধ্যাপনার জন্য কোন পারিশ্রমিক নেওয়ার রীতি নেই, অধিকন্তু ছাত্রদের গৃহে রেখে পালন করাই অধ্যাপকদের কর্তব্য বলে গণ্য। সে সামর্থ্য তাঁদের নেই বলে, স্বামী দেবদেব মিশ্র যথেষ্ট আত্মগ্লানি ভোগ ক'রে গেছেন চিরদিন। তবু তাঁদের যা সামান্য জমিজমা আছে ব্রহ্মত্র হিসাবে পাওয়া—তা ঠিকমতো দেখাশুনো করলেও দুবেলা জানকীনাথের সেবা—সাড়ম্বরে না হোক—নিয়মরক্ষার মতো চলে যেতে পারে।

কিন্তু সেটুকু সময় দেবার মতো সামর্থ্য বা অভিরুচি বিশ্বেশ্বরের নেই। তিনি স্ত্রীলোক—তিনি কি করবেন, কতখানি করবেন ?

অনেকে বলেন, এত অল্প বয়সে অধিক বিদ্যার্জনের ফলেই সে এমন একটা অদ্ভুত মানুষ হয়ে গেছে—পার্থিব জীবন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন, নিরাসক্ত। শুধু তাই নয়, সর্বদাই যেন অন্যমনস্ক, কী যেন এক গভীর চিন্তায় মগ্ন। এধারে গৃহে অন্নাভাব তো বটেই, সংস্কারের অভাবে বাসকক্ষগুলির অবস্থা ক্রমশ বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ বৎসর চালে নূতন খড় না দিতে পারলে আগামী বর্ষায় নিজেদের তো বটেই স্বয়ং গৃহদেবতাকেও রক্ষা করা যাবে না। তাঁর শয্যাও বৃষ্টির জলে সিক্ত ও কর্দমাক্ত হবে। মাথার উপর চাল বা দেওয়াল খসে পড়াও বিচিত্র নয়।

এক কথায় আশু বিস্তর অর্থের প্রয়োজন। এখন জমিজমায় মন দিলেও সে পরিমাণ অর্থ কিন্তু এ বছরেই উঠবে না। সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় হচ্ছে একবার দেশে যাওয়া। সেখানেও কিছু ব্রহ্মত্র জমি আছে, যে সব প্রজা বা চাষী সে জমি ভোগ করে তারা বেশির ভাগই সজ্জন, ওঁরা যে কেউ গেলেই তারা অর্থে বা শস্যে ওঁদের প্রাপ্য শোধ দেবে। এ ছাড়া ওদিকে ওঁদের কিছু মন্ত্রশিষ্যও আছেন, তাঁরা গুরুর বার্ষিক প্রণামী মুদ্রা ও বস্ত্র তুলে রেখে দেন, কেউ গেলেই স্বেচ্ছায় সাগ্রহে এনে পৌঁছে দেবেন। সেও যথেষ্ট।

দেশে যাওয়ার আরও একটা বিশেষ কারণ আছে। সেটা এতদিন বিশ্বেশ্বর শোনেন নি, আজ প্রথম শুনলেন।

সেখানে বিশ্বেশ্বরের পিতামহী এখনও জীবিত আছেন। অতিবৃদ্ধা হয়ে পড়েছেন, তবু তাঁর জ্ঞান বুদ্ধি অটুট আছে, একথা সে দেশাগত বহু লোকের মুখেই শুনেছেন ইন্দ্রাণী দেবী।

তাঁরই একটি আদেশ এবং ইন্দ্রাণীর প্রতিশ্রুতি আজও পালন করা হয় নি।

দেবদেব শেষ যেবার দেশে যান—এখান থেকে বহুদূর, বঙ্গদেশের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে সে দেশ—সেবার ইন্দ্রাণী দেবীও সঙ্গে ছিলেন। তিনি একদা স্বপ্ন দেখেন যেন এক জ্যোতির্পিণ্ড তাঁর গর্ভে প্রবেশ করেছে। সে স্বপ্নের বিবরণ শুনে প্রাচীনারা মন্তব্য করেন নিশ্চয় কোন মহাপুরুষ ইন্দ্রাণীর সন্তান

রূপে জন্মগ্রহণ করেছেন।

দৈবক্রমে এর কিছুদিনের মধ্যেই ইন্দ্রাণীর গর্ভ লক্ষণ প্রকাশ পায়। তখন দেবদেব নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তনের সব আয়োজন সম্পূর্ণ করেছেন—তখন আর বিলম্ব করা যায় না, তিনি অন্তর্বত্নী স্ত্রীকে নিয়েই যাত্রা করলেন। দেবদেবের জননী, বিশ্বেশ্বরের পিতামহী বিশেষ বাধা না দিলেও বধূকে বলে দেন, 'এই যে ছেলে আসছে তোমার ঘরে, ছেলেই আসবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস—তাকে একবার দেখিয়ে নিয়ে যেও।'

ইন্দ্রাণী বলেছিলেন, 'যদি ছেলে হয়, অবশ্য সে এসে আপনাকে প্রণাম ক'রে যাবে।'

এ বৃত্তান্ত আগেও কিছু কিছু শুনেছেন, তবে অত কান দেন নি। এমন অবশ্যকরণীয় বলেও বোধ হয় নি। আজ সে ইতিহাস সম্পূর্ণ বিবৃত ক'রে ইন্দ্রাণী বললেন, 'তুমি যদি এখনও একবার না যাও, তোমার মহাগুরুর আদেশ অমান্য করা হবে। আমিও প্রত্যবায়ভাগী হবো।'

এর পর জননীর আদেশ পালনের জন্য প্রস্তুত হওয়া ভিন্ন উপায় থাকে না। পরমার্থের চিন্তা-বিলাস ত্যাগ ক'রে অর্থের চিন্তাকেই প্রাধান্য দিতে হয়।

এ কদিনের আবেগ ও আজ রাত্রিশেষের আলোকোজ্জ্বল স্বপ্ন প্রদোষের দূর দিগন্তে বিলীন হয়ে যায়।—

তখনকার দিনে বিদেশ ভ্রমণ—দেশ এখন ওঁর কাছে বিদেশেরই তুল্য—আদৌ সহজ ছিল না। পদব্রজে, নতুবা জলপথ থাকলে নৌকার ব্যবহার, এই ছিল বিদেশ যাতায়াতের উপায়। নৌকায় ভ্রমণ সাধারণের সাধ্যর অতীত, বেশ কিছু অর্থের প্রয়োজন। তবে সেটা নিরাপদ, পায়ে হাঁটা পথে দস্যু তস্করের ভয় আছে, প্রতারক সর্বকালেই ছিল, পরেও থাকবে, আর তারা কাছাকাছিই থাকে। পথ ভুল হতে পারে। অভিজ্ঞ মাঝিরা শুধু পথই চেনে না, কোন্ স্থানে বিশ্রাম বা আহারের ব্যবস্থা নিরাপদ, কোন্ স্থানে নয়—তাও তাদের নখদর্পণে। তাছাড়া মালপত্র সঙ্গে নেওয়ার থাকলেও, নৌকাই সুবিধা। পায়ে-হাঁটা পথে সে এক বিড়ম্বনা, হয় নিজেকে বহন করতে হয়, নচেৎ একজন বাহক নিতে হয় সঙ্গে—সে যথেষ্ট ব্যয়বহুল।

সব দিক বিবেচনা ক'রে বিশ্বেশ্বর নৌকাযোগে যাওয়াই স্থির করলেন। তিনি দূরদেশে যাচ্ছেন শুনে তাঁর বিত্তবান শ্বশুর তাঁর নিজস্ব নৌকা ও দাঁড়ি মাঝি দিলেন, সঙ্গে একজন সেবকও।

প্রথমটা বিশ্বেশ্বর বা ইন্দ্রাণী এ আনুকূল্য গ্রহণ করতে চান নি, কিন্তু মাধবীর পিতা এসে করজোড়ে এটুকু ভিক্ষা চাইতে আর 'না' বলতে পারলেন না।

আর একটা প্রয়োজনও ছিল। ওঁর কাছ থেকে না নিলে ঋণ নিতে হয়। বহু ধনী ব্যক্তিই বিশ্বেশ্বরকে সেবার সুযোগ পেলে কৃতার্থ হতেন—কিন্তু সে

সহায়তা গ্রহণ ওঁর পক্ষে অস্বস্তিকর। অথচ সব দিক দিয়েই নৌকা নেওয়া শ্রেয়। রন্ধনের তৈজস ও কিছু কিছু খাদ্যও সঙ্গে নেওয়া উচিত। বিশ্বেশ্বর সঙ্গে জানকীনাথের পটখানি নিলেন—পথে যখন নিজেকেই রন্ধন ক'রে খেতে হবে তখন সেখানেই ভোগ নিবেদন করবেন। সে দিক দিয়ে সুপ্রশস্ত নৌকা পেয়ে সুবিধাই হ'ল। বিশেষ আসার পথে বহু সংগৃহীত দ্রব্য থাকবে এই আশাতেই যাচ্ছেন, সেগুলির স্থান সংকুলানের ব্যবস্থাও রাখা দরকার।...

যাত্রার পূর্বরাত্রে, অকল্যাণের ভয়ে সংযমের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও মাধবী মিলন-ক্ষণে অশ্রু সম্বরণ করতে পারবেন না—এ স্বাভাবিক। বিশ্বেশ্বরও এ জন্য প্রস্তুতই ছিলেন, কারণ তিনি শুধুই গ্রন্থকীট নন, অনায়াসে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গেই মেলমেশা করেন, সব্জী-বিক্রেতা হাটুরিয়াদের সঙ্গেও তাঁর প্রগাঢ় সখ্য—সুতরাং তাঁর এই বয়সেই মানবচরিত্র সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা।

তিনি আদরে আশ্বাসে বালিকাবধূকে সান্ত্বনা দিতেও ত্রুটি করলেন না। মাধবীও বহু চেষ্টায় অশ্রু সম্বরণ ক'রে পরমবাঞ্ছিত বক্ষ ও বাহুর খাঁজে মুখ গুঁজে লজ্জা ও বাষ্প-জড়িত কণ্ঠে বললেন, 'আমার কেবলই কেমন ভয় হচ্ছে, আপনি আমার থেকে বহু দূরে চলে যাচ্ছেন।'

'আরে পাগল, তা তো যাচ্ছিই। তবে সে আর কতদিন? যাতায়াতে মাস ছয় বড় জোর। তার মধ্যে অবশ্যই ফিরে আসব, তোমাদের এ ভাবে ফেলে রেখে গিয়ে বেশী দিন থাকব না। আমার ছাত্ররাও তো এই যাত্রার সংবাদে তোমার মতোই কাতর হয়ে পড়েছে।'

এবার মুখ তুললেন মাধবী, 'না, সে দূরে যাওয়ার কথা বলছি না।'

'তবে?' বিস্মিত বিশ্বেশ্বর প্রশ্ন করেন।

তবু দ্বিধা যায় না, রাজ্যের সঙ্কোচ এসে কণ্ঠরোধ করে।

অতিকষ্টে, বেশ কিছুক্ষণ পরে বলেন, 'কেমন যেন মনে হচ্ছে আপনি অনেক অনেক বড় হয়ে যাবেন—তখন আমি আর নাগাল পাব না। আপনি তখন বহুলোকের নাথ হয়ে যাবেন, আমি সামান্য দাসীর একজনও হয়ত হ'তে পারব না।...আর এই যেন তার পূর্বাভাস। আপনি যেন সেকালের রাজাদের মতো কোন্ দিগ্বিজয়ে যাচ্ছেন,—যে রাজ্য জয় ক'রে ফিরবেন সেখানে আমার স্থান হবে না।'

'তোমার কি আশঙ্কা আমি আর গুটিকতক বিবাহ ক'রে ফিরব?'

'না না, তাতে আমার ভয় নেই। সপত্নীদের সঙ্গে হলেও আপনার সেবা করতে পারলেই কৃতার্থ হবো।'

'তবে?'

'তবে কি, তা আমি বোঝাতে পারব না। নিজেই ঠিক যেন বুঝতে পারছি না।'

এই বলে তিনি আবারও ওঁর দেহে মুখ গুঁজে দিলেন।

বিশ্বেশ্বরও আর কথা বাড়ালেন না।

ঠিক এই ধরনের একটা অস্পষ্ট আভাস, ভবিষ্যতের ছায়া কি তাঁর মনেও দেখা দেয় নি!

কি, তা তিনিই কি জানেন!

শুধু তার অস্থিরতা, আকারহীনতা ও অনিশ্চয়তা অনুভব ক'রে অস্বস্তি বোধ করেন।...

তিনি মৌখিক সান্ত্বনার পথ বর্জন ক'রে প্রেমের পথই গ্রহণ করলেন। বধূকে সবেগে ও সবলে বক্ষে আকর্ষণ ক'রে আলিঙ্গন নিবিড়তর করলেন।

সেই পরমসুন্দর দেহের স্বেদ নিজের দেহের স্বেদে মিলিত হচ্ছে সেই একান্ত ঈপ্সিত বক্ষের স্পন্দন নিজের আবেগ-আশঙ্কা-কামনায় আন্দোলিত স্পন্দনে অনুভব করতে পারছেন—এই অত্যাশ্চর্য অভিজ্ঞতায় মাধবী তখনকার মতো আর সব কিছুই ভুলে গেলেন।

প্রেম ও ঐকান্তিক আত্মনিবেদনের এই মধুরতম প্রকাশে বিশ্বেশ্বরও এক-প্রকার শান্তি ও আনন্দ অনুভব ক'রে থাকবেন নিশ্চয়। ঐ অবশিষ্ট রাত্রিটুকুর বিস্ময়কর ও অবর্ণনীয় অভিজ্ঞতার স্মৃতি রাত্রিশেষেও তাঁর মনে মধুরতম সঙ্গীতের রেশ-এর মতো অনির্বচনীয় মাধুর্য জাগিয়ে রাখবে এটাই স্বাভাবিক —কিন্তু প্রত্যূষে আর একটি বিচিত্রতর অভিজ্ঞতা বিশ্বেশ্বরকে আবারও অস্থির ও অন্যমনস্ক ক'রে তুলল।

এর কোন সঙ্গত অর্থ তাঁর হৃদয়ঙ্গম হ'ল না। শুধু বিস্ময়, বিস্ময়—আর কী এক দুর্বার আবেগ।

শয্যাত্যাগের সময়—যাত্রার পূর্বে আর এ ধরনের নিভৃত অন্তরঙ্গ সাক্ষাৎ সম্ভব হবে না বুঝে—শেষবারের মতো, আরও আশ্বস্ত করার জন্যই বধূকে চুম্বন করতে গিছলেন—

শিয়রে পূর্বদিকের জানলা দিয়ে এখনও অদৃশ্য অরুণের আবির্ভাবদ্যোতক দ্যুতির একটা আভা তখন এসে পড়েছে মাধবীর মুখে। অকস্মাৎ বিশ্বেশ্বরের মনে হ'ল এ মুখ যেন কোন অতিবাঞ্ছিত, আকাঙ্ক্ষিত পরমসুন্দর কোন পুরুষের, সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল এ তাঁর স্বামীর, তিনি যেন এর স্ত্রী। তিনি এর দাসী, সেবিকা, প্রেমিকা—পরম দয়িতকে চুম্বন করতে গেলে দেহে যেমন পুলক শিহরন জাগে, যেমন সমস্ত শরীর হর্ষকণ্টকিত হয় ক্ষণেকের জন্য—হয়ত এক লহমা—তেমনি হ'ল। স্থান কাল পাত্র, তিনি কি ও কে—সব বিস্মৃত হয়ে কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়লেন।

কয়েক পলক মাত্র স্থায়ী এ অনুভূতি।

কিন্তু বড় আশ্চর্য যে! বড় আশ্চর্য!

সে আনন্দ-অনুভূতি সুমিষ্ট-সঙ্গীতের স্মৃতির মতো আবেগের সৃষ্টি করল না —তাঁকে দীর্ঘকাল উন্মনা ও উদ্বিগ্ন ক'রে রাখল।

এ কী হ'ল!

তিনি কি ক্রমে উন্মাদই হয়ে যাচ্ছেন?

তবু এই অসম্ভব ও অবাস্তব অনুভূতিটিও যে বড় মধুর, অমৃতময়—তাও তো অস্বীকার করতে পারছেন না।

॥ ৬ ॥

মাধবী যা বলেছিলেন, তার একটা কথা সত্যই মিলে গেল।

এ যাত্রা যেন বিশ্বেশ্বরের দিগ্বিজয় যাত্রা।

তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি যে এত দূর অবধি প্রচারিত হয়েছে, এভাবে ছড়িয়ে পড়েছে—সে সম্বন্ধে বিশ্বেশ্বরের ধারণা মাত্র ছিল না।

নৌকায় ভ্রমণ করলে গঞ্জেবাজারে মধ্যে মধ্যে নৌকা রাখতে হয়। দাঁড়ি মাঝিদের বিশ্রাম তো প্রয়োজনই—প্রয়োজন রন্ধনদ্রব্যাদি সংগ্রহও।

তবে সে তো এক প্রহর বা এক বেলার কাজ। মূল রন্ধনকার্য বা পূজা ভোগ নিবেদনের জন্য অপেক্ষাকৃত জনবিরল স্থানই বাঞ্ছনীয়। তেমন স্থান নদীর দু পাড়েই অজস্র। একটি ছায়ানিবিড় পরিচ্ছন্ন বৃক্ষতল দেখে কাছাকাছি নৌকা ভেড়ালেই চলে।

কিন্তু বিশ্বেশ্বরের এই ভ্রমণযাত্রায় জনপদের কোথাও তিনি একবেলা বা একদিনে অব্যাহতি পেলেন না। কোথা থেকে কেমন ক'রে যে তাঁর আগমনবার্তা প্রচারিত হয়, তা বোঝা যায় না, দেখতে দেখতে বহু দর্শনপ্রার্থীর সমাগম ঘটে। বড় গণ্ডগ্রাম কি শহরে তো কথাই নেই—সম্ভ্রান্ত সম্পন্ন ব্যক্তিরা এসে করজোড়ে তাঁকে নিজেদের গৃহে পদার্পণের আহ্বান জানান; স্থানীয় প্রধান প্রবীণ পণ্ডিতরা সকৌতূহলে বয়সে নবীন বিদ্যায় প্রবীণ এই অত্যাশ্চর্য প্রায় কিশোর অধ্যাপককে দেখতে এসে তাঁর সবিনয় বাক্য ও সুমধুর ব্যবহারে মুগ্ধ ও আশ্বস্ত হয়ে সাগ্রহে আমন্ত্রণ জানান স্থানীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর সঙ্গে পরিচয় ও বিচার—অন্যথায় আলাপ আলোচনা ক'রে যাওয়ার জন্য। সৎব্রাহ্মণ-গৃহে আহারের নিমন্ত্রণও গ্রহণ করতে হয়—সেখানেই নিজের গৃহদেবতাকে ভোগ নিবেদন করার সম্পূর্ণ সুযোগ পাবেন, এই প্রতিশ্রুতি পেয়ে। তাঁদের দীনতা ও সনির্বন্ধ অনুরোধ এড়াতে পারেন না।

আর, এই প্রসঙ্গে কাল-প্রথানুযায়ী বিচারবিতর্ক অন্তে 'বিদায়' বা সম্মান-মর্যাদাও গ্রহণ করতে হয়। সাধ্যানুযায়ী স্থানীয় সম্পন্ন ব্যক্তিরা বস্ত্র, অর্থ, ভোজ্য এবং ধাতুপাত্র প্রভৃতি নিবেদন ক'রে যেন ধন্য কৃতার্থ হন।···

যাতায়াত দুদিকের পথেই এই ঘটনা ঘটেছে। সর্বত্র। এতে—এই প্রীতি ও শ্রদ্ধার প্রকাশে সুখী ও আনন্দিত হয়েছেন বিশ্বেশ্বর। তাঁর বিরাট নৌকা এই সব অর্ঘ্যে ভরে উঠেছে। তবে তিনি সব কিছু সঞ্চয় করেন নি—এক স্থানের বোঝা অন্য স্থানে নামিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন; দরিদ্র অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বিতরণ করেছেন অকাতরে। কেবল স্বল্পবিত্ত ভক্তদের আন্তরিক পূজা হিসাবে যেগুলি নিবেদন বলে বুঝেছেন, সেগুলি আর্থিক মূল্য হিসাবে সামান্য হলেও সযত্নে রক্ষা করেছেন।

দেশে পৌঁছেও জ্ঞাতি ও চাষী প্রজাদের বহু দ্রব্য উপহার দিয়েছেন। অবশ্য সে জন্য স্থান পূর্ণ হতেও বিলম্ব ঘটে নি। বৃদ্ধা পিতামহীর প্রায় শেষ অবস্থা—এতদিন তিনি যে তপস্যার মতো ক'রে আকুল হৃদয়ে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাসের 'মহাপুরুষ' পৌত্রটির জন্য বুক দিয়ে তাঁর প্রাপ্য সম্পত্তি ও তৈজস-

দ্রব্যাদি পাহারা দিয়ে রেখেছেন—এখন তা সব উজাড় ক'রে দিতে চাইলেন।

ব্যাকুল বিব্রত বিশ্বেশ্বর তাঁকে বোঝাতে পারেন না যে, এত বোঝা কোন-মতেই একটা নৌকায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়—তা সে যতবড় নৌকাই হোক। আর এখান থেকে অন্য নৌকা সঙ্গে নিলে তাদের আসা যাওয়ার ব্যয়ভার বহন ক'রে কোন লাভ হবে না।

কিন্তু শুধু তিনিই তো নন—জ্ঞাতিরা, প্রজারা সকলেই যেন তাঁকে দিতে ব্যগ্র, ব্যস্ত। এত প্রীতি, এমন আন্তরিকতায় তিনি বিহ্বল হয়ে পড়েন। বিশেষ প্রবীণ খ্যাতনামা পণ্ডিতরা যখন তাঁর সঙ্গে বিতর্কে বিচারে রত হয়ে একসময় পরাজয় স্বীকার ক'রে নমস্কার জানাতে আসেন তখন তাঁর সঙ্কোচের অন্ত থাকে না। তিনি পূর্বে প্রণাম ক'রে তাঁদের নিরস্ত করেন।

চারিদিক থেকেই এমনি ক'রে প্রাচুর্য বর্ষিত হতে থাকে—সাধারণ মানুষ হলে তার তৃপ্তির পাত্র উছলে উঠত। সাময়িক ভাবে বিশ্বেশ্বরও যে তৃপ্ত হন না, তাও নয়। তবু কোথায় একটা অতৃপ্তি বোধ করেন তিনি।

পার্থিব প্রাপ্য যত কিছু পাওয়া সম্ভব সবই পেলেন এ যাত্রায়, আর্থিক দুর্গতির যে সঙ্কট দেখা দিয়েছিল, তার অনেকটাই লাঘব হ'ল। গৃহসংস্কার, জানকীনাথের একটি মন্দির নির্মাণ, নূতন শীতবস্ত্রের ব্যবস্থা—কোনটারই আর অসুবিধা হ'ল না। প্রাচুর্য না হোক প্রয়োজন মিটেছে—এতেই ইন্দ্রাণী তৃপ্ত। আর স্বামী নিরাপদে ফিরে এসেছেন, অধিকতর সুস্বাস্থ্য নিয়ে, তাঁকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছে, এককালের নিরতিশয় শুষ্ক ম্লান মুখে যেন জ্যোতি ফুটে উঠেছে—তাতে মাধবীও আনন্দিত।

কিন্তু বিশ্বেশ্বর?

তিনি কেন কিছুতেই তৃপ্তি পান না আর।

আবারও সেই পূর্বের অস্থিরতা ও অতৃপ্তি তাঁকে পেয়ে বসে কেন?

যতদিন দেশভ্রমণের উত্তেজনা ছিল, সম্মানের বিভ্রান্তিকর দীপ্তি ছিল ততদিন এ শূন্যতা অতৃপ্তি এতটা বুঝতে পারেন নি। রাত্রিদিন বহুলোকের মধ্যে থেকে চিন্তারও খুব অবসর পান নি বলেই বোধ হয়। বিশেষ এ ভ্রমণে শুধুই তো সম্মান ও মর্যাদা কুড়িয়ে বেড়ান নি—যে সব দেশ গ্রাম পরগণা চাক্‌লার মধ্যে দিয়ে গেছেন, যেখানে যেখানে দু-একদিন থেকে যেতে হয়েছে—যতটা সম্ভব সে সব স্থানের অধিবাসীদের সঙ্গেও মিশেছেন, তাদের অবস্থা অসুবিধা—অভাব অভিযোগ শুনেছেন, বোঝার চেষ্টা করেছেন, তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা ক'রে তাদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে একটা অন্তরঙ্গ চিত্র পাবার চেষ্টা করেছেন।

এতে দুঃখই পেয়েছেন বেশী। কারণ যে সামগ্রিক চিত্র তাঁর মানসপটে অঙ্কিত হয়ে গেল তা আদৌ উজ্জ্বল নয়। পাঠান মুঘলে রাজ্য অধিকার নিয়ে নিত্য সংঘর্ষ, ভুঁইয়াদের প্রায় চিরন্তন বিবাদ—এসবের যাবতীয় কুফল নিরীহ গৃহস্থদেরই ভোগ করতে হয় সবচেয়ে বেশী। পাইক বা সিপাহীরা যা তন্‌খা

পায়—প্রায়ই পায় না সেটুকুও—তাতে তাদের পরিবারের ভরণপোষণ চলে না। অথচ তারা জীবন বিপন্ন করতে আসে পরিবার পালনের উপায় করতেই। সুতরাং লুঠতরাজের দ্বারাই জীবিকা সংস্থান করতে হয়; আর, সেই সঙ্গে যদি কিছু সম্ভোগের উপকরণও সংগ্রহ করে—যা ব্যবহার ক'রে চলে যায়—তো খুব দোষ দেওয়া যায় না।

এ রীতি তো আবহমান কাল থেকেই চলে আসছে। বিশ্বেশ্বর যতদূর শুনেছেন জেনেছেন—ভারতের বাহিরে পূর্ব-পশ্চিমের সুদূর দেশগুলিতেও এই একই রীতি প্রচলিত। বিজয়ী সৈন্যদেরই যে শুধু লুণ্ঠনের অধিকার তাও নয়—পরাজিত ছত্রভঙ্গ পলায়নপর বাহিনীও, খাদ্য তো বটেই ভবিষ্যতের জন্য অর্থ, অভাবে গৃহস্থদের ধাতুপাত্র পুরনারীদের অলঙ্কারাদিও হস্তগত করার চেষ্টা করে।

এ রীতি এমন কি মহাভারতের সময়ও ছিল।

নতুবা কুরুক্ষেত্র মহাসমরের শেষ দিনে দুর্যোধনের পতনের পরই বিজয়ী লুণ্ঠনরত সেনাদের আক্রমণ থেকে সদ্য বিধবা কৌরব পুরনারীদের রক্ষা করতে যুধিষ্ঠির ত্রস্তেব্যস্তে স্বয়ং পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকেই বা পাঠাবেন কেন? অথচ সে রাত্রে শ্রীকৃষ্ণ সেখানে উপস্থিত থাকলে অশ্বত্থামা ঐ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সুযোগ পেত না।

এই নিত্য দুর্যোগের মধ্যে উৎকণ্ঠা লাঞ্ছনার ভিতর তথাকথিত শাস্ত্রপ্রবক্তা-রাও কম অত্যাচার করছেন না। একদিকে বিধবাদের নানা বিধিনিষেধের নিগড়ে আবদ্ধ রেখে অকারণে উপবাসের ব্যবস্থা ক'রে কৃশ ও অবাঞ্ছনীয় ক'রে তোলার চেষ্টা করছেন যেমন; অন্যদিকে সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে বা অনিচ্ছাতেও সামান্যতম বিধর্মী সংস্পর্শ হলেও, এমন কি তাদের ছায়া স্পর্শ করলেও—হিন্দুদের জাতিচ্যুত করার ব্যবস্থা দিচ্ছেন। ফলে সেই সব জাতিচ্যুতদের অন্য ধর্ম গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না, অনেক বিধবাও কুলত্যাগ ক'রে চলে যান বিধর্মীদের বিবাহ ক'রে সংসারের সাধ মিটোতে। এইসব লোকগুলো যদি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ঐ তথাকথিত জাতিরক্ষকদের উপর অত্যাচার করে তো তাদের খুব দোষ দেওয়া যায় কি?

আরও অনেক সমস্যা চোখে পড়ল বিশ্বেশ্বরের। ধর্মাচরণের নামে এক-শ্রেণীর ভ্রষ্ট বা ছদ্ম বৌদ্ধরা ব্যভিচার ও সুরাপানের যেন এক স্রোত প্রবাহিত করেছেন দেশের সকল বর্ণের মধ্যেই। তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের নামে তন্ত্রশাস্ত্রকে কলুষিত করছেন।

এসব দেখে ব্যথিত বোধ করবেন বৈকি।

সেও তাঁর উন্মনাভাবের অস্থিরতার একটা কারণ। যতই হোক, শুধু নিজের কথাই চিন্তা ক'রে নিজের মনের গভীরে ডুবে থাকা তাঁর স্বভাব নয়। অনেক পড়াশুনো করেছেন, দেশ ও জাতির প্রতি কিছু কর্তব্য আছে সে বিষয়ে তিনি অবহিত। শুধু তাই বা কেন, পৃথিবীর অপরাপর দেশের মানুষের কথাও ভেবে দেখেছেন তিনি। সকলেই সদ্য-বর্তমানের তুচ্ছাতিতুচ্ছ প্রাপ্য সুখ

দুঃখ হতাশা নিয়ে অহরহ কলহ বিবাদে মত্ত। যে প্রতিষ্ঠার কোন মূল্য নেই—যাকে সাধু ব্যক্তিরা শূকরী বিষ্ঠার সঙ্গে তুলনা করেছেন—তারই জন্য উন্মত্ত, দিবারাত্রি ঈর্ষার আগুনে দগ্ধ হচ্ছে; নিজের ক্ষমতা ও সম্ভোগের লালসায় লক্ষ লক্ষ প্রাণনাশ করতেও কেউ পশ্চাদ্‌পদ নয়।

এদের সম্বন্ধে চিন্তা করলে সহজেই যে কথাটা মনে আসে—উন্মার্গগামী ভ্রষ্ট সন্তান, যারা পিতার কথা চিন্তা করে না, অথচ পৈতৃক সম্পদই যাদের উপজীব্য। এরাও তেমনি সকল প্রাণীর যিনি পিতা সেই ভগবানের কথা কেউ স্মরণ করে না, তাঁকে প্রাণের মধ্যে ধারণ করা তো কঠিন—যা সহজ, তাঁকে ভালও বাসে না কেউ। মানুষ যেন ভালবাসতেই ভুলে গেছে। অপর মানুষকেই কি যথার্থ ভালবাসে? স্ত্রী স্বামীকে কিম্বা স্বামী স্ত্রীকে? মাও কি সন্তানকে ভালবাসে? নিঃস্বার্থ ভাবে, আত্মবিসর্জন দিয়ে? সে দু-একজন মাত্র হয়তো পাওয়া যাবে—লক্ষ মানুষের মধ্যে। নইলে ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে নিজের পথে চলতে গেলে মা বাবা তিক্ত হয়ে ওঠেন কেন? একই স্বামী বহুবিবাহ করেন, স্ত্রীরা স্বামীর মৃত্যুতে নিজের কি অবস্থা হবে, সেই চিন্তা করেই আকুল হন।

অথচ ঈশ্বরের নাম ক'রেই কত না হানাহানি! অপর ধর্মাবলম্বীরাও যে সব আচার অনুষ্ঠান করে—নিত্যকৃত্য, সেও তো ঈশ্বরকেই লক্ষ্য ক'রে। হয়ত অন্য নামে, অন্য অনুষ্ঠানে—কিন্তু তাতে কি এসে যায়? তবে একজন আর একজনকে এত ঘৃণা করবে কেন, এত বিদ্বেষের চোখে দেখবে কেন, তাদের হনন করতে চেষ্টা করবে কেন? এ নিজেদের বুদ্ধির অহংকার ভিন্ন আর কিছু নয়—তারা যা ভেবেছে সত্য, তাই সকলকে মানতে হবে, যারা মানবে না, তাদের জোর ক'রে মানাবে। মূর্খ এরা, একবার নিজেদের সংসারের দিকে চাইলেই তো বুঝতে পারে সে মূর্খতা। তাদের সব সন্তান একরকম হয় না, এক পথে চলে না, তবু তারা ভাইবোন, একই মাতাপিতার সন্তান, তাই নয় কি!

মনের মধ্যে এই প্রশ্নগুলি যতই উত্থিত হতে থাকে—ততই বোঝেন ভালবাসার পথ ছাড়া অন্য কোন পন্থাই নেই মানুষের।

ভালবাসা ও বিশ্বাস। পূর্ণ নির্ভরতা, পূর্ণ বিশ্বাস। ঐ মেয়ে দুটির মতো সরল অথচ অটল বিশ্বাস, আর অখণ্ড ভালবাসা। নিখাদ নিঃস্বার্থ ভালবাসা।

এই ভালবাসাতেই ঈশ্বরকে পাওয়া যেতে পারে। একমাত্র এই উপায়।

তাঁর জন্যেই তাঁকে ভালবাসা। কোন স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে নয়, কোন প্রাপ্যর আশায় নয়। এমন কি নিজেকে রক্ষা করার জন্যও নয়।

কোন ঐহিক সুযোগ সুবিধার কথা মনে থাকলে সে ভালবাসা মনে জাগবে না। অর্থ, প্রতিষ্ঠা, ক্ষমতা,—নিজের রোগমুক্তি বা দীর্ঘ আয়ুর জন্য তাঁকে ভালবাসলে সে ভালবাসা ঈশ্বরের কাছে পৌঁছবে না। ঈশ্বরকে ডাকলে কি ভালবাসলে (তারা যাকে ভালবাসা ভাবে) এসব যারা ভাবে তারা নিজেদেরই

প্রতারিত করে। কোনো পিতামাতা—সন্তান নিজ স্বার্থের জন্য তাঁদের তোষামোদ করছে, ভক্তিভালবাসার ভান করছে দেখলে সুখী হ'তে পারেন ?

না, তাঁর জন্যই তাঁকে ভালবাসতে হবে, নিজের দেহ, মন, অস্তিত্ব সমস্ত বিলোপ ক'রে দিয়ে সকল চিন্তাভাবনা ভালবাসা তাঁর মধ্যে বিলীন করতে হবে, একাত্ম হতে হবে।

সে-ই পরিপূর্ণ শান্তি। তিনিই প্রাণের আনন্দ, আত্মার আরাম। তিনিই সুখ, তিনিই আশা।

এই ভাব মনে আসাই বুঝি পরম ও চরম পাওয়া, যার বেশী আর কোন প্রাপ্য আশা তো দূরের কথা—কল্পনা বা চিহ্নিত নির্দিষ্ট করাও যায় না।

কিন্তু সে ভালবাসা কি অনন্ত আকাশ, এই অগণিত গ্রহনক্ষত্রযুক্ত বিশ্ব বর্ণনাতীত ধারণাতীত, অনন্ত স্বরূপ, যাকে পণ্ডিতরা নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ অখণ্ড ব্রহ্ম বলেছেন—তাকে অবলম্বন ক'রে বিকশিত হওয়া সম্ভব! যে অস্তিত্বকে কিছুতেই মনে বা মস্তিষ্কে ধারণা করা যায় না—শুধু একের পর এক বিশেষণ দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেন ঋষিরা—তাকে ভালবাসা যায় ? মন প্রাণ আকাঙ্ক্ষা বাসনা কামনা দিয়ে তাকে অর্চনা করা যায়, আবেগ দিয়ে তাকে আকর্ষণ করা যায় !

তা যায় না বলেই মানুষ মূর্তি গড়ে পূজা করতে চায়, বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুকে, গোষ্পদজলের মধ্যে আকাশকে ধরতে চায়। কেউ মূর্তি পূজা করে, কেউ প্রস্তর-খণ্ডকে তাঁর প্রতিনিধি ভাবে, কেউ বা বিশেষ আকৃতির কাষ্ঠখণ্ডকে তাঁর প্রতীক কল্পনা করে। বরং এ সবের থেকে মূর্তিকে পূজা করা আরও সহজ।

তবে তাতেই কি তাঁকে ভালবাসা যায় ?

ভালবাসে কি মানুষ ? ভালবাসতে পারে ?

কে জানে, কেউ হয়ত পারে।

যুগে যুগে এক-আধজন এমন মহাপুরুষ জন্ম নেন যাঁদের দ্বারা এই অসাধ্যও সাধিত হয়।

বিশ্বেশ্বর অন্য কথা ভাবেন।

মনে হয় একটি পরিচিত কাউকে, তাকে না দেখলেও ক্ষতি নেই—অবলম্বন ক'রে তাঁকে এই ভাবে আত্মলোপ ক'রে—সুখদুঃখ দেহ সব লোপ ক'রে ভালবাসতে পারলে সে ভালবাসা একদিন সেই পরম অস্তিত্ব, পরম শক্তির কাছে পৌঁছতে পারে—যাঁকে ভিন্ন ভিন্ন নামে ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ার দ্বারা পাবার চেষ্টা করে, পূজা করে। হয়ত ভালবাসছে ভেবে আত্মপ্রতারণা করে। কেউ হয়ত চেষ্টাও করে।

শুনেছেন, কঠোর তপস্যার দ্বারা পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন প্রান্তে, বিভিন্ন মতাবলম্বীর কোন কোন সাধুসন্ত, মুনিঋষিরা নিজেদের সেই ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম ক'রে দিয়েছেন। যাকে হিন্দুরা বলেন নির্বিকল্প সমাধি।

হয়ত তা পারা যায়। কিন্তু সে তপস্যা বড় কঠিন, বড় কঠোরও।

তাতে মাধুর্য কোথায় ? এ জীবন, এ দেহ কি ভগবান সৃষ্টি করেছেন শুষ্ক কঠিন তপস্যার দ্বারা ক্ষয় করতে, নষ্ট করতে ?

না, তা হ'তে পারে না।

এই সুন্দরী শ্যামা বসুন্ধরা—তার ফুল ফল রূপ রস গন্ধ, এই সূর্য চন্দ্র, নক্ষত্রখচিত আকাশ, অন্তহীন মাধুর্যে ভরা এই সৃষ্টি যিনি করেছেন—মধুর রসই কি তাঁর প্রিয় নয় ? সেই ভেবেই নানান পুষ্প, সুমিষ্ট ফল, শ্রেষ্ঠ আহার্য দিয়ে মানুষ পূজা করে।

না, তিনি নিজেই মধুর, মধুরতর, মধুরতম। তাঁর চেয়ে মধুর আর কিছু নেই। মাধুর্য দিয়েই তাঁকে সেবা করতে হবে।

আর, প্রেম ভালবাসার মতো মধুর কি আছে ?

ঈশ্বরও নিশ্চয়ই আমাদের কাছে তাই চান। পুরাণের অসংখ্য কাহিনীও তো সেই সাক্ষ্যই দিচ্ছে।

বহুদিন উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরে বিশ্বেশ্বর মন স্থির ক'রে ফেলেন। এই পথেই তিনি ঈশ্বরকে লাভ করবেন।

আত্মবোধহীন, তদ্‌গতপ্রাণ ভালবাসার দ্বারা। লাভ করতে পারুন বা না পারুন, ভালবাসার মাধুর্য তো অন্তত উপভোগ করতে পারবেন।

অকস্মাৎ নবদ্বীপের গতানুগতিক নিস্তরঙ্গ জীবনে একটা আলোড়ন দেখা দিল।

কে এক সন্ন্যাসী, উচ্চকোটির সাধক একজন এসেছেন ব্রহ্মস্বরূপ আচার্যের গৃহে।

বেদান্তবাদী এই আচার্য নিজেও সাধক। গৃহস্থ সাধক, প্রধানত জ্ঞানমার্গ-পন্থী। সেইজন্যেই কতকটা বিশ্বেশ্বর তাঁকে পরিহার ক'রে চলেন। আচার্য নিজে উপযাচক হয়ে মধ্যে মধ্যে আসেন—এই তরুণ অধ্যাপকের সঙ্গে আলোচনা করতে, অর্থাৎ তাঁকে দিয়ে নিজের মত সমর্থিত করতে। কিন্তু বিশ্বেশ্বর সেদিক এড়িয়ে যান, যথার্থ শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে তর্কে পরাস্ত করতে মন চায় না।

আচার্যের গৃহে এই সন্ন্যাসীর আগমন সংবাদ পেলেন বিশ্বেশ্বর জননীর কাছেই।

সেদিন দ্বিপ্রহরে এঁদের ভোজন সমাপ্ত হলে তিনি বললেন, 'বিশাই, আজ তুই বাড়িতে থাক একটু। কোথাও যাস না। আচার্য ঠাকুরের ওখানে কে এক সন্ন্যাসী অনুগ্রহ ক'রে পদার্পণ করেছেন, তাঁকে একবার দর্শন করতে যাব এখন। বৌমা একা থাকবে, সেটা ঠিক হবে না। ছেলেমানুষ ভয় পাবে হয়ত।'

'কেন, গঙ্গাদাস দাদা নেই ?'

গঙ্গাদাস মূলত ওঁদের কৃষাণ, বহুদিনের প্রবীণ লোক, সে-ই যথাসাধ্য এঁদের সংসারের সাধারণ দায়িত্বগুলো বহন করে। বিশ্বেশ্বর প্রায়ই গৃহে থাকেন না, বস্তুত সে-ই এই দুটি নারীকে পাহারা দেয়।

ইন্দ্রাণী বললেন, 'সে পাগলারও তো সাধু দেখা বাতিক কম নয়। কোন-

মতে সংসারের কাজগুলো সেরে ছুটেছে সেখানে। খেতেও আসে নি। হয়ত সেখানেই প্রসাদ পাবে। আচার্য ঠাকুরও নাকি সেইমতোই ব্যবস্থা করেছেন, কোন দর্শনার্থীরা যাতে অভুক্ত না ফেরে।'

বিশ্বেশ্বর আর কিছু বললেন না। ইন্দ্রাণীকে বাধাও দিলেন না।

তখন অত কিছু মনেও হয় নি।

কিন্তু তখন থেকেই এই সন্ন্যাসী সম্বন্ধে একটা কৌতূহল জাগ্রত হয়েছে। পরে বধূর সঙ্গে আলোচনা করতে করতে সঙ্কল্পটাও আকার ধারণ করল।

মাধবীই কথাটা তুললেন, 'আপনি যাবেন না? শুনেছি খুব বড় সাধু যথার্থ সংসারবিমুখ। সকলেই তাই বলছে।'

বিশ্বেশ্বরের মনে হ'ল, তাঁর মনের কথাটাই মাধবী উচ্চারণ করলেন।

একটু যেন ব্যগ্রভাবেই বললেন, 'যাবো? তুমি বলছ? বেশ, মা আসুন —সন্ধ্যার দিকে যাবো। তুমি যাবে?'

'ওমা, ছিঃ! লোকে আপনাকে—। না, না। সে হয় না। মা'র সঙ্গে গেলেও কথা ছিল। তিনি যখন বলেন নি, তখন বোধ হচ্ছে এত ভিড়ের মধ্যে আমাকে নিয়ে যাওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করেন নি। তা বাদে, সন্ধ্যার্চনার আয়োজন, গৃহে সন্ধ্যাদীপ দেখানো—অনেক কাজও তো আছে। আপনিই যান।'

আর কথা বাড়ালেন না বিশ্বেশ্বর।

ইন্দ্রাণী দেবী ফিরে এলে উত্তরীয়খানা কাঁধে ফেলে তখনই বেরিয়ে গেলেন।

আচার্যগৃহে তখন যেন জনসমুদ্রর সৃষ্টি হয়েছে। তথাপি, বিশ্বেশ্বরকে দেখে সকলেই কিছু সচেষ্ট হয়ে পথ ক'রে দিলেন।

আচার্যদেব চণ্ডীমণ্ডপে একটি কাঠের চৌকির উপর নিতান্ত অনাড়ম্বরে সাধু বসে আছেন। তবু এই সাধুকে দেখতেই যে এই বিপুল জনসমাগম—তা বুঝতে অসুবিধা হ'ল না। প্রথমেই যেটা লক্ষ্যে এল, কাঠের চৌকির উপর কোন প্রকার আসন নেই, কৃত্তি বা অজিন-আসনও একখানা পাতা হয় নি।

তবে এ তো তুচ্ছ। সাধুর মুখের দিকে চেয়ে আর চোখ ফেরাতে পারলেন না। এমন শান্ত, প্রসন্ন অথচ উদাস দৃষ্টি, এত মাধুর্যে ভরা অথচ নিরাসক্ত— এর আগে কারও চোখে দেখেন নি বিশ্বেশ্বর। এ সাধু এ শহরের তথাকথিত সাধকদের থেকে একেবারে স্বতন্ত্র। আচার-(কদাচারই অধিকাংশ ক্ষেত্রে) অনুষ্ঠানের মধ্যে অসংখ্য বিধি-নিষেধের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখেন নি, তার অনেক ঊর্ধ্বে উঠেছেন।

চণ্ডীমণ্ডপের উপরে ওঠার মুখে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গিছলেন বিশ্বেশ্বর— এবং দাঁড়িয়েই ছিলেন—একদৃষ্টে ওঁর মুখের দিকে চেয়ে। আচার্যদেব এতক্ষণ ভিড় কিছুটা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছিলেন, তাঁকে দেখতে পেয়ে এবারে ভিড় ঠেলে কাছে এলেন, বললেন, 'ইনিই পরিব্রাজক শ্রেষ্ঠ মহাত্মা পরমেশ্বর পুরী, সর্বজনপূজ্য শ্রীমৎ কৃষ্ণেন্দ্র পুরীর প্রধান শিষ্য। আমাদের পরমভাগ্যে নবদ্বীপে

পদার্পণ করেছেন।'

এতক্ষণ পরমেশ্বরের দৃষ্টি সামগ্রিক ভাবে সেই সমবেত জনতার উপরে আবদ্ধ ছিল। এখন আচার্যের কণ্ঠস্বরে যেন সচেতন হয়ে উঠে বিশেষ ভাবে এদিকেই তাকালেন।

তখনও অপরাহ্ন বেলা সন্ধ্যার কৃষ্ণাঞ্চলে আত্মগোপন করে নি, দিন-শেষের আলোক পশ্চিম আকাশে দীপ্যমান, যেন বিদায় নেবার পূর্বে সিন্দূরবর্ণ ধারণ ক'রে আগামী তামসী নিশার অচির-অবসান ঘটবে এই আশ্বাস ঘোষণা করছে।

সে অপরূপ লালিমা সেই মুহূর্তে যেন দৈব-ইচ্ছাতেই বিশ্বেশ্বরের উপর এসে পড়েছিল।

সুগঠিত দীর্ঘ দিব্য দেহ, অনিন্দ্যসুন্দর আনন, ঈষৎ আরক্ত ললাট কপোলে পথশ্রমজনিত বিন্দু বিন্দু ঘর্ম—কবির ভাষায় 'স্বেদমকরন্দ তাহে বিন্দু বিন্দু চুয়ত'—এবং পদ্মপলাশতুল্য আয়ত চক্ষুর বিস্ফারিত স্থির-নিবদ্ধ দৃষ্টি—দেখে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীও যেন কিছু কালের জন্য মুগ্ধ অভিভূত হয়ে গেলেন।

কিন্তু সে কয়েক নিমেষ মাত্র। সে মোহ অপগত হ'তেও বিলম্ব ঘটল না।

যেন কী এক অজ্ঞাত আঘাতে সচকিত চমকিত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন। পরক্ষণেই ত্বরিত গতিতে কয়েক ধাপ সিঁড়ি ভেঙে একেবারে বিশ্বেশ্বরের সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন। তাঁরও তখন চক্ষু বিস্ফারিত—সে চোখে এক যেন বিপুল বিস্ময়, অবিশ্বাস্য অভূতপূর্ব কিছু দর্শন করলে মানুষের চোখে যেমন বিস্ময় দেখা দেয় তেমনি।

বিশ্বেশ্বর দেখলেন সাধুর সমস্ত দেহ কী এক নিরুদ্ধ আবেগে কেঁপে কেঁপে উঠছে, বিশেষ হাত দুটি স্পষ্টতই কাঁপছে থর থর ক'রে। বুঝি ওঁর হাত ধরবারই চেষ্টা করলেন একবার কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারলেন না, অবশ অবাধ্য হাত সেখানে পৌঁছল না।

বেশ কিছু চেষ্টার পর পরমেশ্বরের বাক্যস্ফূর্তি হ'ল। যেন একপ্রকার আকুলিবিকুলি ক'রে বলে উঠলেন, 'আচার্য, এ—এ কে? আশ্চর্য, এ কাকে দেখছি! সত্য পরিচয় দাও তুমি কে। তোমাকে দেখা মাত্র আমার দেহে এমন পুলক শিহরন জাগল কেন, কেন এমন হর্ষরোমাঞ্চ দেখা দিল। তোমার সঙ্গে আমার যেন জন্মজন্মান্তরের সম্পর্ক—যেন বোধ হচ্ছে তুমি আমার চিরকালের, তুমি আমার ইষ্ট—'

বলতে বলতেই তিনি কেমন কাষ্ঠবৎ স্থির হয়ে গেলেন। চক্ষু বিস্ফারিত কিন্তু তাতে দৃষ্টি নেই। দেহটা কাঠের মতোই পড়ে যেত—যদি না এটাকে ভাবসমাধি বুঝে আচার্য ধরে ফেলতেন।

তাঁকে সযত্নে চৌকিতে শুইয়ে আচার্য ব্রহ্মস্বরূপ তাঁর কানের কাছে হরিনাম করতে লাগলেন—চৈতন্য আনবার চেষ্টায়।

পরমেশ্বর পুরী বিশ্বেশ্বরের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন, বেশ অনেকক্ষণ। যেন একটা কিছু নিরীক্ষণ করছেন—যেমন অদৃশ্য কোন লেখা পাঠ করার চেষ্টা করছেন, যা মানুষের মুখেই লেখা থাকে কিন্তু সাধারণ মানুষ পড়তে পারে না।

অথচ এই অনুরোধেরই আশা করেছিলেন তিনি, বলা চলে অপেক্ষা করছিলেন।

বোধ করি সেই প্রথম দিনটি থেকেই—যেদিন অকস্মাৎ তাঁর মনে ও মস্তিষ্কে প্রবল এক ভাবের আলোড়ন উঠে তাঁকে ক্ষণিকের জন্য বাহ্যচৈতন্যহীন ক'রে দেয়।

সে ভাব কি তা তিনি জানেন না, প্রেম না তার থেকেও বেশী কিছু—তখনও বুঝতে পারেন নি, এখনও পারছেন না। কেমন যেন মনে হয়, এখন মনে হয়—তাঁর ইষ্টদর্শনের রোমাঞ্চ-শিহরণ জেগেছিল সর্বাঙ্গে, মন এক বিপুল পুলকের বাত্যায় নিমজ্জিত হ'তে বসেছিল প্রেমের অতল সমুদ্রে।

এত বৎসরের সাধনাতেও এ অনুভূতি জাগে নি ইতিপূর্বে—এই তরুণ কিশোরটিকে দেখে যা জাগল। আর সেই থেকেই মনে একটা সন্দেহ ক্রমে ক্রমে তাঁর চিন্তাভাবনায় আকার গ্রহণ করছে—এ বুঝি বিধাতার, না, তাঁর ইষ্টেরই যোগাযোগ। এ বুঝি তাঁর প্রারব্ধ—বিধিনির্দিষ্ট কর্তব্য।

ঈশ্বরের অবতার কিনা জানেন না, তবে এই ছেলেটি যে ঐশ্বরিক বিভূতি-সম্পন্ন তাতে কোন সন্দেহ নেই। নইলে স্পর্শ করা মাত্র এমন একটা সর্বাঙ্গ-বিহ্বল-করা অতীন্দ্রিয় অনুভূতি জাগত না মনে। তার পরেও, সেই প্রথম দর্শনের বিস্ময়কর অননুভূতির পরেও দেখেছেন স্পর্শ ক'রে। বারবারই দেখেছেন। ছেলেটি নিত্য তাঁকে প্রণাম করে—প্রতিবারই একটা অকারণ অবর্ণনীয় রোমাঞ্চ জাগে তাঁর দেহে, মনে আসে অননুভূতপূর্ব বিহ্বলতা।

বোধ হয় এই মহামানবকে সাধনার পথে অগ্রসর করার জন্যই পরমেশ্বর পুরীকে এ পথে পাঠিয়েছেন ঈশ্বর। যখন কোন অবতার বা লোকোত্তর-বিভূতি-সম্পন্ন মানুষের আবির্ভাব হয়, মনুষ্যত্রাণের জন্য—তখন, তাঁর জীবনকে সাধনাকে বিকশিত করতে, অনুকূল অবস্থা রচনা করতে পূর্ব থেকেই কিছু কিছু তাঁর চিহ্নিত লোকের আগমন হতে থাকে।

পরমেশ্বর পুরী আজ এখানে এসে বুঝলেন কথাটা।

এই জন্যই তাঁর জন্মগ্রহণ, তীব্র বৈরাগ্য-বোধ, সন্ন্যাসের বাসনা—এবং বিখ্যাত তপস্বী মধুসূদন পুরীর পদাশ্রয় লাভ।

এ সেই লীলাময়েরই খেলা।

মহাচতুর সেই মনুষ্যদেহধারীরই লীলা—যাঁকে ইষ্টজ্ঞানে পূজা করেন পরমেশ্বর, যাঁকে হৃদয়ে প্রত্যক্ষ করার জন্যই এতদিনের সাধনা তাঁর—যাঁকে শুধু ভক্তি নয়, ভালবেসে ফেলেছেন তিনি।

সুতরাং এ ছেলেটি তাঁর কাছে দীক্ষা নিতে চাইবে তা তিনি অনুমানই

করেছিলেন।

আশা বা অপেক্ষাই করছিলেন এ অনুরোধের—অনুনয়ের।

তবে এ দ্বিধা কেন? কেন আরও কিছু জানার আগ্রহ? ওঁর ইষ্টের কোন লিপির অনুসন্ধান—এর মুখে, প্রশস্ত বেদনার্ত ললাটে, অবর্ণনীয় সুন্দর দুটি চোখের আশ্চর্য দৃষ্টিতে?

এর উত্তর কি পেলেন কে জানে—হয়ত কোন উত্তর পেলেন না বলেই বহুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কি দীক্ষা চাও আমার কাছে? আমার পথ আর তোমার পথ তো এক নয়। তুমি বেদান্ত-জ্ঞানী—বেদান্ত কেন সকল শাস্ত্রেই পারঙ্গম, তা এই ক'দিনেই বুঝেছি—তোমার লক্ষ্য নিশ্চয়ই সেই পরমব্রহ্ম, তাই নয় কি? জীবজগতের পরমকারণ মূল সত্তা এক অখণ্ড অদ্বয় পরব্রহ্ম—বেদান্তোক্ত এই জ্ঞানযোগই তোমার লক্ষ্য হওয়া উচিত। কিন্তু আমি সে পথের পথিক নই। কেউ কেউ আমাকে সাধক বলে, তপস্বী বলে—আমি জানি আমি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দাস—না, দাস বলার স্পর্ধাও রাখি না, আমি কীটাণুকীট, তাঁর প্রেমরস আস্বাদনের যোগ্যতা নেই, লোভ আছে। তোমার পথ আমার পথ তো এক নয় বাবা।'

বিশ্বেশ্বর যেন সহসা বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়েন। ধীরে ধীরে বলেন, 'কিন্তু প্রভু, সাধারণ মানুষের তো এ ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার নেই। অধিকার তো দূরের কথা—এ সম্বন্ধে ধারণামাত্র নেই। এ তাদের পক্ষে বহুদূরের কোন বস্তু, শব্দটা মাত্র শুনেছে কেউ কেউ, সেও স্বল্প দু-চারজন—কেউ তাও শোনে নি। শুধু শিক্ষাতেও হয় না, এমন কি বহু উচ্চশিক্ষিত লোকও দেখেছি—তারা কেউ ঐ বেদান্তোক্ত জ্ঞানযোগের অধিকারী হ'তে পারেন নি। বরং তাঁরা নিজেদের ভ্রান্ত ধারণার দ্বারা সর্বসাধারণের মনে আরও জটিলতার সৃষ্টি ক'রে গেছেন।···প্রভু, নানা দেশ ঘুরে দেখলাম, যেখানে জন্মগ্রহণ করেছি, এতকাল বর্ধিত হয়েছি, সেখানের মানুষ তো দেখছিই—সাধারণ মানুষের বড় দুঃখ। তারা জ্ঞান শিক্ষা তপস্যার কথা কিছু জানে না, বোঝে না, অহমিকা-সার পণ্ডিতদের উপদেশ নির্দেশের দ্বারা বিন্দুমাত্র উপকৃত হয় না। বরং বহু ভ্রষ্টাচারী সাধক, গুরুনামধারী—তাদের কদর্য সাধনপদ্ধতিতে ঐ সব অবোধ মানুষদের বিপথে নিয়ে গিয়ে অধিকতর দুঃখের কারণ হচ্ছে। আমি চাই সহজ সরল সাধনার মধ্য দিয়ে, অন্তরের প্রেমভক্তির মধ্য দিয়ে ভগবদ্‌ প্রেমমাধুর্যের স্বাদ পাক তারা, দেহজ দুঃখ, সংসারের নানা কষ্ট দুঃখ নিপীড়ন থেকে উত্তরিত হয়ে এক পরম আশ্রয়ে গিয়ে পৌঁছোক, আমিও ঐ ভাবেই তাঁকে চাই, আপনি সেই পথই আমাকে দেখান।'

আবারও ওঁর মুখের উপর স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে নীরবে বসে রইলেন পরমেশ্বর পুরী। তারপর পূর্ববৎ ধীর ভাবে বললেন, 'কিন্তু তুমি ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ণ অধিকারী, সাধন-চতুষ্টয়ের উত্তম আধার। তা এই ক'দিনেই বুঝেছি। তুমি কেন এ সুযোগ ত্যাগ করবে?'

এবার বিশ্বেশ্বর প্রতিপ্রশ্ন করেন, 'আপনি কেন ঐ সাধনার পথ পরিত্যাগ

করলেন ? আপনিও তো উত্তম অধিকারী একজন।'

'না, আমি তোমার মতো এতটা অগ্রসর নই। তুমি জ্ঞানমার্গের সর্বোচ্চ সীমা স্পর্শ করেছ। সাধকমাত্রেরই যা চরম লক্ষ্য ও পিপাসা, ব্রহ্মে লীন হওয়া, ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি, তা তোমার কাছে সহজলভ্য। অনায়াসেই পেতে পারো। এমন সুযোগ ত্যাগ করছ কেন ?'

'না প্রভু', এবার কিছু দৃঢ়স্বরেই উত্তর দেন বিশ্বেশ্বর, 'আমি এই পরম বস্তু একা—স্বার্থপরের মতো সম্ভোগ করতে চাই না। আমি চাই এমন সাধনার পথ যে পথে গিয়ে আপামর সাধারণ পাপীতাপী দুর্বল অজ্ঞান মানুষ, ভিন্নধর্মমতাবলম্বী মানুষও—ইহজীবনের যা সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্য, সর্বোত্তম ঈপ্সার বস্তু, সেই ভগবদ্‌প্রেমের স্বাদ লাভ করতে পারে। আমি নিজেও সেই পথেই যেতে চাই, শুষ্ক জ্ঞানমার্গে আমার আনন্দ নেই।'

পুনশ্চ এক অখণ্ড নীরবতা। কিছুক্ষণ পরে পরমেশ্বর পুরী বললেন, 'তুমি কি দীক্ষা চাও ? কোন্ ইষ্টকে তুমি এই অভিনব সাধনমার্গের যোগ্য লক্ষ্য বলে বিবেচনা করো ? সে কথা কি ভেবে দেখেছ ?'

'ভেবেছি প্রভু, অনেক ভেবেছি। কিন্তু কিছুই ঠিক করতে পারিনি। সেই কারণেই আমার আরও ব্যাকুলতা। জানকীনাথ রামচন্দ্র আমাদের গৃহদেবতা। তাঁকে ভক্তিও করি যথেষ্ট—কিন্তু আমি চাই ভালবাসতে। মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসতে। একজন দেহীকে বা দেহধারীকে যতটা ভালবাসতে পারে মানুষ—যে ভালবাসায় দেহভাব সম্পূর্ণ বিদূরিত হয়ে ব্রহ্মভাব উপলব্ধি করা যায়। আমি কিন্তু ব্রহ্মে লীন হতে চাই না—আমি চাই তাঁকে ভালবাসার মাধুর্য উপভোগ করতে। মক্ষিকার মতো মধুর আস্বাদ চাই, মধুর পাত্রে নিজেকে নিঃশেষ করতে নয়।'

বলতে বলতে সহসা যেন আকুল হয়ে ওঠেন বিশ্বেশ্বর আচার্য, 'ঠিক কি চাই তা বুঝি আমিও জানি না, বুঝতে পারি না। ঈশ্বরকে চাই আমি—তাঁর প্রেমে ডুবে থাকতে চাই—তার বেশী কিছু ভাবি নি, ভাবতে পারি না। আপনিই বলে দিন কি করব, কার কথা ভাবব।'

তার পর আর কিছুক্ষণ নীরব থেকে, আবেগের প্রান্তি কিছুটা নিরসন ক'রে নিয়ে বলেন, 'এমন কে আছেন মহাপুরুষ বা অবতার—যাঁকে আমি এমনি ভালবাসতে পারি—মনপ্রাণ-সর্বস্ব দিয়ে, যিনি আমার সমস্ত চিন্তায় ভাবনায় কল্পনায় স্বপ্নে মিশে যাবেন, যাঁকে ঘিরে আমার মন নিত্য সেবার রসাস্বাদ করবে, যাঁর অস্তিত্বে আমার অস্তিত্ব মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবে, আমি বলতে আর কিছু থাকবে না—এমন একজনের কথা আমাকে বলুন।'

আবারও দীর্ঘ প্রতীক্ষা।

এবার পরমেশ্বর শুধু নির্বাকই রইলেন না, দুই চক্ষুও নিমীলত করলেন।

তবে কি তেমন কোন ইষ্টকে ধ্যানে পাবার প্রয়াস পাচ্ছেন ? তেমন কোন মহামানব—যিনি মানবোত্তর মহাপুরুষ, ঈশ্বরের সর্বৈশ্বর্য যাঁর মধ্যে বিদ্যমান,

অথচ যিনি সামান্য মানব-মানবীর প্রেমে ধরা দিয়েছেন ?

বহুক্ষণ পরে যখন চোখ খুললেন পুরীজী, বিশ্বেশ্বর দেখলেন তাঁর দুটি চক্ষুই অশ্রুপ্লুত।

তবে এ অশ্রু বোধ করি বেদনার নয়, মনে হ'ল এ প্রেমাশ্রু। এই স্বল্পক্ষণ চিন্তার ফল।

পুরী ধীরে ধীরে বললেন, 'আচার্য', তেমন একজনকেই আমি জানি, যিনি আমার সমস্ত মন—সকল চিন্তা ভাবনাকে মাধুর্যে পূর্ণ ক'রে রেখেছেন—যাঁকে ধ্যান করতে বসলে প্রহরের পর প্রহর কেটে যায়—প্রেমরসে পূর্ণ সে সময়ে আহার নিদ্রা, এ দেহ এ বাস্তব জীবনের কোন কিছুই স্মরণে থাকে না—কিছুরই প্রয়োজন হয় না ; তোমারই কল্পনামতো যাঁকে আমার সর্বাঙ্গে সর্ব অস্তিত্বে মিশিয়ে ফেলার সাধনা আমার—তিনি হলেন পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ। যিনি রাজনীতিক, যোদ্ধা, দার্শনিক—আবার সেই সঙ্গে প্রেমেশ্বরও, সরলা গোপকন্যারা যাঁকে সহজ প্রেমেই লাভ করেছিল ; অথচ মুনিঋষিরা সহস্র বর্ষ তপস্যাতেও যাঁর করুণা লাভ করতে পারেন না। বৎস, তিনি ছাড়া আর কারও কথা আমি জানি না, শ্রেষ্ঠতর কোন দেহধারীর কথা ভাবতে পারি না।'

বিশ্বেশ্বর সাগ্রহে সবেগে তাঁর দুটি চরণ স্পর্শ ক'রে বললেন, 'আমাকে সেই ইষ্টই দিন—তাঁরই সাধনার দীক্ষা। আর তাঁর কথা বলুন, আরও, আরও। তাঁর অত্যাশ্চর্য জীবন কথা। আমি শুনেছি, শ্রীমদ্ভাগবতও পাঠ করেছি—তবে তাতে কিছুই জানা হয় নি। আপনি বলুন। অধিকারীর কাছ থেকেই দিব্য প্রসঙ্গ শুনতে হয়। আপনি সেই সঙ্গে আমাকে শ্রীকৃষ্ণ-সাধনার দীক্ষা দিন, সেই প্রেমরসের ভাগী করুন—যা আপনাকে এমন ভাবে জারিত করেছে।'

মাথা নাড়লেন পরমেশ্বর।

'না, এত দ্রুত এসব কাজ করতে নেই বৎস। বৎসই বললাম, যদিচ আমার বিশ্বাস তুমি আমার প্রণম্যই হবে একদা। আগে তাঁর কথা জানো, চিন্তা করো —তাঁকে ভগবান বলে ভাবতে পারো কিনা মনে মনে বিচার করো—তারপর দীক্ষার প্রশ্ন উঠবে, তার পূর্বে নয়।'

তারপর ঈষৎ গাঢ়স্বরে বললেন, 'আমি অনেকদিন ধরেই শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে একটি গ্রন্থ রচনা করছিলাম, কিন্তু সে বিপুল, অনন্ত, সাক্ষাৎ-ব্রহ্ম-বৃত্তান্তর যেন কূল পাচ্ছিলাম না। বলতে গেলে দৈব নির্দেশেই এখানে এসেছি। কারণ, তোমাকে দেখামাত্র যেন বিপুল এক উদ্দীপনা অনুভব করছি। কেন, কিসের সে প্রেরণা, তা আজও জানি না। তবে তার ফলে এই এক মাস কালে সে পুঁথি শেষ হয়েছে। তোমাকেই প্রথম পাঠ করতে দেব সে গ্রন্থ। তুমিই উত্তম পাঠক, ঐ অমৃততত্ত্বের উত্তম আধার।'

তারপর, ক্ষণকাল মৌন থেকে পুনশ্চ বললেন, 'সেই গ্রন্থ পাঠ করার পরও, তুমি অন্তত দুই মাস কাল এ নিয়ে চিন্তা করবে। আমি আগামীকালই এ স্থান ত্যাগ করব, এ পুস্তক তোমার কাছেই থাক, পারো তো কাউকে দিয়ে

একটা নকল করিয়ে নিও।'

'তার পর?' বিশেশ্বর ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করেন, 'আবার কবে আপনার দর্শন পাবো?'

'তুমি বলছিলে না, পিতৃকৃত্য করতে গয়াধামে যাবে? এই গ্রন্থ শেষ হলে তুমি শুভদিন দেখে গয়া যাত্রা ক'রো। ইহলোকের এ একটা প্রধান ঋণ, প্রধান কর্তব্য—পিতৃকৃত্য সম্পূর্ণ করা। আমিও ঐ দুই মাস কাল পরে গয়াধামে তোমার সঙ্গে মিলিত হবো। যদি তখনও তোমার প্রবল ইচ্ছা থাকে—এবং শ্রীকৃষ্ণে মতি হয়—সেই পুণ্যক্ষেত্রেই তোমাকে দীক্ষা দেবো। তবে তুমি তৎপূর্বে ভাল ক'রে ভেবে দেখো, নিজের মনের প্রকৃত অবস্থা বোঝার চেষ্টা ক'রো।'

॥ ৮ ॥

ভাল ক'রে ভেবে দেখার, নিজের মনের প্রকৃত গতি ও ঈপ্সা,—বিচার করার কোন চেষ্টা করেন নি বিশ্বেশ্বর, একথা বললে পুরোপুরি সত্য বলা হয় না।

আসলে সে অবস্থাই আর তাঁর ছিল না। পরমেশ্বর পুরীর গ্রন্থপাঠ করার পর—তিনবার আদ্যন্ত পড়েছিলেন উনি—এমনই একটা বিহ্বল আচ্ছন্ন অবস্থা হয়েছিল বিশ্বেশ্বরের যে, আর কোন কিছু চিন্তা বা বিচার করার শক্তিই ছিল না। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বরসে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ বিরাট পুরুষ অথচ প্রেমময়; সমস্ত জগতের প্রতি তাঁর অপরিসীম করুণা, পীড়িত লাঞ্ছিত মানুষকে ত্রাণ করার জন্য, পাপীদের দমন করার জন্যই তাঁর বিরাট ও প্রায়-সর্বনাশী কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আয়োজন—এসব তুচ্ছাতিতুচ্ছ তথ্য।

পরমেশ্বর প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন—ইতিপূর্বে যে সব মহামানবদের আমরা অবতার বলে অভিহিত করেছি—তাঁরা ঈশ্বরের অংশমাত্র। শ্রীকৃষ্ণ সেই সর্ববিভূতিময়, সর্বশক্তিমান, সৃষ্টিস্থিতিলয়ের নিয়ন্তা শুধু নন—তিনিই পরম কারণ। যাঁর ইচ্ছামাত্রে এই অন্তহীন বিপুল বিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে; এই বিশ্ব যাঁর মধ্যে লীন অথচ যিনি অনায়াসে তার মধ্য থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিতে পারেন; যিনি একাধারে পুরুষ ও প্রকৃতি, অথচ অবলীলাক্রমে দুই পৃথক সত্তায় রূপান্তরিত হ'তে পারেন—সেই শ্রীকৃষ্ণ মানুষের ঐকান্তিক প্রেমে, সহজ ভালবাসায় ধরা দিয়েছেন, দিয়ে থাকেন। তিনিই পরম প্রভু অথচ বার বার যেন স্বেচ্ছায়, সানন্দে সাগ্রহে ঐকান্তিক প্রেমে সেবকদের সেবকত্ব করেছেন।

এ গ্রন্থর বৈশিষ্ট্য—বিরাটতম চরিত্রের এই জটিলতা, নানা পরস্পরবিরোধী তথ্যকে পরমেশ্বর যুক্তিগ্রাহ্য ক'রে তুলেছেন—সে পরমপুরুষের বিরাটত্ব কিছু-মাত্র ক্ষুণ্ণ না ক'রে।

এবং এক আকাঙ্ক্ষিত বিরাট আশ্বাসকে বিশ্বাস্য করেছেন।

ঠিক যে আশ্বাস বিশ্বেশ্বর চাইছিলেন—সেইটেই দিয়েছেন। পরম শ্রেয়ের

সঙ্গে পরম প্রেয়ের যে মহামিলন কল্পনা করতে চেয়েছিলেন কিন্তু ঠিক সাহস হচ্ছিল না খুঁজে পাচ্ছিলেন না তার নির্ভরযোগ্য কোন সূত্র—সেই মিলনেরই সন্ধান দিয়েছেন।

আর কোনদিকে তাকাবেন না বিশ্বেশ্বর, আর বৃথা অন্ধকারে ঘুরে বেড়াবেন না। তাঁর পথ তিনি পেয়ে গেছেন।

দূর তীর্থযাত্রার দীর্ঘ পথে আরও অনেক লোক তাঁর দৃষ্টিপথে পতিত হ'ল। তাদের দুঃখদুর্দশা, সর্বোপরি তাদের ধর্মাচরণের বিভ্রান্তি তাঁর ব্যথিত হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করল।

এরা সরল, এরা সৎপথে জীবন অতিবাহিত করতে চায়, ভগবানকে ডাকতে চায় কিন্তু নানা পথ, নানা মত, নানা নায়কের পরস্পরবিরোধী নির্দেশে—পাণ্ডিত্যের জটিলতায় দিশা পায় না।

এদের ব্যথা নিজের অন্তর্গূঢ় দৃষ্টি দিয়ে লক্ষ্য করেন, করুণাভরা অন্তরে অনুভব করেন—এদের বেদনা ও অসহায়তা।

দেখছেন, শুনছেন, অনুভব করছেন—তথাচ সমস্ত পথটাই কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে রইলেন।

তাঁর সঙ্গী—আত্মীয় বান্ধব ও ছাত্ররা তাঁর মুখে শাস্ত্রবাক্য শুনতে চান; বিশেষ তাঁদের যাত্রাপথে আরও কিছু কিছু তীর্থ ও বহু বিখ্যাত জনপদ পড়ছে—তাদের ইতিহাস বা মাহাত্ম্য—এই প্রায় সর্বজ্ঞ পণ্ডিতের কাছ থেকে শ্রবণ করার একান্ত আগ্রহ ও ঔৎসুক্য তাঁদের—কিন্তু বিশ্বেশ্বরের এসব আর ভাল লাগে না।

পাণ্ডিত্য প্রদর্শন, অর্থাৎ তর্ক বা বিচার কিম্বা অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাতে যেন এক প্রকার অরুচি জন্মেছে তাঁর। তিনি চান নির্জনে নির্বাক থেকে পরম চিন্তায় মগ্ন থাকা—যার আলোচনা অধিকারী ব্যতীত আর কারও সঙ্গে করা যায় না।

এ মনোভাব সত্ত্বেও তীর্থকৃত্যে কোন ত্রুটি ঘটে না।

ফল্গুতে স্নান, গদাধরের পাদপদ্মে পিণ্ডদান ও ব্রাহ্মণসেবা প্রভৃতি যা কিছু করণীয় সবই করেন। সেই সময়টা অন্যমনস্কতা পরিহার ক'রে পিতৃদেবকে একাগ্র স্মরণ করার চেষ্টা করেন। পারেনও, নিজের অতিমানবিক মনোবলে।

পিতৃকৃত্য সমাপ্ত হ'তেই সংবাদ পেলেন পরমেশ্বর পুরী গয়াধামে এসে পৌঁছেছেন। যেন ওঁর ঐহলৌকিক কর্তব্য সমাপ্ত হওয়ার জন্যই নিকটে কোথাও অপেক্ষা করছিলেন।

অতঃপর বিশ্বেশ্বর নিশ্চিন্ত হয়েই এই সাধুসঙ্গে কটা দিন অতিবাহিত করবেন, সেইটেই স্বাভাবিক।

তিনি নিজে রন্ধন ক'রে সাধুকে ভিক্ষা দেন—পরে তাঁর প্রসাদ গ্রহণ করেন। তদ্ব্যতীত অবশিষ্ট সময়টুকু, দৈহিক প্রয়োজনের সামান্য কাল বাদ

দিয়ে—তাঁর সঙ্গে ভগবদালোচনাতেই কাটে। রাত্রের নিদ্রাকে যতদূর সম্ভব সংক্ষেপিত ক'রে নিয়েছেন, বোধহয় এক প্রহরের বেশী তাতে ব্যয় করেন না।

আর, যতই আলোচনা করেন, যতই এ তত্ত্বের গভীরে প্রবেশ করেন—ততই যেন বিশ্বেশ্বরের আকুলতা বৃদ্ধি পায়। শ্রীমদ্ভাগবত তিনি পাঠ করেছেন—কিন্তু পুরীজীর নব আলোকপাতে, দৃষ্টির স্বচ্ছতায় তার সত্য পূর্ণতর জ্যোতিতে প্রতিভাত হয়।

প্রত্যুত সকল শাস্ত্রেই—বিশ্বেশ্বরের শাস্ত্রজ্ঞানের যেটুকু অহঙ্কার ছিল তা চূর্ণ করে দিয়ে—(যথেষ্ট চেষ্টা সত্ত্বেও হয়ত কিছু অহঙ্কার থেকেই যায় বৈরাগ্যপথ-যাত্রীরও) সে শাস্ত্রজ্ঞানে যেন নবীন আলোকপাত করলেন। গতানুগতিক ব্যাখ্যার পথে না গিয়ে নিজের সহজ বোধশক্তি ও নির্মল বিচার বুদ্ধি দিয়ে গ্রন্থের প্রকৃত মর্মোদ্ধারের পথ দেখালেন।

কিন্তু, বিশ্বেশ্বরের যা আসল উদ্দেশ্য—দীক্ষাগ্রহণ—সে প্রসঙ্গ যেন এইসব মধু অপেক্ষা মধুরতর আলোচনায় গৌণ হয়ে পড়েছিল।

সহসা—একটি সাধারণ, অতি সামান্য ঘটনার অসামান্য আঘাতে তিনি সচেতন হয়ে উঠলেন।

সাধারণ, তবে বড় বিচিত্রও।

সাধুজীকে, স্বীয় মনোনীত মনোমত গুরুকে নব নব সুখাদ্যে ভিক্ষা দেবেন—এই ইচ্ছাতে তিনি ইদানীং প্রত্যহই রন্ধনকার্যে নানারূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতেন।

কোন্ বস্তুর সঙ্গে কোন্ বস্তুর বা মশলার সংমিশ্রণে ব্যঞ্জন অধিক স্বাদু হয়—প্রচলিত পদ্ধতি ছাড়াও অন্য কি ভাবে পাক করলে সেই স্বাদে উপনীত হওয়া যায়—তারই নব নব, নানাবিধ পরীক্ষা।

যে বুদ্ধিমান ও প্রতিভাবান, সে জীবনের সর্ব ক্ষেত্রেই তার প্রতিভার চিহ্ন রাখবে—এ স্বাভাবিক, বিশ্বেশ্বরের ক্ষেত্রেই বা তা হবে না কেন?

একদিন তিনি নিজ বাসাবাড়ির গৃহসংলগ্ন পাকশালায় এমনি নানাবিধ আয়োজনে ও পরীক্ষায় ব্যস্ত—একটি স্থানীয় অধিবাসী বালক এসে প্রাঙ্গণে, তাঁর অনতিপ্রশস্ত রন্ধনস্থানের সামনে এসে দাঁড়াল।

অল্পবয়সী, শ্যামবর্ণ, কৌপীনের মতো একখণ্ড বস্ত্রমাত্র পরনে, সর্বাঙ্গে ধূলা—যেমন এদেশীয় দরিদ্র চাষীঘরের গ্রাম্যবালক হয়—তেমনিই। হাতে একটি গোচালনার পাচনবাড়ি।

ছেলেটি একদৃষ্টে ওঁর দিকে চেয়ে আছে দেখে উনি সস্নেহে প্রশ্ন করলেন, 'কী দেখছ? খাবে কিছু, ক্ষিদে পেয়েছে?...একটু অপেক্ষা করো তো রন্ধন শেষ ক'রে সাধুজীর জন্যে অগ্রভাগ সরিয়ে রেখে তোমাকে বসিয়ে খাইয়ে দিই।'

ছেলেটা পিচ ক'রে খানিকটা থুথু ফেলে বললে, 'না, আমার দরকার নেই। আমি তোমার খাবারে নজর দিচ্ছি না, শুধু তোমার কাণ্ডটা দেখছি।'

'কাণ্ড ? কাণ্ড আবার কি দেখলে এর মধ্যে ?' বিশ্বেশ্বর প্রশ্ন করেন।

'দেখছি জিভের একটু তোয়াজের জন্যে কী ভূতের মতোই না খাটছ! একমুঠো ভাত, তাই বা কেন—একমুঠো চাল খেলেই তো দিন চলে যায়—তার জন্যে এত মেহনতের দরকারটা কি ?'

'না না, একা আমার জন্যে করছি নাকি!' ঈষৎ কি অপ্রতিভ বোধ করেন বিশ্বেশ্বর ? বলেন, 'এক খুব ভাল বড় সাধুকে ভিক্ষা দেবো বলেই—'

ছেলেটা এবার বেশ শব্দ করেই হাসে। বলে, 'মুখে বলছ ভিক্ষা—চোখে দেখছি রাজারাজড়ার মতো খাওয়া। আর সেই বা কি রকম সাধু যার এত জিভের তার, এত লালসা ভাল ভাল খাওয়ার ? সাধুরা তো শুনেছি প্রাণ ধারণের জন্যেই কিছু খান!'

'না না, তাঁর আহারের লোভ নয়, আমারই সাধুসেবা করার লোভ!'

'মানে সাধুটাকে বিপথে নিয়ে যেতে চাও, এই তো!' যেন তিরস্কারের সুর বাজে ছেলেটির কণ্ঠে, 'তা বেশ তো, ওখানে তো দেখছি ক্ষীর তৈরী করে রেখেছ বেশ খানিকটা, ওই তো যথেষ্ট। ওর চেয়ে ভাল খাবার আর কি আছে ? একাধারে জীবনধারণের ভাল জিনিস, অথচ খেতেও ভাল লাগে খুব। ...অনেক রকম ভাল ভাল খাবার একসঙ্গে খেলে, কোনটারই তো স্বাদ পাওয়া যায় না ঠিক মতো—পেটে গিয়েও গোল বাধায়। যা সবচেয়ে ভাল তাই একটু সাধুকে দিলেই তো হয়! তা নয়, তোমারও ভাল খাবার লোভ আছে—প্রসাদ তো পাবেই জানো—বাহাদুরী নেবার লোভও কম নয়।'

এই বলে—যেন একটু চরম অবজ্ঞার দৃষ্টি হেনে ছেলেটা আবারও খানিকটা থুতু ফেলে চলে যায়।

ছেলেটা চলে গেলে অনেকক্ষণ স্তম্ভিত ভাবে বসে রইলেন বিশ্বেশ্বর। রন্ধনে যেন আর রুচি বা আগ্রহ রইল না। ছেলেটির কথাই ভাবতে লাগলেন। যখন কথা কইছিল তখন তাকে উত্তর দেবার দিকেই মন ছিল তাঁর, উত্তর দিয়ে তার অভিযোগ খণ্ডন করায়—এইবার ভাল ক'রে ভাবতে গিয়ে অপরিমাণ এক বিস্ময় বোধ হ'ল।

কে এ ছেলেটি ? বয়সে তো বালক মাত্র—অথচ এমন প্রবীণ ব্যক্তির মতো কথা বলে গেল!

এ দেশে এই শ্রেণীর ছেলেরা—কোন কোন সম্ভ্রান্ত লোকের গৃহে হয়ত বিদ্যাচর্চা করে—কিন্তু গ্রাম্য রাখালবালক—এদের তো অক্ষর পরিচয় মাত্র নেই, কোন সৎপ্রসঙ্গ শোনারও বোধ করি সুযোগ পায় না, এমন প্রজ্ঞার মতো কথা কোথা থেকে শিখল!

তবে কি, তবে কি—এও দৈব প্রেরিত! এ কি তাঁর বিধাতারই সতর্কীকরণ!

এ বিদ্রূপ তাঁর প্রাপ্যই ছিল বুঝি!

অমৃতের সমুদ্র সম্মুখে থাকতে তিনি সাধারণ এক দীর্ঘিকায় নিমজ্জিত

আছেন, পথের ধারের আকর্ষণে পথের শেষ—পরম লক্ষ্য যা—ভুলে বসে আছেন!

সত্যই তো, এ কী ছেলেখেলায় ডুবে আছেন তিনি!

একবার মনে হ'ল এ হয়ত গুরুরই পরীক্ষা। তিনি ইচ্ছা ক'রে ভুলিয়ে দিচ্ছেন।

দীক্ষার কথা গত কদিনে ওঠেও নি একবার।

তত্ত্বরসেই আবিষ্ট নিমজ্জিত হয়ে আছেন।

বিশ্বেশ্বর রন্ধনের বিবিধ বিচিত্র উপকরণ সরিয়ে রাখলেন। সামান্য কী একটা প্রাথমিক পর্যায়ের ব্যঞ্জন ইতিমধ্যেই প্রস্তুত হয়েছিল। আর কোন ব্যঞ্জনের ব্যবস্থা করলেন না. শুধুই অন্ন পাক শেষ ক'রে পুরীজীর অপেক্ষা করতে লাগলেন।

পুরীজী তাঁর ভাবান্তর দেখে বিস্মিত হলেও তা প্রকাশ করলেন না। বিশ্বেশ্বর তাঁর পাদপ্রক্ষালন ক'রে দিয়ে নিজের উত্তরীয়ে পা মুছিয়ে আসনে বসালেন। অতঃপর সেই অতি সাধারণ ভোজ্য অন্ন, একটা ব্যঞ্জন ও ক্ষীরের পাত্র সম্মুখে ধরে দিয়ে গাঢ় ও আবেগকম্পিত কণ্ঠে প্রভাতের অপরিচিত গ্রাম্য রাখাল বালকের আকস্মিক আগমন ও কথোপকথনের বৃত্তান্ত আনুপূর্বিক বর্ণনা ক'রে কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন, 'আর বিলম্ব করবেন না প্রভু, এবার দীক্ষা দিয়ে আমাকে সাধনার পথে কিছুটা অগ্রসর ক'রে দিন!'

সাধু হাসলেন। বললেন, 'তুমি দীক্ষার প্রসঙ্গ না তুললেও আমি কথাটা ভুলি নি। তোমাকে পরীক্ষাও করি নি, তার প্রয়োজন নেই। সুদ্ধ মাত্র প্রস্তুত করছিলাম। বীজবপনের পূর্বে ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হয়—জানো তো—ভূমি কর্ষণ, তাতে সার প্রদান ইত্যাদির দ্বারা। সেই ভাবেই তোমার অন্তর-ক্ষেত্রকে প্রস্তুত করছিলাম, ভূমির উর্বরাশক্তির পরিমাপ হচ্ছিল সেই সঙ্গে। তবে আর বিলম্বের প্রয়োজন নেই। শুভদিন আমি স্থির ক'রেই রেখেছি। তুমিও প্রস্তুত হও মনে মনে।'

তারপর একটু নীরব থেকে বললেন, 'তবে এ বড় সাংঘাতিক পথ বিশ্বেশ্বর—এ পথে যেতে হ'লে সম্পূর্ণ নিঃস্ব নিঃসঙ্গ হয়ে চলতে হয়। নির্দয় নির্মম হয়ে। সংসার সম্বন্ধে এমন কি কর্তব্যবোধও বিসর্জন দিতে হয়। তিনি একাগ্রতাই চান। সর্ববন্ধন মুক্ত হয়ে—স্নেহ প্রেম দয়া সব ত্যাগ করে লঘু হয়ে অগ্রসর হ'তে হয়। এও একরকম মৃত্যু, সাংসারিক জীবনের শেষ।··· পারবে তো এতটা নিরাসক্ত হতে? গৃহে তোমার স্নেহময়ী মাতা আছেন, তরুণী সুন্দরী জায়া, তাদের কথা ভেবে দেখেছ?'

'ভাবা আমার পূর্বেই হয়ে গেছে। আপনি মৃত্যুর উপমা দিচ্ছিলেন না? আমার দৈহিক মৃত্যু ঘটলে যা হ'ত তাদের—এক্ষেত্রেও তাই হবে।' ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন বিশ্বেশ্বর, 'যাঁর পায়ে আমাকে সমর্পণ করব, করতে চলেছি, তাঁর কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ, নিজস্ব যা কিছু আছে সবসুদ্ধ নিঃশেষে নিবেদন করব, এ-ই তো আমার সঙ্কল্প। আত্মীয়তার বন্ধন তো তুচ্ছ, মানুষের যা

সকলের চেয়ে বেশী প্রিয়—অহঙ্কার—জ্ঞানের, পাণ্ডিত্যের, প্রতিষ্ঠার—প্রেম প্রীতি বাৎসল্য সব সুদ্ধই তাঁকে সঁপে দেব, দিতে চেষ্টা করব—তারপর আর কিছু ভাবব না, কোন দিকে চাইব না, যা ভাববার, যা করবার তিনিই করবেন—এই তো আমার সাধনা হবে, তাই না?'

বলতে বলতে তাঁর দুই চক্ষুর প্রান্ত প্লাবিত ক'রে দরবিগলিতধারে অশ্রু নামল।

গুরুর চক্ষুও শুষ্ক রইল না, বলা বাহুল্য।

তিনি নীরবে দুই হাত তুলে নমস্কার জানালেন—ইষ্টকে অথবা ভাবী শিষ্যকে, ঠিক বোঝা গেল না।

॥ ৯ ॥

মৃদু, খুব মৃদু অথচ গম্ভীর কণ্ঠে উচ্চারিত—যেন বহু-দূরাগত কার মেঘমন্দ্র রবে—বীজমন্ত্রটিতে কী ছিল তা বিশ্বেশ্বর জানেন না, কিন্তু তাঁর মনে হ'ল মুহূর্তমধ্যে তাঁর সমস্ত কিছু পরিবর্তিত হয়ে গেল।

চিন্তা ভাবনা কল্পনা ধারণা—এতদিনের আহরিত জ্ঞান, বিদ্যাচর্চা—বিচার-বিতর্ক জয়পরাজয় এক প্রবল আলোড়নে, এক প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যায় সব ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে কোথায় চলে গেল, তলিয়ে গেল কোন্ অতলে।

মনে হ'ল তাঁর জীবনের মূল সুদ্ধ নাড়া দিল ঐ শব্দটি।

সত্যিই কি তাঁর জন্মান্তর ঘটল!

ইষ্টমন্ত্র প্রদানের সময়, বীজমন্ত্র উচ্চারণের পূর্বে—পুরীজী সাধনার কিছু কিছু প্রক্রিয়া পদ্ধতির কথাও বলে দিয়েছিলেন। ধ্যান ও জপের বিভিন্ন সময়, কখন কিভাবে ধ্যানে বসলে মন অতি সহজে ও সত্বর ইষ্টসমাহিত হ'তে পারে, সে ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে বাহ্যজ্ঞান বিরহিত হ'তে পারে; সন্ধ্যা ও প্রভাতের কিছু সময় জপের জন্য নির্দিষ্ট রাখলেও, সম্ভব মতো অবসরে বা কর্মে অবিরাম জপ করাই সঙ্গত; শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বরসআস্বাদনে ধ্যানপূজা অপেক্ষা নিরন্তর জপের চেষ্টা, তাঁর নামকীর্তনই শ্রেয়—এসব তাঁকে বিশদভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

অবশ্য সেই সঙ্গে আরও বলেছিলেন, 'তবে তোমার প্রতি এ আমার উপদেশও নয়, নির্দেশও নয়, গুরু হিসাবে একটা কর্তব্য পালন মাত্র। তোমার এসবের কোন প্রয়োজন হবে না, তুমি ইতিমধ্যেই যথেষ্ট অগ্রসর, তোমাকে আমি কোন নিয়মের নিগড়ে বাঁধতে চাই না। আমি জানি তুমিই নিয়ম সৃষ্টি করবে, তুমি যে আচরণ করবে, যে উপদেশ দেবে, যে পথ নির্ধারণ করবে—তাই শ্রেয়, তা-ই সত্য। তৎসত্ত্বেও লৌকিক কিছু আচার-আচরণ পালনের চেষ্টা করা ভাল, নইলে অন্য অনেক অক্ষম ব্যক্তি, অনুপযুক্ত—তোমাকে অনুকরণ করার চেষ্টা ক'রে সাধারণের সম্মুখে অসত্যাদর্শ স্থাপন করাতে পারে।' আমাদের রসের সাধনা; শ্রীকৃষ্ণের সেবারসে নিমজ্জিত থাকায়—জন্যে

এর মধ্যেও কিছু কঠোরতর প্রয়োজন আছে।'

দীক্ষাগ্রহণের পরও কিছুদিন গয়াধামে ছিলেন বিশ্বেশ্বর, সে কেবল অধিক-সংখ্যক সঙ্গীদের গয়াত্যাগের অপেক্ষায়। এখানে আসার সময়ও তিনি কিছুটা স্বতন্ত্র ছিলেন, অনাবশ্যক কথাবার্তার মধ্যে যোগ দিতেন না, নিতান্ত প্রাকৃত-প্রসঙ্গ আলোচিত হ'তে দেখলে ত্বরিতগতিতে অগ্রবর্তী হতেন অথবা ক্লান্তির অকথিত অজুহাতে পিছিয়ে থাকতেন—ঐ দলের সঙ্গে ব্যবধান রচনা ক'রে।

কিন্তু এখন যেন অধিকলোকের সংসর্গই অসহ মনে হচ্ছে; ওঁর বিলম্ব দেখে—সংসারী যারা, একান্ত ভাবে ইহজীবনাশ্রয়ী, তারা গৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্য ব্যস্ত হবে তা তিনি জানতেন। হ'লও তাই। কিছু লোক পূর্বেই ফিরেছে, পরমেশ্বর পুরীর সঙ্গে নিত্য এত কি কথা বুঝতে না পেরে—যে কয়েকজন ওঁব সঙ্গাভিলাষী ছিল তারাও অনেকে আরও প্রায় পক্ষকাল অপেক্ষা করে চলে গেল। দুই চারিজন দরিদ্র সেবক, কৃষক শ্রেণীর লোক, তারা শাস্ত্র জানে না, তত্ত্বে তারা আগ্রহী নয়—তারা ওঁকেই জানে, ওঁর সাহচর্য লাভে, ওঁর সেবা করেই মুগ্ধ; উনি এই দীর্ঘপথ একা যাবেন তা তারা ভাবতেও পারে না। ঘর-সংসার, সেখানকার নিত্য অভাব অভিযোগ—এসবের চিন্তা পরিহার ক'রে ওখানেই স্থানীয় গৃহস্থবাড়ি ভিক্ষা ক'রে দিন কাটাতে লাগল, ওঁর প্রত্যাবর্তনেচ্ছার প্রতীক্ষায়।

এই সঙ্গীগুলিকে ত্যাগ করার ইচ্ছাও ছিল না বিশ্বেশ্বরের। এরা সরল, ওঁকে দেখে এদের ভক্তি হয়েছে—তিনি হরিনাম তথা কৃষ্ণনাম করতে বলেছেন তাই করছে। এ জীবনের এত দুঃখ কষ্টের হেতু বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার বৈষম্য এবং মানুষের অজ্ঞানতা—বৃহত্তর স্বার্থবুদ্ধির অভাব—এ উনি বলেছেন বলেই বুঝেছে। কিছু মূর্খ বা পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্রাহ্মণ পরস্পর-বিরোধী মতের দ্বারা তাদের চিন্তায় ধারণায় বিহ্বলতা আনছে, এক প্রকার কুয়াশার সৃষ্টি করছে—সেসব তথ্য যে এরা ঠিক বুঝতে পারে তা নয়, উনি বলছেন বলেই বিশ্বাস করে।

তবু তারাও নবদ্বীপ প্রত্যাবর্তনের পথে কিছু হতাশ হ'ল।

এ যাত্রায় উনি কোন উপদেশও দেন না, যুক্তির দ্বারা ধর্মের মূল সত্যও বোঝানোর চেষ্টা করেন না। যেন কী এক আচ্ছন্নতার মধ্যে ওঁর দিনরাত কাটে। কী ভাবেন, কী জপ করেন—কখনও কাঁদেন, কখনও দূর দিগন্তে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে স্থির হয়ে বসে থাকেন; পাক-শাকেও কোন আগ্রহ নেই। সঙ্গীরা রন্ধনের উত্তম স্থান নির্বাচন ক'রে, নদীজল দ্বারা সে স্থান ধৌত ক'রে, রন্ধনের সমস্ত আয়োজন ক'রে ওঁকে আহ্বান করলে কোন দিন উঠে যন্ত্র-চালিতের মতো রন্ধন করেন—তাও নিজের আহার তনুরক্ষার মতো এক মুষ্টি অন্ন—কোন দিন স্থির হয়ে বসেই থাকেন। সেবকরা কেউ ব্রাহ্মণ নয়, ওঁকে নিজেদের রন্ধন করা কোন দ্রব্য দিতে সাহস হয় না, দুধ ভিক্ষা পেলে তাই একটু এনে দেয়—তাও জোর ক'রে খাওয়াতে হয়—কোথাও বা কিছু ফলমূল। অভাবে শুধুই একটু গুড় আর জল হয়ত।

দীক্ষার পর যে কদিন গয়াধামে ছিলেন সে কদিনও এই ভাবই লক্ষ্য করেছে ওরা। এমন কি গুরুকে ভিক্ষা দেবারও কোন আগ্রহ নেই, গুরু নিজে না এলে উনি তাকে দর্শন করতেও যেতেন না। আহারে আগ্রহ নেই, রুচি তো নেইই।

দিনরাত কি ভাবেন, কি করেন—ওঁর সাধনা বা পূজাপাঠ কখন হয় কিছুই ওরা বোঝে না। ও কদিনও বুঝত না। এখনও বোঝে না। উনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন কিনা, এ মস্তিষ্কের কোন ব্যাধি কিনা—এ চিন্তাও দেখা দেয় তাদের মনে।

কেবল যখন তারা প্রত্যুষে বা সন্ধ্যায় হরিনাম করে, তখন যেন উনি কিছুটা উজ্জীবিত হয়ে ওঠেন, ওদের সঙ্গে নিজের মধুর গম্ভীর কণ্ঠ যোগ ক'রে উচ্চরবে নামগান করেন, এমন কি এরা পরিশ্রান্ত হয়ে নিরস্ত হওয়ার পরও বহুক্ষণ পর্যন্ত একাই সে নামগান চালিয়ে যান।

স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের পরও অবস্থার যে বিশেষ উন্নতি হ'ল তা নয়, এবং আকুলতা ও আবেগ এবং চিন্তা আরও বৃদ্ধি পেল।

ইন্দ্রাণী দেবী দীর্ঘকাল পরে তাঁর হারানিধি ফিরে পেলেন বটে—মাধবী দেবী তাঁর উপাস্য দেবতা—কিন্তু যে বিশ্বেশ্বর বিদেশে গিয়েছিলেন, তিনি যেন আর ফিরলেন না।

জননীকে প্রণাম করেন, পরিজন সেবকদের কুশল প্রশ্ন করতেও ভুল হয় না, স্মিত হাস্যে অন্তরালবর্তিনীর প্রণামও গ্রহণ করেন গৃহের মধ্যে গিয়ে—কিন্তু স্বাভাবিক কথাবার্তা আলাপ-আলোচনা কিছুই আর পূর্বের মতো দেখা যায় না।

দুই-চারদিন বিশ্রামের পর ইন্দ্রাণী সাংসারিক নানাবিধ সমস্যার কথা তুলতে যান, বিশ্বেশ্বর কিছুক্ষণ নির্বাক ও অন্যমনস্ক ভাবে শোনার পর বলেন, 'ও যা হয় তুমি করো মা, যা ভাল বোঝ—আমার আর এসব ভাল লাগছে না।'

ইন্দ্রাণী ক্ষুণ্ণ হন, চিন্তিত হন, অথচ এ ঔদাসীন্যর কারণও বুঝতে পারেন না। এটা শারীরিক না মানসিক ব্যাধি, গয়ায় পিতৃকার্য করতে গিয়ে কোন প্রেতের প্রভাবে পড়ল কিনা—এ চিন্তাও হয়।

তবে দীক্ষার সংবাদ তিনি পূর্বেই পেয়েছেন, অগ্রাগত যাত্রীদলের নিকট থেকে। অতবড় সাধু যাকে দীক্ষা দিয়েছেন—তার ওপর প্রেতের প্রভাব পড়বে কি ক'রে!

বধূ মাধবীর বিস্ময় দুশ্চিন্তার সঙ্গে বেদনাও যুক্ত হয়। ক'মাস পূর্বের কিশোরী এখন উদ্ভিন্ন-যৌবনা, মুকুলিকা এখন অর্ধপ্রস্ফুটিতা। তাঁর অন্তরের প্রেম ও শ্রদ্ধার ডালি নিয়ে অনন্যচিত্ত হয়ে এই প্রত্যাগমনটিরই প্রত্যাশায় ছিলেন দীর্ঘকাল।

কিন্তু এ কে ফিরে এল?

মনে হয় জীবন্ত কিন্তু প্রাণহীন কোন ব্যক্তি।

প্রণয় সম্ভাষণ না হোক, কিছু অন্তরঙ্গ স্নেহমধুর কথোপকথন আশা করেছিলেন বৈকি মাধবী।

কিছু শুনবেন ওঁর কথা, ওঁর বিরহ ব্যথা, আশা ও স্বপ্নের কথা—কিছু শোনাবেন নিজের এই দেশ ভ্রমণের বিবরণ, যাতায়াতের পথের বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা ; পথের প্রান্তবর্তী দেবতার কথা, গুরুদেবের কথা—এবং নিভৃতে এমন আশাও পোষণ করেছিলেন, অবচেতনে অন্তত যে, উনিও এই বালিকা বধূটির কথা কখনও কখনও চিন্তা করেছিলেন—এই অত্যাশ্চর্য রোমাঞ্চকর বার্তা শোনাবেন।

এসব প্রত্যাশার, দুরাশার সুখস্বপ্ন রাত্রি প্রভাতের ন্যায় বাস্তবতার রূঢ় আঘাত লেগে মনের কোন্ দূর দিগন্তে বিলীন হ'ল।

এমন কি পূর্বে যেটুকু স্নেহের নিদর্শন পেতেন, তাও আর পেলেন না। শরণ করতে এসে পূর্বাভ্যাস মতো পদসেবা করতে বসলেন, তখনও স্বামী কোন সম্ভাষণ করলেন না ; কিছু জানতেও চাইলেন না, কিছু জানালেনও না—নীরবে নির্জীব কোন পুত্তলিকার মতো পদসেবা নিয়েই যেতে লাগলেন, যা ওঁর একান্ত স্বভাব-বিরুদ্ধ। পূর্বে, কিছুক্ষণের মধ্যেই সস্নেহে আকর্ষণ ক'রে পাশে শুইয়ে দিতেন, আজ সেকথা মনে পড়ল না। বোধ করি তাঁর অস্তিত্বই অনুভব করলেন না উনি।

এক এক সময় সন্দেহ হয় সেই ব্যক্তিই ফিরেছেন তো ?

আবার পরক্ষণেই নিজেকে তিরস্কার করেন।

সেই দিব্য কান্তি—বরং—দীর্ঘপথ অতিক্রান্ত করার কঠোর শ্রম ও অনিয়ম সত্ত্বেও—যেন শতগুণে বর্ধিত ; সেই আয়ত চক্ষু, সেই সুমধুর হাসি। হাসি এবার ক্বচিৎ কখনও লক্ষিত হচ্ছে, তবু মাধবীর চোখে পড়েছে বৈকি। সে হাসির মাধুর্যে কৌতুক নেই, আছে মানবোত্তর কোন প্রসন্নতা।...

দুই একদিন এই ভাবে কাষ্ঠবৎ থাকার পর বোধ করি সহসাই বিশ্বেশ্বর সচেতন হলেন যে তাঁর পদতলে আরও একটি প্রাণী পড়ে থাকে, সে প্রায় সমস্ত রজনীই বিনিদ্র অতিবাহিত করে। তিনি এবার অন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন। শয়নের সময়টাই সংক্ষেপ ক'রে আনলেন।

মাধবীর যন্ত্রণার নিরসনে তাঁর অক্ষমতা বুঝেই—স্ত্রীর সঙ্গে অতি সাংসারিক বা লঘু বিশ্রম্ভালাপ আর তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়—অন্তত এখন তো তিনি একান্ত অপারগ—এই ব্যবস্থা।

যথাসময়েই শয়নকক্ষে আসেন কিন্তু শয্যায় যান না। মাটির উপর একটি আসনে স্থির হয়ে উপবিষ্ট থাকেন। প্রথম প্রথম মাধবী ওঁর জন্য অপেক্ষা ক'রে থাকতেন কিন্তু বিশ্বেশ্বর তাঁকে অতি সংক্ষিপ্ত ভাষণে নির্দেশ দিলেন, 'তুমি শয়ন করো, আমার বিলম্ব হবে।'

একেবারেই স্থির হয়ে বসে থাকেন, সম্মুখের প্রদীপটির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে। প্রায় নিষ্পলক সে দৃষ্টি।

মাধবী বহু রাত্রি পর্যন্ত অপেক্ষা ক'রে এক সময় ঘুমিয়ে পড়েন, তারপর

উনি কখন এসে সন্তর্পণে শয্যা গ্রহণ করেন তা তিনি জানতেও পারেন না। আবার এক এক দিন সম্ভবত সুগভীর ক্লান্তিতেই সেই মেঝের উপরেই শুয়ে পড়েন, উত্তরীয় খুলে বিছিয়ে নেবার কথাও মনে পড়ে না।

শুধু যে পূর্বজীবনের সঙ্গীদের পরিহার করেছেন বিশ্বেশ্বর তাই নয়—সে সব অভ্যাসও।

গঙ্গাতীরে বহু সময় অতিবাহিত করা আবাল্য অভ্যাস; নিত্য কেশবের গৃহে যাওয়া; অধ্যাপনা অধ্যয়ন—কিছুতেই আর রুচি নেই তাঁর।

আসলে পরিচিতদের কাউকেই ভাল লাগছে না। তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার অর্থই বহু বৃথা বাক্যব্যয়, বহু অলস জল্পনা, নানা অবান্তর প্রসঙ্গ। মানুষের জীবনের যা চরম লক্ষ্য, অন্তত ওঁর নিজের বিশ্বাসমতো—তা তিনি জানতে পেরেছেন। সেখানে পৌঁছবার পথ দীর্ঘ, ভ্রম-আশঙ্কাসঙ্কুল, কষ্টকর, কণ্টকময়, বাধা-বিকীর্ণ। এখন একমনে সেই পথের কথাই চিন্তা করতে চান উনি, এ সময়ে অন্তঃসারশূন্য উদ্দেশ্যহীন কথাবার্তা, অথবা খ্যাতি যশ প্রতিষ্ঠা লাভের উপায় আলোচনা, পরচর্চা—বড় বিরক্তিকর মনে হয়।

সেই কারণেই আজকাল তিনি গৃহদেবতার মন্দির কক্ষে অধিক সময় অতিবাহিত করেন। এ মন্দির যেন তাঁর আশ্রয়স্থল বহির্জগৎ থেকে আত্মগোপন করার। এখানে এসে সহজে কেউ তাঁকে বিরক্ত করতে—পার্থিব জগতে, সংসারের অজস্র অপ্রীতির মধ্যে টেনে আনতে সাহস করবে না।

অবশ্য এক এক সময় মনে হয়—এ কি এক ধরনের প্রবঞ্চনা হচ্ছে না?

এখানে বসে থাকেন ঠিকই, কিন্তু এ সময় কি জানকীনাথের পূজা বা ধ্যানে বা মননে নিমগ্ন থাকেন?

না, বরং এক এক দিন সে কথা ভুলেই যান। শঙ্কিতা ইন্দ্রাণী লক্ষ্য করেন—দেবতার স্নান পূজা আরতি বাল্যভোগ নিবেদন কিছুই হয় না—চোখ বুজে বসেই থাকেন, শুধু দুই চক্ষু দিয়ে মধ্যে মধ্যে অবিরল ধারে জল ঝরে পড়তে থাকে—আকুলতায়।

এই সব সময়ে জননী ওঁর ধ্যানে চিন্তায় বাধা দিতে বাধ্য হন।

চমকিত বিশ্বেশ্বর চক্ষু উন্মীলিত করা মাত্র নিজের অপরাধ বা ত্রুটি বুঝতে পারেন, জননীর কাছে ও গৃহদেবতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে করণীয় কর্মে মনোনিবেশ করেন।

আবারও কখন হয়ত হাত থেমে যায়, মন্ত্রোচ্চারণ হয়ে ওঠে না। ভোগের স্থান মার্জনা করতে এসে মাধবী দেখেন তখনও পর্যন্ত বাল্যভোগই অনিবেদিত।

অথচ এ সবটাই ইষ্টের ধ্যান বা চিন্তা নয়। কিছুটা কিংকর্তব্যবিমূঢ়তাও।

কিছুদিন ধরেই জানকীনাথ রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে একটা বিতর্ক চলছে মনে মনে।

মধ্যে মধ্যে ধ্যানে ইষ্টকে ঐ জানকীনাথের পটের সঙ্গে মেলাবার চেষ্টা

করেন। রামচন্দ্র শ্যামল সুন্দর, শ্রীকৃষ্ণও তাই। তবে এক হ'তে বাধা কি? ত্রেতার রামচন্দ্র দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ হয়ে জন্মেছেন—সেই রূপ সেই মূর্তি নিয়ে—এইটেই তো স্বাভাবিক। তবু ওঁর মন ভরে না কেন?

গুরুদেব বলেছেন অন্য অন্য অবতারে ঈশ্বরের অংশমাত্র প্রকাশ পেয়েছে—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ঈশ্বর, মানবদেহ ধারণ ক'রে মানবলীলা আস্বাদনের ইচ্ছাতেই এই মূর্তি পরিগ্রহ তাঁর। কোন কোন গ্রন্থেও এই মত আছে। এই সব পঠনে ও শ্রবণেই কি এই দ্বিধার সৃষ্টি হয়? যখন মানবদেহই ধারণ করেছেন তখন অবতারের দেহকে কল্পনা করতে দোষ কি?

আবার একসময় ওঁর মন যেন বলে তিনি আরও সুন্দর।

সে রূপের বর্ণনা হয় না, মানুষের সীমিত জ্ঞানে বুদ্ধিতে তার ধারণা জন্মে না, তা কল্পনা করা যায় না।

তিনি এই মানসিক আলোড়ন ও সংশয়ের মধ্যেই এক এক সময় কখন যেন এক অনির্বচনীয় সেবারসে নিমগ্ন হয়ে যান। কল্পনা করেন তিনি দাসরূপে—কখনও বা নিজেকে দাসী বলেও কল্পনা করেন—সেই পরমপ্রিয়র সেবা করছেন, কখনও পদসেবা, কখনও অঙ্গমার্জনা; কখনও বা তাঁকে স্কন্ধে বহন করছেন; কখনও বা মনে হয় মাল্যচন্দন বস্ত্রে রাজবেশে সজ্জিত করছেন। আবার কখনও মনে হয় সেই পরমপুরুষ ওঁকে আলিঙ্গন করছেন, আর—আর ওঁকে চুম্বনও করছেন।

এমন উপলব্ধি হয় কদাচিৎ। এক আধ লহমার জন্য। কিন্তু যখন এ চিত্র মানস কল্পনায় চিত্রিত হয় তখন কী এক অনির্বচনীয় আনন্দরসে শরীর মন আপ্লুত হয়ে যায়! তিনি যেন ইহজগতে নেই, ইহজীবনে নেই; তিনি যেন বিগলিত হয়ে যাচ্ছেন, কোন্ এক পরম সত্তায় লীন হয়ে যাচ্ছেন—

তবু এই সমস্ত সময়গুলোতেও সে মূর্তি সম্যক ধ্যানে আসে না কেন? কেন মানসপটে স্পষ্ট পরিপূর্ণ রূপে দেখতে পান না?

তিনি যাকে দেখেন, মনে হয় যাকে দেখছেন, সে একটা আব্‌ছা অস্তিত্ব মাত্র। তার অবয়ব আছে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গও আছে কিন্তু সে কেমন তা বলতে পারবেন না।

তাইতেই এত আকুলতা, এত অন্যমনস্কতা।

অবশেষে এক সময় নিজেই আত্মসচেতন হয়ে ওঠেন। নিজের স্পর্ধা তথা নির্বুদ্ধিতার জন্য নিজেকে লজ্জিত ও অপরাধী বোধ করেন।

এই যে দিবাস্বপ্ন, কল্পনাবিলাস—তাঁর সেবকরূপে নিজেকে চিত্রিত করার চেষ্টা—এ তো আত্মপ্রতারণাই।

অহমিকার তরুমূলে জলনিষেকের জন্য আত্মপ্রতারণা।

বহু একাগ্র সাধক বহু বর্ষের সাধনায়—কেউ বা জন্মজন্মান্তরেও—এই স্তরে উঠতে পারেন না, উনি দীক্ষাপ্রাপ্তি মাত্র সেই স্তরে পৌঁছনোর স্বপ্ন দেখছেন!

গুরুদেব বার বার ওঁকে যোগ্য আধার, অগ্রসর ইত্যাদি বলাতেই তাঁর এই অহমিকার সৃষ্টি হয়েছে। ধিক্।

'উদ্বাহুরিব বামনঃ' উনি এখনই হাত বাড়িয়ে সেই দেহধারী দেহাতীতের রূপকে ধ্যানে পেতে চাইছেন—যিনি সেই অদ্বিতীয় বিরাট সত্তা—অনাদি অনন্ত, কারণাতীত গুণাতীত প্রভৃতি কোন পরিচিত শব্দে যাঁকে বোঝানো যায় না, যাঁকে বর্ণনার ভাষা অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নি।

না, এখনও বহু পরীক্ষা বাকী। যোগ্যতার বহু প্রমাণ উপস্থাপিত করার।

তিনি যে সংকল্প নিয়েছেন—নানা ভাবে নিপীড়িত অধঃপতিত, বিপথ-গামী দেশবাসীকে ঈশ্বরাভিমুখী করতে ; তাদের সহজ অথচ সত্যসাধনার পথ প্রদর্শন করতে, পাণ্ডিত্যের অভিমান ও তর্কবিতর্ক থেকে, জ্ঞানের অজ্ঞানতা থেকে, অর্ধজ্ঞানের ধূম্রজাল থেকে তাদের রক্ষা ক'রে তাদের প্রত্যক্ষত ঈশ্বরকে অবলম্বন করার শিক্ষা দিতে—সে সংকল্পই বা এত শীঘ্র ভুলে গেলেন কি ক'রে!

পূর্ণ অজ্ঞানতা অনেক শ্রেয়, তা সত্যের জ্ঞানের আলোকপাত মাত্রে বিদূরিত হয় ; জ্ঞান-বিহ্বলতা, সংশয়, তত্ত্ব, তর্ক প্রভৃতি কুহেলিকা—এরা সত্যের আলোক প্রবেশে বাধা দেয়। ঈশ্বর নিয়ে তর্কবিতর্ক, জ্ঞানের প্রতি-যোগিতা মানুষের মন থেকে তাঁকে বহুদূরে ঠেলে দেয়।

উনি তো সেই কর্মেই আত্মনিয়োগ করতে মনে মনে প্রতিশ্রুত—একই পথে অজ্ঞানকে অর্ধজ্ঞানকে দূর ক'রে মানুষকে সহজ সরল সাধনায় উত্তরিত করবেন, যাতে তারা লোভ লালসা দ্বন্দ্ব প্রভৃতি জাগতিক অশান্তি থেকে মুক্তি পায়। এমন আত্মিক শক্তি লাভ করে যাতে মানব-জীবনের অঙ্গীভূত ঐসব বিষ-জ্বালা অনায়াসে উপেক্ষা করতে পারে।...

ঈশ্বরে বিশ্বাস, সহজ সরল বিশ্বাসে আত্মীয় জ্ঞানে তাঁকে ভালবাসার চেষ্টা—তাঁর নামগান করতে করতেই জন্মাবে।

সে বিশ্বাস, সে ভালবাসা সহস্র বক্তৃতা ও শাস্ত্র বাক্যের পরস্পরবিরোধী কচ-কচিতে আসবে না, অহরহ তাঁর নাম কীর্তনে, নাম জপেই আসবে। কারও সাহায্যে নয়—নিজেই একদিন তা লাভ করবে।

তবু একটা রূপ চাই, একটা আকার।

প্রতীক একটা কিছু, সম্মুখে একটা অবলম্বন।

শ্রীকৃষ্ণই সেই প্রতীক। তাঁরই নামগানের মধ্য দিয়ে মানুষ তাঁকে লাভ করতে পারবে।

এই নাম প্রচারই হোক ওঁর ব্রত, ওঁর সাধনা। হয়ত বা ওঁর সিদ্ধিও।

নিজে ব্রহ্মে বিলীন হওয়া, নির্বিকল্প সমাধি তো ওঁদের কাম্য নয়—নামরস প্রেমরস আস্বাদনই তো ওঁদের লক্ষ্য। সে কথা না ভুলে যান।

উনি যেমন অকস্মাৎ দূরবগাহতা ও মৌনতার ব্যবধান রচনা ক'রে সকলের সঙ্গে প্রায় সম্পর্কচ্ছেদ করেছিলেন, তেমনিই অকস্মাৎ আবার সকলের মধ্যে এসে

দাঁড়ালেন।

শুধু নিরাশ করলেন ছাত্রদেরই।

তারা এতদিনেও আশা ত্যাগ করে নি। এবার উনি করজোড়ে তাদের বললেন, 'অধ্যাপনা আর আমার দ্বারা হবে না, ওতে আর আমার রুচি নেই। তোমরা আমাকে মার্জনা করো। অন্য শিক্ষক বা গুরু তোমরা নির্বাচন ক'রে নাও। তোমাদের প্রতি আমার আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা রইল।'

॥ ১০ ॥

প্রবল ব্যক্তিত্বে অসম্ভবও সম্ভব হয়। বিশ্বেশ্বরের ক্ষেত্রে আর একবার সে সত্য প্রমাণিত হ'ল।

যেখানে এ-ভাবের নামকীর্তন একেবারেই প্রচলিত ছিল না, তান্ত্রিক সাধনার গোপন রহস্যাবৃত অনুষ্ঠানই যেখানের বৈশিষ্ট্য; পাণ্ডিত্যের বা তদনুরূপ আড়ম্বরের দ্বারা সাধারণ মানুষকে ভীত অভিভূত করার চেষ্টা—উচ্চবর্ণে ও নিম্নবর্ণে বিপুল ব্যবধান রক্ষা ক'রে অধিকসংখ্যক মানুষকে অবদমিত রেখে নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখার—সেখানে এরূপ সর্বালিঙ্গন-কারী নামযজ্ঞের আয়োজন সফল হবে—কেউ ধারণাও করতে পারে নি।

প্রথম প্রথম ওঁর পরিচিত ব্যক্তি ও বন্ধুরাই অনেকে সন্দেহের চোখে দেখে-ছিলেন। দু'চারজন সামান্য লোককে নিয়েই শ্রীকৃষ্ণ-নাম-সংকীর্তন তথা হরিনাম গান আরম্ভ হয়েছিল। কিন্তু সেই সাধারণ সামান্য লোকের সংখ্যা শীঘ্রই অসামান্য হয়ে উঠল।

বিশ্বেশ্বরের দেবদুর্লভ কান্তি, তপ্তকাঞ্চন বর্ণ, এবং—সর্বোপরি দৃপ্ত বলিষ্ঠতা লোককে আকৃষ্ট ও আবিষ্ট করার এমনই এক শক্তি তাঁকে দিয়েছিল যে—উপমাটা অবশ্য এক্ষেত্রে ঠিকমতো প্রযোজ্য নয়—আলোকাভিমুখী পতঙ্গের মতোই ধাবিত হ'তে লাগল সকলে।

বিশ্বেশ্বরের দীর্ঘ দেহ, সাধারণ যে কোন মানুষের মাথার উপর জেগে থাকে তাঁর মাথা। তেমনি মিষ্ট গম্ভীর কণ্ঠস্বর। ভগবান যেন ওঁকে এই কার্যের জন্যই প্রস্তুত ক'রে পাঠিয়েছিলেন—এই সকল লোকোত্তর বৈশিষ্ট্য দিয়ে।

এর পর আসতে আরম্ভ করলেন তাঁর সহাধ্যায়ী ও বন্ধুরা। এতদিন এঁরা কিছু দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন, এবার এই জয়যাত্রার কলেবর দিন দিন বৃদ্ধি পেতে দেখেই হোক বা বিশাইয়ের হরিনামের প্রতি প্রীতির আন্তরিকতা দেখেই হোক—তাঁরা ওঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন। সেও সংখ্যায় বড় কম নয়। বন্ধুত্বের মধ্যে কোন দিনই বাছবিচার ছিল না বিশাইয়ের। পথের ধারে বসে যে দরিদ্র সহপাঠী কলার খোলা, থোড়, মোচা ইত্যাদি বিক্রী করে তার সঙ্গেই যেন কৌতুকক্রীড়া ছিল আরও বেশী। শুধু বাল্যে নয়, প্রাপ্তবয়স্ক হবার পরও

যথেষ্ট। তার কাছ থেকে এটা ওটা কেড়ে নিয়ে আসতেন, সে অনুনয় বিনয় ক'রে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করত, আবার অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে সে বস্তু ফেলে চলে আসছেন দেখলে সে বন্ধুই আবার ছুটে গিয়ে গাছিয়ে দিয়ে যেত।

সে সম্ভবত এই উপদ্রব উপভোগই করত। এ তো এক রকমের সামাজিক স্বীকৃতি।

এই সব বন্ধুরা এবার যোগ দিলেন ওঁর হরিনামের দলে। কেশব এলেন, রঘুনাথ এলেন, নৃসিংহ এলেন—আরও বহু সহাধ্যায়ী বা বন্ধু এসে যোগ দিলেন। নিজেদের তীব্র ঈশ্বর প্রেম থাকুক বা না থাকুক, শ্রীকৃষ্ণকে পুরুষোত্তম বলে বুঝতে পারুন বা না পারুন—তাঁরা বিশ্বেশ্বরের আন্তরিকতায় মুগ্ধ।

'এত বড় পণ্ডিতের এই পরিবর্তন, এ তো সামান্য কথা নয়। ইনি যখন বলছেন, তখন এ সত্যই। আমাদের বিচারের আবশ্যক নেই।' এই তাঁদের মনোভাব।

তার চেয়েও যেটা উল্লেখ্য—বিশ্বেশ্বরের বিশেষ জয়লাভ বলতে হবে—প্রবীণ পণ্ডিত ব্রহ্মস্বরূপ ভট্টাচার্য, যিনি বেদান্তে সুপণ্ডিত এবং একান্ত ভাবে অদ্বৈতবাদী, সেজন্য লোকে তাঁকে বেদান্তাচার্য বলে উল্লেখ করত—বিশ্বেশ্বরের পিতৃবন্ধুও বটে—এই ধরনের ভাবে-ভেসে-যাওয়া সাধনা তাঁর কাছে এতকাল পরিহাসের বস্তু ছিল, জ্ঞানমার্গ ব্যতীত অন্য কোন পথে বিশ্বাস করতেন না—তিনিও সেই ভাবেই ভেসে এলেন, নিজে থেকে এসে এই নামকীর্তনেই যোগ দিলেন।

প্রথমে তর্ক করতেই এসেছিলেন, এসেছিলেন নিরস্ত করতে—জ্ঞানী ব্যক্তিকে অজ্ঞানবৎ আচরণ থেকে নিবৃত্ত করতে, কিন্তু বিশ্বেশ্বরের ক্ষুরধার যুক্তির সঙ্গে সনম্র মিনতিতে শুধু মুগ্ধ নয় যেন বিগলিত হয়ে গেলেন।

অবশ্য বয়সে প্রবীণ এবং সুপণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি চিরদিনই বিশ্বেশ্বরকে স্নেহ করতেন। এত অল্পবয়সে সকল শাস্ত্রে পারঙ্গমতা লক্ষ্য ক'রে গৃহিণীকে বলতেন, 'এ বালক সাধারণ নয়; অলৌকিক শক্তিধর এ।' আর সেই কারণেই, বালকের সঙ্গে হলেও, শাস্ত্রাদি নিয়ে সমানে সমানে আলোচনা করতেন।

ব্রহ্মস্বরূপ ভট্টাচার্য ছাড়া আর যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি এলেন, বস্তুত শেষ পর্যন্ত সহায় হয়ে দাঁড়ালেন—তিনি হলেন শ্রীনিবাস আচার্য।

ইনি ব্রহ্মস্বরূপের মতো জ্ঞানী ও সুপণ্ডিত না হ'লেও বিদ্বান এবং ধর্ম-পরায়ণ বলে এঁরও যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। ইনিও বিশ্বেশ্বর অপেক্ষা বেশ কিছুটা বয়সে বড়। ইনি এসে প্রায় বিশ্বেশ্বরকে গুরুত্বে বরণ ক'রে নিলেন।

দল ক্রমেই বর্ধিত হচ্ছে। দিনেরাত্রে যখন তখন যেন এক বিপুল বাহিনী হরিনাম কীর্তন করতে করতে নবদ্বীপের পথ পরিক্রমা করে। সন্ধ্যার পরই বেশী, কারণ দিবাভাগে যে যার জীবিকার কার্যে ব্যস্ত থাকে, নইলে তাদের সংসার অচল হয়। এরা তো কেউ সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী নয়।

এ ছাড়া বিশ্বেশ্বরের ও শ্রীনিবাসের প্রাঙ্গণেও এক একদিন বিরাট জমায়েৎ

হচ্ছে। কোথা থেকে কি ক'রে এত আয়োজন হচ্ছে, কে কি এনে দিচ্ছে—তা বোঝা যায় না। আয়োজন কিছু বিপুলই হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। হরিনাম তো শুধু হরিনামই নয়—তার সঙ্গে আহারাদি, প্রসাদ-বিতরণেরও ব্যবস্থা রাখতে হচ্ছে। এ আবশ্যিক নয়, এই লোভেই যে লোক আসছে তাও নয়—ভক্তরা, সাধারণ মানুষ আপনিই মিষ্টান্ন, রন্ধনের নানাবিধ আয়োজন মাথায় করে এনে পৌঁছে দিয়ে যাচ্ছে।

ইন্দ্রাণী ও মাধবী এবার যেন কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হন। তাঁরা দ্বিগুণ উৎসাহে পরিশ্রম করতে লাগলেন। রন্ধনাদির ভার তো তাঁদেরই উপর। অন্য আরও বহু ব্যবস্থা তাঁদেরই করতে হ'ত। তাতেও তাঁরা সুখী। বিশাই যদি এই ভাবেও গৃহবাসী হয়ে থাকে তো সেও ভাল।

আর, হয়ত মনের গভীরে এ আশাও পোষণ করেন দুজনে, ঘরবাসী হয়ে থাকলে একদা সংসারীও হ'তে পারে। বিচিত্র কি!

ভক্ত বা বন্ধুই থাকবে, বিরূপ বা বিদ্বেষী কেউ থাকবে না—এ সংসারে তা সম্ভব নয়।

এসব ক্ষেত্রে, এই অবিশ্বাস্য জনপ্রিয়তা দেখে অনেক বন্ধুও শত্রু হয়ে দাঁড়াবে, সে-ই স্বাভাবিক।

নিমাইয়ের এই প্রতিপত্তি, সমাদর, বিপুলসংখ্যক অনুগামী—বিদ্বেষ ও অসূয়ার এই তো যথেষ্ট কারণ।

তবে, এ ছাড়াও কিছু ছিল।

নবদ্বীপে জ্ঞানী ও পণ্ডিত যাঁরা—অন্যান্য স্থানের অপেক্ষা এখানে তাঁরা সংখ্যায় অনেক বেশী তা অনস্বীকার্য—তাঁরা অধিকাংশই তান্ত্রিক সাধনায় বিশ্বাসী। এঁদের সাধনা নিশীথরাত্রে, নিভৃতির মধ্যে। কোন কোন ক্ষেত্রে পঞ্চ-মকার এঁদের করণীয় কিন্তু বেশীর ভাগ এই তথাকথিত সাধকরা এটাকেই প্রধান, মুখ্য ক'রে নিয়েছেন। বিশেষ মদ্য ও মৈথুন বড় প্রিয়—ভ্রষ্টাচারী কপটদের কাছে তো বটেই—এক শ্রেণীর অর্ধসাধকদের কাছেও।

এই দল ক্রুদ্ধ হবে এ তো অবধারিত। যাঁরা শুধু কুকর্মের জন্যই এ সাধনাকে অবলম্বন করেন নি, এর অন্তর্নিগূঢ় সত্য উদ্ঘাটনে ব্রতী—তাঁরা বিরক্ত হলেন।

বিশ্বেশ্বরকে এক শিক্ষক এসে একদিন তিরস্কার ক'রে গেলেন। এলেন ওঁর এক সহাধ্যায়ী ব্রহ্মানন্দ—যিনি এই বয়সেই সাধনায় অনেক অগ্রসর হয়ে গেছেন।

পিতৃপিতামহের রীতিপদ্ধতি ত্যাগ ক'রে এ তোমার কি অনাচার? লেখা-পড়া শিখেছ, অধ্যয়ন যেমন তেমনি অধ্যাপনাও তোমার অবশ্য কর্তব্য। গৃহে জননী, যুবতী স্ত্রী, সংসারধর্মও অবশ্য পালনীয়। তুমি এমন ভিখারীর মতো পথে পথে নেচে গেয়ে বেড়াচ্ছ—তোমার কি মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটল? তাহলে চিকিৎসা করাও, কোন প্রবীণ বৈদ্য ডেকে।

তাঁদের এই বক্তব্য।

এর উত্তরে করজোড়ে বলেন বিশ্বেশ্বর, 'আমি জানি না এ কাজ কে করাচ্ছে। আমার বুদ্ধি চেতনা চিন্তা কিছুই আমার স্ববশে নেই। আমার অন্তরে বসে বৃহৎ কোন শক্তি, বোধ করি বিশ্বের সমস্ত কার্যের যিনি নিয়ন্তা, তিনিই এ কাজ করিয়ে নিচ্ছেন। তিনিই চালক, আমি চালিত। সুতরাং আমাকে আপনারা ক্ষমা করবেন।'

এঁরা সকলেই বিশ্বেশ্বরকে উন্মাদদশাপ্রাপ্ত সাব্যস্ত ক'রে জননী ইন্দ্রাণী দেবীকে উত্তম চিকিৎসা করানোর উপদেশ দিয়ে গেলেন। কেউ বললেন ব্রাহ্মী বা মধ্যমনারায়ণ তৈলের কথা, কেউবা সোজাসুজি চন্দ্রহংসিকার * ব্যবস্থা দিয়ে গেলেন।

এঁদের এতজনের কথা শুনে ইন্দ্রাণীও যে ভয় পান নি তা নয়—কেবল মাধবীর দৃঢ়তাতেই তিনি স্থির রইলেন। মাধবী বললেন, 'কেন মা আপনি বিচলিত হচ্ছেন ? ওঁর আচরণে উন্মাদের কি লক্ষণ দেখলেন ? উনি গৃহদেবতার পূজা-সেবায় কি অবহেলা করেছেন ? আপনার সঙ্গে কথাবার্তা যা বলেন তা কি আপনার অস্বাভাবিক মনে হয় ?···ওঁকে তো জানেন, বাধা দেবেন না, ব্যস্ত করে তুলবেন না, তাতে হিতে বিপরীত হতে পারে।'

ইন্দ্রাণী কথাটা বুঝলেন। তবে পূর্ণ আশ্বস্ত হলেন বেদান্তাচার্যর কথায়। তিনি বললেন, 'তোমার পুত্র এখনই সাধনার উচ্চমার্গে উন্নীত হয়েছে, ঈশ্বরের কৃপাপ্রাপ্ত সত্যকার অধিকারী ব্যতীত এত অল্পকালে এতদূর অগ্রগতি সম্ভবে না। এ উন্মাদ নয়, একে যারা উন্মাদ বলে তারা নির্বোধ এবং অন্ধ। সাধারণ মনুসন্তান থেকে এ ছেলে এতই উন্নত—যে এর আচরণের পরিমাপ করা, সম্যক অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা তাদের সাধ্যাতীত। আপনার এই পুত্রই যথার্থ তার বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে, আপনার গৌরবস্থল হবে। এর জননীরূপে আপনার নামও স্মরণীয় হয়ে থাকবে। একে লালন করুন, সাহায্য করুন—ব্যস্ত হবেন না, ওকে উদ্‌ব্যস্ত করে তুলবেন না।'

স্ত্রী বা জননী শান্ত হলেন বটে—কিন্তু যাদের অন্তরে মাৎসর্য প্রবল তারা শান্তি পাবে কিসে ?

বিশ্বেশ্বরের ভক্ত ও অনুগামীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পেতে বিপুল আকার ধারণ করল। ওঁর গৃহে বা শ্রীনিবাসের গৃহে—যেদিন যেখানে ভগবৎপ্রসঙ্গ ও নামকীর্তনের ব্যবস্থা থাকে—যেন বিপুল মহোৎসবের আয়োজন হয়। ভক্তরা মাথায় ক'রে বয়ে আনেন তার উপকরণ—কোন বস্তুর অভাব ঘটে না। আর যখন পথপরিক্রমায় যাত্রা করেন তখন বোধ হয় অর্ধক্রোশ দীর্ঘ এক বিপুল-দেহ অজগর চলেছে।

ঘৃতের মশাল, খোল করতাল প্রভৃতি নানা বাদ্যযন্ত্র, উদ্দাম নৃত্য, সহস্র কণ্ঠে উচ্চারিত হরিনাম-ধ্বনি বিদ্বিষ্ট ঈর্ষীদের কর্ণে গলিত সীসকের মতো

* ছোট চাঁদর—এর পাতার রস ঘোরতর উন্মাদের মাথায় দেওয়া হয়।

অনুভূত হয়, এ দৃশ্যে তাদের চক্ষু অন্ধ হবার উপক্রম হয়।

এরা—বিশেষ ক'রে কপটী তান্ত্রিকের দল, এবার ওঁকে দমন করার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করল।

বহু লোক মিলে কাজীর কাছে গিয়ে নালিশ করল—এরা নাকি নাগরিকদের শান্তিভঙ্গ করছে, অন্য ধর্মাবলম্বী বা ভিন্ন সাধনমার্গীদের ঈশ্বরচিন্তায় ব্যাঘাত জন্মাচ্ছে। কাজী এই নাম-মহোৎসব বন্ধ করতে গিয়ে বিশ্বেশ্বরের চরিত্র-মাধুর্যের কাছে পরাজয় স্বীকার করলেন, বরং একটা আত্মীয়বৎ সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল।

প্রহারাদির উদ্যোগও হ'ল কিছু কিছু। এরা হরিনামের অন্তরালে মদ্য-মাংস ব্যভিচার চালায় তাও প্রমাণ করার চেষ্টা হ'ল। এমন কি স্ত্রীলোকঘটিত দুর্নামেরও ব্যবস্থা বাদ গেল না।

কিন্তু পর্বতগাত্রে প্রত্যাহত সমুদ্র-তরঙ্গের মতোই এসব আঘাত ফিরে গেল ব্যর্থ হয়ে, পাষাণ গলাতে বা টলাতে পারল না।

এর সঙ্গে নানাবিধ কুৎসা রটনাও চলছিল বৈকি!

কিন্তু সে চলছিল নেপথ্যে; তার বৃত্তান্ত একেবারে যে বিশ্বেশ্বরের কর্ণগোচর হয় নি তা নয়—তবে তিনি এমন এক নেশায় মত্ত ছিলেন যাতে কারও কোন অনভিপ্রেত প্রসঙ্গই—তাঁর কর্ণে প্রবেশ করলেও মর্মে পৌঁছত না। তিনি এত সব গ্রাহ্যও করতেন না।

তথাপি, একটা দিনের এক কদর্য ঘটনায় বিচলিত—এবং চিন্তিতও—না হয়ে পারলেন না।

কোন এক বিশেষ ক্ষণে এক একটি ঘটনা বা সংবাদ বা বাক্য—মানুষের মনে এমন আঘাত করে যে তার জীবনের গতিই পরিবর্তিত হয়ে যায়—বিরাট পরিবর্তন ঘটে যায় তার জীবনযাত্রায়, তার ফল হয়ত সমস্ত পরিবারকেই অল্পবিস্তর ভোগ করতে হয়—কখনও বা সমগ্র বংশের ইতিহাস বহুদিন পর্যন্ত সে ক্ষণের চিহ্ন বা ফলাফল বহন করে।

সেদিনের সে তুচ্ছ ঘৃণার্হ এই ঘটনাও, শুধু বিশ্বেশ্বর ইন্দ্রাণী বা মাধবী নয়—কেবলমাত্র সেই কাল নয়, কিছুসংখ্যক দেশবাসী নয়—বহু শতাব্দী ধরে কোটি কোটি লোকের জীবনে, বস্তুত জাতীয় ইতিহাসেই তার ছাপ রেখে গেছে। সম্ভবত অনাগত বহু শতাব্দী সে ঘটনার ফলাফল বা তার ইতিবৃত্ত বহন করবে।...

একদা প্রাতঃকালেই, সবেমাত্র গৃহদেবতার প্রাভাতিক পূজা ও বাল্যভোগ নিবেদন সমাপ্ত ক'রে পূজাগৃহের বাহিরে এসেছেন বিশ্বেশ্বর; জননী নিজের সন্তানের বাল্যভোগের আয়োজনে ব্যস্ত, অকস্মাৎ অনাহূত ভাবে এক মধ্যবয়সী অধ্যাপক বিনা আমন্ত্রণেই ওঁদের অঙ্গনে প্রবেশ করলেন।

অধ্যাপক বটে, নিজেকে বিশিষ্ট সাধক বলেও প্রচার করেন, কিন্তু অধ্যাপনা বিষয়ে তাঁর যে খুব সুনাম আছে তা নয়। তবে বিখ্যাত নৈয়ায়িক বংশের

সন্তান ব'লে তাঁকে কেউ একেবারে উপেক্ষা করতেও সহেস করেন না। বিচার-সভায় কিম্বা অধ্যাপক বিদায়ে আমন্ত্রণ জানাতেই হয়।

তিনি ভিতরে এসে—তখনও—পট্টবস্ত্র-পরিহিত বিশ্বেশ্বরকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন, তার পর দুই হাত কোমরে দিয়ে কিছুক্ষণ যেন সপ্রশংস দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বলে উঠলেন, 'বাঃ বাঃ, যেন বালার্ক দ্যুতিতে উদ্ভাসিত দেবমূর্তি দেখলাম! নাঃ বাবাজী, সার্থক তোমার জন্ম, সার্থক বিশ্বেশ্বর নাম।'

তারপর, বিস্মিত শ্রোতা বা দ্রষ্টাদের আরও যেন কিছু বিহ্বল করতেই, কিছুক্ষণ নাটকীয় ভঙ্গীতে ওঁর দিকে চেয়ে সহসাই, অবগুণ্ঠিতা ইন্দ্রাণীর দিকে ফিরে বললেন, 'না বৌঠান, আপনি যে রত্নগর্ভা তা স্বীকার করতেই হবে। আমাদের দাদা সজ্জন সাধু ব্যক্তি ছিলেন কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে যাকে প্রতিষ্ঠা বলা হয় তা লাভ করতে পারেন নি—অবশ্য তেমন কোন চেষ্টাও করেন নি বোধহয় সে যোগ্যতা অর্জনের জন্য। সে ত্রুটি আপনার সন্তান বহুগুণে শক্তি ও যোগ্যতার দ্বারা সংশোধন ক'রে নিয়েছেন।

'দেখুন, বিদ্বান অনেকেই আছেন, আমাকেও—হেঁ হেঁ—আত্মঅহমিকা প্রকাশ করছি না, অনেকেই বিশিষ্ট পণ্ডিত বলে মান্য করেন—কিন্তু বিদ্যার সঙ্গে বুদ্ধির এমন দুর্লভ যোগাযোগ তো আর কারও দেখলাম না এতটা বয়সে। এ যোগাযোগ ঘটে কদাচ, দৈবাৎ। আপনার পুত্র, সেই অনন্যসাধারণ সৌভাগ্যের অধিকারী।'

বলে একটু থামলেন অধ্যাপক মহাশয়। বোধ করি অধিকতর প্রস্তুতির জন্য। অথবা বিশ্বেশ্বরের সংশয়চকিত, বিস্মিত ও ঈষৎ বিহ্বল অবস্থাটা উপভোগ করার জন্যই।

বিশ্বেশ্বর এ অধ্যাপকটিকে বিলক্ষণ চেনেন। তিনি যে কেবলই এ প্রভাত-কালে তাঁর প্রশংসা করতে আসেন নি—সে বিষয়ে আর সন্দেহ মাত্র ছিল না। এ আগমন কোন আক্রমণেরই ভূমিকা। শুধু সেই আক্রমণটা কোন্ দিক থেকে কেমন ক'রে আসছে—সেইটে ঠিক অনুমান করতে না পেরেই কতকটা তাঁর এই বিহ্বল ভাব।

অবশ্য বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতেও হ'ল না। তিনি চোখের একটা বিশেষ ভঙ্গী ক'রে বললেন, 'পাড়ার সব ইতরবুদ্ধির লোকেরা বলে—ছোকরা আচ্ছা জাহাঁবাজ বটে। পরের অর্থে উত্তম আহার, মূল্যবান বস্ত্রাদি আহৃত হচ্ছে, সংসারে কোন অভাব নেই, বরং সম্পদ উথলে পড়ছে; গৃহে সুন্দরী যুবতী ভার্যা, কোন প্রকার সম্ভোগেই তো বাধা নেই। এই হরিনামই দেখছি এ যুগের উত্তম ব্যবসায়!'

'আমি তাদের বলি', কণ্ঠস্বর ঈষৎ অন্তরঙ্গ করার চেষ্টা ক'রে বলতে থাকেন, 'তোরা শুদ্ধমাত্র মূর্খই নোস, তোরা নির্বোধ, কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানহীন। বাবাজী জাহাঁবাজ নন—সে আমরা কাদের বলি, যারা মিথ্যাচরণ জুয়াচুরি প্রভৃতির দ্বারা অপরের বিষয়সম্পত্তি বা প্রতিষ্ঠা কি প্রাপ্য যশ প্রভৃতি আত্মসাৎ করে—ছলেবলে কৌশলে। বাবাজী কোন উদ্যম করছেন না, কোন প্রকার

তঞ্চকতা করছেন না, মিথ্যা কথার প্রয়োজন হচ্ছে না। লোকে স্বেচ্ছায় ভোগ্যবস্তু পৌঁছে দিয়ে যাচ্ছে, দিয়ে—দিতে পেরে—যেন কৃতার্থ হচ্ছে। তবু তো আমি বাবাজীকে সাধুবাদ দিই তাঁর সংযমের জন্য। তিনি ইচ্ছা করলে এই সুযোগে একাধিক নারীও সম্ভোগ করতে পারতেন—সে বিষয়ে তিনি নির্বিকার, অতি বড় নিন্দুকও সে অপবাদ দিতে পারবে না।'

এই পর্যন্ত দীর্ঘ বক্তৃতা সেরে, যেন একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'না বাবাজী, তুমি কারও কোন কুৎসা রটনায় কর্ণপাত ক'রো না। এ পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু—ভূমি স্ত্রী স্বর্ণ গোধন ইত্যাদি—সর্বথা বীর্যভোগ্যা নয়, বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বুদ্ধিভোগ্যা। মহাবীরও যদি বুদ্ধিমান না হয়, সে কিছুই পায় না। তুমি তো কোন অন্যায় করছ না—তুমি তোমার পথে অবিচল থেকো।...

'যাই। প্রথম প্রহর শেষ হ'তে আর বড় বিলম্ব নেই, স্নান পূজা সারতে হবে। বৌঠান, প্রণাম জানালাম এখান থেকেই। তারা, তারা। ব্রহ্মময়ী মা!'

বেশ ধীরেসুস্থে—আঘাতটা যে যথাস্থানে পৌঁচেছে তা বিশ্বেশ্বরের রক্তহীন বিবর্ণ মুখ এবং ললাটের ঘর্মবিন্দু দেখেই বুঝেছেন—ঈষৎ কৌতুক তথা তৃপ্তির হাসিতে আনন রঞ্জিত ক'রে—এঁদের গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন অধ্যাপক।

॥ ১১ ॥

বাক্য-বাণ শব্দটির সঙ্গে অবশ্যই পরিচয় ছিল বিশ্বেশ্বরের কিন্তু তার সম্যক অর্থ এতকাল বোঝেন নি, এই প্রথম বুঝলেন।

অর্জুননিক্ষিপ্ত শরের মতোই তার বর্ম ভেদ ক'রে মর্মে প্রোথিত হওয়ার শক্তি যে এত প্রচণ্ড, এ শর যে এত বিষাক্ত—যে বিষের কাছে আশীবিষের বিষজ্বালাও তুচ্ছ—আজ প্রথম উপলব্ধি ঘটল তাঁর।

তাঁর গত কয়েক মাসের চিত্তপ্রশান্তি, অহরহ নামজপ নামগানের আনন্দ—নষ্ট হয়ে গেল এই কটা কটু বিষাক্ত বাক্যের আঘাতে।

এতক্ষণের পূজাধ্যানের তৃপ্তি, প্রভাতের এই নির্মলতা, চারিদিকের বৃক্ষলতা থেকে ভেসে আসা কত কি পুষ্পসুবাস, পক্ষীকূজনের সুমধুর সঙ্গীত, শিশিরসিক্ত বৃক্ষপল্লবে প্রতিফলিত নবীন সূর্যের আলো—সমস্ত কে যেন একটা কৃষ্ণ যবনিকা দিয়ে আবরিত ক'রে দিল। মানুষের নীচতায় কিছুক্ষণের জন্য নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া স্তব্ধ হয়ে গেল ওঁর।

মানুষের অনুমান বা কল্পনা যে এত কদর্য হতে পারে, অপরের আচরণের যে এমন কলুষিত কদর্থ করা যায়—সেটাই তো বিশ্বেশ্বরের কাছে অবিশ্বাস্য রকমের বিস্ময়ের কারণ। উনি যে জগতে এতকাল এই বাইশ তেইশ বছর বয়স পর্যন্ত কাটিয়ে এসেছেন সেখানে যে ষষ্ঠরিপুর বা মাৎসর্যের সঙ্গে পরিচয় একেবারে ঘটে নি তা নয়—গ্রন্থাদিতেও তার একটা পরিচয় অবশ্যই ঘটেছে—

তবে সে ঈর্ষা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যশ প্রতিষ্ঠা প্রাধান্য নিয়ে—তার মধ্যে এই ধরনের ঘৃণ্য মনোভাব কখনও প্রকাশ পেতে দেখেন নি উনি ; বা সে মনোভাব প্রকাশের এই ঘৃণ্যতর প্রচেষ্টাও।

বিশ্বেশ্বর যেন ক্লান্ত হয়ে অবসন্ন ভাবে সম্মুখের একটা সিঁড়িতে বসে পড়লেন।...

মাধুরীও ওঁর মানসিক অবস্থা—দৈহিকটা তো দেখতেই পাচ্ছেন—বুঝেছেন ও ব্যাকুলও হয়েছেন কিন্তু শ্বশ্রূমাতা সম্মুখে থাকতে তাঁর কিছু করার উপায় নেই। মাধবী বিপন্ন ও কাতর মুখে তাঁর দিকেই চাইলেন।

অবশ্য তার প্রয়োজন ছিল না।

ইন্দ্রাণী প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই ব্যস্ত হয়ে এসে বিশ্বেশ্বরের উত্তরীয় খুলে নিয়ে তাই দিয়েই বাতাস করতে করতে বললেন, 'যে যেমন মানুষ সে তেমনি কথাই বলবে। সাপ বিষ ছাড়া আর কি ওগরাতে পারে বল্! এ নিয়ে তুই ব্যস্ত হোস নি, কি দুঃখ বোধ করিস নি। নীচ ব্যক্তির ইতর আক্রমণে ভদ্র শিক্ষিত ব্যক্তিরা বিচলিত হন না, উপেক্ষা করেন। নিশীথ অন্ধকারে নিশাচর মানুষ বা প্রাণী সূর্যকে যথেষ্ট গালাগালি দেয়— কিন্তু সূর্যের উদয় ঘটলে তারাই গুহা কি কোটর খুঁজতে পথ পায় না। নীচ যদি উচ্চভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে। আমার বাবা-মা বা ওঁর কাছে চিরদিন এই শিক্ষাই পেয়েছি। পথের কুকুর কামড়ালে মানুষ তাকে কামড়াতে চেষ্টা করে না। আর, তাছাড়া, যে কোন বড় কাজ করতে গেলেই এই ধরনের নিন্দা সহ্য করতে হয়। এতেই নিজের কর্মপ্রচেষ্টা আরও তীব্র হয়ে ওঠে। সংঘর্ষে ধাতু অধিকতর শাণিত হয়—প্রকৃতির এইই তো নিয়ম। তুমি ওঠো, মুখে জল দাও। মনে মনে তাঁকেই ডাকো—তোমার ইষ্টকে—তিনিই এই সব কণ্টক-জ্বালা তুচ্ছজ্ঞান করার শক্তি যোগাবেন।'

মায়ের কথায় তখনকার মতো ঈষৎ সান্ত্বনা লাভ করলেন বিশ্বেশ্বর, তবে তখনই কিছু আহারে প্রবৃত্তি হ'ল না। নিজেকে যেন অত্যন্ত অশুচি বোধ করছেন। তিনি সেই অবস্থাতেই উত্তরীয় পট্টবস্ত্র সুদ্ধ গঙ্গায় স্নান করতে গেলেন।

তারপর অবশ্য জলযোগাদি, দ্বিপ্রহরে গৃহদেবতার ভোগনিবেদন, সর্বকার্যই যথানিয়মে চলল। ভক্ত বা বন্ধুদের সঙ্গে কথোপকথনেও কোন বৈলক্ষণ্য লক্ষ্য করল না কেউ—কেবল যারা অন্তরঙ্গতম,—জননী ও জায়া বুঝলেন প্রভাতের আঘাত কী গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছে তাঁর মনে।

কে জানে এর পরিণাম কি দাঁড়াবে—এই অজ্ঞাত আশঙ্কায় কণ্টকিত হয়ে রইলেন দুজনেই।

পরিণামের একটা লক্ষণ সন্ধ্যার পূর্বেই দেখা গেল। নিত্য কীর্তনে ছেদ পড়ল আজ। বিশ্বাই বন্ধু ও ভক্তদের কাছে করজোড়ে অনুরোধ জানালেন, তাঁরা ওঁকে বাদ দিয়েই আজ পথপরিক্রমা করুন—অথবা শ্রীনিবাস-অঙ্গনে গিয়েই

কীর্তনের কাজ সম্পন্ন করুন। উনি আজ বড় ক্লান্ত, কিছুকাল একা থাকতে চান।

এবং পাছে এ নিয়ে পীড়াপীড়ি অনুরোধ-উপরোধের চাপে আধিক্য ঘটে—এই আশঙ্কায় সকলের অলক্ষ্যে গৃহত্যাগ ক'রে বহুদিন পরে গঙ্গাতীরের এক নির্জন বৃক্ষতলে গিয়ে বসলেন।

আজ তাঁর নিজের সঙ্গে বুঝি একটু বোঝাপড়া আবশ্যক হয়ে পড়েছে। এই যে এতদিন—যেন একটা নেশার ঘোরে—আচ্ছন্ন হয়ে ছিলেন, দিনরাত্রির স্রোতে ভেসে যাচ্ছিলেন—অগ্র পশ্চাৎ, লক্ষ্য বা পথ সম্বন্ধে কোন বিশদ চিন্তা না ক'রেই—এবার তাতে কিছু বিরতি আবশ্যক। কোথাও একটু স্থির হয়ে থেকে নিজের জীবনের এক প্রকার অর্থহীন উদ্দেশ্যহীন এই অধ্যায়ের পর্যালোচনা না করতে পারলে স্বস্তি বা শান্তি পাচ্ছেন না।

অধ্যাপকটির কুৎসিত বিষাক্ত ইঙ্গিত প্রথমে ঘৃণা পরে অপরিসীম ক্রোধ জন্মেছিল মনে। কিন্তু স্থিতধী বিশ্বেশ্বর সারাদিনের চেষ্টায় মনের এই বিরূপতা ও উষ্মাজনিত উত্তেজনা দমন করেছেন। এবার বিচার আরম্ভ হয়েছে মনে মনে। এখন এমনও বোধ হচ্ছে ইষ্ট বুঝি তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়েই এই নির্মম আঘাত করেছেন—ওঁকে নিজের কার্যকলাপ সম্বন্ধে সচেতন ক'রে দিতে।

অবশ্য অধ্যাপকটি যা বলেছেন তা মিথ্যা, ঈর্ষা-নিঃসৃত। তিনি অপরের নাম করে যা বলেছেন তা হয়ত নিজেরই মনোভাব। কিন্তু কিছুটা কি সত্য নেই এর মধ্যে?

সে সত্য ঐ ঈর্ষা, অধ্যাপক কুলকলঙ্ক ব্যক্তিটির অজ্ঞাতসারেই উদ্‌ঘাটিত হয়েছে বিশ্বেশ্বরের মনে।

সত্যিই তো, জগতের তাপিত লাঞ্ছিত পীড়িত মানুষকে পরিত্রাণ করার, সত্য পথ দেখাবার যে স্বেচ্ছাবৃত ব্রত তাঁর—সে কি তিনি বিস্মৃত হয়ে বসে নেই? হরিনাম করছেন সত্য কথা, শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করছেন, তাঁর নাম শোনাচ্ছেন, কিছুসংখ্যক লোককে সে নাম উচ্চারণে উদ্বোধিত করছেন। কিন্তু সে ক'জন? এই জনপদের হয়ত বা দুই তিন কি পাঁচ শত নাগরিক। যাদের কাছে কৃষ্ণপ্রেমের আলোক পৌঁছে দেবার ব্রত তাঁর—তাদের থেকে বরং আরও দূরেই চলে যাচ্ছেন না কি?

আর এখানকার লোকরাই বা কি দেখছে!

ঈশ্বরের নাম করার প্রত্যক্ষ ঐহিক পুরস্কার। সু-আহার্য, সূক্ষ্মবস্ত্র—সুখে ও আরামে জীবন অতিবাহিত করার নানা বস্তু ভারে ভারে আসছে, নিত্য দীয়তাং ভুজ্যতাং চলছে। তাঁর সঙ্গে যারা নামগান করছে তারাও সে সুফলে বঞ্চিত হচ্ছে না।

আর এগুলি যারা যোগান দিয়ে যাচ্ছে তারা অধিকাংশ সাধারণ গৃহস্থ বা দরিদ্র ব্যক্তি—তারা কি এ নামগানের, এই নিয়ত হরিনামে গান কীর্তনের মর্ম

ও প্রয়োজন বুঝছে? তারাও হয়ত ঐ প্রত্যক্ষ পুরস্কারের কথাই চিন্তা করছে।

না, কিছু সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগের আশা রেখে ঈশ্বরকে ডাকা চলবে না। সর্ববিধ আশা-আকাঙ্ক্ষা, লোভ-লালসা ত্যাগ ক'রে, সর্বরিক্ত হয়ে, অশেষ দুঃখকষ্ট সহ্য ক'রে তাঁকে ভজনা করতে হবে—সেই কিম্বদন্তীর ব্রজবাসিনীদের মতো। স্ত্রীলোকের সর্বাপেক্ষা অত্যাজ্য যে বস্তু—লজ্জা, শেষ পর্যন্ত তাও বিসর্জন দিয়ে সম্পূর্ণ আচ্ছাদন বিবর্জিত অবস্থায় যারা তাঁর কাছে পৌঁছেছিল—তাদের দয়িত সেই পরমপুরুষের কাছে।

সে শিক্ষা কি এই এত স্বাচ্ছন্দ্য, এত সেবা, এত আরাম—জননীভার্যা পরিবৃত হয়ে গৃহসুখে কাল কাটাতে কাটাতে অপরকে দেওয়া সম্ভব?

ভিখারী হয়ে ঐসব মূঢ়, নিঃস্ব, মূক, চিরসহিষ্ণু লোকের দ্বারে গিয়ে ঈশ্বরের নাম-প্রেম ভিক্ষা না চাইলে কি সে শিক্ষা লোকের অন্তরে পৌঁছবে? লোকে দৈহিক সুখভোগের আশা আকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিয়ে ঈশ্বরকে ডাকতে শিখবে?

বিবস্বান সূর্য যদি দূর আকাশেই জ্যোতিঃ বিকীরণ করতেন তাহলে কি এই মাটিতে জীবলক্ষণ দেখা দিত! সে সূর্য মর্ত্যের মৃত্তিকায় নেমে এসেছেন বলেই প্রাণীদের জন্ম হচ্ছে, ফল ফলছে, ফুল ফুটছে—তাদের জীবনধারণের উপযোগী খাদ্য-পানীয়ের সৃষ্টি হচ্ছে।

না, বুঝি নিজের সম্বন্ধে এ উপমাও অহমিকাপ্রসূত। দীনাদপি দীনরূপে, সর্বত্যাগী ভিক্ষুকরূপে মানুষের দ্বারে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর এক প্রাণী হিসাবে। অকিঞ্চন ভিক্ষুক হয়ে প্রেমভিক্ষা চাইতে হবে।

অর্থাৎ সন্ন্যাসীরূপে।

সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন তিনি।

জননী ব্যথা পাবেন; প্রেমময়ী একান্ত-নির্ভরশীলা কিশোরী বধূর হয়ত জীবনই নাশ হবে।

সে দুঃখ কি ওঁর প্রাণেও বাজবে না?

কিন্তু উপায় কি!

সাংসারিক জীবনের সকল ভোগ সকল বন্ধন সকল বিবেচনা, স্নেহ দয়া মায়া—সর্বস্ব ত্যাগ ক'রেই তো সন্ন্যাস নিতে হয়।

এ দেহে থেকেও এ দেহকে ত্যাগ করতে হবে। সাংসারিক অর্থে মৃত্যু ঘটলে তবেই সন্ন্যাসী হওয়া যায়।

কোন কথা কারও কথা চিন্তা করার প্রশ্ন সেখানে নেই। প্রয়োজন নেই। মৃত্যুই তো সকল প্রয়োজনের সমাপ্তি।

সন্ন্যাস নিতে গেলে মৃত্যুর সেই সীমানা পার হয়েই তো যেতে হয়। সে অবস্থায় মৃত্যুর অধিকার আর থাকে না—তাই কোন কিছুর, কোন সম্পর্কেরও অধিকার থাকে না।

মন স্থির করলেও তখনই সে সংকল্প কারও কাছে প্রকাশ করলেন না।

শুধু আত্মজনই নয়—বন্ধু, ভক্ত, অনুগামীরাও বাধা দেবার চেষ্টা করবে। এমন কি বোধহয়, যারা এখনও বিরূপ বা বিদ্বিষ্ট তারাও ব্যস্ত হবে। গালাগালি দেবার, বিদ্রূপ করারও যোগ্য পাত্র চাই, যে দীন, নিত্যধিক্কৃত তাকে বিদ্রূপ ক'রে হাস্যাস্পদ করার চেষ্টা করলে মন ভরে না। তেমন যোগ্য পাত্র এ শহরে বিশ্বেশ্বরের মতো কে আছে!

আর মুখে যাই বলুন ভিন্নমতাবলম্বী পণ্ডিত বা সাধকরা—অন্তরে অন্তরে এই যুবকটিকে তাঁরা শ্রদ্ধা করেন, হয়ত ঈষৎ গর্বও বোধ করেন এ তাঁদের আত্মীয় বা আত্মীয়তুলা বলে। স্নেহ তো করেনই। নতুবা তিনি ভ্রান্ত পথে যাচ্ছেন বলে তাঁদের এ ব্যাকুলতা কেন!

সংকল্প কারও কাছে ব্যক্ত করলেন না তার আরও কারণ—কোন কার্যের ইচ্ছা বা সংকল্প যতই দৃঢ় হোক, তার অগ্রপশ্চাৎ সকল দিক বিবেচনা না ক'রে কোন কার্যে অগ্রসর হওয়া যে মূর্খতা—তা ভাবাবেগে যতই বিচলিত হোন—বিশ্বেশ্বর একবারও ভোলেন নি। জীবনের ধারায় একটা বিরাট পরিবর্তন আনার পূর্বে অন্তত কয়েকটা দিন স্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করা কর্তব্য।

তেমন ভাবে চিন্তা করার জন্য নির্জনতা প্রয়োজন। বিশ্বেশ্বরও তাই যথাসাধ্য জনসমাগম পরিহার ক'রে জনহীন প্রান্তরে বা গঙ্গাতীরে চিন্তা-সমাহিত অবস্থায় কাল অতিবাহিত করতে লাগলেন।

বাধা অনেক। এ সংসারে বুঝি ইচ্ছামতো কিছুই করা যায় না, সংসার ত্যাগ করাও না।

কিছুদিন পূর্বে কাটোয়ার মধুসূদন ভারতী নবদ্বীপে এসেছিলেন। বিশিষ্ট তত্ত্বজ্ঞানী ও উচ্চমার্গের সাধক, তাঁর খ্যাতি পূর্বেই শোনা ছিল। তিনি ভিক্ষাগ্রহণ করলে গৃহ পবিত্র ও সংসার সার্থক হবে—এই জ্ঞানে বিশ্বেশ্বর তাঁকে ভিক্ষাগ্রহণের বা আহারের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। আহারাদির পর বিবিধ সৎকথা প্রসঙ্গে গৃহীর কর্তব্য ও তার সাধনার অধিকার সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন ক'রে অবশেষে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করেন, 'আমি যদি সন্ন্যাস গ্রহণ করতে চাই, আপনি দেবেন?'

'না।'

'না কেন?' বিশ্বেশ্বর নিরতিশয় বিস্মিত বোধ করেন, 'আমি তো বয়ঃপ্রাপ্ত।'

তর্কে প্রবৃত্ত শিশুর অজ্ঞানতা দর্শনে যেমন অভিভাবকরা প্রসন্ন কৌতুক হাস্য করেন—মধুসূদন তেমনই ঈষৎ হাস্যের সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'এ সংসারে জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের উপরে কতকগুলি দায়িত্ব বর্তায়। কুলপ্রথা রক্ষা, কুলদেবতার সেবা অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা এবং স্বীয় বংশের ধারা-বাহিকতা রক্ষা—যাতে পূর্বপুরুষের পিণ্ডব্যবস্থা লোপ না পায়—এ তাদের অবশ্যকর্তব্য।'

'কিন্তু ঈশ্বরকে পাওয়ার প্রশ্ন যেখানে—সেই পরম ও শ্রেষ্ঠ কারণে তপস্যা—অন্য সমস্ত কিছু; ভোগ, দায়িত্ব, কর্তব্য, বিচার-বিবেচনা, লজ্জা ভয় এমন কি ক্ষুধা-তৃষ্ণার চিন্তাও ত্যাগ না করলে যাকে পাওয়া যায় না শুনেছি—সেখানেও কি এসব প্রশ্ন উঠবে?'

প্রশ্নের সরল উত্তর দিলেন না, বা দিতে পারলেন না মধুসূদন ভারতী মহারাজ। বললেন, 'গৃহে তোমার বিধবা মাতা, তাঁর অন্য কোন সন্তান নেই। কিশোরী বধূ আছেন, তিনি অদ্যাপি সন্তানবতী হন নি—তুমিই তাঁদের একমাত্র আশা ও আশ্রয়স্থল। বর্তমানঅবস্থায় এঁরা অত্যাজ্য। এ ক্ষেত্রে কোন সদ্‌গুরুই তোমাকে সন্ন্যাস দেবেন না।'

দৃঢ় কণ্ঠে কথাগুলি উচ্চারণ ক'রে মধুসূদন মৌনাবলম্বন করেছিলেন সেদিন।...

এখন সংসার ত্যাগের সংকল্প গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে ভারতী মহারাজের সেই নির্দ্বিধ মন্তব্যটিই আগে মনে পড়ল।

আরও স্মরণে এল—স্বয়ং শংকরাচার্যের সন্ন্যাস গ্রহণ করার জন্য এক-প্রকার মিথ্যার আশ্রয় নেওয়ার কথা। জননীর অনুমতি গ্রহণের জন্য তাঁকেও ছলনার সাহায্য নিতে হয়েছিল—এই কিম্বদন্তী।

অর্থাৎ সন্ন্যাস নিতে গেলে জননী ও জয়ার অনুমতি গ্রহণ অত্যাবশ্যক।

কিন্তু—

তাঁরা কি দেবেন? দেওয়া কি সম্ভব?

অথচ সে অনুমতি না নিয়ে যদি গৃহত্যাগ করেন, কোন সৎ-গুরুর চরণাশ্রয় লাভ ঘটবে না।

গুরু সন্ন্যাস দেওয়ার পূর্বে অবশ্যই প্রশ্ন করবেন—সংসারে কে কে আছে এবং কি অবস্থায় আছে। সেখানে মিথ্যা বলাও চলবে না।

তবে বিশ্বেশ্বরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সন্ন্যাস তিনি নেবেনই। তাঁর যা আশা আদর্শ—তা সংসারাশ্রমে থেকে সফল কি সার্থক হওয়া সম্ভব নয়।

দুটি আকাঙ্ক্ষা তাঁর। ঈশ্বরকে লাভ করা, প্রত্যক্ষভাবে যেমন নারী তার দয়িতকে লাভ করে—সেই ভাবে। এবং ঈশ্বরের সেই প্রত্যক্ষ স্বরূপ, নর-দেহধারী নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের জন্য সাধনা, আর সে সাধনার সে আকুলতার অমৃতসর—দুঃখী, সন্তপ্ত, প্রপীড়িত, রিক্ত, সুখসৌভাগ্যাদি সর্ববঞ্চিত পথ-ভ্রষ্ট অজ্ঞান মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

তা দিতে গেলে আগে নিজেকে তার অধিকারী হ'তে হবে—পরিপূর্ণ পাত্র সে অমৃত লাভ করতে হবে—নচেৎ তা অপরকে দিতে পারবেন কেন?

সে অমৃত কঠোর তপস্যালভ্য বস্তু। সে তপস্যা সে সাধনা সংসারে থেকে—ভোগের মধ্যে, প্রাচুর্য এমন কি স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে থেকে করার উপায় আছে কিনা তা তিনি জানেন না। তেমন কোন পন্থা বা আদর্শ তিনি অন্তত দেখতে পাচ্ছেন না, কারও কাছে শোনেনও নি।

অতএব—হয় সন্ন্যাস নয় এ দেহ বিনষ্ট করা—এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

কোন কোন মানুষ আছেন যাঁরা অ-পরাজয়ের সহজাত বর্ম নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা কোন বাধা বা প্রতিকূলতাতেই পথভ্রষ্ট বা সংকল্পচ্যুত হবার কথা কল্পনাও করতে পারেন না। বিশ্বেশ্বর আচার্য সেই শ্রেণীর মানুষ।

খ্যাতি যশ প্রতিষ্ঠার মোহ, সম্ভোগের নানা উৎকৃষ্ট উপকরণ যাঁকে বাঁধতে পারে নি—তাঁকে সামান্য দুটি স্ত্রীলোকে বেঁধে রাখবে কি ক'রে!

না, তা পারবে না। পৃথিবীতে সকল নিয়মেরই ব্যতিক্রম আছে। আর সে ব্যতিক্রম শুরু হয় কোন একজন মানুষকে দিয়েই।

ক্রমে ক্রমে সকল দিক বিবেচনা ক'রে বিশ্বেশ্বর স্থির করলেন তিনি সেই আপাত অসাধ্য কার্যই সাধন করবেন। ভার্যা ও জননীর অনুমতি নিয়েই গৃহত্যাগ করবেন।

মিথ্যাচরণ, ছলনা কি তস্করবৃত্তির সাহায্যে তাঁর এই বহু আকাঙ্ক্ষিত নবজন্মের সূচনা হতে দেবেন না।

তবু কার্যটা হয়ত অত অনায়াসসাধ্য হ'ত না—যদি ইন্দ্রাণী দেবী নিজেই প্রসঙ্গটা উত্থাপন না করতেন।

শুধু তো তিনিই নন, অনেকেই বিশ্বেশ্বরের এই আকস্মিক ভাবান্তরে উদ্বিগ্ন হয়েছেন। তাঁরাই আরও প্রতিদিন ইন্দ্রাণীকে অধিকতর চিন্তিত ক'রে তুলছেন।

এই বিপুল, নিত্য বর্ধমান নাম-মহোৎসবের প্রবর্তনা ক'রে নিজ শক্তিতে তাকে লালন ও পুষ্ট ক'রে—সহসাই তিনি সে উৎসবে এমন নিরুৎসুক বা বীতস্পৃহ হলেন কেন? কেনই বা বন্ধুবান্ধব এমন কি আচার্যদেব—যাঁকে অদ্বৈতবাদ থেকে এই ভক্তিবাদে উত্তরণ করাই বিশ্বেশ্বরের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিজয়লাভ বলে মনে করেন অনেকে—তাঁর বা তাঁদের সঙ্গও পরিহার ক'রে চলছেন কেন বিশাই? কি হ'ল তাঁর? শারীরিক অসুস্থতা? মনোবৈকল্য? অথবা এই বিশ্বাসের উপরই বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছেন?

ইন্দ্রাণীর নিজেরই উৎকণ্ঠিত বোধ করার, ব্যাকুল হবার যথেষ্ট কারণ ছিল —এদের এই প্রায়-সামগ্রিক অনুযোগে ও অবিরাম প্রশ্নে আর স্থির থাকতে পারলেন না।

একদা দ্বিপ্রাহরিক আহারাদি ও সামান্যমাত্র বিশ্রাম সেরে বিশ্বেশ্বর তাঁর অধুনা-অভ্যস্ত অজ্ঞাত যাত্রায় বেরোচ্ছেন—ইন্দ্রাণী তাঁকে ডেকে নিজের কাছে বসালেন। তাঁর তখনও আহার হয় নি, তবে বধূকে পূর্বেই খাইয়ে দিয়েছেন, নিজের জন্য কোন ব্যস্ততা নেই।

ইন্দ্রাণী বললেন, 'বিশাই, তুই কি ঐ ঈর্ষী নীচ লোকটার কথাতেই এত বিচলিত হলি?'

যেন চমকে ওঠেন বিশ্বেশ্বর, 'কে বলেছে মা ?'

'কোন কোন সত্য অপরের কাছে শোনার প্রয়োজন হয় না। তোমার এ ভাবান্তর, এই বিষাদ ও সর্ব বিষয়ে ঔদাসীন্য—বোধ করি এ গৃহের জড় পদার্থগুলিরও লক্ষ্য করতে অসুবিধা হয় নি। তুমিই এই আশ্চর্য নামযজ্ঞের সূচনা করলে—আজ তা এই বিবিধ গৌরবশালিনী নগরীরও গৌরববৃদ্ধির কারণ হয়ে উঠেছে ; এমন কি স্বয়ং কাজী সাহেবকেও একরকম পরাজিত ক'রে এই মহামহোৎসব পালনের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে—এখন আর তাতে তোমার বিন্দুমাত্র রুচি বা আগ্রহ দেখি না।...তুমি তোমার অনুরাগী ও ভক্তদের সাহচর্য—কিশোর যুবা বয়স্ক নির্বিশেষে ত্যাগ করেছ। তারা তোমার এই উপেক্ষাকে ক্রোধ বা বিরক্তির লক্ষণ ভেবে নিরতিশয় দুঃখিত হয়েছে। অকারণেই নিজেদের অপরাধী ভারছে।'

এই পর্যন্ত বলে—একটু যেন নিশ্বাস নেবার জন্য বা অতিরিক্ত আবেগ সম্বরণের জন্য অল্পক্ষণ থামলেন ইন্দ্রাণী, পরক্ষণেই আবার বলতে আরম্ভ করলেন, 'তোমার আহারে রুচি চলে গেছে, কোন মতে—দেহ ধারণের জন্যও তত নয় যতটা আমাদের সান্ত্বনা দেবার জন্য—একটু প্রসাদ মুখে দাও। ফলে দিন দিন কৃশ ও মলিন হয়ে যাচ্ছ, এই বয়সেই ললাটে বলিরেখার চিহ্ন দেখা দিচ্ছে। অমন লক্ষ্মী-প্রতিমা বধূর মানসিক অবস্থার দিকে তোমার ক্ষণমাত্র দৃষ্টি নেই। সেও নিজেকে কোন্ অজ্ঞাত কারণে তোমার কাছে অপরাধী চিন্তা ক'রে অস্থির হয়ে পড়েছে। তোমারই অমঙ্গল-আশঙ্কায় উদ্‌গত অশ্রু দমনের চেষ্টা করছে—কিন্তু পারছে না। এ সব ঘটনার মূলে যদি সেই নীচ লোকটার ঘৃণ্য ব্যবহার না হয়—তাহলে এ ভাবান্তরের কারণটা কি তাই বলো !'

অনেক, অনেকক্ষণ নীরব থেকে—ইন্দ্রাণীর মনে হ'ল এক যুগ—বিশ্বেশ্বর ধীরে ধীরে বিষণ্ণকণ্ঠে বললেন, 'মা, আমি বড় দুঃখী !'

আর যাই হোক—ঠিক এ উত্তরের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না ইন্দ্রাণী। তিনি চমকিত হয়ে উঠলেন, আবেগে উত্তেজনায় বিস্ময়ে যেন তাঁর বাক্ রোধ হয়ে এল। কোনমতে বললেন, 'তার—তার অর্থ ? তুমি দুঃখী ! এই বয়সে এত-খানি প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি, এত লোকের এই প্রীতি ও শ্রদ্ধা, গৃহে প্রেমময়ী সুন্দরী বধূ—কান্তি, বুদ্ধি, মেধা ঈশ্বর বুঝি ঢেলে দিয়েছেন—তথাপি তুমি দুঃখী ! আরও কি চাও ? তুমি কি আর্থিক সম্পদ কামনা কর ? এত দিন পরে কি সেটাই তোমার কাম্য হয়ে উঠল ? তা হলেও—তোমার যা যোগ্যতা, উপার্জনেও তো কোন অসুবিধা থাকার কারণ নেই ! তবে দুঃখ কিসের ?'

বিশ্বেশ্বর নতমুখে—মায়ের চোখের দিকে চাইবার বুঝি সাহস নেই—বললেন, 'মা, আমি ঐশ্বর্যই চাই, অপরিমাণ অতুলনীয়—কিন্তু যে অর্থে ভাবছ—আর্থিক সম্পদ—সে অর্থে নয়। আমি চাই এমন সম্পদ যা ইহলোকে নর-দেব-ঋষি সকলের কাছেই দুর্লভ। মা, যে কোন বস্তু আকুলভাবে আকাঙ্ক্ষা করে—একাগ্র অনন্যমনা হয়ে—সেটা না পেলে তার যে দুঃখ যে অভাব-বোধ, শূন্যতা—তা আর কিছুতে পূরণ হয় না ; সে দুঃখের অবসান

ঘটে না। তেমনি এক তীব্র কামনা আমার—আমি ঈশ্বরকে পেতে চাই মা! তাঁকে না পেলে আমার এ জীবন এ দেহ বৃথা, অর্থহীন।'

ইন্দ্রাণী তবুও বুঝি ঠিক বুঝতে পারেন না।

বলেন, 'কিন্তু সে তো আরও অনেকেই চায় বাবা। এ তো কোন নতুন কথা নয়।'

'না, সে চাওয়া আমি চাই না। আরও বহু ভোগ্যবস্তুর সঙ্গে অন্যতম হিসাবে, কিম্বা জীবনের শেষ প্রান্তে পোঁছে অজ্ঞাত অন্ধকার অনিশ্চিত পরবর্তী জীবনের পাথেয় হিসাবে বা সেখানেও স্বর্গবাসের সুখভোগ নিশ্চিত করতে যে ঈশ্বরকে চাওয়া—সে চাওয়াতে আমার বড় ঘৃণা মা। কোন বড় সাধককে গুরুত্বে বরণ ক'রে সহজে ঈশ্বরকে লাভ করার চেণ্টা— সমান অবজ্ঞেয়। তেমন করে ভগবানকে চাওয়াতে আমার রুচি নেই।'

'তবে?' ইন্দ্রাণী ঠিক যেন বুঝতে পারেন না ওঁর কথাগুলো।

'আমি তাঁকে আপন ক'রে পেতে চাই মা। অন্তরঙ্গ ভাবে—প্রেমিকের মতো ক'রে চাই। রক্তমাংসের মানুষের মতো তাঁকে আমি চাই—তাঁকে সেবা করতে, তাঁকে আলিঙ্গন করতে, তাঁর ভালবাসা পেতে।'

'কিন্তু সে কি কখনও হয়। শাস্ত্রকাররা বলেন, তিনি এই অখিল বিশ্বের সর্বত্র অণুপরমাণুতে মিশে আছেন—তিনি অনন্ত, অনাদি, তাঁর আরম্ভ নেই শেষও নেই। আকারও নেই। একটা অদৃশ্য অবর্ণনীয় অপার্থিব শক্তি। তিনি এই সামান্য পৃথিবীর একটি মানুষকে ধরা দিতে আসবেন—দেহ ধারণ ক'রে! এ তুমি ভাবতে পারলে কি ক'রে!'

'করেছেন মা ইতিপূর্বে। যুগে যুগে বার বারই তিনি বা তাঁর শক্তির এক অংশ দেহ ধারণ ক'রে এই মাটির পৃথিবীতে এসেছেন—তাঁর ইচ্ছাতেই সৃণ্ট এই মানুষদের শাসন করতে, রক্ষা করতে। মানুষকে অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছেন—কিন্তু মানুষ যখনই সে স্বাধীনতার অপব্যবহার করে, এক একজন যখন বহু জনের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার করে বা তাদের সর্বপ্রকারে বঞ্চিত লাঞ্ছিত দলিত করে—তখনই অবতারের আবির্ভাব ঘটে। এও তো তোমার শাস্ত্রেই আছে। তা ছাড়াও হয়েছে। অংশ নয় পূর্ণরূপেই অবতীর্ণ হয়েছেন। স্নেহে প্রেমে করুণায় যুদ্ধে রাজনীতিতে—পূর্ণ কিন্তু মানবোত্তর এক মানব রূপে। মানুষের আর্তক্রন্দনে, বহু লোকের ঐকান্তিক একাগ্র প্রেমে স্বয়ং অবতীর্ণ হয়েছেন—তাঁরই সৃণ্ট জীবের এই লীলারস আস্বাদন করতে। গোপীদের প্রেমে, রুক্মিণী সত্যভামা জাম্ববতীর প্রেমে, দ্রৌপদীর সখ্যে—ধরা দিয়েছেন। অন্যদের তপস্যায়, অমানুষিক সাধনায় মর্ত্যে নেমে এসেছেন—তাদের কামনা সার্থক করতে।'

'তোমার মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছে বিশাই। পুরাণে বলে, তাঁরা যে জন্মে যে দেহে তপস্যা করেছেন সে জন্মে সে দেহে পান নি। সে পূর্ব দেহের তীব্র আকাঙ্ক্ষা কি তৃপ্ত হয়েছে? সে দেহের সে জন্মের অনুভূতি এ জন্মে থাকা সম্ভব নয়। কথাগুলো ভাল ক'রে ভেবে দ্যাখো।'

'তাঁরা এক জন্মে পান নি বলে কেউ পাবে না—তা আমি স্বীকার করি না। প্রেমে সর্বস্ব-ত্যাগ-করা আকুলতা থাকলে তিনি অবশ্যই ধরা দেবেন। সেই আকুলতা সেই ত্যাগই আমি আনতে চাই। সেই তপস্যা।'

'সেটা কি ভাবে হবে?'

'সন্ন্যাস নিতে হবে মা। কঠোর তপস্যা সন্ন্যাস ছাড়া হয় না।'

'সন্ন্যাস!' এবার যেন আর্তনাদ ক'রে ওঠেন ইন্দ্রাণী, 'না না, এ কি বলছিস! ও-কথা বলিস নি। ও সর্বনেশে কথা মুখে আনিস নি। ও আমি কোনমতেই হ'তে দেব না!'

হাসেন বিশ্বেশ্বর, কেমন একরকমের করুণ হাসি। বলেন, 'তুমি ঠিকই বলেছ মা। সর্বনাশের কথাই। সর্ব-নাশ করতে না পারলে—ইহলোকের যা কিছু বন্ধন, যা কিছু চিন্তা—সকলের বিনষ্টি না ঘটাতে পারলে সন্ন্যাস গ্রহণই তো মিথ্যা হয়ে যায়। দয়া মায়া স্নেহ প্রেম জন্মজ সম্পর্ক, বন্ধুত্ব, কাম-কামনা—অর্থ যশ প্রতিষ্ঠা—সমস্ত। সেই জন্যেই তো সন্ন্যাস নিতে চাইছি মা। সব কিছু ত্যাগ করতে না পারলে তাঁকে চাইব কোন্ লজ্জায়!'

এবার কেঁদেই ফেলেন ইন্দ্রাণী, 'আমার যে আর কেউ নেই বাপ!...আমার মুখের ওপর এত বড় কথা বলতে পারলি! তোর পিতৃপুরুষের ঋণ স্মরণ কর্। জল-পিণ্ড থেকে তাঁদের বঞ্চিত করবি? আর ঐ অজ্ঞান মেয়েটা—এখনও বালিকা সে—ওর কথাটাও চিন্তা কর্। ওকে একটা সন্তান না দিয়ে তুই কোথায় যাবি!'

'মা, তোমরা সমস্ত জীবনটাই যেন একটা তন্দ্রার ঘোরে যাপন করছ। যে নিয়ম চলে আসছে আবহমান কাল ধরে—তার আবরণ ভেদ ক'রে স্বচ্ছ নির্মোহ চোখে কখনও জীবনের সত্য দিকটা দ্যাখো না। সন্তান লাভ কি খুব সুখের? মূত্রস্থান থেকে বীর্য স্খলিত হয়ে সন্তানের জন্ম সম্ভব হয়—কেউই নির্মল চিত্তে সন্তান কামনায় স্ত্রীতে উপগত হয় না, হয় কামের তাড়নায়—সে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়ও ঐ মূত্রস্থান দিয়ে। সে জন্মে অজ্ঞান হয়ে—অজ্ঞানই থাকে। ছোট ছোট সুখ-দুঃখ, অকিঞ্চিৎকর গণ্ডীবদ্ধ জীবন, তাই নিয়ে কলহ বিতর্ক বিতণ্ডার অন্ত থাকে না। অভিমানে অন্ধ হয়ে থাকে।

'মা, যৌবনে নবশক্তি-সচেতন হয়ে নিজেকে প্রায়-ঈশ্বর ভাবে মানুষ, তার পর বৃদ্ধ বয়সে যখন তাদের পুত্র-পৌত্ররা অবহেলা উপহাস করে, তখন কী পর্যন্ত দৈহিক কষ্ট ও মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করে ভাব দেখি! কটা দিনের জীবন মা, কত দিন তার এই সব মূল্যহীন ভোগ করার শক্তি থাকে। অথচ তার জন্যেই মানুষ হেন কুকর্ম নেই যা করে না। সামান্য ভূখণ্ডের জন্য পুত্র পিতাকে হত্যা করে, পিতা পুত্রকে। রাজ্যসীমা বৃদ্ধির জন্য অনায়াসে রক্ত-বন্যার সৃষ্টি করে নৃপতিরা। এ তো পুঁথি পুরাণে বিস্তর পড়েছ, চোখেও দেখছ কিছু কিছু। তবে সন্তানের জন্য এত হাহাকার কেন? তোমার প্রতি-বেশীদের মধ্যে যাঁরা বার্ধক্যে পৌঁছেছেন তাঁদের দুর্দশা তো তোমার দেখতে বাকী নেই। তবে আপনজন চাও কেন? এ সংসারে আপনজন কেউ নেই, কেউ

আপন নয়। সকলেই নিজ নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থের ঘানিতে চক্ষুবদ্ধ অবস্থায় নিরন্তর আবর্তিত হচ্ছে—তার বাইরে কিছু জানে না—কিছু পায় না। তবে কেন একটা মিথ্যাকে এমন ভাবে আঁকড়ে রাখে।'

এসব কোন যুক্তিই, মস্তিষ্কে কেন কর্ণে প্রবেশ করারও বুঝি অবস্থা নয় ইন্দ্রাণীর। তিনি আকুল হয়ে রোদন করতে লাগলেন।

এও জানেন বিশ্বেশ্বর। এ রোদনে তাই তিনি বাধা দিলেন না, সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলেন না—নীরবে অপেক্ষা করতে লাগলেন—প্রাথমিক আবেগ প্রশমনের।

ক্রন্দন সম্বরণ করতে অবশ্যই বহু বিলম্ব হ'ল। অবশেষে একসময়—বধূর কথা স্মরণ ক'রেই সম্ভবত, সে দূর গৃহাভ্যন্তর থেকে এ দৃশ্য দেখলে আশঙ্কায় ব্যাকুল হয়ে উঠবে—কোনমতে নিজেকে কিছুটা প্রকৃতিস্থ ক'রে আনলেন ইন্দ্রাণী।

পুত্রের মুখের দিকে চেয়ে বুঝলেন ওঁর এ আকুলতা এ বিলাপ তাকে কিছু-মাত্র বিচলিত বা সঙ্কল্পভ্রষ্ট করতে পারে নি। তিনি বললেন, 'তাহলে—তুমি যদি সংসার ত্যাগ করবে বলে কৃতসঙ্কল্প হয়ে থাকো—তাহ'লে যাও। সন্ন্যাস নিলে বুঝি নারীহত্যার পাতক অর্শায় না!'

বাক্যের এ কণ্টকাঘাতেও ধৈর্যচ্যুতি ঘটল না বিশ্বেশ্বরের। তিনি বললেন, 'না মা, তোমার অনুমতি না পেলে যাবো না। যেতে পারবও না, তা তো তুমি জানই। শুধুই তোমার কেন, স্ত্রীর অনুমতি না পেলেও সন্ন্যাস পাওয়া যাবে না। তবে—যা সত্য তাই বলছি—গৃহে থাকলে আমার দেহটাই থাকবে, জীবনের বড় উদ্দেশ্য, সর্বাপেক্ষা তীব্র আকাঙ্ক্ষা যদি চরিতার্থ করার, সফল করার উপায় না হয়—তাহ'লে মন ভেঙে যাবে চিরদিনের মতো। যা পড়ে থাকবে তা কিছু অস্থি মাংস ও চর্মের সমন্বয়, জীবন্ত কঙ্কাল। আর তোমার যা প্রধান কামনা, বংশ রক্ষা—সেও আমার দ্বারা সম্ভব হবে না আর। ও প্রবৃত্তিই জন্মাবে না কোন দিন।'

শিউরে উঠলেন ইন্দ্রাণী। একটা প্রবলতর আঘাতও বোধ করলেন।

ছেলে এমন কথা বলতে পারল তাঁকে! দেহটাই থাকবে, না, দেহও নয়—শুধু অস্থিচর্মের একটা জড়পিণ্ড! শবের মতো অবস্থা হবে ওর! হয়ত শবেই পরিণত হবে সে অচিরে।

এমন সাংঘাতিক কথা কি ক'রে বলল সে!

সে এতই পর হয়ে গেছে!

তাই যদি হয় ওকে ধরে রেখে কি করবেন।

সহসা—এই আঘাতেই যেন সম্বিৎ ফিরে পেলেন ইন্দ্রাণী দেবী। প্রাণপণ চেষ্টায় অশ্রু সম্বরণ করলেন।

অমানবিক মনের জোরে তাঁর স্বভাব-গাম্ভীর্য ও মর্যাদা বোধ ফিরিয়ে আনলেন।

তিনি এই বিশ্বেশ্বর আচার্যেরই মা। তাঁর চরিত্রবলই ছেলে পেয়েছে।

আজ এ যেন তাঁর নিজের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে, নিজের চারিত্রিক দৃঢ়তার সঙ্গেই তাঁর সংঘর্ষ বেধেছে···!

কিছু সময় লাগল, তা তো লাগবেই।

তিনি ধীরে ধীরে, গম্ভীর, প্রায় স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন, 'তেমন ভাবে তোমাকে ধরে রাখতে চাইব না, তা তো তুমি জানই। পুত্রের সুখই সর্বদা জননীর কাম্য। আমিও নিজের ধারণার কাছে—বিশ্বাসের কাছে তোমাকে বলি দিতে চাই না। যাও, তুমি নিজের পথেই যাও। আমি তোমাকে আশীর্বাদই করছি, তুমি সফল হও, সিদ্ধি লাভ করো। তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক।'

বলতে বলতে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন ইন্দ্রাণী, এখন দ্রুতবেগে ঠাকুরঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে দেবতার আসনের সম্মুখে লুটিয়ে পড়লেন।

শয়ন দেবার পর কোন কারণে দেব-গৃহে প্রবেশ করতে গেলে বারকয়েক হাততালি দিয়ে ঢুকতে হয়। সে কথাও মনে পড়ল না। ছেলে যে—তিনি যেখানে বসে ছিলেন সেইখানে মাথা দিয়ে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করছেন—তাও লক্ষ্য করলেন না।

॥ ১৩ ॥

জননীকে শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার ক'রে বোঝানো যায়—বালিকা স্ত্রীকে কি বলে বোঝাবেন ?

এই প্রশ্নটাই অবশিষ্ট দিনটা পীড়া দিতে লাগল। নির্জন গঙ্গাতীরে গিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা ক'রেও যেন কোন পথ দেখতে পেলেন না। বরং একটা অস্বস্তি ও শঙ্কার ভাব নিয়েই গৃহে ফিরে এলেন।

সন্ধ্যারতি, রাতের শীতল, শয়ন-আরতি—সর্বপ্রকার সেবাই ক'রে গেলেন, তবে সে যন্ত্রের মতোই। অভ্যস্ত হাত এবং মুখ কাজ ক'রে গেল—এই মাত্র। তার সঙ্গে মস্তিষ্ক বা মনের কোন যোগ রইল না।

সমস্ত বাড়িটা নিস্তব্ধ, থমথম করছে। জননী একটিও কথা কইছেন না, সেটা অবশ্য আশাও করেন নি বিশ্বেশ্বর। আরতির সময় একুশ দীপের আলোতে মার মুখের দিকে চেয়ে দেখলেন—নিরুদ্ধ রোদনে তাঁর দুই চক্ষু জবাফুলের মতোই আরক্ত হয়ে উঠেছে।

বুকে কি একটা তীক্ষ্ণ তীব্র আঘাত অনুভব করলেন না ?

তাঁর দেবীসমা জননী, একাধারে পিতা ও মাতার কর্তব্য ক'রে গেছেন। পুত্রের জন্য অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন। পুত্রকে সাংসারিক দায়িত্ব এবং ঝঞ্ঝাট থেকে যতটা সম্ভব আচ্ছাদিত ক'রে রেখেছেন চিরকাল। ছেলে যাতে গৃহবাসী থাকে এই আশায় কীর্তন উপলক্ষে কত না পরিশ্রম করেন হাসিমুখে। সেই মার বুকে শেল দিয়েছেন। সে শেলের আঘাত নিজের বুকেও কি কম বেজেছে!

কিন্তু উপায়ও তো ছিল না। অথবা এই তো পরীক্ষা।

যে সর্বস্ব ত্যাগ করতে উদ্যত তাকে প্রথমেই দুর্বল হয়ে পড়লে চলবে কেন!...

আহারে রুচি ছিল না, শুধু মার মুখ চেয়েই প্রতিদিনের মতো বসতে হ'ল। মা যে বধূকে আহার্য সাজিয়ে দিয়ে বাকী সব তুলে রাখলেন—অর্থাৎ এবেলা উপবাসীই থাকবেন, একটু প্রসাদও মুখে দেবেন না—তাও লক্ষ্য করতে হ'ল। তবে এ নিয়ে পীড়াপীড়ি করতেও সাহসে কুলোল না। মা কি বলবেন তার ঠিক কি। সে বেদনার কথা শুনে হয়ত উনি আরও বিচলিত হয়ে পড়বেন। আর, গৃহত্যাগ করলে তো এমন বহুদিনই উপবাসী থাকবেন মা—তখন তো আর উনি সান্ত্বনা দিতে কি সাধ্য-সাধনা করতে আসবেন না। সন্ন্যাস নিতে গেলে পিছনের দিকে আর তাকানো যায় না।...

ক্লান্ত, অবসন্ন একটু বা আশঙ্কিত মন নিয়েই শয়নকক্ষে গেলেন বিশ্বেশ্বর।

সেখানেও একটা আঘাত পেলেন তিনি। অপ্রত্যাশিত, অভাবনীয়।

তবে এ সম্পূর্ণ ভিন্ন আঘাত। বিস্ময়ের আঘাত। প্রবল বিস্ময়।

গৃহে এসে যথা-অভ্যস্ত উত্তরীয় খুলে আলনায় রেখে আসনের দিকে যাবেন—মাধবী এসে ওঁর দুটি হাত ধরলেন।

হাসি হাসি মুখ তাঁর। শুধু তাই নয়—দুঃসাহসিনীর কণ্ঠেও অন্য দিনের মতো লজ্জার জড়িমা নেই, দৃষ্টি থেকে ভয় ও মিনতির সে সংমিশ্রণও যেন মুছে গেছে। তিনি সহজ (যে ভাব এতদিনে কখনও দেখেন নি বিশ্বেশ্বর) স্পষ্ট কণ্ঠেই বললেন, 'অত ভয় পাচ্ছেন কেন? ভাবছেন আমি সন্ন্যাস নেওয়ায় বাধা দেব, কান্নাকাটি করব?'

বিশ্বেশ্বর সহসা কোন উত্তর দিতে পারলেন না—এতই বিস্মিত ও বিমূঢ়-বৎ হয়ে গেছেন।

মাধবীই আবার বললেন, 'আপনি আমার দেবতা, আমার ইষ্ট, আপনার সুখেই আমার সুখ, আপনার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা। আপনি যাতে সুখে থাকেন, শান্তি পান—আমি তাতে বাধা হবো কেন?'

বিশ্বেশ্বর যেন নিজের শ্রবণেন্দ্রিয়কে বিশ্বাস করতে পারেন না।

'তুমি ঠিক বলছ মাধবী? জেনে বুঝে বলছ তো?'

'জেনে বুঝেই বলছি। আমিও সন্ন্যাস নেব আপনার সঙ্গে, আপনার সঙ্গেই থাকব। তাতে দুঃখ বোধ করব কেন?'

বিশ্বেশ্বর এবার এই অপ্রত্যাশিত ব্যবহারের কারণটা বুঝতে পারেন। বালিকার পক্ষে এ সব কথা জানা বা বোঝা সম্ভব নয় বলেই সে এত নিশ্চিন্ত উৎফুল্ল আছে—বিরাট মিথ্যার উপর অসম্ভব, অবাস্তব প্রাসাদ রচনা ক'রে।

শান্ত ধীর কণ্ঠে পত্নীর মুখখানি নিজের দিকে তুলে ধরে বলেন, 'তুমি একটু ভুল জেনেছ, সন্ন্যাসীর জীবনে স্ত্রীসংসর্গ, স্ত্রীলোকের সাহচর্য সঙ্গ—বিষবৎ পরিত্যাজ্য।'

প্রভাতের প্রফুল্ল শতদল যেন নিমেষে সন্ধ্যার আভাস পায়, শুষ্ক মলিন হয়ে ওঠে।

উৎকণ্ঠিত অবিশ্বাসের সুরে বলেন, 'কেন, সন্ন্যাসিনী কি হয় না! শুনেছি কুম্ভ স্নানে শত শত সন্ন্যাসিনী আসেন, আমার পিতামহ নিজে দেখে এসেছেন।'

'সন্ন্যাসিনী কে আছেন জানি না, তবে তপস্বিনী হতে বাধা নেই। কিন্তু তাঁদেরও পুরুষের সঙ্গ সংসর্গও এইরূপই নিষিদ্ধ। এমন কি গুরু ব্যতীত অপর সাধুর সঙ্গও। এক অবধূত সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর একত্র বাসের ব্যবস্থা আছে, কোন কোন তান্ত্রিক উত্তরসাধিকা নিয়েও সাধনা ক'রে থাকেন—তবে আমার সন্ন্যাস তেমন নয়। ইহজীবনে সমস্ত বন্ধন বাসনা কামনা ত্যাগ ক'রে নিজের শ্রাদ্ধ নিজে ক'রে এ সন্ন্যাস নিতে হয়, এখানে স্ত্রী কেন মাব সাহচর্যও সম্ভব নয়।'

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে প্রায় হতাশ কণ্ঠে বলতে যান মাধবী, 'কেন, সীতা দেবী যে গিয়েছিলেন স্বামীর সঙ্গে চীরবল্কল পরিধান ক'রে—'

'না, সীতা দেবী চীরবল্কল পরিধান করেন নি। তাহলে আর রাবণ যখন তাঁকে হরণ ক'রে নিয়ে যাচ্ছে তখন তিনি পরিহিত অলঙ্কার ফেলতে ফেলতে যাবেন কি করে? রামচন্দ্রকেই চীরবল্কল গ্রহণ করতে হয়েছিল—পিতৃসত্য অক্ষুণ্ণ রাখতে। সীতা দেবীর তো তেমন কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। তাছাড়া রামচন্দ্র সন্ন্যাস নেন নি, চৌদ্দ বৎসরের জন্য বনে বাস করাব কথা—এই মাত্র, তিনি ফিরে গিয়ে সিংহাসন গ্রহণ করবেন এ স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি তিনি ভরতকে দিয়েছিলেন।'

এবার কান্নায় ভেঙে পড়েন মাধবী। সহসা যেন মনে হয় তাঁর পায়ের নিচের মাটি সরে যাচ্ছে, তিনি কোন অন্ধ গহ্বরে একা—কেউ কোথাও নেই তাঁর, থাকবে না। জীবনে আলো বলতে কিছু থাকবে না।

বিশ্বেশ্বরের গৃহে স্থান লাভ ক রে সাধারণ ঐ বয়সী কিশোরী মেয়েদের অপেক্ষা অনেক বেশী জ্ঞান আহরণ করেছিলেন সত্য কথা—দিবারাত্রি নাম-সঙ্কীর্তনে মত্ত হওয়া দেখেও বুঝেছিলেন যে এ লোক অধিকদিন সংসারে থাকবেন না—এবং তাঁর ধারণা তিনি সেজন্য নিজেকে প্রস্তুতই করেছেন।

তবু বালিকা বালিকাই। তাঁর পক্ষে, যে অবস্থা আগে আর কারও দেখেন নি, সে অবস্থার কথা কল্পনা করা কি চিন্তা করাও তো অসাধ্য। শিক্ষা কি জ্ঞানই বা এর মধ্যে কতটুকু আয়ত্ত করা সম্ভব। সুতরাং তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠবেন, নিজেকে অসহায় বোধ করবেন, এই তো স্বাভাবিক।

মার ক্ষেত্রে যেমন স্ত্রীর বেলাতেও তেমনি—নীরব হয়ে রইলেন বিশ্বেশ্বর। প্রতীক্ষা করতে লাগলেন এই দুঃখের, সম্পূর্ণ আশাভঙ্গের এই বেদনার প্রাথমিক প্রবলতা নিঃশেষিত হবার।

নিজেকে যে ঈষৎ অপরাধী বোধ করতে লাগলেন না—তাও নয়।

মা বয়স্কা, তিনি কারও কাছে রীতিমতো পাঠগ্রহণ না করুন—পণ্ডিত-

গৃহের কন্যা, পণ্ডিতবংশের বধূ—শুনে শুনে, প্রত্যক্ষ দেখে অনেক কিছু শিখেছেন। একে সন্ন্যাসের মর্ম, সাধনার তত্ত্ব, তাঁর মনের বিচিত্র গঠন, তাঁর আশা—এসব কি বোঝানো যাবে ? জ্ঞান দিলেই হয় না—যে পাত্রে দিচ্ছেন সে আধার কতখানি তা বিবেচনা ক'রে দেখা প্রয়োজন।

এ বালিকা তাঁর কাছে পায় নি কিছুই, তবু তাঁকে ভালবাসে। অথচ তিনি স্বার্থপরের মতো নিজের কথাই কেবল চিন্তা করছেন। এ মেয়েটা কি পেল, কি পাবে তা ভাবছেন না।

কিন্তু তাঁরও যে আর উপায় নেই। তিনি কিছুতেই যাকে সংসার করা বলে, তা করতে পারবেন না। এর যা প্রাপ্য, এ কেন, এই বয়সের সব মেয়ে যা আশা করে তা দিতে পারবেন না। সুতরাং সান্ত্বনা দেবারও কোন উপায় নেই তাঁর। কীই বা বলবেন, ভবিষ্যতের কোন্ আশার চিন্তা ক'রে বুক বাঁধতে বলবেন !

বুঝি এমনিই হয়। ওঁর যিনি ইষ্ট, যাঁকে পাবার জন্যই এমন সর্বগ্রাসী আকুলতা ওঁর—তিনিও এমনি ক'রেই বহুকে কাঁদিয়েছেন। সেই কান্নার মধ্যে দিয়ে, বিরহের মধ্য দিয়েই তারা তাঁকে পেয়েছে কিনা কে জানে।

এটুকু জানেন শুধু—ওঁকেও এমনি ক'রে কাঁদতে হবে দীর্ঘকাল।

বিশ্বেশ্বরের অনুমান এবারও অভ্রান্ত প্রমাণিত হ'ল।

বহুক্ষণ, প্রায় তিন দণ্ডকাল নীরব আকুল রোদনের পর ধীরে ধীরে আপনিই শান্ত হয়ে এলেন মাধবী—একান্ত শ্রান্ত হয়েই। সে কান্নার কোন উচ্চ শব্দ নেই তবু, অথবা সেই জন্যই, মনে হয়েছিল হৃদয় বা দেহ এত নিরুদ্ধ আবেগ সহ্য করতে পারবে না, প্রাণটাই বেরিয়ে যাবে।

ওঁর সে যন্ত্রণা দেখে বিশ্বেশ্বরও যথেষ্ট যন্ত্রণা বোধ করছিলেন, তবে তিনি জানতেন যে একসময় শারীরিক শক্তির অভাবেই মাধবীকে বিরত হতে হবে, সেই আশাতেই সে দুঃসহ দুঃখ সহ্য করছিলেন।

শান্ত হবার পরও কথা বলতে দেরি হ'ল।

কি বলবেন, কি বলা উচিত, কি করবেন—কিছুই গুছিয়ে ভাবতে পারছিলেন না। অবশেষে সেই কথাই বললেন, 'তাহলে আমি কি করব ? বিবাহের পর থেকে সর্ব বিষয়ে চিন্তাভাবনা আপনার পায়ে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলাম, আপনিই বলুন আমার কি গতি হবে, আমি কি করব।'

বিশ্বেশ্বর মিষ্টকণ্ঠে বললেন, 'তুমি আমার সঙ্গিনী হ'তে চাইছিলে সন্ন্যাস নিয়ে—সে আমার তপস্যায় সাহায্য করার জন্যই, তাই নয় কি ?'

ঠিক যেন কথাগুলো বুঝতে পারেন না মাধবী, বক্তব্যের গতি কোন্ পথে যাবে। আর এখন যেন ভাবারও শক্তি নেই। কিছুক্ষণ বিহ্বল ভাবে চেয়ে থেকে বললেন, 'কি জানি ! আমিও তপস্যা করব ভেবেছিলাম !'

এবার একটু অসহায় বোধ করেন কি বিশ্বেশ্বর ?

একটু থেমে বলেন, 'কিন্তু আমি যে তোমার সাহায্য চাই। তুমি দয়া না করলে আমার সাধ তো কোনদিনই পূর্ণ হবে না।'

এই দয়া শব্দেই তড়িৎ স্পর্শ ঘটল। অকস্মাৎ আকুল ও ব্যস্ত হয়ে উঠলেন মাধবী, বললেন, 'ছি ছি, এ কি বলছেন! আপনাকে দয়া করব, করতে পারি, বললে যে আমার অপরাধ হয়। আপনার কোন আজ্ঞা পালন করতে পারব সে তো আমার সৌভাগ্য।'

'তাহলে কথা দিচ্ছ আমাকে?'

এবার ঈষৎ যেন অনুযোগের দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চান মাধবী, 'কথা নিয়ে বাক্যবন্ধ করার কথা আপনি ভাবতে পারলেন কি ক'রে! আপনি যা বলবেন তা আমি শুনব না, এ তো আমি ভাবতেই পারি না। আপনি ছাড়া আমি যে কোন দেবতা ঈশ্বর কাউকে জানি না, আপনিই আমার ভগবান।'

'তাহলে আমার অনুরোধ, তুমি এখানেই থাকো। আমি সংসার সাংসারিক বন্ধন সম্পর্ক ত্যাগ করতে উদ্যত ঠিকই—কিন্তু কর্তব্যের বন্ধন বড় কঠিন যে। মা স্ত্রী এদের অনুমতি না নিলে সন্ন্যাস দেবেন না গুরু। বংশগত গৃহদেবতা, তাঁরও সেবার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। আদেশ গ্রহণেই কর্তব্য শেষ হয় না। মার আদেশ নিয়েছি, কিন্তু সে কতকটা বলপূর্বক ভয় দেখিয়ে নেওয়া। সে ক্ষেত্রে তাঁর পরিচর্যা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং গৃহদেবতার সেবা—এর কিছু সুব্যবস্থা না দেখে চলে গেলে আমাকে প্রত্যবায়ভাগী হতে হবে। তুমি যদি এই ভার নাও, তাহলেই আমাকে যথার্থ মুক্তি দেওয়া হয়।'

ভীতি এবং সংশয়—যুগপৎ স্পষ্ট হয়ে ওঠে মাধবীর মুখে, চোখের দৃষ্টিতে। তিনি বিহ্বল কণ্ঠে বলেন, 'কিন্তু আমি কি পারব? আমি যে এখনও সংসারের কিছুই জানি না—মার সেবা করতে পারব—তবে বাইরের দিক—?'

'তার জন্য চিন্তা ক'রো না। তুমি মাকে দেখো তাহলেই আমি নিশ্চিন্ত। এখানে আমার বন্ধু অনুরাগী যাঁরা আছেন, তাঁরা তোমাদের উপবাসী থাকতে দেবেন না। পুরাতন সেবকরা আছে, তারা প্রাণ দিয়ে দেখবে। দেবসেবা আর তোমাদের দু'মুঠো প্রসাদ—এ হয়েই যাবে।'

বহুক্ষণ নীরব থেকে মাধবী বললেন, 'বেশ, আপনার আজ্ঞা আমি মাথা পেতে নিলাম। আর কোন আদেশ আছে? আমার সম্বন্ধে আর কোন অনুজ্ঞা?···আমি কি এখানে থেকেও আপনার সাধনার পথ অনুসরণ করতে পারি না?'

আবেগে এবার মাধবীর দুটি হাত চেপে ধরেন বিশ্বেশ্বর। বলেন, 'তুমি আমাকে বাঁচালে। এই কথাটাই কি ক'রে বলব তাই ভাবছিলাম। আমিও তাই চাই। গৃহে থেকেও সাধনা হয়—মেয়েরা, বিবাহিতা মেয়েরাও তপস্যা করতে পারে—এই আদর্শ তুমি স্থাপন করো।'

চকিতে একবার যেন ভ্রূকুঞ্চিত হয় মাধবীর।

কিন্তু কণ্ঠে কোন উষ্মা কি ব্যঙ্গ প্রকাশ পায় না। শান্ত ভাবই বলেন, 'মেয়েদের গৃহে থেকে সাধনা সম্ভব হ'লে পুরুষের হবে না কেন?'

'আমি থাকলেই দম্পতি। স্বামী-স্ত্রী। কাছাকাছি থাকব, আমি যুবক, তুমি যুবতী—দেহের ধর্ম পীড়ন করতে থাকবে। প্রতিনিয়ত সেই যুদ্ধ করতে

করতে কোনমতে নাম জপ যদি বা হয়, সন্ন্যাস কেন, তপস্যাও সম্ভব হবে না।'

'আমি যদি অন্যত্র যাই ?'

'সে তো আরও অশান্তি। তখন সংসারের দায়িত্ব, মা, গৃহদেবতা। তা ছাড়াও আছে, গৃহে থাকলে বহু লোক নিত্য আসা যাওয়া করবে—বহু বন্ধু, বহু ভক্ত, বহু অনুরাগী। লক্ষ কোলাহল। বিভিন্ন অরুচিকর প্রসঙ্গ। সংসারের বিষ সঙ্কীর্তনে দূর হয় না। আমি যে সব ছাড়তে চাই। সব না ছাড়লে তাঁতে সমস্ত মন অর্পণ করা যায় না, সেজন্য নিঃসঙ্গ, নির্বান্ধব, আশ্রয়হারা হয়ে কঠোর সাধনার প্রয়োজন।'

'কিন্তু আমি যে সাধনার কিছুই জানি না। আমি কি ক'রে কি করব ?'

'আমি তোমাকে দীক্ষা দিয়ে যাবো মাধবী। ইষ্টমন্ত্র স্বামীর নিকট হতে নেওয়াই শ্রেয়—যদি না একই সঙ্গে তা গুরুর কাছ থেকে নেওয়া যায়। আর তপস্যা ? শ্রীকৃষ্ণ আমার ইষ্ট, তুমি আমাকে ইষ্টর মতো মনে করো—আমাতে শ্রীকৃষ্ণে যেদিন তোমার মনে এক হয়ে যাবে—বুঝবে তোমার সিদ্ধিলাভ হয়েছে। তোমার পক্ষে নাম জপ করা আর তাঁর চিন্তা ধ্যান—সর্ব কর্মে সকল ভাবনায় তাঁকে স্মরণ করা—এই-ই যথেষ্ট তপস্যা। আর সেইখানেই তোমায় আমায় নিত্য মিলন। আমি যেখানেই থাকি এই একই চিন্তা দুজনের এই একই মন্ত্রজপ—এই কথাটা চিন্তা ক'রো, আমার দেহাতীত উপস্থিত অনুভব করবে।...আগামীকালই শুভ লগ্ন আছে, তুমি প্রত্যূষে স্নান ক'রে এখানেই এসো, এই ঘরেই আমি তোমাকে দীক্ষা দেব।'

আর কোন কথা বললেন না মাধবী কিন্তু যখন গলায় আঁচল দিয়ে স্বামীর দুই পায়ে মাথা রেখে প্রণাম ক'রে আবার মুখ তুললেন—বিশেশ্বর দেখলেন তাঁর দুই চোখ থেকে পুনশ্চ জলের ধারা নেমেছে।

মাধবী প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চোখ মুছে গাঢ়কণ্ঠে বললেন, 'না না, দুঃখের নয়, এ আমার আনন্দের অশ্রু। আপনি আমার সঙ্গে নিত্য মিলন স্বীকার করেছেন, আমার সঙ্গে ইষ্ট-সাধনা ভাগ ক'রে নেবেন—এই চিন্তাই আমাকে আজীবন বিচ্ছেদ সহ্য করার শক্তি যোগাবে।'

তারপর ঈষৎ থেমে একটু যেন অধিকতর আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'তবে একটা ভিক্ষা, যেদিন যাবেন আমাদের না জানিয়েই যাবেন, চোখের সামনে বিদায় নিয়ে চলে যাবেন চিরকালের মতো হয়ত বা—হয়ত অতটা সহ্য হবে না, ভেঙে পড়ব হয়ত, হয়ত মনের এই এখনকার সঙ্কল্প আশ্বাস স্থৈর্য কিছুই কাজে আসবে না। আর মাও—হয়ত মাথা কুটবেন, উন্মাদের মতো আচরণ করবেন—আপনি দুঃখ পাবেন তাতে।'

'তাই হবে মাধবী। আজ বুঝছি তুমি আমার প্রতি ঈশ্বরের আশীর্বাদ!'

সন্ন্যাস নেবার পর কটা দিন যেন এক ঘোরের মধ্যে দিয়ে কাটল বিশ্বেশ্বরের।

সে ঘোর বা আচ্ছন্নতা ক্রমশ এক প্রবল দ্বন্দ্বে পরিণত হ'ল।

সন্ন্যাস নেওয়ার ইচ্ছা এতদিনের, এ কদিন শুধু সেই কথাই চিন্তা করেছেন একমনে, যেন একটা জিদকেই লালন করেছেন অবিরাম।

এখন সেই সন্ন্যাস পাওয়ার পর—পুরোমনটা কি দিতে পারছেন তপস্যায়?

যে সব অনভিপ্রেত চিন্তা জোর ক'রে মন থেকে অপসারিত করার চেষ্টা করছেন সেই সব চিন্তাই পুনঃ পুনঃ অধিকতর শক্তি সঞ্চয় ক'রে মনে আসছে।

মনে হচ্ছে তাঁর দেবীর মতো জননী, নিবেদিতপ্রাণা কিশোরী বধূ—সেদিন প্রভাতে শয্যাত্যাগ ক'রে উন্মুক্ত দুয়ার, শয্যা শূন্য দেখে না জানি কি আছাড়-পিছাড়িই খেয়েছেন!

এই অল্প বয়সেই বহু লোক বহু ধরনের লোক দেখেছেন তিনি—অভিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান বিশ্বেশ্বর জানেন যে অনুমতি দেওয়া, আবেগের বশে তাঁকে নিশ্চিন্ত করার যতই চেষ্টা করুন না কেন—মা স্ত্রী এঁরা, এই সর্বকালের জন্য গৃহত্যাগে, চিরদিনের মতো তাঁদের পরিত্যাগ ক'রে যাওয়ার আঘাতে ভেঙে পড়বেনই। তখন আর ভদ্র শিক্ষিত বংশের সংস্কার, স্থৈর্য কিছুই থাকবে না। এই শ্রেণীর আঘাতে যে দুঃখ তা যখন বাস্তব হয়ে দাঁড়ায় তখন গ্রাম্য নারীতে ও নগরযোষিতায় কোন পার্থক্য থাকে না। চিরন্তন নারীর হাহাকার একই, সর্বদেশে, সর্বকালে।

ওঁদের ভরণপোষণের অভাব হবে না, তবু সে কথাও মনে হয় বৈকি।

অবশ্য এ সবই সাময়িক। ক্ষণেকের চিন্তা ক্ষণেকেই মেলায়—লীয়তে হৃদিরুখায়।

সন্ন্যাসীর এ সব চিন্তা নিষিদ্ধ, ইষ্ট ব্যতীত অন্যমনস্ক হ'তে নেই—এই জ্ঞানে বার বার মানসিক বন্ধনচিন্তা ছিন্ন করার চেষ্টা করেন, তবু কোথায় অবচেতনে অশান্তি একটা থেকেই যায়।

কেন, কি করলে তিনি অনন্যমনা হয়ে এতদিনের ঈপ্সিত তপস্যায় নিজেকে নিয়োগ করতে পারেন?

অবশেষে আর দ্বন্দ্ব সহ্য করতে না পেরে মধুসূদন ভারতীকে একদিন বলেন, 'শুনেছি সন্ন্যাসীর পক্ষে তীর্থভ্রমণ বা হিমালয়ে গমনই প্রশস্ত। আপনি আজ্ঞা দিন, আমি ব্রজমণ্ডলের দিকে যাত্রা করি।'

মধুসূদন কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'তীর্থযাত্রাকালে তোমার চিন্তা বা মানসিক অস্থিরতাকে কি এ স্থানে রেখে যেতে পারবে?'

লজ্জা পেলেন কৃষ্ণপ্রাণ ভারতী—বর্তমানে বিশ্বেশ্বরের এই নামকরণ হয়েছে—মাথা নিচু ক'রে জড়িত কণ্ঠে বললেন, 'সেখানে শুনেছি শ্রীভগবানের নিত্য-লীলা আজও বহমান, সেখানের বাতাসে গোপীগণের তদ্গতপ্রাণতা, সেখানের ধূলিকণা তাঁর পদরজঃপূত—সেখানে গেলেও কি আমার চিত্ত স্থির

হবে না—?'

তার পর, মাথা তুলে তখনও নির্বাক মধুসূদনের দৃষ্টি তেমনি স্থিরনিবদ্ধ দেখে কতকটা বিহ্বল কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'তাহলে আপনিই বলুন, এখন কি করব ?'

মধুসূদন বললেন, 'আমার মনে হয় কয়েকদিনের জন্য তোমার শান্তিপুর গমনই শ্রেয়। শুনেছি আচার্যদেব, শ্রীনিবাস প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছেন, তোমার পূর্বাশ্রমের মাতৃদেবী ও ভার্যা অনাহারে অনিদ্রায় এবং নিরন্তর রোদনে মৃতপ্রায়। তুমি শান্তিপুরে গেলে তাঁরা আসতে পারবেন, তোমার জননীও তোমাকে দেখে এই আশ্বাস লাভ করবেন যে হয়ত ভবিষ্যতেও এই ভাবে মধ্যে মধ্যে পুত্রের দর্শন লাভ করবেন, অন্তত যোগাযোগ—সংবাদ আদানপ্রদান থাকবে। আর তাঁরা আশ্বস্ত হয়েছেন, কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করেছেন জানলে তুমিও চিন্তার সূত্র থেকে মুক্ত হয়ে তপস্যায় সম্পূর্ণ মনোসংযোগ করতে পারবে। প্রয়াগের পর থেকেই গাঙ্গেয় পশ্চিমাংশকে যমুনা বলে গণ্য করা হয়। প্রত্যহ সেখানে স্নান ক'রে ইষ্ট ধ্যান করলে ব্রজমণ্ডলের পরিবেশ অনুভব করতে পারবে।'

'আবার গৃহের নিকট, পূর্ব-পরিচিতদের মধ্যে ?' উদ্বিগ্ন বিষণ্ণ কৃষ্ণপ্রাণ বলে ওঠেন।

'কেন, তাতে কি তোমার বৈরাগ্য বিপন্ন হবে ? তোমার বৈরাগ্য, তীব্র ঈশ্বরাকাঙ্ক্ষা কি এত ভঙ্গুর ! আর, এ সবই শ্রীকৃষ্ণের গৃহ, ভক্তজন মাত্রেই আত্ম-জন ! তোমার আমার গৃহ বলে কিছু নেই। দেখ, তোমার যা অভিরুচি। আমি যা বললাম তোমার কল্যাণের জন্যই।'

সেই আদেশ বা উপদেশ মতোই নবীন সন্ন্যাসী পদব্রজে যাত্রা করলেন। একা, নিঃসঙ্গ। নিঃসম্বল। একবস্ত্র।

কোন্ দিকে যাচ্ছেন সে জ্ঞান নেই, আহারাদি সম্বন্ধেও কোন সচেতনতা বা আগ্রহ নেই। হয়ত শেষ পর্যন্ত শান্তিপুরে পেঁছানোই হ'ত না—যদি না অনুরাগীজনেরা, তাঁরই সন্ধানে বহির্গত তাঁর বন্ধুরা তাঁকে দেখে ফেলতেন।

চেনা প্রায় অসম্ভব, অমন সুন্দর কান্তি ধূলিধূসর, অনাহারে অনিদ্রায় দেহ শুষ্ক ও শীর্ণ, ভ্রমরকৃষ্ণ কেশরাশি বিলুপ্ত—এই কি সে অনিন্দ্যসুন্দর বিশ্বেশ্বর আচার্য ?

বাষ্পাচ্ছন্ন-দৃষ্টি বন্ধুরা তাঁকে স্নান করিয়ে নূতন গৈরিক বহির্বাস পরিয়ে দিলেন। একবস্ত্রেই এ কয়দিন ছিলেন, স্নানান্তে অশৌচকালের মতোই সিক্ত-বস্ত্র দেহের উত্তাপে ও বাহিরের বাতাসে শুষ্ক হ'ত ; ব্রহ্মস্বরূপ বুঝিয়ে দিলেন যে বহির্বাস দণ্ড কমণ্ডলু সবই একসময় জীর্ণ দশাপ্রাপ্ত হ'তে বাধ্য, সে ক্ষেত্রে নবগ্রহণ যখন অবশ্যম্ভাবী, তখন মিথ্যা এই মলিনবস্ত্রে থাকার প্রয়োজন কি ?

আচার্যদেবের বাটির বহিরঙ্গনেই আশ্রয় গ্রহণ করলেন কৃষ্ণপ্রাণ। তাঁর শুভ

আগমন সংবাদ শুনে চারিদিক থেকে অগণিত ভক্ত ছুটে এল তাঁকে দর্শন করতে। নবদ্বীপ প্রায় শূন্য ক'রে তাঁর অনুরাগীরা এসে পৌঁছলেন। তাঁদের স্থানের জন্য চিন্তা নেই, আহারের উৎকণ্ঠা নেই, ওঁকে দেখেই শান্তি—তারপর তো প্রান্তর বৃক্ষতল রইলই।

আচার্য ওঁর সংবাদ পাওয়া মাত্র ইন্দ্রাণী দেবীকে তা পৌঁছে দিয়েছিলেন, এক্ষণে তাঁকে আনয়নের জন্য নৌকা প্রেরণ করলেন।

ইন্দ্রাণী দেবী ত্রস্তে-ব্যস্তে যাত্রা করলেন বৈকি।

তিনি যে অবস্থায় ছিলেন সেই অবস্থাতেই ছুটে এলেন নৌকার কাছে। কিন্তু জলে নেমে নৌকা আরোহণ করতে গিয়ে সহসাই সচেতন হয়ে উঠলেন—আর একটি প্রাণী সর্বাঙ্গ বস্ত্রে আচ্ছাদিত ক'রে তাঁর পিছনে পিছনে এসেছে।

তাঁরই পুত্রবধূ বালিকা মাধবী।

গত কয়েকদিনের অবিরাম ক্রন্দনে, অনাহারে, অনিদ্রায় তার সেই স্বর্ণলতার মতো তনু বিশুষ্ক, শ্বেতচম্পকবৎ গাত্রবর্ণ তাম্রাভ, দুটি আয়ত চক্ষু কোটরগত।

দেখে মায়া তো হয়ই, নিজেকে যেন অপরাধী বোধ করেন ইন্দ্রাণী।

তিনি সস্নেহে আবাহন করতে যাচ্ছেন, আচার্যের প্রেরিত লোকটি সবিনয়ে অর্ধস্ফুট স্বরে জানাল, সন্ন্যাসীর পূর্বদেহের স্ত্রী দর্শন নিষিদ্ধ। এমনিতেই গর্ভধারিণী ব্যতীত কোন স্ত্রীলোককে সম্ভাষণ করার রীতি নেই, তদুপরি পত্নী—নৈব নৈব চ। আচার্যদেব বিশেষভাবে সতর্ক ক'রে দিয়েছেন।

ইন্দ্রাণী দেবীর বোধ হ'ল আবারও একটা প্রচণ্ড আঘাত পেলেন।

এই মেয়েটা—এই বয়সেই স্বামীসঙ্গ-বঞ্চিতা—

দূর থেকেই না হয় তাকে দর্শন করত, তাতে এমন কি অন্যায় বা অনাচার ঘটত!

তাঁর মনে হ'ল তিনি এ নৌকা শূন্যই ফিরিয়ে দেন।

প্রয়োজন নেই ঐ মিথ্যা নিষ্ঠুর পুত্রকে দেখে। কিন্তু দেখলেন ঐ লোকটির বাক্যগুলি কর্ণগোচর না হোক বাক্যের মর্মার্থ মাধবীর মস্তিষ্কগোচর হয়েছে। সে নতমুখ আরও নত ক'রে ফিরে যাচ্ছে গৃহের দিকে।

দুঃখ ঠিকই, তত্রাচ পুত্রকে দেখার আকর্ষণ আরও প্রবল।

ইন্দ্রাণী নৌকায় আরোহণ করলেন।

মুণ্ডিত মস্তক গৈরিকবাস দণ্ড-কমণ্ডলুধারী সন্তানকে দেখে জননীর বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে অশ্রু নির্গত হওয়ার কথা, দুই চক্ষু বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে দৃষ্টির অন্তরায়ও ঘটল তথাপি, এ সত্যও উনি মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে, এই বেশেও ওঁর পুত্র অনন্যসুন্দর; বরং নবীন সন্ন্যাসের জ্যোতিরাভা তাঁকে অপরূপ, প্রায় কল্পনার দেবতার মতো এক দুর্লভ মহিমামণ্ডিত করেছে; সূর্যের মতো তেজঃপুঞ্জ অথচ চন্দ্রের মতো স্নিগ্ধ, মনোরম, দৃষ্টির আনন্দদায়ক ক'রে তুলেছে।

এই এতগুলি লোকের মধ্যেও ওঁর পুত্রের সমতুল্য কেউ নেই। তিনি একক, অসামান্য। মানবোত্তর দ্যুতিতে দীপ্যমান।

সন্ন্যাসীপুত্র উঠে এসে জননীর দুই পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করল।

মা যেন এতক্ষণ তাঁকে স্পর্শ করতে সাহস করছিলেন না ; এবার বক্ষে বন্ধন ক'রে এতদিনের অদর্শন-যন্ত্রণার কিছুটা প্রশমন করলেন।

হতভাগিনী এবং গৌরবিনী-গৌরব এই বহুজনপূজ্য স্বামীর স্ত্রী হিসাবে পূজনীয়া বলে—বধূর প্রসঙ্গ কোন পক্ষই উত্থাপন করলেন না।

অতঃপর ক'দিন আচার্যগৃহেই অবস্থান ক'রে ইন্দ্রাণী দেবী নিজে রন্ধন ক'রে পুত্রকে ভিক্ষা দেওয়ালেন। পুত্রের প্রিয় সব ব্যঞ্জন পুনশ্চ তাঁর সম্মুখে পরিবেশন ক'রেই সুখ। ভিক্ষুকের মতো কদলীপত্র ও পত্রপুট ব্যবস্থা—তবু তো পুত্রকে খাওয়াতে পারছেন। নিশ্চয়ই বিশাইয়ের এই কয়দিন পর্যাপ্ত আহার হয় নি, হয়ত আহারই হয় নি বেশির ভাগ দিন। মার হস্তে প্রস্তুত খাদ্য ছাড়া যে বাছার মুখে কোন কিছু রোচে না।

তাই এ পরিবেশনে হাসি ও অশ্রুর আশ্চর্য সম্মিলন, তবে দুঃখের থেকে আনন্দই বেশি। আর আশঙ্কা। এ ভাগ্যও কি বেশী দিন থাকবে!

এধারে বিশ্বেশ্বরের এই নব বেশে পুনরাবির্ভাবের বৃত্তান্ত লোকমুখে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। দিকদিগন্তর থেকে জনসমাগম হয়। দিন দিন সে সংখ্যা বেড়েই যাচ্ছে। ফলে আচার্যকে বহিরঙ্গনে বিরাট আটচালার মণ্ডপ প্রস্তুত করাতে হয়। তবে তাদের আতিথেয়তা নিয়ে আচার্যকে খুব একটা বিব্রত হ'তে হ'ল না। স্থানীয় অনুরাগী ও ভক্তের দলই এই জনসমুদ্রের সেবার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। প্রাচীন কালের নৃপতিদের অনুষ্ঠিত যজ্ঞের মতো প্রতিদিনই কিছু কর্মী অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত ক'রে যেতে লাগলেন।

সাধক, পণ্ডিত, সাধারণ মানুষ সে যজ্ঞে একাকার হয়ে এক বিরাট পরি-বারের রূপ ধারণ করল।

কী বলবেন একে কবিরা ?

চাঁদের হাট ?

না নীহারিকা-পুঞ্জের মধ্যে এক নবোদিত নক্ষত্রের উদয়-উৎসব ?···

দিবারাত্রি সংকীর্তন, শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা—এবং প্রসাদ বিতরণ—এর মধ্য দিয়েই সময় কাটে কৃষ্ণপ্রাণের। প্রিয় বন্ধু ও ভক্তদের সঙ্গে আনন্দও লাভ করেন প্রচুর।

কিন্তু ক্রমে ক্রমে একটা ক্লান্তিও বোধ করতে লাগলেন। ক্লান্তি, আর সেই সঙ্গে গ্লানিও একটা।

এ কি করছেন তিনি? এই জন্যই কি মা ও স্ত্রীর বক্ষে মর্মান্তিক শেলাঘাত ক'রে সন্ন্যাস নিলেন তিনি!

এই অধিকতর কোলাহল ও সীমাহীন আলস্যের মধ্যে কেন্দ্রকারণ হয়ে অবস্থান করবেন বলে ?

এতে যে তাঁর বিন্দুমাত্র কোন নিজস্ব সময় থাকছে না, থাকছে না এতটুকু

নির্জনতা। ধ্যান ধারণা তো দূরের কথা—ইষ্টচিন্তা থেকেই যে ক্রমশ দূরে চলে যাচ্ছেন!

গৃহেও তো এই ভাবেই ছিলেন। বরং তখন কিছুটা ধ্যান বা চিন্তার অবসর ছিল, ছিল কিছুক্ষণ আত্মস্থ হয়ে থাকার সুযোগ। কিছুটা বিশ্রামও পেতেন।

তবে আর এত কাণ্ডর কি প্রয়োজন ছিল?

না, আর না।

অন্য কোথাও যেতে হবে। লোকালয়েই যদি থাকতে হয়—দূর কোন তীর্থে, যেখানে পরিচিতদের অনুগতদের প্রীতি ও শ্রদ্ধার আতিশয্য এমন নিয়ত তাঁকে কঠোর বন্ধনে শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে পারবে না।...

সহসাই একদা তিনি নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন।

এবার ওঁরা অনুগ্রহ ক'রে বিদায় দিন। তিনি নির্জন বাসে তপস্যার প্রয়াস পাবেন। সন্ন্যাসের কর্তব্যে বিস্তর ত্রুটি ঘটেছে, আর অপরাধ বাড়াবেন না।

এ সংকল্পের কথা শুনে সকলেই যে উদ্বিগ্ন ব্যস্ত বা ব্যাকুল হয়ে উঠবেন সে তো জানা কথাই। অন্তরঙ্গদের তো কথাই নেই। তাঁরা যেন সবেমাত্র কিছুটা নিশ্চিন্ত হ'তে আরম্ভ করেছিলেন—এ আনন্দ উৎসব, এ প্রিয় সঙ্গ চিরস্থায়ী না হোক, দীর্ঘস্থায়ী হবে, এখনই বিচ্ছেদের কথা চিন্তা ক'রে ব্যস্ত হবার কোন প্রয়োজন নেই—এমনি একটা ধারণা জন্মে গিয়েছিল তাঁদের। ফলে চারিদিক থেকে প্রতিবাদ, অনুনয়-বিনয়ের বন্যা এসে যেন কৃষ্ণপ্রাণকে অভিভূত বিচলিত করার উপক্রম হ'ল।

আচার্য শ্রীনিবাস প্রভৃতি শ্রদ্ধেয় বন্ধুরা অবশ্য এ বৃথা বাক্যব্যয়ে গেলেন না। তাঁরা এতদিন এই তরুণ যুবকটিকে সম্যক চিনে নিয়েছিলেন। এ যেমন কুসুমাদপি কোমল, তেমনি বজ্রাদপি কঠোর হতেও জানেন।

তাঁরা প্রস্তাব করলেন, এ শহরের উপকণ্ঠে অপেক্ষাকৃত কোন নির্জন স্থানে গঙ্গাতীরে তাঁরা ওঁকে কুটির নির্মাণ ক'রে দিচ্ছেন। বিশেষ কোন কারণ ছাড়া তাঁরা সে কুটিরের সান্নিধ্যে কখনও যাবেন না, শুধু নিকটেই ভিন্ন কুটিরে কেউ একজন ক'রে সেবক থাকবে যে নীরবে ওঁর প্রয়োজনগুলি সাধন করবে। ভিক্ষা—উনি সম্মত হলে এঁরা প্রত্যহ এক নির্দিষ্ট সময়ে গিয়ে সে কুটিয়ার এক-স্থানে নীরবে রেখে চলে আসবেন, অন্যথায় সে চেষ্টাও করবেন না।

এমন কি তাঁরা ওঁর জননীকেও অনুরোধ করবেন—আর যেন তিনি ওঁকে দেখার জন্য ব্যাকুল না হন। নিকটে থাকলে নিত্য সংবাদ পেলে তিনিও সে অনুরোধ অবশ্যই রক্ষা করবেন। পরন্তু, অন্য কোন তীর্থে বা সুদূর পর্বতে গেলে সংবাদ-সীমার বাইরে চলে যাবেন, সেক্ষেত্রেই মার পক্ষে উদ্বিগ্ন হয়ে সে স্থানে যাওয়ার চেষ্টা করা স্বাভাবিক।

যুক্তিপূর্ণ প্রস্তাব। কৃষ্ণপ্রাণ এবার একটু বিব্রতই বোধ করলেন।

দিন দুয়েক চিন্তাও করলেন। অবশেষে বললেন, 'বেশ, আমি এ বিবেচনার ভার মার উপরই ন্যস্ত করলাম। এ দেহ তাঁরই দান, তিনি লালন পালন করেছেন, তিনিই মনুষ্যত্ব লাভে—বিদ্যায় শিক্ষায় প্রবুদ্ধ করেছেন। সাধনাই করি আর তপস্যাই করি—সিদ্ধিলাভ ঘটুক আর নাই ঘটুক—যতদিন এ দেহ থাকবে তাঁর ঋণ তো অস্বীকার করতে পারব না। এ বিষয়ে তিনি যা আদেশ করবেন আমি তা নির্বিচারে পালন করব।'

এ কথায় শুধু সাধারণ অনুরাগীবৃন্দ নন—অন্তরঙ্গ যাঁরা, ওঁর মনের পথ যাঁদের একেবারে অগম্য নয়, তাঁদের মনেও আশার সঞ্চার হ'ল।

মা নিশ্চয় একমাত্র পুত্রকে দূরে পাঠাতে চাইবেন না। আচার্যদেব প্রভৃতির প্রস্তাবই সমর্থন করবেন।

কিন্তু ইন্দ্রাণী দেবী সকলকে চমৎকৃত ও হতাশ ক'রে দিয়ে এক আশ্চর্য আদেশ করলেন।

মাতা যে একমাত্র সন্তানকে সন্ন্যাস গ্রহণে সম্মতি দিয়েছিলেন, তার কারণ পুত্রের মন তিনি জানতেন, নিজের সুখের অপেক্ষা, সংসারের অখণ্ডতা অপেক্ষা—পুত্রের সুখ তার সার্থকতার মূল্য তাঁর কাছে অনেক বেশী।

তিনি অনেকক্ষণ নীরব রইলেন। একবার পুত্রের মুখের দিকেও চাইলেন। সে মুখ নির্বিকার, প্রশান্ত। ওঁর চোখেও কোন অনুরোধ বা অনুনয় নেই, শান্ত সহজ ভাবেই জননীর অভিমতের অপেক্ষা করছেন যেন, যেন সম্পূর্ণ ভাবেই, 'কায়েন মনসা বাচা' আত্মসমর্পণ করেছেন তাঁর কাছে—

তবু ইন্দ্রাণীর মনে হ'ল তিনি সে চোখে ঈষৎ বেদনা ও হতাশার ছায়া দেখতে পেলেন ক্ষণেকের জন্যে। এ কি ব্যর্থতার বেদনা, এতকালের আশা ভঙ্গ হবার হতাশা ?

তিনি মন স্থির ক'রে ফেললেন।

বললেন, 'ছেলে আমার নিকটে থাকে, এর চেয়ে আনন্দের কথা আর কি থাকতে পারে। কিন্তু ছেলের মন আমি জানি। তার যদি তপস্যায় বিঘ্ন ঘটে তার জীবনটাই নষ্ট হয়ে যাবে। ছেলেকে চোখের দেখার থেকে তার সাফল্য, তার পূর্ণতা, তার গৌরব—অনেক বেশী কাম্য।'

এই বলে একটুখানি থেমে পুনশ্চ বললেন, 'আপনারা তীর্থের কথা বলছিলেন, বেশ তো, নীলাচল ধাম, শ্রীক্ষেত্র প্রসিদ্ধ তীর্থ, চার ধামের এক ধাম। জ্ঞানী ব্যক্তিরা বলেন, ভগবান ওখানে নিত্য আহার করেন, দারুভূতো মুরারি—ওখানে ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ।* প্রধান তীর্থ অথচ নিকটে, এই জন্য এ দেশের বহু লোক প্রতি বৎসর বিভিন্ন পার্বণ উপলক্ষে ওদেশে যান, রথযাত্রা, ঝুলন, দোল—প্রায় সারা বৎসরই যাতায়াত চলে। বিশাই যদি ওখানে থাকেন, তাহলে

---

* একটা জনশ্রুতি প্রচলিত আছে—ভগবান নিত্য প্রয়াগে স্নান করেন, পুষ্করে প্রভাত-সন্ধ্যা, বদরীনারায়ণে তপস্যা, দ্বারকায় কাছারী, নীলাচলে আহার, সেতুবন্ধে সায়ংসন্ধ্যা ও বৃন্দাবনে শয়ন করেন।

মধ্যে মধ্যে ওঁর সংবাদ পাওয়া শুধু সম্ভব নয়, সহজ হবে। লোকে চোখে দেখে এসে সংবাদ দিতে পারবে। আমার মনে হয় বিশাই যদি ওখানেই সাধনার আসন পাতেন তো আমি কিছুটা শান্তি পাই, আশ্বস্ত বোধ করতে পারি।'

কৃষ্ণপ্রাণ নীরবে সাশ্রু নয়নে উঠে এসে মায়ের দুই পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করলেন।

ব্রহ্মস্বরূপ একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'আমাদের অন্য আদেশ আশা করাই নির্বুদ্ধিতা হয়েছে। মা এরূপ না হলে এমন সন্তান হতে পারত না।'

॥ ১৫ ॥

কৃষ্ণপ্রাণের ইচ্ছা সেই দিন তন্দণ্ডেই নীলাচল যাত্রা করেন—কিন্তু ভক্তবৃন্দ কিছুতেই তা হ'তে দিলেন না। তাঁরা যুক্তি দেখালেন—অনেকেই তাঁকে দর্শনের জন্য দূর-দূরান্তর থেকে রওনা দিয়েছেন, এখনও অনেকে এসে পোঁছতে পারেন নি। সুতরাং অন্তত আর দু-চারদিন তিনি এখানেই আসন রাখুন।

আরও একটি বিষয়েও তাঁর অভিপ্রায় মতো কাজ হ'ল না। তাঁর ইচ্ছা ছিল তিনি একা নিঃসঙ্গ যাত্রা করবেন, দীনহীনের মতো কৃষ্ণনাম জপ করতে করতে একা গিয়ে শ্রীমন্দিরে পোঁছবেন, কিন্তু ভক্তরা বললেন, 'তা হ'তে পারবে না। আপনার কোন বাহ্যজ্ঞান থাকে না পথ চলতে গেলে, ক্ষুধা-তৃষ্ণার জ্ঞানও থাকে না—এ অবস্থায় পথেই কোথাও দেহরক্ষা করবেন হয়ত, কেউ জানতেও পারবে না। ওঁরা কেউ কেউ সঙ্গে যাবেনই।'

কৃষ্ণপ্রাণ জিদ করতে তাঁরা স্পষ্টই উত্তর দিলেন, 'সুলতানের রাজত্ব এটা, পথ সরকারের, সে পথ দিয়ে আমরা গেলে তুমি বাধা দেবার কে? আমাদের তো তুমি বহন ক'রে নিয়ে যাচ্ছ না। আর আমরা তোমার ভিক্ষালব্ধ অন্নেও ভাগ বসাচ্ছি না।···আমরাও ভিক্ষা করতে জানি।'

অগত্যা একটা আপস ব্যবস্থা করতেই হ'ল। স্থির হ'ল যে, ওঁর যে পাঁচজন বন্ধু ব্রহ্মচর্যের ব্রত নিয়েছেন, কোন দিন বিবাহাদি করবেন না বা সংসারে লিপ্ত হবেন না, তাঁরাই ওঁর সাথী হবেন। আর একটি লোক ওঁর সেবকের পদ দাবী করল, সে ভয় দেখাল যে বাধা দিলে সে ওঁর সামনেই গঙ্গায় ঝাঁপ দেবে।

অগত্যা অসহায় কৃষ্ণপ্রাণকে সম্মতি দিতে হ'ল।

শ্রীনিবাসের অন্য একটি গোপন অভিপ্রায় ছিল, তিনি বললেন, 'বহু লোক সংবাদ মাত্র পেয়ে দূরদূরান্তর থেকে এসে তোমাকে দর্শন করে গেল, তোমার উপদেশ, তোমার নামগান শুনে গেল—একটি সর্বরিক্তা বালিকাকে কেন বঞ্চিত করছ? বধূমাতা যদি অবগুণ্ঠিতা হয়ে এসে দূরে বসে থাকেন—তাতে দোষ কি?'

কৃষ্ণপ্রাণ শ্রীনিবাসের মুখের ওপর স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে ধীরে ধীরে

উত্তর দিলেন, 'সে বালিকা এই বয়সেই বিনা দোষে বহু দুঃখ পেল, আমার জন্য সে যে ত্যাগ করেছে, করল—তার বোধ করি তুলনা নেই—তদুপরি এখন এই ভাবে অপরাধিনীর মতো এসে দেখে যেতে বললে তাকে অপমান করা হবে না কি ? আর, তাতে কি ফললাভ হবে বলতে পারেন ? এ তাকে অধিকতর কষ্ট দেওয়া নয় কি ? তাছাড়া, এ কদিনে সে প্রাথমিক প্রচণ্ড দুঃখটা একটু সম্বরণ করতে পেরেছে হয়ত—এ ভাবে পুনশ্চ চোখে দেখলে, বিশেষ এই বেশে—সে যন্ত্রণা বহুগুণ বর্ধিত হবে। মা আমার শ্রুতিগোচর ভাবেই অপরকে বলেছেন, সে এখন তপস্বিনীর জীবনযাপন করছে, সাংসারিক সকল দায়িত্ব পালন ক'রে অবশিষ্ট সমস্ত সময় ইষ্টনামজপে অতিবাহিত করে। মাত্র একপ্রহরকাল বিশ্রাম আর দিনান্তে একমুষ্টি মাত্র প্রসাদ এই গ্রহণ করে। কারও সম্মুখে কোন কারণেই অবগুণ্ঠন মোচন করে না। সে দিক দিয়ে সে আমার থেকে এ পথে বহুদূর অগ্রসর হয়ে গেছে, বস্তুত সে আমার নমস্যা।...মিথ্যা তাকে পূর্ব সম্পর্কের কথা স্মরণ করিয়ে নূতন ভাবে তীব্র যন্ত্রণাভোগের কারণ হওয়া কি ভাল হবে ? তদ্ব্যতীত পূর্ব দেহের সম্পর্কে সে আমার অর্ধাঙ্গিনী, সব থেকে বেশী আপন—তাকে দূর থেকে একবার দেখে চলে যেতে বলবেন, একটা কথা পর্যন্ত বলতে পারবে না—এর থেকে তার অবমাননা আর কি হ'তে পারে ? না, সে চেষ্টা করবেন না। আমার নবগৃহীত সন্ন্যাস অনেক ভাবেই ক্ষুণ্ণ হয়েছে বা হচ্ছে—আর আমার মনে ধিক্কার-বোধ জন্মাবেন না।'

ইন্দ্রাণী দেবী পুত্রের যাত্রার পূর্বদিনই গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। তাঁর শিবিকা আরোহণের সময় কৃষ্ণপ্রাণ উপস্থিতও ছিলেন। প্রণামও করেছেন—সে মর্মান্তিক যন্ত্রণা প্রাণপণে সহ্য ক'রে অমানুষিক মনোবলে সাগরপ্রমাণ অশ্রুর নির্গমন পথ কপাটরুদ্ধ ক'রে শুষ্ক চক্ষুতেই শিবিকায় উঠেছেন, পাছে পুত্রের যাত্রাপথে অকল্যাণের ছায়া পড়ে। সে যে আর কোন দিন আসবে, আবার দেখতে পাবেন—এ সম্ভাবনা যে নেই ইন্দ্রাণী তা ভালই জানতেন, সেজন্য প্রস্তুতই ছিলেন, তথাপি মার প্রাণ যে কোন যুক্তি-সম্ভাব্যতাই হিসেব করে চলে না, তাই দৃষ্টিপথের সীমা অতিক্রম করা মাত্র তিনি শিবিকাতেই মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।...

আর কে জানে কেন, ঠিক সেই মুহূর্তে আচার্য-গৃহসংলগ্ন তাঁর আশ্রম-দ্বারের সম্মুখে এসে নবীন সন্ন্যাসীও একবার থেমে গেলেন, বোধ হ'ল তাঁর দুই চক্ষু বাষ্পার্দ্র হয়ে এল।

অবশ্য সে অত্যল্প কালের জন্যই, আবার সচকিত হয়ে উঠে একবার শুধু অস্ফুট কণ্ঠে বললেন, 'হে প্রভু, তোমার পরীক্ষার কি শেষ হবে না ?'...

ইন্দ্রাণী দেবী কিছু পরেই জ্ঞান ফিরে পেয়েছিলেন, এবং বধূর কথা চিন্তা ক'রে প্রাণপণে অশ্রুচিহ্ন বিলুপ্ত করার চেষ্টা করতে করতেই শিবিকা থেকে অবতরণ করলেন—কিন্তু ধৈর্যের মূর্তিমতী প্রতিমা তাঁর বধূর দৃষ্টিতে সে চিহ্ন গোপন রইল না।

তিনি নিঃশব্দে কাছে এসে 'মা' বলে একবার মাত্র ডেকে উঠেই—সে অতি-মৃদু কণ্ঠের সম্বোধনও যেন ইন্দ্রাণীর কর্ণে সহস্র আর্তনাদের মতো আঘাত করল—এত দিন পরে শ্বশুরের বুকে মাথা রেখে হু-হু ক'রে কেঁদে উঠলেন।

মা ছিলেন এ কদিন পুত্রের নিকটে, তাতেই বুঝি তবু স্বামীর সঙ্গে একটা যোগাযোগ ছিল ওঁর। স্বামী এখানেই আছেন, অতি নিকটে, এই আশ্বাসটা ছিল; এবার সে সামান্য বা কল্পিত যোগসূত্রটুকুও ছিন্ন হ'ল, সম্ভবত চিরদিনের জন্যই—সেটা মাধবীরও বুঝতে অসুবিধা হয় নি।

হয়ত কোন কালে, কোন সুদূর ভবিষ্যতে ইন্দ্রাণী দেবী নীলাচলে গিয়েও দেখে আসতে পারবেন মাধবীর ইষ্টকে, কিন্তু ওঁর যে সে অধিকারটুকুও নেই!...

কে জানে এই বুকফাটা হাহাকার, তীব্র হতাশার এই বেদনা-প্রকাশ সেই প্রায়-সর্বজ্ঞ সংসারত্যাগীর মনে বেজেছিল কিনা, নামসংকীর্তনের মধ্যে বারেক অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন কিনা—এক লহমার জন্য যতিভঙ্গ ঘটেছিল কিনা!

তার কোন ইতিহাস কোথাও লেখা নেই।

যদি বা তেমন অনিয়ম ঘটে থাকেও—পরদিন প্রভাতে পূর্বজন্মের এ সম্পর্ক সম্বন্ধে কোন অনুভূতি বা স্মৃতিচিহ্ন প্রকাশ পেল না, ভাষান্তর তো নয়ই।

কৃষ্ণপ্রাণ—যেন মুক্তি পাবার মতো আনন্দেই জন্মভূমি ত্যাগ করে যাত্রা আরম্ভ করলেন। ছটি সঙ্গীর সঙ্গে দ্রুত চলতে লাগলেন সাগর সঙ্গমের দিকে।

পথ চেনেন না, সঙ্গীরাও কেউ চেনে না—সুতরাং এই ভাবে গঙ্গার তীর ধরে চলে সমুদ্রে পড়াই নিরাপদ।

তবে তার পর কি হবে, কোথা দিয়ে কি ভাবে যাবেন তা কেউ জানতেন না।

লোকমুখে অনেক বিপদের কথা শোনা যায়। অনেক নির্যাতন যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর কথাও।

বঙ্গের সুলতানদের সঙ্গে উড়িষ্যার নৃপতিদের দীর্ঘদিনের বিরোধ। সুলতানরা চান উড়িষ্যাকে নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করতে—কিন্তু উড়িষ্যা-রাজের বিক্রমে ও শৌর্যে তা সম্ভব হয় না। তাই দুই দেশের সীমান্তরক্ষীরা তীর্থযাত্রীদের কি সাধারণ পথিকদের উপর নির্যাতন ক'রেই সে গাত্রদাহ নিবারণের চেষ্টা করে! অবশ্য সেই সঙ্গে কিঞ্চিৎ সুবিধাও লাভ হয়।

এ সব কথাই এই অভিনব তীর্থযাত্রা-পথিকদের শোনা ছিল। পরন্তু, পথে যত অগ্রসর হতে থাকেন বহু লোক স্বতঃপ্রবৃত্ত ভাবে, অগ্রসর হয়ে এসে অধিক সংখ্যক এই ভয়াবহ কাহিনী শোনান ওঁদের—হয়ত বা কিছু পল্লবিত অতিরঞ্জিত ক'রেই। হয়ত কিছু সম্পূর্ণ অলীকই, বক্তার স্বকপোল-কল্পিত।

সঙ্গীদের যে মধ্যে মধ্যে কণ্ঠ তালু শুষ্ক হয়ে না উঠছিল এমন নয়, রাত্রে, পথ-শ্রম সত্ত্বেও নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটছিল—কিন্তু কৃষ্ণপ্রাণ নির্বিকার, তিনি মনের

আনন্দে হরিনাম কীর্তন করতে করতে পথ চলছেন। যেদিন যেখানে যা ভিক্ষা জোটে তাই আহার করেন, দেবালয়ে সাধুদের আশ্রমে অথবা গঙ্গাতীরে বৃক্ষতলে নিশিযাপন করেন। তাঁর ব্যাকুলতা দুশ্চিন্তা শুধু সেই দারুভূতো মুরারিকে দর্শনের জন্য—মনে হয় পাখা মেলে উড়ে যেতে পারলে ভাল হ'ত।

মধ্যে মধ্যে যখন বোঝেন সঙ্গীরা বিচলিত হয়ে পড়ছে, তখন বলেন, 'সন্ন্যাসীকে যেমন ভবিষ্যতের জন্য কিছু সঞ্চয় করতে নেই, তেমনি তীর্থযাত্রা-পথে বেরিয়ে ঈশ্বরদর্শনাভিলাষীদেরও পথের বিপদের কথা চিন্তা করতে নেই। যাঁকে পরমব্রহ্মজ্ঞানে দর্শন করতে চলেছ, তাঁর উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে পারছ না? তিনি যদি কষ্ট দিতে চান তো দেবেন—সেই তো পরীক্ষা। তবে যদি কারও প্রাণের বা নির্যাতনের আশঙ্কা দর্শনাকাঙ্ক্ষার থেকে প্রবল বোধ হয়—সে স্বচ্ছন্দে ফিরে যেতে পারে—আমি একাই বেশ যাবো, সে বরং আরও শ্রেয়, আহার ও বিশ্রামের জন্য অকারণ সময় নষ্ট হবে না।'

এরপর কে আর যাত্রাপথের বিবিধ বিপদের কথা মুখে উচ্চারণ করবে?

কিন্তু সমুদ্র সঙ্গমে 'ছত্রভোগে'* পেঁৗছে উপলব্ধি হ'ল—"যোগক্ষেমং বহাম্যহম্" এ আশ্বাস কথার কথা নয়।

ভক্তের নিরাপত্তার ব্যবস্থা ভগবানই ক'রে রেখেছেন।

স্থানীয় জমিদার পূর্বেই লোকমুখে এই এক অসাধারণ নবীন সন্ন্যাসীর তীব্র বৈরাগ্য ও ঈশ্বরদর্শনের আকুলতার কথা শুনেছিলেন। তিনি ওঁদের পেঁৗছবার জন্য অপেক্ষা না ক'রে নিজেই সেবক ও অনুরাগীবৃন্দ নিয়ে অগ্রসর হয়ে এসে অভ্যর্থনা জানালেন। ভিক্ষা ও বিশ্রামের আয়োজন পূর্বাহ্ণেই করা ছিল—সেজন্য নূতন পর্ণকুটির নির্মাণ করিয়েছিলেন; স্থানীয় তীর্থস্নান ও দর্শনাদির ব্যবস্থারও কোন ত্রুটি ঘটল না।

সে পর্ব সমাধা হ'লে বিশাল এক নৌকাযোগে রক্ষী ইত্যাদি দিয়ে জলপথেই উড়িষ্যার দিকে রওনা ক'রে দিলেন। তাঁরা ওঁকে উড়িষ্যার বেশ কিছুটা অভ্যন্তর দেশ—বিরজা ক্ষেত্র পর্যন্ত পেঁৗছে দিয়ে বিদায় নিল।

এর পর আর দুশ্চিন্তার কি থাকবে!

পথে অসংখ্য বিখ্যাত তীর্থ পড়ে, বহু দেবস্থান। সে সব তীর্থে স্নান ও দেবদর্শন করতে করতে যাত্রীর দল দ্রুতপদে নিজেদের পরম লক্ষ্যপথে অগ্রসর হতে লাগলেন।

অবশেষে একসময় সে লক্ষ্যও নিকটে এল বৈকি।

নীলাচলে পেঁৗছলেন কৃষ্ণপ্রাণ।

---

* বর্তমান দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগর-মজিলপুরের নিকটবর্তী, পূর্বে এখানেই সমুদ্র ছিল। মহাপ্রভু এখানের অম্বুলিঙ্গ শিব পূজা করেছিলেন।

অনেক আশা অনেক আশঙ্কা।

আশার অপেক্ষা কি আশঙ্কা বেশী?

তা হয়ত নয়—তবু আশা করতেও যেন সাহস হয় না।

কমলপুর গ্রাম থেকেই শ্রীমন্দিরের ধ্বজা দৃষ্টিগোচর হ'ল।

সন্ন্যাসী যেন উন্মত্ত হয়ে উঠলেন এবারে।

সকলকে পিছনে ফেলে সেখান থেকে প্রায় দৌড়তে আরম্ভ করলেন। কোন দিকে লক্ষ্য নেই, কারও প্রতি ভ্রূক্ষেপ নেই। নগ্ন পদ কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে, পাথরে আঘাত লাগছে—সে অনুভূতিও নেই। পথের লোকেরা যে অবাক হয়ে চেয়ে আছে তা বুঝতেও পারছেন না।

তবে প্রারম্ভেই একটা শুভ সূচনা দেখা গেল।

মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করার পর ধাঁধা লাগার কথা।

অত বড় মন্দির, তার কোথায় গর্ভ-দেউল, কোন্‌টা নাটমন্দির—কোন দিক দিয়ে সে মূলমন্দিরে প্রবেশ করার পথ, কিছুই জানেন না কৃষ্ণপ্রাণ। সিংহ-দ্বারের সোজাসুজি মন্দির প্রবেশের পথ নয়, সেখানে ভোগমণ্ডপ।

এ সব কিছুই জানা নেই—কিন্তু কাউকে প্রশ্নও করলেন না। পা যেন আপনিই সেই পথ ধরল, যেন মনে হ'ল ওঁর আকুল আকাঙ্ক্ষার ধন, সেই পরম প্রিয় নিজেই পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন—অদৃশ্য থেকেও, অন্তরের আকর্ষণে।

তেমনি উন্মত্তের মতো ছুটতে ছুটতে এসে গর্ভগৃহে প্রবেশ করলেন বটে—কিন্তু প্রথমেই একটা প্রচণ্ড আঘাত লাগল তাঁর।

এ কী বীভৎস মূর্তি!

ওঁর ধ্যানের, ওঁর স্বপ্নের সে প্রেমময় মূর্তি কোথায়?

কোথায় সেই নবীননীরদশ্যামকান্তি, গুঞ্জামালাধারী পীতবাস-পরিহিত সুন্দর মূর্তি!

এ তো তারামূর্তি! পাশে শুভ্র-কান্তি দেবাদিদেব। শক্তি ও শিব।

হ্যাঁ, সবই এক।

তা শুনেছেন বহুবার। বহু পণ্ডিত ও সাধকের কাছে।

সেই পরম ব্রহ্মেরই ইচ্ছা অনুসারে তাঁর বিবিধ বিচিত্র রূপে প্রকাশ, পুরুষ ও প্রকৃতি অভিন্ন—এক অবর্ণনীয়, অকল্পনীয় ধারণাতীত মহাশক্তি তিনি—পুরুষ ও প্রকৃতি দুই-ই তাঁর অস্তিত্বের স্বরূপ—এ তো অতি পুরাতন কথা। শুনেছেন, নিজেও বলেছেন কত লোকের কাছে।

তবু নিজের আশাকল্পনার ধনকে, সেই কল্পনায় আঁকা রূপেই যে দেখতে চায় মানুষ।

হে ঈশ্বর, এ কী রূপে দেখা দিলে তুমি!…

প্রথম দেখার পরই চোখ বুজেছিলেন কৃষ্ণপ্রাণ।

পথের এত ক্লেশ—এতটা দীর্ঘ পথ বিনা বিশ্রামে ছুটে এসেও—কিছুমাত্র অনুভব করেন নি, কিন্তু ক্লান্তি দেহের জন্য এই যৌবনকালে তত বোধ হয়

না, যতটা বোধ হয় মনের কারণে। হতাশা ক্লান্তির পুরোগামী। অবসন্ন পদযুগল যেন ভেঙে আসছে এবার, মাথাও আর স্থির থাকছে না, মদ্যপের মতো অবস্থা যেন তাঁর।

এই মন্দিরেই সংজ্ঞা হারাবেন নাকি?…

আবারও বুঝি ভগবানই ভক্তকে রক্ষা করলেন।

মন্দিরের এক রক্ষী তাঁকে একটা ঠেলা দিয়ে বলে উঠল, 'এ লোকটা কে রে, পাগল নাকি! এখানে মণিকোঠায় দর্শন করতে এসে চোখ বুজে আছে।…না মাতাল, পাও টলছে যে!…যা যা, দূর হ!'

তাতেই যেন সম্বিৎ ফিরল। চোখও খুলতে হ'ল।

আর, মুখ তো ঊর্ধ্বোত্থিত—বিশাল দারুমূর্তির দিকেই নিবদ্ধ ছিল—চোখ মেলতেই এক যেন অলৌকিক ঘটনা চোখে পড়ল।

এ কি দেখলেন?

সত্যিই দেখছেন তো? না কি উত্তপ্ত মস্তিষ্ক আশাভঙ্গের আঘাতে সবটাই কল্পনা করছে!

কোথায় সে ভয়াবহ মূর্তি!

মরি মরি, এই তো সেই পীতবাস, গুঞ্জামালা পরিহিত শ্যামলসুন্দর মূর্তি। এই তো তাঁর ধ্যানের ইষ্ট।

আর সে মূর্তি যেন তাঁর দিকেই করুণাপ্রসন্ন নেত্রে চেয়ে আছে, মুখে ঈষৎ কৌতুকের হাসি। হস্তে অভয়মুদ্রা।

ব্যর্থতার আঘাতে যা হয় নি—সার্থকতার আকস্মিক তীব্র আনন্দে তাই হ'ল।

গর্ভদেউলের বহুভক্তপদধূলিধন্য সেই পাষাণকুট্টিমে মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন।

॥ ১৬ ॥

রাজার সভাপণ্ডিত সর্বেশ্বর আচার্য প্রত্যহই দর্শন করতে আসেন, তবে কিছু বিলম্ব হয়। নিজ গৃহের পূজাপাঠহোম ইত্যাদি না সেরে মন্দিরে আসা বিধেয় নয়। কারণ মন্দিরে সমাগত পুণ্যার্থীদের ভিতর অনেকে তাঁর পরিচয় অবগত আছেন, তাঁরা ওকে দেখামাত্র প্রণামে আর প্রশ্নে ঘিরে ধরেন। অনেকের সব প্রশ্নের প্রয়োজনও থাকে, কেউ বা শুধুই আলাপের জন্য অকারণ অপ্রয়োজন বক্তব্য উপস্থাপিত করেন।

অবশ্য কোন কোন ছাত্রশ্রেণীর লোকের কিছু সংশয় থাকে, তারাও অন্যত্র ওঁর নাগাল পায় না, এই মন্দির আগমনের সময়টুকুরই অপেক্ষা করে। কেউ বা দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা নিয়ে অপেক্ষা করে—শাস্ত্রীয় বিধানের জন্য। অতবড় দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত—তাঁকে তো এসব বিড়ম্বনা ভোগ করতেই হবে!

এই সব কারণেই বহু সময় অতিবাহিত হয়। ততক্ষণে রাজসভায় উপস্থিত

হওয়ার সময় এসে পড়ে। সেখানে যে প্রাত্যহিক কোন কর্ম বা দায়িত্ব থাকে তা নয়—তেমন কোন প্রয়োজন বোধ করলে মহারাজ রাষ্ট্রীয় শিবিকা প্রেরণ করেন, অষ্ট বাহকের—যাতে দ্রুত আসা যায়। তৎসত্ত্বেও বহুক্ষণ অধীর প্রতীক্ষায় থাকতে হয় তাঁকে, সেটাও অনভিপ্রেত। কখনও কখনও কোন কর্মে ব্যস্ত থাকলে শিবিকা পৌঁছানো মাত্র ওঠা যায় না, উপস্থিত কর্মের জট শিথিল ক'রে আসতে কিছু বিলম্ব ঘটে যায়—সেক্ষেত্রে রাজার ললাটে ভ্রূকুটি ঘনীভূত হ'তে দেখেছেন সর্বেশ্বর কয়েকবারই। রাজা ব্যস্ত শাসক এবং শুধু তো শাসন-কর্মই নয়—চারিদিকে প্রবল শত্রু, নিজশক্তিকে সদাসক্ষম রাখার উদ্বেগ বা কার্যও বড় অল্প নয়—তাঁকে সর্বদা এক পা অশ্বের পাদানিতে রেখেই থাকতে হয় বলতে গেলে—সুতরাং সামান্য কাল প্রতীক্ষা করতে হ'লেও বিরক্তি উপজিত হওয়া স্বাভাবিক।

আর—এমনই দৈবের বিরূপতা—যেদিন আচার্য অনুপস্থিত থাকেন বা সভাগমনে বিলম্ব ঘটে—সেইদিনই যেন রাজ্যের প্রয়োজন এসে ভিড় করে রাজসভায়। ধনী ব্যক্তি, ভূম্যধিকারী কি নৃপতিগণ সহজেই অসহিষ্ণু; অসহিষ্ণুতা ক্রোধের জনক। সুতরাং অপ্রীতিকর বা আশঙ্কাজনক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সতর্ক থাকাই শ্রেয়। বিশেষ ওঁর মতো পণ্ডিতের পক্ষে বিন্দুমাত্র তাচ্ছিল্য এমন কি অনাদরও মৃত্যুতুল্য।

এই সব বিবেচনাতেই তিনি প্রত্যূষে মঙ্গলারতির সময় মন্দিরে আসার চেষ্টা করেন না। গৃহপূজাদি সেরে কিঞ্চিৎ জলযোগ ক'রে—একেবারে রাজসভার জন্য প্রস্তুত হয়েই মন্দির যাত্রা করেন। যাতে তৃতীয় প্রহরের পূর্বে ফিরে আসার প্রয়োজন না হয়। শ্রীক্ষেত্রে ভগবান অপেক্ষাও বুঝি তাঁর প্রসাদ বড়—সুতরাং উদর শান্ত ক'রে মন্দিরে আসাতে কোন দোষ ঘটে না।...

সেদিনও, তিনি যখন মন্দিরে এলেন বেলা প্রথম প্রহর উত্তীর্ণপ্রায়। অন্য দিন এসময় গর্ভদেউলের ভিড় কমে যায়, শান্তিতে দর্শন করতে পারেন।

আজ দেখলেন সেখানে প্রচণ্ড ভিড় এবং প্রচণ্ডতর কোলাহল।

'ব্যাপার কি?' এক পূজারীকে প্রশ্ন করলেন, 'কি হয়েছে এখানে?'

দশ-বারোটি কণ্ঠে উত্তর সরবরাহ হওয়ায় কোন উত্তরই সম্যক শ্রুতিগোচর হ'ল না। অগত্যা সর্বেশ্বর ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেলেন। পূজারী-পাণ্ডারা সকলেই তাঁকে যথেষ্ট সম্মান করেন—তাঁরাই ভিড় কমিয়ে, নিজেরা যথাসম্ভব সরে গিয়ে ওঁকে পথ করে দিলেন।

প্রথমটা সর্বেশ্বর চিনতে পারেন নি।

তিনিও নবদ্বীপেরই লোক, সেখানেই তাঁর শিক্ষা, শিক্ষকতারও আরম্ভ। সে পারঙ্গমতার খ্যাতি দেশের সীমা অতিক্রম ক'রে ওদিকে কামরূপ এদিকে উড়িষ্যা পর্যন্ত পৌঁছেছিল বলেই রাজা বহুমানে তাঁকে এখানে আনিয়েছেন। সুতরাং বিশ্বেশ্বর তাঁর আদৌ অপরিচিত নন। এমন কি বিশ্বেশ্বর যে সন্ন্যাস নেওয়ার পথেই অগ্রসর হচ্ছেন, গৃহে থাকলেও গৃহ সম্বন্ধে নিরাসক্ত উদাসীন—এ সংবাদও তাঁর কর্ণে এসে পৌঁছেছিল।

তথাচ এই গৈরিকধারী মুণ্ডিত মস্তক, কৃশকায়—পথশ্রমে রৌদ্রতাপে মলিন ও ক্লান্ত আনন—এর মধ্যে সে কন্দর্পকান্তি বলিষ্ঠ বিশাইকে আবিষ্কার করা সম্ভব হ'ত না—যদি না সেই মুহূর্তেই কৃষ্ণপ্রাণ চক্ষু উন্মীলিত করতেন।

কৃষ্ণপ্রাণের দৃষ্টিতে তখনও বিহ্বলতা, তথাপি সর্বেশ্বরের এই আরত ভাবগভীর নেত্র স্মরণ করতে অসুবিধা হ'ল না। এবং পলকপাত কাল মধ্যে কার্যকারণও অনুমান করে নিলেন।

'আরে—সরো সরো। আমি এঁকে বিলক্ষণ জানি। ইনি মহাপণ্ডিত ও মহাতপস্বী। তোমরা ক'জন এঁকে ধরাধরি ক'রে বাইরে মুক্ত স্থানে নিয়ে এসো। বরং একটা শিবিকার ব্যবস্থা করো—আমি এঁকে স্বগৃহে নিয়ে যাবো। চালি প্রস্তুতে বিলম্ব হয় বস্ত্রাদি দিয়ে একটা ঝোলার মতো করো—এঁকে বহন ক'রে আমার গৃহে নিয়ে চলো।'

তখনকার মতো হাতে হাতেই বহন ক'রে জগমোহনে আনা হ'ল। ততক্ষণে কৃষ্ণপ্রাণও চারিদিকের পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছেন। কি ঘটেছিল তারও একটা অস্পষ্ট আভাস তাঁর স্মৃতিপটে আসছে। তিনি ব্যস্ত হয়ে নিজেই ওঠার চেষ্টা করলেন কিন্তু পারলেন না। তীব্র আশা ও আকাঙ্ক্ষায়, কেবল মাত্র মনের জোরেই এই পথটা এসেছেন—সে বহু আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছবার পর আর বিন্দুমাত্র শক্তি অবশিষ্ট নেই।

সর্বেশ্বরও তাঁকে প্রচণ্ড তিরস্কার ক'রে উঠলেন—এ বাতুলতা প্রদর্শনের মতো তাঁর দেহের অবস্থা নয়, সে বিষয়ে সচেতন ক'রে দিয়ে।

কৃষ্ণপ্রাণেরও আর বাধা দেওয়ার কি প্রতিবাদ করার শক্তি নেই। তিনি সে চেষ্টাও করলেন না। সুগভীর শ্রান্তিতে চক্ষু নিমীলিত করলেন আবার।

নিজ গৃহে এনে সর্বেশ্বর সন্ন্যাসীর মুখে মাথায় জল দিয়ে, পা দুটি প্রক্ষালিত ক'রে দিয়ে কিছুটা সুস্থ করলেন। অতঃপর নারায়ণের স্নানজল ও জগন্নাথের চরণতুলসী মুখে দিলেন, সেই সঙ্গে প্রভুর অঙ্গচন্দনও। তারপর কিঞ্চিৎ পক্কান্ন প্রসাদও খাওয়ালেন এক প্রকার বলপূর্বকই। স্নান ও মন্দিরের অন্য দর্শনাদি না ক'রে কিছু আহার করা বিধেয় হবে কিনা—সসঙ্কোচে এই প্রশ্ন তুলতে সর্বেশ্বর বুঝিয়ে দিলেন, এই একমাত্র ক্ষেত্র যেখানে ক্ষেত্র-দেবতার থেকেও দেবতার প্রসাদ অধিক সম্মানার্হ। কথিত আছে ব্রহ্মা স্বয়ং সারমেয়র মুখত্যক্ত মহাপ্রসাদ পাছে পদদলিত হয় এই আশঙ্কায় তুলে নিয়ে স্বীয় মস্তকে ধারণ করেছিলেন।

কৃষ্ণপ্রাণও আর দ্বিধা রাখেন নি। আবেগ-কণ্টকিত দেহে সে প্রসাদ গ্রহণ করেছিলেন।

ইতিমধ্যে ওঁর সঙ্গীরাও মন্দিরে পৌঁছে গেছেন।

সেখানেও প্রাণপ্রিয় সন্ন্যাসীকে দেখতে না পেয়ে তাঁদের বোধ করি জগন্নাথ-দর্শনও হ'ল না, তাঁরা ব্যাকুল হয়ে নানা লোককে প্রশ্ন করতে লাগলেন। শেষে এক তরুণ সন্ন্যাসীর মূর্ছিত হয়ে পড়ার সংবাদটা পেতে এবং সে সন্ন্যাসীকে

রাজার সভাপণ্ডিত সযত্নে তাঁকে নিজগৃহে নিয়ে গেছেন জেনে কিছুটা নিশ্চিন্ত হলেন।

পরে সর্বেশ্বরের গৃহে পেঁছে, তাঁর আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বহু পরিচিত মুখের সাক্ষাৎ পেয়ে আরও আশ্বস্ত এবং আনন্দিত বোধ করলেন। প্রবাসে স্বদেশবাসীকে দেখলেই প্রীতির সঞ্চার হয়। স্বদেশে যারা বিরূপ থাকে প্রবাসে তারাও সাগ্রহে স্বেচ্ছায় সৌহার্দ্যের হস্ত প্রসারিত করে।

একটু বিশ্রাম ক'রে পথের শ্রান্তি ও উদ্বেগের অবসন্নতা অপনোদিত হ'লে এঁরা স্নান দর্শনের জন্য ব্যস্ত হলেন। কিন্তু সে ব্যবস্থাও সর্বেশ্বর এর মধ্যেই ক'রে রেখেছেন। তিনি নিজের শ্যালককে সঙ্গে দিলেন, যাতে সমুদ্রে স্নান বা মন্দিরের প্রধান দর্শনগুলির কোন অসুবিধা না ঘটে।

দ্বিপ্রহরে নিজগৃহেই সকলের প্রসাদ-লাভের ব্যবস্থা করা ছিল, উৎকৃষ্ট প্রসাদে ভূরিভোজন করালেন দীর্ঘ-পথশ্রান্ত, উপবাসী ও আশঙ্কা-গ্রস্ত তীর্থ-যাত্রীদের।

সন্ধ্যায় কৃষ্ণপ্রাণের নির্জনবাসী করার ইচ্ছা জেনে সর্বেশ্বর এক আত্মীয়ের বিস্তীর্ণ উদ্যানের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ বাসের জন্য ঠিক ক'রে নিজে গিয়ে সসম্মানে সেখানে রেখে এলেন। একজন সেবক শুধু সেখানে রইল, বাকী সঙ্গীদের অন্যত্র বাসা দিলেন। তবে তাঁরাও যাতে কাছাকাছি থাকতে পারেন সে দিকে লক্ষ্য রেখেই বাসস্থান ঠিক করা হ'ল।

সন্ন্যাসীর ভিক্ষা ক'রে খাওয়াই বিধি। কখনও কখনও আমন্ত্রণ জানিয়েও সে ভিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু সর্বেশ্বরের মুখে এই আশ্চর্য সন্ন্যাসীর পরিচয় পেয়ে, ওঁর ভক্তিতন্ময়গত ভাব ও বিনম্র ব্যবহারে মুগ্ধ নীলাচলের প্রধান নাগরিকরা ও পূজারীরা ওঁদের ভিক্ষা দেবার জন্য যেন ব্যাকুল ও ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। বলা যায় ভিক্ষা যেন এসে সকরুণ মিনতির সঙ্গে সম্মতি ভিক্ষা করতে লাগল।

অর্থাৎ বাস ও আহার কিছুরই অভাব রইল না।

কৃষ্ণপ্রাণ এতদিনে উপযুক্ত আশ্রয় ও সাধনার নিশ্চিন্ত অবসরের আনন্দ পেলেন। নিভৃতে দীর্ঘকাল ধরে নামজপ, সমুদ্রস্নান এবং সাধ পূর্ণ করে দারুব্রহ্ম দর্শন—এ যেন এক অভিনব স্বাদের জীবন, অভূতপূর্ব আনন্দ উপভোগ।

সর্বেশ্বরের পরামর্শক্রমে প্রায় প্রত্যহই তিনি জগমোহনের সর্ব শেষ প্রান্ত থেকে দর্শন করেন। সর্বেশ্বর বলেছেন গর্ভগৃহে দর্শন করলে যাত্রীদের ধাক্কাধাক্কি পাণ্ডাদের প্রাপ্য আদায়ের কচকচি নিরন্তর ঐকান্তিকতায় ব্যাঘাত ঘটাবে। তদ্ব্যতীত পূজারীরা গর্ভগৃহে বেশীক্ষণ একই ব্যক্তিকে দাঁড়াতে দেবেও না।

আরও একটি কারণ, দূর থেকেই বিগ্রহকে ভাল দেখাবে। দারু-নির্মিত বিগ্রহ, কারিগররাও তেমন দক্ষ নন—অভ্যাস থাকে না বলেই দক্ষতা আয়ত্ত করার অবসর মেলে না। কারণ দ্বাদশ বৎসর এমন কি কখনও কখনও আরও

দীর্ঘকাল অন্তর এই নব কলেবর নির্মিত হয় (আষাঢ় মাসে মলমাস না এলে নব-কলেবর নির্মাণের সময় পাওয়া যায় না), সুতরাং অপটু হস্তের রূঢ়তা বা অমার্জনা থাকেই কিছুটা—দূরে গেলে এত তথ্য দৃষ্টিগোচর হয় না, বিগ্রহের সামগ্রিক চিত্রটাই শুধু চোখে পড়ে। এই মূর্তির মধ্যে স্বীয় ইষ্টকে দর্শনের জন্যও কিছুটা মায়ালোক সৃষ্টির প্রয়োজন। দূরত্বই সে মায়ালোক সৃষ্টির সহায় হয়। গবাক্ষহীন অন্ধকার গর্ভগৃহের মধ্যে দুটি কম্পমান ঘৃতপ্রদীপের আলোকে মনে হয় দেবতা জীবন্ত হয়ে উঠেছেন।

সর্বেশ্বরের এই উপদেশমতো দূর থেকে প্রায় নিষ্পলক নেত্রে বিগ্রহের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে সে উপদেশ সত্য হয়ে উঠতে দেখতেন কৃষ্ণপ্রাণ। আপাত-দৃষ্টিতে যা শিবশক্তির মূর্তি মনে হয়—তাও কোন ধ্যানসম্মত মূর্তি নয়—কিছুক্ষণ নির্নিমেষে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তা নয়নমনোহর তাঁর প্রিয়তম কৃষ্ণমূর্তিরূপে প্রতীয়মান হয়।

সে সময় দেখে যেন আশ মেটে না—স্বপ্নাবিষ্ট, প্রস্তরমূর্তিবৎ নিথর হয়ে দেখেন। এই মন্দির, চারিদিকের ভক্ত বা দর্শকমণ্ডলী, এ পরিবেশ কোন কিছু সম্বন্ধেই যেন তাঁর চেতনা থাকে না। এক এক সময় তাঁর ভাব-সমাধি ঘটে, চক্ষু স্থিরনিবদ্ধ, নিস্পন্দ হয়ে যায়। তাঁর সঙ্গীরা কানের কাছে হরিনাম ক'রে সম্বিৎ ফিরিয়ে আনেন।

কিন্তু ততঃ কিম্ ?

সর্বেশ্বর ওঁর সাধনভজনের নির্বিঘ্ন ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন। জনহীন বিস্তৃত উদ্যানের মধ্যে ছোট একখানি ঘর। রাত্রির তৃতীয় প্রহরের শেষভাগ থেকে প্রভাতের প্রথম প্রহর পর্যন্ত কেউ তাঁকে যাতে বিরক্ত না করে—সেদিকেও দৃষ্টির অভাব ছিল না। স্নান দর্শনে বহির্গত না হ'লে ওঁর অন্তরঙ্গরাও নিকটে আসেন না। প্রসাদভিক্ষা গৃহে পৌঁছে যায়।

এই তো তাঁর কাম্য ছিল, ধ্যান ও ধারণার, মনন ও চিন্তনের নিরবিচ্ছিন্ন নির্বিঘ্ন অবসর।

তবে সেও তো প্রাথমিক।

মূল কামনা যা—ওঁর সাধনার যা লক্ষ্য—তার কাছেও তা পৌঁছতে পারেন না। সেদিকে যাওয়ার কী পথ তাই বা কে বলে দেবে ? যাকে প্রশ্ন করতে যাবেন, মনের গোপন কল্পনার ঈপ্সার পদ্মদলটি যার কাছেই অনাবরিত করবেন—সে-ই বাতুল বলবে না কি ?...

দর্শনে গিয়ে দণ্ডের পর দণ্ড কাটে, প্রহরাধিক কাল উত্তীর্ণ হয়ে যায় ; নির্নিমেষ নেত্রে চেয়ে থাকেন মূর্তির দিকে। দারুভূতো ব্রহ্মের দিকে।

কখনও বা সেই আধো অন্ধকারে কম্পমান প্রদীপের আলোতে মদনমোহন মূর্তি প্রতিভাত হয় তাঁর চোখের সম্মুখে ; তাঁর ধ্যানমূর্তি, ইষ্টমূর্তি—প্রাণের ঠাকুর দেখা দেন। তবে সে কদাচিৎ এবং চকিতের জন্য।

পলকপাত মাত্রে সেই দারুমূর্তিই আবার স্পষ্ট ও সুপ্রকট হয়ে ওঠে।

আবার এক এক সময় মনে হয় সেই দারুমূর্তিই নরদেহের মতো সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে, যেন কি বলতে চাইছেন দেবতা—কী যেন বোঝাতে চাইছেন ওঁকে, কী যেন নির্দেশ দিতে চান—

বুঝতে পারেন না কৃষ্ণপ্রাণ। আকুল হয়ে ওঠেন।

প্রস্তরস্তম্ভে মাথা কুটে রোদন করেন।

সে স্বপ্ন বা কল্পনাও বুঝি মিলিয়ে যায়।

মনে হয় দারুমূর্তি তাঁর দিকে বিদ্রূপের দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন।

'ওগো আমি যে তোমাকে কাছে পেতে চাই, তোমাকে ভালবাসতে চাই; তোমাকে বক্ষে পেতে চাই, তোমার সেবা করতে চাই! তুমি কি আসবে না?'

এই অস্থিরতা ক্রমশ যেন তাঁর দিনরাত্রির জপধ্যানকেও বিঘ্নিত ক'রে তোলে, সে অস্থিরতা তাঁর মনোসংযোগের মূলে নাড়া দেয়।

তবে বহিরঙ্গ সাধনায় কোন ব্যাঘাত ঘটে না।

তিনি ঘটতে দেন না।

এখানেও দিনে দিনে অনুরাগীর দল গড়ে ওঠে, বৃদ্ধি পায় ভক্তসংখ্যা। নিজের নির্জনবাস, জপধ্যানের স্বাধীনতা রক্ষা করতেই যেন কৃষ্ণপ্রাণ এঁদের জন্য একটি পৃথক সময় বেছে নেন। অপরাহ্নে মন্দিরে গিয়ে আর একবার দর্শন ক'রে এসে শ্রীমন্দিরের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে সংকীর্তন আরম্ভ করেন। অনুরাগী ভক্তরা তো বটেই—কিছু বা বহিরাগতও সে দলে যোগ দেন। দেখতে দেখতে সে দলের আয়তন বিশাল হয়ে ওঠে।

কীর্তন করতে করতে ভাবাবেগে নৃত্য শুরু হয়—নৃত্য করতে করতেই পরিক্রমা করেন এই আশ্চর্য সন্ন্যাসী, যাঁর দেহ নবনী নয় যেন ভক্তিচন্দন-পঙ্কে গঠিত, যাঁর ভঙ্গীতে পবিত্রতার দ্যুতি, দৃষ্টিতে যাঁর সুগভীর প্রেম, কণ্ঠস্বর অমৃতবর্ষী। এ বার্তা দেখতে দেখতে দূর থেকে দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়ে, শুদ্ধমাত্র তাঁকে দর্শন করতেই বহু লোক বহু কষ্ট করে ছুটে আসে।

ফলে কীর্তনের দল এমনই বিশাল হয়ে ওঠে যে এক একদিন পরিক্রমা কালে তার শেষ প্রান্ত অগ্রবর্তী দলের সম্মুখীন হয়ে পড়ে। পথের দুই পাশে, যাঁরা এ দলে যোগ দিতে পারেন না—বিশেষ স্ত্রীলোকেরা—গভীর ভিড় ক'রে থাকেন, কেউ বা ছোট ছোট মন্দিরগুলির বলভীতে পর্যন্ত উঠে পড়েন সম্মুখে স্থান না পেয়ে—মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন এই অপার্থিব দৃশ্যের দিকে, দুই শ্রবণেন্দ্রিয় একাগ্র ক'রে নামগান সুধা গ্রহণ করেন।

ক্রমে এই অসাধারণ সন্ন্যাসীর অসংখ্য কাহিনী রাজার কর্ণেও প্রবেশ করে। বহু পূর্বেই করেছিল—কিন্তু এখন তাঁর চাঞ্চল্যের কারণ নীলাচলের এই ভক্তিতরঙ্গর উচ্ছলতা। যেন মনে হয় নগরের সকল অধিবাসী, সুদূর গ্রামাঞ্চলের সহস্র সহস্র ব্যক্তি এখানে একত্রিত হয়ে ঈশ্বরের প্রেমসাগরে অবগাহন

ক'রে শুদ্ধ হচ্ছেন, সেই অপূর্ব রসে মত্ত হয়ে উঠেছেন। সে সরোবর টলমল করছে, ছলছল শব্দে আহ্বান জানাচ্ছে সন্তাপিত দুঃখী লোকদের।

রাজা আর স্থির থাকতে পারেন না, সভাপণ্ডিতকে বলেন, 'আচার্যদেব, এমন আশ্চর্য দৃশ্য ও দর্শন থেকে আমাকে বঞ্চিত রেখেছেন কেন? শুনলাম আপনারও শুষ্ক শাস্ত্রচর্চা—বেদান্ত ও অদ্বৈততত্ত্ব এই লোকটির প্রবল ভক্তিস্রোতে ভেসে গেছে। তবে আমিই বা সে স্রোতে ভাসি না কেন, সে অমৃত থেকে দূরে রেখেছেন কেন?'

সর্বেশ্বর চিন্তিত মুখে বললেন, 'রাজাধিরাজ, এ সন্ন্যাসী সানন্দে দীনতম লোককে আলিঙ্গন করেন কিন্তু ধনী বা বিষয়ী লোক শুনলেই বিষবৎ পরিহার করতে চান। অত মধুর স্বভাব লোকটির—মুহূর্তে কঠোর হয়ে ওঠে। বলেন, ওরা সাধুর কাছে আসে ঐহিক শক্তির প্রার্থী হয়ে। বিষয়ের বাইরে কিছু জানে না। অনেক কপটাচারী সাধু ওদের তোষামোদও করে, সবাইকে তাই ভাবে।'

রাজা বললেন, 'আমি যদি দীনতম দীন রূপে যাই—তাঁর চরণরেণুভিক্ষু হয়ে?'

'না রাজন, সে প্রস্তাব আমি নিজে থেকেই করেছি। এও বলেছি যে তিনি রাজচক্রবর্তী হয়েও ব্যক্তিগত জীবনে সামান্য নাগরিকের মতোই আচরণ করেন। কিন্তু তাঁর ঐ একই বক্তব্য, "বিষয়ী লোককে দেখলেই আমার সর্বঅঙ্গে যেন বিষদাহ অনুভব করি"।'

রাজা যৎপরোনাস্তি দুঃখিত ও ক্ষুণ্ণ হন—কিন্তু কোন উপায়ও চিন্তা করতে পারেন না। সুদক্ষ শাসক তিনি, দুর্ধর্ষ যোদ্ধা; আফগান শক্তিকে সম্পূর্ণ পরাভূত ও বিতাড়িত করে উড়িষ্যার শক্তি বা শাসনসীমা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করেছেন—কিন্তু সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর নিকট তাঁর শৌর্যবীর্য প্রকাশের অবসর কই? ভিক্ষুকের কাছে তিনি ভিখারীর বেশেই যেতে চান—তার বেশী আর কী করতে পারেন তিনি?

শেষ পর্যন্ত সর্বেশ্বরই এক উপায় চিন্তা করেন। রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র, যুবরাজ পঞ্চদশবর্ষীয় কিশোর। অতি সুদর্শন, অতি সুকুমার। লাবণ্য ও পৌরুষের অপরূপ সমন্বয় তাঁর দেহে। শিক্ষিত, ভদ্র, বিনত।

সর্বেশ্বর একদিন অপরাহ্নে—সংকীর্তন দল সমবেত হওয়ার সময় হিসেব ক'রে যুবরাজকে পীতধড়া, মোহনচূড়া (শিখিপুচ্ছসহ) গুঞ্জামালায় সুসজ্জিত ক'রে প্রস্তুত রাখলেন।

কৃষ্ণপ্রাণ সংকীর্তন দলের অগ্রভাগে উদ্দণ্ড নৃত্য করতে করতে যাচ্ছেন—অকস্মাৎই দৃষ্টি পড়ল তাঁর ঠিক সম্মুখেই ঐ মোহনমূর্তি; তাঁর ধ্যানের কল্পনায় ইষ্ট তাঁর সম্মুখে, মুখে সুমধুর হাস্য, হস্তে অভয় মুদ্রা—

'তুমি কি এলে! এত দিনে দয়া হ'ল তোমার! প্রভু আমার, প্রিয় আমার, সর্বস্ব আমার—সত্যিই কি তোমাকে পেলাম!'

যেন এক বুকফাটা আবেগের সঙ্গে শব্দ কটা উচ্চারণ করতে করতে পাগলের

মতো সে দিকে ধাবিত হলেন সন্ন্যাসী—প্রিয়তমকে গভীর আলিঙ্গনে বন্ধ করার আশায় দুই বাহু প্রসারিত ক'রে।

ঠিক সেই মুহূর্তে, সর্বেশ্বরের কিছুপূর্বের শিক্ষা অপেক্ষা আজন্ম শিক্ষা ও জন্মগত সংস্কারেরই জয় হ'ল। অথবা এই অপরূপ ভাবমূর্তি দেখে শ্রদ্ধা আপনিই তার কাজ ক'রে গেল। রাজকুমার কুণ্ঠিত ও ব্যস্ত হয়ে সন্ন্যাসীর পদপ্রান্তে প্রণাম জানাতে গেলেন।…

একটা রূঢ়—বা যেন রূঢ়তম আঘাতে স্বপ্নভঙ্গ হ'ল কৃষ্ণপ্রাণের।

কুমারের এই প্রণামোদ্যত ভঙ্গীতে, শ্রদ্ধা ভক্তি এবং তজ্জনিত কৃষ্ণপ্রাণের ইষ্টভ্রমের জন্য কুণ্ঠাতে—কতকটা নিজেকে অপরাধী বোধ করলে যে কুণ্ঠা দেখা দেয় সৎ ও সংস্কৃত-মানুষের—কৃষ্ণপ্রাণ বুঝলেন এ তাঁর সে ইষ্ট নয়—মানুষই।

বহুদিনের একাগ্রতম তীব্রতম কামনার কারণেই, গত কয়েকলহমায় যে এতটা আশা দেখা দিয়েছিল মনে, এমন অসম্ভব অথচ উত্তুঙ্গ আশা—তা বোধ হয় তিনিও বুঝতে পারেন নি।

সেই বিপুল আশা আর তার আকস্মিক বিনষ্টির সংঘাতে সমস্ত শরীর মন শিথিল, অবসন্ন হয়ে এল, কিছুকালের জন্য কোন চেতনা বা অনুভূতিই রইল না। মূর্ছা নয়—বিহ্বল ভাবেই তিনি যেন পড়ে গেলেন, বসে পড়ার মতোই—ইষ্টমূর্তিধর যুবরাজের প্রায় পদপ্রান্তে।

॥ ১৭ ॥

এর পর অস্থিরতা আরও বাড়ে।

কেমন একটা অভিমানও বোধ করেন যেন।

এ অভিমান কার উপর ?

এই চারিপাশের অগণিত ভক্তজন, সঙ্গীসেবকদের উপর—না স্বয়ং জগন্নাথের উপর ?

নিজেকে যেন একপ্রকার প্রতারিত বোধ করেন। মনে হয় তাঁর ইষ্টদেবতাই তাঁকে নিয়ে এই খেলা খেললেন। তাঁর আশা ও কামনাকে পরিহাস করতে, হাস্যাস্পদ ক'রে তুলতে।

সর্বেশ্বরের উপরও কিছুটা বিরক্ত হয়ে ওঠেন। বুদ্ধিমান কৃষ্ণপ্রাণের বুঝতে বাকী থাকে না, এ আয়োজন কেন ও কার প্ররোচনায়।

অথচ এও বোঝেন, ঈশ্বরই তাঁকে এই আঘাত দিয়েছেন—বামনের চাঁদ ধরার মতোই, এত সামান্য সাধনায় তাঁকে জীবন্তরূপে পাবার ইচ্ছা যে কতখানি ধৃষ্টতা ও মূঢ়তা—তাই বোঝাবার জন্যই এ ব্যবস্থা তাঁর।

পদানত যুবরাজকে সস্নেহে তুলে শেষ পর্যন্ত আলিঙ্গন দান করেছিলেন সেদিন ঠিকই—তবে রাজাকে দর্শন দিতে সম্মত হন নি। এমন কি অন্তরঙ্গ সহচরদের মিনতিতেও না।…

আরও যেন এই সব কারণেই বেশী অস্থির হয়ে ওঠেন।

মনে হয় এখানেও অনুরাগী ও ভক্তদের বন্ধনে বাঁধা পড়ছেন। সেই পূর্ব জীবনেরই পুনরাবৃত্তি ঘটতে চলেছে। ভক্তি ও সাধনার সমারোহের মূল উদ্দেশ্য যেন সুদূর এক কুহেলিকায় আচ্ছন্ন অস্পষ্ট হয়ে উঠছে।

তবে তিনি জন্মভূমি ছেড়ে, জ্ঞানী সমমর্মী বান্ধবদের সাহচর্য ছেড়ে, গর্ভধারিণী জীবনদাত্রীকে কাঁদিয়ে—এত দূর এলেন কেন?

পথের দিশা যে শুধু দেখতে পাচ্ছেন না তাই নয়?—তার অন্বেষণ করার কি উপায় সে কথা চিন্তা করারও অবসর পাচ্ছেন না।

মধ্যে মধ্যে মন্দিরস্থ বিশাল মূর্তির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ইষ্টর দর্শন পান বটে—তবে বড় চকিতের সে দেখা, বড় দূরের দর্শন।

তাতে আশ মেটে না, তৃষ্ণা বর্ধিত হয়।

শেষে সহসাই একদিন মন স্থির ক'রে ফেলেন।

তিনি তীর্থে যাবেন। তীর্থে তীর্থে ঘুরবেন। ভারতভূমি পরিক্রমা করবেন। খুঁজে বেড়াবেন কোথায় তাঁর সে প্রাণের পুরুষ, প্রাণের মানুষ—কোন্ তীর্থে কোন্ মন্দিরে বা কোন্ মানুষের মধ্যে ওঁরই অপেক্ষায় বসে আছেন।

আর দেখবেন তাঁর দেশবাসীদেরও।

যতটা দেখেছেন—একই অবস্থা। ধর্মের নাম করে নানা অবিচার, অত্যাচার এবং অনাচার চলছে। ব্যভিচারও। এই সব পীড়িত লোকদের কোন্ সেবায় তিনি আসতে পারবেন, কেমন ক'রে ভগবানকে ডাকার সহজ উপায় তাপিত উৎপীড়িত ভগবানেরই সৃষ্ট মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারবেন—এ চিন্তাও আজকাল যেন তাঁর ভাবনার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে।

তবে তার আগে আরও দেখতে হবে, তাদের কাছে পৌঁছতে হবে।

স্থির করলেন এখান থেকে সোজা দক্ষিণাভিমুখে যাবেন সমুদ্রতীর ধরে। বহুপরিচিত, বহুশ্রুত সকল তীর্থে তো যাবেনই, দেবতাদের দর্শন করবেন; পথে আর যে সব স্বল্পখ্যাত তীর্থ বা মন্দিরের কথা শুনবেন সেখানেও যাবেন। যাবেন সিংহাচলম্, যাবেন গোদাবরীতীর্থে, মল্লিকার্জুন, বেঙ্কটাচলম্ (তিরুপতি ও তিরুমল্লেশ্বর দর্শন); যাবেন কাঞ্চী; শ্রীরঙ্গম্ যেখানে প্রভু রামানুজাচার্যের অর্চিত অনন্তশয়নে বিরাট বিষ্ণুমূর্তি, মথুরায় মীনাক্ষী দর্শন করবেন, সেখান থেকে রামেশ্বরম্, কন্যাকুমারী; তারপরও যাবেন দক্ষিণ পশ্চিমের নানা তীর্থ; পরে বিঠ্ঠলদেব প্রভৃতি দর্শন সেরে দ্বারকায় যাবেন। তারপর? পথেই স্থির করবেন। তাঁর প্রাণের ইষ্ট যে পথ দেখাবেন সেই পথেই যাবেন।

তিনি এ সঙ্কল্প ব্যক্ত করা মাত্র সঙ্গী ও সহচররা ওঁর সহযাত্রী হওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কিন্তু কৃষ্ণপ্রাণ এবার তাঁর মন দৃঢ় করেছেন, বহু

লোকের সঙ্গে বিরাট দল নিয়ে তো নয়ই—এমন কি অন্তরঙ্গ কজনকেও তিনি সাথী হিসাবে নেবেন না। ওতে সাধনার বহিরঙ্গ ক্রিয়াগুলো যদি বা বজায় থাকে—অন্তরের সঙ্গে বোঝাপড়া চলে না। তিনি চান ঈশ্বরের চিন্তায় ডুবে থাকতে, তিনি চান মনের মধ্যে খুঁজে পেতে। তিনি চান ঈশ্বর তাঁর কাছে এসে তাঁর সেবা নিন। এ নিভৃত সাধনা, আকুলতা তীব্র না হলে সে সাধনায় সিদ্ধি মিলবে না। বহু লোকের সঙ্গে বহু কোলাহলে বা আড়ম্বরের মধ্যে সে নিভৃতি সম্ভব নয়।

অবশ্য শেষ পর্যন্ত একজন সেবককে নিতেই হ'ল। হরিগুণগাননিরত এক ব্রাহ্মণ সন্তান, ব্রহ্মচারী—এখানেও তাঁর সেবায় নিযুক্ত ছিল—সে-ই সঙ্গে যাবে। প্রায়শঃই যার কোন বাহ্যজ্ঞান থাকে না, তাকে রক্ষণাবেক্ষণ, তার প্রাণরক্ষার জন্য একটি অনুরাগী ও অনুরক্ত লোক সঙ্গে থাকা প্রয়োজন—তা স্বয়ং কৃষ্ণ-প্রাণও স্বীকার করতে বাধ্য হলেন। তবে সে সেবক বিষ্ণুদাসকে বলে দিলেন, বহির্বাস কৌপীন ও জলপাত্র ছাড়া আর কোন বস্তু সঙ্গে না নেয়।

ভক্তরা এই দীর্ঘ যাত্রায় তাঁর যে সব বস্তু প্রয়োজন হতে পারে তার দীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত করছেন লক্ষ্য করেই বোধ হয় তাঁর এই নিষেধাজ্ঞা।

ভ্রমণে বহির্গত হয়ে তিনি যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন।

যাত্রাপথ বড় সুখদ, বড় সুন্দর।

শারীরিক অর্থে সুখদ নয়—যার শরীর সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই—তার কাছে আর প্রচলিত অর্থে সুখের মূল্য কি?

নব নব তীর্থ, নব নব দেব দর্শনের আনন্দ তো আছেই; মানুষের ভক্তি ও ঈশ্বরের চিন্তা, ঈশ্বরসেবার এই নব নব প্রকাশ—অনন্ত নীল আকাশের নীচে শয়ন, নদীজলে স্নান, পর্বতের নীলাভা, বৃক্ষে বৃক্ষে পুষ্প সমারোহ, সুমিষ্ট ফলবান বৃক্ষসমূহ—প্রকৃতি যেন এখানে স্রষ্টার সকল বিভূতি প্রকাশ করিতে ব্যস্ত। এই তো তাঁর স্বরূপ, এখানেই তো ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ।

আর মানুষ। নর-নারায়ণ, নররূপী নারায়ণ—এও যেন এবার পূর্ণরূপে উপলব্ধি করলেন।

সাধারণ বিত্তহীন মানুষের যে অহেতুক ভালবাসা লাভ করলেন পথে যেতে যেতে, তার বুঝি তুলনা নেই। শ্রদ্ধাভক্তির কারণ আছে, তাঁর মুণ্ডিত মস্তক, গৈরিক বসন, কমণ্ডলু—এ যে দেখবে সে-ই মাটিতে লুটিয়ে প্রণাম করবে, কোন পরিচয় ব্যতিরেকেই—এই তো এ দেশের শিক্ষা। কিন্তু অকারণ প্রীতিও যে মানুষ এমন অকৃপণ ভাবে বিলোতে পারে তা কখনও ভাবতে পারেন নি।

তৃপ্তিলাভ করেন বৈকি।

তবে সে তৃপ্তি কি পূর্ণ?

ওঁর মনে যে শূন্যতা, ওঁর মনে যে হাহাকার—তা তো পূর্ণ হয় না। মন তো বলে না, আর নয়, আমি যা চেয়েছিলুম এখানে এসে তাই পেয়েছি। খুঁজে বেড়ানোর এই শেষ।

তবে একেবারে কিছু পান নি, তা নয়।

তাঁর পথের পরিষ্কার দিশা দেখতে পেলেন।

সিংহাচলম্ পেরিয়ে গিয়ে এক রাজর্ষির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

এ এক ঐতিহাসিক যোগাযোগ যেন। এ মিলন এক বিরাট পরিবর্তন এনে দিল ওঁর জীবনে, ওঁর মনে। তিনি সাধনার পথে বহুদূর অগ্রসর হ'তে পারলেন।

এই মহাজ্ঞানী মহাভক্ত ভগবৎরসিক ব্যক্তির খ্যাতি পূর্বেই শুনেছিলেন। ইনি পৌরাণিক আখ্যায়িকায় জনক রাজার মতোই, নিপুণ ভাবে রাজকার্য পরিচালনা করলেও রাজগীর ভোগবিলাস শক্তির মোহ তাঁকে বন্ধন করতে পারে নি। যেমন হংস জলে থাকলেও জল তার কোন চিহ্ন রাখতে পারে না ওদের দেহে—তদ্রূপ।

ইনি রাজপ্রতিনিধি, উড়িষ্যারাজ্যের প্রতিভূ হয়ে রাজ্যের দক্ষিণাংশ শাসন করেন। তদুপযুক্ত জীবনযাত্রা তাঁর তেমনি সাড়ম্বর, তেমনি মহিমাময়। এগুলি রাজত্বেরই রঙ্গ। আড়ম্বর সমারোহ। শক্তির প্রকাশ না থাকলে প্রজাদের শাসনে রাখা যায় না। উত্তর ভারতে প্রবাদই আছে—'জিমিনদারী গরম কা'! অর্থাৎ ইতর বাংলায় যাকে 'দাপট' বলে তা কিছু প্রয়োজন। প্রজারা ভালও বাসে এগুলো। যার দ্বারা শাসিত হচ্ছি সে আমাদের থেকে স্বতন্ত্র, অনেক উচ্চে—এই অনুভূতিটাই শাসক সম্বন্ধে শ্রদ্ধাবান করে।

অনেকে বলবেন এটা অদৃষ্টের পরিহাস।

বিষয়ী লোকের সঙ্গ বিষ বলে যিনি নৃপতিকে দর্শন মাত্র দিলেন না, পরম ভক্ত এবং সাধারণ জীবনযাপনকারী জানা সত্ত্বেও—তিনিই শেষ পর্যন্ত বিষয়ী লোককে আলিঙ্গন দিয়ে এক অনির্বচনীয় মাধুর্যে অবগাহনের আস্বাদ পেলেন। সে মধুররসে দেহমন আপ্লুত হয়ে গেল। এমনি ভাবেই বুঝি পরম প্রেমে বিগলিত হয় মানুষ।

দুই বন্ধুর মিলন হ'ল পুণ্যতোয়া গোদাবরী তীরে। বন্ধু বলছি এই জন্যে যে—প্রথম মিলন থেকেই নিবিড় সখ্য, যেন আত্মার আত্মীয়তা গড়ে উঠল দুই বিভিন্ন জীবনের সাধকের মধ্যে। এবং সে বন্ধুত্ব চিরজীবনই অটুট ছিল।

বেশ কিছুদিন এঁর আশ্রয়ে রইলেন কৃষ্ণপ্রাণ।

রাজপ্রতিনিধি—সারাদিন রাজকার্যে ব্যাপৃত থাকতেন, তৎসত্ত্বেও সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত্রি পর্যন্ত সন্ন্যাসীর কাছে অতিবাহিত করতেন—কৃষ্ণপ্রেম-রসতত্ত্বকথা সাধনার নিগূঢ় তত্ত্ব আলোচনা করতেন।

এই প্রবীণ গুপ্ত সাধকের কাছে নবীন সন্ন্যাসী শিখলেন, জানলেন অনেক, আবার নিজের তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও রসানুভূতির জারক রসে জারিয়ে উপলব্ধি করলেন আরও অনেক বেশী।

রাজর্ষি বুঝিয়ে দিলেন—সাধনার প্রথম স্তর হ'ল স্বধর্মাচরণ; শাস্ত্রবিধি অনুসারে নিজ কর্তব্যপালন। এই হ'ল সাধনার আসল ভিত্তি। এর পরে সমুদয় কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করলে চিত্ত শান্ত শুদ্ধ হয়, এতদ্ব্যতীত অন্য

পথ যে আছে—শাস্ত্রবিধি অনুসারেই নিয়ত ঈশ্বর ভজনে নিরত থাকা—তাকে বলে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি। পরে এই সকল আচার ও বিধির ঊর্ধ্বে উঠলে শুদ্ধাভক্তি লাভ করে সাধক। এর দ্বারা ভগবান তাঁর একান্ত আপনজন, তিনি নিরন্তর সঙ্গে আছেন, এই রূপ অনুভূতি হয়। একে শান্তপ্রেমাভক্তি বলেন পণ্ডিতরা। এই পথেই ক্রমে ক্রমে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর—এই পঞ্চ শ্রেষ্ঠ রসের অনুভূতি আসে মনে।

এই সব শেষ অর্থাৎ মধুর রসের সর্বোচ্চ বিকাশ, সর্বশেষ অবস্থা আসে—ঈশ্বরকে কান্তাভাবে ভজনা করলে। অর্থাৎ শ্রীরাধা-শ্রীকৃষ্ণ লীলারস আস্বাদনে রাধার প্রেমের অবস্থা, আত্মশূন্য প্রবল প্রেম অনুভব করতে পারলেই ঈশ্বরকে একান্ত আপন করে পাওয়া যায়।

এই গোপন এবং অন্তরঙ্গ আলোচনার পরও কোথায় যেন একটা অতৃপ্তি বোধ হয়।

কৃষ্ণপ্রাণ প্রশ্ন করেন, 'কান্তাভাবে ভজনার সর্বশেষ অবস্থা কি রাধাভাবে শ্রীকৃষ্ণ সাধনায় ?'

'না। রাধাভাবও সর্বশেষ কথা নয়।' রাজসাধক আরও গূঢ় গূঢ়তম তথ্য প্রকাশ করেন, 'সখীভাবে ভজনাই সর্বসাধ্যসার।'

'কেন ?' তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করেন কৃষ্ণপ্রাণ, 'শ্রীরাধার প্রেম অপেক্ষাও তাদের প্রেম মহান কিসে ?'

উত্তরদাতা হাসেন। চতুর ব্যক্তির চাতুর্য ধরা পড়ে গেলে যেমন অপ্রতিভের হাসি হাসে মানুষ।

তিনি বলেন, 'রাধাভাব বলতে যা বুঝি, বিভিন্ন পুঁথি ও কিম্বদন্তীতে বা সঙ্গীতে রাধাভাবের যে রূপটি আমাদের হৃদয়ে প্রতিভাত হয়—তাতে তাকে স্বার্থ-ও বাসনাযুক্ত এমন কি সকাম বললেও অন্যথা হয় না। কিন্তু সখীদের ভাব তা নয়। তাঁদের নিজেদের সুখ দুঃখ বলতে কিছু রাখেননি তাঁরা, আশা-আকাঙ্ক্ষা· কাম-কামনা—কিছুই নয়। শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার প্রেমলীলা আস্বাদন করেই তৃপ্ত, সুখী—সেই তৃপ্তিলাভে সহায়তা ক'রে, সে লীলার আস্বাদনেই তাঁদের তৃপ্তি, ওঁদের সুখে তাঁদের সুখ—ওঁদের পূর্ণতাতেই তাঁদের পূর্ণতা। সেইজন্যই সখীভাব শ্রেষ্ঠ।'

আরও বললেন, 'তাঁদের মধ্যে কাম-কামনার গন্ধ নেই। নিজেদের স্বার্থ, বোধ হয় নিজেদের অস্তিত্বই তাঁরা বিস্মৃত হয়ে ছিলেন, রাধাকৃষ্ণের সেবায় মন প্রাণ জীবন সমস্ত বিলিয়ে মিলিয়ে দিয়ে।...এই ভাবে কামগন্ধ দূর হলেই পরমানন্দ প্রাপ্ত হয় মানুষ। নর বা নারীর পরস্পরের প্রতি চরম প্রেমে যখন কে কি সেই বোধ লোপ পায়, কে পুরুষ কে রমণী সে জ্ঞান থাকে না—অর্থাৎ সম্পূর্ণ ভাবে কামসচেতনতা বিলুপ্ত হয়—তখনই তাঁরা প্রেম-সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেন, ব্রহ্মস্বরূপে উপনীত হন।*

---

*"ন সো রমণ ন হাম রমণী
দুহুঁ মন মনোভাব পেশল জানি।"

॥ ১৮ ॥

কান্তাভাবে ঈশ্বর ভজনার আরও স্পষ্ট চিত্র দেখতে পেলেন কৃষ্ণপ্রাণ দক্ষিণী এক কবির গীতিগুচ্ছ থেকে।

এই কবি-রচিত বহু গান এদেশে গীত হয়ে থাকে, ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের সমাবেশে তো বটেই, মন্দিরে মন্দিরে দেবদাসীরাও গেয়ে থাকেন।

সে গানের ছত্রে ছত্রে গভীর প্রেমের প্রকাশ, আকুলতা, ঐকান্তিকতা। ঈশ্বরকে প্রিয়, প্রিয়তম জ্ঞানে তাঁকে প্রেম নিবেদন—যেমন স্ত্রীলোক তার ভর্তা বা দয়িতকে ক'রে থাকে, প্রেমিকা তার প্রেমিককে।

কৃষ্ণপ্রাণ সংস্কৃতে সুপণ্ডিত, সংস্কৃতের অপভ্রংশ প্রাকৃত ভাষাতে অনর্গল কথা বলতে পারেন; এসব দেশের ভাষা প্রধানত সংস্কৃতজ, তখনও পর্যন্ত কিছু কিছু প্রাকৃতেরও চল ছিল ভদ্রসমাজে—অনন্যসাধারণ মেধাবী পণ্ডিতের পক্ষে এসব ভাষার মর্মার্থ বা বক্তব্য গ্রহণ করা কিছুমাত্র কঠিন নয়।

তিনি এই গীতিমালার রস ও গভীর আন্তরিকতা উপলব্ধি ক'রে মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

এইভাবেই তাঁকে ডাকতে হবে—এই আকুলতা, এই একাগ্রতা দিয়ে; হৃদয়ের যন্ত্রণা এমনি ভাবে উজাড় ক'রে দিতে হবে।

সাধারণ, বহু আচরিত সাধনায় তাঁকে পাওয়ার আশা করাই তো বাতুলতা!...তবু স্থির থাকতে পারেন কই? সংশয় যায় কই?

অথবা পাণ্ডিত্যের, বহু শাস্ত্রচর্চার ফলে অদ্বৈতবাদ যুক্তির মেঘ এসে কুজ্‌ঝটিকার সৃষ্টি করে। সংশয়ের ধূম্রজালে বিশ্বাসকে আবরিত করে।

তিনি উন্মাদের মতো ছুটে যান ঐ দেবদাসীদের কাছে। প্রকৃতি সম্ভাষণ যাঁর কাছে সাধনা থেকে স্খলিত হওয়ার মতোই মহাপাপ, তিনি সে মুহূর্তে ভুলে যান যে দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত হ'লেও এরা মূলত প্রকৃতিই—বলেন, 'তোমরা কি পেয়েছ তোমাদের ইষ্টদেবতাকে, তোমাদের প্রিয়তম, তোমাদের ভগবানকে? বুকের মধ্যে পেয়েছ? তাঁকে প্রত্যক্ষ দেখেছ? তাঁকে সেবা করতে পেরে সার্থক হয়েছ?'

ওরা বেশির ভাগই অবাক হয়ে যায়, ওঁর বক্তব্য বুঝতে পারে না। কেউবা পাগল ভাবে, কেউ ভাবে কপট সন্ন্যাসী, গৈরিক বস্ত্রের ছদ্ম আবরণে দেবতার নামে উৎসর্গীকৃতা কুমারী কন্যাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা করতে চায়।

উনি গিয়ে মন্দিরের পূজারীদেরও এই প্রশ্ন করেন।

মন্দিরের সন্নিকটে কিংবা তীর্থতীরে সাধনারত তপস্বীদেরও।

'ওগো, তোমরা তাঁকে পেয়েছ? অনুভব করেছ? আদর করতে, সেবা করতে পেরেছ? তিনি দেখা দিয়েছেন তোমাদের?'

তাঁরাও কেউ মৌন থাকেন, কেউবা পরিহার করেন উন্মাদ ভেবে—কেউবা স্তোকবাক্যে ভুলিয়ে তখনকার মতো অব্যাহতি পাবার চেষ্টা করেন।

মন ভেঙে পড়ারই কথা, তবু ভাঙতে দেন না কৃষ্ণপ্রাণ।

তিনি তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছবেনই।

এতদূর যিনি টেনে এনেছেন, এ ভাবে যিনি গৃহসুখ, আত্মীয়, বান্ধব, পরিজন, নববধূ—সর্বাপেক্ষা প্রিয় খ্যাতি-যশ-প্রতিষ্ঠা থেকে সরিয়ে এনে পথের ভিখারী করেছেন—তিনি শেষ মুহূর্তে বঞ্চনা করবেন না কখনই। তাঁর উদ্দেশ্য কিছু আছে বলেই এ খেলা খেললেন কৃষ্ণপ্রাণের জীবন নিয়ে, সে উদ্দেশ্য সাধন তিনি করিয়ে নেবেনই।

তাই তীর্থভ্রমণ দেবদর্শন তাঁর অব্যাহত, অবারিত থাকে।

দাক্ষিণাত্যের সকল প্রসিদ্ধ তীর্থে বা দেবস্থানেই যান একে একে।

ত্রিপতি, পান্ধারপুরের বিঠ্ঠলদেব, রঙ্গজী, কন্যাকুমারী।

কোন মূর্তি বিরাট, কোন মূর্তি সুন্দর। তবে সবই যেন কিছুটা রহস্যে ঘেরা। আধা অন্ধকারে এক এক সময় মনে হয় এ সব মূর্তি জীবিত।

ওঁদের কি ওষ্ঠ কম্পিত হচ্ছে?

কিছু বলতে চাইছেন ওঁরা?

আরও পরীক্ষা করতে চান তাঁকে?

না কি পরিহাসে ওষ্ঠ বিকৃত হচ্ছে?

তীর্থেরও শেষ নেই। কাঞ্চীধামে যান, সেতুবন্ধ রামেশ্বরে। নাসিকে, উজ্জয়িনীতে। সাধুদের মঠ আশ্রম ঘোরেন। যান শংকরাচার্যের জন্মস্থান, শৃঙ্গেরী মাঠে। পাণ্ডিত্য সাধনার পীঠস্থান। উভয়েরই আশ্চর্য সম্মেলন। বিখ্যাত সাধকসমাজের উপদেশ বক্তব্য শ্রবণ করেন, কিছু কিছু তর্কও হয় এক আধ সময়ে। রামানুজী সম্প্রদায়, মধ্বাচার্য সম্প্রদায় এঁদের সঙ্গেও আলাপ করেন।

কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করতে পারেন না। আশ মেটে না।

মনে হয় কেবল শব্দঝঙ্কার, বাক্‌চাতুর্য।

নিজ নিজ সম্প্রদায়কে নিজমতকেই প্রাধান্য দেবাব জন্য আপ্রাণ চেষ্টা। এত বাগ্‌জাল বিস্তার।

এ আকুলতার সঙ্গে সাধারণ গৃহী বা বিষয়ী মানুষের ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধি, সামান্য প্রতিষ্ঠালাভের জন্য আকুলতায় কোন প্রভেদ নেই।

সকলেই মধুমক্ষিকা-ধর্মী, মধু সঞ্চয় করে, মধুর কলসের কানায় বসে কে কতটা অধিকার বিস্তার করতে পারবে—কার কতটা প্রাপ্য তাই নিয়ে কলহ—মধু পান করার কি মধুতে ডুবে যাওয়া, বিলীন হওয়ার চেষ্টা মাত্র নেই।

ভারতখণ্ড পরিক্রমার পথে দ্বারকায় আসেন।

এখানেও মঠ আশ্রমের অভাব নেই।

মোহান্তরাও নাকি বড় সাধু, তপস্বী। সাধনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত।

ঘুরে দেখেন, আলাপ আলোচনা করেন।

মনে হয় এসব পাণ্ডিত্যের সঙ্গে অহঙ্কার যুক্ত হয়েছে। তপস্যার অহঙ্কার, জ্ঞানের অহঙ্কার। নিজেদের প্রচার। ঈশ্বর কোথায়?

এঁরা জানেন না যে—এঁরা সন্ন্যাস নিয়েছেন ঠিকই, হয়ত সে সন্ন্যাস নষ্ট হয় নি, ব্রহ্মচর্য আছে অস্খলিত, কৃচ্ছ্রসাধনের অন্ত নেই—কিন্তু তার মধ্যেই কখন ঈশ্বর থেকে আরও দূরে সরে গেছেন।

তবে শুধুই এই শ্রেণীর—নিজ নিজ সম্প্রদায়ের প্রচারকার্যে উৎসুক, স্বমতের শ্রেষ্ঠত্বে অহঙ্কারী—সাধু দেখলেন বললেও সত্যের অপলাপ হয়।

যথার্থ সাধু—প্রতিষ্ঠায় প্রচারে উদাসীন বীতস্পৃহ তপস্বীও দেখলেন বৈকি। তাঁরা সাধারণত জনারণ্যে আসেন না, খুঁজে বার করতে হয়। অনেককে প্রশ্ন ক'রে জেনে, ঘুরে ঘুরে—নির্জন গুহায় কি নদীতীরে কি বিজন অরণ্যে একা তপস্যা করেন, সেবক-শিষ্য কিছু করেন নি, এমন সাধুও অনেক দেখলেন। অবশ্য তাঁরাও জ্ঞানমার্গী, যোগী, কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা, সর্ববিধ ভোগত্যাগের দ্বারা ব্রহ্মে লীন হতে চান, নির্বিকল্প সমাধি চান।

এ ওঁর পথ নয়।

উনি যে ভালবাসা চান, ভালবাসতে চান।

চান সেবা করতে। প্রেম রস আস্বাদন করতে, সেই মাধুর্যে ডুবে থাকতে। শুষ্ক সন্ন্যাস ওঁর জন্য নয়।

অবশেষে এক সময় তাঁর ইষ্টের বাল্যলীলাভূমি, শিক্ষাস্থানও—শ্রীবৃন্দাবনে পোঁছন।

দূর হ'তে নীলাচলে মন্দিরচূড়া দেখে যে অবস্থা হয়েছিল, বৃন্দাবনের নিকটস্থ হয়েও সেই আকুলতা বা উন্মত্ততা জাগ্রত হ'ল।

শেষ দুই ক্রোশ পথ প্রায় ছুটেই গেলেন, কণ্টকগুল্মে বস্ত্র ছিন্ন, পা ক্ষত-বিক্ষত—তবু ভ্রূক্ষেপ নেই। বেচারী সেবক ব্রাহ্মণ তাঁর সঙ্গে ছুটতে পারল না।

পোঁছে স্বপ্ন ভঙ্গ হ'ল অবশ্যই।

কোথায় ওঁর সেই পুরাণে পঠিত বৃন্দাবন, ওঁর ধ্যানের ওঁর স্বপ্নের বৃন্দাবন!

এ তো অরণ্য। কিছু ভিক্ষুকের বাস, কিছু হিংস্র জন্তুর।

পথে ঠগ, ডাকাতের দল নাকি থাকে ওৎ পেতে।

দিল্লীর অধীশ্বর এর যথার্থ নামই দিয়েছেন—ফকিরাবাদ।

থাকার মধ্যে আছে যমুনা নদী, মুক্তালতা, দু'একটি তমাল বৃক্ষ। যমুনা-পুলিন বলে একটি স্থানও নির্দিষ্ট আছে অবশ্য—যদিও তা সেই প্রাচীন সাহিত্যের বর্ণনার সঙ্গে মেলে না।

এমন কিছু কিছু আরও চিহ্নিত স্থান আছে।

ভগবানের কিছু কিছু প্রস্তরমূর্তিও আছে।

কিম্বদন্তী শ্রীকৃষ্ণ-পৌত্র অনিরুদ্ধের পত্নী উষাদেবীর বর্ণনামতো এক

প্রখ্যাত শিল্পী সে মূর্তি গঠন করার চেষ্টা করেছিলেন।*

বোধ করি মানব-কল্পনা ও দক্ষতার অতীত সে অনন্যসুন্দর মূর্তি প্রস্তরে উৎকীর্ণ করা সম্ভব নয় বলেই শিল্পী তা পারেন নি।

একটি মূর্তি সম্পূর্ণ হ'তে শিল্পীর উৎসুক ব্যগ্র চোখের দিকে চেয়ে বিষণ্ণ ঊষা বলেছিলেন, 'মূর্তির চরণযুগল সর্বদেবপূজিত শ্রীচরণের মতোই হয়েছে বটে, তবে আর কোন অংশের মধ্যে কোন সাদৃশ্য নেই।'

পুনশ্চ আর এক মূর্তি গঠিত হ'ল।

ঊষা বললেন, 'ভৃগুপদলাঞ্ছিত সেই অবর্ণনীয় বক্ষস্থলের সঙ্গে এ মূর্তির বক্ষস্থলের কিছুটা সৌসাদৃশ্য আছে।'

প্রায় হতাশ শিল্পী আর এক মূর্তি নির্মাণ করলেন।

এবার ঊষা মুখে অবগুণ্ঠন টেনে দিয়ে বললেন, 'গুরুজনের মুখ দেখে নিজের মুখ আবৃত করেছি, তবে সেও আংশিক সাদৃশ্য মাত্র। শিল্পীরাজ মনে করবেন না যে এ মূর্তি সবটাই তাঁর মতো হয়েছে।'

তারপর, অবসন্ন ক্লান্ত শিল্পীর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'না না, আপনি হতাশ হবেন না কিম্বা লজ্জা বোধ করবেন না। মানবের যা সাধ্য তা আপনি করেছেন, তার বেশি করবেন কেমন ক'রে! মনে হয় বিধাতারও অভিপ্রায় নয় যে সে অকল্পনীয় অভূতসৃষ্ট সুন্দর দেহের প্রতিকৃতি একটি মাত্র প্রস্তরখণ্ডে বিধৃত থাকে! ভাবীকালের দর্শনেচ্ছু ভক্তরা তিনটি মূর্তি দর্শন ক'রেই তাঁকে কিছুটা ধারণা করতে পারবেন।'

সেই তিন মূর্তি—শ্রীমদনমোহন, শ্রীগোপীনাথ ও শ্রীগোবিন্দ রূপে বৃন্দাবনেই নাকি বিরাজ করছেন।...

অতি কষ্টে সন্ধান ক'রে সে মূর্তিত্রয় দর্শন করলেন কৃষ্ণপ্রাণ। তবে এ দর্শনে আনন্দ অপেক্ষা বেদনাই অধিক বোধ করলেন তিনি।

এই অমূল্য মূর্তিগুলি কী অযত্ন কী অবহেলার মধ্যেই না আছে!

আজও তো তেমন কৃষ্ণগতপ্রাণ ভক্তের অভাব নেই, তবে এ তীর্থ, এই মূর্তিগুলি পূর্ণ গৌরবে প্রতিষ্ঠিত বা সংরক্ষণ ও পূজার যথাযথ ব্যবস্থা হয় না কেন?

তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন—কোন এক বা একাধিক যোগ্য ব্যক্তিকে

---

* শোনা যায় আদি খ্রীষ্টানদের মহাত্মা পল যীশুকে দেখেন নি (কতকটা সে কৌতূহলেও হয়ত) তবু, অনাগত কালের ভক্তদের আকুলতা অনুমান করেই সম্ভবত, তিনি যীশুর এক প্রতিমূর্তি বা প্রতিকৃতি রচনায় ব্যস্ত হয়েছিলেন। সেজন্য তিনি দারু নির্মিত শেষ পানপাত্রটির (লাস্ট সাপার) একটি রজত আধার নির্মাণের পরিকল্পনা করেন। তাতে আধারটিও রক্ষা পাবে, যীশু ও তাঁর সাক্ষাৎ শিষ্যদের মূর্তিও থাকবে, এই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। সে কারণে তিনি একমাত্র, তখনও জীবিত শিষ্য মহাত্মা জনকে ও কারিগর শিল্পীকে এক নির্জন স্থানে নিয়ে গিয়ে (রোমানদের ভয়ে) ঐ আধারটি নির্মাণ করান।—লেখক।

এই মূর্তিত্রয় তথা শ্রীবৃন্দাবনকে পূর্ব তথা পূর্ণ গৌরবে প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্বভার অর্পণ করবেন।

তাঁর যেরূপ দুই চক্ষু বিদীর্ণ, দৃষ্টি আচ্ছন্ন ক'রে বাষ্পধারা নির্গত হ'ল—নিজেদের অকর্মণ্যতার, ঔদাসীন্যের জন্য, কর্তব্যে অবহেলার জন্য লজ্জায়—অনাগত কালের ভক্ত যাত্রীদের ভাগ্যে এমন না ঘটে।

তীর্থ পরিভ্রমণের প্রায় সমাপ্তিপর্বে এক চরম লাভ হ'ল তাঁর।

ঈশ্বরের পরম করুণাও বলা যেতে পারে।

অনুসন্ধান ক'রে ক'রে গোকুলে পৌঁছে—অন্তত গোকুল বলেই চিহ্নিত করলেন যে স্থানকে ব্রজবাসীরা—এক আশ্চর্য সাধকের সন্ধান পেলেন।

যমুনার তীরে এক পর্ণাচ্ছাদিত ঝোপড়ায় বাস করেন এই সাধু বা বৈরাগ্যব্রতী। কোন শয্যা নেই, জীবনধারণের জন্য কোন উপকরণও নেই, নেই ভবিষ্যতের কোন সঞ্চয়। পরিধানে একমাত্র সাধারণ বস্ত্র একখানি। তাও গৈরিক নয়। মালাতিলক ধারণ করেন না, কৌপীন বহির্বাস জটা কিছুই নেই। সন্ন্যাসীর কোন চিহ্নই না।

প্রত্যূষকাল থেকে বার বার যমুনায় অবগাহন করেন ও সেই সিক্ত দেহে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে ধূলি মাখেন। বলেন, 'ওরে, এই ধূলিতে তিনি পা দিয়েছিলেন, এই ধূলি গোপীজনের পাদস্পর্শ পেয়েছে—এর তুল্য ঈপ্সিত বস্তু আর কি আছে এ সংসারে?'

এ লোকটি আর কোন জপতপ জানেন না। কেউ কোন খাদ্যবস্তু দিয়ে গেলে কিছু গ্রহণ করেন, কিছুবা নদীজলে নিক্ষেপ করেন। হেসে হেসে ডাকেন, 'আয় রে তোরা—কালীয় নাগের বাচ্ছারা—খেয়ে যা!'

কৃষ্ণপ্রাণের কেমন মনে হ'ল—এ-ই আদর্শ সাধক, সত্যকার তপস্বী।

তিনি করজোড়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন এই পাগলের সচেতন-অবসরের।

অবশেষে এক সময় দৃষ্টি পড়েও।

নিকটে এসে একেবারে সেই পূত ধূলিলিপ্ত দেহেই সন্ন্যাসীকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করেন, উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে ওঠেন, 'এই যে এসেছ! এসে পৌঁছে গেছ! আঃ, বড় আনন্দ হ'ল, বুক জুড়িয়ে গেল। বসো বসো, এই তাঁর চরণরেণুধন্য কালিন্দীতীরেই বসো।'

তার পর, অনেকক্ষণ ধরে ওঁকে নিরীক্ষণ ক'রে বলেন, 'তোমারই আশায় পথ চেয়ে বসে আছি বাবা। সংবাদ পেয়েছি। তোমার লক্ষ্য, তোমার এই আশ্চর্য সাধনার—বৈকুণ্ঠকে মর্ত্যের আলিঙ্গনে বাঁধার সাধনা—সংবাদ পৌঁচেছে আমার প্রাণে। বড় কঠিন পথ বাবা, সুকঠোর তপস্যার চেয়েও কঠোর, দুশ্চর।'

আবারও খুব খানিকটা—অকারণেই হেসে নিয়ে যেন আপনমনেই বলেন, 'তবু পূর্বাচলের পানেই তো চেয়ে থাকতে হয় বাবা। আশা থাকতে নৈরাশ্যের দিকে তাকাবো কেন? স্বীকৃতি, আশার বাণী, নব অভ্যুদয়ের আশা চিরদিন

পূর্ব থেকেই তো পশ্চিমে পৌঁচেছে। শুনেছি বহু দূর পশ্চিমের এক দেশে একজন বড় সাধক জন্মেছিলেন, তাঁরও ছিল তোমারই মতো সাধনা—ঈশ্বরকে পিতাজ্ঞানে ভজনা, ভালবাসায় সকলকে বুকে টেনে নেবার তপস্যা। সেখানকার অধিবাসীরা বহুদিন পর্যন্ত তাঁকে চিনতে পারে নি, মৃত্যুর পরও বহুকাল অবধি, কিন্তু তাঁর আবির্ভাবক্ষণেই এই পূর্বদেশ থেকে একদল সাধু গিয়ে তাঁকে প্রথম চিহ্নিত করেন, ঈশ্বরপ্রেরিত মহামানব বলে স্বীকৃতি দেন।'

তারপর বহুক্ষণ নীরব থেকে কি যেন ভাবলেন, খানিক নির্নিমেষ নেত্রে কৃষ্ণপ্রাণের চোখের দিকে চেয়ে থেকে বলেন, 'তবে কি জানো বাবা, তাঁকে বহু-দূরে বাইরে কোথাও খুঁজে বেড়াতে হয় না। মানুষই ভগবান, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই তিনি আছেন। শুধু তাঁকে জাগ্রত করার অপেক্ষা। ভালবাসার রসে সঞ্জীবিত ক'রে তুলতে হয়, তবে তিনি জীবন্ত হয়ে ওঠেন। তবেই তো তাঁর ভালবাসা আদায় সম্ভব। অবশ্য হ্যাঁ, কখনও কখনও অহেতুক কৃপাতেও এসে ধরা দেন বৈকি! না, পাওয়া কঠিন নয়, কঠিন হ'ল চিনে নেওয়া, পাওনাটা কোথা দিয়ে আসছে, কী ভাবে আসছে সেটা বুঝে পাওয়া। গল্পে আছে একটা লোক স্পর্শমণি যোগাড় ক'রে সব লোহাকে সোনা ক'রে নিয়ে অনেক ঐশ্বর্য সঞ্চয় করবে এই লোভে—পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরছিল, হাতে লোহা, পাথর নুড়ি তোলে আর ঠেকায়, সোনা হ'ল না দেখে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। এই করতে করতে পাগল হয়ে গেল প্রায়—কাজটা অভ্যাসে, নেশায় দাঁড়িয়ে গেল। কী হচ্ছে আর তাকিয়ে দেখে না। সত্যিই যেদিন সোনা হ'ল সে বুঝতেও পারল না, কবে কখন কোন্ স্পর্শমণির স্পর্শে তা হ'ল। তাই বলছি বাবা, জীবনের সে পরম লগ্ন না ব্যর্থ হয়ে যায়। পাবার জন্যেই শুধু ছুটে বেড়িও না, পেলে কিনা সে বিষয়েও হুঁশ রেখো।'

॥ ১৯ ॥

দীর্ঘ পথ, পথ চলার বিরাম নেই।

তীর্থ তো শুধু পথের ধারে ধারেই নয়, সারা পথই তো তীর্থ। প্রতিদিনই মনে হয় তীর্থস্নান ক'রে উঠছেন।

এই আশ্চর্য সন্ন্যাসী—যার রূপ, মিষ্ট ব্যবহার ও সকরুণ সস্নেহ কণ্ঠস্বর ইতিমধ্যেই প্রবাদে পরিণত হয়েছে এবং সে প্রবাদ হয়েছে বহুদূর বিস্তৃত—তিনি নিকটে আসছেন বা এসেছেন শুনে সহস্র সহস্র ঈশ্বরবার্তা-তৃষাতুর ভক্ত ছুটে আসছেন দূর-দূরান্ত থেকে—তাঁদের সাহচর্য, প্রীতি ও শ্রদ্ধাই তো তীর্থস্নান।

বৃন্দাবন মথুরা—তারপর প্রয়াগ বারাণসী—এসব প্রসিদ্ধ তীর্থে স্থানীয় অধিবাসীদের নির্বন্ধাতিশয্যেই কিছু দিন ক'রে থাকতে হ'ল।

কাশী পণ্ডিতদের স্থান, বৈদান্তিক সন্ন্যাসীদেরও—তাঁরা এলেন বিচার করতে, তর্ক করতে। প্রথম প্রথম নম্রতার সঙ্গে, নতি স্বীকার ক'রে এড়িয়ে

যাবার চেষ্টা করলেও—তাঁরা ছাড়তে চান না। অগত্যা বিচারবিতর্কে প্রবৃত্ত হ'তে হয়। সর্বশাস্ত্রপারঙ্গম সাধুর কাছে তাঁরা পরাজিতও হন শেষ পর্যন্ত—কিন্তু এসব বড় তুচ্ছ, অসার বোধ হয়। এ বিজয়লাভে তো রুচি নেই কৃষ্ণপ্রাণের বরং কেমন বিতৃষ্ণাই বোধ হয়।

কেউ কেউ বিদ্রূপও করেন, 'তুমি তো বেদান্তবাদী সন্ন্যাসী—তবে কৃষ্ণ কৃষ্ণ করো কেন?'

উনি হাসেন, বলেন, 'ভাই শাস্ত্রকথার শূন্যগর্ভ শব্দঝঙ্কারে ভুলো না, একটু ভিতরে প্রবেশ করো। কৃষ্ণ আমাদের কাছে ঈশ্বরের ধ্যানমূর্তি ধারণার সহায়ক, আমাদের মানসিক আশ্রয়। ঈশ্বর সর্বগুণে আছেন, অথচ গুণাতীত। যা কিছু এ ব্রহ্মাণ্ডের রূপ রস গন্ধ বর্ণ গুণ ভাবনা—সবই তাঁর সৃষ্টি। তাঁর ইচ্ছাতেই সব সৃষ্টি হয়েছে—এ কথা যদি মানো তো দেখবে তিনি সকল বিতর্কের অতীত। আমাদের মতো ক্ষুদ্র মূঢ় প্রাণীর কি শক্তি তাঁকে ধারণা করব? সেই জন্যে তিনি নিজে থেকে আমাদের ভাবনায় কল্পনায় ধরা দিয়েছেন। কৃষ্ণ তাঁর সেই প্রেমঘন স্বরূপ, এই রূপেই তিনি মানবের ভক্তি ও প্রেম আস্বাদন করতে চান। ব্রহ্মসংহিতায় আছে, "যিনি সর্ব জগতের আশ্রয়, পরমাত্মা পরব্রহ্ম, সৎচিৎ আনন্দমূর্তি; যিনি সকলের আদি, পরন্তু যাঁর আদি কিছু নেই; সর্ব প্রপঞ্চের কারণীভূত, মায়ারও কারণ যিনি—সেই পরম ঈশ্বর গোবিন্দই কৃষ্ণ।"*

এই সব পণ্ডিত তথা পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তিদের চেয়ে সহস্রগুণে শ্রেয় ঐ সব দূরদেশাগত ভক্তলোকের সঙ্গ।

তারা শাস্ত্র জানে না, বিচার করে না, তর্কে জয়লাভের উচ্চাশা তাদের নেই—তাদের মনের মধ্যে একটিই ব্যাকুলতা, এই সাক্ষাৎ কল্পনার-ঈশ্বর-সদৃশ সন্ন্যাসীর কাছে ভগবানের কথা শুনবে, ভগবানের সান্নিধ্যে পৌঁছবার পথের সন্ধান পাবে।

তাই উনি যা বলেন সেই ভাবে অগ্রসরের চেষ্টা করে তারা প্রাণপণে।

তারা দীক্ষা নিতে চায়—উনি বলেন, 'নাম করো, তাঁকে ডাকো। তাঁকে স্মরণ ক'রে তাঁর শরণাগত হও, এ-ই দীক্ষা। আর কোন দীক্ষার প্রয়োজন নেই তোমাদের।'

তারা প্রশ্ন করে, 'তাঁকে কখন ডাকব, কি ক'রে ডাকব? আমাদের মন যে এখনও সংসারে বদ্ধ, মায়া মোহ কাম কামনা যে যায় নি এখনও।'

'ঐ নামেই সব বন্ধন কাটবে, মন মুক্ত হবে। আর ডাকা? যখন সময় পাবে, যখন মনে পড়বে—তখনই ডাকবে। শুদ্ধ হয়ে স্নান ক'রে কখন আসনে বসতে পারবে—সেজন্যে অপেক্ষা করো না। কাজের মধ্যেই মনে মনে জপ

* ঈশ্বর পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদি গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণং॥

করবে। তাঁকে স্মরণ করলেই তো শুচি। যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরিকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরো শুচি—শোন নি এ মন্ত্র!'

তারা তৃপ্ত হয়, নিশ্চিন্ত হয়।

এরাই ধন্য, ভাবেন কৃষ্ণপ্রাণ, হয়ত বা একদিন সার্থকও হবে, ব্রহ্মকে পাবে, ঈশ্বরে লীন হবে।

তিনি কি সার্থক হবেন কোন দিন? তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধ হবে? ঈশ্বরে লীন হতে চান না যে উনি। তাঁকে সেবা করতে চান, তাঁর সাহচর্য চান, জন্ম-জন্মান্তর ধরে এই লীলারস আস্বাদন করতে চান।

এই ভাবে চলে তাঁর ভক্তসঙ্গমে নিত্য তীর্থস্নান। ভক্ত বন্ধু শিষ্য—এরাই সাধুর আপনজন।

কেউ না ভুল বোঝে তাই বার বার সতর্ক ক'রে দেন, 'রাধাকৃষ্ণের প্রেম, গোপীদের প্রেমাকুতি সাধারণ অর্থে প্রেম নয়। এর মধ্যে ইন্দ্রিয়সম্ভোগ নেই। দেহজ নয়—দেহাতীত। শুধুই আনন্দ, সেই আনন্দে ডুবতে না পারলে এ সাধনাই ব্যর্থ হবে।'

আবার হয়ত বলেন, 'তবু এ সাধনা অনেক সহজ সাধনা। নাম করতে করতেই, যদি ইচ্ছায় না ভেজাল থাকে, মন নিষ্কাম হ'তে বাধ্য। সব সাধনাই নির্মল, মানুষের মনে যদি ঈশ্বর সম্বন্ধে আকুলতা না জন্মায়—সে পাঁকেই ডুবে থাকবে। পাঁকের ওপরে যে পদ্ম, যাতে কোন মালিন্য লাগে না—শুধুই সৌরভ আর মধু—সেখানে পৌঁছতে পারবে না।'

এই সব সময়গুলো একরকম আনন্দে থাকেন। এ যেন অন্য মানুষ।

আবার কখনও কখনও কেমন বিষাদে ডুবে যান।

হঠাৎ গিয়ে হয়ত কাউকে ধরে বলেন, 'তোমার এই সরল বিশ্বাস, তাঁকে পাবার জন্যে এ আকুলতা—আমাকে দিতে পারো না? আমার মনের এ সংশয় আর শঙ্কা যায় না কেন? কেন এই কুয়াশাটুকু কাটে না?'

মথুরাতে এক আশ্চর্য ভক্ত দেখেছিলেন।

না, মথুরাতে ঠিক নয়—গোকুল থেকে মথুরা আসার পথে।

চিরবাস পরিহিত একটি শীর্ণকায় লোক, যে বাসে লজ্জা নিবারিত হয় মাত্র, যাকে বস্ত্র বলা চলে না কোনমতেই—এককালে নাকি সুলতানের পদস্থ কর্মচারী ছিলেন, সে সব ছেড়ে এখানে এসে আছেন। জঙ্গল থেকে কাঠকুটো সংগ্রহ ক'রে এনে লোকালয়ে বিক্রী করেন, তবে পাঁচ পয়সা বা ঢেবুয়ার বেশী নয়। তা থেকে দৈনিক এক পয়সা মাত্র নিজের আহার ও অন্যান্য প্রয়োজনে ব্যয় করেন, বাকী চার পয়সা এক 'চটি'ওয়ালা দোকানদারের কাছে গচ্ছিত রাখেন। আতুর, রুগ্ন, অসহায় তীর্থযাত্রী দেখলে তাদের সেবা করেন, খাওয়ার ব্যবস্থা ক'রে সুস্থ ক'রে তোলেন—ঐ গচ্ছিত পয়সা থেকে।

কৃষ্ণপ্রাণ দেখেন মহা আনন্দে আছে লোকটি। দর্শনে যায় না, পুজার ধার ধারে না—এই দুঃখী পুণ্যার্থীদের সেবা ক'রেই তার আনন্দ।

ওকে দেখে কৃষ্ণপ্রাণের চোখে জল এসে গিছল।

প্রণাম করতে গিছলেন লোকটিকে, সে বাধা দিয়ে ওঁর পায়ে পড়ে পা দুটি জড়িয়ে ধরেছিল।

এ যদি তীর্থ না হয়—আর কোথায় কী তীর্থ আছে।

॥ ২০ ॥

কৃষ্ণপ্রাণ নীলাচলে ফিরে আসার পর এই প্রায় দু বছরের মরে-থাকা আনন্দের হাট আবার পূর্ণ গৌরবে বা পূর্ব গৌরবে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে।

যেন সেই রূপকথার কোন্ রাজপুত্রের পাদস্পর্শে জেগে ওঠে নিদ্রিত এক বিশাল রাজপুরী।

আবার শুরু হয়ে যায় পল্লীতে পল্লীতে সেই অষ্টপ্রহর হরিনাম সংকীর্তন —শ্রীকৃষ্ণ লীলাকীর্তন, সেই উদ্দাম উদ্দণ্ড নৃত্য।

স্থানে স্থানে সেই নাম-সুধা বিতরণ।

প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম জগবন্ধুর মন্দিরেও সেই কীর্তনের তরঙ্গ এসে লাগে—বা বলা যেতে পারে এখান থেকেই দূরে দূরান্তরে আঘাত জাগিয়ে প্রত্যাহত হয়ে ফিরে আসে।

স্বয়ং রাজা বা রাজপুত্র যাঁর পদাশ্রয় পাবার জন্য লালায়িত, তাঁকে পূজারীরাও সমীহ করবেন বৈকি, শুরু হয়ে যায় আরতি দীর্ঘায়ত করার প্রতিযোগিতা, পূজা ত্রুটিহীন করার আপ্রাণ চেষ্টা।

বহুলোক দূর-দূরান্তর থেকে আসতে আরম্ভ করেন আবারও। সন্ন্যাসীকে দর্শন করার জন্য স্পর্শ করার জন্য লালায়িত তাঁরা। তাঁদের বিশ্বাস, ওঁর কাছেই স্বর্গের চাবি আছে, ওঁর দর্শন মাত্রই তাঁরা সর্ব কলুষমুক্ত জীবন্মুক্ত হবে। ওঁর উপদেশে মুক্তির দিশা পাওয়া যাবে।

উনি প্রকৃতি দর্শন করেন না সত্য কথা। প্রকৃতিকে সাধ্যমতো দর্শনও দেন না—পাদস্পর্শ তো কল্পনাতীত। তা নাই বা দিলেন, দূর থেকে উপদেশ শুনতে হরিনাম গান শুনতে তো বাধা নেই।

অনেকে আসে সর্বস্ব ত্যাগ করে। তাঁকে দেখেই যেন সংসার-বিমুখ হয়।

ওঁর এই তীর্থযাত্রার পথেই—যাওয়া আসা দুদিকের ভ্রমণেই—কত পরিবারের কি বিপুল পরিবর্তন হয়ে গেল। কত রাজপুত্র বা তদ্রূপ ধনীপুত্র ছিন্ন-কন্থা বৈরাগীর জীবনের জন্য লালায়িত হয়ে উঠল। গৃহের কোন বন্ধনই তাদের বাঁধতে পারে না। বিপুল বিত্ত, সম্ভোগের অজস্র আকর্ষক ও উত্তেজক আয়োজন, গৃহে সুন্দরী বধূ—তা ব্যতিরেকেও তাদের পিতামাতা বিশেষ যত্নে আহরিত নির্বাচিত সুন্দরী স্ত্রীলোকের শৃঙ্খল পায়ে পরাবার চেষ্টা কি কিছু কম করেন?—তবু এ সব কিছুই তাদের ধরে রাখতে পারে না। এ সব বিষবৎ বোধ হয় তাদের কাছে।

বরং এই সব ধনীর দুলালরাই কৃচ্ছ্রসাধন বেশি করেন। মনে হয় এমন

কঠোর তপস্যা কৃষ্ণপ্রাণও করেন নি কখনও। আহার বিশ্রাম কোন দিকেই তাদের দৃষ্টি থাকে না।

এক জমিদার পুত্র—জমিদার না বলে রাজা বলাই উচিত, তেমনিই বিপুল বিত্ত তাঁদের, তেমনিই প্রতাপ—তাঁদের বংশের একমাত্র সন্তান রামচন্দ্র ষোল বছর বয়সে প্রথম দেখেছিলেন কৃষ্ণপ্রাণকে, সঙ্গে সঙ্গেই সংসার-ত্যাগের আকুলতা জেগেছিল তাঁর মনে। পালিয়ে চলে এসেছিলেন। কৃষ্ণপ্রাণই অনেক বুঝিয়ে, বিস্তর উপদেশ দিয়ে বাড়ি ফিরতে বলেন। ছেলেটি তাঁর পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে শুরু করে শেষ পর্যন্ত। তখন দু বৎসর সময় চেয়ে নেন কৃষ্ণপ্রাণ। বলেন, 'দু বৎসর আরও গৃহে থাকো, তার পরও যদি এ তীব্র বৈরাগ্য থাকে—আমি তোমার সন্ন্যাসের ব্যবস্থা করে দেব।'

অতি অনিচ্ছায় রামচন্দ্র বাড়ি ফেরেন। তাঁর পিতা-পিতৃব্য হাতীতে ক'রে বহুসংখ্যক প্রহরী দিয়ে বাড়ি নিয়ে আসেন।

আগেই একটি সুন্দরী বালিকার সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল রামচন্দ্রের, এবার তাকে আনিয়ে একত্র বাসের ব্যবস্থা করা হ'ল। তা ব্যতিরেকেও, পুরুষের মনে বন্ধন পরাবার যা কিছু পথ জানা আছে, তার সবগুলিই অবলম্বন করেন। নৃত্যগীত-পটীয়সী, ছলাকলায় অদ্বিতীয়া সুন্দরী বারাঙ্গনা আনান ওঁরা, তারা সর্বদা ঘিরে থাকে কিশোর রামচন্দ্রকে—নানা ভাবে নানা সম্ভোগে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে।

কিন্তু রামচন্দ্র এ সর্বপ্রকার আয়োজনে বীতস্পৃহ থাকেন। বহির্বাটির একটি ঘরে নিঃসঙ্গ জীবন কাটে তাঁর—জপে আর ধ্যানে। আর কিছুটা কাটে হিসাবে কত দিনে প্রতিশ্রুত দু বৎসর বিগত হবে।

শেষ পর্যন্ত সে সময়ও পার হয়ে আসেন। এবার নীলাচলে যাবেন সংসার ত্যাগ ক'রে, চিরদিনের মতো। কিন্তু এ হিসাব তাঁর অভিভাবকরাও রেখে-ছিলেন। তাঁরা চেষ্টা করেন সর্বশক্তি প্রয়োগে তাঁদের বংশের একমাত্র সন্তানকে এ পথ থেকে নিবৃত্ত করতে। তবে সংসারবিমুখ, যে প্রব্রজ্যায় কৃতসংকল্প—তাকে বাধা দেবে কে? শেষ পর্যন্ত রামচন্দ্রকে কোনমতেই সংসারে বেঁধে রাখা গেল না। কী ভাবে যে কয়েকশত প্রহরীর দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত ক'রে চলে গেলেন তা কেউ বুঝতেও পারল না।

অভিভাবকরা অবশ্য আবারও নীলাচলে গিয়েছিলেন, বলপ্রয়োগে ধরে এনে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখবেন এই উদ্দেশ্যে—কিন্তু রামচন্দ্র স্পষ্টই বলে দিল যে তাকে জোর ক'রে ধরে নিয়ে গেলে সে প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করবে।

অগত্যা তাঁরা নিরতিশয় দুঃখিত চিত্তে ফিরে যেতে বাধ্য হলেন।

রামচন্দ্র বৈরাগী জীবনের প্রথম থেকেই যে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করলেন, তা কৃষ্ণপ্রাণের পক্ষেও বিস্ময়কর।

ভূমিশয্যা, একমাত্র বহির্বাস-সার—তা স্নানের পর দেহেই শুষ্ক হয়; ভিক্ষা সম্বল। সে ভিক্ষার সময়ও অতি সীমিত। প্রভাতে লক্ষ নাম জপ করার পর দর্শন পরিক্রমা প্রভৃতি সেরে বেলা তৃতীয় প্রহরে মন্দির প্রবেশের পথে নীরবে

দণ্ডায়মান থাকেন। কেউ স্বেচ্ছায় ভিক্ষা দিলে তা গ্রহণ করেন এবং জীবনধারণের মতো খাদ্য পেলেই নিজের কুটিয়ায় ফিরে যান।

রাজপুত্র ভিখারী হয়েছে—এ সংবাদ রটিত হ'তে বিলম্ব হয় না। সূপকাররা সাগ্রহে এসে প্রসাদ ভিক্ষা দেয়—এবং দেয় উৎকৃষ্ট যা প্রসাদ, তাই। রামচন্দ্র কয়েকদিন দেখেই বুঝলেন এ একপ্রকার জুলুমই করছেন তিনি। আত্মপ্রবঞ্চনাও বটে। তিনি ওভাবে ভিক্ষাগ্রহণ থেকে নিবৃত্ত হলেন। এবার যে পন্থা অবলম্বন করলেন তা অনন্যসাধারণ, অলোকসামান্য।

আনন্দবাজারে মহাপ্রসাদ বিক্রয়ের প্রথা। সূপকার বা সওয়াররা নিজ নিজ প্রসাদ সেখানেই নিয়ে আসে, ক্রেতারা প্রয়োজন মতো তা সংগ্রহ করে। যা অবিক্রীত থাকে, গভীর রাত্রি পর্যন্ত দেখে পকাল বা পান্তা ক'রে রাখে। পরের দিন তা বিক্রী করার চেষ্টা করে। দরিদ্র লোকেরা স্বল্পমূল্যে কয়েকটি কড়ি দিয়ে তা কিনে নিয়ে যায়।

তথাপি, তৎসত্ত্বেও কিছু উদ্‌বৃত্ত থাকে, তখন তা সমাগত ভিক্ষুকদের দেওয়া হয়। তারও পরে যা থাকে—মন্দির-প্রাচীরের ওপাশে মাঠে ফেলে দেয় মালিকরা। সেদিকে লোকজন বিশেষ আসে না। এলেও মহাপ্রসাদ পদস্পৃষ্ট হওয়ার ভয়ে সে স্থান পরিহার করে। কখনও পথচারী গাভীরা আসে, তবে তারাও সব খায় না, অথবা গলিত অন্ন খেতে চায় না।

রামচন্দ্র সিংহদ্বার বা মন্দিরের প্রবেশপথ পরিহার ক'রে স্বর্গদ্বার বা প্রধান স্নানের ঘাটে দাঁড়াচ্ছিলেন; সেখানেও তাঁর ত্যাগ ও তিতিক্ষার কাহিনী পেঁছিতে বিলম্ব হ'ল না। তীর্থস্নানার্থীরা দয়াবশত নয়—শ্রদ্ধাভরেই ভিক্ষা দিতে লাগল। কেউ বা করজোড়ে তাদের বাড়িতে গিয়ে ভিক্ষা নেবার জন্য অনুরোধ করতে লাগল, কেউ বা উত্তম প্রসাদ কিনে এনে ভিক্ষা দিতে লাগল।

বিপন্ন তরুণ বৈরাগ্যব্রতী দৈবাৎই আনন্দবাজারের প্রাচীরপারে নিক্ষিপ্ত অর্ধগলিত মহাপ্রসাদের সংবাদ পেলেন। অতঃপর মহা আনন্দে নিশ্চিন্ত মনে সেই অন্ন পথ বা প্রান্তর থেকে সংগ্রহ ক'রে এনে দু-তিনবার ভাল ক'রে ধুয়ে গলিত অংশ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট 'মাঝ' বা মধ্যের যেটুকু তখনও চর্বণযোগ্য থাকে সেইটুকুই লবণ সহযোগে আহার করতে লাগলেন।

অর্থাৎ প্রাণধারণের জন্যে যেটুকু প্রয়োজন।

ক্রমশ কৃষ্ণপ্রাণের কাছেও এই সংযম ও ত্যাগের কাহিনী পেঁছিল। তাঁর দুই গণ্ড বেয়ে নামল আনন্দাশ্রুর ধারা। 'ধন্য, ধন্য' এই ধ্বনি করতে করতে তখনই ছুটলেন রামচন্দ্রের দীন আবাস, সামান্যতম পর্ণকুটিরের দিকে।

সেটা দিনের তৃতীয় প্রহর প্রায়—রামচন্দ্র তাঁর নিত্যকৃত্য শেষ ক'রে ঐ অর্ধগলিত অন্ন গ্রহণ করতে বসেছেন—গুরু ছুটে এসে তাঁর পাতা থেকেই দুই গ্রাস তুলে মুখে দিয়ে বললেন, 'তোমার ত্যাগে, তোমার বৈরাগ্যে, তোমার তপস্যায় এই মহাপ্রসাদ অধিকতর সুস্বাদু অমৃতময় হয়ে উঠেছে। রামচন্দ্র, তুমি ধন্য!'

অতঃপর ওঁকেই যোগ্য পাত্র বিবেচনা ক'রে কৃষ্ণপ্রাণ বললেন, 'শ্রীবৃন্দাবন

প্রভুর বাল্যের লীলাভূমি আজ বিস্মৃত, অবলুপ্তপ্রায়। তুমি সেখানেই যাও। ব্রজবাসীরা দরিদ্র হলেও তোমাকে দুখানা রুটি আর একটু লবণ দিতে পারবেন। তোমার পুণ্যে ব্রজভূমি পুনঃসঞ্জীবিত হয়ে উঠবে।'

এমন অনেক ব্যক্তিই ছুটে এলেন সর্বত্যাগী হয়ে—স্বেচ্ছায় অসীম দৈহিক কষ্ট বরণ ক'রে নিতে।

মনে হ'ল ঈশ্বরের জন্য এই ক্লেশ বরণেই তাঁদের আনন্দ বা সুখ বেশি।

গৌড়সুলতানের দুই মন্ত্রী এলেন, রাজারও অধিক, অপরিমিত ঐশ্বর্য ত্যাগ ক'রে—পদব্রজে, ভিক্ষা করতে করতে—সে ভিক্ষাও প্রাণধারণের মতো। তাঁরা শুধু বিত্তশালী নন—বিদ্বান, পণ্ডিতও। অর্থশাস্ত্রে ন্যায়শাস্ত্রে পারঙ্গম—রাজ্যশাসনে বিপুল অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, দূরদর্শী বুদ্ধিমান। এঁদের একজন পরবর্তীকালে সংস্কৃত কাব্য রচনায় ভারতবিখ্যাত হয়েছিলেন। এঁরাও সানন্দে, সাগ্রহে—ভূমিশয্যা, একাহার; শীতকালে ছিন্নকন্থা সম্বল—এই কষ্টকর জীবনযাত্রা অবলম্বন করলেন।

এঁদেরও কৃষ্ণপ্রাণ বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দিলেন।

পরে শুনেছিলেন—মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে এক প্রায়-অলৌকিক কাহিনী তাঁর কানে এসেছিল—এর মধ্যে একজন শ্রীকৃষ্ণের এক প্রাচীন মূর্তি উদ্ধার ক'রে এনে নিজের ঝোপড়ায় রেখেছিলেন। প্রতিদিন প্রায় অপরাহ্নে, মাধুকরীতে সংগৃহীত কয়েক টুকরা রুটি এনে সেই বিগ্রহকে নিবেদন ক'রে নিজে সে প্রসাদ করতেন।

মাধুকরী অর্থাৎ মধুকর বৃত্তি, নানা স্থান থেকে সামান্য সামান্য ক'রে সংগ্রহ করা।

তখন ও দেশে অন্নের চল ছিল না। গম ছোলা বা যবের আটা মিশ্রিত ক'রে, অথবা শুধুই গম কি যবের আটার রুটি প্রধান খাদ্য ছিল। ব্রজবাসীরা তাই খেতেন, তাই ভিক্ষাও দিতেন। ভিক্ষার্থীরা শ্রীরাধার নাম উচ্চারণ ক'রে গিয়ে দাঁড়াবে শুধু, ব্রজবাসীরা সাধ্যমতো নিজেদের খাদ্যের অংশ ভিক্ষা দেবেন—এই ছিল প্রথা, বোধ করি এখনও সে প্রথা কিছু আছে। তবে তখন সাধ্য ছিল সামান্য, অধিকাংশরই পুরো একখানা ক'রে রুটি দেবার সামর্থ্য ছিল না, আধখানা বা সিকিখানা শ্রদ্ধাভরে নিজের ললাটে স্পর্শ করিয়ে তাদের ঝোলায় ফেলে দিতেন।

তাও অনেক সময় প্রয়োজনের অতিরিক্ত জমে যেত, বৈরাগী সাধু বা ভিক্ষুকরা সেগুলি শীতে গ্রীষ্মে রোদ্রে শুকিয়ে তুলে রাখতেন মাটির জালায় কি কলসীতে। বর্ষায় যখন মাধুকরীতে বেরোনো দুঃসাধ্য হ'ত—সেইগুলির কিছু বার ক'রে জলে ধুয়ে ভিজিয়ে রাখতেন—যার যেমন সঙ্গতি—শুধু লবণ কি গুড় কিংবা তার সঙ্গে দধি বা দুগ্ধ সহযোগে আহার করতেন।

[পরবর্তীকালে অন্নভোগের চলন হয়েছে—তবে তেমন প্রসাদ একজনকেই দেওয়া যায় এবং সেক্ষেত্রে বসিয়ে খাওয়ানোই রীতি। আরও পরে কুঞ্জে কুঞ্জে

একাদশীর প্রসাদ থেকে পূর্ণ 'পায়স' বা একজনের পেট ভরার মতো প্রসাদ—অন্ন ব্যঞ্জন রুটি পায়স—ভাঙ্গী ধোপা প্রভৃতি সেবকদের দেওয়ার রীতি হয়—অতিরিক্ত প্রাপ্য হিসাবে। এখন দেওয়া হয় কি না জানি না—তখন ধরে নেওয়া হ'ত পূজারী বা সেবাইৎরা একাদশীতে ফলাহারী হয়ে থাকবেন।]

রুটিই দেওয়া হ'ত—ব্যঞ্জন কি লবণ বা গুড়ের কথা কেউ চিন্তা করতেন না। সে যদি কারও প্রয়োজন হয় তো প্রার্থনা করবে। এই রাজভিখারী কারও কাছে কিছু যাণ্ডা করতেন না, নিজেও প্রয়োজন বোধ করতেন না। রসনাকে সর্বপ্রকারেই দমন করেছিলেন। একদিন যেন মনে হ'ল স্বপ্নে দেখলেন—বিগ্রহ যেন তাঁর কাছে একটু লবণ প্রার্থনা করছে, বলছে, 'ও রে, শুধু শুকনো রুটি আর খেতে পারি না।'

স্বপ্নভঙ্গে সাধুর মনে হ'ল এ তাঁরই মনের গোপন ইচ্ছা। মনকেই শাসন করলেন—অতিরিক্ত কয়েক সহস্র নাম জপ ক'রে—এবং বিগ্রহকে উদ্দেশ ক'রে বললেন, 'ঠাকুর, আমার আত্মবৎ সেবা, আমি যা খাচ্ছি তাই তোমাকে দিচ্ছি। যদি সত্যই এর বেশি প্রয়োজন হয়—নিজে ব্যবস্থা ক'রে নাও।'

তখন যমুনা বহতা নদী ছিল, বড় বড় পণ্যবাহী নৌকাও যাতায়াত করত। এই স্বপ্নের কয়েক দিন পরেই এক বণিকের বিরাট কয়েকটি নৌকার বহর ঠিক এই সাধুর কুঠিয়ার কাছে এসে আটকে গেল। চড়া পড়ে নি, ওখানে তো জোয়ার ভাঁটার কোন প্রশ্নই নেই যে অকস্মাৎ জল কমে যাবে—তবে নৌকো আটকায় কেন?

ওঁরা অনেক দেখেও কোন কারণ খুঁজে পেলেন না। চেষ্টাও বিস্তর করলেন, পারিশ্রমিক কবুল ক'রে লোকালয় থেকে বহু লোক ডেকে আনলেন—তারা জলে নেমে প্রাণপণে ঠেলতে লাগল—কিন্তু কোন নৌকাই এক চুল নড়াতে পারল না।

এই সব ব্যর্থ চেষ্টা করতে করতে রাত্রি নেমে গেল। অগত্যা ঐখানেই রাত্রি যাপন করা ছাড়া কোন গতি রইল না। বণিক নিজের নৌকাতেই শুয়ে রইলেন।

প্রথম রাত্রিটা তো ছটফট্ ক'রেই কাটল—নিদারুণ দুশ্চিন্তায়, শেষরাত্রে একটু তন্দ্রা এলে স্বপ্ন দেখলেন, এক প্রিয়দর্শন বালক এসে বলছে, 'কী করছ, এ নৌকা তোমরা কেউ নড়াতে পারবে না। এই নদীর পাড়ে এক পাতার ঝোপড়ায় এক সাধু আছে—তাঁর পায়ে গিয়ে পড়ো—তিনি হাত দিয়ে ছুঁলেই নৌকো চালু হবে। ওঁর একটি বিগ্রহ আছে—তার ভাল সেবা হয় না, ফেরার পথে তোমার লাভের টাকা দিয়ে একটা মন্দির করে দিও, আর যাতে ভাল সেবা হয় তার ব্যবস্থা করো।'

বণিকের কেমন মনে হ'ল, এ ঈশ্বরেরই নির্দেশ, নইলে এমন অকারণে এখানে এসেই বা নৌকা আটকাবে কেন?

তিনি ভোর হতেই চড়ায় উঠে গিয়ে সাধুর পায়ে পড়লেন, 'ঠাকুর রক্ষা করো। আমি বিরাট মন্দির ক'রে দেব। জমি জায়গা দেব।'

সাধু সব শুনে হেসে বললেন, 'আমার কোন প্রয়োজন নেই। তবে উনি যদি স্বপ্ন দিয়ে থাকেন, তাহলে ওঁকেই বলো। প্রতিশ্রুতি দাও—তাহলেই হবে। আমাকে কিছু করতে হবে না।'

বণিক তবু পীড়াপীড়ি করতে লাগল, 'আপনি দয়া ক'রে আমার নৌকায় একবার পদার্পণ করুন, তাহলে আমার জীবনরক্ষা হয়।'

পদার্পণের প্রয়োজন হ'ল না, সাধু গিয়ে স্পর্শ করতেই সব কখানা নৌকা দুলে উঠল।

সেবার সে বণিকের লাভও হ'ল প্রচুর। তিনি ফেরার পথে এখানে দেবতার মন্দির করে দিলেন। সেবা যাতে ভালভাবে চলে—তার জন্যও ওখানকার এক মহাজনের গদীতে প্রচুর অর্থ জমা ক'রে দিলেন।

হয়ত এ সবই জনশ্রুতি মাত্র। কৃষ্ণপ্রাণ প্রত্যক্ষভাবে এ সব কিছুই দেখেন নি। তবে এঁদের ত্যাগ তিতিক্ষা তো জনশ্রুতি নয়! এঁদের কঠোর তপস্যা, একান্ত কৃচ্ছ্রসাধন তো চোখেই দেখছেন।

এঁরা পাবেন। এঁদের যা লক্ষ্য, ব্রহ্মকে লাভ করা, ঈশ্বরে লীন হওয়া তা সফল হবে। এঁরা তপস্বী।

কিন্তু তিনি? তিনি যে এ সিদ্ধি চান না। তাঁর যে উদ্বাহুবামনের মতোই অতিরিক্ত লোভ। তিনি চান সেই ঈশ্বর প্রত্যক্ষ ভাবে মর্ত্যের মৃত্তিকায় নেমে আসুন, তাঁর সেবা তাঁর প্রেম উপভোগ করুন।

এ কি কোন দিন সফল হবে?

অথচ এই জন্যেই তো কোন পাওয়াতে তাঁর আশ মেটে না, শান্তি পান না।

মাঝে মাঝে মনে পড়ে যায় প্রয়াগে এক সাধুর মুখে শোনা, এক সুফী সাধকের লেখা ফার্সী বয়েৎ—

"না বা হিন্দ্ অস্ত্ অয়মন্দ্
ও না দরখতন—
আন কি খসম এ উ অস্ত্
ছায়া এ খেস্তন্ ॥"*

যার নিজের ছায়া (বা মনই) নিজের শত্রু, সে হিন্দোস্তানেই যাক্ আর তাতারেই যাক্ কোথাও সে নিরাপদ নয়—অর্থাৎ কোথাও তার শান্তি নেই, তৃপ্তি নেই।

এ বুঝি কৃষ্ণপ্রাণের জন্যই রচিত।

॥ ২১ ॥

কোথাও যেন কোন দিশা না পেয়ে কৃষ্ণপ্রাণ সেই সাধারণ সাধনার পথই অবলম্বন করলেন

* অয়মন্দ্—নিরাপদ। দরখতন—তাতার।

এমনিই ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর কৃচ্ছ্রতার অন্ত ছিল না—এখন তার মাত্রা বর্ধিত হল, সীমা অতিক্রম করল বললেও অত্যুক্তি হয় না।

ভূমিশয্যা তো ছিলই—শীতকালে তুষারশীতল, গ্রীষ্মে অগ্ন্যুত্তপ্ত প্রস্তর-কুট্টিমেই শয়ন করতেন, অজিন বা অন্য লোমজ শয্যাও ত্যাগ করেছেন বহুদিন —এখন নিজে দেখে ইচ্ছা ক'রে কারাগার সদৃশ একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ বেছে নিলেন, যা দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে সমান এবং সর্ব দিকেই ওঁর অস্বাভাবিক দীর্ঘতা অপেক্ষা ন্যূন।

অর্থাৎ সে প্রস্তর-শয্যাতেও কোন স্বস্তি বা তৃপ্তি না থাকে। আরামের প্রশ্ন তো উঠছেই না, যেমন ভাবেই শয়ন করুন, পদসঙ্কোচন ভিন্ন সম্ভব নয়।

আহার্যেও কৃচ্ছ্রতার অবধি রইল না। চিরদিনই তাঁর আহার ছিল পরিমাণে অতি অল্প। কোন প্রকারে জীবন-ধারণের মতো। এখন আরও কঠোর সংযমের ব্যবস্থা করলেন।

ভক্তরা তাঁকে কুঠিয়াতেই 'ভিক্ষা' দিয়ে যেতেন। প্রভুর মহাপ্রসাদ ভিন্ন কোন খাদ্যই তিনি সাধারণত গ্রহণ করতেন না। ফল—তাও বাল্যভোগের প্রসাদী ফলই খেতেন। কোন বিশেষ ভক্ত—যিনি অতিশয় আকিঞ্চন প্রকাশ ক'রে স্বহস্তে পাক ক'রে ভিক্ষা দেবার প্রার্থনা জানাতেন—একমাত্র তাঁর গৃহেই ইষ্টে নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করতেন।

মহাপ্রসাদের ক্ষেত্রে সাধারণত কিছু কিছু পক্কান্ন—খাজা, পায়স, অমৃত-রসাবলী, ক্ষীর, মালপুয়া, মোহনভোগ প্রভৃতি থাকত, যার যেমন সাধ্য সেই মতো। সঙ্গী-সেবকরা সাগ্রহে সে উৎকৃষ্ট প্রসাদ গ্রহণ ক'রে পরিতৃপ্ত হতেন। কৃষ্ণপ্রাণও তা গ্রহণ করতেন—তবে সে সামান্য সামান্য, নামমাত্র। কোন কোনটা হয়ত জিহ্বায় স্পর্শ মাত্র করতেন। তৎসত্ত্বেও, আয়োজন বিশেষে সে ভাবেও আহার সম্ভব হ'ত না, অবশিষ্টগুলি মাথায় ঠেকিয়ে পাত্রে নামিয়ে রাখতেন—সে প্রসাদের প্রসাদ গৃহস্থ বা সেবকদেরই সেবায় লাগত। তাঁরা চরিতার্থ বোধ করতেন।

তবে সব জড়িয়েও পরিমাণে একটি সাত-আট বৎসরের বালকের উপযুক্ত দাঁড়াত—তার বেশী নয়। যে প্রসাদ নিত্য তাঁর কুটিয়ায় পোঁছত সেও এই ভাবেই সেবায় লাগত। সে ক্ষেত্রেও, যে দিন পূজারী বা সূপকাররা ভিক্ষা পোঁছে দিতেন, বিশেষ যেদিন স্বয়ং রাজার ইঙ্গিতে বা নির্দেশে পাঠাতেন তাঁরা, অবশ্যই সেদিন আড়ম্বরটা বেশী হ'ত—উৎকৃষ্টতম প্রসাদই আসত—কিন্তু তাতেও কোনক্রমে পরিমাণে কোন ইতরবিশেষ হ'ত না।

এখন তাও পরিহার করলেন।

ভিক্ষাদাতাদের করযোড়ে জানালেন যে, অন্ন এবং যে কোন একটি ব্যঞ্জন ভিন্ন অপর কোন খাদ্য যেন না দেন তাঁরা। বিশেষত রসনাতৃপ্তিকর কিছু। সন্ন্যাসীর পক্ষে প্রকৃতি সংসর্গ সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকর, পতনের প্রধান কারণ—এ সকলেই জানেন। কিন্তু সেই সঙ্গে বিলাসও সর্বথা পরিহার্য,—সর্বপ্রকার বিলাসই—আলস্যবিলাস, রসনাবিলাস, শয্যাবিলাস—সব। আর এ সকলের

মধ্যে রসনাবিলাসই বোধ করি অধিকতর ক্ষতিকর। লাম্পট্য বহু প্রকারের হয় ; আহার্য-লোলুপতা রসনা-লাম্পট্যই, তা প্রায় প্রকৃতিসংসর্গ জনিত লাম্পট্যের মতোই ক্ষতিকর।

প্রাণধারণের জন্যই আহারের প্রয়োজন। প্রাণ থাকলে ঈশ্বরকে স্মরণ মনন চলে ; দেহ থাকলে তাঁর সেবায় তাঁর কর্মে লাগে। এই কারণেই সাধু ও তপস্বী বা সৎস্বভাবের মানুষ আহার্য গ্রহণ করেন—গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যাকে বলেছেন, "ব্রহ্মকর্ম-সমাধিনা"।

আহার্য-সঙ্কোচনের ফলে শীর্ণদেহ শীর্ণতর হতে থাকে। এক কালের নবনীতকোমল দেহ অস্থিচর্মসার হয়। কঠিন পাষাণশয্যায় শয়ন প্রতিমুহূর্তে যন্ত্রণাদায়ক হয়ে ওঠে, তাই স্থির হয়ে থাকতে পারেন না। আর ক্রমাগত পার্শ্বপরিবর্তনের ফলে পাষাণের ঘর্ষণে ক্ষতের সৃষ্টি করে।

সেবকরা সজল চোখে বলেন, 'একটা তোশক অন্তত গ্রহণ করুন, এ ভাবে অকারণ ক্লেশ স্বীকার করতে থাকলে দেহেরই যে অবসান ঘটবে। গোবিন্দের সেবায় কি উৎসর্গ করবেন ?'

ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন কৃষ্ণপ্রাণ।

বলেন, 'হ্যাঁ, শুধু তোশক কেন, একটা খাটও আন, রেশমাস্তীর্ণ শয্যার ব্যবস্থা করো—তাহলেই সন্ন্যাসের ষোলপুয়া পূর্ণ হয়। তোমরা কি চাও, আমি সন্ন্যাস বিসর্জন দিয়ে জনসমাজের ঘৃণা ও ধিক্কার কুড়িয়ে বেড়াই ?'

এরপর আর সেবকরাই বা কি বলবেন, ভক্তরাই বা কি করবেন !

শেষ পর্যন্ত এক গৃহী ভক্তই মধ্যপন্থা অবলম্বন ক'রে এই সাংঘাতিক অবস্থার অবসান ঘটালেন।

কদলীপত্রের মধ্যদণ্ড ও দড়ির ন্যায় ছোটা গুলি পৃথক করে শুধু কোমল পত্রভাগগুলিকে চিরে চিরে সরু পাপড়ির মতো ক'রে তুললেন, সেইগুলিকেই রৌদ্রে শুষ্ক করে—কৃষ্ণপ্রাণেরই দুটি গৈরিক বহির্বাস সীবন ক'রে একটি খোল প্রস্তুত করলেন, তারপর তাতেই সেই শুষ্ক পত্রাংশগুলি পূর্ণ করে তোশকের মতো তৈরী করা হ'ল। এবার আর এঁদের আকিঞ্চন এড়িয়ে যেতে পারলেন না, হার মানতে হ'ল।

কিছু দিন এইভাবে নীরব নিভৃত নিবিড় তপস্যায় নিরত থেকে আবার পূর্বের ন্যায় প্রকাশ্য সরব সাধনায় ফিরে এলেন।

তখনও প্রতি বৎসর রথের সময় বহু বাঙালী ভক্ত পুরীতে আসতেন। নবদ্বীপ শান্তিপুর কাটোয়া সপ্তগ্রাম হুগলী প্রভৃতি স্থান থেকে যাঁরা আসতেন তাঁদের ব্রজবালাদের মতোই দুটি উদ্দেশ্য—"এক পন্থ দ্বৈকাজ—দধি বেচন, হরি ভেটন"—একই সঙ্গে রথারূঢ় জগন্নাথ দর্শন ও তাঁদের প্রিয়তম সন্ন্যাসী কৃষ্ণ-প্রাণের সঙ্গে সৎসঙ্গে ও সৎপ্রসঙ্গে আনন্দে দিন যাপন। তাঁকে ও জগন্নাথকে একত্রে দর্শন তাঁরা 'গুরু-গোবিন্দ করা' বলে মনে করতেন, ভাবতেন জীবনের

পূর্ণ সার্থকতা।

এঁরা এলে সন্ন্যাসীও আনন্দিত হতেন, কীর্তন-তরঙ্গে ভাসমান থাকতেন দিন রাত্রি। সে কীর্তনের মধুর-গম্ভীর নাদ এক এক সময় মন্দিরের বিশাল প্রাঙ্গণ বিরাট দেউল সু-উচ্চ প্রাচীর ছাড়িয়ে দূরে বহুদূরে ছড়িয়ে পড়ত। পথিক গৃহস্থ ভক্তরা কেউ বা উচ্চৈঃস্বরে কেউ বা আপন মনে সে কীর্তনের প্রতিনি তুলতেন। ফলে হরিনামধ্বনি যেন সর্বদা নীলাচলের আকাশ-বাতাস আচ্ছন্ন ক'রে থাকত, ভগবৎপ্রেমের অমৃত সরোবরে মগ্ন থাকতেন এই পুণ্যধাম-বাসীরা—আগত কৃষ্ণপ্রেম-প্রয়াসীরা।

কৃষ্ণার্পিতচিও কৃষ্ণপ্রাণ আর মহাপ্রভু জগন্নাথ কি অভিন্ন নন!

সঙ্গীতের সঙ্গে থাকত উন্মত্ত উদ্দাম নর্তন। সন্ন্যাসী সত্যই যেন উন্মত্ত হয়ে উঠতেন। তাঁর শ্রান্তি নেই, বিরক্তি নেই। অপর সকলে এক সময় হয়ত নিরতিশয় ক্লান্ত অপারগ হয়ে থেমে যেতেন, মৃদঙ্গ-মন্দিরা-বাদকরা অবসন্ন ভাবে বসে পড়তেন কিন্তু কৃষ্ণপ্রাণ একাকীই মুখে অবিরাম নামকীর্তন করতে করতে উদ্বাহু হয়ে উদ্দাম নৃত্য ক'রে যেতেন। সেই শীর্ণ তপস্বীর পদভরে মনে হ'ত শ্রীমন্দিরের বিপুল বিশাল প্রাঙ্গণের পাষাণতলস্থ ধরিত্রী কাঁপছেন, আকাশ-বাতাসে সেই নর্তন কম্পিত হচ্ছে। বাদ্য নেই, গীত আছে—হয়ত তখন সে অঙ্গহানির সংশোধন করতেন দর্শক বা শ্রোতাদের মধ্যে যাঁরা অভিজ্ঞ তাঁরা—তাঁরাই কেউ এসে মৃদঙ্গ, কেউ বা অপর বাদ্যযন্ত্র তুলে নিতেন—কীর্তনে নূতন শক্তি সংযোজিত হ'ত। যাঁরা অভিজ্ঞ নন তাঁরা হাততালি দিতে দিতে সেই নামোৎসবে যোগ দিতেন।

এই বিরামহীন বিশ্রামহীন পরিশ্রমে শীর্ণদেহ প্রায়-উপবাসীর সর্বাঙ্গ বেয়ে স্বেদপ্রবাহ বইত, মধ্যে মধ্যে বসন্ত-সমীর-আন্দোলিত কদলীপত্রের মতোই কেঁপে কেঁপে উঠত সেই বরদেহ—কিন্তু নৃত্য বা গীত কোনটারই বিরতি ঘটত না।

সেবক ভক্তরা এক সময় জোর ক'রে ধরে বসিয়ে দিলে সঙ্গে সঙ্গেই মূর্ছিত হয়ে পড়তেন। ঘাম মুছিয়ে বাতাস ক'রে মহাপ্রভুর স্নান-জল মুখে দিয়ে তাঁর সংজ্ঞা ফিরিয়ে আনতে হ'ত। সে সময় বহুক্ষণ আর উঠে বসতে কি দাঁড়াতে পারতেন না, কথা বলারও শক্তি থাকত না। ভক্ত ও সুহৃৎরা প্রায় বহন ক'রে নিয়ে যেতেন কুঠিয়ায়। দু দিকে ঘনবদ্ধ দর্শনপিপাসু পথিকের দল হরিধ্বনি ও জয়ধ্বনি ক'রে তাঁকে উদ্দীপিত করার চেষ্টা করতেন। হরিধ্বনিতে মুখে প্রসন্নতা দেখা দিত, ললাটে প্রশান্তি জাগত—আত্মস্তুতিমূলক জয়ধ্বনি শুনলে বিরক্তি বোধ করতেন। তবে তাতে ললাট ভ্রূকুটিবদ্ধ হ'ত—এই মাত্র। প্রতিবাদ কি তিরস্কার করতে পারতেন না, সেটুকু শক্তিও অবশিষ্ট থাকত না।

দেহের উপর অতিরিক্ত পীড়ন করলে সে দেহ এক সময় দেহীর উপর প্রতিশোধ তুলবে বৈকি!

রথযাত্রার পূর্বে যাত্রাশেষে তিন দারুমূর্তি যেখানে গিয়ে অবস্থান করবেন—সেই ইন্দ্রদ্যুম্ন-মহিষীর স্থাপিত ও নামাঙ্কিত 'গুণ্ডিচা বাড়ি' মার্জনা

ক'রে শ্রীভগবানের বসবাসযোগ্য ক'রে তুলতে হ'ত। অবশ্য বৎসরকালের আবর্জনা দূর করার প্রাথমিক কার্য পূজারীরাই করতেন—এই সময়টা দৈত্যপতি পাণ্ডাদেরই প্রাধান্য, সেবার ভার তাঁদের উপরই পড়ত। এঁরা সেই শবরদের বংশধর—যাদের ঘর থেকে রাজা স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে ওই দারুব্রহ্ম মূর্তি এনে এখানে স্থাপিত করেন।

কিন্তু তাঁদের মার্জনা প্রাথমিক, আরও একবার করার প্রয়োজন থাকত। সে প্রয়োজন সাধন করতেন ভক্তরা।

সাধারণ গৃহস্থের আবাসকে মালিন্য বা আবর্জনা কি ধূলি থেকে মুক্ত করা অনেক সময় কষ্টকর বলে মনে হয়, অনেকে সে কার্য হীন বলেও মনে করেন কিন্তু এখানে এ পরিশ্রম আনন্দের, কিছুটা গৌরবেরও। ফলে গুণ্ডিচা মার্জন একটা উৎসবে দাঁড়িয়ে গেছে। অদ্যাপি এই উৎসবানন্দ বজায় আছে—সাধু-গৃহী-যোগী-বৈষ্ণব নির্বিশেষে এই উৎসবে যোগ দেন।

রথে আরূঢ় হওয়ার পূর্বে জগমোহন থেকে এই মূর্তিত্রয়ের অবরোহণ বা পহুণ্ডিও এক বিশাল পর্ব। সে পথও নির্মল করা প্রয়োজন। সেখানে অগ্রণী হতেন রাজা স্বয়ং। এখন রাজ্য নেই কিন্তু সে পদবীধারী আছেন, রাজবংশের প্রধান যিনি, তিনিই এ পুণ্যকর্তব্য পালন করেন। গুণ্ডিচা বাড়ি পরিমার্জনার ভার ভক্তদের উপর।

এই গুণ্ডিচা-মার্জন কৃষ্ণপ্রাণের নিকট সত্যই সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব হয়ে উঠত। ওঁর প্রিয় ভক্ত ও সেবক এবং অপর বহু মঠের পূজারী বা সাধুদের সঙ্গে একত্রে কীর্তন, তদঙ্গ নৃত্য ও পরিমার্জনা চলত। জলকলস ও সম্মার্জনী নিয়ে তিনি বালকের মতো কৌতুক রঙ্গেও মেতে উঠতেন, প্রথম জীবনের মতোই চপল কৌতুক রঙ্গ, যাকে গ্রাম্যভাষায় বলে 'খুনসুটি' 'তামাশা'—নির্দ্বিধায় তাও করতেন।

এই মার্জনা শেষ হ'ত তৃতীয় প্রহরেরও শেষে। তখন নিজে আনন্দবাজারে গিয়ে সূপকারদের নিকট হতে প্রসাদ ভিক্ষা ক'রে এনে সমাগত স্বেচ্ছাকর্মীদের পরিতুষ্ট করে আহার করাতেন, অবশেষে নিজেও সে ভিক্ষা গ্রহণ করতেন।●

কীর্তন চলত এই উৎসবের সঙ্গেও—তার পরও যে কদিন প্রভু ওখানে অবস্থান করতেন—দিবাভাগে প্রথম প্রহরের মধ্যভাগ থেকে চতুর্থ প্রহর পর্যন্ত অবিরাম কীর্তন ও হরিনাম চলত। লোক বদল হ'ত—একদল দোহার বা বাদ্যকর ক্লান্ত হ'লে আর একদল স্থান অধিকার করতেন—কিন্তু নেতা বা মূল গায়েনের কোন ক্লান্তি কি অবসাদ দেখা যেত না। আহার-নিদ্রার প্রয়োজন, ক্ষুৎপিপাসা যেন সে উচ্চ হরিনামধ্বনির প্রাচীর উল্লঙ্ঘন ক'রে তাঁর কাছে আসতে সাহস করত না।

● কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত, শ্রীমৎ রামদাস বাবাজী মশাইয়ের অন্তর্ধানের কাল অবধি, এই গুণ্ডিচা মার্জনের আনন্দ-হুল্লোড়ের পর সমস্ত স্বেচ্ছাকর্মীদের বাবাজী মশাই প্রসাদ খাওয়াতেন। ঠিক বর্তমানে কি হয়—আমার জানা নেই। —লেখক

একবার এই কীর্তনোৎসবের মধ্যেই আবার একটি আঘাত পেলেন ঈশ্বর-সেবাকাঙ্ক্ষী প্রেমিক সন্ন্যাসী। একটিও বুঝি নয়, দুটি বলাই উচিত।

তবে সেটি এত মর্মান্তিক নয়।

প্রথমটিতেই ব্যর্থতার, সেই সঙ্গে প্রবঞ্চিত হওয়ার তীব্র দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন।

রথের সময় সেটা। প্রথামতো গুণ্ডিচাবাড়ির ভিতরে ও বাহিরে কীর্তন মহামহোৎসব চলছিল। নৃত্যও এ উৎসবের অঙ্গ। এ নৃত্য অন্তরের প্রেমানন্দে বুঝি আপনিই উৎসারিত হয়, 'নৃত্য করছি' এ জ্ঞান থাকে না তাঁদের।

সেদিন সে নৃত্যের নায়ক ছিলেন সোমেশ্বর নামে একটি উড়িয়া যুবা। রূপবান, যথার্থ নৃত্য-পারদর্শী। ভক্তিমান, কীর্তনেও পটু। নৃত্য কীর্তনের সঙ্গেই চলে।

তবু ভাবাবেগে নৃত্য করলেও নৃত্যরীতি কখনও লঙ্ঘিত হয় না। সেটা বুঝি স্বভাবের সঙ্গে জড়িত হয়ে গেছে। তাঁর সে অসামান্য দক্ষতা সকলেরই চোখে পড়ে। অথচ সে সময়কার আবেগও মিথ্যা নয়, প্রেমের একাগ্রতা ও তন্ময়তা থেকেই সে আবেগের জন্ম।

ইদানীং সোমেশ্বরকে কৃষ্ণপ্রাণের অন্তরঙ্গ সঙ্গীদের মধ্যেই গণ্য করা হ'ত। যেদিন বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে চারিদিক থেকে নাম-সঙ্গীতের সরোবর রচিত হ'ত সেদিন তিনি অন্য প্রধান ভক্তদের সঙ্গে এক দলের নায়ক রূপে কীর্তন ও তদঙ্গ নৃত্য পরিচালনা করতেন।

এইদিন সোমেশ্বর ছিলেন কৃষ্ণপ্রাণের সঙ্গী, সন্ন্যাসীর অতি নিকটে, প্রায় পাশাপাশি কীর্তন করছিলেন—যথারীতি নৃত্যের ভঙ্গিমাসহ।

সেদিন তাঁর সজ্জাও ছিল অপরূপ, ভুবনমোহনের মতোই ভুবন ভুলানো।

দর্শকদের মধ্য থেকেই কোন ভক্ত বা শৃঙ্গারী পূজক—তাঁকে পীত বসন পরিয়েছিলেন, পীত উত্তরীয়ও ছিল—ক্রমশ তা স্বেদসিক্ত হয়ে স্বচ্ছন্দ অঙ্গ-সঞ্চালনে বাধা সৃষ্টি করছিল—কোন ভক্ত তা উন্মোচন ক'রে সেই নৃত্যের মধ্যেই কটিবদ্ধ ক'রে দিয়েছে। কণ্ঠে স্বর্ণচম্পকের গুঞ্জমালা ; ললাট চন্দন-চর্চিত ; উন্নত সুঠাম নাসিকায় গোপীচন্দনের তিলক। চন্দনলেখা শ্রমজলে অনেকখানি বিগলিত বিধৌত হ'লেও যেটুকু তার চিহ্ন অবশিষ্ট আছে—চারুললাটে তাই এক আশ্চর্য সুষমার সৃষ্টি করেছে।

কীর্তন ও নৃত্যের মধ্যেই সোমেশ্বর এক সময় বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণের ভঙ্গিমায় নৃত্য আরম্ভ করলেন। কটিতট ঈষৎ বঙ্কিম, একটি পা আর একটি পায়ের উপর ন্যস্ত—তাতেও নৃত্যের বিরাম নেই—দুটি সুডোল হাত বংশীধারণের ভঙ্গিমায় উন্নত—সবটা মিলে মোহ সৃষ্টিরই তো কথা।

প্রেমোন্মত্ত মহাসাধকের চোখে সেই মুহূর্তে কল্পনা-বাস্তব এই পরিবেশ, মন্দির, অগণিত দর্শক—সব একাকার হয়ে যায়। তিনি অকস্মাৎ সোমেশ্বরের কণ্ঠালিঙ্গন ক'রে ঘন ঘন চুম্বন করতে থাকেন, আর তার মধ্যেই অশ্রু-আবেগ-গদ্‌গদ কণ্ঠে বলতে থাকেন, 'এলে ? এসেছ ? সত্যই কি তোমাকে পেলাম ?

তোমার নামামৃত তুমিই পান করছ, বিতরণ করছ? তৃপ্ত তুমি? আনন্দিত?'

বলতে বলতেই তিনি সোমেশ্বরের পায়ের কাছে বসে পড়ে তার পায়ে চুম্বন করতে চেষ্টা করেন।

সোমেশ্বরের যেন স্বপ্ন ভঙ্গ হয়ে যায়। একটা তন্দ্রার ঘোর থেকে জেগে ওঠেন তিনি, শিউরে ওঠেন। তিনিও বসে পড়ে বাধা দেন, গুরুর পায়ে মাথা রাখতে চেষ্টা করেন।

সঙ্গে সঙ্গেই স্বপ্নভঙ্গ হয়ে যায় কৃষ্ণপ্রাণেরও।

প্রচণ্ড মর্মান্তিক একটা আঘাত পান।

মনে হয় বুকটা শতধা বিদীর্ণ হয়ে যাবে এখনই।

যদি সত্যিই শ্রীকৃষ্ণ হবে ও--তবে ও আমাকে ভালবাসে না কেন? কেন ভক্তি করতে চায়?

কেন, কেন এভাবে আমাকে প্রবঞ্চিত করে আমার প্রিয়তম, এমন বার বার!...

শ্রান্ত, আশাভঙ্গে আরও দুর্বল সন্ন্যাসী প্রায় মূর্ছিত হয়ে পড়েন। ভক্তরা ধরাধরি করে নিয়ে এসে নিকটবর্তী বলগণ্ডী উদ্যানের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ছায়া-ঘন স্থানে শুইয়ে দেন, ব্যজন করতে করতে মৃদুকণ্ঠে কৃষ্ণনাম শোনাতে থাকেন।

কিছুক্ষণ পরে কৃষ্ণপ্রাণ কতকটা প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে প্রকৃতিস্থ, সম্বরণ ক'রে উঠে বসলেন, কিন্তু আর কীর্তনের মধ্যে ফিরে গেলেন না। বেশ কিছুটা সময় মৌন-মুদিত-নেত্র হয়ে বসে থেকে যেন এক উত্তাল আবেগসমুদ্রকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন।

তারপর কতকটা কৈফিয়ৎ দেবার মতোই বললেন, 'শ্রীকৃষ্ণর চরণ চুম্বন ক'রে যে আনন্দ—তা ব্রহ্মানন্দ থেকে শতগুণে শ্রেষ্ঠ।'

আবারও কিছু পরে বলেন, 'যাঁরা যোগের দ্বারা ব্রহ্মানন্দ আস্বাদ করেন, তাঁরা এই মাধুর্যের স্বাদ পান না। তাঁর হতভাগ্য।'

নবদ্বীপ থেকে ওঁর এক প্রধান সেবক তথা সঙ্গীর ছোট ভাই এল রথের সময়। নাম শিবনাথ। কিশোর বালক—পনেরো ষোল বছর বয়স। শান্ত নম্র স্বভাব, সদা প্রফুল্ল মুখ।

দেখা মাত্র স্নেহে প্রাণ ভরে উঠল কৃষ্ণপ্রাণের।

আহা-হা! এ যেন সেই গোষ্ঠপতি শ্রীকৃষ্ণ।

এই রকমই বুঝি রূপ ছিল তাঁর এ বয়সে।

প্রণত বালককে সবলে বুকে টেনে নিয়ে তার শিরশ্চুম্বন করলেন। তারপর সেবক বিষ্ণুকে ডেকে বললেন, 'একে সযত্নে লালন ক'রো। যেন কোন প্রকার দুঃখ বা ব্যথা না অনুভব করে। খাওয়াদাওয়ার যত্ন নিও। নিতান্ত বালক, লজ্জায় নিজে থেকে খাওয়ার কথা বলতে পারবে না। তোমরা সচেতন থেকে প্রয়োজনমতো সময়ে সময়ে এর আহারের ব্যবস্থা করবে।'

তারপর আবারও বলেন, 'এর অগ্রজের প্রতি আমার স্নেহ যেমন, তেমনি সম্ভ্রম ও ভক্তির ভাবও আছে। সে আমার সাধনার মর্ম বোঝে, সে সম্বন্ধে সদা সতর্ক। সে বিষয়ে আমার অভিভাবক সে। কিন্তু শিবনাথের কথা স্বতন্ত্র, এর সঙ্গে ভক্তি কি ভক্ত ওসব কিছু নয়—শুধুই প্রীতির, স্নেহের সম্পর্ক।'

এই ভাবে বার বার সতর্ক ক'রে দিয়েও যেন তৃপ্তি হয় না তাঁর। নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন না।

তাঁর দৈনিক সার্ধ ছয় প্রহর ব্যাপী অবিচ্ছিন্ন সাধক জীবনের মধ্যেও তিনি বালকের সংবাদ নেন। এক-একদিন নিজের ভোজনপাত্র থেকে স্বাদু প্রসাদ তুলে স্বহস্তে ওকে খাইয়ে দেন, ওর আহারের সময় সেখানে এসে দাঁড়ান; সেবকদের নির্দেশ দেন এটা ওটা এনে দিতে। কখনও কোন সুমিষ্ট প্রসাদ—মালপুয়া বা ক্ষীর বা অমৃতরসাবলী—নিজেই পরিবেশন করেন।

বস্ত্রাদি ঠিকমতো আছে কিনা, শয্যার ব্যবস্থা ঠিক হচ্ছে কিনা সে সংবাদ নেন।

শিবনাথ অভিভূত হয়ে পড়ে। এমন যত্ন এমন স্নেহ বোধ করি সে নিজের পিতামাতার কাছেও পায় নি।

বিশেষ এই সর্বজনপূজ্য মহাপুরুষ—স্বয়ং দোর্দণ্ডপ্রতাপ নৃপতি যাঁকে সাক্ষাৎ ভগবান রূপে দেখেন, এঁর দাসানুদাস হ'তে পারলে ধন্য মনে করেন—এমন প্রশ্রয় ও অতন্দ্র স্নেহদৃষ্টি দিয়ে তাকে আচ্ছন্ন করে রাখছেন—এ তো অচিন্তিত সৌভাগ্য!

সেও প্রাণপণেই—অন্তরের সহিত এ ঋণ শোধের চেষ্টা করে।

সর্বদা কাছে কাছে থাকে, ভালও লাগে এঁর কাছে থাকতে, এঁর কথা শুনতে। রাতে কৃষ্ণপ্রাণের অনিচ্ছা সত্ত্বেও অঙ্গসংবাহন, পদসেবা করে। গুরু অবশ্য বেশীক্ষণ থাকতে দেন না, কৃত্রিম কোপ প্রদর্শন ক'রে ওকে উঠিয়ে দেন, শয়ন করতে বলেন।

তবে তা সর্বদিন হয় না। একান্ত শ্রান্ত সন্ন্যাসী নিজেই তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। বালক নিশ্চিন্তে, সানন্দে সেবা ক'রেই যায়, খুব মৃদু লঘু হস্তে।

তারপর সেও একসময় নিদ্রাতুর হয়ে সেইখানেই—ওঁর পায়ের কাছে, কোন দিন বা পায়ের ওপরেই ঢলে পড়ে।

সন্ন্যাসীই অল্প পরে সচেতন হয়ে ওঠেন।

অবচেতনে—বালকের না কষ্ট হয়, অতি পরিশ্রমে তার বিশ্রামের না ব্যাঘাত ঘটে—সে চিন্তা তো থাকেই, সেইজন্য শ্রান্তি দুর্বলতাজনিত আচ্ছন্নতা গভীর নিদ্রায় পরিণত হতে পারে না।

কিন্তু শিবনাথ ঐ ভাবে পায়ের কাছে বা কোলের কাছে নিদ্রিত হয়ে পড়েছে দেখলে আর তার ঘুম ভাঙান না। বরং শীত করতে পারে এমন আশঙ্কা বোধ করলে নিজের একমাত্র কন্থাখানি দিয়ে সযত্নে তাকে আচ্ছাদিত ক'রে বাকী রাতটুকু নগ্নগাত্রেই থাকেন।

পরে বালকের নিদ্রাভঙ্গ হ'লে সে মৃদু অনুযোগ করে, কিছু অপ্রতিভ হয়

সম্ভবত—তবে খুব একটা অপরাধী বোধ করে না। অনুতাপও প্রকাশ করে না। বরং যেন এই করুণা বা স্নেহ সে সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে অনুভব করে, আস্বাদন করে।

অনুতাপে নয়—আনন্দেই তার চোখের দুই কূল প্লাবিত ক'রে অশ্রুধারা নামে।

সে চেষ্টা করে অধিকতর সেবা দিয়ে এই মহাঋণ শোধ করতে।

আনন্দিত হন, উপভোগ করেন কৃষ্ণপ্রাণও।

এক-একসময় এ চিন্তাও মনে দেখা দেয়—তবে কি তাঁর প্রাণসত্তাই এসেছেন?

কিন্তু তা কেমন ক'রে হবে!

এ তো ওঁকে পিতার মতোই দেখে।

ওঁরও যে এই উদ্বেলিত স্নেহ—সে তো বাৎসল্য ব্যতীত আর কিছু নয়।

বাৎসল্য প্রেমও বহু আকাঙ্ক্ষিত—তাঁর বন্ধু-উপদেষ্টা রাজ-দার্শনিক উচ্চাঙ্গের সাধনার মধ্যে এ রসকে স্থান দিয়েছেন।

এই সাধনাতেই তো বদ্ধ হয়ে ওঁর প্রিয়তম গোপের গৃহে ধরা দিয়েছিলেন, স্বেচ্ছায় বন্ধন শাসন মেনে নিয়েছিলেন—যশোদার স্তন্যপান ক'রে তাঁকে গর্ভ-ধারিণীর উপরে স্থান দিয়েছিলেন।

ভাল, খুবই ভাল—কিন্তু উনি যে চান কান্তারূপে তাঁকে ভজনা করতে, সেবা করতে—প্রেমিক, দয়িতরূপে তাঁকে পেতে।

হয়ত, যদি শিবনাথ ওঁর কাছে আবদার করত, স্নেহের অত্যাচারে অস্থির ক'রে তুলত, ওঁকে শাসন করত—কিছুটা মন ভরত!

তা পারে না শিবনাথ। সে চিন্তা তার সুদূর কল্পনারও অতীত।

সে ওঁর প্রতি ভক্তিতে আপ্লুত, অভিভূত।

সে চায় ওঁর দাসানুদাস হয়ে থাকতে।

ওঁর সামান্যমাত্র সেবার সুযোগ পেলেই নিজেকে কৃতার্থ বোধ করে সে।

সে ওঁকে সাক্ষাৎ জগন্নাথ বলেই মনে করে। যেন তার গুরু ও ঈশ্বর একাকার হয়ে গেছেন এই একটিমাত্র মানুষের মধ্যে।

তৃপ্ত হন বৈকি, বালকের এই অকৃত্রিম প্রেমে।

তবু ক্ষোভ, একটা হতাশাও বোধ না ক'রে পারেন না।

তিনি যে পূর্ণভাবে চান—এ তো সে বস্তু নয়।

॥ ২২ ॥

বালকটি কোথা থেকে কেমন ক'রে সন্ন্যাসী কৃষ্ণপ্রাণের এত কাছে এসে গেল—তা কেউ বুঝতেও পারে নি অনেক দিন পর্যন্ত। অত লক্ষ্যও করে নি। যখন সচেতন হয়ে উঠল ভক্ত-সেবকের দল, তখন তার অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত, ঘনিষ্ঠতা

বহুদূর অগ্রসর হয়ে গেছে।

উড়িয়া বালক, ব্রাহ্মণ, দশ-বারো বছর বয়স। শ্যামবর্ণ—আর একটু ঔজ্জ্বল্য থাকলে উজ্জ্বল-শ্যাম বলা যেত। শ্যামসুন্দর নাম।

এসব তথ্য সংগ্রহ করতে বিলম্ব হয়েছে। এসব এবং আরও ব্যক্তিগত তথ্য সংগৃহীত হয়েছে বেশ কিছুদিন পরে। ওর সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠার পরে তো আরম্ভই হয়েছে খোঁজখবরের।

নিঃসম্বল নির্বান্ধব বিধবার পুত্র। কেউ নেই, কিছুই নেই। মা স্থানীয় এক মন্দিরের দেবগৃহ ও নিত্য পূজা বা ভোগের ধাতুপাত্র মার্জনা ক'রে দুটি প্রাণীর জীবিকার সংস্থান করেন। তাতেও সব হয় না। ভিক্ষা দুঃখ ক'রে বাকীটা পূরণ করতে হয়।

তবু, অনুনয় বিনয় ক'রে এক চতুষ্পাঠীতে ছেলের শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন ওর মা মালতী। ব্রাহ্মণ-সন্তান অধ্যয়ন অধ্যাপনা পর্যন্ত যদিবা অগ্রসর হতে না পারে—যজন যাজন চালাবার মতো কিছু বিদ্যা তো প্রয়োজন।

কিন্তু সেটুকুও হয় নি। পাঠচর্চা আদৌ অগ্রসর হয় নি।

অধ্যাপক মালতীকে ডেকে বলেছেন, 'তোমার ছেলে তো মা যথেষ্টই মেধাবী, পাঠ একবার মাত্র বলে দিলেই ওর আয়ত্ত হয়ে যায়—কিন্তু এদিকে যে ওর কিছুমাত্র আগ্রহ নেই। তিরস্কার করলে, অনুযোগ করলে আমার মুখের ওপরেই বলে দেয়, "এসব বৃথা শাস্ত্রের কচকচি, কতকগুলো শব্দ-ঝঙ্কার, আমার ভাল লাগে না। যে আমাকে ভালবেসে ভালবাসার পথে আসল যা শিক্ষা তাই দেবে, সে-ই আমার যথার্থ গুরু, আমি তাকেই খুঁজছি।" একে কতদূর কি শিক্ষা দেব বলো!'

দুঃস্থা সহায়হীনা বিধবা জননী চোখের জল ফেলেন শুধু, ছেলেকে শাসন করতে পারেন না।

তিনিও এই ক'বছরেই ওকে চিনে নিয়েছেন। জোর ক'রে ওকে দিয়ে কিছু করানো যাবে না। আর শাসন করবেনই বা কি ক'রে—তিরস্কার করতে গেলেই দু'হাতে ওঁর গলা জড়িয়ে ধরে আদর ক'রে আদর আদায় ক'রে ওঁকে অভিভূত ক'রে দেয়, কটুবাক্য মুখে আসে না।

শ্যামসুন্দরের যেন সকলই অদ্ভুত। বা বলা চলে সব দিকেই অসাধারণ। সৃষ্টিছাড়া ছেলে সে।

আচরণ কথাবার্তা অনেক সময়ই দুর্বোধ্য বোধ হয়, হেঁয়ালির মতো শোনায়। কখনও বা মনে হয় ঐ বালকের দেহে কোন প্রবীণ জ্ঞানীর আত্মা নবজন্ম গ্রহণ করেছে। আবার এক এক সময় যখন আদরে আবদারে অত্যাচারে ওঁকে অস্থির করে তোলে তখন মনে হয়—বালকও নয়, এখনও শিশুই থেকে গেছে সে।

শাস্ত্রপাঠে মন নেই কিন্তু দেবতায় ভক্তি আছে।

তবে সে ভক্তিও ওর নিজস্ব পথ ধরে চলে।

মার সঙ্গে মন্দিরে গিয়ে গর্ভদেউলের সম্মুখের প্রাঙ্গণ বা জগমোহনের এক

কোণে বসে নির্নিমেষ-নেত্রে চেয়ে থাকে বিগ্রহের দিকে। ভিতরের অন্ধকারে সামান্য একটি প্রদীপের শিখার কম্পনে যে আলোছায়ার রহস্য—তার মধ্যেই কি জীবন্ত দেবতাকে খোঁজে? কে জানে!

তবে সেও যতক্ষণ পূজারী এসে তাঁর নিত্যসেবার নিয়মকার্যগুলি না আরম্ভ করেন ততক্ষণ পর্যন্তই। স্নান বা অবকাশ আরতি ইত্যাদি শুরু হয়ে গেলে যেন বিরক্তমুখে উঠে বাইরে চলে যায়। সে সময় কোন কোন দিন দ্রুত ছুটে সমুদ্রতীরে যায়, সেখানের বালুময় বেলায়, প্রখর রৌদ্র বা অশ্রান্ত বর্ষণ অগ্রাহ্য ক'রে, একদৃষ্টে সেই তরঙ্গভঙ্গের দিকে চেয়ে থাকে।

কেউ বলে ছেলেটা পাগল। কেউ বলে ওকে কোন দুষ্ট আত্মা ভর করেছে।

এক এক সময় মালতীরও যে সে আশঙ্কা হয় না তা নয়। সেই সব ক্ষণে শ্যামসুন্দর যেন অন্তর্যামীর মতো ওঁর মনোভাব বুঝে নিয়ে হেসে আশ্বাস দেয়, 'ভয় নেই মা, ভয় নেই। আমি পাগল হয়ে তোমার জ্বালা বাড়াব না। একদিন বুঝবে তোমার পুণ্যবলেই আমি তোমার কাছে এসেছি।'

কিছুই বোঝেন না মালতী। এটাও হয়ত প্রলাপ।

তবে বহু দুঃখের মতো এই দুশ্চিন্তাও ইষ্টকে নিবেদন ক'রে নিশ্চিন্ত হবার চেষ্টা করেন, তাঁর উপর পরিপূর্ণ নির্ভর করার প্রয়াস পান।

ছেলে যে আজকাল এ মন্দিরে আসে না, তা জানতেন। কিন্তু সমুদ্রতীরেও যে আর যায় না সেটা জানতেন না। অত মাথাও ঘামান নি। তাঁর ছেলে কোন কুসংসর্গে মিশবে না—এটুকু বিশ্বাস ছিল। সমবয়সী কারও সঙ্গেই ওর খাপ খায় না। সাধারণ ছেলেরা বা তরুণ যুবকরাও—যা সব আলোচনা করে তা ওর ভাল লাগে না। তাই সে নিঃসঙ্গ, বহুর মধ্যেও একা।

শিক্ষা বলতে যা বোঝায় তা পায় নি শ্যামসুন্দর—চতুষ্পাঠীর সঙ্গে সম্পর্ক অতি অল্প দিনেই শেষ হয়ে গেছে—এত কথাই বা সে শিখল কোথা থেকে! ওঁদের এই মন্দিরের পূজারী মধ্যে মধ্যে কোন বিশেষ পার্বণ উপলক্ষে কিছু শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন—সে সময় শ্যামসুন্দর গিয়ে পড়লে বিপর্যয় কাণ্ড ঘটে। মালতীর মনে হয়—ইচ্ছা ক'রেই সে যায় কখনও কখনও।

এই রকম অনভিপ্রেত ব্যাপার ঘটাবে বলেই।

পূজারী অপদস্থ হন, সেই কারণেই মালতীর লজ্জার শেষ থাকে না। তাঁর ভয়—পূজারী না মনে করেন এই ঘটনায় তাঁর কোন হাত আছে, পূজারীর এই অপদস্থ হওয়াটা তিনি উপভোগ করেন।

অথচ বার বার অনুযোগ করেও যে তিনি ছেলেকে নিরস্ত করতে পারেন না।

শ্যামসুন্দর এত জানলই বা কি ক'রে!

বক্তা যখন সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধার করেন—তখন হয়ত কোথাও কোন শব্দ বাদ পড়ে বা উচ্চারণে ত্রুটি ঘটে—তখন মুচকি হাসে বা মধ্যে মধ্যে তালুতে জিহ্বার সংযোগ ঘটিয়ে পরিতাপমূলক শব্দ করে। কিন্তু ব্যাখ্যার সময় সরব

হয়ে ওঠে, শব্দের অর্থ বা অপপ্রয়োগ ধরে—শ্লোকের ভাবার্থ ভুল প্রমাণ করতে চায়—পূজারীর অপ্রতিভতার শেষ থাকে না। অথচ যথেষ্ট অপমানিত বোধ করলেও বেশি কিছু বলতে পারেন না। কারণ মনে মনে অন্তত স্বীকার করতে বাধ্য হন যে এই বালকের ব্যাখ্যাই যথার্থ।

তাঁর এই নীরবতাতেই মালতী সে সত্য অনুভব করেন। চমকে ওঠেন। তাহলে কি গোপনে অন্য কোথাও গিয়ে পড়াশুনো করে!

মধ্যে মধ্যে ক্রুদ্ধ হয়ে তর্জন করেন, 'তুই কি আমার অন্ন বন্ধ করতে চাস?'

ছেলে নিশ্চিন্ত ভাবে বলে, 'ইস! তোমাকে কাজ ছাড়িয়ে দিয়ে দেখুক না। আমি সবাইকে বলে দেব ওর বিদ্যার দৌড়। বলব ভুল উচ্চারণ করে, বিকৃত ব্যাখ্যা—পূজার মন্ত্রও ঠিক বলতে পারে না—আমি ধরিয়ে দিই তাই আমার মাকে তাড়িয়েছে। দেখো, ও মুখ্য বামুনটা কিছু বলতে সাহসই করবে না।'

তাই এই ছেলে যে ঐ আশ্চর্য সন্ন্যাসীর সঙ্গ নেবে, তার অনুগামী হয়ে পড়বে—মালতী কখনও ভাবেন নি।

ছেলে যে দেববিগ্রহ বা সমুদ্রের দিকে চেয়ে গভীরভাবে কিছু ভাবার চেষ্টা করে—সে বিষয়ে ওর মা নিঃসন্দেহ হয়েছেন অনেক দিন আগেই। ঠিক কি চিন্তা করে তা অত ভেবে দেখেন নি—অত দূর ভেবে দেখার মতো তাঁর জ্ঞানও ছিল না, অবসরও না—তবে সে চিন্তা কোন আধ্যাত্মিক তত্ত্বের পথ ধরে চলে, এমনি একটা অস্পষ্ট ধারণা ক'রে নিয়েছিলেন।

তবে তার সঙ্গে ওর বর্তমান আচরণ—একে নেশা বললেও অত্যুক্তি হয় না—কোনক্রমেই তো মেলে না।

প্রচণ্ড নামকীর্তন, উদ্বাহু উদ্দণ্ড নৃত্য—এ তো সবটাই বাহ্য উচ্ছ্বাস। গভীরে ডুবে যাবার পরিবেশ এ তো নয়। এর মধ্যে তাঁর ছেলে আকৃষ্ট হয় কিসে?

এ সংবাদ অবশ্য আগে কেউ দেয় নি। তিনি নিজেই সচেতন হলেন ওর অনিয়মিত গৃহে ফেরায়। তাঁদের এই মন্দির থেকে দুজনের মতোই প্রসাদ পাওয়া যায়—কিন্তু ওখানের সব কাজ সেরে প্রসাদ নিয়ে গৃহে আসতে তৃতীয় প্রহরও উত্তীর্ণ হয়ে যায় এক-এক দিন। বস্তুত এই একবারই আহার করেন তাঁরা। রাত্রে প্রসাদ আসে সামান্যই—তা শ্যামসুন্দরই কিছু খায়, যা সামান্য উদ্বৃত্ত থাকে তাও পরের দিন তারই জলযোগে লাগে। 'সহ্য হয় না' এই অজুহাত দেখিয়ে মালতী রাত্রের আহার বন্ধই ক'রে দিয়েছেন।

এই সময়ও যদি শ্যাম না ফেরে—ক্লান্ত ক্ষুধার্ত জননী বসে থাকবেন—অষ্টপ্রহরের পর এই একবার মাত্র আহার—তাও বিলম্বিত হবে।

এই বিবেচনাতেই—যেখানেই যাক ঐ সময়ে সে ঠিক ফিরে আসে, বরং এক একদিন তাকেই অপেক্ষা করতে হয়—কোন কারণে বাড়তি কাজের চাপে মালতীর বিলম্ব হয়ে গেলে।

কিন্তু এখন এই নিয়মেরই ব্যতিক্রম ঘটতে লাগল। কোন কোন দিন সন্ধ্যা হয়ে যায়—অপরাহ্নিক কাজের জন্য অভুক্ত অবস্থাতেই মন্দিরে চলে যেতে হয় মালতীকে।

অনুযোগের উত্তরে বলে, 'না না, মন্দিরেই ছিলাম। অন্য কোথাও যাই নি।'

তারপর বলে, 'এক আশ্চর্য সন্ন্যাসী এসেছেন গৌড় থেকে, তিনি প্রতিদিন শ্রীমন্দিরে বহুক্ষণ ধরে নামকীর্তন করেন। কি আশ্চর্য তাঁর গলা—সবাই পাগল হয়ে যায়। কেউ কেউ বলে স্বয়ং ভগবানই শিক্ষা দিতে ভগবানের নাম-গান করছেন।...আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই রঙ্গই দেখি। অত খেয়াল থাকে না কত সময় গেল।'

আবার বলে, 'এত ভীড় জমে যায় শেষের দিকে—সবাই তো খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে ভগবানের নাম শুনতে আসে—গান না থামলে বেরুনো যায় না।'

এ সন্ন্যাসীর কথা মালতী আগেও শুনেছেন। এঁর কণ্ঠে এমনই নাকি জাদু—বহু বালক-কিশোর-তরুণ-যুবাকে ঘরের বার করেছে, রাজা রাজাপুত্রকে ভিখারী করেছে। সন্ন্যাসের কাঙাল হয়ে ওঠে তারা—গৃহের সহস্র সুখ, পিতামাতার স্নেহ, কিশোরী রূপসী বধূর বন্ধন—কিছুই তাদের ধরে রাখতে পারে না।

এ তাঁর ছেলেকেও শেষে সন্ন্যাসী করবে নাকি!

তাঁর যে একমাত্র সন্তান। ভবিষ্যতের আশাভরসা অবলম্বন বলতে ঐ এক।

উদ্বেগের সীমা থাকে না। কিন্তু কেমন ক'রে বাধা দেবেন তাও ভেবে পান না। অবসরও যে বড় স্বল্প। বহু কাজ এই দুটি হাতে সারতে হয়।...

তবু শেষ অবধি স্থির থাকা যায়ও না।

প্রতিদিনই যখন এমনি বিলম্ব ঘটতে লাগল, তখন আর নিষ্ক্রিয় থাকা সম্ভব হয় না।

ছেলেও তো সারাদিন বলতে গেলে অভুক্ত থাকে। সকালে খাওয়ার মধ্যে কোন দিন এক গাল 'পকাল' প্রসাদ, কিম্বা সাধারণত যা থাকে, এক আধটু মিষ্ট প্রসাদ—মোহনভোগ, খাজা, সে নামমাত্র। এতে ঐ ছেলের কি হয়। এখন উঠতি বয়স, বেশী করে খাওয়ার কথা।

অগত্যা পূজারীর কাছে বিস্তর অনুনয় বিনয় মিনতি ক'রে—সামান্য কিছুক্ষণের অবসর চেয়ে নিয়ে শ্রীমন্দিরেই গেলেন একদিন।

লোকারণ্য, জনসমুদ্র বলাই উচিত। তা ভেদ ক'রে এই আকর্ষণের কেন্দ্র-বিন্দুতে পৌঁছানো যাবে কি?

শেষে, প্রাণের দায়েই কতকটা, সকলকে ঠেলে সরিয়ে কোনমতে এগিয়ে গেলেন। সকলেই মুগ্ধ অভিভূত—কীর্তনরসে আপ্লুত বলেই অত কেউ লক্ষ্য করল না, বুঝল না। কোন কটূক্তিও তাদের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল না। এমন কি একটি অল্পবয়সী স্ত্রীলোক অগণিত পুরুষকে ঠেলে এগিয়ে গেল—তাতেও কারও বিরক্তি প্রকাশ পেল না। আসলে এদের কারও কোন বাহ্যজ্ঞানই নেই।

কিন্তু সে কেন্দ্রবিন্দুতে গিয়ে বুঝি তাঁরও চোখ বন্ধ হয়ে গেল।

শীর্ণ দীর্ঘদেহ এক মুণ্ডিতমস্তক গৈরিকবহির্বাসধারী সন্ন্যাসী আপনহারা হয়ে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে শ্রীকৃষ্ণের নামগান ক'রে যাচ্ছেন।

রূপযৌবন হয়ত এককালে ছিল, বয়সের হিসাবে আজও থাকার কথা—কিন্তু কিছুই নেই আর। তবু কি যে আছে—মনে হচ্ছে জ্যোতিঃ দিয়েই সেই অস্থিসার দেহ গঠিত, যেন কোন এক অগ্নি থেকে এ দেহ সংগ্রহ করা, সে অগ্নি হয়ত অন্তরেরই, তপস্যার—তবু তা প্রতিনিয়ত তাঁকে বেষ্টন করে আছে। এ যেন চলন্ত প্রজ্বলন্ত অগ্নিশিখাই। প্রভেদের মধ্যে এতে দাহ নেই, মাধুর্য আছে। স্নিগ্ধ শান্ত পবিত্র অগ্নি—একে অনুভব করা যায়, বর্ণনা করা যায় না।

ছেলেকে খোঁজার কথা মনেও রইল না মালতীর। তিনিও যেন কেমন বিহ্বল মূর্ছাহত হয়ে গেলেন কিছুক্ষণের জন্য। নিজের অজ্ঞাতসারেই ওষ্ঠ দুটি কম্পিত হতে লাগল, ক্রমশ সেই নামও উচ্চারিত হ'ল তা থেকে।

অবশেষে একসময়—প্রাণপণ শক্তিতেই যেন নিজেকে সম্বরণ করলেন।

ফিরে যেতে হবে। কর্মে বদ্ধ। জীবিকার জন্যই সে কর্ম। নিজের ও পুত্রের জীবনধারণের মতো দুমুষ্টি অন্ন—তাও পাবেন না, যথাসময়ে তাদের কাজ সেরে দিতে না পারলে।

চেয়ে দেখলেনও। কিন্তু এর মধ্যে কোথায় খুঁজবেন! সন্ন্যাসীকে ঘিরে আরও কিছু প্রবীণ ভক্ত—দোহার ও বাদ্যকর—যেন এক প্রাচীর রচনা ক'রে রেখেছে। তারপরই তো এই জনতরঙ্গ, ঐ প্রাচীরে আছড়ে পড়তে চাইছে—

এর মধ্যে সে শীর্ণ বালককে কোথায় খুঁজে পাবেন ?···

ব্যাকুলভাবে চাইতে চাইতে একসময় চোখে পড়ল। আছে সে, কাছেই আছে।

মন্থর গতিতে গায়কের দল অগ্রসর হচ্ছে ; মন্দির পরিক্রমাই উদ্দেশ্য, এর মধ্যে কয়েকবারই হয়ত হয়ে গেছে। গায়কদলের সঙ্গে সঙ্গে ভক্ত শ্রোতারাও চলেছে তেমনি মন্থর গতিতে, এক পা এক পা ক'রে—তারই মধ্যে সেও আছে, শ্যামসুন্দর।

সে নামগান করছে না। নৃত্যেও নিরত নয়—সে শুধু পলকহীন নেত্রে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ঐ সন্ন্যাসীর দিকে। চোখে জল নেই, ভঙ্গিতে ভক্তি-বিহ্বলতা নেই—অন্য শ্রোতা বা দর্শকদের মতো উন্মত্ত হয়ে ওঠে নি। নিঃশ্বাস পড়ছে কিনা তাও বোঝা যায় না তাকে দেখে। জীবনলক্ষণ বলতে কেবল ঐটুকু—পায়ে পায়ে অগ্রসর।

আশ্চর্য এই—সেই ঘনীভূত মানুষের মধ্যেও—কীর্তন-নায়ক ও তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে যেখানে অন্য ভক্তদের কোন প্রকার ব্যবধান সম্ভবই নয়—সেখানেও, তার মধ্যেও যেন একটু স্বাতন্ত্র্য রক্ষা ক'রে চলেছে ঐ বালক। সকলেরই আগে যাওয়ার আকৃতি বা চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও অন্য কোন ব্যক্তির আঘাত যেন তার গায়ে লাগছে না—যেন সকলেই, ওর সেই ধ্যানমগ্নতা পাছে

কারো রূঢ় আঘাতে নষ্ট হয় সেই ভয়ে, প্রাণপণে তার সঙ্গে দূরত্ব রক্ষা ক'রে চলেছে।

এদিকেও, বলতে গেলে সন্ন্যাসীর অতি নিকটেই আছে কিন্তু তাঁকেও স্পর্শ করার কি ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করছে না। মনে হচ্ছে নিজের চারিদিকে একটা ব্যবধানের বেষ্টনী রচনা ক'রে রেখেছে সে—এই চলার মধ্যেই। কী দেখলেন কে জানে—তবু যেন কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়েই কর্মস্থলে ফিরে গেলেন মালতী।

এখানেও সে আপন চিন্তাতেই ডুবে আছে, আপন হিসেবনিকেশ—যেমন অন্যত্র, বিশেষ শ্রীমন্দিরে বা সমুদ্রতীরে থাকে।

এ কীর্তন-সাগরের প্রচণ্ড তরঙ্গাভিঘাত সকলই অভিভূত প্লাবিত করলেও তাঁর বালক পুত্রকে বিচলিত করতে পারে নি।

সন্ন্যাসী হয়ে চলে যাবে সেরকম কোন লক্ষণ ওর মধ্যে নেই।

আবার সে নিশ্চিন্ততার ভিতর একটা আশঙ্কাও মনে উঁকি মারে—সত্যই কি কোন প্রবীণ জ্ঞানীর আত্মা দেহ ধারণ ক'রে এসেছে তাঁর গর্ভে ?

এত নিজস্ব বিচার বিবেচনা, চিন্তার উপাদান এই বয়সেই কোথায় পেল সে ?

সাধারণ মানুষের ক্রিয়াকর্ম পূজাপাঠ ভক্তি—সকলের সম্বন্ধেই যেন একটা ঔদাসীন্য বা অবহেলা। কেন ?

॥ ২৩ ॥

অন্তরঙ্গতা না হোক—ঘনিষ্ঠতাটা একদিন হয়ে গেল আকস্মিক ভাবেই।

যে প্রধান ভক্ত বা অনুচরের দল সর্বদা যেন একটা বেষ্টনীতে ঘিরে রাখত, তারা কোন বাধা দেবার সময়ই পেল না।

শ্রাবণের শেষ, ঝুলন পর্ব চলছে। উৎসবসজ্জায় মন্দির আর মন্দিরের দেবতা অপরূপ রূপ ধারণ করেছেন। পুষ্প কদলীকাণ্ড এবং সোলার কাজে যে এমন সৌন্দর্য আনা যায় পাষাণ দেউলে আর দারুমূর্তিতে—তা চাক্ষুষ না দেখলে বিশ্বাস করা তো কঠিন বটেই, বোধ করি কল্পনাতেও আনা যায় না। সব চেয়ে—মনে হয় দারুব্রহ্মদেবেও সে উৎসবের রঙ লেগেছে, মেতে উঠেছেন তিনিও। মনে হচ্ছে কাষ্ঠও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

মেতে উঠেছেন সন্ন্যাসী কৃষ্ণপ্রাণও। প্রভুর আনন্দেই যে তাঁরও আনন্দ।

মহাপ্রভুর এই ভুবনমোহন রূপসজ্জা—প্রদীপশিখার নর্তনে ছায়াতে আলোতে যা সজীব হয়ে উঠেছে—মনে হচ্ছে কণ্ঠের গুঞ্জামালা কোন অদৃশ্য মধুর বাতাসে হিল্লোলিত হচ্ছে, দৃষ্টিতে যেন মদির কৌতুক—সব মিলে সন্ন্যাসীর প্রেমোন্মত্ততা বাড়িয়ে দিয়েছে।

ফলে উপবাসক্লিষ্ট এই ক্ষীণদেহে কতটা উত্তেজনা আবেশ ও পরিশ্রম সহ্য হয়, সে হিসাব আর ছিল না। প্রভাতের নিজকৃত্য জপধ্যানাদি ঊষাতেই সম্পন্ন হয়ে গেছে—তখনই বেরিয়ে পড়েছেন তিনি শ্রীমন্দিরের উদ্দেশ্যে, তাঁর মধুর

গম্ভীর কণ্ঠের নামগানে পদে পদে কীর্তনের দল সংগঠিত হয়েছে, ছুটে এসেছে সঙ্গী অনুচর সেবক এমন কি পথিকের দলও—সে কীর্তনে যোগ দিতে। সেবক বিষ্ণু যাত্রার প্রাক্কালে একটু প্রসাদ মুখে দিয়ে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করাতে কণামাত্রই মুখে দিয়েছেন—বস্তুত উপবাসীই আছেন তখনও পর্যন্ত।

সময় বড় কম অতিবাহিত হয় নি এর ভিতর।

তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, অপরাহ্ন সমাগতপ্রায়। অন্য সঙ্গীরা কেউ কেউ অবসন্ন হয়ে বসে পড়েছেন মধ্যে মধ্যে—সমাগত নামকীর্তন-পিপাসুদের মধ্যে থেকে কোন কোন সজ্জন ডাবের জল এনে মুখের কাছে ধরতে তা পান করেছেন—প্রধান গায়ক-নর্তক সোমেশ্বরকে তো রাণী স্বয়ং ডাবের সঙ্গে মুখে মিষ্ট প্রসাদও দিয়েছেন—কিন্তু কৃষ্ণপ্রাণের বিরামও নেই বিশ্রামও নেই। তিনি বাহ্যজ্ঞানহীন, উন্মত্ত।

তবে দেহ দেহই, জীববিজ্ঞানের নিয়মে বাঁধা। তার অত্যাচার সহ্য করার সীমা আছে—একসময় অতর্কিতেই তা ভেঙে পড়ল। মাথা ঘুরে মূর্ছিতের মতো পড়ে যাবার উপক্রম হ'ল।

ঠিক সেই সময়টাতে কেউ একেবারে পাশে ছিল না।

প্রস্তুতও ছিল না কেউ এমন ঘটনার জন্য। কৃষ্ণপ্রাণের অস্থি দধীচির মতোই বজ্রকঠিন বুঝি; তাঁর দেহ মানবাতীত কোন উপাদানে নির্মিত, ক্লান্তি ব্যাধি জরা কোনদিন তাঁর উপর প্রভুত্ব স্থাপন করতে পারবে না—এমনিই একট ধারণা হয়ে গিছল।

শ্যামসুন্দরও একেবারে নিকটে ছিল না।

তবে সে লক্ষ্য করছিল। একদৃষ্টেই চেয়ে ছিল, লক্ষ্যও রেখেছিল।

দেহ টলছে, কণ্ঠস্বর জড়িমাচ্ছন্ন হয়ে আসছে—অর্থাৎ সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছে—এটা সে বুঝেছিল। তাই পতনের উপক্রম মাত্রেই সে এগিয়ে গিয়ে ধরে ফেলল। বাধাও ছিল না, কোন এক আশ্চর্য কৌশলে অথবা দৈবক্রমে—জনতার ঐ বিপুল ঘনবন্ধতার মধ্যেও নিজেকে একক রাখছে সে এই ক'দিনই।...

পতনের প্রথম বেগটা সম্পূর্ণ ঐ বালকই সামলে নিল। তবে অত দীর্ঘ দেহকে বেশীক্ষণ ধরে রাখা হয়ত সম্ভব হ'ত না—বা সযত্নে, ধীরে ধীরে—আঘাত না লাগে পাথরের ওপর পড়ে, এমনভাবে—শুইয়ে দেওয়া।

তবে তার প্রয়োজনও ছিল না। অনুগামী প্রধান সহচররা সেই, প্রায় এক নিমেষপাত সময়ের মধ্যেই এসে শ্যামসুন্দরের সঙ্গে সে বরদেহ ধারণ করেছে—বালকের হাতও সরিয়ে দিতে বিলম্ব হয় নি।

অতঃপর কিছুদূরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। বাতাস করা, স্বেদ-মোচন, শেষ পর্যন্ত মহাপ্রভুর পকাল ভোগের 'তোড়ানি' বা আমানি ঈষৎ পান করানো—যাতে তৃষ্ণা নিবারণের সঙ্গে কিছু খাদ্যও দেহে যায়—এক কথায় সেই অবসন্ন মূর্ছাতুর দেহে চেতনার সঙ্গে ঈষৎ শক্তি ফিরিয়ে আনার কোন ব্যবস্থারই ত্রুটি ঘটে নি।

এর মধ্যে—উদ্বেগাকুল সঙ্গী ও ভক্তবৃন্দের ঠেলাঠেলিতে—সে বালকের খোঁজ আর কে রাখবে!

সদাসতর্ক অন্তরঙ্গদের সামান্যমাত্র অসতর্কতায় যে মহাসর্বনাশ হয়ে যেতে পারত, ঐ অজ্ঞাতপরিচয় বালকটির জন্যই তা হয় নি—লজ্জিত অনুতপ্ত সঙ্গীরা এ তথ্য বিলুপ্ত করার জন্যই ব্যস্ত, ব্যগ্র। তাঁরা সে বালকের খোঁজ করবেন কি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবেন তা সম্ভব নয়।

শুধু কৃষ্ণপ্রাণ সামান্য একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠলে—তখনও উঠে বসার মতো শক্তি আসে নি দেহে—একবার প্রশ্ন করলেন, 'কে আমাকে প্রথম ধরেছিল বলো তো? সে কোথায়?'

রঘুনাথ বললেন, 'কি জানি, গান আর হবে না দেখে সে বোধ হয় বাড়ি চলে গিয়ে থাকবে। সে বালক পরিচিত কারও সন্তান নয়, চিনি না তাকে। তবে এ ক'দিন আসছে এটা লক্ষ্য করেছি।'

'বালক!' কৃষ্ণপ্রাণ যেন একটু বিস্মিত হলেন, 'আমি চেয়ে দেখতে পারি নি—তবে আমার মনে হ'ল উচ্চাঙ্গের ভক্ত কেউ হবেন—তেমনিই পুলকানুভূতি হয়েছিল, তেমনিই শিহরণ জেগেছিল দেহে—ভক্ত-সংস্পর্শে যেমন অনুভূত হয়।'

অনাবশ্যক বোধেই সম্ভবত কেউ এ কথার কোন উত্তর দিলেন না।

তবে রঘুনাথ আচার্যের অনুমান সত্য নয়।

সে বালক গৃহে ফেরে নি। গান বন্ধ হয়েছে বলে ফিরে যাবে, এই কীর্তন গানে এমন আসক্তি তার ছিল না, থাকার কোন কারণ নেই। প্রধান কীর্তনীয়া সম্বন্ধেই তার আগ্রহ, কৌতূহল।

কৌতূহল অবসানে ফিরে যাওয়ারই কথা হয়ত। সাধারণ কোন অল্পবয়সী বালক হ'লে তাই যেত—সেও তখনও পর্যন্ত অভুক্ত, ক্ষুধার্ত—তা যায় নি।

তবে সবাইকে ঠেলে সরিয়ে এদের মধ্যে গিয়ে নিজের পরিচয় দেবার মতোও সাধারণ সে নয়। এই তুচ্ছ কৃতিত্বের জন্য মনোযোগ আকর্ষণ করা কি কৃতজ্ঞতা দাবি করার মতো প্রবৃত্তিও তার নেই।

সে কিছু দূরে গিয়ে লক্ষ্মীর মন্দিরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে স্থিরভাবেই দেখছিল এঁদের। তারপর কৃষ্ণপ্রাণ আরও একটু সুস্থ হতে যখন সকলে ধরাধরি ক'রে তুলে প্রায় বহন ক'রে তাঁর কুঠিয়ার উদ্দেশে যাচ্ছেন তখন দূর থেকেই তাঁদের অনুগমন করেছে।

আজ সে প্রভাতে যাত্রাই করেছে মন স্থির ক'রে—দৃঢ় সংকল্প নিয়ে। এ ঘটনা না ঘটলেও সে গৃহে ফিরত না, সন্ন্যাসীরই অনুগমন করত।

মাকে বলে আসা যায় নি। মা কাঁদাকাটা করতেন, তাকে ছাড়তেন না। তবে প্রতিবেশিনী এক বৃদ্ধাকে বলে এসেছে—'কদিন আর আমি ঘরে ফিরব না, মাকে বলে দিও। মা না ভাবে—খাওয়াদাওয়া না বন্ধ ক'রে দেয়। আমি যেখানে যাচ্ছি খাওয়ার অভাব হবে না।'

এ-ই মাত্র। আর কোন তথ্য জানায় নি ইচ্ছে ক'রেই।

ঘটনাস্রোত বা ভাগ্যস্রোত তাকে কোন্ পথে নিয়ে যাবে তা তো সে নিজেও জানে না।

সন্ন্যাসী তাঁর কুঠিয়ায় পৌঁছে আরও কিছুক্ষণ বিশ্রাম করবেন এই ইচ্ছা ছিল।

সন্ধ্যা আগত—সান্ধ্যকৃত্য না ক'রে কিছু আহার করা অকর্তব্য। জগন্নাথের প্রসাদ সর্বদা সর্ব অবস্থায় গ্রহণ করা যায়—তা তিনি জানেন কিন্তু সান্ধ্যকৃত্য না সারলেও অপরাধ হবে—এমনি একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে। মনে স্বস্তি পাবেন না সে কৃত্য সমাপন না করলে।

তা ছাড়া, বিষ্ণুও বলেছে, 'মহাপ্রসাদ আছে সকলের মতোই—কিন্তু রাজার সূপকার বলে দিয়েছেন, এখনই মধ্যাহ্ন ধূপের ভোগ লাগবে, ভোগ সরা মাত্র তিনি পাঠিয়ে দেবেন। যদি এখনই প্রসাদ না পেতে চান তাহলে সেই প্রসাদই সেবা করবেন।'

সেই ব্যবস্থাই স্থির হয়েছে, কৃষ্ণপ্রাণ জপে বসবেন—কুঠিয়ার বাইরে কিছু বচসার শব্দ পাওয়া গেল। একদিকে পরিচিত কণ্ঠস্বর সব—ওঁরই অনুরাগী অনুগামীর দল—আর একদিকে একটি বালককণ্ঠ, বাঁশীর স্বরের মতোই সুমিষ্ট এবং তেমনই তীব্র।

কিন্তু তখন সঙ্কল্প ক'রে নিয়মসেবায় বসেছেন, জপে নিমগ্ন হয়ে গেলেন। কোন প্রশ্ন উত্তরের সময় নয় সেটা। মন পূজা জপে নিবিষ্ট হ'লে আর কোন শব্দ কর্ণগোচর হয় না। তবু কথাটা মনে ছিল। সাধারণত থাকে না। জপে মন দিলে আর সব প্রসঙ্গই স্মৃতি থেকে মুছে যায়—কেউ স্মরণ করিয়ে না দিলে মনে পড়ে না—তবু আজ মনে ছিল।

বোধ হয় তাঁর মন তেমনভাবে অন্তর্মুখী হতে পারে নি। কেন? সে তাঁর কাছেও দুর্বোধ্য।

জপের মালা কণ্ঠলগ্ন ক'রে বাগ্‌বিতণ্ডাটা কিসের জানতে চাইলেন কৃষ্ণপ্রাণ।

সোমেশ্বর এসে তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন, 'সেই ছেলেটা, যে আপনাকে তখন ধরতে গিয়েছিল—সে ভেতরে আসতে চায়।'

ধীর ভাবে প্রশ্ন করলেন কৃষ্ণপ্রাণ, 'তার পর?'

'কত ক'রে বোঝালাম আমরা', রুষ্ট কণ্ঠে শিবনাথ বলে উঠল, 'সন্ন্যাসীর কুঠিয়াতে প্রবেশ করতে নেই, সে সম্ভব নয়। তদ্ব্যতীত আপনি নিরতিশয় ক্লান্ত, এখন কথা বলারও অবস্থা নেই—কিন্তু সে এসব কোন কথাই শুনতে প্রস্তুত নয়। তার কি স্পর্ধা, বলে যা শোনবার আমি তাঁর মুখ থেকেই শুনব, তোমরা কে? সে ঐ বাইরেই অনড় হয়ে বসে আছে, বলছে আমি দেখা না ক'রে যাবো না, যদি সারারাত এখানে বসে থাকতে হয় তাই থাকব। দরকার হয় তো—এমনি আরও অনেকদিন অনাহারে ধরণা দিয়ে অপেক্ষা করব তাঁর—তিনি দেখা না দিয়ে থাকবেন কেমন ক'রে দেখি!'

সোমেশ্বর আবারও পূর্ব বক্তব্যের সূত্র গ্রহণ করেন, 'ব্রাহ্মণের ছেলে, গলায়

উপবীত রয়েছে দেখছি—কিন্তু কোন বিদ্যাভ্যাস কি শাস্ত্রচর্চা করেছে বলে মনে হয় না। মূর্খ তো বটেই—উদ্ধত আর দুর্বিনীতও।···থাক বসে, কত দিন উপবাস ক'রে থাকতে পারে দেখি!'

'না না, ছিঃ!' কৃষ্ণপ্রাণ বলেন, 'ছেলেমানুষ, অকারণে ওর ওপর রূঢ় হয়ো না।···আর, ধরে ফেলতে গিয়েছিল বলছ কেন, ধরে ফেলেছিল—সেটুকু আমার মনে আছে। ওর স্পর্শে আমার দিব্য পুলকানুভূতি হয়েছিল—নিশ্চয়ই ওর সত্ত্বগুণের দেহ। ওকে নিয়ে এসো এখানে।'

অগত্যা পথ ছেড়ে ভেতরে আসতে দিতে হয়।

শ্যামসুন্দরের এটা বড় একটা জয়লাভ—কিন্তু সে বিজয়গর্ব বা অহঙ্কার কিছুই ওর মুখে-চোখে প্রকাশ পেল না। কারও দিকে চাইলও না। সোজা—যেন মনে হ'ল এমন বহুবার এখানে এসেছে সে, এ সবই ওর পরিচিত—ঘরে ঢুকে ওঁর কাছে বসে, প্রণাম করার চেষ্টা করল না, একেবারেই পায়ে হাত দিল, পায়ের গোছ থেকে পায়ের তলা পর্যন্ত হাত বুলোতে লাগল। আস্তে। ওর কোমল হাতের সেবা বা ওর স্পর্শেই আবারও যেন রোমাঞ্চ জাগল সন্ন্যাসীর দেহে।

তবে সে অনুভূতির কথা চিন্তাও করার সময় পেলেন না কৃষ্ণপ্রাণ, শ্যামসুন্দর বসার সঙ্গে সঙ্গেই যেন অভিমানে ফেটে পড়ল, 'আমি তোমার কাছে আসতে চাই, তোমার কাছে থাকতে চাই—ওরা আটকাবে কেন? তুমি কি ওদের কেনা সম্পত্তি?'

পুলকানুভূতির মাধুর্য, ওর কোমল হাতের স্পর্শ—ওঁকে দ্রবীভূত ক'রে এনেছে ততক্ষণে, সেই সঙ্গে মনে বিপুল একটা স্নেহস্ফুরণ চলছে ওঁর।

উনি শ্যামসুন্দরের পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'তুমি ছেলেমানুষ, আমি বয়স্ক সন্ন্যাসী, আমাকে দেখতে চাও কেন? আমার কাছে এসেই কি তোমার ভাল লাগবে! ইহজীবনের আনন্দ তোমার চারিদিকে—তুমি এই বদ্ধঘরে এসে কি করবে?···আর তোমার অল্প বয়স—তোমার তো এখন পাঠাভ্যাস করার কথা। তুমিই বা এভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন? কোথায় থাকো তুমি? বাবা কি করেন? তোমার মুখ দেখে তো মনে হয় এখনও কিছু খাও নি। তাঁরা হয়ত কত ভাবছেন!'

কুঠিয়া ছোট, সেখানে অধিক লোকের প্রবেশ সম্ভব নয়। সেবক সঙ্গীরা দরজার কাছেই ভীড় ক'রে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁরা রীতিমতো বিস্মিতই হলেন। কত কাল এমন সহজ, গৃহীজনোচিত কথা ওঁর মুখে শোনেন নি তাঁরা!

আরও বিস্মিত হলেন তাঁরা ছেলেটির উত্তর শুনে।

'ভাল লাগবে বলেই তো এসেছি। আসতে চাই। কার কিসে ভাল লাগে কেউ কি বলতে পারে? শুনেছি তো তুমি মহাপণ্ডিত—সব ছেড়ে ভিখিরী হতে ভাল লাগল কেন? ভাল লাগে বলেই তো রোজ তোমাকে দেখার জন্যে মন্দিরে আসি।'

তারপর একটু থেমে বলে, 'খাওয়া হয়ই নি তো। এমনিই তো একবেলা

খাওয়া—বাবা নেই, মা এক মন্দিরে কাজ করে, যা পায় দুজনের একবেলার বেশী খাওয়া হয় না। তাই দেরি ক'রেই খাই। বিকেলে না হয় সন্ধ্যেয়। যখন হোক খেলেই হ'ল।'

'ও, তোমার বাবা মারা গেছেন ? তাই এমন ক'রে ঘুরে বেড়াও, দেখবার কেউ নেই বলেই—। তা তুমি ব্রাহ্মণসন্তান—পুজোর্চনার কাজ কিছু কিছু শিখে নাও না কেন ? পুজারীর প্রয়োজন তো হয়ই—এত মঠমন্দির এখানে।'

'ও সব কাজ আমার ভাল লাগে না। নিজের কাজ করি সে আলাদা কথা —ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে দেবসেবা বিক্রী করব! আর নিজের ভাতের জন্যে করলেই ফাঁকি দিতে ইচ্ছে করবে, মন থাকবে কখন লোক-দেখানো পুজো সেরে এখান থেকে বেরিয়ে পড়তে পারব ! যে মজুরীর জন্যে এ কাজ করা—সেটুকু পাবার মতো লোক-দেখানো কাজে তাদের তুষ্ট ক'রে বেরিয়ে পড়া.। দেবতাকে ফাঁকি দিয়ে জীবন কাটাতে চাই না, ও তো মহাপাপ !'

সেবক বিষ্ণু আর অপেক্ষা করতে প্রস্তুত নন। তিনি কিছু বিরসমুখেই বললেন, 'প্রভুর ভিক্ষা নেবার সময় উত্তীর্ণ হতে বসেছে। এখানেই কি গ্রহণ করবেন ?'

কৃষ্ণপ্রাণ একদৃষ্টে ছেলেটির দিকে চেয়ে ছিলেন। এতটুকু বালকের মুখে—ঠিক কিশোরবয়সীও বলা যায় না, ও বালকই—এমন কথা কখনও শোনেন নি। এ যেন বালকের দেহে কোন জ্ঞানবৃদ্ধ কথা বলছে।

তিনি এবার মুখ ফিরিয়ে বিষ্ণুর দিকে চেয়ে বললেন, 'দুজনের মতোই নিয়ে এসো। এ ছেলেটির পাতাও এখানে দাও। তোমার নাম কি বাবা ?'

'শ্যামসুন্দর !'

'শ্যামসুন্দর ! শ্যামসুন্দর !' মৃদুকণ্ঠে নামটি বার দুই উচ্চারণ ক'রে কেমন যেন উন্মনা হয়ে যান।

কে জানে কেন, বহুদিন পূর্বের এক বিস্মৃত ঘটনা মনে পড়ছে বার বার। এমনি আর একজনের কথা। সেই যে ছেলেটি, গয়াতে তিনি গুরুকে ভিক্ষা দেবেন বলে রন্ধন করছিলেন—তাঁকে সন্ন্যাসের নিয়ম সম্বন্ধে সচেতন ক'রে দিয়ে চলে গিয়েছিল।

তারও এমনি স্পষ্ট স্পষ্ট কথা।...

এক অজ্ঞাতকুলশীল এদেশী বালক, মূর্খ—তা তো বোঝাই যায়, দীন অবস্থা, নগ্ন দেহে একটা উত্তরীয় পর্যন্ত নেই—তাকে এতদূর প্রশ্রয়দানে ভক্ত অনুচরের দল সন্তুষ্ট হতে পারলেন না।

অথচ কিছু বলতেও সাহস হয় না। কৃষ্ণপ্রাণ বিরক্ত হলে আর রক্ষা নেই—আজকের মতো আহার তো ত্যাগ করবেনই—হয়ত এদের সকলকেই ত্যাগ ক'রে অন্য কোথাও চলে যাবেন।

একবার এক ভক্তের জন্য অনুনয় করতে গিয়ে এমনি ঘটনা ঘটেছিল ; কোমল শয্যার প্রশ্নেও—পুরী ছেড়ে আলালনাথে গিয়ে একা বাস করবেন বলেছিলেন॥

তবু, আরও কিছু বিস্ময়াঘাত, বালকের অবিশ্বাস্য স্পর্ধার পরিচয় লাভ ভাগ্যে ছিল তাঁদের।

বিষ্ণু এসে সেই স্বল্পপরিসর স্থানেই দুটি কদলীপত্র পেতে রেখে প্রসাদ আনতে যাবেন, শ্যামসুন্দর বেশ উচ্চকণ্ঠে পরিষ্কার বলে উঠল, 'আমি কিন্তু তোমার কাছে থাকব, যতদিন আমার ইচ্ছা। যদি থাকতে না দাও আমি কিছুই খাব না। শুধু এখানে বা আজ নয়—আর কোনদিনই খাব না। না খেয়ে এখানেই দেহপাত করব। এরা যদি জোর ক'রে বাইরে ফেলে দেয়—রাস্তাতেই পড়ে থাকব, সেখানেই মরব। আমি মিথ্যে কথা বলি না, তোমাকে ছুঁয়ে তো বলবোই না। আমার যে কথা সেই কাজ।'

এবার কৃষ্ণপ্রাণেরও বিচলিত হয়ে ওঠার পালা।

'আরে না না। এসব কি বলছ। সে কখনও হয়। তুমি এখানে থাকবে কি। তোমার মা আছেন গৃহে—'

'মাকে আমি বলে এসেছি।' নিশ্চিন্ত ভাবে বলে শ্যামসুন্দর।

'তা হোক, তুমি থাকবে কি ক'রে। সন্ন্যাসীর কুঠিয়ায় কারও থাকা সম্ভব নয়। থাকতে নেই।'

'কেন নেই? কে বলেছে? শুনেছি মেয়েছেলেকে আসতে নেই, থাকতে নেই। আমি তো পুরুষ। তাও মেয়েদের এলে কি এমন ক্ষতি তা জানি না। নিজের সন্ন্যাস নিজের কাছে। মেয়েছেলে কাছে এলেই সন্ন্যাস নষ্ট হবে?'

বাইরে দু'একজন ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলাবলি করতে লাগল, 'এ ছেলের তো দেখছি এই বয়সেই কিছু জানতে বাকী নেই। এত পরিপক্ক হ'ল কি ক'রে? এ ছেলে ভাল নয়, প্রভু বুঝছেন না, বেশী প্রশ্রয় দিলে বিপদে পড়বেন।'

'তা নয়', আরও কি কোমল হয়ে আসে কৃষ্ণপ্রাণের কণ্ঠ? বলেন, 'ধ্যান তপস্যা জপ—এসব সময়ে সাধকদের নির্জনতা প্রয়োজন। এটা বোঝ না কেন? তুমি তো অনেক কিছু জান দেখছি, এটাও জানা উচিত। আর এইটুকু ঘর, এর মধ্যে একজনের বেশী লোক এলেই জনতা বলে মনে হয়, অস্বস্তি হতে থাকবে, নিজের চিন্তায় মন বসবে না।'

'বেশ, তুমি কথা দাও জপধ্যানের সময় ছাড়া অন্য সময় ইচ্ছামতো আসতে পারব—তাহলে আমি একটুও বিরক্ত করব না, এ ঘরের ত্রিসীমানায় আসব না। এই তো তোমার এত সেবক শিষ্য দেখছি—এরা তো বেশ আসে, তোমার জপ-তপের সময়টুকু বাদ দিয়ে সব সময়ই আসা যাওয়া করে—তার মধ্যে আমি এলে এমন কি ক্ষতি!'

বাহির থেকে কে যেন বলল, 'এত দেখল ও কখন? ওকে তো আমরা এখানে কোনদিন দেখি নি!'

কিন্তু সে কথায় কেউ উত্তর দিল না। এঁরা কেউ শুনলেন কিনা তাও বোঝা গেল না।

কারণ ততক্ষণে বিষ্ণু প্রসাদ নিয়ে এসে গেছেন।

দুটি পাতাতেই প্রসাদ সাজিয়ে দিলেন। সন্ন্যাসীর পাতে শুধু অন্ন ও

ব্যঞ্জন। ছেলেটির পাতায় একাধিক ব্যঞ্জন, কিছু কিছু মিষ্ট প্রসাদও।

কৃষ্ণপ্রাণ তখনও পাতায় হাত দেন নি। ধীর ভাবে বললেন, 'তোমারই বা কি লভে হবে বলো। আমি এই কঙ্কালসারমাত্র বৃদ্ধ, ইহলোকের সঙ্গে সম্পর্কই ঘুচে গেছে—তুমি অল্পবয়সী বালক—আমার সঙ্গ তোমার ভাল লাগবে না। তুমি গৃহে ফিরে যাও, যখন মনে হবে এসো।...এখন প্রসাদ গ্রহণ করো, প্রসাদে বিলম্ব করতে নেই—প্রাপ্তিমাত্রেণ ভক্ষয়েৎ!'

'না, আমি মুখে জলও দেব না, তুমি কথা না দিলে। কার কিসে আনন্দ হয়, কাকে কার ভাল লাগে কে বলতে পারে? তুমি সন্ন্যাস নিয়ে আনন্দ পেয়েছ, কই আরও তো কত লোক আছে, তারা তো নেয় না। কত লোক অনেকগুলো বিয়ে করে—অনেক ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসার—তাতেই তাদের আনন্দ। এই যে এরা, তোমার ভক্তরা—তোমাকে সকলে ভক্তি করে, ভালবাসে—সেই দেখেই এসেছে। এদের মনে তেমন বৈরাগ্য হলে অন্য কোথাও বনে পাহাড়ে চলে যেত। আর এত কথায় কাজ কি, আমি যদি তোমার একটু সেবা ক'রে আনন্দ পাই, কাছে থাকি—তোমারই বা তাতে আপত্তি কি? তুমি যে কারও সেবা নাও না তাও তো নয়।'

আর কথা বাড়ানোর মতো শক্তি ছিল না কৃষ্ণপ্রাণের। বললেন, 'তাই হবে, তুমি প্রসাদ নাও।'

'বেশ। তাহলে এদের বলে রাখো, তোমার এই পাহারাদারদের, কেউ না আমাকে তাড়িয়ে দেয়।'

॥ ২৪ ॥

কৃষ্ণপ্রাণের যে অন্তরঙ্গ ভক্তগোষ্ঠী, যাঁরা নিয়ত ওঁকে ঘিরে থাকেন, সর্বত্র অনুসরণ করার চেষ্টা করেন—তাঁরা কেউ ওঁকে ভাবেন গুরু, কেউ বা সাক্ষাৎ ব্রহ্ম বলে মনে করেন।

তবু তাঁদের মনেও একটা অহঙ্কার থাকবে এটা স্বাভাবিক। ভক্তির অহঙ্কার, গুরুর আদর্শ-উপদেশ-ইচ্ছা ঠিকমতো পালন করছেন, করতে পারছেন এ অহঙ্কার—তাঁর কখন কি প্রয়োজন, সেবা বা অন্য দৈনন্দিন অভ্যস্ত কার্যে—তাও তাঁরাই ঠিক বোঝেন, সতর্ক থেকে সেই কার্য নির্বাহ করেন—এই অহঙ্কারও।

সর্বজ্ঞ দর্পহারী কি তা জেনেই কৌতুক করার জন্য এই ছেলেটাকে এনে ফেললেন!

প্রভু বলেছেন, ওর গতায়াতের অবাধ অধিকার রইল, সুতরাং বাধা দেওয়ার কি ভর্ৎসনা করার কোন উপায় তাঁদের নেই। তাই বলে ছেলেটা যে অনায়াসে একদিনেই সেই প্রভুর প্রভু হয়ে বসল—এতটা সহ্য করা যায় কি করে!

অথচ প্রভু তো বেশ সহ্য করছেন—হাসিমুখেই। মনে হয় এতে তিনি

বরং আনন্দিত। যেন এমনি একজন অভিভাবকই তিনি মনে মনে চেয়ে ছিলেন।...

প্রথম দিন জপধ্যানের পর সমুদ্রে স্নান করতে যাবেন, ছেলেটা যেন আগে থেকেই তৈরী ছিল—যে সব নিত্য সঙ্গীরা ওঁর সঙ্গে স্নানে যান—তাঁদের মধ্য দিয়ে এক ফাঁকে কাছে এসে একেবারে হাত ধরল।

'তুমি কোথায় যাবে শ্যামসুন্দর, তুমিও স্নান করবে?'

'কোথা যাব আমি তা কি জানি, তুমি যেখানে যাচ্ছ সেখানেই যাব।'

স্নানান্তে কৃষ্ণপ্রাণ দুটি তিনটি প্রিয় ভক্ত বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে কুঠিয়ায় ফেরেন, সিক্ত বহির্বাস পরিবর্তনের জন্য, তার পরই শ্রীমন্দির যাত্রা করেন দর্শন করতে।

শ্যামসুন্দর ছায়ার মতো তাঁর সঙ্গ নিল। তার দ্বিতীয় বস্ত্র নেই, সে ভিজে কাপড়েই যাচ্ছিল, প্রভু ব্যথিত নেত্রে তার দিকে চেয়ে তরুণ ভক্তদের মুখের উপর দৃষ্টি রাখলেন। এদের বস্ত্র গৈরিক নয়, বালককে দেওয়া যেতে পারে। ওঁর সে দৃষ্টির অর্থ বুঝতে বিলম্ব হ'ল না—শিবনাথ অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাড়াতাড়ি নিজের একটা বস্ত্র এনে দিল। শ্যামসুন্দর নির্বিকার—যেন এ তার প্রাপ্যই, এই ভাবে কাপড় নিয়ে ভিজে কাপড়টা একটা শ্বেত করবীর ডালে মেলে দিয়ে ওঁর সঙ্গে চলতে লাগল।

মন্দিরে প্রবেশের পূর্বে একটু অভিভাবকত্বের স্বরেই বলল, 'কালকের মতো অত দেরি ক'রো না। সকাল করে তোমার গান শেষ ক'রো।'

এবার কৃষ্ণপ্রাণও একটু অবাক হয়ে যান, 'কেন রে, আমার গান শেষ করার সঙ্গে তোর কি সম্পর্ক?'

'বা রে! খেতে হবে না! নিত্য উপবাস চালাবে নাকি? না খেয়ে না খেয়ে কি চেহারা হচ্ছে! এমন ভাবে চললে তোমার ঐ নাম-গান তো চিরকালের মতো বন্ধ হয়ে যাবে!'

আরও কিছু বলত হয়ত কিন্তু বলা গেল না। প্রভু মন্দিরের দিকে যখন যান—শহরবাসীদের তো জানা হয়ে গেছে, তারা এসে পূর্ব থেকেই ভীড় ক'রে দাঁড়িয়ে ছিল—এসে ঘিরে ফেলল। শ্যামসুন্দর ইচ্ছা ক'রেই এবার সরে এল। গায়ক দলের নেতৃস্থানীয় যাঁরা, দোহারের দল—এঁদেরই এবার কাছে থাকা প্রয়োজন, এটুকু সে বোঝে।

তবে সত্যই কিন্তু সেদিন অনেক আগে কীর্তন ভঙ্গ করলেন কৃষ্ণপ্রাণ। রাজভোগ উঠে ছত্রভোগ লাগছে—সেই সময়ই। প্রভু অভ্যাসমতো নীরবে যখন দর্শন শেষ ক'রে কুঠিয়ার দিকে যাত্রা করলেন—তখনও তৃতীয় প্রহর অতিক্রান্ত হতে বিলম্ব আছে।

কে জানে, ছেলেটাও ক্ষুধার্ত থাকবে, এই চিন্তাতেই তাঁর কুঠিয়ায় ফেরার কথা মনে পড়ল কিনা!

সেদিনও নিজের ভিক্ষায় বসার সময় শ্যামসুন্দরকেও সেইখানেই প্রসাদ

দিতে বললেন।

এতটা বাড়াবাড়ি সহ্য করা কঠিন বৈকি।

এমন কি সেবক বিষ্ণুদাসের ললাটেও ভ্রূকুটি দেখা দিল। কিন্তু বলতে গেলে যিনি ওঁদের মালিক, সর্বেশ্বর—যিনি ওঁদের মনে ঈশ্বরের সঙ্গে সমান হয়ে গেছেন, ইহ-পরকালের কাণ্ডারী, গুরু—তাঁকে কি বলবে!

প্রসাদ গ্রহণ শেষ হ'লে শ্যামসুন্দর ওঁর সঙ্গে কুঠিয়ায় প্রবেশ করল।

এবার আর সহ্য হ'ল না শিবদাসের। সে এসে বলল, 'তুমি এখন যাও, উনি বিশ্রাম করবেন।'

'তা বিশ্রাম উনি করুন না!' নিশ্চিন্ত মনে উত্তর দিল শ্যামসুন্দর, 'আমি ওঁর বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটাব কে তোমাকে বললে! আমি কি ওঁর সঙ্গে বকবক করব!'

'এই সময় ওঁর একটু সেবার প্রয়োজন—'

'তা আমি জানি, সেবা করতেও জানি। সেই জন্যেই এসেছি। তোমরা ছাড়া আর কেউ সেবা করতে পারবে না এমন কোন লেখাপড়া আছে?'

এবার কৃষ্ণপ্রাণই কথা বললেন, 'না বাবা, তুমি এখানে থাকতে পারবে না। ছোট ঘর, গবাক্ষ বলতে ঐ একটুখানি, গরমে কষ্ট হবে। স্থানও নিতান্ত অল্প।'

'কিছু কষ্ট হবে না। তুমি শুয়ে পড়ো দিকি। কতটুকুই বা সময়। এখনই তো উঠে পড়বে, সন্ধ্যার জপের সময় বলে। শুয়ে পড়ো, আমি তোমার কোমর পা টিপে দিই। আমার খুব ইচ্ছে—'

তখনও শিবদাস অপেক্ষা করছিল, যদি প্রভু ওকে কঠিনভাবে নিবৃত্ত করেন, চলে যেতে বাধ্য করেন, কিন্তু তেমন কোন ঘটনাই ঘটল না। তিনি শুয়ে পড়ে—পা টান ক'রে শোওয়ার কোন উপায় নেই এ ঘরে—শুধু আবারও বললেন, 'তোমার কষ্ট হবে। কেন এমন করছ!'

'আমার কষ্ট আমি বুঝব। আমি কি রাজবাড়িতে বাস করি নাকি! চালা-ঘর তাও নিচু চালা—একটুও হাওয়া আসে না।'

তারপর বলে ওঠে, 'তুমিই বা এত কষ্ট ক'রে থাকো কেন! না খেয়ে না খেয়ে দেহ তো ঐ কাঠ হয়ে গেছে—বিশ্রাম বলতে গোনা ক'দণ্ড। তার ওপর এত কষ্ট ক'রে লাভ কি? এ তোমার বাপু লোক-দেখানো সাধু সাজা। ভণ্ডামি। এই বলো তুমি ভগবানের সেবা করতে চাও, তা সেবা করবে কি দিয়ে? শরীর থাকলেই তো—শরীর নষ্ট হ'লে সেবা করবে কে? কি দিয়ে করবে?'

কৃষ্ণপ্রাণ চমকিত হয়ে ওঠেন।

'এসব কথা তোমাকে কে বললে? কার কাছে শুনলে?'

'আহা, তুমিই তো বলে বেড়াও, মন্দিরে, গুণ্ডিচা বাড়িতে, বলগণ্ডিতে—কতদিন বলেছ, আমি নিজে শুনেছি!'

আর কথা বাড়ান না কৃষ্ণপ্রাণ। দুই চোখ মুদিত করেন মাত্র, কিন্তু তন্দ্রা

আসে না চোখে। মনের মধ্যে একটা ঝড় উঠেছে যেন, অকস্মাৎ। আবারও মনে পড়ছে গয়ার সেই ছেলেটার কথা।

শ্যামসুন্দরও আর কিছু বলে না। নীরবে মৃদু কোমল হস্তে ওঁর কোমর পা, দুই হাতের পালকা—একটু একটু টিপে দেয়।

শিবদাস বিষ্ণু শরণ এঁরাও অন্যদিন দেহের এইসব স্থানগুলি টিপে বা টেনে দেয়। কৃষ্ণপ্রাণ প্রথম প্রথম প্রবল বাধা দিতেন কিন্তু এরা শোনে নি, শোনে না। শীর্ণ শরীর, উদ্বাহু হয়ে উদ্দাম নৃত্য করেন—ব্যথা হবারই কথা, হয়ও। এটুকু পরিচর্যা না হ'লে পরের দিন শয্যাত্যাগ করতেই পারবেন না। সেইভাবেই এঁরা অঙ্গ সংবাহন করেন—নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকেই বোঝেন, কোথায় কোথায় এ সংবাহন প্রয়োজন।

এ ছেলেটার তো কোন অভিজ্ঞতা নেই, এ জানল কি করে ? এমন নৈপুণ্যই বা পেল কোথায় ?

হাতের স্পর্শটাই কি মধুর, আর লঘু। ওঁর জননীর কথা মনে পড়ে যাচ্ছে বার বার। তিনিও এইভাবে গায়ে হাত বুলিয়ে দিতেন, মনে হ'ত ওঁর সে কল্যাণহস্তের স্পর্শে বুকভরা স্নেহই উজাড় ক'রে দিচ্ছেন—

এইসব চিন্তা থেকে জোর ক'রে মনকে সরিয়ে এনে মানসজপের চেষ্টা করেন, তার মধ্যেই তন্দ্রায় শিথিল হয়ে আসে দেহ।

সন্ধ্যার সময় শ্যামসুন্দর কোথা থেকে একটা তালপাতার পাখা সংগ্রহ ক'রে আনে।

রাত্রে কৃষ্ণপ্রাণ শয়ন করলে সে পিছনে বসে বাতাস করতে যায়।

কৃষ্ণপ্রাণ ব্যস্ত হয়ে উঠে বসেন, 'না না, পাখার বাতাস ক'রো না। সন্ন্যাসীর আরাম করতে নেই। আমার লাগবেও না।'

রেগে ওঠে শ্যামসুন্দর, 'কে বলেছে নেই ? কোন্ শাস্ত্রে লেখা আছে যে দারুণ গ্রীষ্মে বন্ধ ঘরে একটু পাখার বাতাস খেলে সন্ন্যাস নষ্ট হবে ? সন্ন্যাসী যদি আরামে বাঁধা পড়ে, আরামের দাস হয়—তবেই খারাপ।...আর এতই যদি সন্ন্যাসের বিধিনিষেধ, তাহলে সন্ন্যাসী হয়ে পাকা ঘরে শোবার শখ কেন ? খোলা গাছতলায় পড়ে থাকো—বাতাস লাগবে না।'

তারপর আড়চোখে বাহিরে-প্রতীক্ষমাণ উৎসুক ভক্তদের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলে, 'আর আরাম যে একেবারে নিচ্ছ না, তাও তো নয়। আমি তো প্রথম নই—তোমার এই চেলারা তো কতদিন থেকে তোমার গা টিপে দিচ্ছে। মুখে বলো ভিক্ষা, ভিক্ষায় যাও কোনদিন ? প্রসাদ ঘরে পৌঁছে যায়, বিষ্ণুদাদা সাজিয়ে দেন, ভক্তরা প্রতিটি প্রয়োজনের দ্রব্য হাতের কাছে এগিয়ে দেন—এর কোন্‌টা আরাম নয় ?'

'ভিক্ষায় বেরোলে সবাই অনেক দেয়, ভাল ভাল খাদ্য দেয়, সেই জন্যেই বেরুনো বন্ধ করতে হয়েছে। আমি ভিক্ষা করতে বেরোলেই অনেকে বহু প্রসাদ পাঠিয়ে দেন। আর গা হাত—নেচে পাথরে পড়ে গড়াগড়ি দিয়ে গায়ে ব্যথা

হয় বলেই ওরা টিপে টেনে দেয়, আমিও না বলতে পারি না—নইলে এত ব্যথা হবে যে পরের দিন হয়ত উঠতেই পারব না—'

ওঁর বক্তব্য শেষ করতে না দিয়েই বালক বলে ওঠে, 'আর এই গুমোট গরমে চারদিক চাপা ঘরে পড়ে থাকো—ঐ তো শরীর করেছ, হাড়ের ওপর চামড়া জড়ানো—তাতেই তো ঘামে গা ভেসে যাচ্ছে। ঘুম না হ'লে শরীর থাকবে? ঘামে পচে গায়ে ঘা হয়ে যাবে না? আসলে এরা যে জোর করতে পারে না। তোমাকে ভয় করে—তুমিও যা খুশি তাই করো।'

কথা বলছে যুক্তি দিচ্ছে—কিন্তু পাখা বন্ধ হয় নি একবারও।

কৃষ্ণপ্রাণ বলেন, 'পাখা চালাবে তুমি ছেলেমানুষ, তোমার গায়ে ব্যথা হবে না? পরকে কষ্ট দিয়ে আরাম নেওয়া অধর্ম।'

শ্যামসুন্দর বলে, 'আমি আর বাপু অত বকতে পারি না তোমার সঙ্গে। পরের দুঃখে তো প্রাণ কাঁদছে, এই যে গরমে সেদ্ধ হচ্ছ—নিজের শরীরকেই বা কষ্ট দিচ্ছ কেন? সব শরীরেই তোমার ঠাকুর আছেন, তোমার শরীর বলেই কি তিনি পালিয়ে যাবেন!...বেশ তো, আমার যখন কষ্ট হবে তুমি বাতাস করো—তাহলেই হবে।'

বাইরে থেকে ভক্তরা প্রবল তিরস্কার করে ওঠেন, 'প্রভু তোমাকে বাতাস করবেন! তোমার সাহস তো কম নয়! মুখে আনলে কি ক'রে! একেই বলে মূর্খ আর অর্বাচীন।'

তেমনিই উচ্চ কণ্ঠে উত্তর দেয় শ্যামসুন্দর, 'সাহস কার কোথা থেকে আসে তোমরা কি জানবে। ভালবাসাই সাহস যোগায়। তোমরা ভক্তি করো—ভালবাস কি?'

তারপর কৃষ্ণপ্রাণের দিকে ফিরে বলে, 'তোমাতে আমাতে কথা হচ্ছে, এরা তার মধ্যে কথা কইতে আসে কেন বল তো? আমি তোমার কাছে আসি, সেটা ওদের সহ্য হয় না—হিংসেয় বুক ফেটে যায় একেবারে!'

কৃষ্ণপ্রাণ তখন নীরবে এই মধুর সেবাটুকু নিচ্ছেন, শ্রান্ত চোখ দুটি—বহু দিন পরে পাওয়া এই মৃদুমন্দ বাতাসে আপনিই নিমীলিত হয়ে এসেছে, আর কোন কথা বলতে কি বলাতে ভরসা হ'ল না কারও।

যিনি প্রভু, সর্বেশ্বর—তিনিই যদি এ দুঃসহ স্পর্ধার কোন প্রতিবাদ না করেন—ওঁরা কি করবেন!

পরের দিন প্রসাদ পাবার সময় আর এক অঘটন ঘটিয়ে বসল শ্যামসুন্দর।

স্বল্পমাত্র আহার করেন কৃষ্ণপ্রাণ, শুধু প্রাণটুকু রাখার মতো। পূর্বে তার মধ্যেও বৈচিত্র্য ছিল, এখন কে এক এদেশীয় সাধু, সম্ভবত ঈর্ষাবশতই—নিত্য রাজভোগ্য খাদ্য ওঁর কাছে কুঠিয়ায় পৌঁছে যায় এই ঈর্ষাতেই কি কটাক্ষ করাতে, তাও ত্যাগ করেছেন।

রসনা-লাম্পট্য সাধুর কাছে প্রকৃতি-সংসর্গের মতোই অনাচার—বার বার এই কথাই ব'লে সকলের অনুযোগ অনুরোধ এড়িয়ে যান। এখন সুক্তমাত্র

একমুঠি অন্ন মহাপ্রসাদ এবং যে কোন একটি ব্যঞ্জন—এ ছাড়া কিছু গ্রহণ করেন না। দিনান্তে একবার মাত্র তাও। কদাচিৎ এক-আধ টুকরো মিষ্ট প্রসাদ—নিতান্ত কোন ভক্ত ভিক্ষা দিতে এসে চোখের জল ফেললে গ্রহণ করেন।

এই ভাবেই সেদিনও ব্যবস্থা হয়েছে। শ্যামসুন্দর যেন প্রভুর অনন্ত নির্দেশে, কতকটা বিধিবদ্ধ ভাবেই ওঁর সামনে বা পাশে বসে আহার করার ব্যবস্থা ক'রে নিয়েছে। তার পাতায় তিন-চার প্রকারের ব্যঞ্জন, ক্ষীর মালপুয়া প্রভৃতি পড়েছে।

শ্যামসুন্দর প্রথমে কিছু বলে নি, কৃষ্ণপ্রাণ এক গ্রাস মুখে তোলার পরই—তার নিজেরও মুখে দু-তিন গ্রাস উঠেছে—হঠাৎ উঠে নিজের পাতা থেকে একটা মালপুয়া এনে কৃষ্ণপ্রাণের মুখের সামনে ধরে বলল, 'নাও, মুখে দাও।'

প্রথমটা কয়েক নিমেষ ভক্তদের বাক্যস্ফূর্তি হয় নি, তার পরই তাঁরা ক্রোধে ফেটে পড়লেন। সোমেশ্বর বললেন, 'তুমি না ব্রাহ্মণসন্তান, খেতে খেতে উঠে পড়লে!'

প্রশান্ত কণ্ঠে শ্যামসুন্দর বলল, 'মূর্খ', উঠতে নেই অবশিষ্টটা উচ্ছিষ্ট হয়ে যায় বলে। এ তো মহাপ্রসাদ, উচ্ছিষ্ট হবে কি?—এ আহারও নয়, প্রসাদ লাভ। এর কোন বাধা নিয়ম নেই!'

তার পরই কৃষ্ণপ্রাণকে যেন প্রচণ্ড ধমক দিয়ে ওঠে, 'নাও নাও, ধরো! আমি কি সারাদিন এমনি লক্ষ্মণের ফল ধরার মতো ধরে দাঁড়িয়ে থাকবো নাকি।'

কৃষ্ণপ্রাণ বলেন, 'কিন্তু তুমি তো জান, আমি এসব আহার ছেড়ে দিয়েছি।'

'আরে, ছেড়ে দেবে কি! জগন্নাথের প্রসাদ মুখের কাছে এনে ধরেছি—তুমি ফিরিয়ে দেবে! তোমার আস্পদ্দা তো কম নয়! স্বয়ং ব্রহ্মারও তো এমন সাহস হয় না শুনেছি।'

অগত্যা কৃষ্ণপ্রাণকে গ্রহণ করতে হয়, ওরই হাত থেকে একেবারে মুখে গ্রহণ করেন তিনি।

শ্যামসুন্দর নিজের স্থানে ফিরে গিয়ে পুনশ্চ আহার শুরু ক'রে বলে, 'কে এক ভণ্ড সন্ন্যাসীর হিংসের জ্বালায় বলা কথা—তাই শুনে তুমি খাওয়া-দাওয়া ছাড়লে! তুমি তো বোকা কম নও! তুমি থাকতে তার শিষ্য ভক্ত জুটবে না, তাই তোমার শরীরটা যত তাড়াতাড়ি যায়—সেই মতলবে বলা। এটা বুঝলে না!'

'না, না। তিনি প্রকৃত কথাই বলেছেন। সাধুর পক্ষে সর্ব প্রকারে সংযম রক্ষা করা প্রয়োজন।'

'তোমার ও পণ্ডিতি কথা শুনেছে সবাই। ওসব রাখো দিকি। তুমি বুকে হাত দিয়ে—এই মহাপ্রসাদ হাতে সত্যি কথা বলো তো, পাছে তার কথা শুনে কেউ ভণ্ড সন্ন্যাসী ভাবে—সেই জন্যেই এমন ক'রে শরীর পাত করছ কিনা! তুমি কিসের সিদ্ধপুরুষ, সন্ন্যাসী—যদি লোকের কথায়, কে কি ভাববে এই ভয়ে অস্থির হয়ে উঠবে! আসলে প্রতিষ্ঠার ভয়। প্রতিষ্ঠা শোকরী বিষ্ঠা—শোন নি! প্রতিষ্ঠা গেলে তো ভালই—এত লোকের ভিড়ে ভগবানের নাম হয়

না—বেশ নির্জনে তাঁকে ডাকতে পারবে। আর তোমার তপস্যা তো ঐ সব সাধুর মতো নয়—তুমি চাও তাঁর সেবা করতে। তাঁর কাছ থেকে ভালবাসা আদায় করতে—সন্ন্যাসীর দলে নাম কাটা গেলে তোমার ভয়টা কি!'

তারপর, আরও খানিকটা খাওয়ার পর বলে, 'না না, আর একটু খাওয়া বাড়াও। এই দেহ নিয়ে সেবা করবে তাঁর, দেহটা ঠিক রাখো। ভগবান তোমাকে সুন্দর দেহ দিয়েছেন, সেই দেহ দিয়ে তাঁর সেবা করবে না? তিনি একটা ঘাটের মড়া নিয়ে সুখী হবেন?'

আবারও চমকে ওঠেন কৃষ্ণপ্রাণ।

অন্য ভক্তরা—অর্বাচীনটার স্পর্ধা এবং প্রভুর অকারণ প্রশ্রয় দান ও সহ্য-শক্তিতে স্তম্ভিত হয়ে থাকেন। কেবল সেবক বিষ্ণুদাস এই অবসরে আর এক মুষ্টি অন্ন এনে নিঃশব্দে রেখে যান। দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ থাকায় কৃষ্ণপ্রাণ তা দেখতে পান না, অন্যমনস্ক থাকার দরুন বুঝতেও পারেন না।

এই ভাবে আহার কমিয়ে দেহপাত করাটা বিষ্ণুদাসের ভাল লাগে নি কোন দিনই! এঁদের সকলের মধ্যে তিনিই আজ এই বালকের কাছে কৃতজ্ঞ বোধ করেন।

একটু একটু ক'রে, কদিনে শ্যামসুন্দর প্রভুর ঘরে পাকাপাকি ভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল।

কেউ আর এখন, তার এই দিনরাত্রি ছায়ার মতো সঙ্গে থাকায়, বিস্মিত হন না। এখানে ওর এটা অনধিকার-প্রবেশ সেকথাও তাঁরা আলোচনা করেন না। এক কথায় সহ্য হয়ে গেছে সকলকারই, বাধ্য হয়েই মেনে নিয়েছেন।

কৃষ্ণপ্রাণের ওর সম্বন্ধে একটা অদ্ভুত মনোভাব। তিনি নিজেই ঠিক বুঝতে পারেন না, এ কি স্নেহ? বাৎসল্য? নইলে ওর শাসন ভর্ৎসনা মেনে নিয়ে এমন আনন্দ পাবেন কেন? গৃহীরা এমনি সুখ বা আনন্দ পায় তা তিনি দেখেছেন। আবার ভাবেন, তাই যদি হবে—মধ্যে মধ্যে এমন সম্ভ্রমের ভাব বোধ করবেন কেন ওর কথা শুনে? আশ্চর্য হয়ে যান, ভয়ও করে তাঁর এক এক সময়। এই অল্প বয়স, লেখাপড়াও তেমন শেখে নি—এত সব গূঢ়তত্ত্ব জানল কি করে?

অনেক কিছুই মেনে নিতে হয় তাঁকে।

ভক্তদের চাপে শুষ্ক কদলীপত্রের তোষক ব্যবহার মেনে নিতে হয়েছিল। আর সত্যই হয়ত দেহে ক্ষতর সৃষ্টি হ'ত—দেহের এই অবস্থায় পাথরের ওপর শুয়ে।

এখন—হঠাৎ একদিন অনুভব করেন শয্যাটা আরও সুখদ বোধ হচ্ছে। তোশক তুলে দেখেন, আরও একখানি এই ধরনের পাতার তোশক যোগ হয়েছে সে শয্যায়।

মুখ তুলতে দেখা গেল নির্বিকার স্মিত মুখে শ্যামসুন্দর চেয়ে আছে, ওষ্ঠ-প্রান্তে ঈষৎ কৌতুকের রেখা।

'এ তোমার কীর্তি !' একটু রুষ্টভাবেই বলেন কৃষ্ণপ্রাণ।

'হ্যাঁ, তা কি হয়েছে ! পাতায় শুতে দোষ নেই, পাতার ভাগটা একটু মোটা হ'লেই দোষ ! এসব কথা আবার কোন্ শাস্ত্রে লেখা আছে ?'

'না না, কেনই বা তা হবে ! ঠিক যেটুকু প্রয়োজন তার বেশী আরাম বিলাসেরই নামান্তর।'

'তোমার কতটুকু কি প্রয়োজন তার তুমি কি জানো ! আর সে কথাই যদি ভাববে, হিসাব করতে বসবে তো—জগন্নাথ ঠাকুরের কথা ভাববে কখন ? নিজের দেহের অবস্থা তুমি তো দেখতেও পাও না। আমরা দেখি, কি দরকার তাও বুঝি। বিষ্ণুদাদাকে বলতে উনি বললেন, তুমি বাঁচালে ভাই, আমরা তো বলতে সাহসই করি না। কিন্তু সত্যিই ওঁর দরকার।...বিষ্ণুদাদাই তো পাতা চিরে শুকিয়ে সব যোগাড় করে দিয়েছেন।'

তথাপি কৃষ্ণপ্রাণ কি বলতে যাচ্ছিলেন, শ্যামসুন্দর ওর স্বভাবমতো প্রচণ্ড ধমক দিয়ে উঠল, 'তোমার অত আমি-আমি ভাব কেন বলো তো ! কিসের সাধু তুমি ? এত প্রভুত্ব চালাবারই যদি সাধ—ভিখিরী সাজতে গিয়েছিলে কেন ? তুমিই সব বোঝ, আমরা কিছু বুঝি না ? কষ্ট করলেই যদি ভগবানকে পাওয়া যায় মনে করো—বনে কি পাহাড়ে চলে যাও না। নগরে লোকালয়ে বাস করতে এলে কেন ?'

অভিভাবকের দ্বারা তিরস্কৃত বালকের মতোই কৃষ্ণপ্রাণ মৌন হয়ে যান, নীরবেই শুয়ে পড়েন।

॥ ২৫ ॥

শ্যামসুন্দর সম্বন্ধে যতই যা ভেবে থাকুন—সে যে প্রতি রাত্রে জেগে তাঁর সেবা করে—তা কৃষ্ণপ্রাণ ভাবতে পারেন নি।

ওঁর নিদ্রার সময় খুবই অল্প, রাত্রির তৃতীয় প্রহরের কিছু অবশিষ্ট থাকতেই শয্যাত্যাগ করেন—শয়ন করতে এক একদিন দ্বিপ্রহরও হয়ে যায়। সুতরাং যতটুকু নিদ্রা হয়—প্রগাঢ়, স্বপ্নহীন। কোন ভক্ত সেবা করছে জানলে উৎকণ্ঠিত থাকেন—যেমন কিশোর শিবদাসের বেলায়—তখন উঠে দেখেন সে তখনও জেগে আছে কি না ; ঘুমিয়ে পড়েছে দেখলে—তার কোন কষ্ট হচ্ছে কি না দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোন। বিষ্ণুদাসের বেলায় সেটুকু চিন্তাও থাকে না। উনি নিদ্রিত হয়ে পড়লে সে নিঃশব্দে বাইরে গিয়ে প্রবেশপথের সামনে শুয়ে পড়ে।

শ্যামসুন্দরের সম্বন্ধে তেমন কোন উদ্বেগও ছিল না। এ বালক অন্য ধাতুতে গঠিত। এ কোন কথাও শুনবে না। আবার যা প্রয়োজন আদায় করে নিতেও পারবে। এর সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হবে এমন কথা মনে হয় নি কখনও।

প্রগাঢ় সুষুপ্তিতে অচেতন ছিলেন, সহসাই কি এক কারণে ঘুম ভেঙে গেল

তাঁর, আর চোখ মেলতেই চোখে পড়ল, পাখা দিয়ে মৃদু ব্যজন করতে করতে—এক ভাবে, হাত বন্ধ হচ্ছে না—নির্নিমেষ নেত্রে চেয়ে আছে ওঁর মুখের দিকে।

রাত্রি তৃতীয় প্রহরের প্রায় মধ্যভাগ সেটা, অভ্যাসবশতঃই অনুভব করলেন—আর কিছু পরে—চার পাঁচ দণ্ড কাল পরে—তাঁর জাগ্রত হওয়ার কথা। এতক্ষণ জেগে থাকে নাকি প্রত্যহ? তিনি জানতে পারেন না!

কে জানে অন্য দিন নিদ্রা তরল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে—চক্ষু উন্মীলিত করার পূর্বেই কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করেন—সেই শব্দেই বোধহয় ছেলেটা সরে যায়। আজ নিঃশব্দে চোখ খুলেছেন বলে সতর্ক হবার সময় পায় নি।

'তুই এখনও জেগে আছিস!' বিস্মিত কৃষ্ণপ্রাণ অনুযোগের স্বরে প্রশ্ন করেন, 'রাত যে শেষ হতে যায়, এখনও ঘুমোস নি কেন?'

কেমন এক প্রকারের গাঢ় মৃদুকণ্ঠে বলে, 'আমি আরও পরে শুতে যাই। তুমি ঘুমোও, এখনও ওঠার সময় হয় নি।'

ওর সেই কণ্ঠস্বরে আর নিমেষহীন চাহনিতে কি মনে হ'ল, উনি উঠে বসে ওর ডান হাতটা চেপে ধরে প্রশ্ন করলেন, 'তুই কি প্রতিদিনই এমনি জেগে থাকিস নাকি?'

'কি জানি!' আগের মতোই নিম্নকণ্ঠে বলে—অতি সংক্ষেপে।

'কি জানি কি রে! তুই ঘুমোতে যাস কিনা তুই জানিস না!'

'তোমার দিকে চেয়ে তোমার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে কি বাতাস করতে করতে আমার কোন হিসেব থাকে না। আর সে হিসেবে দরকারই বা কি?'

'না না, এসব ভাল না। ছেলেমানুষ, না ঘুমোলে শরীর ভেঙে যাবে যে।'

'ঘুমুই না কে বললে! তুমি তো ওঠো বলতে গেলে মাঝরাত্রে, আমি তারপর অনেকটা সময় পাই ঘুমিয়ে নেবার।'

'সে আর কত! আবার তো আমার সঙ্গে স্নান-দর্শনে যাস!'

'আমার বেশী ঘুম লাগে না। আমি জেগে থাকতেই ভালবাসি। তুমি শুয়ে পড়ো, আমার কথা ভাবতে হবে না।'

সে এক রকম জোর ক'রেই ওঁকে শুইয়ে হাত দিয়ে চোখ দুটো বুজিয়ে দেয়।

'তুই না শুলে আমি ঘুমোব না।' জেদ করেন কৃষ্ণপ্রাণ।

'আমি শোব? তোমার ভাল লাগবে?' কেমন এক অদ্ভুত গলায় বলে।

তারপর একেবারে শিশুর মতো ওঁর কোলের কাছে শুয়ে পড়ে আস্তে আস্তে ওঁর গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বলে, 'তুমি এবার ঘুমোও লক্ষ্মীটি, সত্যি আমি ঘুমিয়ে পড়ব, কথা দিচ্ছি।'

পরের দিন শোবার সময় বার বার সতর্ক ক'রে দেন কৃষ্ণপ্রাণ, 'না না, অমন ক'রে রাত জাগিস নি। আমি একবার ঘুমিয়ে পড়লে আর আমার সেবার কোন দরকার পড়ে না। তুইও শুয়ে পড়িস, আমার কাছে—না হয় এখানেই শুয়ে

থাকিস !'

'আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবে। সন্ন্যাসীর আবার এসব তুচ্ছ কথা নিয়ে অত মাথাব্যথা কেন ?'

প্রথমটা গা হাত টিপে দেয় খুব মৃদু ভাবে, সবটাই তো প্রায় হাড়, জোরে টিপলে লাগবে—এ হুঁশটা ওর থাকে। তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লে আস্তে আস্তে বাতাস করে। এটুকু উনি জানেন। সে সেবা যে সারারাত প্রলম্বিত হয় তা মনে করেন নি কখনও। অন্য কোন ভক্তই তো তা করে নি কোন দিন। তাদেরও ক্লান্তির যথেষ্ট কারণ থাকে, সহজেই নিদ্রাতুর হয়ে পড়ে।

এ ছেলেটাও তো সারাদিন ঘোরে, সন্ধ্যার পর এখানে ভগবৎপ্রসঙ্গ আলোচনা হয়—নানাবিধ পাঠ ও ব্যাখ্যা—কোনদিন আবার নামকীর্তন, ছেলেটাও তো সেখানে ওঁরই কাছে বসে থাকে। ঘুম তো তখনও হয় না। ঘুম বা বিশ্রাম। যেদিন কিছু আগে ভিক্ষা হয়, সেদিন রাত্রে ওকে ডেকে বিষ্ণুদাস কিছু খাইয়ে দেন—কৃষ্ণপ্রাণ একাহারী—সেই সময়টুকু মাত্র সে কাছে থাকে না। তবে তাতে তো আর বিশ্রাম সম্ভব নয়। সত্যিই কি ওর বিশ্রাম কি নিদ্রার প্রয়োজন হয় না !···

সেদিন সতর্ক হয়ে ছিলেন বলেই বোধ হয়—গাঢ় ঘুমের মধ্যে একবার সচেতন হলেন।

সেদিন সন্ধ্যা থেকেই বর্ষা নেমেছে, বৃষ্টি, দমকা হাওয়া—মধ্যে মধ্যে মেঘ-গর্জন—হয়ত তাতেও ঘুম ভাঙতে পারে—চেয়ে দেখলেন, আজ আর পাখা নেই হাতে, আজ আরও গরম লাগছে না এখানেও, তবে গায়ে হাত বুলনো তখনও চলছে, খুব মৃদু আলতো ভাবে—আর তেমনি নিমেষ-পাতহীন চোখে চেয়ে আছে ওঁর দিকে—

কৃষ্ণপ্রাণ বললেন, 'আজও ঘুমোও নি তুমি ! মরে যাবে যে !'

তারপর জোর ক'রে কাছে শুইয়ে ওর গায়ে হাত রেখে বললেন, 'হ্যাঁ রে, একদৃষ্টে অত কি দেখিস বল্ তো !'

'তোমাকে দেখতে ভাল লাগে—তাই দেখি।'

'আমাকে দেখতে ভালো লাগে কি রে ! আমি তো এই বুড়ো, শুকনো, বিশ্রী দেখতে হয়ে গেছি—তুই-ই তো বলিস ঘাটের মড়া !'

'কি জানি ! সে কথা তো ভেবে দেখি নি কোনদিন। ভাল লাগে এই তো ঢের—তার অত কারণ খুঁজতে যাব কেন ? ভাল লাগা উচিত কি অনুচিত—বুড়ো কি ছেলে সে হিসেবেই বা দরকার কি ?'

'কেন লাগে তার কোন কারণ মনে হয় না তোর ?'

'তোমার কৃষ্ণনাম ভাল লাগে কেন, সে হিসেব করেছ কখনও ?'

তারপর গলায় জোর দিয়ে বলে, 'তোমারই বা এই নিযুতি রাতে এত বাজে বকুনি কেন ? চুপ করে ঘুমোবার চেষ্টা করো দিকি !'

সে সহসাই ওঁকে নিবিড় ভাবে জড়িয়ে ধরে। বুকে গায়ে মুখ ঘষতে থাকে। বিস্ময়ের সীমা থাকে না কৃষ্ণপ্রাণের।

ওরা যা বলে তাই কি সত্য তাহলে ? ছেলেটা কি পাগল ?

পরের দিন রাত্রে যখন পায়ের কাছে এসে বসেছে, কৃষ্ণপ্রাণ বললেন, 'আয় আমি তোকে দীক্ষা দিই। আনন্দ পাবি। আমায় যেমন ভালবাসিস তেমনি এই ভালবাসা তাঁকে দে, তাঁকে পাবি।'

'কই তুমি পাচ্ছ ?' শ্যামসুন্দর বলে, 'তুমিও তো সন্ন্যাসী, জপতপ কিছুই বাদ দাও নি, তাঁকে ভালবাসবে বলেই সংসার আত্মজন সব ছেড়েছ—তবে কোথা কৃষ্ণ কোথা প্রাণনাথ বলে কাঁদ কেন ?...ওসব কিছু না। এই ভালবাসা মানুষকে দিলে অনেক পেতে, প্রাণ ভরে যেত।'

সহসা যেন বেত্রাহতর মতো লাফিয়ে উঠে বসেন কৃষ্ণপ্রাণ।

এ কে ? কি বলছে ও ? এমন কথা তো আর কেউ কোনদিন বলে নি !

'হ্যাঁ রে, তুই ভগবানকে চাস না ? এই সব সুখদুঃখের বাইরে যেতে ? জগন্নাথকে ভাল লাগে না ?'

'ছাই ! কী এক রকমের মূর্তি—দেখলে ভয় করে। তোমাকে আমার ঢের বেশী ভাল লাগে।'

উনি আর কোন কথা বলেন না—ওরই মতো একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন ওর মুখের দিকে। সব কেমন আজ গোলমাল হয়ে যাচ্ছে তাঁর। এতদিনের সাধনা ধারণা কল্পনা—সব। ওঁর মনের ভাব কি ছেলেটা বোঝে ?

সে আস্তে আস্তে ওঁকে শুইয়ে দেয়। বলে, 'তুমি ঘুমোও, আমিও শুচ্ছি তোমার কাছে, আজ ঘুমিয়ে পড়ব ঠিক—দেখো।'

তারপর কোলের কাছে গুটিসুটি মেরে শুয়ে বলে, 'আমাকে একটু ভালবাসো না ! ভালবাসতে ইচ্ছে হয় না ?'

'কি বকছিস পাগলের মতো ! ভালবাসা কি কোন বাইরের জিনিস—গাছের ফল যে এনে তোর হাতে দেব ? আর ভালবাসে মানুষ তার মাকে একরকম, স্ত্রীকে একরকম, ছেলেকে একরকম, নাতি নাতনী তাদের একরকম। আমার তো সে সব কিছুই নেই, মাকে ভালবাসতুম, এখনও বাসি—এই পর্যন্ত, সে বহু দূরে অতীতের কথা। বাৎসল্য অপত্যস্নেহ—এইটেই এক্ষেত্রে স্বাভাবিক, ক্রমশ আসবে, কিছুটা হয়ত এসেওছে।'

'ওমা, ভালবাসা আবার এভাবে ওজন ক'রে ভাগ ক'রে রকম রকম ভাবে আসে বুঝি ? ভালবাসলে এ বিচার থাকবে কেন ? তুমি যে জগন্নাথকে ভালবাসো, ওটা কি মূর্তি বলো তো ? মেয়ে না পুরুষ, শ্যাম না শ্যামা, কিছুই তো বোঝা যায় না। তবে অমন পাগলের মতো ভালবাসো কি ক'রে—প্রহর ধরে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকো ! এই যে আমি তোমাকে ভালবাসি—তুমি আমার স্ত্রী কি স্বামী, বাবা কি মা—এসব কথা তো মনে পড়ে না ! তুমি পুরুষ কি মেয়ে—তাও তো কোনদিন ভাবি নি ! তোমার মতো ভাগ ভাগ ক'রে ধরে, ছেলের এইটুকু নাতির এইটুকু—ভালবাসা যায় নাকি ? মনের মধ্যে এত রকম ভালবাসা থাকে ? যাকে ভালবাসবে তাকে সবটুকু দিলে তবে তো তার ভালবাসা পাবে। ভগবানকেই যদি ধরো, তাঁকেও সবটুকু না দিলে তিনি

সবটুকু দেবেন কেন ?'

একটু চুপ ক'রে থেকে আবার বলে, 'ভগবানকে ভালবাসো বলছ—কালই তো পণ্ডিত ভাগবত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছিল, "তিনি অখণ্ড, পূর্ণ। তিনিই পুরুষ, তিনিই প্রকৃতি। ব্রহ্মেরই দুই স্বরূপ।" তুমি তাহলে কি ভাবে ভালবাসো তাঁকে, কি ভাবে দ্যাখো ?'

কৃষ্ণপ্রাণের বুকের মধ্যে প্রবল একটা ঝড় উঠেছে। বাইরের ঐ ঝড়ের থেকে ঢের বেশী প্রবল, উত্তাল। এসব কি শুনছেন তিনি ? এতকাল পরে এ বালক কী সব শোনাচ্ছে তাঁকে !

অনেকক্ষণ পরে যেন নিজেকে কতকটা সম্বরণ ক'রে নিয়ে বললেন, 'আমি তাঁকে প্রকৃতি ভাবে স্ত্রী ভাবে ভালবাসি। আমি যেন সেই রাধা, সেই গোপিনী —এই ভাবে। তাঁকে আমার স্বামী, আমার প্রেমিক, আমার সর্বেশ্বর—এই ভাবে দেখি।'

'দ্যাখো তুমি তো স্ত্রীলোক নও, স্ত্রী নিয়ে ঘর করো নি, সে ভালবাসা কেমন তা বুঝলে কি ক'রে ? ভালবাসার আবার অত ভেদ কি ?'

তারপর বলে, 'আচ্ছা, তুমি তো তাঁকে স্বামীর মতো, প্রেমিকের মতো দ্যাখো বললে, সেইভাবে তাঁকে চাও। তার মানে নিজেকে মেয়েছেলে বলে কল্পনা করো, এই তো ? তবে অত প্রকৃতিসংসর্গের ভয়ে শিঁটিয়ে থাকো কেন ? পাছে কোন মেয়েছেলের ছায়া গায়ে লাগে এই ভয়ে সাবধান হতে হতে তোমার ভগবানের কথাও ভুলে যাও। ঐ যে তোমার অতবড় ভক্ত, কঠোর তপস্যা করে এই কাঁচা বয়সে, রসনা জয়—অত বোধ হয় তুমিও করতে পারো নি—এক বুড়ীর কাছ থেকে ভিক্ষা নিয়েছিল বলে তাকে তুমি ত্যাগ করলে চিরদিনের মতো। লোকটা সেই দুঃখে আত্মঘাতী হ'ল—বিষ্ণুদাদা পর্যন্ত তার জন্যে কত কেঁদেছে। কেন, এত কিসের অহঙ্কার—সাধু বলে—না পুরুষ বলে ? তিনিই যদি এক পুরুষ হন, তোমরা তো সবাই মেয়ে, মেয়েছেলের ভয়ে দিনরাত কাঠ হয়ে থাকো কেন ? নিজেকে এখনও পুরুষ ভাবো, আর এদিকে বলছ মেয়েছেলে হয়ে ভগবানকে পুরুষ ভেবে তাঁকে ভালবাসবে ! ঐ তো কালই পণ্ডিত বলছিল, এ সংসারে এ বিশ্বে সেই এক জনই পুরুষ, আমরা সকলেই তাঁর প্রকৃতি। কতরকম কথা তোমাদের !'

উঠে বসতে চান কৃষ্ণপ্রাণ। তাঁর বুকের মধ্যে যে ভাবে আকুলিবিকুলি করছে—বাইরে ঐ বৃষ্টি আর বজ্রপাতের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াতে পারলে তবে বোধহয় কিছুটা শান্তি পান।

কিন্তু উঠতে পারলেন না। শ্যামসুন্দর এমনভাবে জড়িয়ে আছে, ওঠা সম্ভব হ'ল না। আধশোয়া অবস্থায় কনুইয়ে ভর দিয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'শ্যাম শ্যাম—ঠিক ক'রে বলো তুমি কে, তুমি কি !'

'অত আমি জানি না। তুমি কি তাও যেমন ভাবি নি, আমি কি—তাও না।...ঘরে তো আলো জ্বলছে, চেয়ে দ্যাখো না।'

গৃহে ক্ষুদ্র একটি প্রদীপ জ্বলে সারারাতই। সামান্য হলেও অভ্যস্ত চোখে

তা-ই যথেষ্ট।

সেই আলোতেই একদৃষ্টে চেয়ে দেখতে যান, সত্যই কেমন যেন সব একাকার মনে হয়। স্ত্রী কি পুরুষ, বালক কি বৃদ্ধ—কোন জ্ঞানই থাকে না। অনাদিকালের দুটি সত্তা তাঁরা—কিংবা একই।

সব একাকার, কেবল সামনে দেখেন করুণ কোমল স্নিগ্ধ দুটি চোখ, সে যেন বিপুল অতল এক প্রেমের সরোবর। প্রেম আর করুণা—আর কেউ নেই, আর কিছু নেই।

চেয়েই থাকেন।

তারপর মনে হয় সেই সরোবরে তিনি ডুব দিয়েছেন, ডুবে যাচ্ছেন।

আর কিছু নেই। তিনিও নেই।

আর কোন জ্ঞান থাকে না, কাকে দেখছেন, কি দেখছেন, কিছুই মনে থাকে না।

অনন্ত অপার ভালবাসা, অমৃতের চেয়েও যদি শ্রেয় বস্তু থাকে—এ সেই।

কিছু ভাবার চেষ্টা করেন, চেষ্টা করেন কিছু চিন্তার। সন্ন্যাস, তপস্যা, লক্ষ্য। নানা প্রসঙ্গ মনে করার চেষ্টা করেন। বিগত বর্তমান জীবন। কিছুই ভাবতে পারেন না। শুধু আনন্দ, সব একাকার করা আনন্দ।

এই স্নেহ, এই একাত্মতা অভিন্নতা, এমন আনন্দ আর কখনও অনুভব করেন নি তো!

তিনি বালকের মাথার ওপর মুখ রেখে শুয়ে পড়েন আবার। ততক্ষণে দুই চোখ আচ্ছন্ন ক'রে নেমেছে জলের ধারা। সে বালকও তাঁর কণ্ঠের মধ্যে মুখ গুঁজে দিয়ে অস্ফুট কণ্ঠে বার বার উচ্চারণ করে—'শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণ··· ।'

॥ ২৬ ॥

গত কয়েক দিন ধরেই অন্তরঙ্গ ভক্ত-সঙ্গী অনুগামীদের সমাজে একটা নিতান্ত প্রাকৃতজনোচিত মনোভাব দেখা দিয়েছিল।

প্রথমে অস্বস্তি ও বিস্ময়। তার পর ঈর্ষা—তা থেকে বিরূপতা, ক্ষোভ।

প্রথমে যা সীমাবদ্ধ ছিল চোখের চাহনিতে, ভ্রূকুটিতে, দৃষ্টি-বিনিময়ে—ক্রমে তা ভাষায় প্রকাশ পেতে লাগল।

ক্ষোভ থেকে বিক্ষোভ। তা থেকে ক্রোধ। 'ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহ' এই ভগবদ্বাক্য প্রমাণিত ক'রে ইতরজনের মতোই তাঁদের রসনা ঐ বালকের প্রতি কটু বাক্যে এবং গুরুর প্রতি অশুচি ভাষণে নেমে এল।

গুরুর বুদ্ধিভ্রংশ ঘটেছে। তাই একটা সুযোগ-সন্ধানী বালকের মোহে কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান হারিয়েছেন।

এর প্রতিকার-প্রচেষ্টা যদি না করেন তাঁরা, তাঁদেরই প্রত্যবায়। ধর্মের কাছে পতিত হবেন তাঁরা।

এ উত্তেজনার মধ্যে একবারও তাঁদের কারও মনে হ'ল না, কেউ স্মরণ

করিয়েও দিল না যে—এই ইতর ঈর্ষায় তাঁদেরও এতদিনের সাধনা সংযম গুরু-ও ইষ্টভক্তি সম্ভবত বিনষ্ট হ'ল।

অথবা তা ছিলই না আদৌ। একটা ছদ্ম আবরণ মাত্র ধারণ ক'রে অপরের ভক্তি-শ্রদ্ধা আহরণ করছিলেন, নিজেদেরও প্রবঞ্চিত করছিলেন। এবার স্বয়ং ইষ্টই সে নির্মোক উন্মোচিত করে তাঁদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করলেন।

শেষ পর্যন্ত বহু আলোচনা, বহু কদর্য বাক্য ও ইঙ্গিতের অবতারণার পর স্থির হল প্রভুর এই মোহভঙ্গের ব্যবস্থা করতেই হবে। তাঁদের দায়িত্ব এটা।

পরিষ্কার বলতে হবে গুরুকে—ভক্ত-সমাজে তো বটেই—বৃহত্তর জন-সমাজেও—তাঁর এই মোহগ্রস্ততার প্রতিক্রিয়া কোন্ আকার ধারণ করছে।

কিন্তু কে সে কার্যের দায়িত্ব নেবে?

তা নিয়ে একটা সমস্যা দেখা দিল অবশ্যই। মুখে যে যাই বলুক—এ অপ্রিয় কার্যে অগ্রসর হতে অধিক সাহসের প্রয়োজন।

শেষ পর্যন্ত, সুব্যবস্থা হ'ল বলা যায় না, অন্তত অনিচ্ছায় সম্মত করানো হ'ল স্বরূপানন্দকে।

বয়স্ক ভক্ত স্বরূপানন্দ—যিনি প্রগাঢ় শাস্ত্রজ্ঞানের জন্য পণ্ডিত বলেই পরিচিত—এসে বললেন, 'প্রভু, আমার অপরাধ নেবেন না। নিতান্ত বাধ্য হয়েই একটা নিবেদন নিয়ে এসেছি।'

তখনও পূর্বাকাশে অরুণোদয় হয় নি, সূর্যের আবির্ভাব প্রত্যাশায় অধীর উষার লজ্জা-রক্তিমা প্রকাশ পেয়েছে মাত্র। কৃষ্ণপ্রাণের প্রভাত-কৃত্য ধ্যান-জপ শেষ হয়েছে। তিনি আসন ত্যাগ করতে যাচ্ছেন—এই সময়ই পণ্ডিত কর-জোড়ে এসে দাঁড়ালেন।

অর্থাৎ তিনি বহুক্ষণ ধরেই এই মুহূর্তটির জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আজকাল শ্যামসুন্দরের অহর্নিশ সাহচর্যের জন্য ওঁকে একা বা নির্জনে পাওয়াই যায় না। সেও ওঁর ধ্যান-জপের সময় ও কাল অবগত আছে, এখনই হয়ত কাছে এসে দাঁড়াবে।

ঠিক সুযোগটির জন্য এই একাগ্র প্রতীক্ষা এবং কণ্ঠস্বরের ভয়মিশ্রিত গাম্ভীর্য—এতেই সন্ন্যাসী বুঝলেন কোন গুরুতর সমস্যার কথা তুলবেন পণ্ডিত। ভয়—যদি গুরু, যিনি ওঁর কাছে সাক্ষাৎ গোবিন্দ—ওর প্রতি ক্রুদ্ধ হন এ প্রসঙ্গে? কেবল ভয়ই নয়, সেই অস্বাভাবিক গম্ভীর কণ্ঠের মধ্যে কোথায় উনি একটু প্রচ্ছন্ন অভিমান ও অনুযোগও লক্ষ্য করলেন।

যখন প্রায় সমস্ত জগদ্বাসী নিদ্রামগ্ন, সেই দুর্লভ নির্জন অবসরে কৃষ্ণপ্রাণ ব্রহ্মের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগের চেষ্টা করেন, ইষ্টের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াবার। ফলে কখনও ব্যথা, কখনও অপার্থিব আনন্দ দুই-ই অনুভব করেন। সে ব্যথাও কোন পার্থিব ব্যথার সঙ্গে তুলনীয় নয়। ফলে যখন এই ধ্যানজপের মধ্যেই কখনও কখনও মন সেই মনের সুদূর গহন অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হয়—তখন জপও যায় বন্ধ হয়ে। শুধুই এক লোকোত্তর অনুভূতি থাকে সমস্ত সত্তা সমস্ত চৈতন্য

আচ্ছন্ন ক'রে। তার পর যখন সে আচ্ছন্নতা তন্ময়মগ্নতা থেকে জেগে ওঠেন, তখনও মাধুর্যের রেশ বিদূরিত হয় না, সে অমৃতাস্বাদের কিছুটা থেকে যায় চেতনে ও অবচেতনে—বাস্তব-প্রত্যহের ম্লান স্পর্শ বা কদর্য সংঘাত তাকে অপরিহার্য মালিন্য দ্বারা নিশ্চিহ্ন না করা পর্যন্ত।

কৃষ্ণপ্রাণ নির্বোধ নন। পণ্ডিতের কণ্ঠস্বরেই অনুযোগ ও অভিমানের আভাস পেয়ে প্রসঙ্গটা কোন্ পথ ধরে যাবে তা অনুমান করতে পেরেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই প্রাভাতিক-ইষ্ট-অর্চনাস্নিগ্ধ ললাটে ভ্রূকুটি দেখা দিয়েছিল।

সে ভ্রূকুটি বিরক্তি কি উষ্মার নয়—বেদনারই।

মানব-মন বুঝি যুগযুগান্তের অভ্যস্ত কলুষ ও সঞ্চিত আবর্জনার পঙ্ক কাটিয়ে সত্যকার ঊর্ধ্বে উঠতে পারে না। তাই তাদের ভুল বোঝারও অন্ত থাকে না। আর যে যতই প্রজ্ঞাবান হোক—অপরের প্রতি অবিচার করতেও দ্বিধা করে না।

কিছুক্ষণ মৌন থেকে কৃষ্ণপ্রাণ বললেন, 'বলো, কি বলবে। কিন্তু এটা আমার বড় দুর্লভ অবসর। এই অল্প মাত্রই সময় পাই নিভৃতে ইষ্ট স্মরণ করতে—তার পরও মন সেই রসে কিছুক্ষণ অন্তত নিমগ্ন থাক এইটিই আমার অভিলাষ। এই সময়ই তুমি বেছে নিলে!...যাক্, যা অনিষ্ট হবার তা হয়েই গেছে, এখন বলো কি বলবে!'

পণ্ডিত পায়ের কাছে বসে পড়ে ওঁর পায়ে মাথা রেখে প্রণাম ক'রে বললেন, 'প্রভু, এ যে আপনার কি পরিমাণ ক্ষতি, আমি বুঝি। কিন্তু অনেক চিন্তা ক'রেও অন্য কোন অবসরের কথা ভাবতে পারি নি। আর, আবারও করজোড়ে জানাচ্ছি, আপনি আমার কাছে প্রত্যক্ষ ইষ্ট—এ প্রসঙ্গ তুলতে আমিও কম ব্যথা অনুভব করছি না।'

তারপরও কিছুক্ষণ ইতস্তত ক'রে সঙ্কোচ-কম্পিত কণ্ঠে বললেন, 'প্রভু, ঐ বালকটি যে ভাবে আপনার উপর প্রভুত্ব বিস্তার করেছে, প্রকাশ্যে সবর্জনসমক্ষে যে ভাবে সমবয়স্কর মতো আপনার সঙ্গে কথা বলে—এবং প্রায় দিবারাত্রই আপনার সঙ্গে থাকে, আপনার নিভৃত বিশ্রামপ্রকোষ্ঠে রাতে এমন কি দিবাভাগেও শয়ন করে—এতে আপনার বিপুল ভক্তজনসমাজে দারুণ বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। ক্ষোভ এবং দুঃখও। আমাদের মধ্যে—এই কজন আপনার করুণাধন্য সেবকের মধ্যে হলে এ নিয়ে চিন্তা কি আলোচনা করার কোন কারণ ছিল না। এ আলোচনা বিস্তৃত ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। এ বালকের মা বিধবা, অল্পবয়সী, সুশ্রী—বালককে উপলক্ষ্য ক'রে তার সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠতার সম্ভাবনাও খুব দূরকল্পিত নয়—এ ইঙ্গিতও দিচ্ছে কেউ কেউ। ভক্তগণের ক্ষোভ, ইতরশ্রেণীর লোকের ব্যঙ্গবিদ্রূপ নানা স্থানে নিন্দুকের রসনাকে মুখর ও নিন্দা-লোলুপ ক'রে তুলবে, এও স্বাভাবিক। তার ফলেই এ প্রসঙ্গের এত বিস্তৃতি। আপনার এই দীর্ঘদিনের কঠোর তপস্যা, লোকোত্তর সাধনার ফলে অর্জিত দেশদেশান্তর ব্যাপী খ্যাতির সূর্যালোক, এ রাহু ছায়াবৃত করলে আমাদের—আপনার স্নেহগর্বিত, আশীর্বাদপুষ্ট নিত্য-সেবকদের দুঃখের অবধি

থাকবে না।…আপনার নিকট এই কদর্য প্রসঙ্গ উত্থাপিত করতে হ'ল—এ পাপ নিত্য লক্ষ নাম জপেও স্খালিত হবে কিনা, এ চিন্তাই আমাদের উদ্বিগ্ন ক'রে তুলেছে।'

তিনি আবারও প্রণাম ক'রে নীরব হলেন।

কৃষ্ণপ্রাণও কোনও উত্তর প্রদান করলেন না, অনুযোগ কি তিরস্কারও না।

ততক্ষণে পূর্বাকাশের অরুণাভা বৃক্ষলতা ভেদ ক'রে সেই পূজার আসনেও পৌঁচেছে। চোখ তুলে দেখার সাহস থাকলে পণ্ডিত দেখতে পেতেন, অব্যক্ত যন্ত্রণায় ও দুঃখে, ইতর রসনার অশুচিতায়, মানুষের এই মনোভাবের প্রতি ঘৃণায়—এবং সর্বোপরি ঐ নিষ্পাপ আশ্চর্য বালকের প্রতি স্নেহে করুণায় প্রেমে ওঁর চক্ষু দুটি শুধু নয়, সমস্ত সুগৌর দিব্যদ্যুতি-মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ধারণ করেছে ; চক্ষুর ঠিক পাশের শীর্ণ শিরা স্ফীত ও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নিরুদ্ধ আবেগে রগের দুই পাশের ধমনীতে দ্রুত ও অধিক রক্ত-চলাচলের চিহ্ন বহু দূর থেকেও দৃষ্টিগোচর হচ্ছে।…

আর অল্পক্ষণের মধ্যে স্নানসঙ্গীরা এসে পড়বেন।

কৃষ্ণপ্রাণ উঠে দাঁড়ালেন। পণ্ডিতও অপরাধীর মতো অবনতমস্তকে উদ্যানের পথে আশ্রমদেবতার মন্দিরাভিমুখে চলে গেলেন।

সকলের আগে এল শ্যামসুন্দরই।

সে-ই ওঁর শুষ্ক বহির্বাস বহন করে নিয়ে যায়। আজও কুঠিয়ার মধ্য থেকে বহির্বাস সংগ্রহ ক'রে নিকটে এসে কি বলতে গিয়েও ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

সেও ওঁর দিকে চেয়ে আছে, কৃষ্ণপ্রাণও তার দিকে।

কৃষ্ণপ্রাণ দেখলেন, আশঙ্কা নয় উৎকণ্ঠা নয়—বিস্ময় বা অনুযোগের চিহ্ন-মাত্র নেই। দুটি চোখে শুধু অপার অপরিসীম স্নেহ—এমনও মনে হ'তে লাগল যে স্নেহ নয়, করুণাই—আর ওষ্ঠপ্রান্তে কোন এক আশ্চর্য কারণে প্রচ্ছন্ন কৌতুকের ঈষৎ বক্রতা।

সেদিন কৃষ্ণপ্রাণের ভাবান্তরে তাঁর ভক্ত ও অনুরাগীরা কৌতূহলী ও শঙ্কিত হলেও—তাদের চিন্তা প্রকৃত কারণের পথে গিয়েছিল কিনা সন্দেহ। সকলেই আপন আপন মানসিক গঠন মতো কল্পনা করছিল, তবে শঙ্কা বোধ করছিল সকলেই।

কৃষ্ণপ্রাণ নীরবেই স্নান সমাপন ক'রে মন্দিরে গিয়েছিলেন কতকটা অভ্যাস-বশতই। তবে অভ্যাসেরও ব্যতিক্রম ঘটেছিল কিছু, সমুদ্র যাতায়াতের পথে নিত্য যেসব ভক্ত-বন্ধু মিলন ঘটত,—ঐ সময়েই কোন কোন নির্মল কৌতুকে কাব্যচর্চায় নাট্যচর্চায় মুখর বা চপল হয়ে উঠতেন—তাঁদের কুঠিয়া বা বাসগৃহ পরিহার ক'রেই গিয়েছিলেন।

অপর দিন অপেক্ষা বিলম্ব ঘটেছে—কেউ কেউ আগেই বেরিয়ে পড়েছেন—এই ভেবেই মনকে প্রবোধ দিয়েছিলেন সম্ভবত।

সাধারণত মন্দিরে গিয়ে দর্শন—বহুক্ষণব্যাপী দর্শন ও মননের পর বেরিয়ে এসে প্রতীক্ষমাণ কীর্তনদলে যোগ দিয়ে নামকীর্তনে মেতে ওঠেন। কিন্তু সেদিন মন্দিরেই গরুড় স্তম্ভ আলিঙ্গন ক'রে দণ্ডায়মান রইলেন প্রায় এক প্রহর কালের মতো। দুই চক্ষু বিস্ফারিত, জগন্নাথের মূর্তির উপর স্থির—সেই সঙ্গে বিস্ফারিত চক্ষু প্লাবিত করা দরবিগলিত অশ্রুধারা তাঁর কপোল বক্ষ সিক্ত করছে। এ দৃশ্য দেখার পর আর কারও তাঁকে আহ্বান করতে সাহস হয় নি।

তারপরও, জগমোহন থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে কীর্তনের দলে যোগ দিলেন না, দ্রুতপদে কুঠিয়াতে ফিরে এলেন।

তখন ভিক্ষা আসার সময় হয় নি। কুঠিয়ায় এসে দরজা বন্ধ ক'রে—যা দিনে রাতে কখনই বিশেষ বন্ধ হয় না—একা স্থির হয়ে বসে রইলেন।

শ্যামসুন্দর মন্দির থেকে কিছু দূরে দূরে অনুসরণ করেছিল—সেও এসে রুদ্ধদ্বারের বাহিরে বসে আছে, তাও সে কোন কথা না কইলেও উনি বুঝেছিলেন।...

সেদিনও ভিক্ষার সময় শ্যামসুন্দরকে একেবারে পাশে নিয়ে বসলেন। বিষ্ণুকে নির্দেশ দিলেন—নাম ক'রে ক'রে—উৎকৃষ্ট মিষ্ট প্রসাদগুলি ওকে দিতে। এমন কি শ্যামসুন্দরও যখন—সেও আজ নির্বাক থেকেই প্রসাদ গ্রহণ করছিল—একখণ্ড মিষ্টান্ন তুলে ওঁর পাত্রে দিল, কৃষ্ণপ্রাণ কোন প্রতিবাদ কি অনুযোগ করলেন না, নীরবেই তৎক্ষণাৎ তা গ্রহণ করলেন।

আহার শেষ হলে প্রতিদিনের মতোই ওঁর সঙ্গে শ্যামসুন্দরও পাখা নিয়ে ওঁর শয্যার এক প্রান্তে এসে বসল এবং নিঃশব্দে ওঁকে বাতাস করতে লাগল।

কিছুক্ষণ চোখ বুজে সেবা গ্রহণের পর গাঢ় কণ্ঠে বললেন, 'শোন্, আমার কাছে, এখানে আয়।'

বিনাবাক্যে পাখা নামিয়ে রেখে শ্যামসুন্দর একেবারে ওঁর বুকের কাছে এসে বসল,—স্থির হয়ে নয়, ধীরে ধীরে ওঁর গায়ে হাত বুলোতে লাগল।

তবু কিছু সময় লাগল।

চোখ মেলে চেয়েও রইলেন কিছুক্ষণ ওঁর মুখের দিকে। আবারও সেই বিচিত্র অনুভূতি, দুর্বোধ্য অভিজ্ঞতা, বর্ণনাতীত। সেই রকম যেন সব একাকার হয়ে যাচ্ছে। বালক বৃদ্ধ স্ত্রী পুরুষ—কিছু জ্ঞান থাকছে না। কখনও মনে হচ্ছে গুরু, কখনও মনে হচ্ছে সখা, কখনও সন্তান।

তবু মনে জোর আনতে হয়।

বললেন, 'আমি কি বলব তোকে বুঝেছিস তো?'

'বুঝেছি সে কথা আগেই ধরে নিলে কেন?' কৌতুকের সেই চাপা হাসি—চাপা ঠোঁটের ভঙ্গিতে।

'তুই সব বুঝিস!'

'হয়ত বুঝি। চলে যেতে হবে—এই তো!...তবু তুমি বলো। তোমার মুখ থেকেই শুনি।'

বললেন কৃষ্ণপ্রাণ।

'তোর প্রতি আমার স্নেহ, একপ্রকার বশ্যতা স্বীকার—তোর প্রভুত্বর ভাব, অন্তরঙ্গতা, দিনরাত্রি আমার কাছে থাকা নিয়ে অনেক কুকথা উঠেছে। আমি একা হ'লে এসব অগ্রাহ্যই করতাম হয়ত—কিন্তু এতগুলি লোক আমাকে ভক্তি করে, ভালবাসে, এদের মনে যদি আমার কোন আচরণে, কি আমার নামে কুৎসা রটনায় ব্যথা লাগে—নিজেকে দায়ী বলে অপরাধী বলে মনে হয়। তুই ঘরে ফিরে যা। তুই যেখানেই থাকবি আমার আশীর্বাদ আমার শুভেচ্ছা তোর ওপর বর্ষিত হবে। জগন্নাথ স্বামীর কাছে নিত্য প্রার্থনা করব—তোর যেন ঈশ্বর লাভ ঘটে।'

শ্যামসুন্দর ততক্ষণে তার স্ব-রূপে ফিরে এসেছে।

সে বললে, 'জগন্নাথের কাছে নিজের জন্য যা নিত্য প্রার্থনা করছ—তা কি তিনি দিয়েছেন? তোমার কথায় আমাকে দেবেন, যদি তোমার এত জোর তো তোমাকেই তো আগে দিতেন।'

এই বলে সে খুব খানিকটা হেসে নেয়।

তারপর সহসা একেবারে শিশুর মতো ওঁর বুকে মাথা রেখে বলে, 'অনেক আশা নিয়ে তোমার কাছে এসেছিলুম, একটু ভালবাসা পাব বলে—তুমিও তাড়িয়ে দিলে? তুমি তো নাকি ভালবাসার পথে প্রেমের পথে সেবার পথে তোমার ভগবানকে চাও—তিনি যখন আসবেন তাঁকে চিনতে পারবে, গ্রহণ করতে পারবে?...তুমি এখনও এমন সংস্কার আর চলিত ধারণার শেকলে বাঁধা —তাঁকেও হয়ত এমনি ভাবে তাড়িয়ে দেবে।...কে জানে, হয়ত তিনি এসেওছেন বার বার—তোমার ভালবাসা পেতে, চাইতে—বারবারই তাঁকে এমনি বিদায় ক'রে দিয়েছ!'

তারপর উঠে সোজা হয়ে বসে বলে, 'যাক, সে তোমার গরজ, তবে আমার জন্যে, নিজে ভিখিরী হয়ে আর একজনের কাছে ভিক্ষা চাইতে হবে না। ঈশ্বর লাভের জন্য আমি কাঙাল নই, আমি একটু ভালবাসার কাঙাল।...তোমার কি দশা হবে জান? সেই যে গল্প আছে—একটা লোক স্পর্শমণি খুঁজতে খুঁজতে ঘরদোর আত্মীয়স্বজন সব ছেড়ে প্রায় পাগল হয়ে বেরিয়ে গিছল; যেতে যেতে পাথর দেখে আর তুলে হাতের লোহাটায় ঠেকায়, সোনা হ'ল না দেখে দূর করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ছুটে যায় অন্য পাথরের খোঁজে। করতে করতে অভ্যেস হয়ে গিছল—শেষে আর লোহাটার দিকে তাকিয়েও দেখত না। এর মধ্যে কবে একদিন লোহাটা সোনা হয়ে গেছে তা টেরও পায় নি। যেদিন অপরে বলল, সেদিন দেখে এমন ঘা লাগল মনে—সেইখানেই পড়ে মরে গেল।'

তারপর—একটু হাসা-হাসি মুখে বলে, 'বেশ, চলেই তো যেতে হবে। অনেক দিনের সাধ, যাবার আগে একটু সেবা ক'রে যাই। আমি বাতাস করি, তুমি ঘুমিয়ে পড়ো। সেই ফাঁকে আমি চলে যাবো। তোমার সামনে দিয়ে গেলে তুমি কষ্ট পাবে খুব।'

বলতে বলতে—কৃষ্ণপ্রাণকে আর কিছু বলবার অবসর না দিয়ে ঘন ঘন বাতাস করতে থাকে।

তখনই মনে মনে সঙ্কল্প করেছিলেন কৃষ্ণপ্রাণ যে তিনি জেগেই থাকবেন। আর তাই তো থাকেন অধিকাংশ দিনই। কিন্তু সেদিনই যে কখন চোখের পাতা বুজে এল তা বুঝতেও পারলেন না।

অতি স্বল্পক্ষণই। তারপরই সচেতন হয়ে উঠে বসে চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন, পাখাটা পাশে নামিয়ে রেখে সে কখন চলে গেছে।

"বিষ্ণুদাস বিষ্ণুদাস" বলে ডাকতে ডাকতেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

বিষ্ণু বাইরেই ছিলেন, তখনই উঠে এলেন।

'শ্যামসুন্দর—মানে ঐ বালকটি কোথায় গেল দ্যাখো তো!'

'সে তো আপনার কাছেই ছিল—'

'ছিল তা আমিও জানি। নেই বলেই তো খুঁজে দেখতে বলছি।'

সহসাই যেন অসহিষ্ণু হয়ে পড়েন।

বিষ্ণু সেই সঙ্গে আরও কয়েকজন চারিদিকের উদ্যান, মন্দির, বাহিরের পথ পর্যন্ত খুঁজে দেখে এল। সে নেই।

'তবে', যেন কতকটা আশ্বাস দেবার ভাবেই বলেন বিষ্ণু, 'তার পরার ধুতিটা আছে। তার মানে সে বেশীদূর কোথাও যায়নি। এখনই ফিরে আসবে।'

'তোমরা কেউ তার গৃহ চেনো? একটু খবর নিয়ে এসো তো, সেখানে সে ফিরেছে কিনা!'

'তা যাচ্ছি, কিন্তু প্রভু, ঐ আর একটিই মাত্র তো তার কাপড়, কিছুই তো আনে নি, সোমেশ্বর দিয়েছেন বলে তাই—সেটা ফেলে চলে যাবে অন্য কোথাও?'

'আঃ বিষ্ণু—যা বলছি শোন না। হয়ত এখান থেকে দেওয়া বলেই ও সে বস্ত্র নেবে না।'

কিছু পরেই সংবাদ এল—গৃহে সে ফেরে নি। ফিরছে না নাকি দীর্ঘকাল।

কে একজন—ঠিক কৃষ্ণপ্রাণকে জিজ্ঞাসা করতে সাহস হ'ল না—সাধারণ ভাবে, যেন বাতাসকেই নিম্নকণ্ঠে প্রশ্ন করল—'কিছু নিয়ে গেছে নাকি, প্রভু অত ব্যস্ত হচ্ছেন!'

আরও কে তেমনিভাবেই উত্তর দিল, 'নেবার মতো প্রভুর ঘরে কি আছে—কয়েকখানা পুঁথি ছাড়া?'

কৃষ্ণপ্রাণের কর্ণে একথা যাওয়ার কোন অসুবিধা ছিল না। এর উত্তর তিনি দেবেন না—কিন্তু সেই মুহূর্তে উত্তরটা তাঁর নিজের মনেই দেখা দিল—সে নিয়ে গেছে তাঁর শান্তি আর চিত্তস্থৈর্য—হয়ত বা চিরদিনের মতোই।

সান্ধ্যকৃত্য সেরে অন্যদিন ভগবৎ-প্রসঙ্গে যোগ দেন—সেদিন তখনই বেরিয়ে পড়লেন সমুদ্রের পথে।

'প্রভু কি এই রাত্রে সমুদ্রের ধারে ছেলেটাকে খুঁজতে যাচ্ছেন নাকি?' কে

একজন বলে উঠল। স্পষ্টই চাপা বিদ্রূপের সুর।

কানে গেল, তবে প্রাণে গেল না। এ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, কদর্যোক্তি তাঁকে আর বিচলিত কি ক্ষুব্ধ করতে পারবে না। যে চিন্তা তাঁর সমস্ত সত্তা, সমস্ত জীবনটাকে মূল সুদ্ধ নাড়া দিয়েছে—তার কাছে সংসার, সমাজ, মানুষ—অনেক ক্ষুদ্র, অনেক তুচ্ছ।

না, শ্যামসুন্দরকে খুঁজতে তিনি যাচ্ছেন না। তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না—এ তিনি বেশ বুঝেছেন। উনিই তাকে বিদায় করেছেন। কিন্তু তাকেই কি শুধু? কে জানে! সেই কথাটাই একটু ভাবতে চান।

আসলে আজ নিজেকেই খোঁজবার সময় এসেছে। নিজের লক্ষ্য, নিজের সাধনা—নিজের ব্যর্থতা। নিজের কলুষ, মনের গোপন পাপও।

সেই তো সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা।

এত তপস্যাতেও, এত কৃচ্ছ্রসাধনেও মন নির্মল হয় নি।

এক সেবক—সে তাঁর জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেছিল, তাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন সুদূর নবদ্বীপে, সেখানে মাকে দেখবার কোন লোক নেই, এই অজুহাতে। কারণ? সে তাঁর ইচ্ছায়—এখন স্বীকার করছেন, অন্যায় ইচ্ছায় বাধা দিতে এসেছিল বলে। বাধাকে স্বীকার ক'রে নিলেও মনের গোপন উষ্মা যায় নি—বাধাদানকারীকে সরিয়ে দিয়েছিলেন।

সবচেয়ে অবিচার করেছেন বোধহয় নিত্যরূপানন্দ অবধূতের প্রতিই।

মাৎসর্য? অহংকার?

হ্যাঁ, তাই। মনের অগোচর পাপ নেই। এতদিন প্রাণপণে এই সচেতনতা-টাকে সরিয়ে রেখেছিলেন মনের মধ্যে, দেখতে বা সচেতন হতে চান নি। কিন্তু আজ সব হিসাবনিকাশ শেষ করতে বসে, কোন আত্মপ্রতারণার লেশমাত্র রাখবেন না।

আত্মস্বীকৃতিতে আত্মকলুষ মুছে দেবেন।

সহসাই এসেছিলেন নিত্যরূপানন্দ। বলিষ্ঠ পুরুষ, উদাত্ত মিষ্ট কণ্ঠস্বর, ওঁর মতো স্বার্থপর সাধনার সাধ তাঁর ছিল না—শুধুই হরিনাম বিতরণ, সৎবুদ্ধিতে মানুষকে উদ্বোধিত করা—এই ছিল তাঁর লক্ষ্য, তাঁর তপস্যা।

আর একজন উচ্চশিক্ষিত তরুণ উদ্দাম কৃষ্ণনাম-সংকীর্তনে নদীয়ায় প্রেমের বন্যা এনেছে—লোকমুখে এই অমৃতসংবাদ পেয়েই নবদ্বীপে ছুটে এসেছিলেন, ওঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন।

এই নিত্যরূপানন্দ অবধূত সেদিন পাশে না থাকলে নবদ্বীপে তান্ত্রিক সাধনার নামে মিথ্যা প্রচারের বর্মাবৃত ব্যভিচারী পাপাচারীদের অত্যাচার দমন করা যেত না।

বস্তুত তিনিই ঐ সব দুষ্কৃতকারীদের বৈষ্ণবভক্তে পরিণত করেছিলেন।

সেই শক্তি, সেই সাহস, সেই উদ্যম তার ছিল।

ছিল বলিষ্ঠ পৌরুষ। সেই সঙ্গে ছিল আশ্চর্য ক্ষমাগুণ, ছিল বুকভরা স্নেহ।

কৃষ্ণপ্রাণ নীলাচলে আসার পরও ওঁর কাছে ছুটে আসতেন। এখানেও তিনি পদার্পণ-মাত্র জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন।

তাঁর ব্যক্তিত্বে দীপ্তি ছিল, শক্তি ছিল।

ক্রমশ তিনিই যেন নায়ক বা ওঁর মণ্ডলীর প্রধান পুরুষ হয়ে উঠেছিলেন।

ইদানীং সে প্রাধান্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, এমন কি ওঁর একান্ত ভক্তসমাজে স্বীকৃতও।

ওঁকে তিনি কনিষ্ঠ অনুজের মতো দেখতেন, ওঁর কল্যাণকামী ছিলেন, সেই জন্যই মধ্যে মধ্যে নিজের ইচ্ছা দিয়ে ওঁর ইচ্ছাকে দমন করতেন। ওঁর শরীরের কথা চিন্তা করেই ওঁর উন্মাদদশাকে সংযত করার চেষ্টা করতেন, যুক্তি দিয়ে ওঁর অকারণ জিদকে খণ্ডন করতেন।

কিন্তু কৃষ্ণপ্রাণের তা ভালো লাগে নি।

তাই উনি সরিয়ে দিয়েছিলেন অবধূতকে।

কারণ একটা ছিল, একটা ইচ্ছা বা সংকল্প মনে মনে রূপ ধারণ করছিল অনেকদিন ধরেই।

গৃহস্থ জীবন যাপন করেও যে সাধনা করা যায়, এই দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। তবে সে কাজের জন্য বিশেষ ক'রে অবধূতকে নির্বাচন করার কি খুব প্রয়োজন ছিল?

উনি তাই করেছিলেন। নিত্যরূপানন্দ ছাড়া এ কার্য আর কারও দ্বারা সম্ভব হবে না এই কারণ দেখিয়েই উনি তাঁকে বঙ্গদেশে পাঠিয়েছিলেন—সেখানে বিবাহ ক'রে আদর্শ জীবন যাপন করার অনুরোধ জানিয়ে।

অবধূত কি বুঝেছিলেন কে জানে, ওঁর এই অদ্ভুত অনুরোধকে আদেশ-জ্ঞানে শিরোধার্য ক'রে নিঃশব্দে চিরকালের মতো সরে গিয়েছিলেন ওঁর জীবন থেকে।

আজ বুঝেছেন কৃষ্ণপ্রাণ যে, শুধু নিজের এই শুভবুদ্ধিকে কার্যকর করার জন্যই নয়—ওঁর প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ হচ্ছে তাঁর প্রাধান্যে, এই বোধটাও ওঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল এই অনুরোধে। তিনি ওঁর অন্তরঙ্গ-মণ্ডলীরও প্রধান নায়ক হয়ে উঠেছিলেন—এটা ভাল লাগে নি।

এই অবধূত জানতেন যে মানুষকে ভালবাসার মধ্যেও ঈশ্বরের স্পর্শ পাওয়া যায়। ঈশ্বর স্বয়ং সে ভালবাসা গ্রহণ করেন। প্রতিদানও দেন।

ঈশ্বরের প্রেম মানুষের মধ্য দিয়েই মানুষের কাছে পৌঁছয়।

সে উপলব্ধি ওঁর মধ্যে আসে নি—আত্ম-অহমিকার জন্য।

উনি নিজের সাধনার জোরে ঈশ্বরকে স্ব-রূপে সীমায়িত করে মাটিতে টেনে আনবেন এই অহংকার পোষণ করেছেন, স্বার্থপরের মতো ভেবেছেন সে অমৃত উনি একাই আস্বাদন করবেন, কেউ জানবে না।

তা-ই এসেছেন অবশ্য, ওঁর প্রতি করুণায় তিনি সেই অমৃত নিয়ে এসেছেন বার বার।

কিন্তু শ্যামসুন্দর যা বলেছিল—সেই স্পর্শমণি-লোভী উন্মাদের মতোই

তা চেয়ে দেখার কি বোঝার সময় পান নি—ছ্ঁড়ে ফেলে দিয়েছেন।

সবই বলেছে ঐ বালক। তিনিই নির্বোধ, কিছু বোঝেন নি। বুঝতে চান নি। পুরনো সংস্কারে বাঁধা তার মন, নতুন কোন কথা ভাবতে দেখতে চায় নি।

একদিন বলেছিল না একটা কথা? 'তোমার ঠাকুর যদি তোমার কাছে আসেনই, সেদিনের সে আনন্দ আমি ছাড়া কে বুঝবে, কে তার ভাগ নেবে? এই যে লোকগুলো তোমাকে নকল করার চেষ্টা করে—তাদের কি সাধ্য সে সিন্ধি সে আনন্দর মর্ম বোঝে?' *

তখন উনি অত কানও দেন নি ওর কথায়। বালকের বাচালতা মনে করেছিলেন—শুধুই কতকগুলো ফাঁকা কথা, কি বলছে বুঝি তার অর্থও জানে না ও।

আজও কি বলে গেল না?

'ভালবাসার পথে প্রেমের পথে সেবার পথে তোমার ভগবানকে চাও, তিনি যখন আসবেন তাঁকে চিনতে পারবে তো, গ্রহণ করতে পারবে?'...

হ্যাঁ, আরও বলেছে—'হয়ত এমনি বার বার এসেছেন তোমার ভালবাসা পেতে, চাইতে—বারবারই তাঁকে বিদায় ক'রে দিয়েছ—'

হায় রে! তখনও যদি তার কথায় কান ও মন দিতেন, ওজন বুঝতেন তার আপাত-বাচালতার!

সত্যই তো। ভালবাসার পথে প্রেমের পথে উনি লক্ষ্যে পেঁছিতে চেয়েছিলেন। সে লক্ষ্য সেই পথেই পেঁাচেছে ওঁর কাছে—উনি চিনতে বুঝতে পারেন নি। অবহেলায় বিদায় দিয়েছেন।

আজ মনে হচ্ছে, নানা রূপে তাঁর শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর প্রিয়তম, তাঁর প্রভু এসেছেন তাঁর কাছে। সেবক রূপে এসেছেন সেবা করতে, সন্তানের মতো এসেছেন স্নেহ আস্বাদ করতে। বুঝি এই ভাবেই আসেন। যুগযুগান্তর ধরে, জন্মজন্মান্তর ধরে আসছেন তিনি—নানা ভাবে নানা রূপে ভক্তদের কাছে। লীলাময় তিনি —এ সৃষ্টিও তাঁর লীলা, বাৎসল্য, সখ্য, দাস্য, প্রেম—এই সব বৃত্তিও তাই। তিনি নিজ সৃষ্টির এই সমস্ত সুধা, এই সমস্ত অমৃতরসস্রাবী বৃত্তি সম্ভোগ করতে চান।

কেউ বুঝেছে চিনেছে—কেউ পারে নি। তিনি ম্লান মুখে বিষণ্ণ চিত্তে ফিরে গেছেন।

---

* "তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর/তুমি তাই এসেছ নিচে/আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর/তোমার প্রেম হ'ত যে মিছে—"

• • • •

"তাই তো তুমি রাজার রাজা হয়ে/তবু আমার হৃদয় লাগি/ফিরছ কত মনোহরণ বেশে,/প্রভু, নিত্য আছ জাগি।/তাই তো প্রভু যেথায় এল নেমে/তোমারি প্রেম ভক্তপ্রাণের প্রেমে—"

—রবীন্দ্রনাথ

১৬

হয়ত যেমন আজও ফিরে গেলেন।

অস্থির হয়ে উঠে পাদচারণা করতে লাগলেন জনহীন সমুদ্রবেলায়।

অন্তরঙ্গ একান্ত অনুগামী যে কয়জন ভক্ত সেবক এসেছেন সঙ্গে, তাঁরাও নিঃশব্দে দূরে অবস্থান করছেন, নিকটে যেতে সাহস নেই। সন্ন্যাসীর মনে যে কোনও কারণে একটা বিপর্যয় ঘটেছে, তা সকলেই বুঝছেন।...

মাথার উপরে অসীম আকাশ, নিঃসঙ্গ শারদ চন্দ্র, নিচে সীমাহীন অপার সমুদ্র। রজত পর্বতের মতো আবেগের তরঙ্গ তুলে নিষ্ফল বেদনায় আছড়ে ভেঙে পড়ছে। অনন্তকাল ধরেই এমনি চলছে।

যুগ-যুগান্তর ধরে। আজও সে নিষ্ফল, নিঃসঙ্গ।

সবাই নিঃসঙ্গ। তিনিও।

তবু মনে হতে লাগল এই আকাশ, এই সমুদ্র, এই নিশীথ রাত্রি—যেন তাঁকেই বিদ্রূপ করছে।

হে প্রভু, হে নাথ—তুমি কি তাহলে এই বেশেই এসেছিলে ওঁর কাছে! সেবক রূপে, সন্তান রূপে? সব প্রেমই যথার্থ হলে, সত্য হলে—পূর্ণ হলে, এক হয়ে যায় এই শিক্ষাই দিতে চেয়েছিলে? তাই কি ওর দিকে চেয়ে স্ত্রী বা পুরুষ, বালক কি বয়স্ক কোন বোধ থাকত না—সব এক হয়ে যেত, এক অখণ্ড দেহাতীত সত্তা বলে বোধ হ'ত?

অনেকেই তো এসেছে ওঁর কাছে।

হয়ত তিনিই এসেছেন বার বার, এখনও আসছেন। পরীক্ষা করতেই আসছেন বুঝি।

আজ অনেকের কথাই মনে হচ্ছে।

কিশোর শ্রীকৃষ্ণবেশী রাজকুমার—ভক্তপ্রধান রাজার সন্তান; উনি সাক্ষাৎ কৃষ্ণজ্ঞানেই তো আলিঙ্গন করতে গেছেন, সে প্রণাম করতে স্বপ্ন ভেঙেছে—দুঃখ পেয়েছেন, আশাভঙ্গের বেদনা।

এমনি আরও কত এসেছে। গৌড়ীয়, উড়িয়া, ঝাড়খণ্ডী। কত, কত। বার বারই নিজেকে প্রতারিত প্রবঞ্চিত মনে হয়েছে। অভিমান হয়েছে ইষ্টের উপর। এই তো সেদিনও—সোমেশ্বর এসেছে। শ্রীকৃষ্ণের রূপ ধরে কৃষ্ণলীলার অভিনয় যখন করছিল তখন তো তাকে ওঁর ধ্যানের ধন বলেই বোধ হয়েছিল। এসেছে শিবদাস, সেও এসেছিল ওঁর ভালবাসা, আদর পেতে। নৃপতিসদৃশ ভূস্বামীর একমাত্র কিশোর পুত্র রামনাথ—সর্বস্ব ত্যাগ ক'রে, অতুল ঐশ্বর্য, নবোঢ়া বধূ, বাপ মা সব ছেড়ে ওঁকে তুষ্ট করতে ভিখারীর ভিখারী হয়েছে, তপস্যার কঠোরতায় ওঁকেও অতিক্রম ক'রে গেছে।

ভালবেসেছেন, যত্ন করেছেন—কিন্তু নিতান্তই বাৎসল্য ভাব বলে একে অবহেলা করেছেন, হতাশ হয়েছেন। হতাশ হয়েছে ওরাও—ওঁর কাছে স্নেহ আশা করেছে বলে—কান্তাপ্রেম বা সেবিকার সেবা চায় নি বলে।

সন্তান রূপেও যে সেবা নেওয়া যায়—সেবা নিয়েও যে তাঁর সেবা করা যায়

—এই জ্ঞানটাই ওঁর ছিল না।

কে জানে ঈশ্বরও হয়ত এই অনন্ত সীমাহীন বিশ্বে একক। নিঃসঙ্গ।

তিনি প্রেম নয়—স্নেহেরই কাঙাল।

প্রেমে যে ভজনা করে তারও স্বার্থবোধ থাকে। সে সুখ চায়, আনন্দ চায়, ঐকান্তিকতা চায়, তার পরিবর্তে। কিন্তু বাৎসল্য স্নেহে কিছু পাবার প্রত্যাশা থাকে না, পিতা সন্তানদের ভালবেসেই সুখী, তাদের সুখেই পিতার সুখ। জীবনের সব বিলাস, ভোগসুখ পিতামাতা বিসর্জন দেয় সন্তানের জন্য।

বাৎসল্য স্নেহ, শুধুই দিতে চায়। এ স্নেহ অনাবিল, অমলিন—আপাত-স্বার্থলেশহীন।

সেই জন্যই তিনি এসেছেন, আসেন—ভালবাসার ভিখারী হয়ে।

শ্যামসুন্দর তাঁর বুকে মুখ গুঁজে বলেছিল, 'আমাকে একটু ভালোবাসো না!'

অন্ধ তিনি, নির্বোধ তিনি—তখনও বোঝেন নি।

এই আত্মধিক্কার ও অতীত স্মৃতিমন্থনের মধ্যেই একসময় সত্য প্রতিভাত হ'ল।

অকস্মাৎ যেন অবর্ণনীয় অকল্পনীয় আনন্দে দিশাহারা হয়ে পড়লেন।

মনে হল কত শত যেন সঙ্গীতের সুর আকাশে বাতাসে, কত সুগন্ধ, কত সৌন্দর্য। যেন আকাশে বাতাসে ওঁর এই অনির্বচনীয় তৃপ্তি ; সাফল্য ও সিদ্ধির তৃপ্তি, আনন্দ-উন্মাদনা ছড়িয়ে পড়েছে—

এতদিনের সাধনা তো সফলই হয়েছে তাঁর। এটা কেন এতক্ষণ তাঁর মাথায় যায় নি। তিনি আজ সত্যই সিদ্ধ। দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষা, আকুলতা ক্রন্দন—সংশয়-যন্ত্রণার অবসান ঘটেছে।

তিনিই তো এসেছেন। সেবা করতে, ভালবাসতে। ভালবাসা চেয়েছিলেন—সে ভালবাসা কি কৃষ্ণপ্রাণ দেন নি? হয়ত তত বাহ্য প্রকাশ ছিল না, ছিল না—সংস্কারে বেধেছিল বলে, কিন্তু ওঁর মনের ভাব কি তাঁর অজানা ছিল?

ভক্তকে সেবা ক'রেই তাঁর সমধিক তৃপ্তি বুঝি, সেই লীলারস আস্বাদন করতেই চেয়েছিলেন।

জগন্নাথ প্রভুর কাছে নিত্য কেঁদেছেন—সেই কান্নার সমুদ্র পার হয়ে তিনি ঐ রূপেই এসেছেন ওঁকে পূর্ণতা দিতে, সিদ্ধি দিতে।

ওঃ! এ কি আনন্দ! এমন আনন্দ যে মানবজন্মে আছে, পাওয়া যায়, আনন্দ যে এমন সর্বপ্লাবী হয়—কখনও তো ভাবেন নি।

আর কিছু চাই না তাঁর। কাউকে কিছু বলার নেই, পাওয়ার নেই।

উনি জানেন না পূর্বেকার সিদ্ধ সাধকরা নির্বিকল্প সমাধিতে কি আনন্দ পেয়েছিলেন—জানতে চানও না। তিনি যা পেলেন তা কি কেউ পেয়েছে?

পূর্ণতা পৌঁচেছে ওঁর কাছে। তিনি এখন চান তাতে মিশে যেতে, পূর্ণ হ'তে।

"জগন্নাথ স্বামী প্রভু প্রাণেশ্বর—এসো এবার ঐ রূপেই এসো। সেবক রূপে, ভালবাসার কাঙাল রূপে। চরণে নয়, বুকে স্থান দাও—"

বলতে বলতে উদ্বাহু নৃত্যের মতো ভঙ্গীতেই সমুদ্রের দিকে এগিয়ে গেলেন।

কি দেখলেন সেই পরিপূর্ণ-জ্যোৎস্নাশীর্ষ বিশাল নীল কৃষ্ণাভ তরঙ্গের মধ্যে কে জানে।

সে কি জগন্নাথের দারুমূর্তি ? সে কি গুঞ্জ মাল্যধারী গোপীজনবল্লভ কল্পনার শ্রীকৃষ্ণকে ? না কৌতুকহাস্যরঞ্জিত-অধর বালক শ্যামসুন্দরকে ?

তার কোন ইতিহাস লেখা নেই কোথাও।

উনি উন্মাদের মতো, আনন্দোন্মত্তের মতো পিতৃক্রোড়পিপাসু শিশুর মতো গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন—ভয়ঙ্কর সুন্দর বিপুল রহস্যময় পর্বতসদৃশ তরঙ্গের মধ্যে—সেই তরঙ্গ যেন ওঁকে পরম স্নেহে চরম প্রেমে আচ্ছাদিত ক'রে নিয়ে গেল এক চির-রহস্যময় আনন্দলোকে। যেখানকার রহস্য চিরঅজ্ঞাতই থেকে যাবে আমাদের কাছে। যেখানের বার্তা কোনদিনই এখানে পেঁছিবে না।

সমাপ্ত

কঠিন মায়া

শ্রীধ্যানেন্দ্রকুমার মিত্র

শ্রীচরণেষু

॥ ১ ॥

সর্বেশ্বর কলকাতার এক মেসে থাকে। কখনও কদাচিৎ দেশে যায়। দেশে ওর থাকার মধ্যে আছেন এক পিসিমা। জমি-জায়গা যা আছে তা থেকেই তাঁর সম্বচ্ছরের চালটা হয়ে যায়, কোন কোন বছর বরং কিছু ধান বেচে দু'চারটে টাকাও হাতে আসে। সুতরাং সর্বেশ্বরের কোন দায় নেই, বছরে খান-চারেক পোস্টকার্ড আর মাঝে মাঝে দু-পাঁচটা টাকা পাঠিয়েই সে খালাস।

কিন্তু দায় না থাকলেও টান একটা ছিল। বাবা-মাকে কখনও দেখে নি সে—দেখলেও সে কথা বিশেষ মনে পড়ে না। জন্মে পর্যন্ত আত্মীয় বলতে, অভিভাবক বলতে সে এই পিসিমাকেই দেখেছে, তাই হঠাৎ টেলিগ্রামখানা পেয়ে সে একটু ব্যস্তই হয়ে পড়ল। টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন কে একজন বনমালী ঘোষাল—লেখা আছে, "তোমার পিসিমা মৃত্যুশয্যায়—শীগ্‌গির এসো।" বনমালী ঘোষাল কে তার ঠিক মনে পড়ল না। পাড়ারই লোক হয়ত, দেখলে মনে পড়বে। সেটা বড় কথা নয়—পিসিমার অসুখ সেইটেই বড় কথা। তিনি ভাল আছেন জেনেই সে নিশ্চিন্ত থাকে। এতটা উদাসীনও থাকতে পারে দেশ সম্বন্ধে। আজ এই টেলিগ্রামখানা পেয়ে সে নতুন ক'রে বুঝল যে তার সমস্ত নিশ্চিন্ততা ও নির্ভরতার মূলে আছেন এই পিসিমাই। পিসিমা না থাকা মানে যে কি, ভাবতেই তার মাথা ঝিমঝিম ক'রে উঠল।

অতএব সে প্রায় পত্রপাঠ-মাত্রই প্রস্তুত হ'ল। কিছু টাকা যোগাড় ক'রে নিয়ে পিসিমার জন্যে কিছু ফল ও একশিশি হর্লিকস্ কিনে পরের দিনই সে ভোরের ট্রেনে চেপে বসল এবং বেলা ন-টার মধ্যেই দেশের বাড়িতে এসে উপস্থিত হ'ল।

কিন্তু ওদিকে যত দ্রুতই এসে থাক্—বাড়ির সামনে এসে থমকে দাঁড়াতে হয় ওকে। বন্ধুমহলে সে যতই যা জারিজুরি করুক, আসলে সেও সাধারণ দুর্বল মানুষই। কি খবর শুনবে বা কী দৃশ্য দেখবে—এই ভেবে যেন পা ওঠে না। বুড়ী বেঁচে আছে তো? ডাকতে গিয়ে যেন গলা কেঁপে যায়। তবু প্রাণপণে গলায় জোর দিয়ে ডাকে—'পিসিমা!'

ডেকেও কান পেতে রইল—তেমন অসুখ হলে প্রতিবেশীরা কেউ না কেউ থাকবেই। কিন্তু কৈ, তাদের কারও গলা শোনা যাচ্ছে না তো! কোন সাড়াই নেই কোথাও। আর একটু ইতস্ততঃ ক'রে বাগানের আগড়টা ঠেলে ঢুকে পড়ল; খানিকটা ভেতরে এসে আবার হাঁক দিল, 'পিসিমা!'

এবার ভেতর থেকে সাড়া এল—'কে রে, সবু এলি? আয় আয়।'

সর্বেশ্বর আশ্বস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি সদর দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল। কিন্তু এ কি! পিসিমা তো শুয়ে নেই! দিব্যি রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে কাঠের উনুনে পাতা জেলে কি যেন রান্না করছেন। এই মানুষের অসুখ শুনে সাত

দেশ দূর থেকে ছুটে দেখতে এল সে ? সে কতকটা অবাক হয়েই দাঁড়িয়ে গেল।

'আয় রে, অমন দাঁড়িয়ে রইলি কেন ? ভেতরে আয় !' নিবন্ত উনুনে ফুঁ পাড়তে পাড়তে বলেন পিসিমা।

তারপর চোখ তুলে চেয়ে বলেন, 'ইস ! কী ছিরির চেহারা ক'রে এসেছিস বল তো ? চিরদিন কি তোর সমান গেল ? ঐজন্যেই তো এবার উঠে-পড়ে লেগেছি। যেমন কুকুর তেমনি মুগুর না হলে তোমার চলবে না।'

বাস্তবিক সর্বেশ্বরের চেহারাটা দেখবার মতোই। যেমন রুক্ষ তেমনি শ্রীহীন, লম্বা একহারা চেহারা, কতদিন দেহে তেল-জল পড়ে নি তা অনুমান করাও কঠিন। মাথার চুলগুলো ধুলোয় বিবর্ণ। গায়ে একটি ময়লা কোট,—সে কোট হয়ত এককালে সাদাই ছিল, এখন ধুলো-ময়লা এবং নানাবিধ দাগে তা এক বিচিত্রবর্ণ ধারণ করেছে। হাতে এক টোল-খাওয়া পুরনো সুটকেস আর এক হাতে একটা থলিতে পিসির জন্যে ফলমূল। সর্বেশ্বর অবাক হয়ে খানিকটা চেয়ে থেকে বললে,—'তবে যে শুনলুম তোমার মরণাপন্ন অসুখ ! কে এক বেটা বনমালী ঘোষাল তার পাঠিয়েছে—'

বাধা দিয়ে পিসিমা ব'লে উঠলেন,—'ওমা, ও কী কথার ছিরি রে ! সে তোর গুরুজন যে। তার তো বেয়াইকে আমিই করতে বলেছি। জানি যে এধারে যত চাল্লি-বেচাল্লিই করুক, আমার অসুখ শুনলে সবু ঠিক ছুটে আসবে। আয় আয়, বোস—'

পিসিমা দাওয়ার ওপরই একটা পিঁড়ি এগিয়ে দিলেন।

সুটকেসের গায়ে থলিটা ঠেস দিয়ে রেখে সর্বেশ্বর পিঁড়িটা টেনে নিতে নিতে বললে,—'তা তো হ'ল, কিন্তু বেয়াইটি আবার কোথা থেকে গজালো ? আর তুমিই বা তাকে তার করতে বললে কেন ?'

'নইলে তুই যে আসতিস না বাবা !' একগাল হেসে পিসিমা বলেন, 'তোকে তো আমি চিনি।'

'তা আমাকে আনবার কি এমন জরুরী দরকারই বা পড়লো ?'

'তোর যে বে'র ঠিক করেছি রে ! ঐ বনমালী ঘোষালের মেয়ের সঙ্গেই। ...বনমালীকে তোর মনে নেই ? আমার ভাসুরপোর আপনার পিস্‌শ্বশুর। সেই তোর পৈতের সময় এসেছিল এখানে ! ওর মেয়েও এসেছিল নাকি, তুইও দেখে থাকবি।...বেশ মেয়েটি। আমার অবশ্য তেমন মনে নেই—তবে এবার নিজে গিয়ে দেখে এসেছি। মেয়ে ভাল, বংশও জানা-শুনো—মিছিমিছি দেরি ক'রে লাভ কি ? সামনের তরশুই বিয়ে ঠিক ক'রে ফেলেছি—আজ পাকা দেখা। সব ব্যবস্থা কম্‌পিলিট্‌ !'

একগাল হাসলেন পিসিমা। ইংরিজি বলতে পারার আনন্দেই বোধ হয়।

'তা—তার মানে ?' হতভম্বের মতো প্রশ্ন করে সর্বেশ্বর, 'তার মানে কি ?'

'মানে আবার কি ? বিয়ে ! বিয়ে কথা শুনিস নি কখনও ? না মানুষের বয়েস হ'লে বে হয় তা জানিস না ?...ঐ যা, উনুনটা বুঝি আবার

নিভে গেল!' পিসিমা ব্যস্ত হয়ে ফুঁ পাড়তে থাকেন উনুনে।

'তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল পিসিমা!' এবার সর্বেশ্বর উঠে দাঁড়ায়।

'কেন বাবা, মাথা খারাপ হবার কি আছে?' দস্তুরমতো ঝেঁজে ওঠেন পিসিমা, 'তোমার কি বিয়ের বয়স হয় নি—এখনও কি কচি খোকাটি আছ?'

'কচি খোকাটি নেই বলেই তো বলছি পিসিমা! বয়েসের কি গাছপাথর আছে নাকি? এখন আর বিয়ে করা সাজে না আমার!'

'আচ্ছা আচ্ছা, ঢের হয়েছে। আজকাল দুকুড়ি বয়েস পেরিয়ে গিয়ে কত লোকে বে করছে। তোর তো এই ষেটের চৌত্রিশ হ'ল। তা ছাড়া সে আমরা বুঝব। আমি বুঝব—মেয়ের বাবা বুঝবে। তোর কি? আমরা কি মরে গেছি—না তুই-ই আউট হয়ে গেছিস?'

সর্বেশ্বর এবার ব্যাকুল হয়ে ওঠে একেবারে—'কি বলছ পিসিমা, এই তো আমার অবস্থা, অদ্যভক্ষো ধনুর্গুণো, না চাল না চুলো—নিজেই খেতে পাই না অর্ধেক দিন—বৌ-ছেলে পুষবো কি?'

'তোমার ঐ সব বড় বড় বাক্যিতে ভুলেই তো এতদিন চুপ ক'রে ছিলুম বাছা, আর আমি ভুলছি নে। বৌ আমার কাছে থাকবে—আমি তাকে খেতে দেবো। একটা পেট, তার জন্যে কত খরচ বাড়বে শুনি? আমার যা আছে তাতে একটা বৌ পুষতে পারব না?'

'কিন্তু তার পর?'

'তারপর তুমি রোজগার করবে। তুমি ইচ্ছে করলেই চাকরি করতে পারতে বাছা। এখনও কি আর জুটিয়ে নিতে পারো না! না হয় অন্য কোন কাজেই রোজগার করবে। পুরুষ মানুষ—মুটেগিরিতেও পয়সা। সেজন্যে আমি ভাবি না। ঘাড়ে চাপ পড়লে পথও ঠিক খুঁজে পাবে।'

সর্বেশ্বর অসহায় ভাবে এদিক ওদিক তাকায়। আকুল হয়ে বলে—'তুমি বুঝতে পারছ না পিসিমা। দোহাই তোমার—'

'খুব বুঝেছি, ঢের বুঝেছি। আমি আর তোমার কোন কথা শুনতে চাই না। তোমার ও ভোচ্‌কানিতে আর ভুলছি নি। এতদিন জোর ক'রে দেওয়া উচিত ছিল—না দিয়ে আহাম্মুকি করেছি।'

'পিসিমা, লক্ষ্মীটি—কথা শোন। আর যা করতে বলবে করবো, উটি পারব না।'

'দ্যাখ্‌ সবু, আমি সে ভদ্দরলোকদের কথা দিয়েছি, এখন যদি তুমি গোলমাল করো, তোমার সামনে মাথা খুঁড়ে রক্তপাত করবো—তা বলে দিলুম।'

'তারা সব জানলে কখনও রাজী হ'ত না।' সর্বেশ্বর শেষ অবলম্বন হিসেবে বলে।

'তারা সব জানে বাছা—বনমালী কলকাতায় গিয়ে তোমার হালচাল সব দেখে এসেছে নিজে চোখে।'

'কী সর্বনাশ!' অতিকষ্টে সর্বেশ্বরের মুখ দিয়ে কথাগুলো বেরোয়।

'নে, এখন দাড়িফাড়ি কামিয়ে একটু সভ্য হয়ে নে দিকি। ভদ্দরলোকেরা এখুনি এসে পড়বেন। ওঁরা সকালে আশীর্বাদ করবেন—আমরা যাবো বিকেলে। যা, চান ক'রে আয়। মুখে একটু জল দে—'

সর্বেশ্বর রাগ ক'রে বলে—'আমি দাড়ি কামাবো না, চান করবো না—কিচ্ছু করবো না। মেয়ে দিতে হয় তো এমনি পাত্তরেই দেবে—আমি কেমন পাত্তর দেখেই দিক্ তারা···নাও, এখন একটু চা দেবে?'

॥ ২ ॥

বনমালী ঘোষাল কথামতো ঠিক এগারোটার সময় এসে উপস্থিত হলেন। সর্বেশ্বর ওঁরই অপেক্ষায় যেন ওৎ পেতে ছিল—বাগানের মুখেই ধরল তাকে। একহারা পাক্‌সিটে চেহারা বনমালীর। গলাবন্ধ সস্তা কোটের ওপর একটা পাকানো চাদর গলায় বাঁধা—হাতে একটা লাঠি এবং বগলে ছাতি। ওকে দেখে বেশ প্রসন্ন হাস্যেই বললেন, 'এই যে বাবাজী, এসে গিয়েছ। বেশ বেশ। জানি আসবে। বেয়ানও তাই ব'লে রেখেছিলেন—যে দেখো, ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে আমার ছেলেকে মিলিয়ে নিও। আমার অসুখ শুনলে আর সে থির থাকতে পারবে! হেঁ হেঁ—তা কথাটা ঠিক, স্নেহের টান একটা থাকবে বৈকি, থাকবেই তো!'

বাধা দিয়ে সর্বেশ্বর একেবারে কাজের কথা পাড়ল—'দেখুন, একটা কথা—বলি আপনাদের কি মাথা খারাপ হয়েছে?'

'কেন বাবাজী—কৈ সে রকম তো—'

'তা নইলে আমার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে চাইতেন না। চেয়ে দেখেছেন আমার দিকে?'

'বিলক্ষণ! তোমাকে কি আজ থেকে দেখছি? সে-ই এতটুকু বেলা থেকে দেখে আসছি যে!'

'বলি এখন একবার তাকিয়ে দেখেছেন?'

'এই তো সেদিনেও কলকাতায় তোমার বাসার পাশে উড়ে ঠাকুরের ফুলুরির দোকানে ঘাপ্‌টি মেরে বসে থেকে তোমায় দেখে এলাম—'

'আমার এই চেহারা দেখেও আপনার জামাই করতে ইচ্ছে করে?'

সর্বেশ্বর নিজের খোঁচা-খোঁচা দাড়ি ও ময়লা কোটে একবার হাত বুলিয়ে নেয়, 'বিলক্ষণ, চেহারা তোমার এমন খারাপটা কি বাবা? খারাপ করে রেখেছ বৈ তো নয়! তা দ্যাখো বাবাজী, অমন হয়। বেশী বয়স পর্যন্ত বিয়ে-থা না হ'লে—তার ওপর যদি একা একা বাইরে পড়ে থাকতে হয় তো—বয়সের সঙ্গে সঙ্গে নানারকম ছিট দেখা যায়। ঐ চেহারা কি তোমার থাকবে ভেবেছ? আমার মেয়ের পাল্লায় পড়ো—সে সব ঠিক হয়ে যাবে। মেয়েকে তো আমার এখনও

দেখ নি বাবাজী ! মেয়ে আমার খুব কড়া—শক্ত মেয়ে !'

বেশ নিশ্চিন্ত ভাবে বলেন বনমালী ঘোষাল।

সর্বেশ্বরের মুখ আরও শুকিয়ে ওঠে।—'কিন্তু আমার চাল নেই চুলো নেই, রোজগার নেই ! মেয়ের ভবিষ্যতের দিকটা একবার ভাবছেন না ?'

'কেন বাবাজী ? চাল-চুলো এই তো দিব্যি রয়েছে। একটু পুরোনো ? তা মেরামত করিয়ে নিলেই আবার বেশ চলবে। সব লোককে যে কলকাতাতেই থাকতে হবে তার মানেটা কি ? তুমি কলকাতায় থাকবে কাজকারবার দেখবে, শনিবারে শনিবারে বাড়ি আসবে, তার আর গোলমালটা কি ? আর ধরো ফি শনিবারেই যে আসতে হবে—তারই বা মানে কি ? এই যে আমার জ্যাঠা-মশাই—তিরিশ বছর চাকরি করেছিলেন কলকাতায়, মোট একশ বাইশটি দিন দেশে এসেছিলেন তার ভেতর। জেঠাইমা তো চিরকালটা দেশেই কাটালেন। তা কৈ, আত্মঘাতী হ'তে চেয়েছিলেন, কি লুকিয়ে কলকাতায় চলে গিয়েছিলেন এমনও তো শুনি নি ! ছেলেমেয়ে জমিজায়গা নিয়ে তিনি দিব্যি ছিলেন।'

'কিন্তু মেয়ে আপনার কি খাবে তার খোঁজ রাখেন ?'

'বিলক্ষণ ! নইলে কি চোখ বুজে মেয়ে দিচ্ছি বাবাজী ? কলকাতাতে আমার বড় ভাগ্নি-জামায়ের বাড়ি। সেও কম নয়, উকীল—পুলিশ-কোর্টের দুঁদে উকীল। তা তাকেও বিশেষ দরকার লাগে নি, আমি একাই সব করেছি। তিন দিন সেখানে থেকে, ধরো তা ঐ তিন-কুড়িং ষাট ঘণ্টাই বলতে গেলে, তোমার খবরাখবর নিয়েছি। রোজগার তুমি নানা রকমে করো তা আমি অনেকের মুখেই শুনেছি। খরচের হাত—দু'হাতে খরচ করো !···খেয়াল হ'লে রোজগার করো—নইলে দশদিন চুপ ক'রে শুয়ে বিড়ি খাও—এই তো ? সব খবর আমার নেওয়া হয়ে গেছে যে ! না জেনে-শুনে কি আর হাত-পা বেঁধে জলে দিচ্ছি মেয়েকে ভেবেছ বাবা ? ভবঘুরের মতো থাকা—ও একটা খেয়াল, শুনেছি বিলেতের দিকে ছেলেছোকরাদের মধ্যে অনেকেরই ও ব্যামো আছে। তা থাক—ওসব খামখেয়াল বিয়ের আগে অমন একটু-আধটু ছোকরাদের থাকেই, ও কি আর ধর্তব্যের মধ্যে ? ঘাড়ে জোয়াল পড়লে ব্যামোই বলো আর খেয়ালই বলো—কিচ্ছু থাকবে না। সে তুমি ভেবো না। আর আমার মেয়েও তেমন নয়, তাকে এখনও দ্যাখোনি, তাই ভাবছ। সে তোমাকে দুদিনে তৈরি ক'রে নেবে, সে বড় কঠিন ঠাঁই, গুরু শিষ্যে দেখা নাই !'

'কিন্তু'—প্রায় মরীয়া হয়ে ব'লে ফেলে সর্বেশ্বর—'কিন্তু আমার স্বভাব-চরিত্রই যে একদম ভাল নয়, সে কথাটা কেউ বুঝি বলে নি আপনাকে ?'

উচ্চাঙ্গের হাসি হাসেন বনমালী ঘোষাল, 'হাজার হোক তুমি ছেলেমানুষ বাবাজী। ও যে কাটান-মন্তর সে কি আর তুমি আমাকে শেখাবে ? না, সে খোঁজ না নিয়ে আমি অমনি ছেড়েছি ? সবাই বলেছে, গঙ্গাজলের মতোই পরিষ্কার তোমার চরিত্র। তবে কখনও-সখনও একটু-আধটু দৈবে-সৈবে লুকিয়ে-চুরিয়ে কিছু যদি ক'রেই থাকো সে কি আর ধরতে আছে—ধরো গঙ্গাজলেও তো কত কি ময়লা এসে পড়ছে ! তাতে কি গঙ্গাজলের মহিমে কমে ? তা ছাড়া মনে

করো পুরুষ পরেশ, পুরুষের গায়ে ওসব দাগ লাগে না। যাক গে, এখন চলো বাবাজী—ভেতরে চলো—মিছিমিছি কথায় কথায় সময় পেরিয়ে যাচ্ছে!'

একরকম জোর ক'রেই তাকে টেনে আনেন বনমালী ঘোষাল—'কৈগো বেয়ান ঠাকুরুণ, কোথায় গেলেন?…'

'এই যে আসুন আসুন।…দেখেছেন ছেলের কাণ্ডটা! বললুম এত ক'রে যে, ক্ষেউরি হয়ে চান ক'রে নে—না ইচ্ছে ক'রে অমনি জংলী হয়ে রইল!'

হাসিমুখে এগিয়ে এলেন পিসিমা।

'বিলক্ষণ! আজকালকার ছেলে ওরা, গায়ে ইয়ে মেখে যমকে এড়াতে চায় আর কি! ওরে বাবা, গায়ে ময়লা মাখলে যম হয়ত ছাড়ে—বৌ ছাড়ে কি?… আপনি মিছে মন খারাপ করবেন না বেয়ান। আপনার ছেলেকে আমি চিনে নিয়েছি—সেই জন্যেই তো কুটুম-সাক্ষাৎ নিয়ে আশীর্বাদ করতে আসি নি। একাই চুপি চুপি এসেছি। নিন, দেন দিকি একখানা আসন পেড়ে আর একঘটি গঙ্গাজল! ধান দুর্বো আমি দিচ্ছি—সব পকেটে ক'রেই এনেছি।'

'সে কি আর আমার যোগাড় ছিল না বেয়াই!' মৃদু অনুযোগ করেন পিসিমা।

'বিলক্ষণ! আপনি একা মানুষ, যদি না যোগাড় করতে পেরে থাকেন! তাই জন্যেই তো—'

বনমালী ঘোষাল নিজেই উদ্যোগ ক'রে পুকুর থেকে পা ধুয়ে বেয়ান ঠাকরুণের হাত থেকে আসনখানা টেনে নিয়ে পরিপাটি ক'রে পেতে নিলেন। পাত্রের আসনখানা পিপিমা পাতছিলেন—'উঁহু, হ'ল না বেয়ান, হ'ল না,! পূর্বাস্য হয়ে বসতে হবে যে'—বলে নিজে আবার ঘুরিয়ে ঠিক ক'রে পাতলেন। তারপর সর্বেশ্বরের কনুইতে এক হ্যাঁচকা দিয়ে বললেন—'তা হ'লে আর দেরি ক'রে লাভ নেই বাবাজী—কি বলো?'

বলবার ফুরসুতও অবশ্য হ'ল না। স্তম্ভিত ও হতভম্ব সর্বেশ্বরকে প্রায় টানতে টানতেই এনে আসনে বসিয়ে দিলেন। গঙ্গাজলের ঘটি থেকে এক খাব্‌লা জল নিয়ে নিজের মাথায় খানিকটা দিয়ে বাকি সবটাই ছড়িয়ে দিলেন সর্বেশ্বরের গায়ে। হঠাৎ খানিকটা জল গায়ে লেগে সর্বেশ্বর চমকে উঠল।

'স্নান সেরে নিতে হয়—সেই কাজটাই সারা হয়ে গেল আর কি! বুঝলে না?' এই ব'লে মুচকি হেসে বনমালী 'ওঁ বিষ্ণু' ইত্যাদি ব'লে আচমন ক'রে নিলেন। সুউচ্চ কণ্ঠে গায়ত্রীটা সেরে যথারীতি সর্বেশ্বরের কপালে চন্দনের ফোঁটা লাগিয়ে ধানদুর্বা সিদ্ধি প্রভৃতি দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। এবং অম্লান বদনে নিজের পা দুটি বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'তা হ'লে প্রণামটা সেরে নাও বাবাজী —যে কাজের যা!'

সর্বেশ্বর চোখমুখ বিকৃত ক'রে কোনমতে কাজটা সেরে নিল। তখন বনমালী আবার পা গুটিয়ে নিয়ে বললেন—'অমনি গায়িত্রীটা বাবাজী—যদি মনে থাকে তো একবার আউড়ে ফ্যালো।'

তারপর ট্যাঁক থেকে দশটি টাকা বার ক'রে ওর অনিচ্ছুক হাতের মধ্যে

গুঁজে দিয়ে বলে উঠলেন,—'মাধব, মাধব! সর্বকার্যেষু মাধব!...শ্রীহরি শ্রীদুর্গা! মাগো, ভালয় ভালয় চারহাত এক ক'রে দাও মা!' এই ব'লে এক হুংকার ছাড়লেন,—'কৈগো বেয়ান ঠাকরুণ, কী জলখাবার-টাবার দেবেন দিন। যে কাজের যা—শুভ কাজের নিয়মগুলো মানতে হবে তো! সময় নেই হাতে মোটে—আমাকে আবার এখুনি রওনা হ'তে হবে।'

পাড়ার দু-চারটি মেয়ে ইতিমধ্যে এসে গিয়েছিল। তাদেরই একজনকে পিসিমা ইঙ্গিত করলেন। সে শাঁখটা নামিয়ে রেখে ছুটে গিয়ে একথালা জল-খাবার নিয়ে এসে বনমালীর সামনে সাজিয়ে দিল।

পিসিমা বললেন—'কিন্তু এখনই গেলে চলবে কি ক'রে? ভাত খেয়ে যাবেন না? এই দুপুরবেলা না খেয়ে যাবেন কি করে?'

মুখের মধ্যে একটা গোটা রসগোল্লা পুরে প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে বনমালী বললেন—'আর একদিন,—আর একদিন। সে আর একদিন হবে। আজ মোটে সময় নেই। আপনারা যাবেন, আমাকেই তো আবার ওদিকের গোছগাছ করতে হবে। একা মানুষ—চার হাত তো আর বার করতে পারব না!'

॥ ৩ ॥

বনমালী চলে যাবার পর সর্বেশ্বর অনেকক্ষণ সেখানেই গুম্ হয়ে বসে রইল। একটা আহাম্মুকি ক'রে ফেলেছে সে আগেই—কোটটা খুলে পিসিমার ঘরের হুকে টাঙিয়ে রেখে এসেছে। শধু গেঞ্জিটা আছে তার গায়ে। খানিকটা বসে থাকবার পর বার-দুই সতৃষ্ণ নয়নে সেদিকে চেয়ে দেখল সে। কিন্তু পিসিমা দাওয়া ছেড়ে নড়বার কোন লক্ষণই দেখালেন না।

অবশেষে একসময় প্রায় মরীয়া হয়েই উঠে পড়ল সর্বেশ্বর। ধীরেসুস্থে সহজ নিরুদ্বিগ্ন ভাবে সে ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু জামাটার কাছে পৌঁছবার আগেই পিসিমা হুংকার দিয়ে উঠলেন ওদিক থেকে, 'উঁহু—ওদিকে এখন যেতে হবে না সবু। বেরিয়ে আয় ওখান থেকে—'

সবু মুখখানাকে প্রাণপণে সহজ করবার চেষ্টা ক'রে বলে, 'না, মানে এই একটু পাড়াটা ঘুরে আসতুম।—অনেকদিন তো আসি নি দেশে।'

'এখন এই ঠিক-দুপুরবেলা পাড়া ঘুরতে যাবে তুমি!...বলে অন্য সময় ঠেলে পাঠাতে পারি না! ওসব হবে-টবে না বাবা—সাফ ব'লে দিলুম।... তোমাকে আমি চিনি। দেখছ তো এই মেয়ের পাল। ওবেলা আশীর্বাদ করতে যাবো, তাও নয়নদার সঙ্গে এদের পাহারায় রেখে যাবো। চারহাত এক হওয়ার আগে তোমাকে নজরছাড়া করছি নে।'

'কী মুশকিল, আমি কি তাই বলছি! আশীর্বাদই হয়ে গেল যখন—' সর্বেশ্বর উদাসীনভাবে আবার বাইরে এসে বসে। আমড়া-গাছটার দিকে চেয়ে খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসে থাকে আপনমনেই। যেন কোন উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তাই নেই ওর। কিন্তু মনে মনে চিন্তাটা চলতে থাকে সাংঘাতিক দ্রুতগতিতে।

বেরোতেই হবে ওকে, যেমন ক'রে হোক পালাতে হবে। সে পর্যন্ত ঠিক হয়েই গেছে—এখন শুধু উপায়টা খুঁজে বার করা!

খানিক পরে একসময় পিসিমা তাড়া দেন, 'ও সবু, রান্না হয়ে গেল যে—এইবার মাথায় একটু তেল দিয়ে চান ক'রে আয়। তোর জন্যে কি সারাদিন বসে থাকব নাকি হাঁড়ি-হেঁসেল নিয়ে? বিকেলে আবার বেয়াই-বাড়ি যেতে হবে। সে-ও তো কম পথ নয়, একঘণ্টার রাস্তা। তিনটেয় না বেরোলে সময়ে পৌঁছানো যাবে না।'

অকস্মাৎ যেন অন্ধকারে আলো দেখতে পায় সর্বেশ্বর। সোজা হয়ে বসে বলে, 'হ্যাঁ, এই যে যাই। তেলের বাটিটা দাও দিকি—'

তেলের বাটি হাতে ক'রে সে উঠে দাঁড়ায়। পিসিমা সন্দিগ্ধকণ্ঠে বলেন—'ও কি, বাটি নিয়ে কোথায় চললি? এখানেই মাথায় একটু দিয়ে নে না? গেঞ্জিটাও তো ছাড়লি না!'

'পিসিমা যেন কি!' আড়ে মেয়েদের দিকে তাকিয়ে নিয়ে গলাটা নিচু ক'রে একটু অনুযোগের ভঙ্গীতে বলে সর্বেশ্বর—'এক পাল মেয়ে এনে ঘরে বসিয়ে রেখেছেন, তার ভেতর আমি খালিগায়ে তেল মাখব—না? তা ছাড়া মাঠেও তো যেতে হবে একবার। ঘাটে বসেই তেল মেখে নেবো। গামছাখানা দাও দিকি—'

কাঁধে গামছা ফেলে বেরিয়ে যায় সর্বেশ্বর বেশ নিশ্চিন্ত ভাবেই। তারপর পুকুরঘাটের পাড়ে একজায়গায় তেলের বাটিটা রেখে গামছাখানা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে পেছনের বাগানে যায় সে। কিন্তু মাঠে বসবার তার কোন লক্ষণ দেখা যায় না, বরং একটু আড়ালে গিয়েই গতিবেগ বেড়ে যায় তার। এদিক ওদিক চেয়ে এক লাফে পেছনের পগারটা পেরিয়ে মল্লিকদের বাগানে গিয়ে ওঠে। তার পরও দাঁড়ায় না। ওদের পাঁচিলের তলা দিয়ে কোনমতে অপরের নজর এড়িয়ে এসে পড়ে চৌধুরীদের ঘাটে। তারপর সেখান থেকে আলের ওপর দিয়ে সোজাসুজি ছুটতে শুরু করে। দৌড় দৌড়—খানা-ডোবা ডিঙিয়ে ঝোপঝাপ উজিয়ে দৌড় দৌড়…

পিসিমা রান্নাবান্না এবং গল্পগুজবে খানিটা অন্যমনস্কই ছিলেন। হঠাৎ কিছুক্ষণ পরে তাঁর খেয়াল হ'ল, 'হ্যাঁরে, সবু এখনও তো চান ক'রে ফিরল না! মা শিবানী—একবার একটু এগিয়ে দ্যাখ্ না মা ঘাটে—'

শিবানী একটু পরে ঘুরে এসে বলল—'কৈ পিসিমা, সবুদা তো ঘাটে নেই—তেলের বাটিটা তেমনি পড়ে রয়েছে। চানও বোধ হয় করে নি এখনও।'

'সে কি রে!…য়্যাঁ পালালো নাকি রে!'

'গেঞ্জি গায়ে খালিপায়ে কোথায় পালাবে পিসিমা? আপনি ব্যস্ত হবেন না, মাঠ থেকেই হয়ত এখনও ফেরে নি।'

'এখনও ফিরল না—এতক্ষণ ধরে মাঠ কিসের?…না না, সে সাংঘাতিক ছেলে মা—তার অসাধ্য কিছু নেই! দ্যাখ্ দ্যাখ্ পেছনের বাগান, পগারধারটা

একবার দেখে আয়, লক্ষ্মী মা আমার—'

পিসিমা নিজেও ছোটেন পাগলের মতো। কিন্তু না বাগান না পগারধার, কোথাও তার টিকি দেখা যায় না। পিসিমা কেঁদে ফেলেন একেবারে, 'যা ভেবেছি তাই, ছোড়া আমাকে দ'য়ে মজিয়ে পালাল দেখছি! ভদ্দরলোকদের কথা দেওয়া—সব প্রস্তুত, এ কি কেলেঙ্কারি মা! আমি লোকের কাছে মুখ দেখাব কি ক'রে রে?'

পিসিমা ডাক ছেড়ে কাঁদতে থাকেন। শিবানী, নির্মলা, ওরা যথাসাধ্য সান্ত্বনা দেয় ওঁকে। নির্মলা বলে—'আপনি অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? এরই মধ্যে সে আর কতদূর যাবে! দুপুরের ট্রেনও তো যায় নি এখনও। আমরা খোঁজ করছি, দেখি বরং কাউকে যদি সাইকেলে পাঠাতে পারি!'

'তাই দ্যাখ মা—তাই দ্যাখ।' চোখ মুছে সোজা হয়ে দাঁড়ান পিসিমা, 'তোরা এদিকটা দ্যাখ একটু, আমি বরং গিয়ে বনমালীকে খবরটা দিই। সে খুব মজবুত লোক—তার হাত এড়াতে পারবে না সহজে—'

'আপনি না খেয়ে চললেন কোথায় পিসিমা—যা হয় দুটো মুখে দিয়ে যান—'

শিবানী তাঁর হাত ধরে বলে।

'আর মা খাওয়া, এখন কি আর আমার মুখে ভাত উঠবে! সে ছোঁড়াটারও তো খাওয়া-দাওরা হ'ল না।...না মা, তোরা একটু দ্যাখ। আমি ঘুরে আসি আগে। এখন আমার খাওয়া-দাওয়া কিচ্ছু ভাল লাগছে না। আমাদের বংশে কখনও এরকম কেলেঙ্কার হয় নি।...লোকে বলবে কি! পাড়াঘরে ঢিঢিক্কার পড়ে যাবে যে!'

তিনি চাদরটা গায়ে জড়িয়ে তখনই বেরিয়ে পড়েন।

·

বনমালী ঘোষাল কথাটা শুনে মুচকি হাসেন,—'ঠিক এইটিই ভাবছিলাম বেয়ান!...তা হোক, আপনি ব্যস্ত হবেন না। বলি ঘুরে-ফিরে উঠবে গিয়ে তো সেই কলকাতায়? আপনারা এদিকটা দেখুন। এখানেই ধরা পড়ে তো ভাল, নইলে আমি সন্ধ্যের ট্রেনে চলে যাচ্ছি কলকাতায়। ঘাপ্‌টি মেরে বসে থাকব, বাসায় ফিরেছে দেখলেই অমনি খপ ক'রে গে পড়ে টুঁটিটি টিপে ধরবো। পালাবে কোথায়? আমার নাম বনমালী ঘোষাল, আমার খপ্পর থেকে বেরিয়ে যাওয়া অত সোজা নয়।'

'যদি না আসতে চায়? সেখানে তো তার কোট, যদি খুঁটি গেড়ে বসে!' সংশয় ফুটে ওঠে পিসিমার কণ্ঠে।

কিন্তু ঠিক সেই সঙ্গেই মধুর হাস্যে অভয় দেন বনমালী, 'আপনি ক্ষেপেছেন বেয়ান? আমার হাত সে এড়াবে? এমন কাণ্ড করব—চেঁচামেচি বাধিয়ে পাঁচটা সত্যি-মিথ্যে বানিয়ে ব'লে—যে বাবাজী আমার সুড়-সুড় ক'রে চলে আসতে পথ পাবে না! এখনও তো দুটো দিন সময় আছে, ভয় কি!'

তারপর মেয়েকে হাঁক দেন—'মা শঙ্করী, দে তো মা আমার চাদর আর

ছাতাটা। ইস্টিশানের দিকে রওনা হই।'

শঙ্করী যেন তৈরি ছিল। ছাতা আর চাদরটা বাপের হাতে গ্বঁজে দিয়ে পিসিমাকে আশ্বাস দেয়—'ভাববেন না পিসিমা। আমাকে চেনেন না আপনি—বে-টা হয়ে যাক—এর শোধ তুলে তবে ছাড়ব, ষোল-আনার ওপর আঠারো-আনা!'

॥ ৪ ॥

ট্রেনে চড়ে নি সর্বেশ্বর। পকেট নেই স্বতরাং পকেটে পয়সাও নেই।

ট্রেনে চড়তে গেলে টিকিট লাগবে। দ্বিতীয়তঃ, ট্রেনের দিকেই ওপক্ষের যে প্রথম নজর পড়বে তা সে জানত। স্বতরাং হাঁটা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। হাঁটতেই লাগল সে প্রাণপণে। কিন্তু সারাদিন হেঁটে বিকেলবেলায় বিষম ক্লান্ত হয়ে পড়ল। ক্ষ্বৎপিপাসা তো আছেই। অবশেষে আর থাকতে না পেরে এক খাবারের দোকানের বাইরে-পাতা কাঠের বেঞ্চে বসে পড়ল। খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে দম নিয়ে বলল, 'দোকানী ভাই, বাম্বনের ছেলেকে একট্ব জল খাওয়াবে?'

দোকানী ওকে বেঞ্চে বসা পর্যন্তই লক্ষ্য করছিল—এবার এগিয়ে এসে বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, খাওয়াব বৈকি।' তারপর একঘটি জল হাতে ক'রে বেরিয়ে প্রশ্ন করলে, 'কিন্তু আপনার এমনধারা হাল কেন বাব্ব? দেখলে তো আপনাকে ভদ্দরলোক ব'লেই মনে হচ্ছে। অথচ ময়লা জামা, খালি পা, খালি গা—'

সর্বেশ্বর খানিকটা চুপ ক'রে চোখ ব্বজে বসে রইল, তারপর একট্ব উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বললে, 'সে আর শ্বনে কি করবে ভাই—আমার আহাম্ম্বকির কথা!' তারপর আর একট্ব থেমে বললে,—'কাকী মারা গেছেন। আজ বাদে কাল ঘাট। খ্বড়তুতো ভায়েরা ধার-দেনা ক'রে টাকা দিয়েছে, শ্রাদ্ধের বাজার করতে চলেছি কলকাতায়। পথে কুট্বমবাড়ি নেমতন্ন সেরে যাবো ব'লে হাঁটাপথেই বেরিয়েছিল্বম, কাজ সেরে বাস্-এ চাপব···অদ্বষ্টের ফের ভাই, এক জায়গায় ম্বখ-হাত ধোব ব'লে জামাটা খ্বলে পাড়ে এক গাছের ডালে টাঙিয়ে প্বকুরের ঘাটে নেমেছি—ব্যস্! ম্বখে-মাথায় জল দিয়ে এসে দেখি ফরসা! টাকা ফর্দ সব ঐ জামার পকেটে। ফিরে গিয়ে কী ক'রে ম্বখ দেখাবো বলো দিকি! তাই রওনা দিল্বম হেঁটেই—কলকাতায় পেঁছে বন্ধ্ব-বান্ধবদের কাছ থেকে কিছ্ব টাকা যোগাড় ক'রে কতক কতক বাজার সেরে তবে ফিরব। ফর্দর মোটা জিনিসগ্বলো মনেই আছে।...তাই এই চলেছি আর কি—না খাওয়া না চান, কখন পেঁছব কে জানে!'

আবারও একট্ব হাসে সর্বেশ্বর, অপ্রতিভের হাসি। তারপর হাতটা বাড়ায় 'দাও ভাই জলটা—'

ওর র্বক্ষ চুল, খোঁচা খোঁচা গোঁফদাড়ি, ধ্বলোস্বদ্ধ খালি পা—সবই ওর কথার যাথার্থ্য প্রমাণ করে। দোকানী একট্ব ইতস্তত ক'রে বলে, 'আজ্ঞে বাম্ব্বন মান্বষ সারাদিন অভ্বক্ত, শ্বধ্ব জলটা দিতে পারব না। একট্ব মিষ্টি-

মুখ করতে হবে।'

'না না ভাই, ওসব পাগলামি ক'রো না। জলই দাও। এদিকে আবার কবে আসব না আসব—তোমার দেনা হয়ত শোধই করতে পারব না। তাতে দরকার নেই।'

'আজ্ঞে আপনি ধার ব'লেই বা ভাবছেন কেন? কখনও তো সুযোগ হয় না—না হয় ব্রাহ্মণ-ভোজনই করালুম একদিন।'

ঈষৎ বিদ্রূপের সুরে সর্বেশ্বর বলে—'কেমন ক'রে জানলে আমি বামুন? ও, এই পৈতেটা আছে ব'লে?' গেঞ্জির ফাঁক দিয়ে ময়লা পৈতেটা একটু টেনে বার করে সর্বেশ্বর। তারপর বলে—'কিন্তু কেমন ক'রে জানলে আমি ভণ্ড জোচ্চোর নই? সবটাই যে বানিয়ে বলছি না, তার প্রমাণ কি?'

দোকানীর বিশ্বাস আরও দৃঢ়ীভূত হয়। সে বলে, 'সে বাবু আপনার ধর্ম আপনার কাছে। বামুন মানুষকে আমি সারাদিনের পর শুধু জলটা দিতে পারব না। আপনার মুখ-চোখ বসে গেছে একেবারে।'

'শুধু জল দিতে পারবে না? তবে দাও কী দেবে, আমারও আর শরীর বইছে না—'

দোকানদার শালপাতার ঠোঙায় কয়েকটা মিষ্টি এবং কিছু লুচি-তরকারী এনে দেয়। তৃপ্তি ক'রে খেয়ে এক ঘটি জল পান ক'রে আরামের নিশ্বাস ফেলে সর্বেশ্বর। তারপর বলে—'কিন্তু ভাই, বামুন ভোজন করালে দক্ষিণে দিতে দিতে হয়, তা জানো তো?'

'আজ্ঞে জানি বৈকি। যথাসাধ্য দেব।'

'উঁহু উঁহু, যথাসাধ্য নয়। আমি বলছি…এখান থেকে কলকাতার বাসভাড়া কত?'

'তা আজ্ঞে সাড়ে ছ' আনা।'

'তবে ঐ সাড়ে ছ' আনাই নেব। আর একটা বিড়ি।'

দোকানদার হেসে সাড়ে ছ'আনা পয়সা এবং গোটা-দুই বিড়ি হাতে দেয়। আঙুলে পৈতাটা গলিয়ে আশীর্বাদের ভঙ্গীতে হাত তুলে সর্বেশ্বর বলে—'কল্যাণ হোক। তোমার ব্যবসার বাড়বাড়ন্ত হোক, ছেলে-পুলে সুখে থাক, গতরখানি ভাল থাকুক। কী ব'লে আর আশীর্বাদ করব! ভগবান সুযোগ দেন কখনও এদিকে আসার, তোমার ঋণ আমি ভুলব না ভাই।'

'আজ্ঞে ঋণ বলছেন কেন? ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়েছি—করাতে পেরেছি, ঋণ তো আমারই।'

'পয়সার ঋণটাই কী বেশী হ'ল?' ওর কাঁধে হাত রেখে সর্বেশ্বর বলে।

দোকানীর কল্যাণে সন্ধ্যার একটু পরেই কলকাতা পৌঁছে যায় সর্বেশ্বর। বাস থেকে নেমে বাসা পর্যন্ত হেঁটে যেতেও খুব কষ্ট হয় না। কিন্তু বিপদ হচ্ছে সেখানে ঢোকা! মেসের ব্যাপার—সন্ধ্যের ঝোঁকে কিলবিল করছে লোক, এই অবস্থায় ঢুকতে দেখলেই সবাই হৈ-চৈ করে উঠবে। নানা প্রশ্ন, নানা কৈফিয়ৎ। কোনমতে সবার অলক্ষ্যে ঢুকতে পারলে এই ভাবটা দেখানো যায়

যে অনেকক্ষণ এসে জামা-জুতো ছেড়েছে। এত কৈফিয়তের গোলমালে পড়তে হয় না। কিন্তু সেভাবে ঢুকতে গেলে সন্ধ্যার একটু পরে—আটটা সাড়ে আটটা নাগাদ ঢোকাই সুবিধা। সেই জন্যে সে তখনই আর ঢোকবার চেষ্টা করল না—খানিকটা পথে পথে ঘুরে বেড়াল।

কিন্তু বিধি বাম। এদিক ওদিক দেখে যেমন নিঃশব্দে সদরটি পেরিয়ে চলনে পা দিয়েছে—ওদিক থেকে প্রায় ঝড়ের বেগে গায়ের ওপর এসে পড়ল প্রভাত—মেসের মাধ্য যে ব্যক্তিটি তার ওপর সবচেয়ে চটা!

প্রভাত শৌখিন মানুষ, কী একটা ভাল আপিসে কাজ করে—কিন্তু বাড়ির অবস্থা মোটামুটি ভাল বলে সেখানে বিশেষ কিছু পাঠাতে হয় না, যা রোজগার করে বেশির ভাগই পোশাকে-আশাকে, বিছানায়, গন্ধ তেলে, দামী সাবানে, হেয়ার-লোশনে, স্নোতে, ক্রীমে খরচ করে। তার সকালে মুখ ধুতে লাগে এক ঘণ্টা—চুল আঁচড়াতে প্রতিবার কুড়ি মিনিট করে। চুল আঁচড়ায়ও দিনে-রাতে অন্তত ছ-সাতবার। স্নান করতে যে কত সময় লাগে তার হিসেব নেই। সেই কারণেই কোন দিন সময়ে অফিসে যাওয়া হয় না তার। নেহাৎ আজকালকার চাকরি বলেই আজও টিকে আছে।

এ-হেন প্রভাত ভাল ধোপদস্ত কাপড়-জামা ভেঙ্গে সবে তখন কোন বন্ধুর বাড়ি চা খেতে যাচ্ছে। সে বন্ধুর এক ভগ্নী এম-এ পাশ করেছে, চায়ের নেমন্তন্নটাও সেই উপলক্ষে। সুতরাং ওর সঙ্গে ধাক্কা লাগতেই সে যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হয়ে উঠল, 'এ হে হে, যাত্রাটাই মাটি! যত্তো সব অযাত্রা! নোংরা মানুষ!'

তারপরই বোধহয় কথাটা মনে পড়ে গেল—'আরে আপনি না দেশে গিয়েছিলেন? সেখান থেকে এই অবস্থায় ফিরছেন?...কেন বলুন তো, পথে কারুর পকেট-মেরে ধরা পড়েছিলেন নাকি? তাই তারা জামাজুতো খুলে নিয়ে ছেড়ে দিয়েছে? কী ব্যাপার? নাঃ—আপনি দেখছি আমাদের মেসসুদ্ধ লোককে জড়াবেন!'

'আঃ, কী যে বলেন প্রভাতবাবু! থামুন না একটু।'

'থামব কেন মশাই? এ যে আমাদের সকলকার সেফ্‌টির প্রশ্ন!'

ততক্ষণে প্রভাতের উচ্চকণ্ঠে আরও দু-পাঁচজন নেমে এসেছে।

'ব্যাপার কি? কী, হয়েছে কি?'

'আর কি হবে!' প্রভাত হাত-পা নেড়ে বলে—'এই এঁর কাণ্ড! ভোরবেলা দেশে যাচ্ছি ব'লে বেরোলেন—এখন এইভাবে ফিরে আসছেন। বুঝে দেখুন ব্যাপারটা কি!'

'না, তা নয়—মানে আমি তো খানিক আগেই'—থতমত খেয়ে যায় সর্বেশ্বর।

'খানিক আগেই কি? খানিক আগেই ফিরেছেন? এঃ, আবার মিথ্যে কথাও ধরলেন! এইমাত্র যে আপনার ঘর দেখে আসছি মশাই। চাবি দেওয়া—আপনার রুমমেট হরিশবাবু বেলা পাঁচটায় ফিরে আবার আমার সামনেই চাবি

দিয়ে গেলেন !'

'হ্যাঁ, সেই তো ! চাবির জন্যেই তো তাই—'

'কেন, আপনার ডুপ্লিকেট চাবি কি হ'ল ? বেশ তো, চাবি না হয় হারিয়েছে, আপনার জামাজুতো কোথায় ছেড়ে রেখেছেন ? ব্যাগ কই ? কেন এমন অজস্র মিছে কথা বলছেন বলুন তো !'

সর্বেশ্বর হাল ছেড়ে দেয়। হতাশভাবে দুই হাত নেড়ে বলে,—'ভেবেছিলুম বলব না—আরে মশাই পিসি আমাকে মিছে ক'রে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিল। অসুখ না ঘোড়ার ডিম ! আসলে আমার বিয়ের সব ঠিক ক'রে রেখেছিল—কড়া নজরবন্দী মশাই, কোনমতে নাইতে যাবো ব'লে বেরিয়ে মাঠ-পগার ডিঙিয়ে সারাপথ হেঁটে এই ফিরছি।'

'য়্যানাদার পিস অফ হিজ ইঞ্জিনিআস্ ফেব্রিকেশন্ !' প্রভাত ব'লে ওঠে, 'আরে মশাই, এটা-ওটা ছেড়ে যদি নভেল-লেখা ধরতেন, তা হলেও আপনার দুপয়সা হ'ত ! এমন কি পকেটমারার চেয়েও ওটা লুক্রেটিভ !'

সর্বেশ্বর তর্ক বৃথা দেখে পাশ কাটিয়ে ওপরে উঠে যায়। পিছন থেকে হাসির ঝড় ওঠে, সবাই বাহবা দেয় প্রভাতকে, 'বেড়ে বলেছেন প্রভাতবাবু, খাসা বলেছেন !'

এসব জায়গার নিয়মই এই—বন্ধু আত্মীয় নির্বিশেষে কেউ কাউকে ঠুকে দিলেই বাকী সকলে খুশি।

'হাসছেন কি আপনারা !' প্রভাত বেশ ঝাঁজের সঙ্গেই ব'লে ওঠে, 'লোকটাকে দেখলে আমাব সর্বাঙ্গ জ্বলে যায় !···ও নাকি আবার বামুন ! বলে ইস্কুলেও পড়েছে দিনকতক ! ডার্টি সোআইন্ !···রাস্তার ভিখিরীগুলো ওর চেয়ে পরিষ্কার। এক মেসে থাকতেও লজ্জা করে আমার। ম্যানেজারবাবু কী যে দেখেছেন ওব ভেতর—তা তিনিই জানেন।···এবার দেখছি ম্যানেজারই বদলাতে হবে। রামো, রামো ! যাত্রাটাই মাটি ক'রে দিলে !'

কে একজন দলের মধ্যে থেকে মধুরকণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'কোথায় যাচ্ছিলেন প্রভাতবাবু ? মানে—যাত্রাটা কিসের আবার ? কোন শুভকার্যে যাচ্ছিলেন বুঝি ?'

'না—ঠিক তা নয়। এই মানে, একটা চায়ের নেমন্তন্ন—'

'সে কি ! এই রাত আটটায় চায়ের নেমন্তন্ন ? আপনার তো পেঁছিতে পেঁছিতেই সাড়ে আটটা হয়ে যাবে !'

'কি ক'রে জানলি রে প্রদোষ, ওঁর সাড়ে আটটা হবে ?' আর একজন ফুট্ কাটে।

'প্রভাতবাবুর চা খাবার তো ঐ একটিই জায়গা—বাগবাজার !···ওঁর এক অফিস-ফ্রেণ্ডের বাড়ি ! ভদ্রলোকের অবিবাহিতা ভগ্নী নাকি ফাইন চা করেন !'

প্রভাত গর্জে ওঠে—'শাট আপ্ !···যা জানেন না, তা নিয়ে কথা কইতে আসবেন না।—বলে যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর !···ঐ জোচ্চোর মিথ্যেবাদী ডার্টি লোফারটা যেদিন যথাসর্বস্ব চুরি ক'রে বুকে ছুরি বসিয়ে

পালাবে—সেদিন বুঝতে পারবেন প্রভাত পালের দাম, তার আগে নয়! আমি কালই এ মেস থেকে রিমুভ করবার চেষ্টা করব। আর একদিনও এখানে থাকা নয়—'

প্রভাত গজগজ করতে করতে বেরিয়ে যায়!

॥ ৫ ॥

সর্বেশ্বর স্নান সেরে ঘরে ফিরে কাপড় ছাড়তে ছাড়তেই এসে ঢুকলেন বিপিনবাবু, মেসের স্থায়ী ম্যানেজার।

'এই যে সর্বেশ্বরবাবু! ফিরে এসেছেন আজই?—বাঁচলাম। কী শুনলাম—আপনি নাকি এক কাপড়ে পালিয়ে এসেছেন?'

'সে আর বলবেন না, পিসিমা বিয়ের ঠিক ক'রে রেখেছিল। আমি তো জানি না—বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়ে সেই জাঁতিকলে পা দিয়েছি। কড়া পাহারা একেবারে—যাকে বলে নজরবন্দী মশাই! কোনমতে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছি।'

'সে কি মশাই! বিয়ে তো আনন্দের কথা।···চিরকাল কি এইভাবে ভবঘুরে বাউণ্ডুলে হয়ে থাকবেন নাকি?···মাথার ওপর একটা রেসপন্‌সিবিলিটি এসে না পড়লে জীবনটা বাঁধা-খাতে বয় না—বুঝলেন? ওটা দরকার। তা ছাড়া হাজার হোক বয়স হচ্ছে তো, এখন একটু সেবা—একটু মাধুর্য—এসব না পেলে জীবনে রইল কি?'

'রক্ষে করুন মশাই, সেবা-মাধুর্যের পেছনে যে ঠেলাটি আছে সেটা যে আমি বিলক্ষণ জানি। তা ছাড়া বাঁধাখাতে জীবনটা বওয়াতেই আমার আপত্তি। আরে তাই যদি হবে, তাহ'লে কি আর আজ একটা ভাল চাকরি করতে পারতুম না!—ঐ প্রভাত পালেরই আজ অফিসার হয়ে বসতে পারতুম—তা জানেন?'

'সে কি!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার অফিসের অজিত পিপ্‌লাইকে জিজ্ঞাসা করবেন। সেও তখন ঐ অফিসে ছিল। আমার মামা—গার্ডনার ওয়েস্টের বড়বাবু ছিলেন। ছিলেন কেন—এখনও আছেন। ওঁদের অফিসে সব মার্চেণ্ট অফিসের সাহেবরাই যাতায়াত করেন। মামা ব'লে-কয়ে আমাকে চাকরিটি করিয়ে দেন। গেলেই চাকরির কথা বলতেন ব'লে ওঁর সঙ্গে বড়-একটা দেখা করতুম না। একদিন ডেকে খুব ধমকে দিলেন, বোঝালেনও অনেক ক'রে। তখনকার মতো রাজী হয়ে গেলুম। পরের দিন যেতেই সাহেব স্লিপ দিয়ে বড়বাবুর কাছে পাঠালেন—বড়বাবু একেবারে দিলেন টুলে বসিয়ে। পঁয়তাল্লিশ টাকায় য়্যাপয়েণ্টমেণ্ট—বছরে পাঁচ টাকা বাঁধা ইন্‌ক্রিমেণ্ট, তা ছাড়া প্রোমোশন আছে। বড়বাবু কথাগুলি শুনিয়ে দিলেন—আর চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলেন, কত টাকা ঘুষ দিয়েছি এবং কাকে দিয়েছি?···ও মশাই, বসলুম তো! কিন্তু মনটা যে কি করতে লাগল কি বলব! মনে হ'তে লাগল কে যেন গলাটা

টিপে ধরছে দুহাত দিয়ে !···ঐ স্ট্র্যান্ড রোডের ওপর দেড়শ বছরের বাড়ি, স্যাঁত-স্যাঁত করছে ভিজে, গুমো গন্ধ। তার ওপর সে অফিসের ব্লকটা ভেতর দিকে। বাইরের আলো ঢোকবার কোন পথ নেই—দিনের বেলাতেই সার সার আলো জেবলে ঘাড় গুঁজে কাজ করছে সবাই। দেখে ভয় হয়ে গেল—এমনি ক'রে কাটাতে হবে জীবনের অন্তত ত্রিশটা বছর ? শেষে আর পারলুম না—টিফিনের সময় টিফিন করবার নাম ক'রে সটান নিচে নেমে একেবারে হাওয়া !··· তারপর সে পোস্টে যাকে নেওয়া হয়েছিল, সে-ই এখন প্রভাতদের সেকশনের বড়বাবু, দু'বেলা সেলাম দিতে হয় ওকে।'

'বলেন কি—অমন চাকরিটা ছেড়ে দিলেন ? বরাতে দুঃখ আছে আপনার !' আফসোসের সুরে বলেন বিপিনবাবু।

'বন্ধন ছাড়া সব দুঃখই সইবে মশাই আমার। রুটিনবাঁধা জীবন আর ঘড়ি ধরা কাজ—ঐ দুটি আমার সইবে না।'

'তা মামা কি বললেন ?'

'সেই থেকে তো আমার মুখ দেখেন না আর। বলেছেন, এবার তাঁর বাড়ি গেলে কুকুর লেলিয়ে দেবেন।'

খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বিপিনবাবু বললেন, 'যে যেমন বোঝে মশাই—এমন সব মুরুব্বী থাকতেও আপনার একটা হিল্লে হ'ল না! গ্রহ—নইলে এমন করাবে কে ? খনার বচনে লেখা আছে না—সূর্য কুজে রাহু মিলে, গাছের দড়ি বন্ধন গলে! যদি রাখে ত্রিদশনাথ, তবু সে খায় নীচের ভাত। থাকয়ে রবি ভ্রময়ে ভূখণ্ড।...আপনার লগ্নের সপ্তমে অবশ্য রবি আছে !'

'রবি নয় মশাই—আছেন পবন। ঊনপঞ্চাশটি পাখায় ভর ক'রে নিজে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, আমাকেও ঘোরাচ্ছেন !'

বিপিনবাবু এইবার কাজের কথা পাড়েন—'সে যাক্ গে যাক্, এখন আপনাকে আমার বড় দরকার। লোভে পাপ পাপে মৃত্যু। গত শনিবারে আপনার কথা না শুনে বেশী লোভ করতে গিয়ে মোক্ষম হেরেছি মশাই। মাইনের সব টাকাটাই উড়ে গেছে। মেসের টাকা থেকে ক'টা টাকা পাঠিয়েছি দেশে—কিন্তু তাতে তো কুলোবে না।—এ শনিবারে একটা সিওর টিপ দিন ভাই। এই নাক কান মলছি, যদি আর কোনদিন আপনার কথা না শুনি ! এইবারটি আমায় তরিয়ে দিন—'

সর্বেশ্বর গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়ে—'সে আর হবার যো নেই বিপিনবাবু।'

'সে কি !' বিপিনবাবুর মুখখানা ঝুলে পড়ে, 'না না, ও কথাটি বলবেন না সর্বেশ্বরবাবু, মারা যাবো একেবারে।···দোহাই আপনার !'

'কী করব বলুন! খবর তো আর আপনি আসে না। আসল কথাটা কি জানেন, টার্ফ ক্লাবের এক সাহেবের চাপরাসীর সঙ্গে আমার একটু যোগাযোগ আছে—সে-ই ভেতরের খবরটা আমায় এনে দেয়। তাকে মাঝে মাঝে কিছু দিতে হয়। গত তিন মাস ধরে তাকে কুড়িটি টাকা দেব ব'লে প্রতিশ্রুত, দিতে পারি নি। গত হপ্তায় ভেবেছিলাম আপনার মোটামুটি কিছু লাভ হ'লে চেয়ে

নেব, তা আপনি তো—। মোদ্দা সে কুড়ি টাকা তাকে দিতে না পারলে আর মুখ দেখাতে পারছি না।'

'বলেন কি! তবে যে আপনি বলেন—ওসব আপনার ক্যালকুলেশান!'

'আরে তাই বলতে হয়! তা নইলে কথাটা পাঁচ-কান হোক, আর সে গরীব বেচারীর চাকরিটি যাক!'

বিপিনবাবু খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বললেন—'আচ্ছা, আমি আপনাকে কুড়িটা টাকা দিয়ে দিচ্ছি। আপনি কিন্তু আমাকে কালই খবরটা এনে দেবেন। —ডোবাবেন না যেন।'

'পাগল হয়েছেন আপনি ?···এতদিন ডুবিয়েছি ?'

বিপিনবাবু উঠে গেলেন। একটু পরেই দশ টাকার দুখানি নোট এনে সর্বেশ্বরের হাতে দিয়ে বললেন, 'আচ্ছা আপনি এত লোককে টিপ দেন—অথচ নিজে খেলেন না কেন ?'

'ঐ তো মজা! বাইরে বসে ঠাণ্ডা মাথায় বেশ ক্যালকুলেশান করা যায়—মানে টিপ আনা যায়, কিন্তু মাঠে গিয়েছেন কি আপনার অবস্থা—সব হিসেব আর টিপ ঘোড়ার ক্ষুরের ধুলোয় উড়ে যায়—সেই সঙ্গে ট্যাঁকের টাকাটাও! না মশাই—বেশ আছি। বোকা বটে তবে অত বোকা নই আমি।'

টাকা কুড়িটা ট্যাঁকে গুঁজে সর্বেশ্বর তার অতিশয় মলিন বিছানায় শুয়ে প'ড়ে একটা আরামসূচক শব্দ করে, 'আঃ!'

বিপিনবাবুও উঠে দাঁড়ান—কিন্তু তখনই যান না, একবার বিছানাটার দিকে চেয়ে অনুযোগের সুরে বলেন, 'তা প্রভাতবাবু নেহাত মিথ্যে বলেন না মশাই—আপনি বড় অপরিষ্কার! বিছানা-বালিশগুলো একবারও পরিষ্কার করার কথা মনে হয় না আপনার ?'

'ঐ দেখুন! ও-ও এক রকমের বন্ধন। এখানে কথা হচ্ছে যে—যে শুচ্ছে তার কোন অসুবিধে হচ্ছে কিনা। আমার কোন অসুবিধাই নেই। ময়লা ? আপনার গায়ের চামড়াটা দেখুন তো একটা মাইক্রোস্কোপে ফেলে—শিউরে উঠবেন দেখলে।—আপনার ভেতরে কত ময়লা আছে, তা জানেন ?···ঐ প্রভাত পালের মনের ময়লাটার কথা ভেবে দেখেছেন ? পৃথিবীর কতটুকু ময়লাই বা সাফ করতে পারেন! মিছিমিছি বিছানাটার জন্য অত ব্যস্ত কেন ?'

বিপিনবাবু হতাশাব্যঞ্জক একটা কাঁধ-নাড়া দিয়ে বেরিয়ে এলেন।

॥ ৬ ॥

বিপিনবাবু বেরিয়ে যেতে হাতের বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আরও একটু টান হয়ে শোয় সর্বেশ্বর। সারাদিনের অমানুষিক পরিশ্রমের ফলে ক্লান্তিতে দু'চোখের পাতা বুজে এসেছে তার ইতিমধ্যেই, কথা কইতে-কইতেই। কিন্তু ঘুম বা বিশ্রাম সেদিন ভগবান ওর অদৃষ্টে লেখেন নি। সবে সর্বসন্তাপহরা তন্দ্রার আভাস লেগেছে চোখে—মেসের বাইরের গলিতে সদ্য-পরিচিত একটি

কণ্ঠের ডাক ধ্বনিত হ'ল, 'বলি আমাদের সর্বেশ্বর বাবাজী ফিরেছেন নাকি? ও বাবাজী সর্বেশ্বর!'

পর্দায় পর্দায় গলা চড়তে থাকে।

বনমালী ঘোষালের গলা। মুখ শুকিয়ে ওঠে সর্বেশ্বরের। সত্যিই তো, লোকটা এর আগে যে ওর মেস দেখে গেছে! সে কথাটা মনে রাখা উচিত ছিল!

ঠাকুর এসে ঘরে ঢোকে, 'এই যে মুখার্জিবাবু আছেন, কে একটি বুড়ো মতো বাবু এসে খুঁজছে আপনাকে!'

'হ্যাঁরে, হাতে কি লাঠি আর ছাতা দুটোই আছে সে বাবুর?'

'হ্যাঁ বাবু। কোটের ওপর আবার একটা কোঁচানো চাদর বাঁধা।'

লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায় সর্বেশ্বর, 'ঠাকুর, আমাদের ঐ পেছনের দিকের গলির দরজাটা খোলা যায়?

'কেন যাবে না! ঐ দোর দিয়েই তো জমাদার আসে সাফ্ করতে!'

'ঠিক আছে। আমি চললুম—ঐ গলিতে লুকিয়ে থাকব। আমার খবরটি যেন দিও না। তোমায় পাঁচটাকা পুরো বকশিশ দেব। আমায় তো জান, যে কথা সেই কাজ।'

'তা জানি, কিন্তু বাবুটি কে? ওর ভয়ে আপনি পালাচ্ছেন?'

'শ্বশুর—ঠাকুর! শ্বশুর! পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে ভয়ংকর জীব!'

'শ্বশুর! আপনি বিয়ে করেছেন নাকি?'

'বিয়ে করলে কি আর পালাবার উপায় থাকত ঠাকুর—তখন শ্বশুরকন্যেও তাড়া করতেন যে! সে বড় কঠিন বাঁধন! এ হ'লে-হ'তে-পারত শ্বশুর!'

এবার নিচের প্রবেশপথেই গলাটা বেজে উঠল, 'ঠাকুর মশাই, কোথা গেলেন গো? আর অত খবর দেওয়াদেয়িরই বা আছে কি? এটা তো মেস—কাউর ঝি-বৌ তো থাকে না এখানে! আচ্ছা আমিই যাচ্ছি।'

'সর্বনাশ, এসে পড়ল যে! ঠাকুর যাও যাও! 'কোনমতে আলনা থেকে আর একটা জামা টেনে নিয়ে গায়ে দিতে দিতে বেরিয়ে পড়ল সর্বেশ্বর।

কিন্তু ততক্ষণে নিচে সিঁড়ির মুখে এসে গেছেন বনমালী ঘোষাল। সর্বেশ্বর নিঃশব্দে পাশের একটা ঘরে ঢুকে পড়ে দোরটা ভেজিয়ে দিলে। বনমালী ঘোষাল লাঠি ঠক ঠক করতে করতে ওপরে ওঠেন। তারপর গলা-খাঁকারি দিতে দিতে যান সর্বেশ্বরের ঘরের দিকে। সর্বেশ্বর ইতিমধ্যে তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে পেছনের কানাগলিতেই বেরিয়ে পড়ল।

এধারে বনমালী ঘরে ঢুকে এই প্রথম একটু হতভম্ব হয়ে যান।

'আরে, গেল কোথায়? এ কি ভূতুড়ে কাণ্ড নাকি রে বাবা! এই শুনলুম ওপরের ঘরে আছে—এই একেবারে হাওয়া! বলি ও ঠাকুরমশাই, বাবাজী গেলেন কোথায় বলো তো?'

ঠাকুর রীতিমত বিস্ময়ের ভাণ ক'রে বলে, 'ঘরে নাই আজ্ঞা!'

'অ—তুমিও বুঝি বাবুর দলে আছ?'

'আজ্ঞে?'

'বুঝলুম—বুঝলুম, তা আমার নামও যাকে বলে গে বনমালী ঘোষাল—বাবুকে শুনিয়ে দিও, বুঝলে? আমিও অত সহজে নড়ছি নি। এই গোড়া গেড়ে বসলুম। বাসা ছেড়ে আর কতদিন থাকবেন শ্রীমান? দাও দিকি বাপু এক কাপ চা আনিয়ে, গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে একেবারে! রাধামাধব।'

'আজ্ঞে তা দিচ্ছি—পয়সা?'

'বাবুর হিসেবে আনো গে—বুঝলে? আমি হলুম গিয়ে বাবুর শ্বশুর। আমাকে খাইয়েছ জানলে বাবু রাগ করব না।'

'শ্বশুর? বাবু বিয়ে করেছেন নাকি?'

'ঐ তোমার নাম কি—ধরো গে করাই এক রকম! আর দুটো দিন, দুটো দিন সবুর করো—দুটো দিন পরেই বাবা ব'লে ডাকতে হবে। না ব'লে উপায় নেই। যাও, যাও—'

ততক্ষণে মেসের দু'চারজন লোক ওপরে এসে গেছে। প্রভাতও ফিরে এসেছে ততক্ষণে। সে-ই সকলকে ঠেলে সরিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল—'ব্যাপারটা কি বলুন তো? পালিয়ে বেড়াচ্ছে কেন? কেস্‌টা কি? ফোরজারি? লারসেনি? চিটিং না অন্য কিছু? রেপ? মার্ডার?'

'রোস, বাবা, রোস! ফৌজদারি আইনের ছড়া আউড়ে গেলে যে একেবারে! তুমি বুঝি ওর কোন হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু? বন্ধু ছাড়া এমন ছড়া আউড়ে হিত-কামনা তো কেউ করে না!.. তা বাবা অতদূর এখনও গড়ায় নি—কেস্‌টা হ'ল গে সিম্পল্ ম্যাট্রিমনি—যাকে বাংলায় বলে বিবাহ!'

'অ, বিবাহ! তা বিবাহ হয়ে গেছে, না হবে?'

'হবে বাবা—হবারই তো কথা।'

'তা হ'লে পালিয়ে বেড়াচ্ছে কেন ও লোকটা অমন ক'রে?'

প্রশান্ত হাস্যে মুখখানি রঞ্জিত হয়ে ওঠে বনমালীর,—'হবার আগেই তো পালাবার কথা—পরে আর পালাবার জো কি! সে যে কঠিন বাঁধন!' তারপর একটু থেমে বলেন—'ছেলেমানুষী বাবা! তবে আর ছেলেমানুষী কথাটার সৃষ্টি হ'ল কেন?...বয়েস যতই হোক—বে-র সময় সবাই ছেলেমানুষ হয়ে যায়!...বে-র ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে!'

'বিয়ের আবার ভয় কি মশাই? মেয়ে কি আপনার তাড়কা না শূর্পণখা?'

'ঠিক তা নয়। তবে ভেতরে ভেতরে ধরুন অনেকেই তো ঐজাতীয়া—সাক্ষাৎ মহাপুরুষরাই বলে গেছেন—পলক পলক লোহু চোষে। তবে বাইরেটা মোহিনী না হোক—ঐ কাছাকাছি।...তার জন্যে নয় বাবা, ভয় একটু হয়—সবাইকারই হয়। এই ধরো না কেন আমি! আমারই যখন বে-র কথা হয়—সাত রাত—সাতটি পুরো রাত ভয়ে চোখে-পাতায় করতে পারি নি!'

প্রভাত একটু হতাশ হয়েই দাঁতে দাঁত চেপে বললে—'রাবিশ!'

প্রদোষ গলা নামিয়ে বললে, 'তা হলে সর্বেশ্বরবাবু তো ঠিকই বলেছিল, মিছিমিছি আমরা সন্দেহ করছিলুম—'

নেমে যেতে যেতে প্রভাত বললে, 'চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা! ঐ এক দলের

লোক—খবর নিয়ে জানুন !'

প্রভাত নেমে গেলে প্রদোষ জিজ্ঞাসা করলে,—'তা এখন কি করবেন আপনি তাউই মশাই ?'

'অবস্থান। আজকাল ঐ তোমরা যাকে বলো অবস্থান ধর্মঘট।···টাকাকড়ি বিশেষ আনতে পারি নি তাড়াতাড়িতে। তা সর্বেশ্বর তেমন ছেলে নয়। এখন চালিয়ে নাও তোমরা—এরপর সে কড়ায়-গণ্ডায় শোধ ক'রে দেবে'খন। বেশী কিছু আমার লাগে না বাবা—দৈনিক ধরো গে কাপ-দশেক চা, দশবারো ছিলিম তামাক—অভাবে এক বাণ্ডিল বিড়ি—আর দু'বেলা দু'মুঠো ভাত। জলখাবার ? সে দিলেও হয়, না দিলেও হয়।'

প্রদোষ বললে—'এ তো সামান্যই। তা একরকম ক'রে হয়ে যাবে। তা হ'লে থাকুন এখানেই। কিন্তু এই বিছানায়—থাকতে পারবেন ?'

'থাকতেই হবে বাবা। এই গায়ের চাদরটাই না হয় ওপরে বিছিয়ে নেব। শুধু হাতে তো ফেরবার জো নেই। তা'হলে সে মেয়ে আর তার গর্ভধারিণীতে মিলে জোড়া মহিষমর্দিনীর পার্টে নেমে যাবে। মহিষ কিন্তু পড়ব তখন গে আমি একটিই—বুঝলে না ? থেকেই যাই—বাসা ছেড়ে আর ক-দিন থাকবে ? ফিরতেই হবে একদিন।''

॥ ৬ ॥

পাশের কানাগলিতে অনেকক্ষণ কান পেতে দাঁড়িয়ে রইল সর্বেশ্বর। দাঁড়াবার জায়গা সেটা নয়, আশেপাশের সব বাড়িরই নানাবিধ গৃহস্থালী জঞ্জাল—আনাজের খোসা, মাছের আঁশ, ময়লা কাগজ, ব্যাণ্ডেজের তুলো ইত্যাদি ফেলবার এইটিই একমাত্র স্থান। যেমন নোংরা তেমনি পিছল। কর্পোরেশনের লোক এসে প্রত্যহ সাফ করার কথা, তবে সেটা ঘটে কালেভদ্রে। নেহাৎ প্রাণের দায়েই দাঁড়ানো। আশা ছিল যে বড়জোর মিনিট পনেরো চেঁচামেচি করেই তার হ'লে-হ'তে-পারত শ্বশুর বিদায় নেবে। কিন্তু ক্রমে সেই হ'লে-হ'তে-পারত শ্বশুরের কথাগুলো কানে যেতে আর সেখানে দাঁড়াবার প্রয়োজন রইল না।

বুঝল যে সে যা ভেবেছিল তার চেয়ে ঢের গভীর জলের মাছ বনমালী ঘোষাল। তখন অগত্যা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বড় রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল এবং লক্ষ্যহীনভাবে একটা দিক ধরে হাঁটতে লাগল। বাপ-মা-মরা ছেলে সে—পিসির আদরেই মানুষ। পিসিকে সে যথেষ্ট ভালবাসে, কিন্তু আজ তাঁকেই যেন চরম শত্রু বলে মনে হ'তে লাগল।

অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে হাঁটতে কখন যে ভবানী শীলের লেনের মোড়ে এসে পড়েছে তা সে বুঝতেও পারে নি। হঠাৎ চমক ভাঙল গলির নেমপ্লেটটা চোখে পড়তে। সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় মনে পড়ে গেল, ওর বন্ধু সুনীলকান্তি এই গলিতে কোথায় থাকে। নম্বরটা মনে নেই অবশ্য। তাতে কি ?

সে প্রথম বাড়ি থেকেই প্রশ্ন করতে করতে এগোল—'হ্যাঁ মশাই, এ পাড়াতে

সুনীলকান্তি চাকলাদার বলে কেউ থাকে ? কালো রোগা, একটু বাঁকা-মতন চেহারা ? থাকে না ? আচ্ছা কিছু মনে করবেন না—বিরক্ত করলাম।'

'কত নম্বরে থাকেন তিনি ?' কেউ হয়তো প্রশ্ন করে।

'নম্বরই যদি জানব তা' হলে এভাবে বিরক্ত করব কেন ? গলির নামটা মনে আছে ঢের। যে বাজার, আজকাল লোকে নিজের বাপের নামই ভুলে যায়।'

সে হয়তো উত্তর দিলে,—'কিন্তু এভাবে আপনি কলকাতায় বাড়ি খুঁজে বার করতে পারবেন ? নম্বর না জানা থাকলে—'

'কিছু না কিছু না—কোন অসুবিধাই নেই। এইটুকু তো গলি, স্রেফ থিওরি অফ্ এলিমিনেশান চালাব—বুঝলেন না ? বাদ দিতে দিতে একটা বাড়িতে পাত্তা মিলবেই ?—আচ্ছা চলি।'

সে আবার এগিয়ে যায়। অবশেষে এক সময় তার উদ্যম পুরস্কৃত হয়। দেখা যায় যে বেশী দূর নয়—১।৩।১৭-এফ নম্বরটিতেই সুনীলকান্তি চাকলাদার ভাড়া থাকেন। দোতলা বাড়ি ; বিশ ফুট রাস্তা থেকে বারো ফুট ঢুকে, তা থেকে ছ'ফুট চওড়া কানাগলিতে পড়লেই বাড়িটা পাওয়া যাবে। অন্ধকার গলি, নিচের তলায় দিনের বেলাও আলো জ্বালাতে হয়। সেই জন্যে বাড়িওলা নিচের ঘরে আলোর পয়েন্টের জন্যে দুটাকা ক'রে বেশী নেন। তা হোক, রাতে তার জন্যে অসুবিধে নেই। সব বাড়িই একরকম দেখায় রাত্রিবেলা।

'সুনীল, সুনীল' ক'রে হাঁক দেয় সর্বেশ্বর। অনেকক্ষণ পরে শতচ্ছিন্ন একটি গেঞ্জি গায়ে দিয়ে বেরিয়ে আসে ওর বন্ধু সুনীলকান্তি চাকলাদার।—'কী ব্যাপার! সর্বেশ্বর, তুই এতকাল পরে ?'

'শোন্'—ব'লে একেবারেই কাজের কথা পাড়ে সর্বেশ্বর, 'আমাকে দিন দুই-এর জন্যে একটু আশ্রয় দিতে পারিস ?'

যেমন সোজা প্রশ্ন তেমনি সোজা উত্তর দিল সুনিল,—'উঁহু, তা সম্ভব নয়। দশ-বাই-বারো ঘরে আমরা সাতটি প্রাণী থাকি। তার মধ্যে তুমি নাক গলাবে কেমন ক'রে ?'

'বুঝলাম। ঘর ভাড়া আছে ?'

'না, তাও নেই। বারোখানি ঘর এ বাড়িতে। বাড়িওলাকে নিয়ে বারোটি ফ্যামিলিই থাকে।'

'তা হোক, ডাক্ দেখি তোর বাড়িওলাকে!'

'ঘর নেই বলছি—বিশ্বাস হচ্ছে না ?'

'ডাক্ না তুই ভদ্রলোককে। তোর অত কথায় দরকার কি ?'

আর দ্বিরুক্তি করে না সুনীল। চলনের মুখে গিয়ে ডাকে—'প্রতাপবাবু, ও প্রতাপবাবু', তারপর ভেতর থেকে সাড়া মিলতে ফিসফিস ক'রে বলে সর্বেশ্বরকে—শ্বশুরের বাড়ি এটা। আর কোন রোজগার নেই, এই ভাড়া থেকেই সংসার চলে। ভারি কঞ্জুষ।'

একটু পরেই খাটো পাঁচহাতি ধুতি প'রে প্রতাপবাবু নেমে আসেন। হাতে একটি আধপোড়া বিড়ি। মোলায়েম কণ্ঠে প্রশ্ন করেন, 'ডাকছিলেন সুনীলবাবু ?'

'আজ্ঞে আমি নই ঠিক, আমার এই বন্ধু—ইনি আপনাকে খুঁজছিলেন। বল্ না রে কী বলবি—এঁরই নাম প্রতাপচন্দ্র দত্ত, আমাদের বাড়িওলা।'

'নমস্কার। বিরক্ত করলুম হয়তো--কিন্তু বড় প্রয়োজনে পড়েই—মানে আমি একটু ছোটখাটো আশ্রয় খুঁজছিলাম। অবিশ্যি ভাড়া দেব।'

মুখে অদ্ভুত একটা চু-চু শব্দ ক'রে প্রতাপবাবু বলেন,—'তাই তো—আপনি বড়-মুখ ক'রে বললেন একটা কথা—কিন্তু কোন উপায়-ই যে নেই। বাড়িতে আমার ডেরাটা বাদ দিয়ে দাঁড়ায় এগারোখানি ঘর। তা ধরুন ষেটের—এগারোটি ফ্যামিলিই আছে আপাতত। আপনাকে কোথায় থাকতে দিই বলুন ?'

'আজ্ঞে যদি অনুমতি করেন—আমি ঠিক খুঁজে নেব। আমাকে একবার বাড়িটা দেখতে দেবেন ?'

প্রতাপবাবু করুণার হাসি হাসেন একটু—'দেখুন আমরা হলুম গে বৌবাজারের দত্ত। ভবানী শীলের দৌউত্তুর বংশ আমরা, জঙ্গল কেটে আমরাই এতবড় শহরটা গড়েছি। ভাড়া দেবার জায়গা আছে অথচ ফেলে রেখেছি, এমনটা ভাবছেন কেন ?'

'আজ্ঞে, আমিও হলুম গে বামুন—মুখুজ্জে, ফুলের মুখুটি। আমরা আপনাদের ঠকিয়ে খেয়েছি চিরকাল। এই পাথর থেকে রস বার করি যখন—তখন আমরা ঠিক খুঁজে নিতে পারব। আমি এক দিন মাত্র এসেছিলুম—কিন্তু তবু মনে আছে, দোতলার সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার মুখটাতে একটা চোরা-বারান্দামতো আছে না ? কোনমতে একটা লোক শুতে পারে বোধ হয়—'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আছে বটে। তবে সেখানে ভাড়াটেদের কাঠ-ঘুঁটে থাকে।'

'বিলক্ষণ! তাদের কাঠঘুঁটের জন্যে আপনার একটা আয় মাটি করবেন ? ঐটিই আমাকে ভাড়া দিন—আমি মাসিক ছ'টি টাকা ভাড়া দেব!'

লোভে ও ঔৎসুক্যে প্রতাপবাবুর চোখ-দুটি জ্বলতে থাকে। তবু বলেন —'কিন্তু তার যে তিন দিক খোলা—রোদ আছে জল আছে। তা ছাড়া—'

'আজ্ঞে পর্দা টাঙিয়ে নেব আমি, সে আমার খরচ। মোটা চটের পর্দা। যদি উঠে যাই আপনারই থাকবে।'

কিন্তু প্রতাপবাবু তাঁর আগের কথারই জের টানেন, 'তা ছাড়া আমার সব ফ্যামিলি ভাড়াটে। আপনাকে,—একা পুরুষমানুষ—ভাড়া দিই কি ক'রে ?'

'কি মুশ্‌কিল—এই তো সুনীলরাই রয়েছে। ওর ফ্যামিলি আর আমার ফ্যামিলি কি আলাদা ? হরিহর-আত্মা যে। এক গলায় জল ঢাললে দু গলায় পড়ে। নেহাৎ ওদের ঘরে জায়গা নেই—মানে মাপে বেরোয় না, ছ'ফুট বাই দু'ফুট এই বারো বর্গফুট তো চাই কম্-সে-কম—তাই এত কষ্ট।'

''তা ভাড়াটেরা যদি জিজ্ঞেস করে ?'

'বলবেন—সুনীল আমার নিকট-আত্মীয়—ধরুন আমার স্ত্রীর ভাই।'

সুনীল একটা অস্ফুট কি গালাগাল দিয়ে নিলে। সর্বেশ্বরও চুপিচুপি উত্তর দিলে, 'তুইও তো তা হলে সম্বন্ধটা মেনে নিলি রে ইস্টুপিড!'

সে রাতটার মতো সুনীলের কাছ থেকে একটা মাদুর আর বালিশ ধার ক'রে নিয়ে কাটল। ভোরবেলা উঠে গিয়ে নিজেদের গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে বিপিনবাবুর সঙ্গে দেখা করলে সর্বেশ্বর। আশা ছিল যে হয়তো গভীর রাত পর্যন্ত দেখে হতাশ হয়ে ফিরে গেছে লোকটা—কিম্বা অন্তত আজ সকালে রওনা হয়ে গেছে। কিন্তু দেখা গেল যে মানুষ চিনতে এখনও তার বহু বিলম্ব, শুনলে, বনমালী ঘোষাল খোসমেজাজে বহালতবিয়তে এখনও তার ঘরে অধিষ্ঠান করছেন এবং পালা ক'রে বাকী সমস্ত অধিবাসীদের ঘাড় ভেঙে চা খেয়ে যাচ্ছেন ক্রমাগত।

আবারও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে সর্বেশ্বর। বিপিনবাবুকে তাঁর 'সিওর টিপ' দিয়ে বাজারে গিয়ে গোটা দুই চটের পর্দা এবং সামান্য একটা বিছানা কিনে নিয়ে ভবানী শীলের লেনে ফিরল। পাকাপাকিভাবে ওখানে বাসা বাঁধতে হবে এখন, অন্তত কিছুকাল।

সেই দিনই সর্বেশ্বর বাকী ভাড়াটেদের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে তুলল।

বাজার থেকে ফিরে পর্দা টাঙাচ্ছে, হঠাৎ কানে গেল—একটি বৃদ্ধা মহিলা বেশ চেঁচিয়েই প্রতাপবাবুকে বলছেন—'বলি অ বাড়িওলা ছেলে, এ তোমার কি রকম ব্যাভার গা বাছা! বলি তুমি আমাদের কাছ থেকে মাস মাস টাকা নাও, না দয়া ক'রে অমনি থাকতে দিয়েছ?'

'কেন বলুন তো পিসিমা—কি হয়েছে? কি করলুম?'

'কি না করলে বাছা! বলি, বলা নেই কওয়া নেই কোথা থেকে একটা হাড়-হাবাতে বাউণ্ডুলে বখাটে ছোকরাকে এনে ঢোকালে! ওর যা চেহারা, দেখলেই তো বোঝা যায় জোচ্চোর বখা ছোকরা। গাঁজাগুলির আড্ডা থেকে সবে উঠে এসেছে। এ বাড়িতে এতগুলো লোক মেয়েছেলে নিয়ে বাস করছে সে কথাটা ভাবলে না একবার? আক্কেলটা কি তোমার? বলতে পারলে না যে পরিবারের মেয়েছেলে নিয়ে আসুন, তব ভাড়া দেবো!'

'আজ্ঞে—সুনীলবাবুর আত্মীয় ব'লেই—'

'কিসের আত্মীয় সুনীলবাবুর! চোদ্দপুরুষের নাউখোলা আমার! মুখুজ্জ্যে আর চাকলদার আত্মীয় হয়? আমরা বামুন নই? আমরা জানি না কিছু? বাবা, আমরা হলুম গিয়ে নৈকুষ্যি কুলীন, আমার দাদামশাই কখনও ভেন্ন গোত্তরের জলে পা ধোয় নি...। ঠক জোচ্চোর লোক, এটা তুমি বুঝলে না? এই বুদ্ধিতে তুমি বিষয় দেখবে? বলি বয়েস তো হয়েছে! ছেলেমানুষটি তো আর নেই—'

একটি বছর পনেরো-ষোলর মেয়ে বালতি হাতে বোধ করি নিচের কলতলায় জল আনতে যাচ্ছিল। সর্বেশ্বর তখন একটা পেরেক মুখে চেপে আর

একটা বাঁকা পেরেক দুহাতে সোজা করার চেষ্টা করছিল, এখন সেটা মুখ থেকে নামিয়ে মেয়েটিকে ডাকল—'শুনুন—'

মেয়েটি কিন্তু সে ডাক কানেই তুলল না। যেমন অন্যমনস্কভাবে যাচ্ছিল তেমনিভাবেই সিঁড়ি দিয়ে নামবার উপক্রম করল। সর্বেশ্বর আবার ডাকল—'শুনছেন, শুনুন—'

এইবার মেয়েটি ফিরে তাকাল। তার চোখে যৎপরোনাস্তি বিস্ময়।

'আমাকে ডাকছেন!'

'হ্যাঁ—আর কে আছে এখানে?' একটু বিদ্রূপের সুরেই বলে সর্বেশ্বর।

'আমি বুঝতে পারি নি। আমায় তো কেউ ওভাবে ডাকে না!'

'তবে কি ভাবে ডাকে?'

'আমার নাম টেঁপি। আমাকে তাই ব'লেই ডাকে। আপনি-আজ্ঞে কেউ করে না।'

'ও, টেঁপি নাম বুঝি? তোমার বাবার নাম কি? কোন্ ঘরে থাকো তোমরা? বাবা কি করেন?'

'আমার বাবার নাম মহিমচন্দ্র চক্রবর্তী—ছাপাখানায় কাজ করেন। ঐ ওধারের কোণের ঘরটায় আমরা থাকি।'

'আচ্ছা ঐ যে বুড়িটা অত বকাবকি করছে নিচে—কে বলো দিকি?'

মেয়েটা আরও একটু কাছে সরে আসে। গলা নামিয়ে বলে—'ও বামুন-পিসি! ভারি বদমাইস বুড়ি। ওকে সব্বাই ভয় করে।'

'কেন, ভয় করে কেন?'

'ও যে জিনিসপত্তর বাঁধা রেখে টাকা ধার দেয়—সুদও নেয় তেমনি অবিশ্যি কিন্তু সকলেই কিছু-না-কিছু ধারে ওর কাছে, সেই জন্যে কেউ রাগাতে সাহস করে না।'

'ওর আর কেউ নেই?'

'কে এক ভাইপো আছে—তা তাকেও আমল দেয় না। মাঝে মাঝে আসে খবর নিতে, তাকে দিয়ে বাজার-হাট করিয়ে নেয় কিন্তু কখনও একটা বাতাসা হাতে দিয়ে জল খেতে বলে না। হাড়কিপ্টে বুড়ি, বলে—ওরা সব আমার বিষয় টেঁকে বসে আছে!'

এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে যায় টেঁপি।

ওধার থেকে বোধ করি তার মা-ই ডাক দেন—'বলি অ টেঁপি, তোর জল নেওয়া হ'ল?'

'যাই এখন—য়্যাঁ!' টেঁপি দ্রুত নেমে যায়।

'সর্বেশ্বরও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নেমে আসে। বামুনপিসি তখন স্নান সেরে ভিজে কাপড়েই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রতাপবাবুর সঙ্গে ঝগড়া করছেন। সর্বেশ্বর তরতর ক'রে নেমে এসেই তাঁকে গড় হয়ে এক প্রণাম ক'রে বেশ ভক্তিভরেই পায়ের ধুলো নেয়।

'ওমা—এ আবার কি! হাঁ-হাঁ বাছা, করো কি? এই চান ক'রে এলুম

যে—এখনও পুজো-আচ্চা বাকি, এ আবার কি ঢঙ্ ?'

সর্বেশ্বর হাত জোড় ক'রে বলে—'আপনি তো এখনও ভিজে-কাপড়ে আছেন মাসিমা, ছুঁলেই বা দোষ কি ?'

'দরকারই বা কি বাছা! কথায় বলে অতিভক্তির গলায় দড়ি!'

'মাসিমা, বামুনের ছেলে, নেহাৎ কারে পড়েই আশ্রয় নিয়েছি, তাড়িয়ে দেবেন ?'

বলার সঙ্গে সঙ্গেই জামার ভেতর থেকে অতি মলিন পৈতেটা বার করে।

বামুনপিসি একটু নরম হয়ে যান প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই—'আমি তাড়াবার কে বাবা! তুমি বাড়িওয়ালার কাছ থেকে ভাড়া নিয়েছ, টাকা দিয়েছ গুণে! আমি বললেই বা তুমি যাবে কেন ?'

'তা কি হয় মাসিমা ? আপনি হলেন এঁদের মায়ের মতো। আপনি না মত দিলে তাঁরাই বা রাখবেন কেন ? আর আমিই বা থাকব কেন ?'

'তা থাকো না বাছা—আমি কি আর তোমাকে তাড়াবার কথা বলেছি! পেরতাপকে তার আক্কেলের কথাটাই বলছিলুম। বয়েস হয়েছে, এখন তো আর দুটো পয়সার লোভে যা-তা একটা কাজ ক'রে বসলেই চলবে না, বুঝে-সমঝে চলতে হবে। তা তুমি এত নোংরা কেন বাছা ? বামুনের ছেলে একটু সাফ হয়ে থাকতে পারো না ?'

'আমি যে বাবা সর্বেশ্বরের দোর-ধরা-ছেলে মাসিমা। বাবার নিষেধ—আমাদের খুব পরিষ্কার হ'তে নেই।'

'ও, তাই তো বলি। তা থাকো বাছা, থাকো। পরের ঝি-বৌয়ের দিকে উঁচু নজরে চেয়ো না, তা হ'লেই হ'ল।'

•

এর দিন দুই পরেই একদিন সকালে—চাকরেরা বেরিয়ে গেলে বেলা দশটা নাগাদ টেঁপিকে দেখতে পেয়ে সর্বেশ্বর ডাকে—'অ খুকী—কি যেন তোমার নাম, টেঁপি না ? শোন একবার!'

টেঁপি কাছে এসে দাঁড়ায়।

'আচ্ছা এ বাড়িতে কারুরই কোন চাকর-টাকর নেই, না ?'

'না তো! দু-একজনের ঠিকে-ঝি আছে, তারা কাজ ক'রে দিয়ে চলে যায়। কেন বলুন তো।' টেঁপি কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করে।

'না—মানে, এই এক বাণ্ডিল বিড়ি আনাতুম আর কি!'

'এই কথা! তা বেশ তো, আমাকেই পয়সা দিন না, আমি এনে দিচ্ছি।'

'না না, ছিঃ ছিঃ! সে কখনও হয় ?···তুমি দোকানে গিয়ে বিড়ি আনবে কি ?'

'তাতে কি হয়েছে। আমি তো যাই-ই। বাবার বিড়িও তো এনে দিই। তা ছাড়া দোকান-পাট তো আমাকেই প্রায় করতে হয়। সকালে তো দু'-ঘণ্টা মোটে সময় বাবার—সে বাজার করতে, দুধ আনতে, ডাক্তারখানায় যেতেই কেটে যায়। দোকান তো আমাকেই করতে হয় বেশির ভাগ দিন।'

তারপর একটু থেমে বলে, 'এই তো আমি চিনি আর ডাল কিনতে যাচ্ছি, দিন না, এনে দেব।'

সত্যি-সত্যিই পয়সা চেয়ে নিয়ে বিড়ি কিনে দিয়ে গেল টেঁপি, এমন কি তার বদলে সর্বেশ্বর নগদ একটা পয়সা দেবার প্রস্তাব করতে কিছুতেই নিতে রাজী হ'ল না। তবে তাকে ধরে এ বাড়ির আরও অনেক ভাড়াটের ব্যক্তিগত ইতিহাস সংগ্রহ ক'রে নিল সর্বেশ্বর, কে কেমন মানুষ, কী করে—ইত্যাদি।

অবশ্য কতক তো সে নিজেই দেখে এবং শোনেও।

ভোর হ'লেই এ বাড়ির কলতলায় শোরগোল পড়ে যায়।

'বলি কল তো কারুর একার নয়, সবাই তো ভাড়া দেয়, না কি?'

'একার কে বলছে, বলি একার নয় বলেই তো আমরাও দু-চার বালতি জল আশা করি!'

'ও দিদি, আপনার তো এক ঘড়া হ'ল—আমাকে এবার একটু নিতে দিন! আমার উনুন জ্বলে গেল—ডাল চাপাবার মতো এক ঘটি জলও নেই।'

বামুনপিসির গলার আওয়াজ সবার ওপরে ওঠে—'আ মর্! চোখ-খাকীরা যেন কলতলাটাকে নরক ক'রে তুলেছে। কে বলবে যে ভদ্দরলোকের বাড়ি এটা? আমি গতর পিষে মরব আর সব আঁটকুড়ীর বেটাবেটীরা একধার থেকে নোংরা করবে! নিপাত যাক সব, নিপাত যাক!'

'বাড়িওলা মিনসে ভাড়া নেবার বেলা তো ঠিক আছে—মাস পোয়াতে তো তর সয় না! এদিকে দেখতে পায় না? তাড়াতাড়ির সময় একজন যদি আধঘণ্টা কল জোড়া ক'রে বসে থাকে তো চলে কি করে?'

'বেশ তো, না পোষায় উঠে যা না। পেরতাপ দত্তের অমন ঢের ভাড়াটে জুটবে।' বামুনপিসি চান করতে করতেই গজরাতে থাকেন।

তার সঙ্গে চলে ভগবানের নামও—

'গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরী সরস্বতী,
নর্মদে সিন্ধু কাবেরী জলেহস্মিন সন্নিধিং কুরু॥
গয়াগঙ্গা বারাণসী প্রভাস পুষ্করাণি চ কুরুক্ষেত্র,
তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি স্নানকালে ভবন্তিহ॥'

'মা গঙ্গা—অন্তে পায়ে ঠাঁই দিও মা। শিবকাশী শিবকাশী কাশী কাশী শিবশিব।'

'হ্যাঁরে এই—অ অতসী, কী তোর আক্কেল লা, এইখানে আমি কুঁজো বসিয়েছি আর ছরছর করে এঁটো জলটা ঢাললি!'

'কৈ ছরছর করে জল ঢাললুম কাকীমা, পাছে ছিটে যায় বলে আমি যার দেওয়াল ঠেকিয়ে কত আস্তে আস্তে ফেললুম—বা রে!'

'যেন সব বাবাকেলে কল পেয়েছে! মৌরসী পাট্টা! কলে ঢুকলে আর কেউ বেরোয় না। পাঁচজনের কল—একটু বুঝে-সমঝে চলতে হয়।'

যেন বাতাসকে শুনিয়ে বলে একজন।

ভেতর থেকে অপরে বলে—'ভাড়া দিচ্ছি বাস করছি, অত গালাগাল দেবার কি আছে! আমার বাবাকেলে কল না হয় না-ই হ'ল—তোমারই কি বাবাকেলে কল নাকি! কথার ছিরি দেখো না!'

সেইদিনই সন্ধ্যেবেলা সর্বেশ্বর বাইরে থেকে ফিরে চুপি চুপি টেঁপিকে বলে, 'টেঁপি শোন! এই যে এদিকে—'

টেঁপি কাছে আসতে কাগজের একটা ঠোঙা তার হাতের মধ্যে প্রায় গুঁজে দিয়ে বলে—'এগুলো তোমার ভাইবোনদের দাও গে, তুমিও খেও।'

'কী এতে?' চোখ বড় বড় ক'রে টেঁপি প্রশ্ন করে।

'টফি আছে। ভাল টফি।'

টফি বুঝতে পারে না টেঁপি। অবাক হয়ে চেয়ে থাকে।

'মিষ্টি মিষ্টি খেতে—লজেঞ্চুসের মতো। বুঝলে?'

লোভে ও প্রত্যাশায় টেঁপির মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তবুও সে বলে—'মা যদি বকে?'

'বকবে কেন? ব'লো যে তোমার এক দাদা দিয়েছে, কেমন?' তারপর একটু ইতস্ততঃ ক'রে বলে,—'তোমাদের এখন চা হবে নাকি টেঁপি?'

'এই বাবা এলেই হবে! কেন—খাবেন আপনি?'

'যদি তোমার মা বিরক্ত না হন—'

'না না, বিরক্ত হবেন কেন? আমি দিয়ে যাবো'খন—টেঁপি প্রায় ছুটতে ছুটতে চলে যায় টফির ঠোঙাটা হাতে নিয়ে।

এদিকে মেসের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছে। বনমালী ঘোষাল পুরো-দস্তুর অবস্থান করছেন, আর সে অবস্থিতির মাহাত্ম্য প্রতিনিয়তই এই বাসার অধিবাসীরা অনুভব করছে। প্রদোষ তো সেদিন সকালে প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়েই বিনয়বাবুর ঘরে ঢুকলো—'দেখুন তো বিনয়দা—এ কী অত্যাচার! যখনই আমি সিগারেট আনতে দেব—বুড়ো কোথায় যেন ওৎ পেতে থাকে—সিঁড়ির মুখেই চাকরটাকে ধরে প্যাকেট থেকে দুটো-তিনটে বার ক'রে নেবে!'

বিনয়বাবু বলেন—'কাকে বলছ ভাই! খুশি-মতো চা খাবারও জো নেই আমার! জানোই তো, একটু বেশী চা না খেলে আমার চলে না—তা যতবারই আনতে দেব—কেষ্টর সঙ্গে-সঙ্গেই ঘরে ঢুকবে বুড়ো, আর রেডি একেবারে—একটি গেলাস হাতে ক'রে আসবে—কী বাবাজী, চা হচ্ছে নাকি আর একবার? তা দাও দিকিন এক ঝিনুক আমার এই গেলাসটাতে ফেলে—কী আপদ বলো দিকি!'

প্রদোষ বলে—'বুড়োকে তাড়াতে পারছেন না!'

'কী ক'রে তাড়াব বলো, তা হ'লে পুলিশ ডাকতে হয়। বুড়োমানুষ—!'

ঝড়ের বেগে ঘরে ঢোকে প্রভাত পাল,—'ম্যানেজারবাবু, আমি জানতে

চাই—জবাব চাই ! এসব কি হচ্ছে আজকাল ?'

বিনয়বাবু অবাক হয়ে প্রশ্ন করেন,—'কি, ব্যাপার কি ?'

'আমার এই তেল—' একটা ক্যাস্টর অয়েলের শিশি বার ক'রে দেখায় প্রভাত—'সবে পরশু কিনেছি, পুরো একমাস যায় আমার এক শিশি তেলে —দেখুন, আজই সিকি শিশি ফরসা ! এসব কি কাণ্ড বলুন তো !'

প্রভাতের কথা বুঝি শেষও হয় না, গলাখাঁকারি দিতে দিতে ঘরে ঢোকেন বনমালী,—'এই যে ম্যানেজারবাবু ! প্রাতঃপ্রণাম। আরে প্রভাত বাবাজী যে ! হাতে ওটি কি—ও, তোমার গন্ধতেলের শিশি বুঝি ? খাসা তেল বাবা ! আমি ক'দিন—কি বলে, তোমার ঐ তেলটাই মাখছি কিনা। বেশ মিষ্টি গন্ধ !'

'বেশ করেছেন ! আমার এদিকে শিশি ফরসা !'

'তা বাবাজী—তন্নষ্টং যন্ন দীয়তে—যা দেবে না তা নষ্টই হবে। হ্যাঁ, তা বলছিলুম কি ম্যানেজারবাবু, বড় একঘেয়ে খাওয়া মশাই আপনাদের ! কলকাতা শহরে কি মোচা-থোড় পাওয়া যায় না ? নিদেন একটু শাকের ঘণ্ট ?'

প্রদোষ বেশ ঝাঁঝের সঙ্গেই বলে—'এত কষ্ট ক'রে কলকাতায় থাকবার দরকার কি—কেটে পড়ুন না ! আপনার শুভদিন তো পেরিয়ে গেছে ! জামাইয়ের তো টিকি নেই !'

'ওরে বাবা, আমি কি আর শখ করে পড়ে আছি ! আমার সেই বলে না বিটুইন টু ফায়ারস্—তাই হয়েছে ! ওধারে আমার বাড়ির ওঁয়ারা, এধারে তোমরা। দুটোর মধ্যে বরং তোমরাই ভাল—নয় কি ? অবিশ্যি কতদিন আর চলবে, যেতেই হবে। ভাইপোদের পত্তর দিয়েছি আসতে। এলেই পরামর্শ ক'রে যা হয় করব। তাই তো ভাবছি বাবাজী, সেখানে পৌঁছলেই আবার সেই টু ফায়ারস্—একদিকে মেয়ে আর এক দিকে তার গর্ভধারিণী ! সংসারের কত সুখ—এখনও তোমাদের বুঝতে দেরি আছে বাবাজী, বুঝতে দেরি আছে।'

কালীপদবাবুর ঘোড়া-রোগ আছে।

শনিবার সকাল ক'রে ফিরতে দেখেই স্ত্রী ঝেঁঝে ওঠেন।

'আবার বুঝি বেরোতে হবে ? আচ্ছা তোমার লজ্জা করে না ? ছেলে-মেয়েগুলোর একটারও গায়ে একটা গোটা জামা নেই। ইস্কুলের মাইনে জোটে না। রোগ হ'লে হোমিওপ্যাথির জল খাইয়ে খাইয়ে রাখো—অথচ মাঠে যাবার বেলা তো ঠিক টাকা যোগাড় হয় ! এই ক'রে যে পয়সাটা ওড়াচ্ছ, এর অর্ধেকও যদি থাকত তো ছেলেমেয়েরা খেয়ে বাঁচত।'

'আরে, আমি মাঠে যাচ্ছি কে বললে ? বড়বাবুর অসুখ তাই একবার দেখতে যেতে হবে।'

'ফের মিছে কথা বলছ ! বড়বাবুর অসুখ, তা এই দুপুররোদে কি ? বেশ, সেই সন্ধ্যেবেলা যেও—'

'না, মানে কই—আমি তো একা যাবো না। আরও তো পাঁচজন আছে—বোঝ না কেন? একটা জায়গা ঠিক করা হয়েছে, সেইখানে সবাই জড়ো হবো—কিছু ফলটল কিনে নিয়ে যেতে হবে। রুগী দেখতে যাবো বললেই তো আর যাওয়া হয় না!'

'দ্যাখো, আমি তোমাকে হাড়ে হাড়ে চিনেছি। আমাকে আর ভুলিও না। সবাই মিলে যাবে তো অফিস থেকেই তো যেতে পারতে!'

'আমি তো তাই বলেছিলুম। ঐ গন্‌শাই—'

বলতে বলতে কালীপদ বেরিয়ে আসেন।

পেছন থেকে স্ত্রী বলেন, 'তোমার ঘরকন্না এবার থেকে তুমি ক'রো। আমার যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যাবো—এই ব'লে রাখলুম। আমাকে ছুঁয়ে সেদিন দিব্যি গাললে না—আর কখনও যাবে না?'

জবাব না দিয়ে কালীপদ বেরিয়ে পড়েন।

সিঁড়ির মুখটাতেই সর্বেশ্বর।

'কী, মাঠে চললেন নাকি?'

'হ্যাঁ—একটু মানে ইয়ে—'

'বুঝেছি। শুনুন।' তারপর গলা নামিয়ে বলে—'লেডি লাভের উপর খুব ঝোঁক রাখবেন না। বরং কুইন অফ হেলের ওপর উইন আর প্লেস দুটোই কিছু কিছু ধরবেন।'

কালীপদবাবুর মুখ শুকিয়ে গেছে,—'তবে যে সবাই বলছে লেডি-লাভই আজ—'

'মরবেন। বেশ তো ধরতে চান ধরুন, তবে আমি যা বললুম, তাও মনে রাখবেন। সামান্য কিছু ধরেই দেখুন না!'

'আপনি এসবের খবর রাখেন নাকি?'

'কিছু কিছু, যৎসামান্য। না রেখে উপায় কি বলুন? আমার কাকার সম্বন্ধীর সহিস হ'ল গে লাটসাহেবের বাবুর্চির আপনার মেশোমশাই।'

'তা তো বটেই। তা হ'লে বলছেন—'

'দেখুন না একটু পরখ করে। মোদ্দা লাভ হ'লে আমাকে কিছু দেবেন তো!'

'নিশ্চয় দেব।...কিন্তু আপনি নিজে যান না কেন?'

'গুরুর নিষেধ আছে।' প্রশান্ত মুখে জবাব দেয় সর্বেশ্বর।

সন্ধ্যেবেলা কালীপদবাবু ফেরেন একবাক্স সন্দেশ, অসময়ের ফুলকপি ইত্যাদি নিয়ে। সর্বেশ্বর মুখ টিপে হেসে বলে,—'কী হ'ল দাদা?'

কালীপদবাবু জিনিসপত্র সেইখানেই নামিয়ে ঢিপ ক'রে এক প্রণাম করে বলেন—'আপনি সাধারণ মানুষ নন দাদা—মহাপুরুষ।...যা বলেছেন তাই। লেডি লভ্ কোথায় পেছনে পড়ে রইল!'

তারপর পকেট থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বার ক'রে সামনে রেখে.

বলেন—'কিছু মনে করবেন না দাদা, সামান্য প্রাণামী—কিন্তু এমনি টিপ দু-একটা দেবেন মাঝে মাঝে, একেবারে পায়ে ঠেলবেন না ছোটভাইকে।'

কথাটা ছড়িয়ে পড়ে দেখতে দেখতে। সুনীলই এসে একসময় ওকে চেপে ধরে,—'হ্যাঁরে, তুই নাকি লোককে সিওর টিপ দিয়ে বেড়াচ্ছিস! তোর কাকার সম্বন্ধীর শ্বশুর নাকি কে একটা কেষ্টবিষ্টু!'

সর্বেশ্বর হাত বাড়িয়ে বলে—'একটা বিঁড়ি দে। কেন, তাতে হয়েছে কি?'

'তা আমাকে দু-একটা ছাড়ো না বাবা!'

'দ্যাখ্ সুনীল, ও কাজ কখনো করিস নি। মাঠে গিয়ে বড়লোক কেউ হ'তে পারে না। ও বড় সাংঘাতিক জায়গা।'

'তুই যখন এত খবর রাখিস তখন প্রাইভেট বুকির কাজও তো করতে পারিস। ওতে তো লোকসান নেই, লাভ আছে বরং।'

'ছিঃ ছিঃ! জেনেশুনে মানুষের সর্বনাশ করা কি ভাল? এ পথে আনা মানেই তো তাকে পথে বসানো! আজ না হোক কাল! ও আমি করব না। নেহাৎ খুব দায়ে ঠেকলে কখনও-সখনও এইসব রেসেলদের কাছ থেকে দু-এক পয়সা আদায় ক'রে নিই, এই পর্যন্ত।'

একটু ইতস্তত ক'রে সুনীল বলে—'তা তুই যার কাছ থেকে এসব খবর পাস তার সঙ্গে আমার একটু পরিচয় করিয়ে দে না!'

'তার সঙ্গে আমারই কি পরিচয় আছে?'

'তার মানে?'

'মানে আর কি—সত্যিই কি কেউ আছে ওরকম? ওসব আমারই ক্যালকুলেশান!'

'অত নির্ভুল হিসেব হয়?'

'হয়, মাঠে না গেলে। মাঠে গেলেই সব হিসেব গুলিয়ে যায়।'

সুনীল ঠিক বিশ্বাস করতে পারে না কথাটা—একটু রাগ করেই চলে যায়।

'দিবি না তাই বল্! আত্মীয়-বন্ধুরা দু-একটা পয়সা পায় এ কেউই বরদাস্ত করতে পারে না—তোর আর দোষ দেব কি!'

'কে র্যা? কে ওখানে?' ঈষৎ সন্দিগ্ধ, তীক্ষ্ণ শোনায় পিসীর কণ্ঠ।

'আজ্ঞে আমি শেতল গড়াই, বামুন মা।'

'ও শেতল, এসো বাবা এসো। ঐ গামছাটা বাঁচিয়ে এসে ব'সো। তা কী মনে ক'রে?'

'সুদটা এনেছিলুম—'

'সুদ? তা দাও দাও, দিয়ে যাও। আমিও তো তাই বলি, মাস মাস সুদ দিয়ে গেলে আর অতটা গায়ে লাগে না। আমিও বাঁচি। বলে অবিরে বিধবা, আমারও তো কেউ আর নেই, ঐ থেকেই তো চালাতে হয়। সেই যে সেবার

তুমি সুদ ফেললে—দেখলে তো, অমনি তিনমাস জমে গেল। তা সবটা এনেছ তো ?'

শেতল মাথাটা চুলকে বলে—'সেই কথাটাই বলতে চাইছিলুম। সেবারও ইচ্ছে ক'রে ফেলি নি। দেখলেন তো ছেলেটা মরতে মরতে বেঁচে গেল। গত মাসেও নিজে পড়ে গিয়ে কটা দিন কামাই হয়ে গেল—মাইনে কাটা গেল। এমন গেরো—আবার এমাসে মেয়েটাকে নিয়ে যমে মানুষে টানাটানি, রক্ত-আমাশা হয়ে একেবারে যেতে বসেছিল। আপনি তো চোখেই দেখছেন—বানানো কথা তো নয় !'

বামুনপিসীর চোখ আরও সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে, 'হুঁ। তা আমাকে কী করতে হবে ?'

আরও খানিকটা ইতস্তত করে শেতল। বার-দুই ঢোক গেলে, বায়কতক মাথা চুলকোয়, তারপর মরীয়া হয়েই ব'লে ওঠে—'আমি আপনার সন্তান মা। আপনার কাছে মিছে কথা বলছি না, কোনমতে মেয়েটারই সেই দুলজোড়া বেচে দুমাসের সুদ এনেছি, এইটে নিয়ে আমায় একমাসের সুদ ছেড়ে দিন। দোহাই বামুন মা—আপনার পায়ে ধরছি। কী বিপদে পড়েছি দেখছেন তো !'

বামুনপিসী যেন ফেটে পড়েন,—'উঃ! একমাসের সুদ ছেড়ে দিন! আবদার ! কী বিপদে পড়েছি দেখছেন তো !—বলি টাকাটা যেদিন নিয়েছিলে বাছা সেদিন কী বিপদ কম ছিল কিছু ? তখন কে সে-দায়ে ঠেকাতে এসেছিল শুনি ? সেদিন এই বজ্জাত বামনী না থাকলে কী করতে ?—সেদিনকার কথা বুঝি মনে নেই ? না বাপু, সুদ ছাড়তে আমি পারবো না। নিজেদেরটাই বেশ বড় ক'রে দ্যাখো, আমার চলবে কিসে ভেবেছ কোনদিন ? আমার কে আছে ? ভাতার না, পুত না—তিনকুলে কেউ নেই। আমার ঐ পুঁজি। ... ওসব হবে না—যদি ঐ মতলবে এসে থাকো তো সরে পড়ো।...হাত্তোর বেইমানের ঝাড় রে !'

মহিমবাবু এসে বসেন মাঝে মাঝে।

'আচ্ছা ভাই, আপনাকে তো বেরোতে দেখি না কখনও ?'

'আমি এখন—একটু যাকে বলে বিশ্রাম করছি।'

'করেন কি আপনি ?'

'করি ? কি না করি বললে বরং জবাব দেওয়া সহজ হ'ত।'...অনেক কিছুই করি—মানে যখন যা পাই। ইনসিওরেন্সের দালালী, জমির দালালী, হ্যাণ্ডনোটের দালালী—হাতে দু পয়সা এলে শেয়ারের বাজারেও উঁকি মারতে আপত্তি নেই—এমনি আর কি, কেবল চাকরিটে করি না, ওটা কখনই করি নি।'

'কেন, করেন না কেন ? পান নি ব'লে ?'

'না, তা ঠিক নয়। ওটা আমার ধাতে সয় না। কোন কিছু বাঁধা-ধরার

মধ্যে যাওয়া আমার পোষায় না।'

'বিবাহ করেন নি?'

'ক্ষেপেছেন! ও তো সবচেয়ে বড় বন্ধন!'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মহিমবাবু বলেন—'বেশ আছেন। আমরাই একেবারে ন্যাঙ্গারী হয়ে মরছি।...মেয়েটার বিয়ে না দিলেই নয়—কিন্তু দিই বা কোথা থেকে! ঐ কালো-কুচ্ছিত মেয়ে, তায় লেখাপড়াও শেখাতে পারি নি। কে-ই বা নেবে? টাকা তো একটা পয়সাও হাতে নেই। গতবার ছেলেটার অসুখের সময় বামুন-পিসীর কাছ থেকে পঞ্চাশটা টাকা নিয়েছিলুম, তা আজও তার এক পয়সা সুদ পর্যন্ত দিতে পারি নি। পরিবারের হারছড়াই বোধ হয় যাবে।...'

সুনীল হেঁকে বললে,—'কৈগো, একটু তেল দিয়ে যাও। দেরি হয়ে যাচ্ছে। আবার তো সেই কলের জন্যে এক ঘণ্টা ধরে সাধনা করতে হবে।'

স্ত্রী এসে বললে, 'বেশী দেরি নেই। এগারো আনা পয়সা জমেছে। আর কিছু হ'লেই—মানে হাজারখানেক টাকা হাতে এলেই একটা জমি কিনবো, সর্ষের ক্ষেত। তার মাস-কতকের ভেতরেই সর্ষে ফলবে। আর তা হ'লেই তেল। তেলের তখন একটুও অভাব থাকবে না—দেখে নিও।'

সুনীল অবাক হয়ে স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে থাকে—'তার মানে? তার মানেটা কি? এমন একটু তেল নেই যে মাথায় দিই?'

'ও মাথায় তেল দিয়ে কি হবে বলতে পারো? লাভটা কি? দু' দিন ধরে বাড়িতে একফোঁটা তেল নেই, কাল রাত্তিরে তিন পলা ধার করেছি, আজ সকালে চার পলা। খুব কম হ'লেও চল্লিশবার বলেছি কথাটা। তা-ই যখন ও পোড়ার মাথায় ঢুকল না, তখন সে মাথায় তেল না দিলেও চলবে।'

'সে কী কথা, আমি ভাবছিলুম ঠাট্টা করছ! সত্যিই তেল নেই?'

'হ্যাঁ, ঠাট্টা করবারই তো আমার সময় কিনা—রুপোর খাটে পা সোনার খাটে গা! কী সুখেই আছি—হাজারটা দাসীবাঁদী সেবা করছে, ঠাট্টা করা ছাড়া আর আমার কাজ কি?'

'কিন্তু পরশু যে দেড়পো তেল এনে দিলুম?'

'সে-ই মাথার গোলমাল! ওগো নবাবসাহেব—সেটা পরশু নয়, তরশুরও আগের দিন, আর দেড়পো তেল এনে কত নবাবী করবে তাই শুনি! সাত-সাতটা প্রাণী গায়ে মাখে—আবার রান্না হয়। সেই বলে না—একপো দুধ এল, ক্ষীর হ'ল, ছানা হ'ল, আর কি হবে বলো না! কর্তার দুধ নইলে চলে না, ছেলেটার পায়েস না হ'লে রোচে না!—তা তোমারও দেখছি তাই!'

'না, এবার থেকে দেখছি তেল এনে শিশির গায়ে ডাক্তারী ওষুধে দাগ কাটার মতো দাগ কেটে দিতে হবে। একদিনে এক দাগের বেশি খরচ করা চলবে না।'

'অমনি তাহ'লে আরও একটু কষ্ট ক'রো—কেমন? সেই একদাগ তেলে

সংসারটা সাতদিন চালিয়ে দেখিয়ে দিও! আমি বোকাসোকা মানুষ, দেখিয়ে শুনিয়ে না দিলে কেমন ক'রে পারব বলো?'

'ঐ তো তোমাদের দোষ। হিসেবের কথা শুনলেই তোমাদের মাথায় বজ্রাঘাত হয়।—মেয়েমানুষের জাতের স্বধম্মো!'

দুম দুম ক'রে পা ফেলে রুক্ষ চুলেই স্নান করতে যায় সুনীল।

সর্বেশ্বর বড়-একটা কোথাও বেরোয় না—দুবেলা হোটেলে খেতে যাবার সময় ছাড়া। সিঁড়ির মুখে ঐ একফালি চলনে বিছানা পেতে ডেরা বেঁধেছে সে। সেখানেই শুয়ে শুয়ে খালি বিড়ি খায়। বিড়ির টুকরো আর ছাইতে জায়গাটা নরক হয়ে উঠেছে ক'দিনেই।

সকাল-বিকেল কর্তারা এসে বসেন। বাকী সময়টা ওর কাটে টেঁপির সঙ্গে গল্প ক'রেই। টেঁপি ওর উত্তম শ্রোতা। নানা অবান্তর ও অসম্ভব আজগুবী গল্প ফাঁদে সে টেঁপির কাছে। কোন দিন হয়তো বলে—'জানিস টেঁপি, সেই যে হনোলুলুতে একটা ঘোড়ার পেটে তিনটে মানুষের ছানা হয়েছিল—তার একটা মরে গেছে।'

টেঁপি বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে বলে—'ঘোড়ার পেটে মানুষের ছানা! ধ্যেৎ—তাই নাকি হয়!'

'ওমা তুই জানিস না? এ তো পুরানো খবর রে। এই তো ক'দিন আগেই খবরের কাগজে খবরটা বেরিয়েছিল!'

'বেরিয়েছিল বুঝি? কে জানে বাবা! আমাদের এখানে তো কেউ খবরের কাগজ নেয় না। জানব কি ক'রে? হ্যাঁ দাদা, সত্যি?'

'সত্যি বৈকি। আমি কি তোর সঙ্গে তামাশা করছি?'

টেঁপির চোখ বিস্ময় ও শ্রদ্ধায় বিস্ফারিত হয়েই থাকে।

টেঁপিকে হাত করার একটু কারণও ছিল সর্বেশ্বরের। এখানে চাকর নেই। ফাই-ফরমাস খাটার একটা লোক চাই। সে দিক দিয়ে টেঁপি মেয়েটি ভাল। মানে সে গলির মোড়ের দোকান থেকে মধ্যে-মিশেলে বিড়ি কিনে তো দেয়ই, এক একদিন চুপি চুপি চা-পাঁউরুটিও এনে দেয়।

একদিন বেলা দশটা নাগাদ পুরুষরা সবাই চলে গেলে সর্বেশ্বর টেঁপিকে ডেকে বলে,—'টেঁপি, এক কাপ চা খাওয়াতে পারিস? সুনীলের বৌকে দুদিন ফরমাস করেছি—আজ আবার করলে কি ভাববে!...অথচ উঠতেও ইচ্ছে করছে না।'

টেঁপি শুকনো মুখে বলে,—'আমাদের ঘরেও আজ চা বাড়ন্ত একেবারে।' তারপর একটু কি ভেবে বলে,—'আচ্ছা দেখছি—ঐ বাইরের ঘরে বুনোমোষের মতো যে দুটো ভাই থাকে, ওদের কাছে আছে কিনা।'

'সে আবার কে রে?'

'ওমা দেখেন নি আপনি? কালো কালো মোটা মোটা দুটো ভাই? ঠিক মোষ একেবারে। ওরা কোন্ খবরের কাগজের ছাপাখানায় কাজ করে।

সারারাত কাজ—সারাদিন পড়ে ঘুমোয়। ওদের ঘরে যদি চা থাকে তো আমি এনে দিচ্ছি। লোক ভাল ওরা, যখন যা চাই তাই দেয়। অথচ কারুর সাতে-পাঁচে থাকে না।'

নিচের সেই দুই-ভাইয়ের ঘরে গিয়ে টেঁপি উঁকি মারে—

এক ভাই বসে কুটনো কুটছে, স্টোভে রান্না চড়েছে।

খিল্‌খিল্‌ ক'রে হেসে ওঠে টেঁপি।

'হাসছ কেন? অমন পাগলের মতো?'

মুখে কাপড় দিয়ে হাসি সামলে নিয়ে টেঁপি বলে,—'বেশ গিন্নীবান্নীর মতো রান্না করেন আপনারা! দেখলেই হাসি পায়।'

'আমাদের কেউ নেই—তাই করতে হয়। অত যদি অসহ্য লাগে—এসে ক'রে দিয়ে গেলেই তো পারো।' ছোট ভাইটা হেসে বলে।

'আমার সময় থাকলে ঠিক ক'রে দিয়ে যেতুম, মাইরি বলছি।'

টেঁপির সুরটা আন্তরিকই শোনায়।

আর এক ভাই রাস্তার কল থেকে জল নিয়ে এসে ঢুকল।

'আচ্ছা আপনারাও তো ভাড়া দেন, কিন্তু সব জল রাস্তা থেকে তোলেন কেন—এত কষ্ট ক'রে?'

'কী করব! ঐ ঝগড়া ক্যাচাকেচির চেয়ে এ ঢের ভাল। ওসব আমাদের পোষায় না।'

টেঁপি বলে, 'তা বটে। আচ্ছা একটু চা-পাতা হবে আপনাদের কাছে?'

'হবে—কেন বলো তো?'

'একটু দিন না। এক কাপের মতো।'

'ঐ টিনটায় আছে, নিয়ে যাও।'

ওদের ঘর থেকেই একটু কাগজ সংগ্রহ করে টেঁপি গিয়ে টিনটা থেকে প্রয়োজন-মতো চা ঢেলে নেয়।

তারপর দাঁড়িয়ে একটু ইতস্তত ক'রে বলে—'আর কি হবে, মাছের ঝোল? তা মাছ কৈ, এখনও জলেতে নাকি?'

তারপরই নজরে পড়ে যায়, বাজারের থলিটা মাছসুদ্ধ এক-পাশে পড়ে আছে। সে গালে হাত দিয়ে বলে—'ওমা এ মাছ যে পচে উঠল! এখনও তো বাছাও হয় নি দেখছি! আচ্ছা দাঁড়ান, মাছগুলো আমি বেছে-কুটে দিয়ে যাচ্ছি। ঐ বুঝি আঁশ-বঁটি?'

'আহা, তুমি আবার কেন করবে, আমরাই ক'রে নিচ্ছি!'

'করলুমই বা। আপনাদের করতে আধঘণ্টা, আমার পাঁচ মিনিট। কেটে দিয়ে যাচ্ছি, ধুয়ে তাড়াতাড়ি নুন-হলুদ মাখিয়ে রাখুন, নইলে ওর আর আদায় থাকবে না!'

ওখান থেকে ফিরে একটু পরেই চা তৈরি ক'রে আনে টেঁপি। সর্বেশ্বর পুরস্কারস্বরূপ নতুন একটা গল্প শোনায়। বলে,—'উড়োজাহাজ হয়ে

আজকাল কী সুবিধেই হয়েছে বল তো টেঁপি! বিলেতের রাজা রোজ কামস্কাট্‌কায় মাছ ধরে বাড়ি ফেরার পথে বসোরা থেকে গোলাপ কিনে নিয়ে যায়।...আগে এসব কথা কেউ ভাবতেই পারত না।'

'তাই নাকি? বেশ মজা তো!' চোখ বড় বড় ক'রে বলে টেঁপি। তারপর বলে,—'জানেন দাদা, আপনি সেদিন যে খবরটা দিলেন না—বাবাকে বলতে হেসে উড়িয়েই দিলে। বলে তুই যেমন বোকা—তোকে তেমনি বোকা বোঝায় মুখুজ্যে।'

'কোন্ খবরটা রে?' চায়ের পেয়ালা নামিয়ে রেখে প্রশ্ন করে সর্বেশ্বর।

'সেই যে—বোম্বেতে সেদিন ভূমিকম্প হয়ে সেই সমুদ্দুরের মাছ ছিটকে এসে লাটসাহেবের খাবার টেবিলে পড়েছিল?...সত্যি নয় কথাটা?'

'সত্যি বইকি। নইলে তোকে বলব কেন? তোর বাবা তো খবরের কাগজ পড়তে পায় না, খবর জানবে কি ক'রে বল্?'

টেঁপির চোখ ছলছল করতে থাকে। সে বলে—'আর খবরের কাগজ—খেতেই জোটে না! ওসব খরচ করবে কোথা থেকে? বামুনপিসির কাছে গয়না বাঁধা আছে, তবু কাল ডেকে একরাশ কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দিয়েছে! বাবা কাল ঘরে ফিরে চোখের জল ফেলছিল।'

সর্বেশ্বর খানিকটা চুপ ক'রে থাকে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে জামাটা টেনে নিয়ে গায়ে দিতে দিতে বলে—'আমি এখন বেরুচ্ছি টেঁপি। তোর বাবা ফিরলে বলিস তো, রাত্তির বেলা যেন আমার সঙ্গে দেখা করে।'

রাত্রে মহিমবাবু এসে ওর বিছানারই একটা পাশ ঝেড়ে-ঝুড়ে নিয়ে বসলেন।

'আমাকে ডেকেছিলেন?'

'হ্যাঁ—একটা কথা ছিল। আচ্ছা বামুন পিসির কাছে আপনার কত দেনা?'

'তা ঠিক বলতে পারব না, তবে নব্বুই টাকার কাছাকাছি হবে।'

বালিশের তলা থেকে একখানা একশ টাকার নোট বার ক'রে ওর হাতে দিয়ে সর্বেশ্বর বলে—'ওর দেনাটা মিটিয়ে দিয়ে আসুন দিকি—যান।'

কথাটা বুঝতে মহিমবাবুর কিছু বিলম্ব হয়। শেষে তিনি প্রায় কাঁদো-কাঁদো গলায় বলেন—'টাকাটা আপনি ধার দেবেন? বাঁচালেন দাদা। কাল বুড়িটা কি যাচ্ছেতাই করলে আমাকে! আমাকে বলে কিনা সোনার দামের চেয়ে তার বেশী পাওনা হয়ে গেছে! আপনাকে আমি সত্যিই বলছি দাদা—আপনি ঠকবেন না। সরু হার বটে, তবে দেড় ভরির বেশী ছিল ওজন, ক'দিনই বা গলায় দিয়েছে টেঁপির মা যে ক্ষইবে!'

নোটটা হাতে নিয়ে মহিমবাবু বামুন পিসির ঘরের সামনে দাঁড়ান—'পিসিমা, ঘরে আছেন নাকি?'

'কে, মহিম ? এসো বাবা—এসো। দেখো, আমার ঐ গামছাখানা বাঁচিয়ে। আধ-শুকনো হয়ে গেছে কিনা। তোমাদের পথঘাটের কাপড়—তা বসো বাবা, ঐ যে চটের আসনটা—টেনে নাও।' পিসিমা জপ করছিলেন। জপের মালাটা কপালে ঠেকিয়ে গলায় পরে নিলেন।—'তারপর কি মনে ক'রে বাবা মহিম ?'

'সেই হারটা পিসিমা। দেখুন তো একবার সুদটা কষে, কত দাঁড়িয়েছে ?'

'অ—তা বাবা সব সুদটা তো আর এখন দেবে না। কেন আবার এই বুড়ো মানুষকে খাটাবে এত রাত্তিরে ? যা দেবার দিয়ে যাও না। আমি কাল সকালে জমা ক'রে রাখব'খন।'

'না—আমি—আমি ও হারটা নিয়ে যাবো পিসিমা।'

'নিয়ে যাবে ? সব টাকা দিয়ে !' তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে পিসিমার কণ্ঠস্বর, 'কিন্তু সে যে একগাদা টাকা মহিম। সুদ আমি এক পয়সাও ছাড়তে পারব না, তা আমি ব'লে দিচ্ছি। আমার তো স্বামী-পুত্তুর নেই যে রোজগার ক'রে খাওয়াবে ! বিধবা বেওয়া মানুষ, আমার ঐ সুদই ভরসা।'

'না না পিসিমা—সুদ আমি ছাড়তে বলছি না। আপনি হিসেবটা দেখুন না ?'

'হুঁ—তা হ'লে টাকা হয়েছে বাবুর ? তা টাকাটা কে দিলে তাই শুনি ?'

'সে পরে বলব পিসিমা। আপনি খাতাটা দেখুন আগে।'

'দেখছি বাছা, দেখছি। তোমার এখন ফুর্তির প্রাণ ঘোড়দৌড়ের মতো দৌড়চ্ছে, আমার তো আর তা নয় বাছা, বুড়ো মানুষ, বাতের শরীর। —যত সব অনাছিষ্টি কাণ্ড ! দিন গেল আলোয় ঝালোয়—রাতদুপুরে উনি এলেন আমাকে পয়সার গরম দেখাতে !' পিসিমা গজগজ করতে করতে ওঠেন। কুলুঙ্গীর কোণ থেকে স্লেট, পেন্সিল আর খাতা বার ক'রে হিসাব করতে বসেন।

হিসেবনিকেশ ক'রে সব চুকিয়ে দিয়ে হার নিয়ে ফিরে আসেন মহিমবাবু।

'বাঁচালেন ভাই। ঐ ডাইনী বুড়ীর হাত থেকে অব্যাহতি পেয়ে বাঁচলুম। হারটা যত্ন ক'রে তুলে রাখুন।'

'হার নিয়ে আমি কি করব ?'

'হার—হার আপনি রাখবেন না ?'

'পাগল হয়েছেন ! এই তো হাল দেখছেন ! সোনাদানা রাখব কোথায় ?'

'তবে টাকাটা কি শুধু হাতে ধার দেবেন ? সুদ কত নেবেন তা হ'লে ?' কণ্ঠে আশঙ্কার সুর মহিমবাবুর।

'টাকা ধার দেওয়া কি আমার ব্যবসা ?'

'তবে !' মহিমবাবু আরও বিস্মিত হন।

'ওটা আমি টেঁপির বিয়েতে যৌতুক দিলুম আগাম।'

'না না ভাই, সে হয় না। কদিনেরই বা জানাশোনা ! এতগুলো টাকা—।'

'তা হ'লে হারটা আবার বামুন পিসিকে দিয়ে টাকাটা ফিরিয়ে আনুন !' সর্বেশ্বর বেশ প্রশান্ত কণ্ঠেই কথা ক'টা বলে।

মহিমবাবু আরও কুণ্ঠিত হয়ে পড়েন। একটু চুপ ক'রে থেকে গাঢ় কণ্ঠে বলেন—'কালীপদ ঠিক কথাই বলে, আপনি কোন ছদ্মবেশী মহাপুরুষ!' তারপরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন—'কবে যে ওর বিয়ে দিতে পারব তাই তো ভাবি। হাতে একটা পয়সাও নেই। শুধু হাতে কে-ই বা বিয়ে করবে বলুন? রূপও নেই, আর রূপোও নেই। অথচ মাইরি বলছি ভাই, বড় ভাল মেয়ে ও। বড় ঠাণ্ডা আর গুণের মেয়ে। মারো ধরো কাটো, একটা কথাও কইবে না।'

'হবে—হবে। হয়ে যাবে—ভাববেন না। দেখুন এ সংসারে যার মনটা ভাল তার কখনও অকল্যাণ হয় না। শেষ অবধি ভাল পাত্রেই পড়বে।'

'আর ভাল পাত্তর!' দীর্ঘশ্বাস ফেলে মহিমবাবু উঠে যান।

একটু পরেই টেঁপি আসে ছুটতে ছুটতে।

'একটু মাথাটা তুলুন তো—ও দাদা!'

'কেন রে?' বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে সর্বেশ্বর।

'মাথাটা তুলুন না।'

সর্বেশ্বর উঠে বসতেই দু-হাত দিয়ে ওর পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করে টেঁপি।

'ওকি—ওকি! ওটা আবার কি হ'ল?'

'আপনি নাকি এই হারটা যৌতুক দিয়েছেন আমাকে? বাবা আমাকে পরতে বললে। বাবা বলছেন আপনি মানুষ নয়—দেবতা। আজ বুঝেছে বাবা, এতদিন আমি আপনার সুখ্যাতি করলে আমাকে ঠাট্টা করত।...আমার খুব আনন্দ হয়েছে, সত্যি।'

কতকটা অসংলগ্নভাবে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে কথাগুলো।

'কেন—হার পরে?'

'না, তা নয় দাদা। আপনাকে যে বাবা-মা এতদিনে চিনতে পেরেছে এই জন্যে।'

'আচ্ছা আচ্ছা—হয়েছে। আর পাকামি করতে হবে না, যা এখন।'

সর্বেশ্বর প্রয়োজন হ'লে যেমন ভোরে উঠতে পারে তেমনি অবসর পেলে অনায়াসে ন'টা অবধি ঘুমোতেও পারে। এখানে এসে অবসরের অভাব নেই, কিন্তু ঘুমও হ'তে পারত না। একবাড়ি লোক—দুটি কল—শুধু জল নেবার কচ্‌কচিতেই ঘুম ভেঙে যেত। কাজ নেই ব'লে ওঠবার চেষ্টা করত না—শুয়ে শুয়ে নিঃশব্দে বিড়ি টানত। আজ কিন্তু একটু বেশী আগেই ঘুম ভাঙল। খনখন ক'রে বেজে উঠল বামুন পিসির কণ্ঠস্বর,—'বলি মেয়েটিকে কী দরে বেচলে বাবা মহিম?'

'তা—তার মানে? কী বলছেন আপনি?'

'না, তাই বলছি। বলি ঘাস তো খাই না বাবা—ধানের চালের ভাতই

খাই। কোথা থেকে টাকা নিয়ে হারছড়া ছাড়ালে তা কি আর আমি জানি নে বাবা! এই বাজারে কেউ একটা টাকা বার করতে পারে না পকেট থেকে, আর ওর তো ঐ অবস্থা! অদ্যভক্ষো ধনুর্গুণো—মড়ার চ্যাকড়া পেতে শুয়ে আছে রাতদিন, আর ফুকফুক ক'রে বিড়ি টানছে! কুড়ি টাকা মাইনের চাকরিও নেই! ও অমনি যে ফস ক'রে এক আঁজলা টাকা বার ক'রে দিলে—সে কি শুধু শুধু? তার দাম দিতে হয় নি?'

'এসব কি বলছেন বামুনপিসি! অমন কথা মুখে উচ্চারণ করবেন না। টাকাটা উনি দিয়েছেন সে তো আমি সবাইকেই বলেছি। উনি মানুষ নন, দেবতা। টাকাটা উনি আমার টেঁপিকে যৌতুক করেছেন।'

'যৌতুক করেছেন! তাই তো বলছি! কী এমন শুভদিন—ওর বে-থা হ'ল যে যৌতুক করলেন?...তখনই বলেছিলাম পেরতাপকে যে অমন কাজ করো নি! একটা হাড়হাবাতে বাউণ্ডুলে বিশ্ববকাটে লোককে এতগুলো মেয়েছেলেপিলের মধ্যে ঢুকিও নি! তা আমার কথা তো শুনলে না। এখন ঠেলা সামলাক্। তবে আমিও ব'লে রাখনুম—এই মানি বামনী থাকতে ওসব বেলেল্লাগিরি চলবে না এখানে। ভালয় ভালয় যদি না যায় তো কি ক'রে বিদেয় করতে হয় তা আমি দেখিয়ে দেব। মুড়িখ্যাংড়া মারতে মারতে বার করব বাড়ি থেকে!'

মহিমবাবু মুখখানা এতটুকু ক'রে ওপরে উঠে আসেন। সর্বেশ্বরের সঙ্গে চোখোচোখি হ'তেই বলেন,—'শুনলেন—শুনলেন তো ভাই মাগীর কথাগুলো?···ছি ছি! ও নাকি আবার বামুনের মেয়ে!'

সর্বেশ্বর হেসে জবাব দেয়—'সুদে আসলে হারটা মেরে দেবে এই ভেবেই আপনাকে তাগাদা করেছিল, টাকার দরকারে নয়। সে আশায় ছাই পড়ল, ক্ষেপে তো একটু উঠবেই। ও নিয়ে আর মাথা খারাপ করছেন কেন?'

'আপনি এ বুড়িটিকে চেনেন না—এই নিয়ে যা ঘোঁট হবে!'

'মিথ্যে চিরদিনই মিথ্যে। ওর অত দাম দিতে গেলে এ পৃথিবীতে বাঁচা যায় না।'

'না ভাই, কাদা ছোঁড়ার কারণটা হয়ত মিছে হ'তে পারে কিন্তু কাদাটা সত্যি—তা গায়ে লাগলে ধুতে হয়।'

'ধুয়ে ফেললেই যা চলে যায় তার জন্যে অত ভয় কি?' প্রশান্তভাবে হাসে সর্বেশ্বর।

কথাটা কিন্তু সত্যিই ঐখানে মেটে না।

বিকেলে কলতলাতে একেবারে রণরঙ্গিনী বেশে আবির্ভূতা হন বামুন পিসি।

'বলি, হ্যাঁ লা, তোরা তো বেশ! তোরাও তো সব সোমত্ত সোমত্ত মেয়ে নিয়ে বাস করিস! তোদের একটু প্রাণের ভয় নেই? এমনি রাসলীলা চলবে আর তোরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবি? এর পর তোদের মেয়ের বে দিবি কেমন

ক'রে ? পাত্তর জুটবে ?'

দু-একজন চোখে চোখে চেয়ে মুচকি হাসল। অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সী যারা, তারা সরে পড়ল। বামুন-পিসির মুখ কে না জানে। এখনই হয়তো নানা কল্পিত কেচ্ছার ইতিহাসে আকাশ-বাতাস বিষাক্ত হয়ে উঠবে।

কিন্তু যাদের জল নিতেই হবে, তারা পালায় কি ক'রে ? বিশেষতঃ সুনীল চাকলাদারের বৌ তখন সবে ঘড়া বসিয়েছে। বামুন-পিসি সকলের দিকে একবার অগ্নিদৃষ্টিতে চেয়ে তাকে নিয়েই পড়লেন, 'বলি তপুর মা, তোমার তো কি রকম আত্মীয় হয় শুনেছি ছোঁড়া—তুমি কি বলো ? এমনি চলবে ?'

সুনীলের বৌ মাথায় ঘোমটাটা একটু নামিয়ে নতমুখে জবাব দেয়—'আমার কিসের আত্মীয় ? ওঁর বন্ধু—তা ছাড়া ওসব কথার আমি কিছু জানি নে, ও কথায় থাকতেও চাই নে।'

'তা জানবে কেন···তোমরাও বুঝি ঐ চাও ? বেশ মজা, না ?···তা তুমিই বা বাকি থাকো কেন তপুর মা? দু-পয়সা কামিয়ে নাও না !···তোমার আত্মীয় ব'লেই তো পেরতাপ ঐ আপদ বাড়ি ঢুকিয়েছিল গা !'

তপুর মা'র উদ্যত রসনা জবাব দিতে গিয়েও থেমে যায়। আজই হয়তো সন্ধ্যাবেলা গিয়ে দুটো টাকার জন্যে হাত পাততে হবে। ছোট ছেলেটার অসুখে হাত খালি হয়ে গেছে, টাকা না পেলে হাঁড়ি চড়বে না। শুধু হাতে দু-এক টাকা মেলে মাঝে মাঝে, হোক্ টাকাপ্রতি ছ' পয়সা মাসিক সুদ—তাই বা দেয় কে ? সে ক্ষীণস্বরে শুধু বললে, 'আপনাদের যা করবার করুন না পিসিমা, আমরা গরীব, মরেই আছি, আমাদের আর বেশী ক'রে মেরে লাভ কি ? আপনি তো জানতেনই ও আমাদের কেউ হয় না—সে খোঁটা এখন দেন কেন ?'

'আমি তো জানতুমই ! কিন্তু কৈ, তোমরা তো তখন একটা কথাও বলো নি !···আমি যা করতে পারি তা তো করবই। পেরতাপ দত্ত যদি এর একটা প্রিতিকার না করে তো ওকে সুদ্ধু ভিটেছাড়া করব—এই ব'লে রাখছি।'

কথাগুলো প্রতাপ দত্তের ঘরের দিকে মুখ ক'রেই বলা হয়। ছোট জায়গা, শোনবার কোন বাধা নেই। তবু আর এক পর্দা গলা চড়িয়ে বলেন, 'কালই যদি এর সুরাহা না হয় তো ঐ পেরতাপের ঘরের সামনে উপোস ক'রে তে-রাত্তির শুরু ক'রে দেব, এই ব'লে রাখলুম। দেখি ছেলেপুলে নিয়ে বাস ক'রে কোন্ সাহসে চুপ ক'রে থাকে।'

তিনি দুম্ দুম্ ক'রে পা ফেলে এগিয়ে গিয়ে ঝনাৎ ক'রে কলতলায় বালতিটা বসান।

সন্ধ্যের সময় মহিমবাবু এসে হতাশ ভাবে বসে পড়েন ওর বিছানায়।

'আপনাকে বলেছিলুম মুখুজ্যে মশাই, আপনি বিশ্বাস করেন নি। আজ সন্ধ্যের সময় প্রতাপ দত্ত আমাকে শাসিয়ে গেল যে হয় মেয়ের বে দিতে হবে, নয়তো উঠে যেতে হবে এক মাসের মধ্যে।'

সর্বেশ্বর চুপ ক'রে বসে বিড়ি খাচ্ছিল—তেমনিই বসে রইল।

মহিমবাবু ব'লে চললেন, 'কোথায় এখন রাতারাতি পাত্তর পাই বলুন তো! আর বাসাই বা কোথায় পাই ?'

'তার দরকার হবে না মহিমবাবু—আমি কাল সকালে চলে যাব।'

'না না ভাই—ছিঃ! আমার জন্যে আপনি কেন যাবেন ? তা হ'লে তো পরোপকারে খুব ফল মিলল!'

'আবার পরোপকারের কথা কেন তুলছেন চক্কোত্তি মশাই ? টেঁপিকে স্নেহ করি—ওকে একটা কিছু দেবার কথা ভাবছিলুম—কিনে না দিয়ে না হয় ঐটেই ছাড়িয়ে দিলুম!'

'সেই কথাটাই বলব ভাবছিলুম ভাই—সাহসে কুলোচ্ছিল না। তা অভয় দিলে যখন বলি—তুমিই বলছি ভাই, কিছু মনে ক'রো না, তুমি আমার চাইতে বয়সে ছোটই হবে—তুমি যখন টেঁপিকে স্নেহই করো, তুমিই নাও না কেন ওকে ?'

'ওকে নেব—মানে ?'

'মানে—তুমিই ওকে বিয়ে করো না।'

'নাঃ, এদের দেখছি সক্কলকার মাথা খারাপ হয়ে গেছে! আমার সঙ্গে দেবে মেয়ের বিয়ে! তার চেয়ে এক কাজ করো না কেন চক্কোত্তি—খুব ভোর ভোর উঠে মেয়েটাকে নিয়ে গিয়ে হাওড়ার পোলের ওপর থেকে ঠেলে ফেলে দিয়ে এসো!'

'কেন ভাই ? মেয়ের আমার তেমন রূপ নেই, কিন্তু বড় লক্ষ্মী আর ঠাণ্ডা মেয়ে!'

'তাই বুঝি একটা লক্ষ্মীছাড়ার হাতে না দেওয়া পর্যন্ত শান্তি হচ্ছে না!'

'না না, লক্ষ্মীছাড়া তো তুমি নও! সে আমি বুঝে নিয়েছি—কেউ নেই ব'লে এমন ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছ। তুমি ওকে নিয়ে সংসার পাতো ভাই, সুখীই হবে।'

'দ্যাখো চক্কোত্তি, একটা কথা সাফ ব'লে দিচ্ছি—বিশ্বাস করো আর না-ই করো, বিয়ের ভয়েই আমি এখানে পালিয়ে ঘাপ্‌টি মেরে আছি। যেখানে আমি থাকতুম সেখানে এক ব্যাটা হবু শ্বশুর আমাকে তাড়া করেছে। তুমি যদি আবার এই কথা তোল, তা হ'লে আমাকে এই রাত্তিরেই সরে পড়তে হয়। না হয় রাতটা কোন পার্কে কি ওয়েটিং রুমে কাটিয়ে দেব!'

'না না, তা বলছি না।' অপ্রতিভ হয়ে পড়েন মহিমবাবু, 'মেয়েটাও তোমাকে বড় ভক্তি করে। তোমার নাম করতে অজ্ঞান একেবারে। কোথায় কার হাতে দেব—মোদো মাতাল কিংবা জুয়াড়ি—বিড়িওলা কি গাড়োয়ান—কেঁদে কেঁদে জীবনটা যাবে। অথচ আমার যা অবস্থা, ওর চেয়ে ভাল পাত্তর আর কি জুটবে বলো!'

খানিকটা চুপ ক'রে থেকে লাফিয়ে ওঠে সর্বেশ্বর, 'হয়েছে, ঠিক হয়েছে। পাত্তর আছে চক্কোত্তি। তোমাদেরই বাড়ির নিচে বাইরের ঘরে ঐ যে ছেলে দুটি থাকে,—কোন খবরের কাগজে কাজ করে যেন,—ওদেরই বড়টির সঙ্গে লাগিয়ে

দাও। বেশ ছেলে, ওরাও টেঁপিকে খুব স্নেহ করে।'

'ওরা! হ্যাঁ—ওরা বামুন বটে। কিন্তু ওরা কি রাজী হবে একেবারে শুধু হাতে নিতে!'

'তুমি কথাটা পাড়োই না—যাও, ওঠো। আচ্ছা, সে সামান্য দু'চার টাকার জন্যে আটকায়—আমি যেমন ক'রে পারি যোগাড় ক'রে দেব।...আমি যদি না থাকি তাতেও ভেবো না—বিয়ের তারিখের আগে আমি পাঠিয়ে দেব। বিয়ের আগে আমার মেসের ঠিকানায় একটা চিঠি দিও। যাও।'

প্রায়-অনিচ্ছুক মহিমকে একরকম ঠেলেই পাঠায় নিচে সর্বেশ্বর।

তারপর অনেকক্ষণ পর্যন্ত অন্ধকারেই বসে বসে বিড়ি টানে সে। খানিকটা পরে ওর চোখে পড়ে টেঁপি নিচে থেকে কী একটা কিনে নিয়ে আসছে।

'এই টেঁপি, শোন্!'

'কী দাদা?'

'বোস্ এখানে।...একটা কথা—আমি কালই এখান থেকে চলে যাচ্ছি।'

'সে কি!' চমকে ওঠে টেঁপি, চিনি কিনে ফিরছিল, হাত থেকে ঠোঙাটা পড়ে গিয়ে চারিদিকে চিনি ছড়িয়ে যায়। কিন্তু সেগুলো তুলতেও যেন ওর হাত-পা আসে না। সর্বেশ্বর নিজেই উঠে এসে কুড়োতে শুরু করে।

'আবার কবে আসবেন?'

'আবার আসব কী'রে! একবারেই চলে যাবো। আমার তো বাসা একটা আছে; সেখানে একটু গোলমাল ছিল ব'লেই দু-চার দিনের জন্য এখানে এসেছিলুম!'

'সেখানে কে কে আছে?' কেমন একরকম ধরাগলায় বলে টেঁপি।

'কে আবার থাকবে! সে যে মেস।...ঠাকুর-চাকর—এই সব আছে!'

'আপনার বাড়ি নেই কোথাও?'

'না।'

টেঁপি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে অনেকক্ষণ।

'আপনি একটা বাসা কেন করেন না কোথাও?'

'ও আমার ভাল লাগে না টেঁপি।'

'চিরদিন এমনি কাটাবেন? যদি কখনও অসুখ-বিসুখ করে? কে দেখবে?'

'ভগবান দেখবেন। হাসপাতাল আছে। ওসব বাজে ভাবনা নিয়ে আমি থাকি না।'

'আপনি—আপনি বিয়ে-থা করবেন না?'

'আবার তোর মুখেও ঐ কথা! দেখছি আমাকে রাতটাও কাটাতে দিবি না। বললুম না যে, ওসব আমার ধাতে সয় না!'

টেঁপির মা'র ডাক কানে এল,—'হ্যাঁরে টেঁপি, এলি?' তারপর ঈষৎ নিচু

গলায়,—'হতচ্ছাড়া মেয়ের লজ্জা নেই—আবার ঐখানে গিয়ে জুটেছে—'

'যা টেঁপি—মা রাগ করছেন।' সর্বেশ্বর দাঁড়িয়ে ওর হাতে চিনির ঠোঙাটা তুলে দেয়। আড়ষ্টভাবেই সেটা হাতে ক'রে নেয় টেঁপি। চারপাশের আলোর আভাতে সর্বেশ্বর লক্ষ্য করে—টেঁপির চোখে জল।

'দূর পাগলী, কাঁদছিস কেন? আমি আবার আসব। তোর বাবাকে বলেছি বিয়ের সম্বন্ধ করতে—বোধ হয় হয়ে যাবে।...তোর বিয়েতে নিশ্চয় আসব। যা ভাই, লক্ষ্মীটি যা—'

টেঁপির চোখ বেয়ে এবার অজস্রধারে জল গড়িয়ে পড়ল। ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগল থর থর ক'রে। কিন্তু সে কোন উত্তর দিলে না, নিঃশব্দেই নিজেদের ঘরের দিকে চলে গেল।

সর্বেশ্বরের মুখটা অন্ধকারে ভাল দেখা গেল না। সে তেমনি খানিকটা চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে আবার নিজের বিছানায় বসে পড়ল। তারপর একটা বিড়ি ধরাতে ধরাতে অস্ফুটকণ্ঠে বললে—'কঠিন মায়া বাবা!'

পরের দিন ভোরবেলাই উঠে বিছানাটা গুটিয়ে একপাশে সরিয়ে রেখে সর্বেশ্বর নিচে নেমে এল। কল থেকে এক খাবলা জল নিয়ে মুখে চোখে দি বাড়িওলায় ঘরের সামনে দাঁড়াল।

'দত্তমশাই উঠেছেন নাকি?'

'কে?' বলতে বলতে পাঁচহাতি ধুতি-পরা প্রতাপবাবু বেরিয়ে এলেন।

'আরে, আপনি—এত ভোরে!'

'আমি আজই চলে যাচ্ছি প্রতাপবাবু, সেই কথাটা বলতে এলুম।'

'সে কি! কোথায় যাচ্ছেন? কবে ফিরবেন?'

'যাচ্ছি দেশে। কবে ফিরব তা বলতে পারি না। আপনি জায়গাটা ভাড়া দিতে চান, কাউকে দিয়ে দেবেন। আমার এখনও দিন-পনেরো বাকি আছে—তা ওটার টাকা আর আমি ফেরত চাই না—একটা নোটিশ দিতেও তো হ'ত!'

'তা—হঠাৎ এমন ভাবে—'

'মানে ঐ খবরটা শুনলুম কিনা। আমিই এমন ক'রে বেড়াই, কিন্তু আমার পিসিমার হাতে এখনও সোনাদানা আছে ঢের। তাই ভাবছি—তাঁকে একটা সংবাদ দেওয়া তো উচিত। বিধবা মানুষ, ঐ তো ভরসা। স্নেহ করেন খুব—তার একটা ঋণও আছে, তিনি তো খবর পান না কিছু, আমার একটা খবর দেওয়া কর্তব্যও।'

'কী খবর মশাই? সোনাদানা, মানে—কোন বিশেষ খবর আছে নাকি?'

'কেন, আপনি শোনেন নি কিছু?'

'কৈ, না তো! কি শুনব?'

গলাটা একটু চড়িয়েই উত্তর দেয় সর্বেশ্বর—'কোম্পানি যে সোনার দাম বেঁধে দিচ্ছে!'

'সে আবার কি? প্রতাপবাবুর মুখ শুকিয়ে ওঠে।

বামুনপিসি কলতলায় স্নান করতে নেমেছিলেন। তিনিও কাঠ হয়ে

দাঁড়িয়ে যান।

'সোনার দাম হু-হু ক'রে বেড়ে যাচ্ছে ব'লে ব্যবসা-বাণিজ্যের বড় ক্ষতি হচ্ছিল। তাই কোম্পানি আইন করছে যে, কেউ আর পঞ্চাশ টাকা ভরির বেশি বেচতে পারবে না।'

'যাঃ—কী বলেন!' প্রতাপবাবুর মুখ দিয়ে কোনমতে কথাটা বের হয়। তাঁর মুখে হাসির আভাস, কিন্তু চোখে উদ্বেগ ও হতাশা। হাসি-কান্নায় মেশানো মুখভাব।

'বেশ তো, অমনি নিশ্চিন্ত থাকুন না! দুদিন পরেই খবরের কাগজে দেখতে পাবেন!'

'আপনি—আপনি কথাটা শুনলেন কোথায়?'

'আপনি তো জানেন—আমার কাকার নিজের সম্বন্ধীর সহিস হ'ল গে লাটসাহেবের বাবুর্চির আপনার মেসোমশাই! বলি আইনকানুন যাই হোক না কেন—লাটসাহেবের কানে তো আগে পৌঁছবে!'

যুক্তি অকাট্য। প্রতাপবাবুর পা-দুটো থর থর ক'রে কাঁপতে লাগল। তিনি সেইখানেই বসে পড়লেন। বামুনপিসিরও আর স্নান করা হ'ল না, তিনি উঠে সেই সংকীর্ণ রোয়াকেই আছড়ে পড়লেন,—'ওমা, কী সর্বনেশে কথা রে! আমি যে দাঁড়িয়ে মারা যাবো রে! ওরে আমার যে মূলধনসুদ্ধ চলে যাবে রে!'

'কী করা যাবে মাসিমা বলুন—ওধারে যে অনেক লোকের সর্বনাশ হয়ে যায়! আপনার মতো দু'চারজনের ক্ষতি হয়েও যদি গরীব লোকদের সুবিধে হয়—কোম্পানি তো সেইটে আগে দেখবে কিনা! তবে আপনার অত ভাবনাই বা কি, এখনও তো খুব একটা খবর ছড়ায় নি, যতটা পারেন বেচে দিন না এই বেলা!'

সে আর দাঁড়াল না, নিস্পৃহ উদাসীন ভাবে গুন গুন করে গান গাইতে গাইতে বেরিয়ে গেল—

'মা আমায় ঘুরাবি কত—চোখঢাকা বলদের মতো।'

বামুনপিসি ততক্ষণে মড়াকান্না জুড়ে দিয়েছেন।

॥ ৮ ॥

সর্বেশ্বর ভয়ে-ভয়েই মেসে ফিরছিল। বরাতক্রমে গলির মুখেই ঠাকুরের সঙ্গে দেখা—আর তার মুখে ভাল খবরই পাওয়া গেল। সে একগাল হেসে বললে—'আপনার শ্বশুর মশাই চলে গেছেন আজ্ঞা। সবে পরশু গেছেন—মিলচার্জ বাদে চা-পান-তামাক আর জলখাবারে কদিন বিল হয়েছে আপনার বিয়াল্লিশ টাকা দশ আনা।'

'তা হোক্ গে—আপদ গেছে তো!'

'আজ্ঞা হ্যাঁ, গেছেন। তবে আবার আসবেন।'

'আবার আসবেন! সে কী রে!'

'আজ্ঞা। এবার আপনার পিসিমাকে সুদ্ধ নাকি নিয়ে আসবেন। তা ছাড়া দুজন ভাইপোকে রেখে গেছেন, তারা সারাদিন হাওড়া আর শিয়ালদায় পাহারা দেবে।'

সর্বেশ্বর শিউরে ওঠে, 'বলিস কিরে! এ যে নাগপাশ বাবা—অনন্ত সাপের পাশ! পাশ ফেরবার যো নেই!'

'আজ্ঞা, এ মাস না হ'লে নাকি দু'মাস টাইম নেই! কী করা যাবে! খুব জরুরী দরকার ওঁয়াদের!'

'হুঁ।' মেসে ঢোকে সর্বেশ্বর খুব বিষণ্ণ চিত্তেই। খবর আরো যা মেলে তাতে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। প্রদোষ এসে বলে, 'মুখুজ্জেদা, কেন পালিয়ে ছিলেন তা ঐ মালটি দেখেই বুঝেছি! বাব্বা, শ্বশুর বটে একখানা!...শ্বশুরই এই—না জানি ওঁয়ার কন্যাটি কেমন!'

বিনয়বাবু রাগ ক'রে বলেন,—'না মশাই, আপনাকে সহ্য করি এই ঢের, আপনার ও রকম গেস্ট এলে আর পারব না। দিয়ে যাবেন ষাটটি টাকা।'

'দিয়ে যাবেন ষাটটি টাকা!' ভেংচি কেটে বলে সর্বশ্বর,—'আমার সঙ্গে আগে পরামর্শ করেছিলেন? আমি কি বলেছিলুম খাওয়াতে? দেখলেন আমিই পালালুম—আপনারা কোন্ আক্কেলে খাওয়াতে গেলেন?'

'কে জানে মশাই—সত্যিই যদি কোন দিন আপনার শ্বশুর হয়ে বসেন? তাঁকে কি তাড়াতে পারি?'

'সত্যিই যদি উনি শ্বশুর হয়ে বসেন তো তখন কি আপনার টাকা আদায় হবে ভেবেছেন!...তখন চাইতে গেলে ঐ শ্বশুরটিকে লেলিয়ে দেব! প্রাণ নিয়ে পালাতে পথ পাবেন না!'

সারা সকালটা বসে বসে ভাবল সর্বেশ্বর। যতই পিসি এবং বনমালী ঘোষালের যৌথ আক্রমণের কথা কল্পনা করতে লাগল ততই ওর নাড়ী ছাড়বার উপক্রম হ'ল। গায়ে ঘাম দিতে লাগল।

না, মুখে যতই বলুক—পারবে না সে ঠেকাতে। তার চেয়ে পালানোই বুদ্ধিমানের কাজ। পালানো এবং এই বেলা সময় থাকতে পালানো!

আর একটা ভাঙা-গোছের টিনের সুটকেস ছিল, সেইটেতে একখানা কাপড় গামছা আর এটা-ওটা জিনিস ভরে নিয়ে সর্বেশ্বর খাওয়াদাওয়ার পরই বেরিয়ে পড়ল। যাবার সময় ঠাকুরের হাতে পাঁচটা টাকা দিয়ে বলে গেল, 'এই নাও তোমার বকশিশ, এবার কিন্তু আর ঢুকতে দিও না—ব'লে দিও, সে এখান থেকে উঠে গেছে।'

আবার পথ। এবার দূরে কোথাও পালাতে হবে। বেশ কিছুদিনের জন্যে। কিন্তু যে দেশেই যাক—হাওড়া আর শিয়ালদা দুই-ই এখন তার কাছে অগম্য। সে চেনে না বনমালীর ভাইপোদের, কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে তারা তাকে চেনে!

একটা পার্কের ভেতর বেঞ্চে বসে অনেক ভাবল সে। অনেকক্ষণ ধরে ভাবল।

তারপর উঠে দক্ষিণেশ্বরের একখানা বাস্-এ চেপে বসল। সেখান থেকে বালি ব্রীজ পেরিয়ে ওধারে গিয়ে সাইকেল-রিক্সা নিয়ে চলে এল সটান শ্রীরামপুরে। এইখানে নানা রকমের এক্সপ্রেস প্যাসেঞ্জার থামে, প্রথম যে দূরপথের ট্রেন আসবে তাতেই চেপে যেখানে হোক চলে যাবে সে।

সেদিন কি একটা উপলক্ষ্যও ছিল বুঝি। স্থানীয় কোন মেলাটেলা। স্টেশন লোকে লোকারণ্য। তারই মধ্যে কোনমতে ঠেলেঠুলে জায়গা ক'রে নিয়ে একটা বেঞ্চিতে গিয়ে বসে পড়ল। সেই বেঞ্চিতে আরও গুটিকতক লোক বসেছিল আগে থেকেই। তার মধ্যে ঠিক ওর পাশেই যে বৃদ্ধটি বসে ছিল, তার দিকে ওর নজর পড়তে বিশেষ ক'রে চেয়ে দেখল। লম্বা লম্বা চুল ও গোঁফদাড়ি—পাকা শণের মতো সাদা ধপধপ করছে। কতকটা যাত্রার দলের নারদের মতো চেহারা। চোখে একটি রঙীন চশমা। ভদ্রলোক পাশে-রাখা একটি টিনের সুটকেসে ঠেস দিয়ে মলিন উড়ুনির প্রান্তে ঘাম মুছছেন। লোকটির মুখভাব বড় হতাশ। দেখে মায়া হ'ল সর্বেশ্বরের।

'দাদু, কতদূর যাবেন?' যেচেই আলাপ করে সে।

'আর ভাই যাওয়া!' চাদরের প্রান্তটা নেড়ে হাওয়া খেতে খেতে বলেন বৃদ্ধ,—'যেতে পারলে তো বাঁচতুম।···সংসারের ঘানিগাছে যে বাঁধা পড়েছি ভাই, এ জোয়াল ঠেলে যাবো কোথায়! ঘুরছি তো ঘুরছিই—সে-ই একপথে ঘুরছি!'

এ কথার আর জবাব কি? সর্বেশ্বর চুপ ক'রে থাকে।

বৃদ্ধই একটু পরে বলেন, 'ঘরে ছ-টি প্রাণী খেতে, রোজগার করতে আমি একা। ক্যানভাস করি, তা এই ভীড়ে বুড়োমানুষের গলা পৌঁছবে কেন? আজ এক পয়সাও রোজগার হ'ল না এই এত বেলা পর্যন্ত। অথচ তারা বসে আছে, আমি চাল-ডাল নিয়ে গেলে তবে হাঁড়ি চড়বে।' গলা বুজে আসে শেষের দিকে।

'কিসের ক্যানভাস করেন আপনি? ওষুধের?'

'না ভাই, ওষুধ-বিষুধ আর পাবো কোথায়! তাতে তো কিছু মূলধন লাগে! উপযুক্ত ছেলে এক বছর ভুগে মারা গেল, শেষ কড়িটি অবধি বেরিয়ে গেছে। ···এতে আছে মাদুলি। স্বপ্নাদ্য মাদুলি। দু-পয়সা ক'রে একটা মাদুলি পড়ে গ্রোস দামে কিনলে, বুঝলে না ভায়া! তার মধ্যে অবিশ্যি আছে একটু—বেলপাতায় একটা মন্তর লিখে পুরে দিই। সওয়া পাঁচ আনায় বিক্রি করি। তার ভেতর থেকে আবার এক পয়সা তুলে রাখি মা'র পুজোর জন্যে। বছর অন্তর পয়লা বৈশাখ সব পয়সা হিসেব করে পুজো দিই। তা তোমার কী ভায়া, মাজন না হাতকাটা তেল?'

'কিসের মাদুলি আপনার? কি সারে?' কথাটা এড়িয়ে যায় সর্বেশ্বর।

'মাদুলি ঐ একরকমই। বলি—তোমার কাছে মিছে কথা ব'লে লাভ কি, তুমিও যখন এই পথের পথিক! বলি অনেক রকম। সাদা সুতোয় বাঁধা এগুলি অর্শের মাদুলি। নীল সুতোয় এটা হাঁপানি, লাল সুতো হচ্ছে

পুরনো আমাশার আর কালো সিল্কের সুতোয় বাঁধা আছে—সেগুলো মেয়েদের। মানে ওঁয়াদের যাবতীয় গণ্ডগোল আর কি! সর্বপ্রকার জটিল স্ত্রী ব্যাধির অব্যর্থ মাতৃদত্ত মাদুলি। (এটা চাপা বক্তৃতার ভঙ্গীতে বলেন ভদ্রলোক।) সুতোর দরুন এক আনা আলাদা নিই।'

সর্বেশ্বর কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলে,—'দাদু, যদি কিছু মনে না করেন তো বলি, আমি একবার দেখব চেষ্টা ক'রে? যদি আপনার মাদুলি কটা বেচে দিতে পারি?'

'দ্যাখো না ভাই। পারবে কি!' তারপর সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বলেন,—'তা তুমি কি হিসেবে নেবে? তোমাকে তো এ লাইনে দেখি নি কখনও?'

'আমি কিছুই নেব না দাদা। আমি এ লাইনে নতুন বটে, তবে তা হোক, আপনি ভাববেন না। আমার এই সুটকেস জামিন রইল।'

এই বলে সে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির সুটকেস নিয়ে উঠে পড়ল এবং মেয়েদের ওয়েটিং হলের সামনে যেখানে ভীড় বেশ জমাট, সেইখানে গিয়েই—বলতে গেলে এক হুঙ্কার দিয়ে উঠল—'বিনামূল্যে! বিনামূল্যে! একেবারে যাকে বলে ফ্রি—মা'র আদেশে বিনামূল্যে বিতরণ!'

বলা বাহুল্য নিমেষে সকলের মনোযোগ ওর ওপর এসে পড়ল। দু'পাঁচ-জন এসে ঘিরেও দাঁড়াল। সর্বেশ্বরের ততক্ষণে বক্তৃতা এসে গিয়েছে। একটা ঝোঁকের মাথায় এসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল—অত কিছু ভাবে নি—কিন্তু এখন যেন ব্যাপারটা নেশার মতোই পেয়ে বসল তাকে। সে বলতে শুরু করল—'সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ! এক বছর একদিন, মা'র আদেশে তিনশ ছেষট্টিটি দিন, এই কাজ ক'রে বেড়াতে হবে আমাকে। একশ'একুশ দিন হয়েছে আর দু'শ পঁয়তাল্লিশটি দিন হ'লেই আমার ছুটি।...মা'র আদেশ—কঠিন রোগে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে মাকে ডেকেছিলাম—মা'র স্বপ্নাদেশ হয়েছিল, যদি ভাল হই তো এক বছর একদিন এই সংবাদটি প্রচার ক'রে বেড়াতে হবে, তার পর ছুটি।...নেওয়া আপনাদের ইচ্ছা। বেচতেই হবে মা'র এমন কোন নির্দেশ নেই। নিলে এখন দাম লাগবে না। সেরে গেলে দাম। সে দামও—মনে রাখবেন—সে দামও আমি নেব না, কালীঘাটের কালীবাড়িতে গিয়ে পুজো দিলেই সে দাম পৌঁছবে। এখন আপনাদের মর্জি!'

সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সহস্রকণ্ঠে নানা প্রশ্ন ওঠে—'কিসের মাদুলি মশাই? কি কি রোগ ভাল হয়?' 'টি-বি সারে—হ্যাঁ ভাই?' 'কৈ ভাই দেখি, পেটের অসুখের কী আছে?' 'কিছুই কি নেবেন না?' ইত্যাদি—

'শুনুন শুনুন—একটু স্থির হোন।' প্রায় বিপন্ন কণ্ঠেই বলে সর্বেশ্বর—'হাঁপানি, অর্শ, পুরনো আমাশা আর স্ত্রীরোগ—এই চার রকমের মাদুলি আছে আমার কাছে। তার বাইরে দয়া ক'রে কেউ চাইবেন না, দিতে পারব না। দাম ষোল আনা—সে আপনারা ভাল হ'লে দেবেন। আপাতত আমার মাদুলি, রেশমী সুতো আর মা'র অগ্রিম পুজো একটি পয়সা—এই নিয়ে মোট ছ'আনা এক পয়সা জমা দিতে হবে। তাও ব'লে রাখছি, বেশী নেই এখন

আমার কাছে, শ'খানেকের কিছু কমই হবে। সবাই চাইবেন না, দিতে পারব না। পরশু মঙ্গলবার ভোরবেলা স্নান-পুজো সেরে তবে এই ওষুধ যোগাড় করতে বেরোব। তার আগে দিতে পারব না, দয়া ক'রে মাপ করবেন।'

কে একজন ব'লে উঠল, 'সওয়া ছ-আনা দিতে হবে? তবে যে বললে বিনামূল্যে?'

সেদিকে ফিরে একটু মিষ্টি ক'রে হাসে সর্বেশ্বর, 'আজকালকার দিনে তামা মাদুলির একটা দাম কত! সিল্কের সুতো, সেগুলোও কি ঘর থেকে দেব ভাই? মা'র তো সে আদেশ পাই নি। পেলে তা-ও দিতে হ'ত। প্রচার করবার কথা প্রচার করছি, বেচতেই যে হবে তার কোন মানে নেই। কেউ না নিলে আমি তো বাঁচি। নতুন ওষুধ যোগাড় করা, মাদুলিতে ভরা, ঝঞ্ঝাট কি কম! বিনা-মাইনের চাকরি খতম হ'লে বাঁচি।'

কিন্তু তার কথা শেষ অবধি শোনাই গেল না।

'ও মশাই, এদিকে একটা অর্শ'র!'

'এই যে দাদা—আমাশার একটা দেবেন?'

'এই নিন সওয়া ছ-আনা, হাঁপানির একটা!'

'চেঞ্জ আছে নাকি দাদা? পাঁচটাকার নোটের? আমাশার তাহ'লে দুটো নিতুম!'

'খাওয়া-দাওয়ার নিয়মটা কি বললেন না—আর কোন বিধি-নিষেধ আছে?'

'ও দাদা, আমারটা কৈ?'

'দাঁড়ান দাঁড়ান, আমার তো ভাই দুটো বই হাত নয়! দিচ্ছি দাদা। না ভাই, চেঞ্জ হবে না।...জয় মা!...নিয়ম? কিছু না, কিছু না। তিনদিন শাক অম্বল কড়াই-এর ডাল নিষেধ। হাঁপানিতে ডিম-মাংস চলবে না। খেতে গেলে মাদুলি খুলে রেখে খাবেন, আবার পাঁচ পয়সা জরিমানা দিয়ে পরবেন। জরিমানা কোন কালীবাড়িতে জমা ক'রে দেবেন।...হ্যাঁ, শনি কি মঙ্গলবারে পরতে হবে। এই যে, কী বললেন, অর্শ? ...হ্যাঁ শুনুন, আপনার একটু নিয়ম আছে। মাদুলি ধুয়ে একটু ক'রে দুধ খাবেন, পেঁপের আটার সঙ্গে—'

দেখতে দেখতে বাক্স নিঃশেষ হয়ে মাদুলি চলে গেল, তার বদলে সেটা বোঝাই হয়ে উঠল পয়সায়। সবগুলি শেষ ক'রে 'মা মাগো! তোমারই কৃপা মা!' ব'লে কপালে হাত ঠেকালে সর্বেশ্বর। তারপর হাত জোড় ক'রে বলল, 'আজকের মতো মাপ করুন দাদারা, আজ আর নেই। আবার সেই মঙ্গলবার দুপুরে। নমস্কার।'

ফিরে এসে দাদুর পাশে সুটকেসটা নামিয়ে রেখে কোঁচার খুঁটে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বলল—'নিন দাদু, আপনার কী মাল ছিল হিসেব মিলিয়ে দাম বুঝে নিন। দু'একটা দাম কেউ কম দিয়েছে কিনা বলতে পারব না, যা কাড়াকাড়ি!'

বৃদ্ধ সুটকেস খুলে মাদুলির বদলে সিকি, দু'আনি, আনিতে বাক্স বোঝাই দেখে অবাক হয়ে যান।

'এ কী কাণ্ড ভাই! সব বেচে ফেলেছ? এরি মধ্যে?'

'আমি কি বেচেছি দাদা! মা'র দয়া—মা যা করান!'

'তা ঠিক। কিন্তু তুমি ভাই নিশ্চয় জাদু জানো। কী ব'লে আর আশীর্বাদ করব, ধনেপুত্রে লক্ষ্মীলাভ হোক। কী বলব, এতগুলি প্রাণীকে উপবাসের হাত থেকে বাঁচালে।'

তারপর গুনেগেঁথে নিয়ে বলেন, 'ঠিক আছে, সাড়ে সাঁইত্রিশ টাকা—কেউ ঠকায় নি। একটা কথা কিন্তু ভাই, তোমাকে কিছু নিতে হবে।'

'না না দাদু, আমার কিছু দরকার নেই। আজ একটু ভাল মাছটাছ নিয়ে যান, নাতি-নাতনীরা আনন্দ ক'রে খাবে।'

'না ভাই, তা হয় না। তুমিও আমার নাতির মতোই।'

তিনি একরকম জোর ক'রেই ওর হাতে কতকগুলো রেজগি গুঁজে দিলেন। ইতিমধ্যে একটা লোকাল ট্রেন এসে গিয়েছিল। বৃদ্ধ ভদ্রলোক সেই গাড়িতে উঠে চলে গেলেন।

এইবার শোনা গেল লুপ লাইনের গাড়ি আসবে। ভিড় ক্রমেই বাড়ছে। সর্বেশ্বর একটা বিড়ি ধরিয়ে পায়চারি করতে লাগল। ঘুরতে ঘুরতে নজরে পড়ল একটা বেঞ্চির কাছে বড় ভিড়। লোকজন ঠেলে সরিয়ে এসে দেখল একটি বৃদ্ধ লোক বেঞ্চিতে শুয়ে আছেন, তাঁর মাথার কাছে একটি তরুণী মেয়ে উদ্বিগ্ন মুখে বসে হাওয়া করছে। মুখে-মাথায় জলও দেওয়া হয়েছে—চারিদিকে ছড়ানো জল ও বৃদ্ধের মাথার দিকে চাইলেই তা বোঝা যায়।

'সরুন তো সব—সরুন তো! দেখছেন হাওয়ার দরকার, সব ঘিরে দাঁড়িয়ে হাওয়া বন্ধ করেন কোন্ আক্কেলে তা বুঝি না! সরুন সবাই—'

মুহূর্তে পাণ্ডা হয়ে ওঠে সর্বেশ্বর। ঠেলে গুঁতিয়ে ভিড় সরিয়ে দেয় খানিকটা। ঝুঁকে পড়ে প্রশ্ন করে—'সামলে নিয়েছেন খানিকটা? জ্ঞান হয়েছে?'

কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে চাইতে গিয়েও—ওর দিকে নজর প'ড়ে মেয়েটির দৃষ্টি কঠিন হয়ে ওঠে। শুষ্ককণ্ঠে বলে শুধু, 'হ্যাঁ।'

ফস ক'রে পাখাখানা ওর হাত থেকে কেড়ে নেয় সর্বেশ্বর। তারপর জোরে জোরে হাওয়া করতে থাকে। হাওয়া করতে করতেই প্রশ্ন করে, 'এমনি হয় নাকি মধ্যে মধ্যে? মিরগী নয়?'

'না, না' মেয়েটি আগের মতোই নীরসকণ্ঠে বলে, 'বাবার লো-প্রেসার আছে তাই মাথা ঘোরে। এখানে এসে গরমে ভিড়ে হঠাৎ মাথাটা ঘুরে গেছল। আপনি পাখাটা দিন, বাবা এখন ঠিক হয়ে গেছেন।'

সর্বেশ্বর পাখা দেয় না। কিন্তু বৃধ ভদ্রলোকটি নিজেই উঠে বসবার চেষ্টা করেন এবার। তখন পাখাখানা ফেলে তাড়াতাড়ি ওঁকে ধরে বসিয়ে দেয় সে।

'কোন্ ট্রেনে যাবেন আপনি?'

'এই লুপ-লাইনের গাড়িতে!'

'এই গাড়িতে যাবেন? তা হ'লে তো বেশী দেরী নেই আর। গাড়ি এলো ব'লে, সিগন্যাল দিয়েছে। এ গাড়িটায় খুব ভিড় হয় কিন্তু, এখানেই তো বুঝতে পারছেন ভিড়ের নমুনা! যেতে পারবেন?'

'যেতেই হবে বাবা। সেখানে আমার ছেলের খুব অসুখ, তার পেয়েছি। সামান্য জায়গা, বন-দেশে ডাক্তার-বদ্যিও বিশেষ নেই। ওষুধ, ফল, হর্লিকস সব নিয়ে যাচ্ছি···এ গাড়িতে তো না উঠলে চলবে না।···তুমি কতদূর যাবে বাবা, দেবে আমাদের একটু তুলে?'

'দেব বৈকি। নিশ্চয় দেব, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

মেয়েটি তাড়াতাড়ি ব'লে উঠল, 'না না বাবা, আমরাই উঠতে পারব, কেন আর ওঁকে কষ্ট দেওয়া!'

'তুই বুঝিস না তপু. যে ভিড় হয় এ গাড়িতে! তুই ছেলেমানুষ, আর আমি তো স্থবির—ছেলেটি যখন রয়েছেন, ওঁকে না হয় একটু কষ্ট দিলুমই। হাজার হোক আমার ছেলের বয়সী!'

তপুর বাবা ধমক দিয়ে ওঠেন।

সর্বেশ্বর একটু সরে এসে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে সিগন্যাল দেখছিল। কানে এলো মেয়েটি ফিস্ ফিস্ ক'রে বলছে, 'লোকটাকে আমার ভাল বোধ হচ্ছে না বাবা! নিশ্চয়ই ওর কোন বদ মতলব আছে। ওর চেহারা, বেশভূষা—দেখছ না?'

তার বাবাও ফিস্‌ফিস্ ক'রেই বলেন, 'না রে না। মতলব আবার কি? গরীবরাই পরোপকারী হয়, তা জানিস?'

'পরোপকারী না ছাই!' মুখটা বিকৃত করে তপু।

দেখতে দেখতে গাড়ি এসে গেল। সত্যিই বিষম ভিড় গাড়িতে। ঝুলতে ঝুলতে আসছে সবাই। তা ছাড়া এ স্টেশনেও ভিড় কম নয়। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে দু-তিন জায়গায় ঢোকবার বৃথা চেষ্টা ক'রে হাল ছেড়ে দিলেন। তাঁর চোখে জল এসে গেল। সর্বেশ্বরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কী হবে বাবা! ছেলেটাকে বোধ হয় আর জ্যান্ত দেখতে পাবো না!'

সর্বেশ্বর এতক্ষণ যেন মজা দেখবার জন্যই একটু একপাশে সরে দাঁড়িয়েছিল। এবার সে এগিয়ে এসে বলল, 'ভয় কি, আমি দেখছি।' সত্যিই সে একটা অসাধ্য সাধনই করল। একটা কামরার সামনে গিয়ে দোরের কাছে যারা দাঁড়িয়ে ভিড় ক'রে রেখেছিল তাদের এক এক ঝট্‌কায় সরিয়ে, ভেতর থেকে দু-একজনকে টেনে নামিয়ে চোখের পলকে বৃদ্ধ এবং তাঁর মেয়েটিকে মালপত্রসুদ্ধ ঠেলে উঠিয়ে দিল। বলা বাহুল্য, হৈ-হৈ বড় কম হ'ল না। দু-একজন অকথ্য গালাগালি দিয়ে উঠল। 'আরে আরে এ কী! হাত ছাড়ো না!' 'কী মশাই আপনি?' 'কোথাকার নবাবপুত্তুর হে তুমি?' 'বেয়াদব বেল্লিক ছোক্‌রা, দেখবে?' ইত্যাদি ইত্যাদি। দু-একজন রুখে মারতেই এলো।

সর্বেশ্বর নিমেষে তার উগ্রমূর্তি ত্যাগ ক'রে বিনীতভাবে হাত জোড়

ক'রে দাঁড়াল, 'দেখুন দাদারা, আমি অন্যায় করেছি। আপনারা রাগ করতে পারেন—তা আমি স্বীকার করছি। আপনারা অপমান করুন, জুতো মারুন, আমি কিছু বলব না। কিন্তু উপায় ছিল না, ঐ বৃদ্ধ ব্লাডপ্রেসারের রুগী যে কোন মুহূর্তে পড়ে মরে যেতে পারে। ওধারে ওঁর একটি ছেলে মুমূর্ষু। না উঠতে পারলে সেই শক্-এই ভদ্রলোক মরে যেতেন!'

'তা আমাদের তো বললেই পারতেন!' নরম হয়ে আসে অনেকেই।

'সে সময় কোথা ছিল বলুন? ঐ তো ট্রেন ছেড়ে দিলে। উঠুন উঠুন, কথা বলার সময় নেই।'

তারই ফাঁকে সে নিজেও উঠে পড়ে। তারপর হাত বাড়িয়ে দু-চারজনকে টেনে নেয়। শেষ পর্যন্ত সবাই হয়ত উঠতে পারেও না। কিন্তু তার জন্য ওর পাশের লোকেরা কেউ রাগ করে না। ওর বিনয়-বাক্যে সকলেই ভিজে এসেছে।

তপু আর তার বাবা তখনও বসতে পান নি। ওর বাবা এমন কি পা টাও ভাল ক'রে রাখতে পারেন নি। একবার সেদিকে চেয়েই অবস্থাটা বুঝতে পারল সর্বেশ্বর। তখনি সে হঠাৎ যেন দোরের কাছে বাকী যারা ছিল তাদের জন্যেই ব্যাকুল হয়ে উঠল, 'ও ভাই, আর একটু কোনমতে ঠেলেঠুলে যান না দাদা, এঁরা যে বাইরে ঝুলছেন!···না না, এটা মোটে ভাল কথা নয়। কালও ব্যাণ্ডেলে এক ভদ্রলোক এইভাবে যেতে যেতে ডিস্ট্যাণ্ট সিগন্যালে লেগে মারা গেলেন। এমনিই ঝুলতে ঝুলতে যাচ্ছিলেন।···আর একটু, ও দাদা, কোন-মতে ভেতবে চলে আসুন। অমন ক'রে ঝুঁকবেন না। পৈতৃক প্রাণ গেলে আর ফিরবে না—'

এবং এরই ফাঁকে যে যতটা এল বা না এল—সে নিজেই এক সময় ভেতরে ঢুকে এল এবং ঠেলেঠুলে তপুদের পাশে এসে দাঁড়াল।

'এ হে হে, আপনারা এখনও বসতে পারেন নি বুঝি? কিন্তু আপনার তো না বসলে চলবে না! শেষে আবার একটা কাণ্ড বাধাবেন নাকি? এই তো একটু আগে যায়-যায় হয়েছিলেন।'

'তা তো বুঝলুম বাবা—কিন্তু কোথায় আর বসব? এ তো সব বোঝাই—'

'ওরই মধ্যে জায়গা ক'রে নিতে হবে। উপায় কি?···আচ্ছা আমিই দেখছি।' তারপরই সে কাজে লেগে যায়। 'এ বোঁচকাটা কার দাদু? আপনার বুঝি? ওপরে তুলে দিলে কী হয়? জায়গা নেই? সে ভাবনা আমার, এই তো এখানে ঝুলিয়ে দিলেই তো চলবে। বাঃ, বেশ হ'ল দিব্যি! ভাই, আপনি যদি কিছু মনে না করেন—আধ ইঞ্চিটাক একটু পা-টা সরাবেন? এই যে, বাক্সর ওপরটা খালি ক'রে দিতে চাইছি আর কি! বৃদ্ধ ভদ্রলোকটিকে না বসালে চলছে না যে। আর বলবেন না ভাই, ভিড় উনি মোটে সহ্য করতে পারেন না। এই তো একটু আগেই ভিরমি গিয়েছিলেন। অতিকষ্টে সুস্থ হয়েছেন। কিন্তু শরীর তো এখনও দুর্বল। আবার যদি মূর্ছা যান তো আর ভাল করা যাবে না—।'

তার পর অনেক দূরে অবস্থিত একটি হিন্দুস্থানী ছোক্‌রাকে ধমক দিয়ে

ওঠে—'এই বাবা, জেরা তুম উধার হটো না! দেখ্‌তা হ্যায় বুড্ঢা মানুষ—তুমি আরাম করেগা আর এই বুড্ঢা আদ্‌মি দাঁড়ায়কে দাঁড়ায়কে যায়েগা?'

ওরই মধ্যে গাড়িতে গুঞ্জন ওঠে।—'তা তো বটেই, বুড়ো মানুষ!···ও মশাই আপনি একটু পা-টা সরান না। তা হ'লেই তো ভদ্রলোকের—মেয়েটিই বা এই ভিড়ে দাঁড়িয়ে যায় কী করে—?'

দেখতে দেখতে জায়গা হয়ে গেল। সুশ্রী তরুণী মেয়েটিকে দেখে দু'-একজন নিজেরা মালের ওপর বসে জায়গা ছেড়ে দিলে। ফলে তপুও বসবার জায়গা পেলো, তার বাবাও। আর সেই ফাঁকে সর্বেশ্বরও ওঁদের কাছে একটি বাক্সের ওপর জায়গা ক'রে নিয়ে জাঁকিয়ে বসল।

'আঃ!' আরাম-সূচক একটা শব্দ ক'রে গুছিয়ে বসেন বৃদ্ধ--'ভাগ্যে তুমি ছিলে বাবা! এসব কি আর আমার কর্ম! ভগবানই তোমায় জুটিয়ে দিয়েছেন! বড় ভাল ছেলে তুমি। তা তুমি কোথায় যাবে বাবা?'

তপুর কিন্তু এতটা বাড়াবাড়ি পছন্দ হয় না। সে অগ্নিকটাক্ষে বাবার দিকে চেয়ে চোখটা ফিরিয়ে নেয়।

'আমি?' প্রশ্নটা ক'রে কিছুকাল মৌন থাকে সর্বেশ্বর। তারপর একটু হেসে বলে—'কী জানি!'

বৃদ্ধ রীতিমত বিস্মিত হন, 'কি জানি কি বাবা, কোথায় যাবে তা জানো না?'

আরও কিছুকাল চুপ ক'রে থাকে সর্বেশ্বর। তারপর বলে—'সত্যিই জানি না। কথাটা আপনারা বুঝবেন না। কিন্তু আমার কিছুই ঠিকঠিকানা নেই। এমনিই ঘুরে বেড়াচ্ছি। এই গাড়িতে যে উঠব তাই কি ছাই জানতুম?'

বৃদ্ধ এবার একটু সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠেন, 'টিকিট করো নি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, তা একটা করেছি। বর্ধমান অবধি টিকিট একটা কাটা আছে। তারপর যেখানে নামব সেখানেই বাড়তি ভাড়াটুকু দিয়ে দেবো।'

টিকিট একখানা বার ক'রে দেখায়ও সে। তপুর বাবা খুশি হয়ে ওঠেন। একবার বিজয়-গর্বে মেয়ের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলেন,—'তা তুমি আমাদের সঙ্গে চলো না তা হ'লে, দুদিন থেকে যাবে!'

সঙ্গে সঙ্গে তপু বাইরে থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আনে,—'কী তুমি বলছ বাবা? দাদার তো সেই একটুখানি বাসা ভরসা, বৌদি একা—ওঁকে নিয়ে তুমি তুলবে কোথায়? ওঁর কষ্ট হবে না?'

কণ্ঠস্বরটা তার রীতিমত তীক্ষ্ণই হয়ে ওঠে।

'না না, কষ্ট আবার কি! আর একটু কষ্ট হ'লেই বা! ওরা সব আজকালকার ছেলে, পরোপকারী—ওরা অমন একটু-আধটু কষ্ট গ্রাহ্যই করে না।—না বাবা, তুমি আমাদের সঙ্গেই চলো।'

সর্বেশ্বর এই সময় ইচ্ছা ক'রেই পাশের একটি যাত্রীকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু তপুর কথা তার কানে যায় ঠিকই—'বাবা, তুমি একটা সর্বনাশ

না বাধিয়ে দেখছি ছাড়বে না। লোকটা কখনই ভদ্রলোক নয়, জোচ্চোর গাঁজাখোর টাইপের লোক। ওর কোন বদ্ মতলব আছে—তাই অত গায়ে পড়ে ভাব জমাচ্ছে!'

'তুই থাম দিকি মা!···তোরা সবতাতে বড় লোককে অবিশ্বাস করিস!' চুপিচুপি জবাব দেন বৃদ্ধ।

এইবার সর্বেশ্বর মুখ ফেরায় এদিকে, 'কী বলছিলেন, আপনাদের সঙ্গে যাওয়া? না থাক্, এ যাত্রা আর এত সহজে থামবার ইচ্ছে নেই। গাড়িতে যখন চেপেছিই তখন যতদূর যায় যাক না!' তারপর জোর ক'রে যেন প্রসঙ্গটা থামিয়ে দিতেই কথা পাড়ে—'আপনার ছেলে ওখানে করেন কি?'

'আর সে কথা বলো না। এম.এস্‌সি. পাশ ক'রে ভাল সরকারী চাকরি পেয়েছিল—সে পছন্দ হ'ল না। বলে চাষবাস করব। চাকরি ছেড়ে এই বনগাঁয়ে এসে উঠল। জমিজমার বেধড়ক খাটুনি—সে কী আর ঐ কলেজে পড়া ছেলেদের সহ্য হয় বাবা? প্রায়ই অসুখ, প্রায়ই অসুখ! লাভ তো খুব, আমাকেই এখনও সংসার টানতে হচ্ছে ওদের। মিছিমিছি বৌটার ভোগান্তি। ওরে বাবা, চাষবাস করলে সংসার চলে ঠিকই—কিন্তু ওটিকে ইংরিজী ক'রে এগ্রিকালচার করো, ব্যস্—লাভের দফা খতম। যার যা—কলেজে পড়ে চাষবাস হয়?' বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে ওঠেন বৃদ্ধ। তারপরেই মনে পড়ে যায়। আগের কথার জের টেনে বলেন, 'সেই জন্যেই তো বলছি, চলো না বাবা। তুমি সঙ্গে থাকলে উপকারও হয় একটু। আমি অন্তত মনে বল পাই।'.

সর্বেশ্বর হেসে বলে,—'আমাকে দিয়ে আপনার আর কতটুকু উপকার হবে বলুন! ও-কথা আর তুলবেন না। মাঝখান থেকে আপনার কন্যা ভয় পাচ্ছেন। ভাবছেন যদি সত্যিই আমি আপনাদের সঙ্গে গিয়ে উঠি, হয়তো বা রাতারাতি আপনাদের সবাইকে খুন ক'রে পালাব!'

এই সোজাসুজি আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না তপু। সে নিমেষে রাঙা হয়ে উঠল,—'না না, তা কেন, তা কেন! বাঃ, আমি কি তাই বলেছি?'

'বলেছিস বৈকি, একশ বার বলেছিস। ঠিক বলেছ বাবা, ঐ রকমই বটে ওর মনোভাব। দ্যাখো মা তপতী, তোমাদের ঐ কলেজ-পড়া বিদ্যেয় সব জিনিস বুঝতে এসো না। তোমরা ভাবো বুঝি বেশভূষাটাই মানুষের আসল পরিচয়!'

সর্বেশ্বর তাড়াতাড়ি বলে ওঠে,—'না না, ওঁকে মিছিমিছি দোষ দিচ্ছেন। কথাটা সকলের পক্ষেই প্রযোজ্য। আপনারাও কি সময়-বিশেষে তাই করেন না? আর ওঁরই বা দোষ কি, আমার যা বেশভূষা আর চেহারা—ভদ্রসন্তান ব'লে আমারও ক্লেম করা উচিত নয়।'

'না না—সে কি কথা! দ্যাখো বাবা, যে শিক্ষা বাইরের পোশাক ভেদ করে আসল মানুষে পৌঁছতে শেখায় না, আমি সেটাকে শিক্ষা ব'লেই মনে করি না।···কিন্তু তুমিই বা এমন ক'রে বেড়াচ্ছ কেন বাবা? কোথায় যাবে তাও জানো না, তুমি কি সন্ন্যাসী?'

এতখানি জিভ্ বার ক'রে সর্বেশ্বর বলে, 'পাগল! বৈরাগ্য বা ঈশ্বর-চিন্তা আমার এতটুকু নেই।'

'তবে?'

ওদিকে তপতীও যেন একটু নড়েচড়ে বসে। ওর দিকেই যে কান—সেটা বেশ বোঝা যায়।

মাথা হেঁট ক'রে নিজের একটা নখ খুঁটতে খুঁটতে সর্বেশ্বর বলে,—'কী বলব বলুন। সে দীর্ঘ ইতিহাস। দেশে বাড়িঘর জমি-জায়গা আছে। নিজেও লেখাপড়া শিখেছি। একটা ছোট ভাই ছিল—বুঝলেন. খুব ভালবাসতুম তাকে। মা-মরা ভাই। আমি অল্প বয়সেই চাকরিতে ঢুকেছিলুম। বেশ ভাল চাকরিই করতুম, বাবা বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করলেন তাঁর এক বন্ধুর মেয়ের সঙ্গে। বন্ধুর মৃত্যুর পর বাবাই তাদের—মানে তাকে আর তার ভাই-বোনদের দেখাশুনো করতেন। এ বিবাহের প্রস্তাবে আমার আপত্তি ছিল না, বরং আগ্রহ ছিল। কিন্তু কপালে ঘর-সংসার লেখা নেই—হ'ল না।'

সর্বেশ্বর চুপ করল।

'কেন বাবা, কেন হ'ল না?'

আড়ে একবার তপতীর দিকে চেয়ে যেন গলাটা নিচু করবার চেষ্টা করে সর্বেশ্বর বলে, 'মেয়েটি এসে জানাল যে সে আমার ছোট ভাইকে ভালবাসে, তাকেই সে বিয়ে করতে চায়। আমি নিজের বিয়ে ভেঙে দিলুম। ছোট ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল তার। আমার মনে কেমন একটা স্বার্থত্যাগের নেশা চাপল। আমি বললুম, ভাইকে বিলেত পাঠাবো। বাবা রাজী হলেন না। আমিই জোর ক'রে পাঠালুম। প্রাণপণে খরচ চালাতে লাগলুম, একরকম না খেয়ে। শুধু শুধু একজনকে সুখী করব ব'লেই যেন আমার সব কিছু পণ করলুম। ভাই ওখানের পড়া শেষ করল কিন্তু আর ফিরল না। জানাল যে সে সেখানেই ভাল চাকরি পেয়েছে। বাবা মারা গেলেন। ভাইকে লিখলুম যে তুমি তোমার স্ত্রীকে নিয়ে যাও। কোন উত্তর এল না। তখন বন্ধুবান্ধবদের ধরে ওখানে যোগাযোগ করলুম, খবর এল—সে সেখানে আর একটি বিয়ে করেছে। এ খবর আমি তার স্ত্রীকে দিই নি। কিন্তু আমার মুখ দেখেই বোধ হয় ভাদ্রবৌ সন্দেহ করেছিল। সে গোপনে সে-চিঠি বার ক'রে পড়ল। তারপর ফল যা হবার তাই হ'ল। সে আত্মহত্যা করল।...এই হ'ল মোটামুটি ইতিহাস। চাকরি ছেড়ে দিয়েছি। ভদ্রজীবন আর ভাল লাগে না। মাঝে মাঝে ঘরে ফিরি আর বেশির ভাগই এমনি ক'রে ঘুরে বেড়াই। গাছতলায় ভিখিরী-দের জীবন—তাও যে ভাল লাগে তা নয়, ঐ ত্রিশঙ্কুর মত শূন্যে ঝুলে আছি আর কি!'

ম্লান একটু হাসে সর্বেশ্বর। উদাসভাবে চায় আর একদিকে। কিন্তু অপাঙ্গ নজরটা থাকে তার তপতীর ওপরেই। তপতীর মুখ কিন্তু ইতিমধ্যে বিবর্ণ হয়ে গেছে। তার চোখদুটো ছলছল করছে রীতিমতো। বেশ একটু সশ্রদ্ধ চোখেই চেয়ে আছে সর্বেশ্বরের দিকে।

বৃদ্ধ ব্যাকুল হয়ে উঠলেন, 'তা ব'লে তুমি এমনি ক'রে বাকী জীবনটা কাটাবে বাবা ? যারা বেইমান, যারা তোমার মুখ চাইল না, তাদের জন্যে তুমি সারা জীবন কষ্ট করবে ?'

'না না, নষ্ট করব কেন। ঘরদোর জমি-জমা কিছুই নষ্ট করি নি। হয়ত আবার ফিরে যাবো। সংসারী হয়েই বসব আবার। শুধু এখন যেন কিছুতেই পারছি না—বাঁধাধরা ছকেফেলা জীবন কাটাতে আর মেপে মেপে হাসতে লোকের সঙ্গে, বুঝলেন না!'

সবার আড়ালে চোখদুটো মুছে নিয়ে ধরা গলায় বলে তপু, 'বাবা, আমাদের নামবার সময় হ'ল কিন্তু—'

'হ্যাঁ, এই যে।' ব্যস্ত হয়ে ওঠেন তার বাবা, 'এই যে, তুমিও কিন্তু বাবা চলো আমাদের সঙ্গে। না না, কোন কথা শুনতে চাই না। লক্ষ্মী বাবা, চলো।'

সর্বেশ্বর হেসে বলে, 'যাই না যাই, আমি আপনাদের সঙ্গে নামছি চলুন। আপনাদের যাওয়ার ব্যবস্থা না ক'রে দিয়ে—'

'না না, আপনি চলুন।' ব'লে অকস্মাৎ ঝোঁকের মাথায় ওর একটা হাতই চেপে ধরে তপতী। তার চোখ তখনও লাল, চোখের পাতায় জলের আভাস!

সামান্য একটু বিদ্রুপের হাসি হেসে সর্বেশ্বর বলে, 'এই আপনাদের এত বুদ্ধির অহঙ্কার ? এই সামান্যতেই গলে গেলেন ? আমি যদি বলি যে আমি আগাগোড়া মিছে কথা বলেছি ? যদি বলি যে কস্মিন্‌কালেও আমার ভাই ছিল না ? মা-বাবাকে জন্মে দেখি নি, এক পিসির কোলে মানুষ হয়েছি ? যদি বলি যে স্রেফ ভবঘুরে আমি একজন—?'

'তা হলেও বিশ্বাস করব হয়ত, কিন্তু তাতে আপনার ওপর থেকে বিশ্বাস যাবে না। তবুও বলব—আপনি চলুন আমাদের সঙ্গে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাবেন বৈকি। তুই ওর কথা শুনিস নি তপু। এখনই মিছে বলছে!'

ওর বাবা গলায় জোর দিয়ে বলেন। সর্বেশ্বর হাসি-হাসি মুখে চুপ ক'রে যায়।

ইতিমধ্যেই স্টেশন এসে পড়ে ওঁদের। সামান্য স্টেশন—লোকজন নেই কেউ কোথাও। নামলেনও ওঁরা ঐ তিনজন। মোট-মাটারিসুদ্ধ কোনমতে টেনে নামাল সর্বেশ্বর। চারদিকে চেয়ে দেখে বৃদ্ধ উদ্বিগ্নকণ্ঠে বলেন, 'তাই তো, একটা গোরুরগাড়ি-টাড়িও তো দেখছি না। মুটে পেলেও না হয় হেঁটে যাবার চেষ্টা করতুম। এত মালসুদ্ধ যাই-ই বা কি ক'রে ?'

সত্যিই প্ল্যাটফর্মটি জনমানবশূন্য। এককোণে স্টেশন মাস্টারের ঘর। টিকিটবাবু অনেকক্ষণ আগেই সেই কোটরে ঢুকে গেছেন। সর্বেশ্বর ব্যস্ত হয়ে বলে, 'আপনি কিছু ভাববেন না। দেখছি আমি একটা ব্যবস্থা করতে পারি কিনা—'

বৃদ্ধটি বলেন, 'তুমি বাবা কিন্তু পালিও না যেন। অবশ্য আমাদের সঙ্গে

যাবে।'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পথ রোধ ক'রে দাঁড়ায় তপতী, 'আপনি কথা দিয়ে যান—আমাদের সঙ্গে যাবেন। নইলে এখন কোথাও যেতে হবে না। আপনি চলুন আমাদের সঙ্গে, মোটঘাট আমি নেব এখন।' করুণ মিনতি তার চোখে।—'চলুন লক্ষ্মীটি। নইলে ভাবব আমার অশিষ্ট আচরণে আপনি রাগ করেছেন।'

সর্বেশ্বর জীবনে বোধ করি এই প্রথম একটু বিব্রত হয়ে পড়ল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তার কপালে ঘাম দেখা দিল। সে একবার বিমূঢ়ভাবে নিজের গালের খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফে হাত বুলিয়ে নিল। দৃষ্টিটা নিয়েই যেন সব চেয়ে অসুবিধা। সেটা কখনও নিজের অতি মলিন জামা-কাপড়ের ওপর, কখনও বা তপতীর পরিপাটি বেশভূষার ওপর ঘুরে এসে—একসময়ে তার নিজের হাতটার ওপর এসে নিবদ্ধ হ'ল। কিন্তু সে কয়েক মুহূর্তই। তারপরই নিজেকে সামলে নিয়ে বলল—'আপনারা আমার মতো একটা হত-ভাগাকে এত বেশী দাম দিচ্ছেন যে আমি এই প্রথম একটু লজ্জা বোধ করছি। আচ্ছা আগে দেখি না—একটা গাড়ি বা কোন লোকজন কাউকে যোগাড় করতে পারি কিনা।' এই ব'লে সে আর বাদানুবাদের অবকাশ না দিয়ে এক-রকম তপতীকে পাশ কাটিয়েই চলে গেল স্টেশন-ঘরের দিকে।

স্টেশন-ঘরে ছোট টিকিটবাবু একা বসে একটা বিরাট খাতায় টিকিটের নম্বর তুলছিলেন—সর্বেশ্বর গিয়ে ঢুকল।

'শুনুন ছোটবাবু, শুনছেন?'

তিনি খাতা থেকে একটু বিরক্ত ভাবেই মুখ তুললেন, 'কী চাই?'

'আজ্ঞে একটি বাবু আর একটি মেয়েছেলে নেমেছেন। গাঁয়ে যাবেন। বাবুর শরীরটা বড় খারাপ। একটা গাড়ি কি নিদেন একটা মুটেও যদি পাওয়া যেত!'

'গাড়ি আগে থাকতে খবর না দিলে আসে না। মুটে নেই এখানে।'

এক কথায় মামলা ডিসমিস। তিনি আবার নিজের খাতায় মন দিলেন। সর্বেশ্বর দু'হাত কচ্‌লে আবারও বললে—'না, তাই বলছিলুম—। উনি আবার আমাদের লাইনেরই এ. টি. এস. সাহেবের শ্বশুর কিনা। আর ঐ মেয়েটি হ'ল গে তাঁর শালী—'

'য়্যাঁ!' নিমেষে উঠে দাঁড়ান ছোটবাবু, 'এ. টি. এস.—মানে আমাদের রাধাশ্যামবাবুর শ্বশুর? কী সর্বনাশ!' ভয়ে মুখ বিবর্ণ হয়ে ওঠে তাঁর। 'হারামজাদা কৈলেসটা আবার গেল কোথায় ছাই! হারামজাদা দিনরাত কোয়ার্টারে কোয়ার্টারে জল তুলে বেড়াবে—! বেটার চাকরিটা যে ইস্টিশানে তা একবারও মনে থাকে না বেটার। কী বিপদে পড়লুম বলো দিকি। বড়বাবু থাকলেও যা হয় হ'ত।—অ কৈলাস, অ হারামজাদা নচ্ছার ব্যাটা, গেলি কোথায়? অ কৈলাস—' ছোটবাবু পড়ি কি মরি ক'রে ছুটলেন। কাছা খুলে তাঁর মাটিতে লুটোচ্ছে, ভ্রুক্ষেপও নেই।

সর্বেশ্বর আর এক মিনিটও দাঁড়াল না। কাজ হয়ে গেছে, গাড়ি যমন ক'রেই হোক একটা যোগাড় হবে এবার—সে বিষয়ে সে নিশ্চিন্ত। এখন আত্মরক্ষা করা দরকার। স্টেশন ঘরের ওপাশে একটা খোলা জানলা ছিল। সেইটে দিয়ে লাফিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল সে। তারপর তারের বেড়া টপ্‌কে প্ল্যাটফর্মের ওপাশে নিচে আগাছার ঝোপে পড়ে হেঁট হয়ে আড়ালে আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে লাগাল দৌড়। দৌড়-দৌড়-দৌড়। একেবারে স্টেশন এলাকা থেকে বহুদূরে এসে হাঁফ ছাড়বার জন্যেই বোধহয় একটু দাঁড়াল। এক চাষী মাঠে কাজ করতে করতে অবাক হয়ে চেয়ে ছিল, সে এইবার ওকে দাঁড়াতে দেখে প্রশ্ন করল—'কী হয়েছে গা বাবু ?'

সর্বেশ্বর উত্তর দিলে—'সাপ !'

'সাপ ? কোথায় গো মশাই ?'

'কেঁচোর গর্তে।'

'কেঁচোর গর্তে !'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, কেঁচোর গর্তে। কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বেরোয় শোন নি কখনও ? এত্তো বড় ময়াল সাপ। খুব বেঁচে গিয়েছি বাবা।' সে আবারও হনহন ক'রে হাঁটতে শুরু করল।

বনমালী ঘোষাল সত্যিই শুধুহাতে ফিরবেন তা কেউ আশা করে নি। ওঁর স্ত্রী-কন্যা তো নয়ই, সর্বেশ্বরের পিসিমাও না। ওঁর স্ত্রী মুখনাড়া দিয়ে বললেন—'তা হ'লে এতদিন ধরে সেখানে পড়ে থেকে কী হ'ল ? তখুনি বলেছিলুম বেয়ান যে ও মিন্‌সের কাজ নয়, শুধু বচনটি আছে ওঁর—কাজের বেলা ঢুঁ-ঢুঁ, অষ্টরম্ভা !'

'ঐ লাও ঠেলা ! দোষটা বুঝি হ'ল শুধু আমারই ? সে যে কী জাঁহাবাজ ছেলে তা তো জানো না। সে আমাকে এক হাটে বেচে আর এক হাটে কিনতে পারে।...কোথায় যে ঘাপ্‌টি মেরে রইল, টিকিটি পর্যন্ত দেখতে পেলুম না !'

পিসিমার কথাটা আদৌ ভাল লাগল না। তিনি বললেন, 'ও কি কথা গা বনমালী, ছেলেমানুষ বে করতে ভয় পায় ব'লেই পালিয়ে বেড়ায়। জাঁহাবাজি এখন সে দু-তিন জন্ম তোমার কাছে শিখতে পারে।'

বনমালীর স্ত্রীর কণ্ঠ ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে, 'বলি কেন গা বেয়ান, ওঁর জাঁহাবাজিটা এত দেখলেন কোথায় ! আপনার ছেলে যদি এতই ছেলেমানুষ তো তার বিয়ে দিতে গেছলেন কেন ? আমাদের কী গরজ ছেলের পেছনে গরু-তাড়া ক'রে বেড়াবার ? আমাদের মেয়ে কী ফ্যালনা, না তার বড় জুটছিল না ?'

'না, এ মাগীরা দেখছি এইখানেই কুরুক্ষেত্তর্ বাধিয়ে তুললে। এর চেয়ে বাবা সেইখানেই বেশ ছিলুম। খাও দাও, চা খাও, সিগারেট খাও, গল্প করো। হাড়ে হাড়ে বুঝছি, বাবাজী আমার কেন বিয়ে এড়িয়ে যেতে চাইছেন। যদি এ জন্মের কথা আর-জন্ম পর্যন্ত মনে থাকে তো আর এ কাজে যাচ্ছি না কখনও।

এই নাকে-কানে খৎ—এই নাকে-কানে খৎ!'

গৃহিণী সঙ্গে সঙ্গে ঝেঁঝে ওঠেন—'বেশ তো, সংসারে যদি এতই অশান্তি তো সেইখানেই রইলে না কেন? আমরা হ'তেই তোমার যত অশান্তি নয়? কে চালাত এই সংসার শুনি? এতদিন থাকতে কোথায়? অকম্মার ঢেঁকি—একটা যদি কাজে আছে! ঠিকানা জানো, সব জানো, একটা ছেলেকে ধরে আনতে পারলে না, আবার মুখ নাড়ছ!'

'ঘাট হয়েছে—ঘাট হয়েছে আমার ফেরা। এই চললুম।'

গজগজ করতে করতে তখনই আবার বনমালী ফিরে যাবার উপক্রম করলেন। অবশ্য শেষ অবধি আর যেতে হ'ল না—শঙ্করী এসে একটা হাত ধরল—'ঢের হয়েছে। বুড়ো বয়সে রাগারাগি করতে লজ্জাও করে না। নাও চলো—চান করবে চলো—'

॥ ৯ ॥

বর্ধমান জেলার ছোট্ট একটি গ্রাম। বাজার ব'লে কিছু নেই। হাটতলা আছে, হাট বসে সেখানে। তা ছাড়া সামান্য যা দু-চারটে দোকান আছে তা সবই স্টেশনকে কেন্দ্র ক'রে। যাত্রী যারা নামে বা ওঠে, তারাই এই দোকান ক'টির ভরসা। কলকাতা থেকে প্রথম ট্রেন আসে এখানে ভোর পাঁচটায়, তারপর এই একেবারে বিকেলে। মাঝে আর একটা গাড়ি আসে, তবে সে কলকাতায় যায়। সে গাড়িতে খদ্দের মেলে না বিশেষ। সেইজন্যে এই বিকেলের ট্রেনটির ওপরই সকলের ভরসা। সেদিনও সকলে বিশেষ ক'রে প্রস্তুত হয়ে বসে ছিল। সামনের রাস্তায় জল ছিটিয়ে, চায়ের জল চাপিয়ে, খাবারের গামলাগুলো সামনে সাজিয়ে যাকে ব'লে তৈরি হয়েই অপেক্ষা করছিল।

খবরটা দিলে কেষ্টধন প্রথম—'হৈ রে, এস্টেশানে গাড়ি লেগেছে!'

বিপ্রদাস উঁকি মেরে দেখে বললে—'আরে সত্যিই তো, হৈ-হৈ, ও চরণ, কড়াটা চাপা, কড়াটা চাপা।'

কেষ্টধন বললে—'আমার চায়ের জল চাপানোই আছে। জল ফুটছে ইরিমধ্যেই।'

হঠাৎ রসভঙ্গ করলে বিড়িওলা সুরেন—'দাঁড়া, দাঁড়া। লাফাসনি আগে থাকতে। ক'টা লোক নামে আগে দ্যাখ্।'

কেষ্টধন দোকানের বাইরে এসে দাঁড়ায়—'সত্যিই তো, লোক কৈ? ও বিপ্রদা, খাবারের খদ্দের কৈ তোমার?'

বিপ্রদাস দুটো হাত চোঙার মতো ক'রে দেখে বলে—'তাই তো দেখছি। একটি লোকই তো নামল। ঐ যে সুটকেস হাতে। আর লোক কৈ?'

কেষ্ট বললে—'হ্যাঁ—? হ্যাঁ হ্যাঁ। দেখতে পেয়েছি। যাক—একটা লোক নামল তবু। দ্যাখো কে কত মাল বেচতে পারো!'

জোরে জোরে হেসে ওঠে সে নিজের রসিকতাতেই।

ট্রেন থেকে নেমেছিল সর্বেশ্বর। সেদিন তপতীর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে ঘুরতে ঘুরতে বর্ধমানেই গিয়েছিল। সেখানে গিয়েই মন স্থির ক'রে ফেলে। ওখানকার রাণীগঞ্জ বাজার থেকে কিছু মাদুলি আর কয়েক শিশি ওষুধ পাইকিরি দামে কিনে স্যুটকেস বোঝাই করেছে। তারপর টিকিটঘরের সামনে স্টেশনের তালিকাগুলোর দিকে চেয়ে যে নামটা প্রথম চোখে পড়েছে সেই-খানকারই টিকিট কিনেছে। নামটা উঠেছিল এখানকারই—সুতরাং এখানে নামা ছাড়া আর গত্যন্তর কি? তাছাড়া তার কাছে সব জায়গাই তো সমান।

সর্বেশ্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে নেমে রাস্তায় পা দিতে ওকে অনেকটা পরিষ্কার দেখা গেল। সুরেন নাকমুখ সিঁটকে বললে—'একটা লোক, তাও লোকের যা ছিরি! ঐ লোক তোমাদের চা-খাবার খাবে? আরে ছোঃ! বরং আমার খদ্দের হ'লেও হ'তে পারে।'

এতক্ষণে সকলেই ভাল ক'রে দেখেছে ওকে। বিপ্রদাস মুখে একটা অবজ্ঞা-সূচক শব্দ ক'রে বললে—'ধ্যুস্! নামা রে কড়াটা নামা, শুধু শুধু ঘিটা পোড়ে কেন?'

কেষ্টধন বললে—'দোকানদার তো সুরেনকে নিয়ে যেটের আটটি, খদ্দের নামল একটা, এখন নে—কে কী নিবি নে! পারিস তো খদ্দেরটাকেই ভাগ ক'রে নে! ওর ঐ হাড়-ক'খানা ছাড়া আর যে কিছু আছে ব'লে তো মনে হয় না!'

সুরেন বললে—'তা যা বলেছিস, তোদের বরাতে ঢুঁ-ঢুঁ তো বটেই, এখন আমার কপালে কী জোটে তাই দ্যাখ্—বিড়ি খাবার আধলাটা আছে কিনা তাই সন্দেহ।'

ততক্ষণে সর্বেশ্বর একেবারে কাছে এসে পড়েছে। বিপ্রদাস চাপা ধমক দিয়ে উঠল—'চুপ, চুপ কর্ তোরা।'

সর্বেশ্বর সামনে এসে পড়ে এক লহমায় চারদিকে চেয়ে পরিস্থিতিটা বুঝে নিল। চায়ের দোকানেও বেঞ্চি আছে, তবে জায়গাটা ভাল না। সে একেবারে বিপ্রদাসের বেঞ্চিতেই ব্যাগটা নামিয়ে যেন কতকটা আপনমনেই ব'লে উঠল—'গুরু গুরু! তোমার এ বেঞ্চিটাতে বসব একটু ঘোষেব পো?

বিপ্রদাস যদিচ ঘোষের পো নয়, তবু সে তখনই কোন প্রতিবাদ করল না। বরং যথেষ্ট আন্তরিকতার সঙ্গেই বলল—'বসুন, বসুন।'···তারপর দেশীয় রীতি অনুযায়ী প্রশ্ন করল—'মশায়ের নিবাস?'

'নিবাস?' প্রশ্নটার পুনরাবৃত্তি ক'রে মিনিটখানেক চুপ ক'রে থাকে সর্বেশ্বর, তারপর বলে—'বলতে নিষেধ আছে হে, গুরুর নিষেধ। নিবাস আর আমাদের নেই। নিবাস এখন তোমার বাড়ি, গাছতলা—যেখানে খুশি ধরে নিতে পারো।'

সুরেন, কেষ্টধন ওরা সবাই এর ভেতর ভিড় ক'রে এসে দাঁড়িয়েছিল।

সুরেন চাপা গলায় চরণকে বলল—'ওই, এ বেটা আসল ভণ্ড রে!'

বিপ্রদাসের দেবদ্বিজে ভক্তির কথা সর্বজনবিদিত, সে একটু সম্ভ্রমের সুরেই প্রশ্ন করল—'আপনি কি তা হ'লে সন্নিসী আজ্ঞে ?'

সর্বেশ্বর তখনই কথাটার জবাব দিলে না। বিপ্রদাসের হাতে ছিল হুঁকো, সেদিকে হাতটা বাড়িয়ে বলল, 'দেখি ভাই তোমার কলকেটা একটু!' তারপর অনুমতির অপেক্ষামাত্র না ক'রেই কলকেটা টেনে নিয়ে হুশ ক'রে কয়েকটা টান দিয়ে আবার যথাস্থানে ফিরিয়ে দিয়ে বললে, 'কী বললে, সন্ন্যাসী ? সন্ন্যাসী আর হ'তে পারলুম কৈ বলো ভাই ? মায়া যে বড় কঠিন। কেউ নেই, কিছু নেই, পথে পথে ঘুরছি, তবু মনে হয় সংসারটা বড় মিঠে। এ চক্র থেকে কী পরিত্রাণ পাবার উপায় আছে ভাই!'

বিপ্রদাসের কণ্ঠস্বরে এবার দস্তুরমতো সম্ভ্রম ফুটে উঠে। সে বলে, 'আজ এখন কোথা থেকে আসছেন তা হ'লে ?'

'এখন ? কলকাতা থেকে।'

'এখানে কোথায় যাবেন ?'

সর্বেশ্বর আবারও কিছুক্ষণ মৌন থাকে। বলে, 'কোথায় যে যাবো তা কিছুই জানি না। এখানে বেশ ভদ্রলোকের পাড়াটাড়া আছে ?'

বিপ্রদাস উত্তর দেয়—'আজ্ঞে আপনি কী কাজে এসেছেন সেটা জানতে পারলে—'

সর্বেশ্বর কিছুক্ষণ চোখ বুজে চুপ ক'রে থাকে। তারপর আবারও ব'লে ওঠে—'জয় গুরু জয় গুরু!...গুরুর কাছে সন্ন্যাস নিতেই গিয়েছিলুম, গুরু দীক্ষা দিলেন কিন্তু গেরুয়া দিলেন না। বললেন,—সংসারের মায়া এখনও তোর কাটে নি। এখনও অনেকদিন তোকে সংসারে ঘুরতে হবে। আমি হাতজোড় করে বললুম কিন্তু কী করে ঘুরবো বাবা—সম্বল তো কিছুই নেই। তাঁর দয়া হ'ল। তিনি দুটো জিনিস দিলেন। বললেন—এই দুটো জিনিস তুমি ফিরি ক'রে বেড়াও গে, এতে তোমার পেট চলবে, পাঁচজনেরও উপকার হবে। এক বৎসর সংসারে থাকবার পর, তখনও যদি এ মতি থাকে তো আবার এসো, তখন দেখব। যদি বুঝি তো সেই সময়ে গেরুয়া দেব।...সেই থেকেই পথে পথে ঘুরছি।' এই ব'লে সশব্দে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ে সে—'আরও পাঁচটি মাস না গেলে তাঁর দর্শন পাবো না।'

সুরেন অস্ফুটকণ্ঠে ব'লে ওঠে,—'ধ্যেৎ! যতো সব বুজরুকি!'

কেষ্টধন কিন্তু কৌতূহল চাপতে পারে না। বলে, 'কি জিনিস আপনার জানতে পারি কি ?'

সর্বেশ্বর একটু হাসল। বলল, 'সে আর জেনে কি করবে ভাই। তোমাদের ও কোন কাজেই লাগবে না। একটা জ্বরের ওষুধ আর একটা স্বপ্নাদ্য মাদুলি।'

বলতে বলতেই কিন্তু স্যুটকেসটা খুলে ফেলে ও। বাক্সের একপাশে গাদা-করা ওষুধের শিশি আর মাদুলি। তারই ফাঁকে অত্যন্ত ময়লা একটা কাপড় আর তেলচিটে একখানা গামছা। সুরেন একটা শিশি তুলে নিয়ে দেখল তার

লেবেলে সত্যিই এক সন্ন্যাসীর ছবি ও নাম ছাপা আছে।

'এ ছবিটা কার আজ্ঞে—শিশির গায়ে?' চরণ প্রশ্ন করে।

'ঐ তো আমার গুরুদেব!' দু'হাত তুলে উদ্দেশে প্রণাম জানায় সর্বেশ্বর। তারপর বলে,—'হাটবারটা কবে ভাই এখানের? ঐ হাটের দিন গিয়ে বসব আর কি। যা দু-একটা বিক্রী হবে তাতেই আমার চলে যাবে।'

'হাটবার তো পরশু। তা আপনি থাকবেন কোথায় এ দু'দিন?'

সর্বেশ্বর তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উত্তর দেয়, 'যেখানে হোক পড়ে থাকব দু'দিন। তারপর এখানকার হাটটা দেখে আবার ভেসে পড়ব। এই তো আমার কাজ। এখন তো শুধু দিন গুনছি কবে আবার গুরুদেবের শ্রীচরণে আশ্রয় পাবো।'

বিপ্রদাস একটু ইতস্ততঃ ক'রে বলে—'আপনার নামটা জানতে পারি কি? আপনারা ...'

সর্বেশ্বর বললে, 'আমরা ভাই ব্রাহ্মণ। নাম শ্রীসর্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়।'

সুরেন হঠাৎ খাপছাড়াভাবে প্রশ্ন ক'রে ব'সে—'আপনার ও ওষুধের দাম কত?'

কেষ্টধন ধমক দিয়ে ওঠে—'তুই থাম্ না সুরেন! তোর অত খবরে দরকার কি?'

অপ্রতিভ ভাবে সুরেন জবাব দেয়—'না এমনি। আর ও মাদুলি, কিসের মাদুলি ওটা মশাই?'

সর্বেশ্বর বেশ সহজ ভাবেই জবাব দিল—'মাদুলিটা হ'ল সঙ্কটমোচন মাদুলি, যে কোন বিপদে পড়লে ধারণ করলেই বিপদ কেটে যায়। তবে বারো মাস হাতে পরে রাখতে নেই। মাদুলির দরুন পুজো পাঁচ টাকা, সুতোর দাম চার পয়সা।...ওষুধ হ'ল জ্বরের; খুব সস্তা, চোদ্দ আনা।'

সুরেন শিশিটা রেখে সোজা হয়ে দাঁড়ায়, 'চলো হে কেষ্টদা—'

'চলো চলো।'

সর্বেশ্বর প্রশান্ত মুখে শিশিটা সুটকেসে রেখে সুটকেসটা বন্ধ ক'রে ফেলল।

বিপ্রদাস অনেকক্ষণ ধরেই একটা কি যেন বলি-বলি করছিল। এইবার সাহসে ভর ক'রে মাথাটাথা চুলকে ব'লেই ফেলল, 'একটা কথা নিবেদন করব কি?'

'বিলক্ষণ। আমি তো পথের মানুষ হে। আমাকে আবার সঙ্কোচ কি?'

বিপ্রদাস আর একবার কেশে নিয়ে বললে—'ময়রার দোকান করি বটে, তবে আমরা ঘোষের পো নই—ময়রাও নই। আমরাও ব্রাহ্মণ। আমার নাম বিপ্রদাস ভট্টাচার্য। উপাধি ভট্টাচার্য—নইলে আসল পদবী হ'ল বাঁড়ুয্যে, শাণ্ডিল্য গোত্র। যদি আপত্তি না থাকে তো এই দুটো তিনটে দিন না হয় আমার বাড়িতেই থেকে যান না।'

সর্বেশ্বর বললে,—'বলো কি হে! তোমার সাহস তো কম নয়। চেনা নেই শোনা নেই, বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ঢোকাবে! তারপর যদি আমি চুরি-ডাকাতি

ক'রে নিয়ে পালাই!'

বিপ্রদাস একটা ছোট রকমের দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'কী আর নেবেন? নেবার মতো কি আর কিছু আছে? সম্বল তো এই দোকানটুকু; তা দেনায় দেনায় তাও যেতে বসেছে। এই তো একটুখানি জায়গা, ক'টাই বা লোক নামে দিনে-রাতে! এতগুলো দোকান এখানে চলে কি ক'রে বলুন দেখি! জমি যা আছে কোনমতে খোরাকির ধানটা হয়, বাকী খরচ যে কী ক'রে চালাই তা আমিই জানি।'

সর্বেশ্বর একেবারে উঠে দাঁড়িয়ে বলে—'তবে চলো তোমাদের বাড়িতেই যাই। মোদ্দা বাড়ির ওঁয়ারা আবার গালাগাল দেবেন না তো? কোথাকার কে এক হতভাগাকে জুটিয়ে নিয়ে এলে ব'লে?'

বিপ্রদাস বললে—'না না, সে ভয় নেই। চলুন, আসুন। চরণ, দেখো ততক্ষণ, আমি ঘুরে আসছি।'

দুজনে বাজার থেকে বেরিয়ে মাঠের পথ ধরল। সর্বেশ্বর পথ চলতে চলতে প্রশ্ন করল,—'বাড়িতে কে কে আছেন তোমার ভট্চায্?'

'কে আবার থাকবে! মা আর একটা বোন।'

'বিয়ে করো নি?'

'না। বোনটার বিয়ে না দিয়ে—। এই তো বাজার!'

এদিকে ওরা চলে যাবার পরই একটা বিদ্রূপের ঝড় বয়ে গেল! সুরেন বললে, 'ব্যাটা ক্যানভাসার ফন্দিটা ভেঁজেছে ভাল!'

কেষ্টধন বললে, 'বিপ্রদাসেরও তেমনি, সন্নিসি দেখলে তো ভক্তি উথলে উঠল একেবারে। অথচ ঐ তো অবস্থা। ঘরে তোর একটা সোমত্থ আইবুড়ো বোন, তুই একটা ভণ্ড জোচ্চোরকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ঢোকাস কোন আক্কেলে!'

হরিশ বলল, 'মরবেন যখন তখন বুঝতে পারবেন আর কি!'

॥ ১০ ॥

বিপ্রদাসের বাড়ি দোকানের কাছেই, মাত্র আধ পোয়াটাক পথ। খড়ের বাড়ি, বাইরের দিকে বৈঠকখানা ঘর, মাঝে মস্ত বড় উঠোন, তারই একপাশে দুটো মরাই, আর এক কোণে শীর্ণ গুটিদুই গরু, ওদিকে আর দুটো শোবার ঘর। শোবার ঘরের দাওয়ায় লাগোয়া রান্নাঘর। বাইরের ঘরের বারান্দায় সর্বেশ্বরকে দাঁড় করিয়ে রেখে ওদিক দিয়ে ঘুরে বিপ্রদাস বাড়ির ভেতরে গেল। অসময়ে ওকে ফিরতে দেখে মা এবং বোন পুঁটি দুজনেই হাতের কাজ ফেলে ছুটে এলো। মা প্রশ্ন করলেন, 'কী রে খোকা, এখুনি চলে এলি যে? শরীর ভাল আছে তো?'

'না না, সেসব কিছু নয়। একটি ব্রাহ্মণ আশ্রয় পাচ্ছিল না, তাকেই নিয়ে

এলুম।' মাথাটাথা চুলকে কোনমতে ব'লে ফেলে বিপ্রদাস।

পুঁটি তীক্ষ্ন বিদ্রুপের সুরে ব'লে উঠল, 'তা তো আনবেই। গ্রামের জমিদার। সহস্রপুরুষীর বংশ তোমাদের, অতিথি-অভ্যাগত তোমার দোরে আশ্রয় পাবে না তো পাবে কোথায় ? ভাবনাও তো নেই, বিনা মাইনের রাঁধুনী আর চাকরানী আছে বাড়িতে ! শুধু মুখের কথা খসালেই হ'ল !'

'আঃ পুঁটি, চুপ কর না।'...বিপ্রদাস ব্যস্ত হয়ে ওঠে, 'শুনতে পাবে যে।'

মা-ও তাড়াতাড়ি বলেন, 'এনে যখন ফেলেছে, রাগারাগি ক'রে আর কি হবে বল্ ! যা খোকা, দোর খুলে দিয়ে বসা গে যা।'

দাঁতে দাঁত চেপে পুঁটি বলে, 'সত্যি, লোকে বলে না—যার ন' বছরে আক্কেল হয় না, তার নব্বুই বছরেও হয় না ! তা এ হয়েছে তাই ! চিরদিন তোমার সমান গেল !'

বিপ্রদাস আর কথা না বাড়িয়ে সরে পড়ে। ভেতর দিয়ে গিয়ে দোরটা খুলে দিয়ে সর্বেশ্বরকে আহ্বান করে, 'আসুন আসুন, বসুন। এই চৌকিটার ওপর বসুন ভাল ক'রে। চান করবেন নাকি ?'

'চান ? না, চান আমি বড়-একটা করি নে। মুখে-হাতে জল দিলেই চলবে।'

'তা হ'লে আপনার মুখ-হাত ধোওয়ার জল দিতেই বলি। আপনি বসে একটু বিশ্রাম করুন। আমি এই সন্ধ্যের গাড়িটা দেখেই চলে আসছি।'

বিপ্রদাস চলে গেল। চৌকিটার ওপর একটা মাদুর পাতাই ছিল। তার ওপরই চিৎ হয়ে শুয়ে সর্বেশ্বর একটা বিড়ি ধরালো। সারাদিনের ঘোরাঘুরি ও ক্লান্তিতে দেহটা অবসন্ন হয়ে পড়েছে। তাই শোওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝি চোখে তন্দ্রা নেমেছিল একটু। সহসা নারীকণ্ঠের সম্ভাষণে চম্‌কে জেগে উঠল।

'আপনার মুখ-হাত ধোবার জল এই বাইরে রেখেছি, দাওয়ার ধারে। মুখ-হাত ধুয়ে নিন। চা আনতে যাচ্ছি।'

সর্বেশ্বর ভাল ক'রে চেয়ে দেখল। একহারা লম্বা চেহারা, গায়ের রংটাও ফরসা নয়। বছর উনিশ-কুড়ির অত্যন্ত শ্রীহীন চেহারার একটি মেয়ে। অবজ্ঞায় মুখটা ঘুরিয়ে নিল সে।

পুঁটি ডেকেই চলে গিয়েছিল। সর্বেশ্বর উঠে বাইরের দাওয়ায় আসতে আসতে আপনমনেই ব'লে উঠল,—'সক্কাল বেলা ! এর নাম সোমত্থ মেয়ে ? মেয়ে তো নয় রেষকাঠ ! ছিরি বলতে কি কিছুই নেই ? শ্রীবিষ্ণু শ্রীবিষ্ণু !'

বাইরে মাজা ঝকঝকে গাড়ুতে জল আর তার ওপর পাট-করা পরিষ্কার গামছাখানি দেখে অনেকদিন বাদে কে জানে কেন সর্বেশ্বরের মনটা বড় খুশি হয়ে উঠল। সে ঘাড়ে-মাথায় বেশ ক'রে জল দিয়ে, পা ধুয়ে গামছায় মুখ-হাত মুছে ঘরে এসে বসল। ততক্ষণে পুঁটি একটি রেকাবিতে দুটি রসগোল্লা, একঘটি জল আর এক কাপ চা রেখে গেছে। জলযোগ শেষ ক'রে আবারও একটা বিড়ি ধরাল সর্বেশ্বর।

দোকানে পৌঁছতেই বিপ্রদাসের ওপর দিয়ে যেন একটা লাঞ্ছনার ঝড় বয়ে গেল। সুরেন বললে—'আচ্ছা বিপ্রদা, এতখানি বয়স হ'ল, তবু তোমার একটা বিবেচনা ব'লে কিছু হ'ল না? ঐ আস্ত ভণ্ডটাকে নিয়ে গিয়ে বাড়িতে ঢোকালে?'

চরণ বললে—'তুমি মনিব, আমি তোমার কারিগর—বলা উচিত নয়, কিন্তু কাজটা ভাল করো নি দাদা!'

কেষ্টধন বিদ্রূপ ক'রে বললে—'আক্কেল জিনিসটা কাউকে দেওয়া যায় না রে ভাই, যার থাকে তার আপনিই থাকে।'

বিপ্রদাস আম্‌তা আম্‌তা ক'রে বলে, 'কী কবি, বামুন মানুষ, কোথায় কার ঘরে যাবে—তাই—'

হরিশ বললে, 'হ্যাঁ, তাই বই কি! আসলে তুমি ঐ যে একটু সন্নিসীর গন্ধ পেয়েছে!···আর রক্ষে আছে, গলে গেলে একেবারে! মরবে মরবে, এই করতে করতে একদিন মরবে।'

বিপ্রদাস অপরাধীর মতো নীরবে নত-মস্তকে সব লাঞ্ছনা সহ্য করে। অনুতাপও যে হয় না তা নয়—কিন্তু উপায় কি?

খানিক পরে সন্ধ্যার ট্রেনটা দেখে রাত্রিতে কী কী কাজকর্ম হবে চরণকে উপদেশ দিয়ে বিপ্রদাস যখন বাড়ি ফিরল, সর্বেশ্বর তখন গাঢ় ঘুমে অচৈতন্য। তারই ফাঁকে কখন পুঁটি এসে একটা আলো রেখে গেছে তা সে টেরও পায় নি। বিপ্রদাস ঘরে ঢুকে কেশে গলা-খাঁকারি দিয়েও যখন ঘুম ভাঙাতে পারল না, তখন অকারণে একটা টুল তুলে সরিয়ে একটু বড় গোছের আওয়াজ করল। সেই আওয়াজেই ঘুম ভেঙে গেল সর্বেশ্বরের। ধড়মড় ক'রে উঠে বসে বলল—'এই যে, কখন এলে ভট্‌চায্‌? ইস, খুব ঘুমিয়ে পড়েছিলুম!'

'এই আসছি। তারপর? জলটল পেয়েছিলেন? চা দিয়েছিল একটু?'

'বসো, বসো। হ্যাঁ, সবই পেয়েছিলুম। খুব যত্ন করেছে খুকীটি। অনেকদিন পরে এত আরাম পেয়েই তো ঘুম এসে গিয়েছিল। ঐটি তোমার বোন বুঝি?'

বাইরে থেকে এই সময় খনখন ক'রে বেজে উঠল পুঁটির গলা—'লোকের আক্কেল না থাকলে তাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হয়। তা তোমার ছেলের মা সে বুদ্ধিটুকুও নেই। খড়ের ঘর—তা ছাড়া খরার দিন, কাঠ-কাঠরা শুকিয়ে বারুদ হয়ে আছে। এর ভেতর যদি তক্তপোশে শুয়ে ঘুমোতে ঘুমোতে বিড়ি খায় আর যেখানে সেখানে জ্বলন্ত বিড়ির টুকরো ছুঁড়ে ফেলে তো কী মনে হয়? মনে হয় না যে আমাদের ঘরে আগুন লাগাতে এসেছে?'

ওদিক থেকে চাপা আওয়াজ আসে, 'চুপ কর না পুঁটি! দাদাকে তখন বলিস!'

'চুপ তো ক'রেই আছি মা। অনৈরণ সইতে পারি না তাই—'

একটু অপ্রতিভের হাসি হেসে সর্বেশ্বর বলে—'সত্যিই কাজটা গর্হিত হয়ে গেছে। বিড়ি খেতে খেতে ঘুমোনোটা ঠিক হয় নি। কিন্তু—' চারিদিকে

তাকিয়ে দেখে—'বিড়িটা গেল কোথা ?'

আসলে পুঁটিই সেটা সরিয়ে দিয়ে গিয়েছিল, সর্বেশ্বর টের পায় নি। এঁটো বাসন নিয়ে ঘরে এসে শিথিল হাত থেকে জ্বলন্ত বিড়িটা তক্তাপোশে পড়তে দেখে তুলে ফেলে দিয়েছিল।

কিন্তু বিপ্রদাস ইতিমধ্যে বিষম লজ্জিত হয়ে ব্যাকুলকণ্ঠে ব'লে ওঠে—'আপনি ও পোড়ারমুখীর কথায় কান দেবেন না দাদা। ওর কথাবার্তা ঐ রকমই। মা'র অতিরিক্ত আদরে ও বাঁদ্‌রী মাথায় চড়ে বসেছে একেবারে! আমার ওপর জোর চালিয়ে চালিয়ে মনে করেছে সব্বাইকার ওপরেই ওর জোর খাটে!'

'যেতে দাও, যেতে দাও। ঐ একটি বোন বুঝি ?'

'একটিতেই সামলাতে পারছি না—দুটি হ'লে হয়তো গলায় দড়ি দিতে হ'ত। একটা বোন, যার-তার হাতেও তো দিতে পারি না। অথচ বিয়ের বয়েস ওর পার হয়ে যেতে বসল, কোথাও কোন যোগাড়ই তো দেখছি না। কি ক'রে যে পার করব ওকে, ভাবলে যেন মাথা খারাপ হয়ে যায়।'

বিপ্রদাস চুপ ক'রে বসে বসে আকাশ-পাতাল ভাবে।

সর্বেশ্বরও নিঃশব্দে কিছুক্ষণ বিড়ি টানবার পর বলে—'দেখ ভট্‌চায্‌, একটা কথা তোমাকে বলা দরকার। তুমি আমাকে ডেকে এনে আশ্রয় দিয়েছ, যত্নও করেছ ঢের, তোমাকে আমি ঠকাতে চাই না।'

বিপ্রদাস বিস্মিত হয়ে চেয়ে থাকে। সর্বেশ্বর নাটকীয় ভাবে খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বলে—'একটু আগে যে সন্ন্যাসী-টন্ন্যাসী বলেছিলুম, ওটা বাজে কথা। আসলে আমি ক্যানভাসার। ওকথাটা বলার মানে হ'ল এই যে, কথাটা লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে ভাল রকম একটা বিজ্ঞাপন হয়ে রইল। পরশু যখন হাটে যাবো তখন খদ্দেরের অভাব হবে না। তুমি আমাকে সাধু-সন্ত ভেবে খাতির করছ ব'লে কথাটা শুনিয়ে দিলুম। এর পরেও যদি আশ্রয় দিতে চাও তো দাও, নইলে সাফ ব'লে দাও—আমি পথ দেখি। তবে আমি শুধু-হাতেও থাকতে চাই না, খরচপত্র সব দেব।'

বিপ্রদাস কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বোধ করি খানিক আগেকার লাঞ্ছনাটাই পরিপাক ক'রে নেয়, তারপর বলে, 'না, খরচপত্রের কথা নয়। ব্রাহ্মণের ছেলেকে আশ্রয় দিয়েছি, এখন কি আর তাড়িয়ে দেব ? সন্ন্যাসী না হোক অতিথি তো! অতিথি নারায়ণ। আপনি দয়া ক'রে থাকুন, তাই আমার ঢের।'

'সে যা ভাল বোঝো করো। মোদ্দা আমি আমার দায়ে খালাস।'

বিপ্রদাস এসেই বোধহয় তামাকের ফরমাস করেছিল। পুঁটি এসে দোরের কাছ থেকে বললে, 'এই নাও দাদা তামাক।'

হাত বাড়িয়ে তার হাত থেকে হুঁকোটা এনে সর্বেশ্বরের দিকে বাড়িয়ে দিলে বিপ্রদাস। তারপর বললে, 'বাড়ি আপনার কোথায় তা হ'লে ?'

'বাড়ি আমার হুগলী জেলার এক গ্রামে। সেখানে বিশেষ কেউ নেই—আছেন এক বুড়ি পিসিমা। আমি ধরতে গেলে কলকাতাতেই থাকি।'

'কী করেন—এই ক্যানভাসারি ?'

'কলকাতাতে কি এসব চলে ভাই ! এটা সম্প্রতি ধরেছি, মন্দ লাগছে না। হয়ত এইটেই চালাবো এখন থেকে।'

আরও একটু চুপ ক'রে থাকে বিপ্রদাস,—'সংসারধর্ম করেন নি ?'

'না, ওটা আর হয়ে ওঠে নি।'

'করতে তো হবে। এমনভাবে ভেসে বেড়ালে চলবে কি !'

'চালাতেই তো চাইছি ভাই। সেসব অনেক কথা। ক্রমশ বলব। মোদ্দা সংসারধর্মটি আমার সইবে না।' হুঁকোটা সে বিপ্রদাসের হাতে ফিরিয়ে দিলে।

বাঁ-হাতের তেলোতে হুঁকোর মুখটা মুছতে মুছতে বিপ্রদাস বললে—'ওরা সব আমাকে বড্ড বকাবকি করছিল। বলছিল যে ওর কোনপুরুষে সন্নিসী নয়। আস্ত একটা জোচ্চোরকে বাড়িতে ঢোকালে—মজাটা টের পাবে !'

সর্বেশ্বর প্রশান্ত মুখে বললে—'তা জানি। কিন্তু দেখে রেখো তুমি, ওরাই আবার সস্তায় মাদুলি নেবার জন্যে তোমার দোরে হাঁটাহাঁটি করবে।'

পরের দিন ভোরে উঠে চা খেয়েই বিপ্রদাস বেরিয়ে গেল দোকানে। সর্বেশ্বর কোথা থেকে একটা বড় পিজবোর্ড যোগাড় ক'রে ভুষোকালি দিয়ে সারা সকাল ধরে তার ওপর বড় বড় ক'রে ওর মাদুলি আর ওষুধের বিজ্ঞাপন লিখল।

সে বাইরের দাওয়ায় বসে যখন এই সব লিখছে, তখনই এক ফাঁকে পুঁটি তাকে দুটি রসগোল্লা আর এক কাপ চা দিয়ে গেছে, উঠে ভেতরে গিয়ে খাবার দরকার হয় নি। লেখা শেষ ক'রে উঠতে ওর মনে হ'ল যে অনেকক্ষণ নেশা করা হয় নি, এবার একটা বিড়ি খাওয়া দরকার। উঠে দাঁড়িয়ে আরামসূচক ভঙ্গীতে পিঠটা ছাড়িয়ে সে বেশ ধীরে-সুস্থেই ঘরে ঢুকল। কিন্তু ভেতরে পা দিতেই ওর চক্ষু স্থির। এ কী কাণ্ড ! ওর টাকাপয়সা বিড়ি দেশলাই চিঠি কাগজপত্র যাবতীয় জিনিস—ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলতে ওর যা-কিছু বোঝায়, চৌকিতে মাদুরের ওপর কে বেশ সযত্নে সাজিয়ে রেখেছে, মোদ্দা কোটটি নেই ! দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে দেখল শুধু কোট নয়—গেঞ্জিটাও উধাও !

যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ ও বিস্মিত হয়ে ভেতরের উঠোনে পা দিয়ে দেখে যে শুধু তার কোট এবং গেঞ্জিই নয়, তার স্যুটকেস খুলে কাপড়খানাও বার ক'রে নেওয়া হয়েছে এবং সেগুলিকে কে সাবান দিয়ে কেচে উঠোনে বাঁধা-তারে শুকোতে দিয়েছে।

সে বেশ একটু চড়া গলাতেই ডাক দিলে—'ভট্‌চায্‌ ! ভট্‌চায্‌ বাড়ি ফিরেছ নাকি হে ?'

রান্নাঘর থেকে পুঁটি বেরিয়ে এল, কিন্তু কাছে এল না। অন্যদিকে চেয়ে উত্তর দিল—'দাদা এখন ফেরে না কোনদিন। একটার গাড়ি দেখে ফিরবে।'

সর্বেশ্বর আগের মতোই চড়া গলায় বললে—'তা তো ফিরবে, কিন্তু

আমার জামা-কাপড়গুলো গেল কোথায় ? কোটটা ? তার পকেটে যে টাকা পয়সা কাগজপত্তরগুলো ছিল, তাই বা এমন ক'রে বার ক'রে রাখল কে ?'

পুঁটি বেশ নৈর্ব্যক্তিক কণ্ঠে উত্তর দিল—'জামা-কাপড় আমিই সাবান দিয়ে কেচে দিয়েছি। অত ময়লা দেখলে আমার গা-ঘিনঘিন করে।'

সর্বেশ্বর ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললে—'বেশ করেছ ! মাথা কিনেছ একেবারে ! কিন্তু ও কোট দিয়ে আমি এখন করব কি ? চারদিক কুঁচকে থাকবে যে !'

পুঁটি কিন্তু তখনও বেশ নির্বিকার।

'পেছনেই পাঁচু ধোপা থাকে, তাকে একটা পয়সা দিলেই ইস্ত্রি ক'রে দেবে।'

সর্বেশ্বর গুম্ হয়ে শুধু বললে—'হুঁ !'

সে ফিরে এসে বসে বিড়ি ধরালে একটা।

একটু পরেই ওধার থেকে তাড়া এল—'চান ক'রে নিন না আপনি !'

সর্বেশ্বর ঝাঁঝের সঙ্গে ব'লে উঠল—'হ্যাঁ, এখানকার পুকুরের জলে চান ক'রে ম্যালেরিয়া ধরিয়ে বসে থাকি আর কি !'

ওদিক থেকে সঙ্গে-সঙ্গেই জবাব এল—'জল ফুটিয়ে বালতি করে রেখে দিয়েছি।...আপনি তেল মেখে নিন। দাওয়াতেই তেলের বাটি গামছা সব আছে।'

সর্বেশ্বর রাগ ক'রে বিড়ির টুকরোটা ফেলে দিয়ে দুমদুম ক'রে এসে তেল মাখতে বসল। আপনমনেই বললে—'আচ্ছা এঁচোড়েপাকা মেয়ের পাল্লায় পড়েছি বাবা !'

বিপ্রদাস দুপুরবেলা বাড়ি ফিরতে সর্বেশ্বর বললে—'ভট্‌চায্‌, তোমার বোনের কাণ্ডটা একবার দ্যাখো !'

সব শুনে বিপ্রদাস হেসে বললে—'আস্ত পাগল একটা।' তারপর একটু বিমর্ষ মুখেই বললে, 'সত্যিই ও নোংরা দেখতে পারে না। তার জন্য খাটেও বেশী। যতটা না করলে নয়—তার ঢের বেশীই করতে হয়, তবুও ও-ই স্বভাব ওর। তাই তো ভাবি, কার হাতে যে পড়বে—'

তারপর বোনকে ডেকে একটু ভৎসনার সুরেই বললে, 'হ্যাঁ রে পুঁটি, ভদ্রলোকের কাপড়-জামা নিলি, ব'লে নিতে নেই ? টাকা-পয়সা যদি ওর হারায় কিছু, তুই দিতে পারবি ?'

পুঁটি বেশ চড়া-গলাতেই, সর্বেশ্বরের যাতে শুনতে কোন অসুবিধা না হয় এমন ভাবে জবাব দিলে—'বললে কি কাচতে দিত নাকি ? যা পিচেশ !'

॥ ১১ ॥

পরের দিন সর্বেশ্বর ফিরল গুনগুন ক'রে গান গাইতে গাইতে—

'মন তুমি কৃষি কাজ জানো না,
এমন মানব জমিন্ রইল পড়ে মন
আবাদ করলে ফলত সোনা।'

তারপরই বাইরে থেকে হাঁক দিল—'ভট্‌চায্‌, ফিরেছ নাকি হে ?'

'হ্যাঁ—এই এলাম।' ব'লে হুঁকো হাতে ক'রে বিপ্রদাস বেরিয়ে আসে।

'তোমাদের দেশটি কিন্তু বেশ। সাত শিশি ওষুধ আর তিনটে মাদুলি বেচেছি, তার ভেতর দুটো পুরো দামে।'

'তাই নাকি ?'

'একটা খালি সস্তায় দিতে হ'লে। ঐ যে তোমাদের বিড়িওলা সুরেন, সে-ই হাতে-পায়ে ধরে একটা নিয়ে গেল তিন টাকায়। কেমন, বলি নি তোমাকে যে ওরাই আগে নিতে আসবে!'

'বলেন কি ? কিন্তু আজই যে আমার কাছে কত কি বলছিল!'

'অমন সবাই বলে। হাতটা দেখো না গিয়ে আজ একবার, কালো রেশমী সুতোয় বেঁধে রাখতে বলেছি।'

খানিকটা হেসে নেয় সর্বেশ্বর আপনমনেই।

'আসুন—' বলে হুঁকোটা বাড়িয়ে দেয় বিপ্রদাস।

নীরবে খানিকক্ষণ তামাক খাবার পর সর্বেশ্বর বলে—'দ্যাখো ভট্‌চায্‌, ভাবছি আর একটা হাট দেখে যাবো। এখানকার বাজারটা ভালো ব'লেই মনে হচ্ছে।'

বিপ্রদাস মনে মনে শঙ্কিত হ'ল। কিন্তু মুখে শুধু বললে—'বেশ তো!'

'মোদ্দা পাঁচ-ছ দিন আমি অমনি থাকতে পারব না। এই নোটটা রাখো —এটা তোমাকে নিতেই হবে।'

'ছি ছি, কী যে বলেন!' ব্যস্ত হয়ে ওঠে বিপ্রদাস—'বামুনের ছেলেকে দুদিন বাড়িতে রেখে খোরাকি নেব ?'

সর্বেশ্বর প্রচণ্ড ধমক দিয়ে উঠল—'বেশী চালাকি ক'রো না ভট্‌চায্‌। যা বলছি শোন। নৈলে এখুনি পৈতে ছিঁড়ে এই অভুক্ত অবস্থায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবো। বামুনের ছেলেকে দু'দিন ভাত তো অমনি দিয়েছ, এমন যদি আমি দশ দিন থাকি—বসে বসে খাওয়াতে হবে ? কী এমন রাজা ইন্দির-চন্দর এলে তুমি হে!'

বিপ্রদাস যৎপরোনাস্তি কুণ্ঠার সঙ্গেই টাকাটা নিয়ে ভেতরে গেল। একটু পরেই শোনা গেল পুঁটির চড়া গলার আওয়াজ, 'তুমি নিতে গেলে কেন ও টাকা ? কিসের জন্যে নিতে গেলে ? এ কী হোটেল পেয়েছে ও ? এত যদি পয়সার গরম তো হোটেলে গিয়ে উঠতে বলো না!'

সর্বেশ্বর সেই নির্জনেই মুখ ভেঙিয়ে বললে—'রাজনন্দিনীর আত্মসম্মানে ঘা লেগেছে! ছুঁড়ির মুখ দ্যাখো না, যেমন চেহারা তেমনি বাক্যি!'

খানিক পরে বাইরের দোরের কাছে এসে দাঁড়িয়ে পুঁটি তাগাদা দিলে—'চানের জল গরম হয়ে গেছে। তেল মেখে নিন—'

সর্বেশ্বর শুয়ে শুয়ে বিড়ি টানছিল, তেমনিভাবেই জবাব দিলে—'রোজ রোজ চান করবার আমার দরকার হয় না। আমি আজ চান করবো না।'

পঁুটি তীক্ষ্নকণ্ঠে জবাব দিলে, 'ভদ্দরলোকের বাড়ি থাকতে গেলে ভদ্দর-লোকের মতোই থাকতে হয়। অতই যদি চানে ভয়, গুলির আড্ডায় গিয়ে উঠলেই তো হ'ত !'

রান্নাঘর থেকে পুঁটির মা তিরস্কার ক'রে ওঠেন, 'ও কী হচ্ছে পুঁটি ? মুখের লাগাম নেই ?'

'তা কি করব ! চান না ক'রে গায়ে পোকা হলে তো সে পোকা আমাদের বাড়িতেই ঘুরে বেড়াবে !'

সর্বেশ্বর ঝেঁঝে উঠল—'ঝকমারি হয়েছিল আমার এখানে আসা। ঘাট হয়েছিল। আমার আর পরের হাটের জন্যে অপেক্ষা করা চলল না দেখছি, আজই যেতে হবে।'

'ও, তবে তো একেবারে পৃথিবী রসাতলে যাবে !' পুঁটিও সমান জোরে জবাব দেয়।

শেষ পর্যন্ত ভালমানুষের মতো গিয়ে তেল মাখতেই বসল সর্বেশ্বর। বিপ্রদাস পুকুরে গিয়েছিল স্নান করতে, বাড়ি ফিরে মার মুখে সব শুনে ভিজে কাপড়েই ছুটে এল, সর্বেশ্বরের হাত দুটো ধরে বললে—'ও পাগলির কথা শুনো না ভাই, ও বদ্ধ পাগল।'

প্রশান্তকণ্ঠে সর্বেশ্বর উত্তর দিলে, 'তুমি ক্ষেপেছ ভট্‌চায্‌ ! ঐ একফোঁটা মেয়ের কথায় রাগ ক'রে চলে যাবো ! আমায় সে বান্দা পাও নি। আমি ঠিক আছি।'

॥ ১২ ॥

বনমালী কলকাতায় ফিরে এসে এবার আর মেসে ঢুকতে পেলেন না। ঠাকুর পথরোধ ক'রে দাঁড়িয়ে খবরটা দিলে—'সে বাবু চলে গেছেন তল্পিতল্পাসুদ্ধ —সে সীট ভাড়া দেওয়া হয়ে গেছে। ওপরে গিয়ে লাভ নেই।'

বনমালী খানিকটা ওর মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললেন—'র'সো বাপু, র'সো। এর মানে তো এই হয় যে, সে এখানে এসেছিল ? ইস্‌, ক'দিন যদি মেসে না থেকে ঘাপটি মেরে থাকতুম ! তা বাপু, এটুকু বেশ পরিষ্কার হ'ল যে সে এ মেস ছাড়ে নি। নইলে তুমি পথ আটকাতে না। তা আমি না হয় তোমাদের ঘর জোড়া করব না, দিনের বেলায় বারান্দা-মারান্দায় পড়ে থাকব, রাতটা ছাদে কাটবে। মন্দ কি !'

'না বাবু। ম্যানেজারবাবুর মানা আছে।'

'বিলক্ষণ ! ম্যানেজারবাবুর তো বেশ দয়ার শরীর দেখছি ! তা বাবা এই বুড়ো মানুষ পথে বসে থাকব ?'

'কী করব বলুন আজ্ঞে। যা হুকুম আমাদের ওপর।'

'তা তো বটেই। তবে এটাও শুনে রাখো ঠাকুর, আমার নামও ঐ যাকে বলে গে বনমালী ঘোষাল। আমিও সহজে ছাড়ছি নি। এই দোরে বসে রইলুম

আমি। বুড়ো মানুষ না খেয়ে দোরে পড়ে রইল, এই কথাটি তোমার সেই দয়ার অবতার ম্যানেজারবাবুকে ব'লো। ধর্মে হয় একমুঠো ভাত দেবে, না হয় দেবে না—'

এবার একটা ক্যাম্বিশের ব্যাগ এনেছিলেন বনমালী ঘোষাল, সেইটিই পেতে বসলেন—চেপেচুপে।...

সকালের দিকে অত কেউ গ্রাহ্য করে নি। কিন্তু বিকেলে অফিস থেকে ফিরেও ওঁকে তদবস্থায় বসে থাকতে দেখে অনেকেই চঞ্চল হয়ে উঠল।

প্রদোষ গিয়ে বিনয়বাবুকে ধরল—'ম্যানেজারবাবু, হোআট ইজ দিস্? পাড়ার লোকে কি ভাবছে বলুন তো? পাওনাদারের মতো দোর জুড়ে বসে—'

বিনয়বাবু শুষ্কমুখে বললেন—'কী করি বলুন দিকি। বুড়োমানুষকে তো আর মারধোর ক'রে তাড়াতে পারি না!'

প্রভাত পাল বলে—'ঐ লোকটা—দ্যাট স্কাউণ্ড্রেল—যত নষ্টের মূল! আপনিই তো মশাই আমাদের সকলের অমতে সেই ডার্টি লোকটাকে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন। যত হাঙ্গামা তাকে নিয়েই। এখন সামলান। আমরা কেন এ অত্যাচার সহ্য করব?'

বিনয়বাবু ভয়ে ভয়ে বলেন—'কী করব এখন বলুন তো—পুলিশে খবর দেব নাকি?'

'তা জানি না। এনি হাউ ক্লিআর আউট দি প্যাসেজ!'

বিনয়বাবু বিষণ্ণমুখে নেমে আসেন, বনমালীকে বুঝিয়ে বলতে যান—'মিছিমিছি এসব কি হাঙ্গামা করছেন বলুন তো?'

'বিলক্ষণ! আমি তো কোন হাঙ্গামা করি নি বাপ-সকল। একটা কথাও তো কই নি।'

'কিন্তু এ কী বিশ্রী ব্যাপার বলুন দিকি! লোকে কি মনে করে!'

'কি করব বাবাজী? প্রাণের দায়—প্রাণের দায়।'

প্রভাতও এসে দাঁড়িয়েছিল। সে ব'লে উঠল—'কী রকম প্রাণ আপনাদের তাও বুঝি না—যে এমন দায় তার! পৃথিবীতে কি আর পাত্তর নেই? তাকিয়ে দেখেছেন লোকটার দিকে?'

'বিলক্ষণ! দেখেছি বৈকি। সেই সঙ্গে, তারও আগে থেকে, মেয়ের দিকেও যে তাকিয়ে রয়েছি বাবা। তাকে তো তুমি দ্যাখো নি। সাক্ষাৎ মা চামুণ্ডার ডাকিনী-যোগিনীদেরই একটি—মা দয়া ক'রে এই অধমের ঘরে ছেড়েছেন। তাই তো এত তাড়া করা বাবাজী, অতিকষ্টে বেড়ালের ভাগ্যে সিকে ছিঁড়েছে, এই পাত্তরটি পেয়েছি, এটি ফসকালে কি আর সহজে মিলবে ভেবেছ! রাধে মাধব, রাধে মাধব!'

'বরাতে যদি থাকে তো আবারও মিলবে।' প্রদোষ বলে।

'হুঁ। বরাত তো চোখে দেখা যায় না বাবা। বরটা দেখা যায়। বর নিয়ে যদি না ফিরি তো আমার বরাতে কী আছে তা ভাবতেও পারো না। তখন যা গৃহের অবস্থা দাঁড়াবে তার চেয়ে এ সরকারী পথ ঢের ভাল।'

'কিন্তু দেখুন এভাবে দোরের সামনে বসে থাকাতে এদের বড় আপত্তি। এরা তো পুলিশে খবর দিতেই যাচ্ছিল।' বিনয়বাবু সবিনয়েই বলেন।

'পথে বসাতে যদি এতই আপত্তি থাকে বাবুদের তো পথ ছেড়ে দিক— ঘরেই আশ্রয় নিই। তবে পুলিশের কথা যদি বলো বাবাজী, ও ভয়টা আর আমাকে দেখিও না। এই বয়সে একশ'টির ওপর ফৌজদারি মামলা করেছি। উকিলকে আইন শেখাতে পারি।...সরকারী রাস্তায় বসে আছি, এখনও তো রাত হয় নি। পুলিশ কোন্ আইনে তাড়াবে? তা ছাড়া ঐ দ্যাখোগে যাও, লালবাজারের রাস্তাতেও কথায় কথায় লোক বসে যায়, পুলিশ তাড়াতে পারে? আর খাওয়া না-খাওয়া তো আমার ইচ্ছে বাবাজী। জেলখানার কয়েদীকেই জোর ক'রে খাওয়ানো আইন নেই।' এই বলে বিজয়গর্বে মাথাটা পিছনে হেলিয়ে সকলের দিকে একবার তাকালেন বনমালী।

এরা সকলে বিপন্নভাবে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। শেষে প্রদোষের মাথাতেই গেল বুদ্ধিটা।

সে হাতজোড় ক'রে বলল, 'তাউইমশাই, দোহাই আপনার, আপনি এক-মুঠো খেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি চলে যান। আমি আপনাকে ছুঁয়ে কথা দিচ্ছি, তার ঠিকানাটা পেলেই আপনাকে আমরা টেলিগ্রাম করব। নিশ্চয়, নিশ্চয়, নিশ্চয়—এই তিন সত্যি করছি।'

'বেঁচে থাকো বাবাজী, দীর্ঘজীবী হও। তাহলে তাই চলো বাবা, আপাততঃ পেয়ালা-দুই চা আর কিছু খাবার দিতে বলো। ভাতটা খেয়ে রাতের ট্রেনেই আমি সরে পড়বো, কোন ভয় নেই।'

॥ ১৩ ॥

পুঁটি ভেতর থেকে ডেকে বললে, 'নাপিত এসেছে, শুনছেন?'

'নাপিত! নাপিত কি হবে?'

'নাপিত দিয়ে কি হয়? দাড়ি কামিয়ে নিন।'

'কী সর্বনাশ! এই তো কাল না পরশু—'

'না, তিনদিন হয়ে গেছে। তিনদিন অন্তর না কামালে বনমানুষের মতো দেখায়।'

'দেখায় তো দেখায়। আমার খুশি আমি কামাবো না।'

'এটা চিড়িয়াখানা নয়। নাপিত কাজের মানুষ, বেশীক্ষণ বসতে পারবে না। কামিয়ে নিন তাড়াতাড়ি।'

'উঃ, রাজনন্দিনীর হুকুম! জ্বালিয়ে খেলে দেখছি! এমন জানলে কোন্ অমুকে এখানে পা দিত!...কৈ হে পরামানিক, কোথায় গেলে? নাও, এসো। আমার যেমন পাপের ভোগ!'

গজগজ করতে করতে গিয়ে দাড়ি কামাতে বসে সর্বেশ্বর।

রান্নাঘরের দাওয়ায় খেতে দিয়ে বিপ্রদাসের মা ভেতর থেকে ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে বলেন—'খাওয়া-দাওয়ার হয়ত খুব কষ্ট হচ্ছে। ওঁরা কী রকম খান, তা তো জানি না। পঁুটি একটু জিজ্ঞাসা কর না রে, উনি কেমন খান-টান—'

সর্বেশ্বর প্রবল উৎসাহে বলে, 'আপনি ক্ষেপেছেন মা, মেসের আর হোটেলের খাওয়া খেয়ে মুখ অসাড় হয়ে গিয়েছিল। অনেকদিন পরে এসব মনে হচ্ছে যেন অমৃত। মুখে ছড়া-ঝাঁট পড়ল তবু একটু—'

পঁুটি যেন অন্যদিকে চেয়ে স্বগতোক্তিই করল—'পোড়ারমুখে আবার ছড়া-ঝাঁট!'

মা এবং দাদা প্রায় একসঙ্গেই ধমক দিয়ে ওঠে—'পঁুটি!'

'তা নয় তো কী? দিনরাতই তো মুখে আগুন! যতক্ষণ জেগে থাকে ততক্ষণই মুখে আগুন! ও মুখ কি আর ছড়া-ঝাঁটে সাফ হবে। লাঙ্গল কোদাল চাই।'

'দূর হয়ে যা দিকি আমার সামনে থেকে।' দাদা ধমক দিয়ে ওঠে।

সর্বেশ্বর কিন্তু বেশ সহজভাবেই হাসে। বিপ্রদাসকে বলে, 'তুমি রাগ ক'রো না ভট্‌চায্‌। বলেছে কিন্তু ভাল—দিনরাতই মুখে আগুন! না, এবার দেখছি বিড়ি খাওয়াটা কমাতে হবে।'

ভেতর থেকে মা আবারও বলেন,—'কী খেতে-টেতে ইচ্ছে করে ওঁর জেনে নে না খোকা। সত্যিই তো, বারো মাস মেসে খেলে কি আর জিবে সোয়াদ থাকে।'

'কিছু না, কিছু না মা। এই বেশ খাচ্ছি। কতকাল পরে যে সেদিন পাকা আমড়ার অম্বল খেলুম! সুক্তো, ঘণ্ট এসব তো ভুলেই গেছি মা। ছেলেবেলায় পিসিমার হাতে খেয়েছি আর এই খেলুম। ঐজন্যেই তো আরো নড়তে পারছি না এখান থেকে।'

'তা খোকা—উনি চিরজীবনই কি মেসে-হোটেলে কাটাবেন? সংসার পাতলেই তো হয়!'

'ঐটি মাপ করবেন মা। আর সব পারব—ঐটি নয়। বাপ রে, সংসার পাতবার কথা মনে হ'লেই আমার হৃৎকম্প হয়।'

'তা তো বটেই।' ভেতর থেকে পঁুটির কণ্ঠস্বর বেজে ওঠে আবার—'তা নইলে অমন জংলির মতো থাকার সুবিধে হবে কেন!'

কিন্তু পঁুটি মুখে যাই বলুক, হতভাগা লোকটার ওপর তারও দয়ামায়া হয় মাঝে মাঝে। সেদিনই দুপুরবেলা ক্ষার কাচতে দেবে ব'লে বৈঠকখানায় দাদার কাপড়-জামা নিতে এসেছিল, যেতে যেতেও অবাধ্য চোখ পড়ে সর্বেশ্বরের দিকে, বন্ধঘরে এক-গা ঘেমে যেন ঘামের সমুদ্রে পড়ে ঘুমুচ্ছে। খানিকটা ইতস্ততঃ করল পঁুটি—একবার বেরিয়ে গেল, আবার ফিরে এসে একখানা পাখা ঠকাস ক'রে ওর গায়ের ওপরই ফেলে দিয়ে গেল।

ঘুমের ঘোরে পাখাখানা টেনে নিয়ে সর্বেশ্বর হাওয়া খেতে খেতে আবার ঘুমিয়ে পড়ল, সে টেরও পেল না পাখাখানা কে দিয়ে গেল।

পরের দিন হাটবার। এ হাটও বেশ জমে ওঠে। তারই ফাঁকে কেষ্টধন এসে সর্বেশ্বরকে চুপি চুপি ধরে—'হ্যাঁ দাদা, আপনার ও মাদুলিতে মকদ্দমার কিছু হয়?'

'হওয়া তো উচিত ভাই। গুরুদেব বলেছেন সঙ্কটমোচন মাদুলি—যে কোনও সঙ্কটেই মুক্তি পারার কথা।'

কেষ্টধন ইতস্ততঃ করে একটু গলাটা নামিয়ে বলে—'আচ্ছা ওরই মধ্যে এমন মাদুলি নেই যে একটু বেশী কাজ করে—মানে নিঘ্ঘাত! ব্যাপারটা আর কিছু নয় ভাই, একটা ছেঁড়া মকদ্দমায় জেরবার হয়ে পড়লুম। কী বলব, নিজের দাদামশাইয়ের সঙ্গেই মামলা একটা জমি নিয়ে। তা সে বুড়ো এমন মামলাবাজ, আমাকে একেবারে জ্বালাতন ক'রে মারলে। এবার একটা বিশ্রী ফৌজদারিতে জড়িয়েছে। এমন সব সাক্ষীদের তালিম দিয়ে রেখেছে যে জেরায় জব্দ করাও মুশকিল। দু' বিঘে জমির জন্যে কি বুড়ো বয়সে জেল খাটব?'

'ও এই!' তাচ্ছিল্যের সুরেই বলে সর্বেশ্বর—'এ আর এমন বেশী কথা কি! আছে, সে মাদুলিও আছে, পঁচিশ টাকা পুজো পড়বে। একটিই আছে—এখানে অত টাকা কে দেবে ব'লে আমি কাউকে বলি নি।'

'পঁচিশ টাকা!' কেষ্টধনের মুখ শুকিয়ে যায়, 'কিছু কমে হবে না দাদা?'

'কমে তো হবার উপায় নেই ভাই। ওর জন্যে যে স্পেশ্যাল যাগ করতে হয়। তার তো খরচা আছে। এতে আমাদের কোন লাভ নেই।'

শুকনো ঠোঁটের ওপর জিভটা বার-দুই বুলিয়ে নিয়ে কেষ্টধন সর্বেশ্বরের হাত দুটো চেপে ধরে—'দাদা, বারোটা টাকা কাছে আছে, মাইরি বলছি। এখন এই নাও। মামলাটা মিটে যাক—আমি ঠিক তোমার টাকা চুকিয়ে দেবো। বিশ্বাস করো।'

'তাই দাও।' উদাসীনভাবে বলে সর্বেশ্বর—'তোমরা আমার বন্ধু-বান্ধবের মতো হয়ে গিয়েছ, তোমাদের সঙ্গে এসব কারবার করতেই আমার খারাপ লাগে।'

ট্যাঁক থেকে বারোটা টাকা বার ক'রে সর্বেশ্বরের হাতে দিচ্ছে কেষ্টধন, এমন সময় একজোড়া ধুতি বগলে ক'রে বিপ্রদাস সেখানে এসে পড়ে।

'আরে আরে এ কী কাণ্ড! কেষ্টধন যে! আরে তুমিও মাদুলি নিচ্ছ নাকি? তুমিও যে দেখছি ঢললে এদিকে!'

'না না বিপ্রদা—মানে আমি নই—' বেগুনি হয়ে ওঠে কেষ্টধনের কালো মুখখানা—'ঐ আমার বোনাইয়ের ভাই—'

'বুঝেছি'—বলে মুখ টিপে হাসে বিপ্রদাস।

কেষ্টধনের হাতে মাদুলিটা গুঁজে দিতে দিতে সর্বেশ্বর কথাটা ঘুরিয়ে দেয়,—কাপড় কী হবে হে?'

'তা জানি নে ভাই। পুঁটির হুকুম—একজোড়া কাপড় চাই।'

'তাও তো দেখছি ধুতি!'

'ধুতির কথাই তো বলে দিয়েছে।'

'নিজের কাপড়ের হিসেবটাও দেখছি রাখো না!'

অপ্রতিভভাবে হেসে বিপ্রদাস বলে—'তা যা বলেছ। ও-ই সব করে। কিন্তু আমি তো, যতদূর মনে পড়ছে, একমাস আগেই একজোড়া কিনেছি! কী রকম হ'ল—?'

'যাকগে, হুকুম যখন তামিল করেছ—তখন আর কথা কি!'

হাট শেষ হয়ে এসেছিল। দুজনেই একসঙ্গে বাড়ির পথ ধরল। বাড়ি ফিরে বিপ্রদাস হেঁকে বললে—'এই নে পুঁটি তোর কাপড়। সাত টাকা সাড়ে ছ আনা। ধুতির কথাই তো বলেছিলি?'

'হ্যাঁ, তুমি শাড়ি এনেছ নাকি?'

'না না, ধুতিই এনেছি। কিন্তু আমার ধুতি একজোড়া গত মাসেই কেনা হয়েছে না?'

'তোমার ধুতি কে বলেছে!'

'তবে?'

'বাড়িতে আর মানুষ নেই? এক কাপড় কতদিন সাবানে কেচে কেচে চলবে? ও পুরোনো কাপড় পাঁচুকে কাচতে দিতে ব'লো দাদা, আর টাকাটা চেয়ে নিও।'

সর্বেশ্বর একেবারে আকাশ থেকে পড়ে।

'ও কাপড় কি আমার জন্যে এল নাকি? এই মরেছে! নতুন কাপড়ের আবার কী দরকার পড়ল? এই তো বেশ চলছিল।'

'হ্যাঁ, বিনা মাইনের ঝি পেয়েছে কিনা—রোজ রোজ আমি সাবান দেব!'

'কে বলে? কে দিতে বলে তোকে? দিস কেন?' সর্বেশ্বর জ্বলে ওঠে।

সে কথার জবাব দেয় না পুঁটি। শুধু বলে—'হরিশবাবুকে বলে আর একটা জামাও করিয়ে দিও দাদা। সন্ন্যাসী হয় তো গেরুয়া নিক—সংসারে থাকতে গেলে গেরস্তের মতো চলাই উচিত।'

॥ ১৪ ॥

পরের হাট থেকে সর্বেশ্বর ফিরল প্রায় লাট্টুর মতো পাক খেতে খেতে। চিৎকার করতে করতে ঢুকল'—ভট্‌চায্‌, কৈ হে ভট্‌চায্‌, বাড়ি ফিরেছ নাকি হে?'

বিপ্রদাস তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসে, 'হ্যাঁ, এই এলাম।'

'আজ হাটে যাও নি তো?'

'না। আজ চরণকে পাঠিয়েছিলাম—কিন্তু ব্যাপারটা কি?'

'আর ব্যাপার! আজ হাটে গেলে একটা জিনিস দেখতে। দারুণ কাণ্ড! মোদ্দা বলো এখন কী খাবে? তোমার দোকান থেকে এনেই তোমাকে

খাওয়াবো—'

'বলি ব্যাপারটা কি?'

'ঐ যে হে, তোমার কেষ্টধন, বলি তুমিই তো দেখলে হাতে-পায়ে ধরে গেল-হাটে পাঁচ টাকার মাদুলিটা বারো টাকায় নিয়েছিল, তা পরের দিন ছিল ওর এক ফৌজদারি মকদ্দমা, ওর জেতবার কথা নয়, তবু জিতে গেছে। ব্যস—মাদুলিরই গুণ! বুঝলে না? কথাটা মুখে মুখে ছড়িয়ে গেছে। আজ একেবারে চারপাশের গাঁ ভেঙে লোক পড়েছে মাদুলির জন্যে। মাদুলির ব্যাগ খালি—ওষুধও যা ছিল সব শেষ। একেবারে ফরসা। ফেরার পথে আমাদের মেসের ম্যানেজার বিনয়বাবুকে টেলিগ্রাম ক'রে এলুম, টাকাও পাঠিয়েছি কিছু, এক চালান মাদুলি পার্শেল করতে। ওষুধওলাকেও তার পাঠিয়ে দিয়েছি। তোমার এখানে চালান আসবে ভি.পি. হয়ে। এখন আর নড়ছিও না সহজে, তা তুমি মনে মনে যতই গালাগাল দাও!'

বিপ্রদাস হেসে বললে—'গালাগাল আর দেব কেন বলুন! আপনি তো আমার ঘাড়ে চেপে খাচ্ছেন না—এর মধ্যে তো একরাশ টাকা দিলেন!'

'ছাই দিলুম। কী আর দিচ্ছি। তুমি তো নিতেই চাও না।' তারপর গলাটা একটু নামিয়েই বলে সর্বেশ্বর—'তোমার বোনের জন্যে একটা ভাল দেখে কাপড় কিনব ভাবছি। বাবুলাল মাড়োয়ারীকে ব'লেও রেখেছি।'

আস্তে বললেও কথা কানে যায় পুঁটির, সে রান্নাঘরের দাওয়া নিকোতে নিকোতে ব'লে ওঠে—'কেন, আমি কি ঝি? যে ঝি-বিদেয় দেবে? খবরদার দাদা, বারণ ক'রে দিও—'

সর্বেশ্বর মুখ ভ্যাঙায়, 'ইস্, তেজ দ্যাখো না! ফোঁস ক'রেই আছেন মেয়ে। ভট্‌চায্, এ বোন নিয়ে তোমার কপালে বিস্তর দুঃখু আছে তা ব'লে দিচ্ছি।'

'আছে তো আছে, সে বোনের দাদা বুঝবে। পরের অত মাথাব্যথা কেন?'

বিপ্রদাস ধমক দেয়, 'তুই থাম্ দিকি পুঁটি। ভেতরে যা দিকি।'

খাওয়া-দাওয়ার পর সর্বেশ্বর বিড়ি ধরিয়ে আরাম ক'রে শুয়েছে, হুঁকো হাতে ক'রে বিপ্রদাস এসে ঢুকল, 'মুখুজ্জেদা ঘুমুলে নাকি?'

'না না, এসো। ব্যাপার কি? না গড়িয়ে এ ঘরে এলে যে?

'ঘুমটা ঠিক আসছে না। আচ্ছা মুখুজ্জেদা, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

'স্বচ্ছন্দে। একটা কেন, একশটা করো না। ভয় ছেড়ে নির্ভয়ে কও। কী কথা?'

'আচ্ছা তোমার ও মাদুলির মধ্যে আছে কি? সত্যিই কি কোন ওষুধ-বিষুধ কি কোন মন্তর-টন্তর—'

'ছিঃ ভট্‌চায্! জ্ঞানী লোক হয়ে তুমিও একথা জিজ্ঞেস করছ এতদিন পরে?...ওর মধ্যে আছে শুকনো তুলসীপাতা। আর কি থাকবে? বিবেচনা করো, তুলসীর বড় আছেই বা কি? স্বয়ং নারায়ণ যা মাথায় ধারণ করেন?'

'যাই বলো—বাহাদুর ছেলে বটে তুমি!' সপ্রশংস দৃষ্টিতে চেয়ে বলে বিপ্রদাস।

সর্বেশ্বর একটু কৌতুকের সুরেই বলে—'তারপর ভট্‌চায্‌, এটা তো মনে হচ্ছে গৌরচন্দ্রিকা, আসল কথাটা কি ব'লে ফেল দেখি?'

বিপ্রদাস হুঁকোটা হাতে দিয়ে একটু কেশে গলাটা সাফ্‌ ক'রে নিয়ে বলল—'বলছিলুম কি, এখানে তোমার ব্যবসাটা তো একরকম জমেছে ভাল। তা এদেশ ওদেশ না ক'রে এখানেই গোড়া গেড়ে ফ্যালো না।'

'তার মানে? ব্যাপারটা কি খোলসা ক'রে বলো!'

'বলছিলুম যে, চিরকাল তো আর এমন ক'রে ভেসে বেড়ালে চলবে না। তুমি এবার একটি সংসার করো।'

'সংসার? সংসার করব কিহে? বয়স কত হ'ল তার হিসেব আছে? চল্লিশের আর খুব বেশী দেরি নেই যে—'

বিপ্রদাস কণ্ঠস্বরে জোর দিয়ে বলে—'তা হোক, ও বয়েসে আজকাল অনেকেই বিয়ে করছে। বলছিলুম কি, তুমি আমার বোনটিকে নিয়ে সংসার পাতো—না না, কোন ওজর আমি শুনব না, ওকে তোমার পায়ে রাখতেই হবে।'

সর্বেশ্বর অবাক হয়ে বলে, 'অ্যাঁ, কি বলছ হে তুমি? আমাকে দেবে মেয়ে? চাল নেই চুলো নেই, বলতে গেলে জোচ্চুরি ক'রে খাই, তার ওপর বয়সেরও সীমে-পরিসীমে নেই। বোনের আর পাত্তর পেলে না তুমি?'

'পাত্তর আর কোথায় পাচ্ছি বলো ভাই? অনেক খুঁজেছি, একে কালো মেয়ে—তার ওপর আমার পয়সা নেই, এ গাঁয়ে পাত্তর আছে এক ঐ বিড়িওলা সুরেনের ছোট ভাই। কলকাতায় কি একটা চাকরি করে, কোন্ অফিসের বুঝি বেয়ারা। পঞ্চান্নটি টাকা পায়। তাও চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু সুরেন পাঁচশ টাকা নগদ চেয়ে বসল। শুধু তো ঐ টাকাতেও হবে না—আরও তো খরচ আছে—অন্তত দুটি হাজার টাকার কম কাজটা নামবে না।'

সর্বেশ্বর ব্যাকুল হয়ে ব'লে ওঠে—'না না, তুমি অন্য পাত্তর দ্যাখো। ও আমি পারব না ভাই, তা হ'লে আমাকে আজই চলে যেতে হয়।'

'না না, সে কথা নয়, আমি জোর করব না। ভাল ক'রে ভেবে দ্যাখো। কথাটা আমি খারাপ বলি নি।'

বিপ্রদাস বেরিয়ে গেল ঘর থেকে দোর ভেজিয়ে দিয়ে। কিন্তু সর্বেশ্বরের আর ঘুম এল না। এলোমেলো কত কি চিন্তা—সে চিন্তা একসময় কখন পুঁটির প্রসঙ্গে এসে স্থির হয় তা বুঝতে পারে না। এই দেড় মাস ধরে যে নিটোল সেবা পাচ্ছে ওর কাছ থেকে—সেই কথাটাই যেন বেশী ক'রে মনে হয়। বিবাহিত জীবনও কল্পনা করে—পুত্র-কন্যা, পরিপূর্ণ সংসার, আর সেই সঙ্গে একটি মুখরা সেবাপরায়ণা স্ত্রী! কিন্তু কিছুদিন আগে—এই কয়েক সপ্তাহ আগেও—জিনিসটা কল্পনা করতে যতটা অসহ্য লাগত, এখন আর ততটা লাগে না তো। ব্যাপার কী, এ কী হ'ল তার?

ভাবতে ভাবতে কখন বেলা গড়িয়ে গেছে, মধ্যাহ্ন অপরাহ্নে এসে পৌঁছেছে তা টেরও পায় নি সর্বেশ্বর। এমন কি পুঁটি কখন পাশে চৌকির ওপর চা রেখে গেছে তাও দেখতে পায় নি সে। খানিক পরে ঝাঁটা হাতে ক'রে ঘর ঝাঁট দিতে এসে পুঁটি চমকে ওঠে। কারণ অন্যদিন এ সময় ঘরে থাকে না সর্বেশ্বর। চায়ের কাপ নিয়ে গিয়ে বাইরের দাওয়ায় বসা তার নিত্য অভ্যাস। আজ সে ঘরের মধ্যেই তেমনি বসে আছে, কতকটা স্তম্ভিত, বিমূঢ় ভাবে। প্রথম বিস্ময়টা সামলে নিতে না নিতে আরও চমক লাগে পুঁটির।

'ও কি, এখনও চা খান নি? কখন চা দিয়ে গেছি যে! ও চায়ের আর কী রইল? জুড়িয়ে জল হয়ে গেল যে। কিসের ধ্যান করছিলেন চোখ বুজে বুজে? সেই গুরুদেবটির নাকি?'

'অ্যাঁ, কী? চা? কোথায় চা?'

'যা ভেবেছি তাই। চায়ে মাছি পড়েছে। আবার তৈরি করতে হবে।'

'হ্যাঁ, আবার তৈরি করতে হবে না ছাই! দেখি দে, ভারি তো একটা মাছি! ওটা ফেলে দিয়ে খেলেই হবে।'

তার উদ্যত হাতের কাছ থেকে ত্বরিতগতিতে কাপটা সরিয়ে নেয় পুঁটি —'থাক হয়েছে। আপনার ঘেন্নাপিত্তি না থাকতে পারে, আমাদের আছে। মাছি পড়েছে চায়ে তবু সেই চা খেতে হবে, না? তারপর অসুখ করলে কে দেখবে শুনি?'

'মর গে যা। বললুম ভাল কথা, তা পছন্দ হ'ল না। তোকেই তো আবার করতে হবে? খাটুনিটা কার হবে, তাই শুনি?'

'ভারি খাটুনি! এক কাপ চা তৈরি করতে মরে যাব কিনা! তাই মাছি সুদ্ধ চা খাওয়াতে হবে লোককে!'

'মোদ্দা তাড়াতাড়ি ক'রে আনবি। কাজ আছে, এখনই আবার বেরুতে হবে।'

'না, আজ আর বেরুতে হবে না। চা খেয়ে নিয়ে একটু শুয়ে থাকুন দেখি চুপ ক'রে। মুখ-চোখ কেমনধারা হয়ে উঠেছে, নিশ্চয় শরীর খারাপ বোধ হচ্ছে। তা নইলে কেউ বসে বসে ঘুমোয়?'

সর্বেশ্বর ধমক দেবার চেষ্টা করে, 'থাম থাম, মেলা ফ্যাচ-ফ্যাচ করিস নি! তোর শাসনে আমাকে চলতে হবে নাকি?'

'হ্যাঁ, তাই হবে। কৈ যান তো দেখি কেমন যেতে পারেন! আজ বিকেলে বেরুতে পাবেন না।'

সর্বেশ্বর মুখটা গোঁজ ক'রে বলে, 'ভ্যালা বিপদ হ'ল দেখছি! এখানে বাস করা আর চলল না!'

'আচ্ছা আচ্ছা, এখন দয়া ক'রে উঠে একটু মুখে-মাথায় জল দিন দিকি। হাট থেকে আসতে রোদটা বোধ হয় লেগেছে। আমি গরম চা ক'রে আনি, খেয়ে শুয়ে পড়ুন। এমন কিছু রাজ-কাজ্য নেই বাইরে যে না গেলে ন'শো পঞ্চাশ টাকা লোকসান হবে। কাজের মধ্যে তো বিড়ি খাওয়া, তা সেটা ঘরে

বসে খেলেই হবেই। না হয় মেঝেটা আমি আর একবার ঝাঁট দেব।'

'হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেয় সর্বেশ্বর, 'যা খুশি করগে যা। তোর সঙ্গে বকতে পারি না আমি।'

॥ ১৫ ॥

পরের দিন ভোরে উঠে সর্বেশ্বর বেরিয়ে পড়েছিল মাঠে। রাত্রেও ভাল ঘুম হয় নি, কান-মাথা জ্বালা করছে যেন। বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় তাই ঘুরল অনেকক্ষণ ধরে। কথাটা যেন পেয়ে বসেছে তাকে। ভুলতেও পারছে না, ভাবতেও চাইছে না—এই তার অবস্থা। অনেকক্ষণ পর্যন্ত মাঠে মাঠে ঘুরে সবে ঘরে এসে জামাটি ছেড়েছে, পুঁটি এল এককাঁশি মুড়ি আর বেগুনি নিয়ে।

'সকাল থেকে কোথায় এত ঘোরেন? কখন থেকে বেগুনি ভেজে বসে আছি, সময়ের হুঁশ থাকে না?'

'সময়ের হুঁশ থাকে ঠিকই। তবে কি জানিস—' কেমন একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকায় সর্বেশ্বর পুঁটির মুখের দিকে—'আমার জন্যে তো কেউ কোন দিন খাবার তৈরি ক'রে বসে থাকে নি কোন কালে, তাই নতুন অভ্যেসটা হ'তে একটু দেরি লাগে।'

'ঢের হয়েছে। হাত-পা ধুয়ে নিন দিকি তাড়াতাড়ি…'

একটু পরেই আবার চা হাতে ক'রে এসে ঢোকে পুঁটি, 'ওকি, খেতেই শুরু করেন নি এখনও?'

'খাচ্ছি খাচ্ছি। পুঁটি, একটা কথা মনে পড়ে গেল রে, তাই ভাবছিলুম।'

'কী কথা?'…উৎসুক নেত্রে চায় পুঁটি।

'তোর দাদা যে আমার সঙ্গে তোর বিয়ে দিতে চায় রে।'

'ধ্যেৎ!' পুঁটি চায়ের কাপটা তখন সবে নামিয়ে রাখছিল, হাত কেঁপে চলকে খানিকটা চা পড়ে গেল।

'হ্যাঁ রে, বলছিল।'

'ও আবার কি অসভ্য ঠাট্টা! ওসব আমার ভাল লাগে না।'

'মাইরি বলছি, ঠাট্টা নয়। আচ্ছা সত্যিই যদি বিয়ে হয়—আমাকে তোর পছন্দ হবে?…'

পুঁটি আগুনের মতো রাঙা হয়ে উঠেছিল। সে ঠকাস ক'রে চায়ের কাপটা বসিয়ে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যেতে যেতে ব'লে গেল—'জানি নে। অত বাজে কথা আমি বকতে পারি না।'

'সর্বেশ্বর অবাক হয়ে সেদিকে চেয়ে রইল। কারণ বিরক্তি নয় লজ্জা নয়—কে যেন সুখেরই একটি অঞ্জন মাখিয়ে দিয়েছে পুঁটির নিরস কঠিন মুখে।তাহ'লে কি পুঁটি তার মতো লোককেও—?

সেদিনও দুপুরবেলা হুঁকো হাতে ক'রে বিপ্রদাস এসে বসল—'মুখুজ্জেদা, কি ঠিক করলে ?'

সর্বেশ্বর অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইল। তারপর বললে—'এত তাড়াতাড়ি কেন ?'

বিপ্রদাস হুঁকোটা একরকম ফেলে দিয়েই ওর হাত দুটো চেপে ধরল, 'ভাই, মনটা যখন টলেছে তখন আর দেরি ক'রো না। আমি পুরুতঠাকুরকে দিয়ে পাঁজি দেখিয়েছি, সামনের হপ্তাতেই দিন আছে।'

'না না, ভট্‌চায্‌। আর দুটো দিন যাক। কথাটা আর একটু ভেবে দেখি।' ব্যাকুলকণ্ঠে বলে সর্বেশ্বর।

'রেখে দাও দিকি ওসব ভাবাভাবি! মিছিমিছি সময় নষ্ট। পিসিমার মত নিতে হবে ? তা যদি হয়, ঠিকানা দাও—আমি ঘুরে আসি!'

'না না। বাপ রে, সেখানে বনমালী ঘোষাল আছে। মত লাগবে না। আমি বিয়ে করলেই পিসিমা খুশি।'

'তবে আর কি! ওই ঠিক রইল।'

'মাইরি ভট্‌চায্‌, এখনই যেন এসব কথা নিয়ে পাঁচকান ক'রো না। আর একটু...।'

তার কথা শেষ করতে না দিয়েই বিপ্রদাস ব'লে উঠল, 'ক্ষেপেছ তুমি ? এখন পাঁচকান করতে আছে ? এমনিতেই তো ব্যাটারা হিংসেয় মরে যাচ্ছে, তার ওপর একথা শুনলে আর রক্ষে আছে ?'

তবু কথাটা চাপা থাকে না। এসব কথা কী ক'রে ছড়িয়ে পড়ে—তা বোধ করি আজও কেউ জানে না। বিপ্রদাসের অনুপস্থিতিতে বিলক্ষণ ঘোঁট হয়। সুরেন বলে—'দেখলে ব্যাপার, বিপ্রদাসকে তোমরা যতটা ভালমানুষ ভাবো ততটা নয়!'

হরিশ বলে—'ওকে চিনতে তোমাদের এখনও দেরি আছে! ও যে কত মতলবে ঘোরে! ভিতভিতে ডান—ছেলে খাবার রাক্কস! কম দুইছে নাকি লোকটার কাছ থেকে ? আজকাল হাটে গেলে বিপ্রদাস সকলের বড় মাছটা কেনে। আগে দু পয়সার পুঁটি মাছও জুটত না।'

সুরেন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—'যে যার দিন কিনে নিচ্ছে। শুধু আমরাই যে তিমিরে সেই তিমিরে রইলুম।'

ওদিকে মেসে একদিন বিনয়বাবু প্রদোষকে ডেকে বলেন, 'ওহে প্রদোষবাবু, শোন শোন—আমাদের মুখুজ্জের পাত্তা পাওয়া গেছে।'

'কী রকম, কী রকম ?' আরও দু-চার-জন ভিড় ক'রে আসে।

'এই যে, আমাকে হঠাৎ একটি এম-ও পাঠিয়েছে পঁচিশ টাকার। দু'গ্রোস তামার খালি মাদুলি পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়। সাবাস্‌! এত রকমও জানে বাবা! কোথায় কী আবার এক বুজরুকি কারবার ফেঁদে বসেছে!'

'আপনি কী করলেন ?'

'আমার এক বন্ধু এইসব কারবার করে, তাকে দিয়ে দিয়েছি, এতক্ষণ চলেও গেছে বোধহয়।'

প্রদোষ বলে, 'বিনয়বাবু, ভাই—ঠিকানাটা আমার একটু চাই যে!'

'কেন হে, কি করবে ?'

'সেই ঘোষাল বুড়োকে দিতে হবে যে!'

'কি হবে ? না না, দরকার নেই। মিছিমিছি, একটা কারবার ফেঁদে বসেছে, শুধু শুধু আবার সেখান থেকেও পালাতে হবে!'

'না না, বুঝছেন না, আমি তিন সত্যি করেছি বুড়োর কাছে। আর আপনাদের বাঁচবার জন্যেই সেটা করতে হয়েছে, নইলে কি সে উঠত! আপনাদেরও কতকটা মোরাল রেস্‌পন্‌সিবিলিটি আছে।'

'তবে নাও'—অনিচ্ছাসত্ত্বেও টেলিগ্রামটা ওর হাতে দেন বিনয়বাবু।

দুপুরে খেতে বসে সর্বেশ্বর খুশি হয়ে ওঠে—'আরে, এ শুষনি শাকের ডালনা কোথা থেকে এল ?'

ঘরের ভেতর থেকে পুঁটির মা উত্তর দেন—'ও মেয়ের কীর্তি বাবা। তুমি নাকি খেতে ভালবাস, তাই আজ একবেলা ধরে মণ্ডলদের পুকুর থেকে শাক তুলেছে।'

'আমি খেতে ভালবাসি সে কথা আবার কে বললে ?'

'তুমি নাকি কবে খোকাকে বলেছিলে খেতে বসে—'

'ও হ্যাঁ হ্যাঁ', বিপ্রদাস বলে ওঠে—'সেই যে সেদিন বললে কলমীশাক খেতে খেতে…'

পুঁটি ভেতরে চাপাগলায় ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে—'তোমার কি কোন কাজকম্ম নেই মা ? এত বাজে কথাও বকতে পারো!'

হাঃ হাঃ ক'রে হেসে ওঠে বিপ্রদাস। কিন্তু সর্বেশ্বর কেমন যেন গুম্ হয়ে যায়। সেদিনও দুপুরে ঘুমোতে পারে না এক ফোঁটা। কত কি এলোমেলো চিন্তা মাথায় এসে মাথা গরম ক'রে দেয়।

বিকেলে ঘুরতে ঘুরতে এক সময় কেষ্টধনের দোকানে গিয়েই বসে সর্বেশ্বর—'দাও হে কেষ্টধন, এক গেলাস তোমার ঐ তেতো চা।'

'এই যে আসুন, আসুন মুখুজ্জেদা।' কোঁচার খুঁট দিয়ে বেঞ্চিটা ঝেড়ে ওকে খাতির ক'রে বসতে দেয় কেষ্টধন। তখন দোকানে আর কেউ নেই। ছোট্ট মোটা কাঁচের গেলাসটিতে খানিকটা কড়া চা তৈরি ক'রে এনে ওর সামনে টেবিলের ওপর রেখে কেষ্টধনও পাশে বসে পড়ে। তারপর গলাটা নামিয়ে বলে—'সত্যি মুখুজ্জেদা, কথাটা শুনে যে কী আনন্দ হ'ল—'

সর্বেশ্বর ভ্রূটা কুঁচকে জবাব দিলে—'অমন হয়। কারুর সর্বনাশ, আর কারুর পৌষ মাস! আমাকে খ'য়ে বন্ধনে জড়াতে না পারলে বুঝি তোমাদের সুখ নেই ?'

'না, তা নয়। তা কেন বলছ? চিরকাল কি আর একভাবে কাটে? ক্রমশ শরীর ভেঙে আসবে। তখন মনে হবে একটু আরাম চাই। এ তো ভালই। ঘুরতে চাও, আশেপাশে ঘুরে বেড়িও। কিন্তু একটা আস্তানা তো রইল।'

সর্বেশ্বর গম্ভীরমুখে চায়ে একটা লম্বা চুমুক দিয়ে বললে—'হুঁ, তা বটে।'

কেষ্টধন উৎসাহিত হয়ে বলে, 'তা শোন, আমি বলি কি বন্ধন যখন হ'লই, তখন ভাল ক'রেই সংসার পাতো দাদা। শ্বশুরের ঘরে বারোমাস থাকাটা ভাল নয়। ঐ ডাঙাটার ওপাশে একটা ঘর তুমি নিজে তুলে নাও।'

সর্বেশ্বর অনেকক্ষণ চুপ ক'রে বসে থেকে আবারও বলে—'হুঁ, দেখি—'

সন্ধ্যেরও অনেক পরে সর্বেশ্বর বাসায় ফেরে। বিপ্রদাস যেন একটু উৎকণ্ঠিত হয়েই বসে ছিল বাইরের দাওয়ায়। ওকে দেখে বলে উঠল—'এই যে, কোথায় ছিলে এতক্ষণ?'

'না, এমনি—'

'এমনি? তার মানে?'

'ওহো হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে—এই একটু ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম। আচ্ছা ভট্‌চায্‌, সুরেন কত টাকা চেয়েছিল তোমার কাছ থেকে? মানে ওর ভাইয়ের জন্যে—তিনশো?'

বিপ্রদাস সন্দিগ্ধ ও শঙ্কিত কণ্ঠে বললে, 'না পাঁচশো—কিন্তু সেসব কথা আবার তুলছ কেন ভাই?'

সর্বেশ্বর বললে—'না, হঠাৎ মনে এল তাই—'

'না না, ওসব পাত্রে আর আমার দরকার নেই। পঞ্চান্নটি টাকা তো মোটে পায়। শহরবাজার জায়গা, সেখানে বাসা ক'রে থাকতে হয়। কী বা থাকে যে সংসার চালাবে!'

বিপ্রদাস চলে গেল। সর্বেশ্বর নিঃশব্দে বসে খানিকক্ষণ বিড়ি টানবার পর বেশ একটু হেঁকে ডাক দেয়, 'পুঁটি, এই পুঁটি শোন একবার!'

পুঁটি এসে দোরের কাছ থেকেই জিজ্ঞাসা করল—'ডাকছিলেন নাকি? এত রাত্তিরে কিন্তু আর চা দেব না, তা ব'লে রাখছি।'

'না না, চা নয়। শুনে যা একবার। একটা কথা আছে।'

পুঁটি ভেতরে এসে দাঁড়াল—'কী কথা?'

মুহূর্ত-কয়েক ওর মুখের দিকে চেয়ে থেকে সর্বেশ্বর বলল—'দ্যাখ, তোকে যা জিজ্ঞেস করব—ঠিক ঠিক জবাব দিবি! খুব জরুরী কথা কিন্তু। বল্ দিবি!'

'মিছে কথা আমি বলি নে। সে অব্যেস আমার নেই।'

'আচ্ছা বিড়িওলা সুরেনের যে ভাইয়ের সঙ্গে তোর বিয়ের কথা হয়েছিল—তাকে তুই দেখেছিস? বল্ বল্, উত্তর দে। লজ্জা করবার কিছু নেই।

'দেখেছি।'

'সে আমার চেয়ে ভাল দেখতে না খারাপ দেখতে রে ?'

পঁুটি এবার অস্ফুটকণ্ঠে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে—'জানি না যাও—'

'সত্যি পঁুটি আমার মাথা খাস—ঠিক ক'রে বল !'

'ওসব কথা আমি বলতে পারব না। আর কিছু বলবার থাকে তো বলুন ? উনুনে ভাত ফুটছে আমার।' সে চলে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়ায়।

'যাস নি, যাস নি পঁুটি, দাঁড়া একটু—আচ্ছা কত বয়েস হবে রে তার ? তেইশ-চব্বিশ ?'

'ঐ রকমই হবে হয়ত—' অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে উত্তর দেয় পঁুটি।

'তার স্বভাব-চরিত্র কেমন রে ?'

'লোকে তো বলে খুব ভাল ছেলে। কিন্তু আমি আর বকতে পারব না, ভাত পুড়ে গেল বোধহয়।'

'হঁু। আচ্ছা যা তুই।'

॥ ১৬ ॥

পরের দিন হাটবার। নতুন মাল এসে পেঁাচেছে সর্বেশ্বরের। ভিড়ও খুব। মামলার মাদুলিরই চাহিদা বেশী। এ ছাড়া আছে ছেলে হবার—ছেলে না হবার। এক বৃদ্ধ এসে বলে, 'দাদা, ছেলের বৌটি আবার পোয়াতি হয়েছে; ছেলে না হয়ে মেয়ে হয়, এমনি করা যায় না ? এমন কোন মাদুলি আছে নাকি ?

সর্বেশ্বর অবাক হয়ে প্রশ্ন করে—'সে কি, ছেলেই তো ভাল ! মেয়ে কী হবে ?'

মুচকি হেসে লোকটি উত্তর দেয়—'মেয়েকে একবার খরচ ক'রে পার করলেই চলে যায়। ছেলে থাকলে বিষয় ভাগ হবে। ভাগ হ'তে হ'তে শেষে কিছুই যে থাকবে না। হেই দাদা—অনেক দূর থেকে এসেছি অনেক খরচা ক'রে। একটি মাদুলি ক'রে দাও লক্ষ্মী ভাই।'

আর একজন একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন—'মামার বিষয় আমারই পাবার কথা। এতকাল তাই শুনে এসেছি। মামার ষাট পেরিয়ে যেতে নিশ্চিন্ত হয়ে এসে বসেছি চাকরিবাকরি ছেড়ে। এখন শুনছি মামীর ছেলে হবে। এর একটা ব্যবস্থা হয় না দাদা ? আমি বেশ কিছু ধরে দেবো।'

সর্বেশ্বর খানিকটা চোখ বুজে দাঁড়িয়ে থেকে প্রশ্ন করে, 'মাদুলি মামীকে পরাতে পারবেন ?'

'কেন, মানে আমি যদি পরি—কি আমার বৌ পরে ?'

'আপনি মাদুলি পরবেন—আপনার মামীর ছেলে নষ্ট হবে !'

'সঙ্কটমোচন মাদুলি আপনার—এর চেয়ে আর কী সঙ্কট আছে বলুন ?'

'তা বটে। তাও আছে। তবে পঁাচিশটি টাকা লাগবে, দেখুন। এসব অর্ডিনারি মাদুলির মারক শক্তি থাকে না।'

'পঁচিশ টাকা! আচ্ছা দেন তাই—কিন্তু কাজ হবে তো?'

'তা বলতে পারব না ভাই। গুরুর মাদুলি, আমি তো বাহক মাত্র।'

বিপ্রদাস ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়েছিল। সব শুনে বলে—'যদি কাজ না হয়, এরপর এসে যদি বলে বেশী দাম নিয়েছিলে, কাজ হ'ল না কেন?'

সর্বেশ্বর প্রশান্ত মুখে উত্তর দেয়—'তখন বলব তোমার মামী কোন বেশী শক্তিশালী মাদুলি পরেছিলেন নিশ্চয়। সে কোন ভাবনা নেই, সেদিকেও অবশ্য মাদুলি আছে। বুড়ো বয়সের ছেলে—এতদিনে কি আর চারটে মাদুলি ঝোলায় নি ওর মামী?'

দুপুর নাগাদ ভিড় করতে সুরেন এসে জেঁকে বসে ওর পাশে।

'কী হে, সুরেনচন্দর যে! কী মনে ক'রে? কেমন আছ?'

সুরেন মাথাটা চুলকে বলে—'তা দাদা, সত্যি কথা বলব? তোমার মাদুলিটা পরে ইস্তক দিন আমার ভালই যাচ্ছে!'

'বেশ, বেশ দেখি। একটা বিড়ি বার করো।'

শশব্যস্তে বিড়িটা দিয়ে সুরেন বলে, 'কিন্তু দাদা—আর একটু পয়সার সচ্ছল না হ'লে তো চলছে না। বামুনের ছেলে, কত দিন আর বিড়ি পাকাই বলো তো?'

'বিড়ির কারবারে আর কত আসবে বলো? বরং লটারির টিকিট কেন, যদি কিছু আসে!'

সুরেন আরও গলা নামায়। প্রায় ফিসফিস ক'রে বলে—'কিনেছি দাদা একটা টিকিট—দু টাকা দিয়ে। সেই জন্যেই তো তোমার কাছে আসো। তোমার গুরুদেবের এমন কোন মাদুলি নেই, যাতে ওটা নির্ঘাৎ লেগে যায়!'

আছে, কিন্তু তার দাম কে দেবে? সে মাদুলির দাম দিতে গেলে তোমার বিড়ির দোকান বেচতে হবে যে। তাতেও কুলোবে না।'

'কত দাম দাদা?' সুরেন সোৎসুকে তাকায় ওর মুখপানে।

সর্বেশ্বর একবার ওর মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে বললে—'আড়াই'শটি টাকা লাগবে। অভীষ্টসিদ্ধি মাদুলি বলে ওকে। যে-কোন অভীষ্ট ক'রে সে মাদুলি পরলে তাই সিদ্ধ হবে। কিন্তু ঐ একবারই।'

'একেবারে অত টাকা! তার কমে আর কোন জিনিস নেই?'

'উঁহু—' গম্ভীরভাবে ঘাড় দোলাতে দোলাতে বলে সর্বেশ্বর।

'একটু দ্যাখো না দাদা ভেবেচিন্তে।'

'হবার জো নেই ভাই। ঐজন্যেই তো বললুম তোমাকে যে তুমি পারবে না।'

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ বসে রইল। তারপর হঠাৎ সুরেন ওর দুটি হাত চেপে ধরলে, 'দোহাই দাদা, দুশোটি টাকায় মাদুলিটি আমায় ক'রে দাও। দিতেই হবে তোমাকে।'

'সে ভাই বোধহয় পারব না।'

'দোহাই দাদা, আমার ছোটভাই এই টাকাটা পাঠিয়েছে একটা জমি কেনার

জন্যে। তার এতদিনের সঞ্চয়—সেই থেকেই দিচ্ছি এখন,আর কিছু নেই।'

'দেখি গুরুদেবকে ব'লে। কিন্তু কেন একাজে যাচ্ছ ভাই? পরের টাকা ভেঙ্গে—যদি কোন ফল না হয়, তখন তো আমাকে গালাগাল দেবে!'

'সে আমার অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে। তোমাকে দোষী করব না, কথা দিচ্ছি।'

'তা হ'লে আজই গুরুদেবকে টাকাটা পাঠিয়ে একটা চিঠি লিখে দিতে হয়। ওর আবার একটা বিশেষ হোম আছে কিনা।'

'তুমি চিঠি লিখে দাও। আমি সন্ধ্যের মধ্যে নিশ্চিত তোমাকে টাকাটা পৌঁছে দেব, তা হ'লেই হবে তো?'

'আচ্ছা তাই দাও।...কিন্তু আমি এর কোন দায়িত্ব নিচ্ছি না, মনে থাকে যেন।'

সুরেন আবারও একদফা আশ্বাস দিয়ে চলে গেল। কিন্তু সর্বেশ্বর বহুক্ষণ সেখানে স্থির হয়ে বসে রইল, তার চোখে অদ্ভুত একটা দৃষ্টি।

হাট থেকে ফিরতে পুঁটি ধমক দিয়ে ওঠে—'আজ আর কি তোমাদের বাড়ি ফেরবার কথা মনে ছিল না দাদা? সুয্যি যে পাটে বসেছে! গরমজল বসিয়ে রেখেছিলুম—সে জল ফুটে ফুটে মরে গেল।'

'থাক গে, আজ আর গরম জলে দরকার নেই। আমিও ভট্চাযের সঙ্গে পুকুর থেকে ডুব দিয়ে আসি গে।'

'হ্যাঁ, তা আর নয়! শহরের মানুষ, অব্যেস নেই, একদিনের জন্যে পুকুরের জলে চান ক'রে জ্বরে পড়ুন আর কি! তখন দেখবে কে? কতক্ষণই বা লাগবে? তামাক খেতে খেতে আমার জল গরম হয়ে যাবে।'...

সেদিনও সারাদুপুর ঘুমোতে পারল না সর্বেশ্বর। খানিকটা ছটফট ক'রে তিনটে বাজবার আগেই বাইরের দাওয়ায় গিয়ে বসল। বিপ্রদাস দোকানে যাবার জন্যে বেরিয়ে ওকে ঐ অবস্থায় বসে থাকতে দেখে বললে—'কৈ, ঘুমোও নি মুখুজ্জে?'

'ঘুমটা এলো না ঠিক। তারপর চললে?'

হ্যাঁ, কাল মনে করেছি সকালের ট্রেনেই কলকাতা চলে যাবো। তাই কাজকর্ম সব এখন থেকে গিয়ে বুঝিয়ে দিইগে।'

'কেন, কলকাতা কেন?'

'বাঃ, বাজার-হাট চাই না? এমনিই তো মা বকাবকি করছেন—পরশু বিয়ে, কালও বাজার না করলে চলবে কেন?'

'পরশু—মানে, এই পরশুই?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। কাল বাদে পরশু। বলে—যার বিয়ে তার মনে নেই—পাড়া-পড়শীর ঘুম নেই!' হেসে বিপ্রদাস চলে যায়।

সর্বেশ্বরের যেন বিড়িও ভাল লাগে না। ঘর-বার করে সে।

পুঁটি চা এনে চৌকির উপর রেখে যাচ্ছিল, হঠাৎ সর্বেশ্বর ওর পথ আগলে দাঁড়াল।

'দাঁড়া একটু, কথা আছে।'

পুঁটি অবাক হয়ে তাকাল, রাঙাও হয়ে উঠল একটু।

'আচ্ছা আমি মানুষটা কেমন রে?'

'ও আবার কি কথা? মানুষ মানুষের মতোই! হাত চোখ কান নাক সবই তো আছে দেখছি।' পুঁটি মুখ টিপে হাসে একটু।

'আচ্ছা আমাকে তোর ঘেন্না করে, না? ঠিক ক'রে বল্ পুঁটি। তুই তো মিছে কথা বলিস না।'

'কী হয়েছে আজ আপনার বলুন তো? মাথাটাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি?'

'না রে, মাথা খারাপ নয়। আচ্ছা পুঁটি, তোর সঙ্গে তো আমার বিয়ে হচ্ছে। আমি তো এই মানুষ—নোংরা, জঙ্গুলি, বুজরুক। আমাকে তোর ঘেন্না করবে না? ঠিক করে বল্—'

'কত কথাই জানেন আপনি! সরুন—মা ডাকছেন।'

পুঁটি একরকম ওকে ঠেলেই বেরিয়ে যায়।

সর্বেশ্বর হতাশ হয়ে এসে চৌকিতে বসে।

পরের দিন অন্ধকার থাকতে থাকতে সর্বেশ্বর উঠে পড়ে। বিপ্রদাস তখনও ঘুমোচ্ছে। পুঁটির মা ঘাটে গেছেন। পুঁটি সবে উঠে উঠোনে ছড়া দিচ্ছে। সর্বেশ্বরের সারারাত ঘুম হয় নি। দুই চোখ লাল। উদ্ভ্রান্তের মতো চেহারা। সর্বেশ্বর ইশারা ক'রে ওকে ডাকল—'এই পুঁটি শোন, এদিকে একবার শুনে যা।'

পুঁটি ছড়ার হাঁড়িটা নামিয়ে রেখে কাছে আসে—'এত ভোরে আজ উঠেছেন যে! এ কী, জামাটামা গায়ে দিয়ে চললেন কোথায়? দাদা তো এখনও ঘুমুচ্ছে!'

'তা ঘুমুক। শোন তুই, যা বলছি মাথা ঠাণ্ডা ক'রে শুনে রাখ। এই নে ধর—এই কাগজের মোড়কটাতে পাঁচশ টাকার নোট আছে। দাদা উঠলে তাকে দিয়ে বলবি যে আমি এটা দিয়ে গেছি—তোর বিয়ের যৌতুক। সুরেনের ভাইয়ের সঙ্গেই যেন তোর বিয়ে দেয়।'

পুঁটির মুখ বিবর্ণ হয়ে ওঠে। সে কোনমতে ঢোঁক গিলে বলে—'ওকি? এসব কি—তুমি…'

'আমি চললুম।'

'চললে কী? আমি দাদাকে ডাকি—'

'চুপ চুপ। তোর পায়ে ধরছি পুঁটি, গোল করিস নি। ভেবে দ্যাখ, আমার সঙ্গে বিয়ে হ'লে তোর দুর্গতির শেষ থাকবে না। তোর ভালর জন্যই আমি চলে যাচ্ছি। তোর কাছে যে সেবা আর যত্ন পেয়েছি এ দুমাস—জীবনে কখনও তা পাই নি। এ কথা আমার মরণকাল পর্যন্ত মনে থাকবে। তার বদলে তোর এমন সর্বনাশ আমি করতে পারব না।'

'সর্বনাশ!' কোনমতে পঁুটির কণ্ঠ ভেদ ক'রে প্রশ্নটা বেরিয়ে আসে।

'তা নয় তো কি! এই তো চেহারা আমার, বয়সের গাছপাথর নেই। তা ছাড়া সংসারে আমি কোনদিন আটকে থাকতে পারব না। কোন দিন মনে হবে—কোথায় চলে যাবো। শেষকালে তোকে দিনরাত চোখের জলে ভাসতে হবে। তার চেয়ে আমি চললুম—ভট্চায্‌কে বুঝিয়ে বলিস, ঐ সুরেনের ভাইয়ের সঙ্গেই যেন সব ঠিক করে।'

সর্বেশ্বর ছুটেই বেরিয়ে যাচ্ছিল, পঁুটি পেছন থেকে ডাকল—'শোন শোন, একটু দাঁড়িয়ে যাও।'

সর্বেশ্বর ফিরে দাঁড়ায়—'কী আবার?'

'এই টাকাটা নিয়ে যাও। এতে আমাদের দরকার নেই।'

'তার মানে?'

'আমরা কি ভিখারী যে ভিক্ষে দিয়ে যাচ্ছ? আমাকে তোমার পছন্দ হয় নি, আমাকে নিয়ে ঘর করতে ঘেন্না করবে—কথাটা স্পষ্ট ক'রে বললেই তো পারতে। নিয়ে যাও তোমার টাকা—আমার অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে।'

সর্বেশ্বর বিমূঢ় দৃষ্টিতে খানিকটা চেয়ে রইল ওর দিকে—'এই দ্যাখ্, এসব কথা আবার তোর মাথায় ঢুকল কী ক'রে! আমি তো তোর ভালর জন্যেই···মানে অল্পবয়সী সুন্দর বর হবে, সেই জন্যেই তো—'

'চাইনে আমার ভাল। আমার ভাল কে ভাবতে বলেছে?'

সর্বেশ্বরের চোখমুখে ফুটে ওঠে অকৃত্রিম বিস্ময়—'হ্যাঁরে, তা হ'লে কি তুই আমাকেই—সত্যি ক'রে বল্ দিকি?'

'জানি না, যাও।' পঁুটির কণ্ঠস্বর কেঁপে ওঠে বার বার, 'অত ন্যাকামি আমার ভাল লাগে না। যেতে হয় যাও, দাদাকে ডেকে দিচ্ছি, যা বলতে হয় তাকেই ব'লে যাও। মোদ্দা টাকা দিয়ে আমাকে ভোলাতে যেও না, ঐ টাকায় আমি তা হ'লে তোমার সামনেই আগুন ধরিয়ে দেবো।'

সর্বেশ্বর ধপাস ক'রে দাওয়ার সিঁড়িটার ওপর বসে পড়ল।

'তাই তো, এ আবার কী ফ্যাঁসাদ! এ যেন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে!'

বিপ্রদাস চোখ মুছতে মুছতে ঘর থেকে বেরিয়ে এল, 'কৈ রে, আমাকে ডেকে দিস্ নি? দ্যাখ্ দিকি, ভোরের গাড়ির সময় হয়ে এল। একি, মুখুজ্জে? এরি মধ্যে উঠে পড়লে?'

'উঠে আর পড়লুম কৈ ভাই! নেমেই পড়লুম—গভীর গাড্ডা!'

'কী, হ'ল কি? কী বলছ?'

'আর কি বলছি! কঠিন মায়া ভাই—ভীম জাল। নাও যাও কলকাতায়, আর কি! দেখি পঁুটি, তামাক দে।' তারপর গলাটা নামিয়ে পঁুটিকে বলে, 'মোদ্দা আমি আমার দায়ে খালাস। আমাকে যেন এরপর দোষ দিস না।'

বিপ্রদাস জামা-কাপড় পরে বেরোতে যাবে, তার হাতে দুশোটা টাকা দিয়ে সর্বেশ্বর বললে, 'এই টাকাটা ভট্চায্ আমার নাম ক'রে সুরেনকে দেবে।'

'কেন বলো তো? এ টাকা—মানে—'

'মানে পরে বুঝবে। ওকে বলো যে, গুরুদেব স্বপ্নে আমাকে আদেশ করেছেন টাকাটা ওকে ফিরিয়ে দিতে। ওর অর্থপ্রাপ্তি-যোগ এখনও আসে নি।'

॥ ১৭ ॥

প্রদোষের চিঠি পৌঁছেছিল কিছু বিলম্বে।

বনমালী ঘোষাল বাড়ি ছিলেন না। মেয়ের জন্যে পাত্রের খোঁজেই গিয়েছিলেন গোয়াড়ী। সেখানে সুবিধা হয় নি। মেয়ে তাদের অপছন্দ না হ'লেও পাড়ায় খোঁজখবর ক'রে পেছিয়ে গেছে তারা। স্পষ্টই ব'লে দিয়েছে যে, 'ওর চেয়ে ডোমপাড়া থেকে মেয়ে আনলেই তো হয়! মেয়ে আর মেয়ের মা'র গলায় শুনেছি পাড়ায় কাক-চিল বসে না! জেনেশুনে ও মেয়ে আমরা ঘরে আনতে পারব না ঘোষাল মশায়।'

সুতরাং ঘোষালের মেজাজ খারাপ। তার ওপর বাড়িতে ঢুকতেই গৃহিণী খর্‌খর্‌ ক'রে উঠলেন, 'যেখানে যাবে বাঘের মাসী! বাড়িতে আর ঢুকতে ইচ্ছে করে না, না? চিঠিখানা এসে দুদিন ধরে পড়ে আছে—কোন ব্যবস্থাই করা হচ্ছে না। নাও এখুনি একবার যাও দিকি ওর পিসির কাছে!'

বোমার মতো ফেটে পড়েন বনমালী।

'আমি পারব না—পারব না। যা খুশি কর্‌ গে যা!···লজ্জা করে না মুখ নাড়তে? এমন সুনাম যে এখান থেকে গঙ্গা পেরিয়ে সেই গোয়াড়ী পর্যন্ত তার বাস ছড়িয়েছে। তোমার ও খাণ্ডারণী মেয়েকে কেউ বে করবে না।···কেন, এত পারো—নিজে যেতে পারো নি সেখানে?'

'হ্যাঁ, সেইটে বাকী আছে। বেশ তো, তাও যাবো। কিন্তু তুমি বেঁচে থাকতে আমি এ কাজে বেরোলে লোকে বলবে কি? তুমি আগে গলায় দড়ি দাও, তোমাকে খালে ভাসাই, তারপর আমি বেরিয়ে মেয়ের বে দিতে পারি কি না দেখি!' চীৎকার ক'রে হাত পা নেড়ে বাড়ি মাথায় করেন তিনি।

অগত্যা বনমালী ঘোষালকেই শেষ পর্যন্ত বেরোতে হয়।

তবে এবার তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সর্বেশ্বরের পিসিমাকে না নিয়ে তিনি যাবেন না। সেখানেও একদিন দেরি হ'ল। পিসি ঘরদোরের একটা ব্যবস্থা না ক'রে তো আর বেরোতে পারেন না। ফলে ওঁরা যেদিন রওনা দিলেন সেই দিনই এখানে সর্বেশ্বরের বিয়ে।

বিয়েটা কিছুতেই এড়ানো গেল না, বসে বসে দেখতেই হ'ল সর্বেশ্বরকে, কেমন ধীরে ধীরে তার চারপাশ ঘিরে পুরুভুজের বাহুপাশের মতো সংসারের বাঁধন চেপে বসছে।

যতক্ষণ ভবিতব্যের সঙ্গে লড়াই করেছিল, যতক্ষণ আশা ছিল মুক্তি পাবার ততক্ষণ একরকম—কিন্তু হার মানার আর হাল ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই মনটা আশ্চর্যরকম শান্ত হয়ে গেল। একটা স্বস্তির ও আরামের ভাবই বোধ হ'ল।

এবং আরও কিছু পরে লক্ষ্য করল যে এই উদ্যোগ আয়োজন, এদের এই ব্যস্ততা ভালই লাগছে তার। শুধু ভাল লাগা নয়—আসন্ন বিবাহের পাত্রী বা কনে তার সামনে আর আসতে পারছে না—তবু অলক্ষ্যে থেকেও যে তার প্রতিটি প্রয়োজন ও স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে নজর রাখছে—এটা অনুভব ক'রে ভারী একটা আশ্বাসও যেন বোধ করল। বুঝল যে আসল বন্ধনটা আরামের—বহুদিনের তৃষার্ত পথিক স্বচ্ছ শীতল সরোবরের সন্ধান পেয়েছে, সেখান থেকে আর নড়তে চাইছে না তার মন।…

অবশ্যম্ভাবীকে মেনে নেবার সঙ্গে সঙ্গে সে সক্রিয় হয়ে উঠল। তার বশম্বদ কেষ্টধনকে ডেকে চিঠি লিখে পাঠাল তার প্রাক্তন মেসে, বিনয়বাবু যেন ভাল একখানা বেনারসী ও দুগাছা বালা কিনে আর সবাইকে নিয়ে বৌভাতের দিন এখানে আসেন, এসে পৌঁছলেই সে টাকা দিয়ে দেবে। এখানে চরণকে ডেকে সে বৌভাতের বাজার করার ফর্দ ও খরচা বুঝিয়ে দিল। সেই সঙ্গে পিসিমাকেও একটা 'তার' করে দিল—যদি পারেন তো কাউকে যেন সঙ্গে নিয়ে চলে আসেন।…

উদ্যোগ আয়োজন শেষ—বিয়ে শুরু হয়ে গেছে, মন্ত্রপড়া চলছে, সর্বেশ্বরের হাতের ওপর পুঁটির হাত—এমন সময় হুড়মুড় ক'রে পিসিমাকে নিয়ে উঠোনে এসে ঢুকলেন বনমালী ঘোষাল।

স্টেশনে নেমে বিপ্রদাসের বাড়ি জিজ্ঞাসা করতেই তাঁকে একজন বলেছিল,—'তেনার যে আজ বোনের বে! ঐ মুখুজ্জের সঙ্গে!'

বনমালী সে কথায় কান দেন নি, বরং ভ্রূকুটি ক'রে বলেছেন—'উঃ, মুখুজ্জের সঙ্গে তেনার বোনের বে! ওসব চালাকি তো চলবে না বাবা! আমার উচ্ছুগ্যু-করা জিনিস, আমি আগে আশীর্বাদ করেছি—দেখি কে তাকে ধরে কার বোনের সঙ্গে বে দেয়? চলে আসুন গো বেয়ান ঠাকরুন!'

কিন্তু এখানে এসে এই দৃশ্য দেখে থমকে দাঁড়াতে হ'ল একটু।

'এ-হে হে! মেরে দিলে—ঝুল কেটে বেরিয়ে গেলে বাবা সত্যি সত্যিই?'

তারপর সামনে এসে পুঁটির দিকে তাকিয়ে দেখে বললেন, 'তা আমার তো যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন, বলি মেয়েকে পার করতে পারি কিন্তু মেয়ের মাকে তো আর পারব না! আমার দুঃখ ঘোচায় কে? মোদ্দা তুমি হয়ত জিতেই গেলে শেষ পর্যন্ত। এ মেয়ে আমার মেয়ের মতো জাঁহাবাজ হয় তো দাঁড়াবে না। মরুক গে যাক—বাবাজী, অনেক দুঃখ দিয়েছ, পয়সাকড়িও নেহাৎ কম খরচ হয় নি। মেয়েটার যদি পাত্তর মেলে তো খরচাপত্তর্ কিছু দিও।'

বরাসন থেকেই ঘাড় হেলিয়ে সর্বেশ্বর রাজী হয়ে গেল।

সমাপ্ত

সুপ্তিসাগর

উৎসর্গ

শ্রীগিরীন্দ্র সিংহ

কল্যাণীয়বরেষু

॥ ১ ॥

কেউ জানত না, তার কারণ ও-পথে এতকাল কেউ যায় নি। সহজে কেউ যায়ও না। সহজে যাবার মতো পথ নয় ওটা। সমুদ্রগর্ভ থেকে সতের হাজারো ফুট উঁচুতে চিরতুষারে ঢাকা উত্তুঙ্গ গিরিশিখর—তার কোণে কোণে বাঁকে বাঁকে আছে মৃত্যু, আছে সর্বনাশ আত্মগোপন ক'রে। কোন্‌টা পথ আর কোন্‌টা বিপথ—হঠাৎ দেখে কেউ বুঝতে পারে না। পথ পাহাড় আর তার পাশে পাশেই অতলস্পর্শী খদ—সবই সেখানে তুষারের চাদরে ঢাকা। হাতী-ধরা খেদার মত অনেক জায়গায় সেই সীমাহীন সুগভীর খদ বরফ দিয়ে ঢেকে রেখেছে প্রকৃতি। পথিক বুঝতে পারে না প্রায়ই, কোনখানটায় আছে কঠিন ভয়াবহ বিশ্বস্ত শিলাখণ্ড, আর কোনখানটায় আছে বিরাট অসীম অন্ধ শূন্যতা। পা দিলে পায়ের চাপে বরফ ভেঙে তলিয়ে যায়, অথবা গড়িয়ে যায় মানুষটাকে নিয়ে কোথায় কোন্‌ অজানা আঁধারে—মৃত্যুতে। এছাড়া আছে তীক্ষ্ম হিমবায়ু তুষারঝটিকা—আছে হিমবাহ। কখন কোন্‌ মুহূর্তে সামান্য বাতাসে অথবা সামান্যতর শব্দে কয়েকশত মণ তুষার নেমে আসবে অসতর্ক, অচেতন, অসহায় পথিকের মাথায়—তা কেউ জানে না।

না, ও পথ নিরাপদ নয় আদৌ; সহজগম্য তো নয়ই।

তাই এতকাল, হয়ত কয়েক শতাব্দী কারুর চোখে পড়ে নি ঐ অদ্ভুত ভয়াবহ দৃশ্য—অগণিত মানুষের দুঃসাহসিক কিংবা ভাগ্যতাড়িত পর্বত-যাত্রীর কঙ্কাল।

একদা যারা আমাদেরই মতো হাসত কাঁদত, আমাদেরই মতো ঈর্ষা-দ্বেষ, স্নেহ-প্রেম, সঙ্কীর্ণতা-উদারতায় গড়া মানুষ ছিল—এমনই কতকগুলি নর-নারীর ইহজীবনের শেষ চিহ্ন—অস্থি-অবশেষ।

আমি বলছি রূপকুণ্ডের কথা।

হিমালয়ের বুকে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে থাকা দুর্গম দুরারোহ পর্বত-চূড়া ত্রিশূল, তারই এক প্রান্তে চিরতুষারে ঘেরা স্বচ্ছ সরোবর একটু—রূপকুণ্ড।

সেই রূপকুণ্ডের পথে একদিন হঠাৎ আবিষ্কৃত হ'ল বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রব্যাপী অগণিত নরকঙ্কাল। একজন নয় দুজন নয়—একশো আধশো নয়—অগণিত মানুষের অস্থি। সার সার পড়ে আছে সেই অস্থিগুলি—নিঃশব্দে, অসীম কৌতূহল এবং অনন্ত বিস্ময় জাগিয়ে।

বিস্ময় আর তার সঙ্গে অসংখ্য প্রশ্ন: কে এরা? এ পথে কেন এল? ক'জন এসেছিল? কেন মারা গেল? কি হয়েছিল এদের? রোগ না আর কিছু? শত্রুর আক্রমণ? আত্মকলহ? নাকি হিমবাহ? কিংবা খাদ্যাভাব?

এমনি অগণিত প্রশ্নের সামনে নিঃশব্দ কৌতুকে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে চিরতুষারে ঢাকা ত্রিশূল পর্বত, স্বচ্ছ ক্ষুদ্র-পরশা রূপকুণ্ড, আর আছে ঐ

কঙ্কালগুলো।

ওরাই বলতে পারে কি এর উত্তর—কী ঘটেছিল, কেন ঘটেছিল, আর কতদিন আগে ঘটেছিল—এরাই জানে, সাক্ষী আছে সেদিনকার।

অবশ্য মানুষও চেষ্টা করেছে বৈকি। ছুটে গেছেন নৃতত্ত্ববিদ বৈজ্ঞানিকরা, ছুটে গেছেন ঐতিহাসিকরা, ছুটে গেছেন রাজনৈতিকের দলও। একটি বিখ্যাত ইংরেজী দৈনিক সংবাদপত্র থেকেও একদল লোক গিয়েছিলেন।

কত কী বললেন তাঁরা! একদল লোক বললেন যে, কাশ্মীরের সেনাপতি এক জোরাওয়ার সিং একদল লোক নিয়ে এই পথেই গিয়েছিলেন তিব্বত দখল করতে, মাত্র শ'খানেক বছর আগে—আর তাঁদের খোঁজ পাওয়া যায় নি। এ নিশ্চয় সেই বাহিনীরই শেষ চিহ্ন। হয়ত হিমবাহে চাপা পড়ে কিংবা খাদ্যের অভাবে কিংবা কোন মারাত্মক মহামারীতে মারা গিয়েছিল সেদিনকার সেই দুঃসাহসী বীর সৈনিকেরা।

কিন্তু বাঙালী নৃতত্ত্ববিদ্ মজুমদার মশাই প্রমাণ ক'রে দিলেন যে তা সম্ভব নয়। কারণ এর মধ্যে প্রচুর স্ত্রীলোকের অস্থি আছে। আর অস্থিগুলি এত অল্পদিনেরও নয়—অন্তত ছ-সাতশো বছর আগেকার এরা, হয়ত আরও বেশি।

কেউ কেউ এমনও বলেছেন যে, আগে এইখান দিয়ে নন্দাদেবীর বিখ্যাত মঠ পরিক্রমা ক'রে তিব্বতে যাবার এক গিরিবর্ত্ম ছিল—কোন এক দুর্ঘটনায় তা নষ্ট হয়ে যায়। আর সেই দুর্ঘটনারই ফলে এই ব্যাপক ও বহুবিস্তৃত মৃত্যু ঘটে।

কিন্তু সেটাও বিশ্বাসযোগ্য নয়, বলেছেন ভূতত্ত্ববিদ বৈজ্ঞানিকরা।

তবে?

তবে কেন এই বিপুল একদল যাত্রী এই দুর্গম দুরূহ পথে এসেছিল—মৃত্যুকে একরকম অবধারিত জেনেও?

কে এরা? কেন এসেছিল? কী হয়েছিল এদের?

সেই অসংখ্য উত্তরহীন প্রশ্ন। আর নিরুত্তর সেই তুষার, সেই কুণ্ড ও সেই অগণিত অস্থি। আজও এসব প্রশ্নের উত্তর মেলে নি, হয়ত কোনদিনই মিলবে না। হয়ত চিরকাল ধরে বিস্মিত কৌতূহলী মানবের এই প্রশ্ন নিরুত্তর সেই তুষার হিমশীতল রূপকুণ্ডের জল এবং প্রায়-শিলীভূত ঐ অস্থিতে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে ফিরে আসবে তাদের কাছেই।

॥ ২ ॥

কিন্তু তাই বলে আমরা কি এমনি ক'রেই হার মানব?

ইতিহাস তো অনেক ক্ষেত্রেই কিছু তথ্য এবং কিছুটা—অনেক সময় বেশির ভাগই—কল্পনায় মিলে রচিত হয়। তথ্যের মাঝখানকার বিরাট বিরাট ফাঁক ভরাট করতে হয় অনুমান দিয়েই। এক্ষেত্রে তথ্য যখন একেবারেই অনুপস্থিত, তখন অনুমান বা কল্পনার রাশ ছেড়ে দিতে আপত্তি কি?

আমরা কল্পনা ক'রে নিই না কী ঘটেছিল, কেন ঘটেছিল ? কারা এরা—কী এদের পরিচয় ?

আর আমরা কল্পনায় যা দেখছি তা যে সত্য নয়, তাই বা কে বলবে ?…

ধরুন এখন থেকে প্রায় আটশো বছর আগেকার কথা। খ্রীষ্টিয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষের দিক সেটা।

ভারতে তখনও তেমন কোন স্থায়ী মুসলমান সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে নি—শুধু দুর্বার সমুদ্রের ঝড়ের মত বার বার মধ্য এশিয়া থেকে দুর্দান্ত দস্যুর দল এসে তার বহুদিনের বহু শতাব্দীর সঞ্চিত ঐশ্বর্যরাশি লুটে নিয়ে গেছে, তার দেবমন্দির নষ্ট করেছে, তার জনপদ ধ্বংস করেছে এবং আসা-যাওয়ার পথে মহাশ্মশান সৃষ্টি করেছে।

অর্থাৎ তাকে ক্ষতবিক্ষত ও নিঃস্ব করেছে।

প্রথম যিনি এই কাজ করতে আসেন এবং বেশ কয়েকবার ধরেই করেন, সেই সুলতান মামুদের বংশধরদের কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাসে এই ভারতে এসেই শেষ পর্যন্ত আশ্রয় নিতে হয়।

সুলতান মামুদ শেষের দিকে বর্তমান পাঞ্জাবের খানিকটা পর্যন্ত নিজের শাসনের অন্তর্ভুক্ত ক'রে নিয়েছিলেন। এখানে স্থায়ী রাজ্যস্থাপনের প্রথম চেষ্টা সেটা। সেই সামান্য রাজ্যখণ্ড সম্বল ক'রেই প্রাণধারণের চেষ্টা করলেন খুসরু মালিক—মামুদবংশের শেষ সুলতান।

কিন্তু তাতেও তাঁর পূর্বপুরুষ-কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হ'ল না। ভারত পর্যন্ত তাঁর সন্ধানে এলেন মুইজউদ্দীন মুহম্মদ-বিন-সাম—পরবর্তীকালে যিনি মুহম্মদ ঘুরী নামে ইতিহাসে বিখ্যাত হয়েছিলেন।

ঘুর হ'ল পূর্ব ইরানের প্রান্তে আফগানিস্থানের সামান্য একটি জায়গা—সেখানকার সামন্ত সর্দাররা ক্রমশ মাথা তুলছিলেন গজনীর সুলতানদের সামনেই। এ ঔদ্ধত্য তাঁদের সহ্য হ'ল না, অথবা প্রবল শত্রুকে অঙ্কুরেই বিনাশ করতে চাইলেন খুসরু মালিকের পিতামহ বাহ্‌রাম শা। ঘুরের কুতবউদ্দীন আর সৈফউদ্দীনকে নৃশংসভাবে পুড়িয়ে মারলেন তিনি। ভেবেছিলেন, হয়ত এবার ভয়ে মাথা নীচু করবে ওরা চিরকালের মত।

কিন্তু তা হ'ল না, এর কয়েক মাস পরেই এই অকারণ হত্যাকাণ্ডের শোধ তুললেন ওঁদেরই এক ভাই আলাউদ্দীন হুশেন শাহ—সাত দিন সাত রাত ধরে অবিরাম গজনী শহর লুঠ ক'রে এবং প্রায় গোটা শহরটা পুড়িয়ে দিয়ে। তাঁর এই কাজের জন্য জনসাধারণের কাছে তাঁর খেতাব মিলল 'জাহান্‌সুজ' বা বিশ্বদাহকারী।

তবু বাহ্‌রাম শার বংশধররা রেহাই পেলেন না।

বাহ্‌রাম শার ছেলে খুসরু শাহকে গজনী থেকে তাড়ালেন ঘুর-এর তুর্কী সর্দাররা। তার পরও তাঁদেরই কাছে তাড়া খেতে খেতে এসে পৌঁছলেন ভারতবর্ষে। ভেবেছিলেন বোধহয় যে, এতদূরে আর কোন বিপদ এসে পৌঁছবে না, কোনমতে দিনযাপনের মত সামান্য আয়ে এই সুদূর ও ক্ষুদ্র

রাজ্যখণ্ডে মাথা গুঁজে থাকতে পারবেন তাঁরা।

কিন্তু বছর দশেক যেতে না যেতেই 'জাহানসুজ'-এর ছেলে গজনীর সিংহাসন অধিকার করলেন।

তিনি অবশ্য সেই যুদ্ধেই মারা গেলেন, কিন্তু তাঁর খুড়তুতো ভাই গিয়াসউদ্দীন তুর্কীদের নির্মূল ক'রে সে তখৎ দখলে আনলেন এবং প্রতিনিধি হিসাবে তা উপহার দিলেন ছোট ভাই মুইজউদ্দীন মহম্মদকে। এঁদের দু ভাইয়ের সম্পর্ক ছিল অস্বাভাবিক রকম প্রীতির—তাই অন্তর্দ্বন্দ্বে সময় ও শক্তি নষ্ট করতে হয় নি ব'লে মুহম্মদ তার সমস্তটাই রাজ্য বা প্রতিপত্তি বিস্তারে ব্যয় করতে পেরেছিলেন।

মুহম্মদ ঘুরী কিন্তু প্রথমেই খুসরু মালিকের দিকে তাকান নি।

তাঁর প্রথম ভারত আক্রমণের উদ্দেশ্যও বড় বিচিত্র। মুলতানে ইস্‌মাইলী মুসলমানদের একটা বড় ঘাঁটি ছিল। এঁরা মুসলমান হ'লেও তখনকার দিনের গোঁড়া মুসলমানরা এঁদের বিধর্মীর পর্যায়েই ফেলতেন। এঁদের দমন করতেই প্রথম মুহম্মদ ঘুরী এদেশে আসেন।

তার পরের বার এসে তিনি সোজাসুজি গুজরাট আক্রমণ করলেন। কিন্তু সেবারে খুব সুবিধা করতে পারেন নি, ওখানকার হিন্দু রাজার কাছে ভীষণ রকম পরাজিত হয়ে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন।

এর পরই খুসরু মালিকের পালা। বেচারীর রাজত্ব বলতে তখন তো দাঁড়িয়েছিল শুধু লাহোরটুকু, এবার সেটুকুর দিকেও হাত বাড়ালেন মুহম্মদ ঘুরী।...তখন একটা পরাজয়ের গ্লানি আর একটা বিজয়ের অহঙ্কারে ঢাকা পড়া চাই, তা লাভ যা-ই হোক না কেন!

খুসরু মালিক সে আক্রমণ প্রতিহত করবার কোন চেষ্টাও করলেন না। কারণ গোড়া থেকেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর পক্ষে মুহম্মদ ঘুরীর সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে টিকে থাকবার কোন সম্ভাবনাই নেই। তিনি লাহোর ছেড়ে সোজা উত্তর দিকে পালালেন এবং নিজের ও আক্রমণকারীর মধ্যে দুর্গম পার্বত্য পথের দুস্তর ব্যবধান রচনা ক'রে একেবারে গিয়ে হাজির হলেন জম্মুতে,—সেখানকার রাজা বিজয়দেবের আশ্রয় প্রার্থনা করলেন।

হিন্দুদের আতিথেয়তার সুনাম ছিল। খুসরু মালিক মনে করলেন, বিজয়দেবের এতটুকু সামর্থ্য থাকলেও তিনি তা প্রয়োগ ক'রে আশ্রিতকে রক্ষা করবেন।

কিন্তু একটা হিসেবে বড় ভুল করেছিলেন খুসরু মালিক। সুদূর গজনী থেকে লাহোর পর্যন্ত পোঁছতে বহু দুরারোহ দুর্লঙ্ঘ্য পাহাড়-পর্বত পার হতে হয়। সে পথ এখনও, এই বিংশ শতাব্দীতেও যথেষ্ট দুর্গম আছে—তখনকার দিনে তো কথাই ছিল না। সেই পথ অতিক্রম ক'রে যে এসেছে, তার পক্ষে জম্মু পোঁছনো আর এমন কি কঠিন কাজ!

বিজয়দেবও সেটা বুঝেছিলেন। তাই যখন মৈত্রী-বন্ধনের প্রস্তাব ক'রে মুহম্মদ ঘুরী তাঁর কাছে গোপনে দূত পাঠালেন উৎকৃষ্ট আতর ও সুগন্ধী

সিরাজী মদ উপঢৌকন দিয়ে—তখন সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করবার মত সাহস তাঁর হ'ল না।

অর্থাৎ তিনি হিসেবে ভুল করলেন না।

খুসরু মালিকের গোপন আশ্রয়ের ঠিকানা এবং অতর্কিতে সেখানে পৌঁছবার গোপন পথটির সন্ধান ঘুরীর অনুচরদের ব'লে দিয়ে নিজে নির্লিপ্ত ও উদাসীন রইলেন।

এর পরের ইতিহাস সামান্যই।

খুসরু মালিক তাঁর সামান্য ক'জন বিশ্বস্ত অনুচর নিয়ে শেষ একটা ক্ষীণ চেষ্টা করলেন আত্মরক্ষার, কিন্তু পাহাড়ী নদীর ঢলনামা বন্যাকে কে কবে ছিটে-বাঁশের বেড়া দিয়ে প্রতিরোধ করতে পেরেছে? মাত্র কিছুক্ষণের চেষ্টাতেই তাঁকে পরাভূত ও বন্দী করল মুহম্মদ ঘুরীর সৈন্যরা।

তবে তখনই কিন্তু বিজিত প্রতিদ্বন্দ্বীকে বধ করবার আদেশ দিলেন না মুহম্মদ ঘুরী—শৃঙ্খলাবদ্ধ বন্দীকে তাঁর পিতৃ-পিতামহের রাজধানী গজনীতে প্রেরণ করলেন। সেখানেই অল্পদিন পরে মারা গেলেন খুসরু মালিক।

তা মুহম্মদ ঘুরী দয়াই করলেন বলতে হবে—সুলতান মামুদের সর্বশেষ উত্তরাধিকারীকে নিজ জন্মভূমিতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করবার সুদুর্লভ সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত না ক'রে।

॥ ৩ ॥

বিজয়দেব তাঁর যে পার্বত্য প্রাসাদটি খুসরু মালিকের জন্য নির্দিষ্ট ক'রে-ছিলেন, সেটির পিছনে ছিল ঘন চীরগাছের অরণ্য। সে অরণ্য এবং প্রাসাদ-সীমা শেষ হয়েছে একটি পার্বত্য নদীতে। সামান্য নদী, কিন্তু বারোমাসই তাতে জল থাকে। তাছাড়া সেদিকটায় ঢালু পাথুরে জমি—সেখান দিয়ে শত্রুর আসার সম্ভাবনা ছিল না, সে চেষ্টাও তারা করে নি। অবশ্য তার প্রয়োজনও হয় নি।

সদর দরজাই যেখানে অবারিত, সেখানে আর খিড়কীর সন্ধান কে করে?

কিন্তু চরম বিপদের মুহূর্তে মানুষের বুদ্ধি যেমন প্রায়ই ঘুলিয়ে যায়—তেমনি কোন কোন ক্ষেত্রে হঠাৎ স্বচ্ছও হয়ে ওঠে।

সেদিন শেষরাত্রের আবছায়া অন্ধকারে যখন ঘুরী-বাহিনী পৈশাচিক ধ্বনি তুলে তাঁর প্রাসাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, তখন ক্ষণকালের জন্য তাঁর রক্ষী-সৈন্যরা ও আত্মীয়রা হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেও খুসরু মালিক এতটুকু বিচলিত বা বিহ্বল হন নি।

তিনি আত্মরক্ষার আশাহীন আয়োজন রক্ষীদের ওপরই ছেড়ে দিয়ে ছুটে গিয়ে নিজের কিশোর পুত্র মালিক বাহ্‌রামকে ঘুম থেকে ঠেলে তুলেছিলেন। তাকে সংক্ষেপে বিজয়দেবের বিশ্বাসঘাতকতা এবং শত্রু আক্রমণের ইতিহাস জানিয়ে বলেছিলেন, 'আমাদের আর কোন আশা নেই—হয় মরতে হবে, নয় বন্দী হ'তে হবে। সকলে মিলে পালাতে গেলে এরা ছাড়বে না। সবুক্তিগীনের

'এক ফোঁটা রক্ত কোথাও অবশিষ্ট আছে জানলে স্বস্তি পাবে না ঘুরের কুকুর-গুলো! যেখানেই যাব খুঁজে বার করবে। তুমি একা হয়ত এখনও পালাতে পারবে—সবাইকে ওরা চেনে না। এখনই চলে যাও, অস্ত্র কি বর্মচর্ম নেবার চেষ্টা ক'রো না, তাতে পালাবার পথে বাধা হবে। চাও তো একখানা ছোরা খাপসুদ্ধ কোমরে গুঁজে রাখ। সামান্য হাল্‌কা সাদা পোশাকে বেরিয়ে পড়। খালিপায়ে যাও—পথ পাথুরে, ঢালু। জুতো পরে গেলে পালাতে পারবে না—শব্দও হবে। পেছনদিকটায় শত্রু এখনও আসে নি—বনের মধ্যে দিয়ে নিরাপদে যেতে পারবে। ওদিককার নদীও তোমার পরিচিত, প্রায়ই তো দেখি স্নান করতে যাও। সুতরাং নদীতে নামবার কি সাঁতরে পার হবার কোন অসুবিধে হবে না। নদীর ভেতরে আল্‌গা পাথর আছে—কিন্তু একটু সাবধানে গেলে বোধহয় পার হয়ে যেতে পারবে। ওপারে আরও ঘন বন, হয়ত কিছু কিছু শের বা ভালুও আছে—তবে তারা তোমার স্বদেশবাসী বা স্বধর্মী মানুষের মত হিংস্র নয়। সে যাই হোক, খোদার মনে যা আছে তাই হবে—শুনেছি ওদিককার বন বেশী দূর যায় নি, দু-তিন ক্রোশের মধ্যেই কিছু কিছু জনপদ আছে। যে গ্রামই আগে পাও, খোঁজ করো ব্রাহ্মণ কে আছেন। তাঁর কাছে গিয়ে আগে পরিচয় না দিয়ে আশ্রয়ভিক্ষা ক'রো—এ দেশের ব্রাহ্মণরা শুনেছি কখনও কথার খেলাপ করেন না, আশ্রিতকে ত্যাগ করেন না।'

এক নিশ্বাসে এতগুলি কথা বলে, বোধ করি দম নেবার জন্যই থামলেন খুসরু মালিক।

বাহ্‌রামের চোখ থেকে তখনও ঘুম যায় নি, মস্তিষ্ক থেকে তখনও যায় নি নিদ্রার জড়তা।

সে বিহ্বল হয়ে শুনছিল এতক্ষণ। এবার সে প্রথম কথা কইল। বলল, 'আপনি এই হিন্দু রাজার কাছে আশ্রয় নেবার সময়ও তো এই কথাই বলে-ছিলেন বাপজান, কিন্তু তার ফল তো দেখতেই পাচ্ছেন!'

'এ যে রাজা, বেটা। সেইখানেই যে হিসেবে ভুল হয়েছিল। রাজার যে অনেক কিছু আছে, তাই অনেক কিছু হারাবারও ভয় আছে। গরীব যে, তার শুধু আছে ইমান, আছে ধর্ম। সেটা সে হারাতে চায় না। যাক—আশ্রয় না পাও, সে তোমার বা আমার তকদীর। তবে চেষ্টা ক'রো। আর কিন্তু এতটুকু সময় নেই। শুনছ দুশমনের উল্লাসধ্বনি? আর বেশীক্ষণ ওদের বোধহয় ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না আমার লোকজন।'

'না বাপজান, আপনাকে ফেলে, মা-ভাই-বোনদের ফেলে একা বাঁচতে আমি চাই না—পারব না। তার চেয়ে সকলের অদৃষ্টে যা আছে, আমারও না হয় তাই হবে।'

শেষ মুহূর্তে, মন স্থির করার সময়ে এসে বেঁকে দাঁড়াল মালিক বাহ্‌রাম।

'ছিঃ বাহ্‌রাম! তুমি আমার বড় ছেলে, আমার ভবিষ্যতের আশাভরসা। তুমি থাকলে সবুক্তিগীন সুলতান মামুদের বংশ থাকবে। গজনীর আসল

মালিকের বংশ থাকবে। হয়ত কোনদিন এর শোধও তুলতে পারবে তুমি—সবাই একসঙ্গে মরে কোন লাভ নেই বেটা। যদি সবাইকে নিয়ে পালাবার বা পালিয়ে বাঁচবার কোন আশা থাকত তো সে চেষ্টা আমি নিশ্চয়ই করতাম। আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে, সবাই আমাকে ত্যাগ করেছে—তুমিও আমাকে ত্যাগ ক'রো না, আমার অবাধ্য হ'য়ো না, আমার কথা রাখ। তুমি হয়ত বেঁচে আছ, হয়ত নিরাপদে আছ—একথা জানলে, একদিন হয়ত তুমি তোমার পিতৃকুলের শত্রুদের দমন ক'রে পিতৃপুরুষের সিংহাসন আবার দখল করতে পারবে মনে ক'রে—আমি সহস্র দুঃখ, সহস্র লাঞ্ছনার মধ্যেও শান্তি পাব। এটুকু সৌভাগ্য থেকে তুমি আমার জ্যেষ্ঠ সন্তান—আমাকে বঞ্চিত করবে না আশা করি।'

বলতে বলতেই চোখে জল এসে গিয়েছিল খুসরু মালিকের। তিনি নিজে হাতে ছেলেকে আঙরাখা পরাবার ছলে সে অশ্রু অলক্ষ্যে মুছে নিলেন। তারপর তাকে টানতে টানতে নীচে নামিয়ে এনে একরকম ঠেলেই বার ক'রে দিলেন বাড়ি থেকে—বাইরের অন্ধকার অরণ্যের মধ্যে।

ওরই মধ্যে, চলতে চলতে একবার বলবার চেষ্টা করেছিল বাহ্‌রাম,—'কিন্তু আম্মা—আম্মাজান? বহিন মুন্নি?—একবার শেষ দেখাও করব না তাদের সঙ্গে?'

'আর সময় নেই বেটা, শুনছ না বাইরের কপাট ভেঙে পড়ল!'

এদিককার, অর্থাৎ বনের দিককার বড় কপাটটা নিঃশব্দে বন্ধ ক'রে দিলেন খুসরু মালিক।

সত্যিই তার কিছু আগে প্রবল শব্দে ভেঙে পড়েছে বাইরের বড় ফটক, সে শব্দও ছাপিয়ে উঠেছে শত্রুসৈন্যের পৈশাচিক উল্লাসধ্বনি। সময় আর সত্যিই নেই। খুসরু চরম মুহূর্তে আশ্চর্য শান্ত আর নির্ভয় হয়ে গেলেন। মনে মনে শুধু একবার নিজের সৃষ্টিকর্তা এই দুনিয়ার মালিককে স্মরণ ক'রে ধীরপদে এগিয়ে চললেন শত্রুদের দিকেই। ছেলে যে এদিক দিয়ে পালিয়েছে, তার ইঙ্গিত মাত্র না পায় শয়তানের বান্দারা।

॥ ৪ ॥

সময় যে আর সত্যিই ছিল না, সেটা একটু পরে বুঝতে পারল মালিক বাহ্‌রামও।

বনপথটুকু পেরিয়ে নদীর ঢালু পাড় বেয়ে নামতে নামতেই প্রথম প্রভাতের রক্তস্বর্ণাভা মাথার ওপরের পর্বতচূড়া স্পর্শ করল। খরস্রোতা পার্বত্য নদী সঙ্কীর্ণ এবং সামান্য হ'লেও তা পার হওয়া সহজসাধ্য নয়—বিশেষতঃ বড় বড় পিছল আল্‌গা পাথরে বিপজ্জনক হয়ে আছে তার তলদেশ।

তাই নদী পার হয়ে ওপারে পৌঁছতে পৌঁছতেই বেশ ফর্সা হয়ে গেল চারিদিক।

বাহ্‌রাম আর পালাবার চেষ্টা করল না। শত্রুসৈন্যে প্রাসাদ ভরে গেছে,

শুধু তাদের উন্মত্ত বিজয়-কোলাহলই শোনা যাচ্ছে না—তাদের দেখাও যাচ্ছে স্পষ্ট এখান থেকে।

সে এপারে, যেখানটায় একটা বড় চীরগাছের গুঁড়িতে আর প্রকাণ্ড একটা পাথরে অনেকখানি অন্তরাল সৃষ্টি ক'রে রেখেছে—সেইখানে গিয়ে গুড়িসুড়ি মেরে বসে রইল।...

শত্রুর বিজয়োল্লাস কানে আসছে স্পষ্ট, কানে আসছে স্বজনদের অন্তিম আর্তনাদ।

তার মধ্যে নারীকণ্ঠও শোনা যাচ্ছে বৈকি। হয়ত তার মায়েরা, তার বোনেরা, তার বালিকা প্রথম বধূটিও ঐ উৎপীড়িতদের মধ্যে আছে। হয়ত ঐ আর্তনাদে তাদের কণ্ঠও মিশছে। সম্ভবত তাদের মেরেই ফেলল এতক্ষণে।

কিন্তু মৃত্যু তো এক্ষেত্রে ঢের ভাল, ঢের বাঞ্ছনীয়। বন্দী হওয়া, বে-ইজ্জত হওয়ার চেয়ে ঢের বেশী শ্রেয়।

সে সম্ভাবনাটা মনে হয়ে সেই নির্জন অরণ্য-অন্তরালে বসেও তার ললাটের শিরাগুলো ফুলে ফুলে উঠতে লাগল, ব্যর্থ আক্রোশে নিজেরই নখ চেপে বসল মুষ্টিবন্ধ হাতের তালুতে—রক্তাক্ত হয়ে উঠল রক্তাভ করতল।

নিষ্ফল অসহায় ক্রোধ, প্রতিকারহীন অপমানবোধ—এর চেয়ে কষ্ট বুঝি আর কিছু নেই।

বহুবার ইচ্ছা হ'ল ছুটে চলে যায় ওপারে, এই সামান্য কিরীচখানা নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়ে দুশমনগুলোর ওপর।

অন্তত একজনকেও মারতে পারবে না নিজে মরার আগে?

তা যদি না-ও পারে, নিজে মরতে তো পারবে।

এ অবস্থায় এমনভাবে বাঁচার থেকে—কাপুরুষের মতো, কোনমতে প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার এই লজ্জাকর প্রয়াস থেকে সে মৃত্যু যে ঢের বেশী লোভনীয়, ঢের বেশী প্রেয়।

কিন্তু প্রাণপণেই সে ইচ্ছা দমন করল সে। তার বাবা, তার সুলতান, তার মালিকের আদেশ। সম্ভবত তাঁর শেষ আদেশ। সে আদেশ যদি তাঁর ছেলেও না মান্য করে—সে-ও যদি অবাধ্য হয় তো তিনি যে বেহেস্তে গিয়েও শান্তি পাবেন না।

সারা দুনিয়াই বেইমান—এই ক্ষোভ তাঁকে মৃত্যুর পরপারেও স্বস্তি দেবে না এতটুকু।

না, বাঁচতেই হবে তাকে—যতক্ষণ সম্ভব, যতটুকু সাধ্য। দুনিয়ার সবাই যদি না মানে—সে অন্তত মানবে তার সুলতানের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে।

তেমনি বসে রইল সে সারাদিন। অভুক্ত, অতন্দ্র—স্তম্ভিত অবস্থায়। ধীরে ধীরে ওপারের কোলাহল ও আর্তনাদ থেমে এল, জনবিরল হয়ে এল প্রাসাদ। বোধহয় আহত-নিহতদের ফেলে রেখে বন্দী বন্দিনী আর লুটের মাল নিয়ে চলে গেল মুহম্মদ ঘুরীর পিশাচ সহচরেরা।

হয়ত সেই রকমই রাজা বিজয়দেবের নির্দেশ। চক্ষুলজ্জাও তো একটা আছে। আশ্রিতদের রক্ষা বা উদ্ধার করবার একটা অভিনয় অন্তত তাঁকে করতেই হবে, নইলে নিজের প্রজাদের কাছেই যে হেয় হয়ে যাবেন রাজা।

সে সময় পেরিয়ে যাবার আগেই কাজ সেরে সরে পড়তে হয়ত ওদের কাতর অনুনয় জানিয়েছিলেন বিজয়দেব।

ক্রমে সন্ধ্যাও নেমে এল উপত্যকায়, নদীবক্ষে, অরণ্যে।

আবছায়া ঘনিয়ে এসেছে চীরগাছের শাখা-প্রশাখায়। এবার অনেকটা নিরাপদ।

বাহ্‌রাম উঠে দাঁড়াল। প্রায় চার প্রহর একভাবে বসে থাকার ফলে হাতে-পায়ে খিল ধরে গেছে। উঠে একটু একটু ক'রে ছাড়িয়ে নিল সেগুলো। তারপর আর একটু এগিয়ে একেবারে নদীর পাড়ে এসে একটা পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে প্রাসাদের দিকে তাকিয়ে দেখল।

আলো বা মানুষের উপস্থিতির কোন চিহ্ন নেই সেখানে। শত্রুসৈন্য নিশ্চয়ই আর নেই। থাকলে তা টের পাওয়া যেত। বিজয়ী সৈন্য কখনও শান্ত হয়ে থাকতে পারে না।

কান পেতে শুনল বাহ্‌রাম—আহতের আর্তনাদ ক্ষীণ হয়ে এলেও এখনও একেবারে স্তব্ধ হয় নি—এক-আধটা গোঙানির শব্দ এখনও শোনা যাচ্ছে। হয়ত এখনও এক-আধজন বেঁচে আছে ওখানে।

লোভ হল বাহ্‌রামের। যাবে নাকি একবার ফিরে?

দেখবে পরিচিত কেউ—তার আত্মীয় কেউ এখনও জীবিত আছে কিনা ঐ মুমূর্ষুদের মধ্যে?

কে জানে—হয়ত এখনও দু-একজনকে বাঁচানো যায়!

কিন্তু তখনই মনে পড়ে গেল বাপজানের স্পষ্ট নির্দেশ।

ওদিকে আর ফেরা চলবে না।

বাঁচতে হবে তাকে।

প্রাণরক্ষার এক একান্ত অরুচিকর অথচ দুরূহ দায়িত্ব তার ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন তার মালিক, তার সুলতান—তার বাবা।

সে দায়িত্ব বহন করতে না পারলে সবুক্তিগীনের রক্তে কলঙ্ক অর্শাবে।

স্খলিত, প্রায় অশক্ত পা দুটোকে টেনে টেনে বিপরীত দিকেই চলতে শুরু করল সে।

খুসরু মালিক বলে দিয়েছিলেন দু-তিন ক্রোশের মধ্যেই জনপদ পড়বে, কিন্তু বহুক্ষণ ঘুরেও বাহ্‌রাম সে জনপদের সন্ধান পেল না। বন আছে—কোন বনপথ নেই। চীরগাছের জঙ্গল—সব গাছ একই রকম দেখতে। তার মধ্যে পথ ঠিক করা যায় না।

অনেকক্ষণ ঘোরবার পর তার মনে হ'ল যে, সে একই পথে বার বার ঘুরছে। হাঁটা অভ্যাস নেই, বিশেষত উঁচুনীচু পাহাড়ী পথ—অল্পক্ষণের

মধ্যেই পা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় শরীর ভেঙে আসছে—বিশেষ ক'রে তৃষ্ণা, বুক শুকিয়ে উঠেছে।

তার ওপর প্রচণ্ড শোক। শোকে যে এমন শারীরিক যন্ত্রণা হয়, নিকটাত্মীয়-বিচ্ছেদে যে বুকের মধ্যে এমন করে, তা কখনও কল্পনাও করে নি সে।

তবু যেতেই হবে। জোর ক'রে মনে এবং দেহে জোর আনে। মামুদ শা'র বংশধর সে—সামান্য দৈহিক ক্লিন্নতার কাছে হার মানলে চলবে না।

অবশেষে সূর্যের অবস্থান দেখে পথ চলা ঠিক করল। সূর্য কোন দিকে, এটা উত্তরায়ণ না দক্ষিণায়ন তা সে জানে না, শুধু সূর্যকে সামনে রেখে এগোবে তা যেখানেই পেঁছিক। মেঘে ও কুয়াশায় ম্লান—তবু তার মধ্য থেকে সূর্যকে দেখা যাচ্ছে ঠিকই।

এইবার ভাগ্য তার প্রতি সুপ্রসন্ন হলেন।

সূর্য সামনের বড় পাহাড়টার আড়ালে নামবার আগেই সে পাহাড়ের কোলে গ্রামের চিহ্ন দেখতে পেলে।

সমৃদ্ধ না হোক, বেশ সম্পন্ন গ্রাম। ঘর-বাড়ির সংখ্যা খুব কম নয়—দু-একখানা পাকা পাথরের বাড়িও আছে। দু'তিনটি দেবালয়ের চূড়া এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে। সম্ভবত স্বর্ণমণ্ডিত চূড়া, সন্ধ্যাসূর্যের রক্তিমাভায় ঝকমক করছে।

যা আছে অদৃষ্টে তাই হবে। ঐখানে গিয়েই আশ্রয় প্রার্থনা করবে সে। আর দ্বিধা বা ইতস্ততঃ করার সময়ও নেই। এখনই একটু বিশ্রামের মত স্থান এবং একটুখানি পানীয় জল না পেলে সে মারাই যাবে সম্ভবত।

সে ওরই মধ্যে জোরে পা চালাল, যতদূর সম্ভব।

॥ ৫ ॥

লালতাকেশৌ সত্যই বর্ধিষ্ণু গ্রাম। বহু ঘর ব্রাহ্মণ ও ছত্রীর বাস এখানে। বৈশ্য বা বানিয়াও কিছু আছে। চাষবাসই বেশির ভাগ লোকের জীবিকা, সামান্য সামান্য কারবারও করে কেউ কেউ।

লালতাকেশৌ বা ললিতাকেশব এ গ্রামের প্রধান দেবমন্দির। পুরাকালে নাকি কাশ্মীরের রাজা ললিতাদিত্য স্বয়ং এই কেশবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, আর বহু দূর থেকে এক নিষ্ঠাবান সাধক ব্রাহ্মণ আনিয়ে তাঁর হাতেই এই আদি-কেশব মূর্তি সেবার ভার দেন।

সে ব্রাহ্মণ সপরিবারেই এখানে এসেছিলেন, বংশ-পরম্পরায় তাঁরাই সে সেবার ভার আজও বহন করছেন।

এই ব্রাহ্মণ পরিবারের স্বধর্মনিষ্ঠা, ঐকান্তিকতা ও পবিত্র জীবনযাত্রার জন্য সকলেই এঁদের খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখেন। সাধারণ পূজারী ব্রাহ্মণের মত কেউ মনে করেন না। এঁদের বংশে যখন যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ কর্তা বা প্রধান পূজারী হন—তাঁকেই গুরু করেন গ্রামের সকলে, অর্থাৎ সে সময় যার দীক্ষাগ্রহণের প্রয়োজন বা সময় হয় তারা তাঁর কাছেই দীক্ষা নেয়।

বর্তমানে যিনি প্রধান পূজারী—বিষ্ণুপ্রসাদ, তিনি সেদিন অপরাহ্ণে গ্রাম-প্রান্তবর্তিনী ঝরণায় স্নান করতে গিয়েছিলেন। এ তাঁর প্রতিদিনের অভ্যাস—সান্ধ্যপূজার আগে আর একবার এই গিরিনির্ঝরিণীর শীতল স্বচ্ছ জলে স্নান করার। দু-বেলাই স্নান করেন তিনি প্রত্যহ—এমন কি শীতের দিনে, যখন দুধারে চীরগাছের ডগা তুষারে সাদা হয়ে যায়, তখনও।

সাধারণতঃ তিনি যখন স্নান করতে নামেন—দু-বেলাই—তখন গ্রামের লোক কেউ নদীতে আসে না। এই ঠাণ্ডায় বিকেলে কেউ স্নান করে না। আর ভোরে যখন তিনি আসেন—তখন কেউ স্নানের কথা ভাবেও না। সুতরাং তিনি একান্ত নির্জনে স্নান করতেই অভ্যস্ত। কিন্তু আজ স্নান সেরে ওঠবার মুখে এক অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ল তাঁর।

দেখলেন তিনি আজ সম্পূর্ণ একা নন, কাছেই অন্তত আর একটি জীবিত মানুষ ছিল। কিন্তু সে কেমন মানুষ? ষোল-সতের বছরের অতিশয় সুদর্শন একটি কিশোর ছেলে প্রায় টলতে টলতে বনের মধ্যে থেকে বেরিয়ে নদীর কাছাকাছি এসে মাটিতে পড়ে গেল—আর উঠতে পারল না। কিন্তু সেই অবস্থাতেই পশুর মত হামাগুড়ি দিয়ে এসে পশুর মতই জলে মুখ দিয়ে জল পান করতে লাগল।

তখনও দিনের আলো বিদায় নেয় নি একেবারে।

বিষ্ণুপ্রসাদ ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখলেন, ছেলেটির গায়ে বিজাতীয় পোশাক, সাদা সুতি-কাপড়ে তৈরি—অনেক জায়গাতে ছিঁড়ে গেছে—তবু তা যে একদা মূল্যবান বস্ত্রেই তৈরি হয়েছিল তা দেখলেই বোঝা যায়। ছেলেটির পা ক্ষত-বিক্ষত, রক্তাক্ত। নিশ্চয় বহুদূর থেকে এবং বহুক্ষণ ধরে হাঁটছে সে—পরিশ্রমে অনভ্যস্ত ধনীসন্তান—ক্লিষ্ট ও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

তৃষ্ণার উগ্রতা দেখে এটাও অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে, সে ক্ষুধার্তও। হয়ত বহুক্ষণই খাওয়া হয় নি তার—কে জানে হয়ত বা একাধিক দিনই।

ভাল ক'রে দেখতে যেটুকু সময় লাগল, তারপর বিষ্ণুপ্রসাদ আর বিন্দুমাত্র দ্বিধা বা সময় নষ্ট করলেন না, এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলেন, 'বৎস, তুমি কে? কোথা থেকে এসেছ? কোথায় যাবে? তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে বহুক্ষণ কিছু খাওয়া হয় নি তোমার—আপত্তি না থাকে তো গ্রামে চল, দেবতার মন্দির আছে—প্রসাদের ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি। যদি বিশ্রাম করতে চাও, তারও ব্যবস্থা হ'তে পারবে।'

ছেলেটি মুখ তুলে তাকাল।

ঈষৎ ভয়ার্ত তার দৃষ্টি, কিছুটা কৌতূহলীও। বিষ্ণুপ্রসাদের সদ্য-স্নাত দীর্ঘদেহ, শিখা ও যজ্ঞোপবীত দেখে সে কি বুঝল কে জানে—খানিকটা যেন আশ্বস্ত হ'ল। তবু বেশ একটু সঙ্কোচের সঙ্গেই প্রশ্ন করল, 'আপনি ব্রাহ্মণ?'

ছেলেটির কথা বাঁকা, উচ্চারণ কষ্টকৃত। অর্থাৎ এ অঞ্চলের লোক নয়, বহু

যত্নে এ দেশের কথা কিছুটা আয়ত্ত করেছে।

বিষ্ণুপ্রসাদ আরও বিস্মিত হ'লেন। কিন্তু তবু প্রশান্ত কণ্ঠেই উত্তর দিলেনঃ 'হ্যাঁ বৎস। আমি এখানকার পুরাধিশ্বর শ্রীললিতাকেশবের পূজারী।'

'আমার—আমার বাপজান বলে দিয়েছেন, ব্রাহ্মণের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতে। আমি বড় বিপন্ন। আপনি আমাকে আশ্রয় দেবেন?'

ভয়ে ভয়েই প্রশ্ন করল ছেলেটি।

বিষ্ণুপ্রসাদ অভয় হাস্যের সঙ্গে বললেন, 'যতক্ষণ এবং যতটুকু সাধ্য আমি করব। তবে আশ্রয় দেবার মালিক তো আমি নই বাবা—সে মালিক কেশবজী। তুমি আমার সঙ্গে চল। তুমি শ্রান্ত এবং ক্ষুধার্ত। আগে তোমার আহার ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করা দরকার।'

'কিন্তু আপনি আমার সব কথা শোনেন নি। আমি আপনাকে ঠকিয়ে কোন সুবিধা নিতে চাই না। আমাকে আশ্রয় দিলে আপনি বিপদে পড়তে পারেন। খুব বেশী রকমের বিপদ। দিগ্বিজয়ী মামুদ শার বংশধর খুসরু মালিক আমার বাবা। ঘুরী সর্দার মুহম্মদ-বিন-সাম আর তার দাদা আমাদের গজনীর তখ্‌ৎ দখল করেছে। তাতেও তাদের তৃপ্তি নেই, আমরা এসে এই সুদূর ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলাম, সেখান থেকেও উৎখাত করতে এসেছে। আমাদের আজ কিছু নেই, তাদের প্রচুর শক্তি। শেষ আশ্রয় নিয়েছিলাম আপনাদের রাজা বিজয়দেবের কাছে—তিনিও বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। আমাদের শেষ আশ্রয়টুকুও গতকাল ঘুচেছে। আমার মা-বাবা-ভাই-বোন সবাই শত্রুর হাতে পড়েছে—হয় মৃত, নয় বন্দী। কেবল বাবার আদেশে আমিই পালিয়েছি। হয়ত দুশমনরা এখন আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কারণ আমি বেঁচে থাকতে তাদের শান্তি নেই। হয়ত খুঁজে বারও করবে আমাকে। সুতরাং আমাকে যে আশ্রয় দেবে, সে অনেকটা ঝুঁকি নেবে মাথায়। দেখুন—এ জেনেও আশ্রয় দেবেন?'

'আমি আশ্রয় দেবার কে বাবা? তুমি ললিতাকেশবের অতিথি। বিপদ বোঝেন—তিনিই ব্যবস্থা করবেন।'

অচঞ্চল কণ্ঠে উত্তর দিলেন বিষ্ণুপ্রসাদ।

'কিন্তু আমি মুসলমান—তা বুঝতে পেরেছেন আশা করি।'

এবার মুহূর্তখানেক চোখ বুজে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন বিষ্ণুপ্রসাদ। তারপর সামান্য একটু চাপা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'তুমি অতিথি, কেশবজীর আশ্রিত। তুমি আমাদের কাছে নারায়ণ। তুমি চল আমার সঙ্গে; হাঁটতে পারবে, না হাত ধরব?'

'না—বেশ পারব। চলুন।'

খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাহ্‌রাম ওঁর পিছনে পিছনে চলল।

এই ঘটনায় লালতাকেশো গ্রামে কিন্তু চাঞ্চল্য ও উত্তেজনার অবধি রইল না।

সাধারণত শান্ত স্তব্ধ বৈচিত্র্যহীন গ্রাম-জীবনে প্রচণ্ড ঝড় উঠল একটা—ক্ষোভ ও বিদ্বেষের। এ কী অনাচার? তাদের ধর্মের ঘরে এসব কি হ'তে শুরু করল? গুরুবংশের সর্বজ্যেষ্ঠ, এ গ্রামের অনেকেরই গুরু বা গুরুস্থানীয় বিষ্ণুপ্রসাদ—সকলেই যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে তাঁকে, তবু তাঁর এ কাজটা সমর্থন করতে পারল না অনেকেই। তিনি গুরু, তিনি ভগবানের প্রধান পূজারী—তিনি একটা বিজাতীয় বিধর্মী মুসলমানকে নিজের বাড়িতে এনে আশ্রয় দিলেন?

যদিও সে যে ঘরে আছে সেটা ঠিক মূল বাড়ির ভেতরে নয়, বাইরের দিকে অতিথিশালার মধ্যে সেটা, তবু এক প্রাঙ্গণ, এক প্রাচীরের মধ্যেই তো।

শুধু তাই নয়, সে আবার নাকি বলেছে যে কোন ঠাকুর-দেবতার প্রসাদ সে খাবে না, তার জন্য পৃথক রান্না করতে হবে। আর বিষ্ণুপ্রসাদও নাকি নিজের গৃহিণী-পুত্রবধূ-কন্যাদের দিয়ে ঐ ম্লেচ্ছের জন্য পৃথকভাবে পাক করাচ্ছেন।

আবার উনি নাকি কোন্ রাজপুত্র—ওঁর দ্বারা নাকি নিজের বাসন ধোওয়াও সম্ভব নয়। প্রথম সে হুকুমও দিয়েছিলেম বিষ্ণুপ্রসাদ যে কুল-নারীরাই কেউ ওর বাসন মেজে দেবে, তাতে নাকি দোষ নেই—অতিথি-সেবার জন্য সব কিছুই নাকি করা যেতে পারে। নেহাৎ ছেলেটাই বুঝি বেগতিক দেখে মাটির বাসন আর পাতায় খেতে রাজী হয়েছে—তাই তবু রক্ষা।

তাও সুলতান বাহাদুরের ঘরে দুবেলা খাবার পৌঁছে দিয়ে আসতে হয়, সন্ধ্যায় প্রদীপ জেবলে দিয়ে আসতে হয়—উনি নাকি নিজে কিছুই করতে পারেন না। ইতিমধ্যে বিষ্ণুপ্রসাদ নাকি একদিন স্নানের আগে নিজে ওর বিছানা সাফ ক'রে ঘর ঝাঁট দিয়ে এসেছেন। এ কী অঘটন! গুরুবংশের এ কী অধঃপতন!

অভিযোগ, অনুযোগ এবং বিক্ষোভ কিছু কিছু খোদ বিষ্ণুপ্রসাদের কানেও যে না আসে এমন নয়। কিন্তু তিনি অবিচলিত নির্বিকার, কিছুই তাঁকে বিচলিত করতে পারে না কোন দিন। এখনও তিনি শুধু বলেন, 'আশ্রয়প্রার্থী অতিথি নারায়ণ। ওর সেবা স্বয়ং কেশবজীরই সেবা।'

আরে সেবা তো বোঝা গেল, কিন্তু আমাদের সেবা আমাদের মতই তো করতে পারি। অত কেন? ওঁর জন্য পৃথক রাঁধতে হবে? কেন?

এমন কী পীর মহাপুরুষ উনি? ওদের তো নাকি খাদ্যাখাদ্য বিচার নেই। আজ যদি ও আব্দার ধরে গোমাংস রেঁধে দিতে হবে—গুরুজী তাও দেবেন নাকি?

এমন অসংখ্য বাঁকা বাঁকা প্রশ্ন ওঠে। বিষ্ণুপ্রসাদ হেসে বলেন, 'সে আবদার তো ধরে নি। আমার যথাসাধ্য আমি করব—ওটা চাইলে সাধ্যাতীত ব'লে বাদ দিতে হবে। তাতে আর অসুবিধাটা কি?'

অর্থাৎ মালিক বাহ্‌রাম থেকেই যায়। নিশ্চিন্ত নিরাপদ আশ্রয় পেয়ে

হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। আদরে লালিত সে, একদিনের অনিশ্চিত জীবনযাত্রাতেই সে ভীত, উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল।

এখানে বাহ্‌রামের দিন বিলাসে না হোক আরামেই কাটে। বেশ লাগে তার জায়গাটা। পাহাড়ে অরণ্যে নির্ঝরিণীতে মনোরম। এঁদের আতিথেয়তারও তুলনা নেই। সুন্দর একটি ঘর, কোমল শয্যা এবং দুবেলা নিয়মিত আহার। কালিয়া-কাবাব মেলে না সত্য কথা, কিন্তু রুটি সব্‌জি ফল দুধ—এই বা মন্দ কি? বরং আজকাল যেন বাহ্‌রামের মনে হয়, ওদের পোলাও-কালিয়ার চেয়ে এই খাবারই ভাল।

শুধু একটা তার অসুবিধা—কথা কইবার লোক কম।

এখানকার গ্রামবাসীরা কেউ অভদ্র ব্যবহার করে না এটা ঠিক, তেমনি প্রীতির চোখেও যে দেখে না তা বাহ্‌রাম তাদের ভাবে-ভঙ্গীতে, তাদের মুখ দেখেই বুঝতে পারে।

উড়ো আপদ বলে মনে করে এরা, মনে করে তাদের ভবিষ্যৎ বিপদের সম্ভাব্য কারণ। তাই যথাসাধ্য সকলে ওকে এড়িয়েই চলে।

ওর ঘরে আসবার মধ্যে দৈনিক চারবার ক'রে খাবার দিতে আসে বিষ্ণুপ্রসাদের পৌত্রী বিশাখা অথবা পৌত্র সূর্যপ্রসাদ। বিশাখার বয়স তের কি চৌদ্দ—সূর্যপ্রসাদের সামান্য একটু বেশী। হয়তো সতেরো কিংবা আঠারো। প্রায় ওর সমবয়সী। তাছাড়া আর তো কোন লোকই নেই হাতের কাছে। তাদের সঙ্গেই যা একটু গল্প করতে পায় বাহ্‌রাম রোজ কিছুক্ষণ।

প্রথম প্রথম ওরাও এড়িয়ে চলত, মাটির পাত্রে ও পাতার ঠোঙায় সাজানো খাবার এনে বসিয়ে দিয়েই ছুটে পালাত, কিন্তু ক্রমে একটু একটু ক'রে ভয় ভাঙল। এখন একটু ক'রে সময় কাটিয়ে যায় এখানে। যদিচ বাহ্‌রামের শয্যাতে বসে না তারা, ঘরের মেঝেতে বা দোরের বাইরে আল্‌তো দাঁড়িয়ে গল্প করে।

ওদের মনে এখনও কোন অন্ধ সংস্কার বাসা বাঁধার অবকাশ পায় নি। ওরা বুঝতেও পারে না এর সম্বন্ধে সকলের এত উষ্মা এত বিদ্বেষ কেন? ওদের তো ভালই লাগে এর সাহচর্য। বিশেষ ক'রে বিশাখার তো কথাই নেই—তার খুবই ভাল লাগে এই কিশোরটিকে। হয়ত রূপবান বলিষ্ঠ পুরুষের প্রতি নারীজাতির সহজাত আকর্ষণ এটা। কে জানে!

কিন্তু সে যাই হোক, এদেরই মুখ থেকে বাহ্‌রাম শুনতে পায় অনেক কথা। এই গ্রামবাসীদের পরিচয় অর্থাৎ কে কেমন—বিষ্ণুপ্রসাদ, ওদের বাবা বৃন্দাপ্রসাদ, চাচা বলদেওপ্রসাদ কেমন লোক; গ্রামের লোকেরা ওঁদের কী পরিমাণ ভক্তি করে; মন্দিরে কী কী দিনে কোন্ কোন্ উৎসব হয়; সে উৎসবে কত খরচ হয়; ভোগে নিত্য যে ক্ষীর বা পায়স দেওয়া হয়—আলাদা তৈরী করলে নাকি তেমন স্বাদ হয় না কিছুতেই, প্রসাদ না খেয়ে খুবই ঠকছে মালিক বাহ্‌রাম—এইসব কথা কল-কল ক'রে বলে যায় তারা।

প্রথম প্রথম ভাষা নিয়ে একটু অসুবিধা হ'ত—বাহ্‌রামের বাঁকা উচ্চারণ ওরা ঠিক ঠিক বুঝতে পারত না সব সময়। ওদের দেহাতী বুলিও সব বোঝা বাহ্‌রামের বিদ্যাতে কুলোত না। তখন ইশারা-ইঙ্গিতে কাজ চলত। এখন আর অসুবিধা নেই কিছু। মানুষ যখন উন্মুখ হয়ে ওঠে মনের কথা মুখে প্রকাশ করতে, তখন ভাষা যাই হোক তার অর্থ বুঝতে মনের অসুবিধা হয় না।

বাহ্‌রাম একটু একটু ক'রে আকৃষ্ট হয় তাদের দিকে, সূর্যপ্রসাদের সঙ্গে তো রীতিমত একটা সখ্যই গড়ে ওঠে তার। আর বিশাখা? বিশাখাকে তার বড় ভাল লাগে। এ ভাল লাগার কোন বিশেষ অর্থ সে বোঝে না—শুধু বোঝে যে বিশাখা এসে দাঁড়ালে তার দেহের প্রতি রক্তকণায় জাগে এক অজানা উত্তেজনার অধীরতা—তার মনের সমস্ত রন্ধ্রকোণ এক অজানা আনন্দের আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

সে আলোর তুলনা নেই। তেমন আলোর আভাস কখনও পায় নি সে।

সারা দিন-রাতের প্রতিটি জাগ্রত মুহূর্ত সেই মূর্তিমতী আলোকদূতীর জন্য প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে থাকে সে। আজকাল এমন কি তার বদলে দোস্ত্ সূর্যপ্রসাদ এলেও একটু ক্ষুণ্ণই হয় মনে মনে।

রাত্রে শুয়েও অর্ধসচেতন, অর্ধতন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় অলস কল্পনাস্বপ্নে কখন তার ছেড়ে-আসা বালিকা বধূর সঙ্গে এই মেয়েটি মিশে যায়—দুটো ছবি একাকার হয়ে গিয়ে কখন শেষ পর্যন্ত এই বালিকাটির ছবিই স্পষ্ট হয়ে জেগে থাকে সেখানে—তা বুঝতেও পারে না।

॥ ৭ ॥

আতিথেয়তার এই অতিরিক্ত আতিশয্যে গ্রামের মধ্যে যে লোকটি সবচেয়ে বিরক্ত হয় সে হচ্ছে বৃন্দাপ্রসাদ—বিশাখা ও সূর্যর বাবা।

তার ক্রোধ বরাবরই একটু বেশী, সেজন্য বাড়ির লোক সবাই তাকে ভয় করে—এক বিষ্ণুপ্রসাদ ছাড়া। পিতা গুরুজন, বাড়ির কর্তা—গ্রামসুদ্ধ লোকের গুরু—তাঁর আদেশ অলঙ্ঘনীয়, সুতরাং একমাত্র তাঁর কাছেই মাথা হেঁট ক'রে থাকতে হয় বৃন্দাপ্রসাদকে।

কিন্তু মনে মনে সে কিছুতেই অনুমোদন করতে পারে না তাঁর এই ব্যবহার।

সে মনোভাব তার শাণিত বাক্যে, রুষ্ট পদক্ষেপে ও ভয়ঙ্কর ভ্রূকুটিতে অহরহই প্রকাশ পায়—বাড়িসুদ্ধ লোক সকলে তটস্থ হয়ে ওঠে তার এই উষ্মার চেহারা দেখে—কেবল বিষ্ণুপ্রসাদই নির্বিকার থাকেন।

ক্রমে তাঁর প্রতি অবিচল আনুগত্য ও শ্রদ্ধাও বৃন্দাপ্রসাদকে আর শান্ত রাখতে পারে না।

হয়ত নিজের ছেলেমেয়ের সঙ্গে ম্লেচ্ছ ছেলেটার একটা প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছে এটা লক্ষ্য ক'রেই—সে একটু শঙ্কিতও হয়ে ওঠে।

হয়ত গ্রামের লোকের আলোচনা ও মন্তব্য কানে এসে পৌঁছবার ফলে সে অপমানিতও বোধ করে নিজেকে। কারণ যাই হোক—একদিন সোজা গিয়ে বাবার সামনে দাঁড়িয়ে সে নতমুখে নিঃসঙ্কোচে বলে, 'আপনি আমার বাবা, আমার ওপর আপনার সবরকম জোর চলে—কিন্তু যেখানে আমার সম্পূর্ণ অধিকার, সেখানে আপনি জোর খাটাতে যান কেন?'

বিষ্ণুপ্রসাদ বিস্মিত হলেন কিনা তা তাঁর মুখ দেখে বোঝা গেল না। তিনি শুধু প্রশান্ত মুখ ছেলের দিকে ফিরিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'অর্থাৎ?'

'আমার ছেলেমেয়ের আমি বাবা। আমার মতামতের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা, তাদের আনুগত্য থাকা দরকার। আমি পছন্দ করি না যে, তারা ঐ বিধর্মীর ঘরে গিয়ে খাবার পেঁৗছে দিয়ে আসে বা তার সঙ্গে গল্প-গুজব করে।'

'তাহ'লে নিশ্চয়ই তাদের যাওয়া উচিত নয়। আমি সেটা ঠিক বুঝতে পারি নি। আমার উচিত ছিল তোমাকে আগে জিজ্ঞাসা ক'রে তোমার মত নিয়ে তাদের একাজে নিযুক্ত করা। সেটা আমার ত্রুটি ঘটে গিয়েছে। যাই হোক্—তুমি তাদের নিষেধ ক'রে দিও। আর সেক্ষেত্রে তুমিই বরং ওর ঘরে খাবার ও পানীয় জল পৌঁছে দিও সময়মত। তোমাকে অবশ্যই আদেশ করার অধিকার আমার আছে। সেই অধিকারেই একথা বললাম।'

তিনি আর দাঁড়ালেন না। অবিচলিত মুখে গিয়ে নিজেদের গৃহদেবতার পূজার ঘরে প্রবেশ করলেন।

অনেকক্ষণ সেইখানেই চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল বৃন্দাপ্রসাদ—দাঁতে ঠোঁট চেপে।

অনেক ভেবেচিন্তে অনেক হিসেব ক'রে কথাটা বলেছিল সে। বাবাকে কী পরিমাণ অপ্রতিভ করতে পারবে—এই ভেবে সে বেশ একটু উল্লসিতও হয়ে উঠেছিল। মনে মনে নিজের বুদ্ধির তারিফও করছিল। ভেবেছিল বাবা আর কোন উত্তরই দিতে পারবেন না। এইভাবে যে এটা ফিরে তার ওপরই এসে পড়বে তা একবারও ভাবে নি। সেই রাগেই দাঁত দিয়ে নিজের ঠোঁট কামড়াতে লাগল সে। আর তার ফলে কিছুক্ষণ পরে ঠোঁটের কোন কোন স্থান কেটে রক্তও পড়তে লাগল, কিন্তু সে লবণস্বাদেও তার সম্বিত ফিরল না। কেমন এক রকমের ক্রূর অথচ শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে স্তম্ভিত হয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল বহুক্ষণ।

তাকে ঐ একভাবে এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বাড়ির অন্যান্য লোকজন কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে এল কেউ কেউ, প্রশ্নও করতে গেল অনেকে—কিন্তু তার মুখ-চোখের সেই ভয়ঙ্কর চেহারা দেখে তাদের মুখের কথা মুখেই মিলিয়ে গেল, তৎক্ষণাৎ সভয়ে সরে গেল সবাই।

অনেক—অনেকক্ষণ, প্রায় একদণ্ডকাল সেইভাবে পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকার পর অকস্মাৎ বৃন্দাপ্রসাদের মুখ প্রসন্ন হয়ে উঠল। অতি ক্ষীণ একটা হাসির রেখাও ফুটে উঠল ঠোঁটের কোণে। সে বাড়ির পেছনের আস্তাবলে গিয়ে নিজের পাহাড়ী টাট্টুটি খুলে নিয়ে তাতে চেপে বসল।

কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে কাউকেই বলল না ; জিজ্ঞাসা করবারও সাহস হ'ল না কারুর। শুধু ঘোড়া ছোটাবার ভঙ্গীতে মনে হ'ল, তার একটু তাড়াই আছে। সদ্য-ভেঙে-নেওয়া চীরগাছের ডালের আঘাতে শিক্ষিত টাট্টু যাত্রার সঙ্গে সঙ্গেই বেশ জোর কদম ধরল। দেখতে দেখতে সে অশ্ব ও অশ্বারোহী উচ্চাবচ পার্বত্য-পথে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বৃন্দাপ্রসাদ ঠিক তিনটি দিন অনুপস্থিত থাকার পর বাড়ি ফিরল খুব খুশমেজাজে। সে মানুষই যেন নয়—সবাইকে ডেকে ডেকে কুশল জিজ্ঞাসা করতে লাগল, অকারণেই হাসি-ঠাট্টা জুড়ে দিতে লাগল। এমন কি বাড়ির দাসী-চাকরদের সঙ্গেও হেসে হেসে কথা কইতে লাগল—যা একেবারেই তার স্বভাববিরুদ্ধ। তার রূঢ় ও রুষ্ট স্বভাবের জন্য দাসী-চাকররা সর্বদা তাকে দূরে দূরে পরিহার ক'রে চলত।

সবই করল, শুধু কোথায় এবং কী কাজে এই তিনদিন অনুপস্থিত রইল, কোন্ এত প্রয়োজনীয় কাজে তার প্রাতিদিনের পূজাপাঠ নিয়মকর্মের ব্যাঘাত ক'রে তাকে বিদেশে ছুটতে হয়েছিল, সেই কথাটি বলল না কাউকে। সম্ভবত খাওয়াও হয় নি কদিন ভাল—কারণ এদিকে অত্যন্ত আচারনিষ্ঠ বৃন্দাপ্রসাদ —পরগোত্রে অন্নাহার করে না। সম্ভবত এই কদিন ফল খেয়েই কাটাতে হয়েছে তাকে।

তার এই আপাত-প্রসন্ন মূর্তিতে বাড়ির অপর সকলে ভুললেও বালিকা বিশাখা ভুলল না।

কারণ বরাবরই সে বৃন্দাপ্রসাদের কাছে কাছে থাকত। ফাই-ফরমাশ তার যা কিছু বরাবর বিশাখাকেই খাটতে হ'ত। সে-ই তাকে চেনে সবচেয়ে বেশী। সেদিন ঘোড়ায় চড়বার আগে—সেই হাসিটাও দেখেছিল সে। এ মূর্তি যে বৃন্দাপ্রসাদের স্বাভাবিক নয়—তা সে বুঝতে পারল।

তার মনের মধ্যে একটা অকারণ উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা তাকে অস্থির ক'রে তুলল যেন। কী একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় তার বুক দুরু দুরু ক'রে উঠল।

কিসের আশঙ্কা তা ঠিক না বুঝলেও তার কেবলই মনে হ'তে লাগল কোথাও একটা বড় রকমের কি বিপর্যয় ঘটবে।

অবশেষে সে আর থাকতে না পেরে সবার অলক্ষ্যে অসময়েই বাহ্‌রামের ঘরে গিয়ে উপস্থিত হ'ল।

বাহ্‌রাম তখন তার খাটিয়াতে বসে জানলার বাইরে দিয়ে দূর তুষারাবৃত পর্বতমৌলির দিকে চেয়ে ছিল, বোধ করি ভাবছিল বিশাখার কথাই। হঠাৎ সেই ধ্যানমূর্তিকে সামনে প্রত্যক্ষ ক'রে প্রথমটা বিশ্বাসই হ'তে চাইল না তার, তারপর খুশি হয়ে বলে উঠল, 'আরে এ যে দিনদুপুরে চাঁদ উঠল আশমানে! ব্যাপার কি? হঠাৎ এত মেহেরবানি? কোন ফরমাশ থাকে তো বল—বসে বসে আর ভাল লাগছে না। কিছু একটা কাজ করতে পারলেও বেঁচে যাই। যাক ভেতরে এস। বসবে না তো—তবু কাছে এসেই দাঁড়াও।

তারপর ? আজ এমন অসময়ে আসার মর্জি হল যে ?'

'তামাশা রাখ শাহ্‌জাদা', কাছে এসে কম্পিত কণ্ঠস্বর নামিয়ে এনে বলে বিশাখা, 'আমার মনে হচ্ছে, তোমার খুব বড় একটা বিপদ আসন্ন। বাবার ভাবগতিক ভাল বোধ হচ্ছে না একটুও। এ ক'দিন কোথায় ছিলেন তিনি, কী ক'রে এলেন, এত খুশিই বা কেন ? তুমি আসার পর থেকেই তো রেগে ছিলেন, সে রাগ বাড়ছিলই দিন দিন বরং—হঠাৎ এত খুশির কারণ কি ? আমার মনে হচ্ছে তোমাকে এখান থেকে তাড়াবারই একটা মতলব আঁটছেন ভেতরে ভেতরে। কে জানে, কোন দুশমনের সঙ্গে কোন বন্দোবস্ত ক'রে এলেন কিনা ?—তুমি, তুমি এখান থেকে পালাও শাহজাদা !'

বাহ্‌রামের মুখের হাসি মিলিয়ে এল। সে স্তব্ধ হয়ে বিশাখার মুখের দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ, যেন কথাটার পুরো অর্থ বোঝবার চেষ্টা করতে লাগল।

অনেকক্ষণ পরে অর্থটা হয়ত বোধগম্য হ'ল, কিন্তু ঠিক বিশ্বাস হ'ল না। একবার নিজের চেহারার দিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে সে যে স্বপ্ন দেখছে না এইটেই যেন বুঝতে চেষ্টা করল।

তারপর আবার জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চাইল।

ঝলমল করছে আকাশ ও প্রকৃতি। দূর পাহাড়ের উজ্জ্বল বরফে-ঢাকা চূড়োয় সূর্যালোক পড়ে বিদ্যুতের মতই চোখধাঁধানো দীপ্তির সৃষ্টি করেছে—দর্পণে প্রতিফলিত আলোর মতোই। নীচে ঘন সবুজ অরণ্য—মধ্যে মধ্যে গলিত হীরকের মত ছোট ছোট পার্বত্য ঝরনা, সবটা মিলিয়ে যেন এক স্বপ্নলোক।

এখানে বিপদ ? এখানে মৃত্যুভয় ? বিশ্বাস হয় না যে কিছুতেই।

তাছাড়া তার যা বয়স—এই বয়সে মানুষ মানুষকে বিশ্বাস করতেই চায়, ভালবাসতেই চায়। অবিশ্বাস করা তার স্বভাববিরুদ্ধ। বিশেষত যেখানে ভালবাসা পেয়েছে—পেয়েছে ভদ্র ব্যবহার, সেখানে কোন বিপদ, কোন ষড়যন্ত্র থাকতে পারে তা বিশ্বাস করা ওর পক্ষে কঠিন বৈকি।

জোর ক'রে আবার মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলে বাহ্‌রাম, 'না না বিশাখা, তুমি মিথ্যে ভয় পাচ্ছ। তোমার বাবা আমার ওপর খুব প্রসন্ন নন সত্যি কথা, কিন্তু তাই ব'লে কোন বড় রকমের দুশমনী কিছু করবেন ব'লে মনে হয় না। তুমি একটু বেশী ভীতু।'

কিন্তু বিশাখার মুখের ভীতিপাণ্ডুরতা কিছুতেই যায় না। সে তেমনি নীচু মিনতিভরা গলাতেই বলে, 'জোর ক'রে হেসে উড়িয়ে দিও না শাহ্‌জাদা। আমার বাবাকে তুমি চেনো না। প্রচণ্ড রাগ ওঁর। উনি রেগে গেলে ঠাকুর্দা-মশাই ছাড়া ওঁর সামনে কেউ যেতেই সাহস করে না। সেদিন তোমার কথা নিয়েই ঠাকুর্দামশাইয়ের সঙ্গে কী কথা-কাটাকাটি হয়েছিল, তার পরই ঘন মেঘের মত অন্ধকার মুখ ক'রে কোথায় চলে গিছলেন—একেবারে ফিরলেন এই তিনদিন পরে। কে জানে, আমার কেবলই মনে হচ্ছে, তোমার দুশমনদের

সঙ্গেই কোন ষড়যন্ত্র ক'রে এলেন তিনি।...না না, তুমি অমন ক'রে হাত-পা ছেড়ে বসে থেকো না শাহ্‌জাদা, দোহাই তোমার, এখনও হয়ত সময় আছে, এখনও হয়ত চেষ্টা করলে এদের বিদ্বেষের বাইরে যেতে পারবে।

এবার বাহ্‌রামের মুখের হাসি সত্যি-সত্যিই মিলিয়ে গেল, সে জায়গায় ফুটে উঠল একটা করুণ বিষণ্ণতা।

কান্নার চেয়েও করুণ ম্লান হেসে বলল, 'কিন্তু কোথায় যাব বিশাখা বলতে পার? একেবারে সহায়-সম্বলহীন, তোমাদের দয়ায়, বলতে গেলে ভিক্ষাতে দিন কাটছে। হাতিয়ার নেই, সওয়ার নেই, পয়সা নেই। আমি রাজার ছেলে—সাধারণ চাষীর ছেলে হ'লে জন-মজুরী খাটতে পারতুম, লোকে সহজে আশ্রয়ও দিত। আমার পিছনে শক্তিশালী বাদশার শত্রুতা সর্বদা তাড়া করছে। তার ওপর আমি বিধর্মী, বিধর্মী লোককে কেউ প্রীতির চোখে দেখে না কখনও। অকারণেই বিদ্বিষ্ট হয়ে ওঠে। কোথায় যাব, কে আশ্রয় দেবে? রাজার আশ্রয় রাজা, পরাজিত পলায়িত রাজা বা রাজপুত্র অন্য রাজার আশ্রয়েই আবার শক্তি সঞ্চয় করে। আমার ভাগ্যে যে তাও নেই। যে আশ্রয় দিলে সে-ই বিশ্বাসঘাতকতা করলে। তা নইলে ক'জন অনুচরও অন্তত যদি থাকত, পালাতে পারতুম অন্য কোথাও। এমন অসহায় হ'তে হ'ত না। আজও সেই রাজার রাজত্বেই আছি—এর বাইরে না গেলে তো নিজের পরিচয়টা পর্যন্ত দিতে পারব না।'

'তা হ'লে এর বাইরেই চলে যাও। শুনেছি দিল্লী আজমেরের রাজা খুব পরাক্রান্ত বীর, দুর্ধর্ষ যোদ্ধা, তিনি নাকি কাউকেই ভয় করেন না—এক ধর্ম ছাড়া। তাঁর কাছেই গিয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করো না। নইলে কনৌজ আছে, গুর্জর আছে—কোন্‌দিকে তা জানি না, তবে এদেরও খুব নাম শুনেছি। সবাই অধার্মিক নয়। কেউ না কেউ আশ্রয় দেবেই—তুমি কোনমতে সেই সব দেশে পালিয়ে যাও।'

'কী ক'রে যাব? হেঁটে কতদূর যাব? পথও চিনি না। সীমানা পার হবার আগেই ধরা পড়তে হবে। সে হয় না বিশাখা, অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে।'

করুণ বিষণ্ণ কণ্ঠে বললে বাহ্‌রাম। তার সমস্ত ভঙ্গীতে একটা হতাশা, নিদারুণ অসহায়তা ফুটে উঠল।

বিশাখা মাথা হেঁট ক'রে চলে গেল। তার দু'চোখে জল ভরে এসেছিল, বোধহয় সেই জল গোপন করতেই একরকম ছুটে পালিয়ে গেল সে।

॥ ৮ ॥

বিশাখা আবার দেখা দিল একেবারে শেষরাত্রে।

সন্ধ্যায় খাবার দিতে আসে নি সে।

সূর্যপ্রসাদও আসে নি।

কে এক অন্তঃপুরিকা দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে পরিচয় আবৃত ক'রে একবার এসে

খাবার ও জল দরজার বাইরে থেকে চৌকাঠের এধারে নামিয়ে রেখেই চলে গিয়েছিল।

আজকাল কেউ সন্ধ্যা দিতেও আসে না। প্রদীপ তেল ও চকমকি ওর ঘরেই থাকে, ইচ্ছে হ'লে জেবলে নেয় বাহরাম।

ওরা ভাইবোন কেউই না আসাতে অন্যরকম ভেবেছিল সে। একটু শঙ্কিতই হয়েছিল ওদের জন্য।

আর সেই সঙ্গে নিজের জন্যও। ভেবেছিল বৃন্দাপ্রসাদ ছেলেমেয়েদের নজরবন্দী করেছে ওর প্রতি তাদের পক্ষপাত লক্ষ্য ক'রে—সম্ভবত তাকে বন্দী বা হত্যা করবারই ভূমিকা স্বরূপ।

তবু পালাবার বা আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করে নি সে। হতাশা একরকমের মরীয়া ভাব এনে দেয় মানুষের মনে—সেই ভাবেই যেন ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পণ ক'রে নিশ্চিন্ত হয়েছিল সে। খোদা যতদিন পরমায়ু ঠিক ক'রে দিয়েছেন, যে ক'দিন এই পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ-আলো তার ভাগ্যে আছে, আছে যে ক'দিনের আহার-নিদ্রা বরাদ্দ—তা থেকে কেউ তাকে বঞ্চিত করতে পারবে না, তা সে জানে।

তারপর ?

তার পরের কথা নিয়ে আর মাথা ঘামাতে পারে না সে। যা হয় হবে। এই দুশ্চিন্তা, এই অপমান, প্রাণরক্ষার জন্য এ প্রাণান্ত আর ভাল লাগে না। ভাগ্যকে যেন তুড়ি মেরে পরিহাস ক'রেই—'তোমার যা সাধ্য, যতদূর সাধ্য করো গে', মনে মনে এই কথা বলে ই নিশ্চিন্ত আলস্যে গা এলিয়ে দিয়েছিল।

এই মনোভাবের জন্যই কপাটে সেদিন আগলটাও দেয় নি সে। সামান্য খিল—একটু আঘাতেই ভেঙে যাবে—লাগিয়ে লাভ কি ? এটা লাগানো হ'ত ছোটখাট পাহাড়ী জন্তুদের সম্ভাব্য আক্রমণ রোধ করতেই—আজ আর তাদেরও ভয় করে না বাহরাম।

জন্তুরা মানুষের চেয়ে, মানুষের মতো হিংস্র নয়—এই অল্প বয়সেই এ অভিজ্ঞতা হয়েছে তার।

খিল দেওয়া ছিল না বলেই বিশাখার আগমনও সে টের পায় নি। বিশাখার এ একটা ভয়ই ছিল, সামান্য হাতের ঠেলায় দরজাটা খুলে যেতে সে ভয়টা থেকে যেমন নিশ্চিন্ত হয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে, তেমনি আর একটা নিদারুণ আতঙ্কে বুক কেঁপে উঠল তার—নিমেষের মধ্যে হাত-পা অসাড় হয়ে গেল। বিছানার দিকে চাইতেও সাহসে কুলোল না। অবশেষে আর সময় নেই বলেই কতকটা মরীয়া হয়ে চেয়ে দেখল সে।

কিন্তু না, মিছে ভয় তার। পাহাড়ের আড়ালে ঢলে-পড়া চন্দ্রের শেষ আভা নির্মেঘ আকাশে এবং তুষারমৌলি পর্বতশিখরে প্রতিফলিত হয়ে যেটুকু আলোর সৃষ্টি করেছিল তাইতেই দেখা গেল, বাহরাম গাঢ়ঘুমে অচেতন।

বিশাখা ভুলে গেল সব নিষেধাজ্ঞা, জোর ক'রে ঝেড়ে ফেলে দিল সব

সঙ্কোচ। বিছানার কাছে গিয়ে বাহ্‌রামের গা ঠেলে চাপাগলায় ডাকল, 'শাহ্‌জাদা শাহ্‌জাদা, ওঠো! কী আশ্চর্য, এমন বিপদের দিনেও কী ক'রে এমন ঘুমোতে পার তুমি! ওঠো ওঠো, উঠে বোস। আর যে মোটে সময় নেই। এমন সময়ও তোমার যদি না ঘুম ভাঙে তো কী করব!'

বাহ্‌রামের ঘুম ভাঙলেও বিশ্বাস হ'তে চাইল না বাস্তব অবস্থাটা। তার মনে হ'ল স্বপ্নই দেখছে সে। হয়ত স্বপ্নই দেখছিল সে এই পর্বতবাসিনী কিশোরীকে, হয়ত আজও তার স্বপ্নে তার কিশোরী বধূ আর এই পার্বতী এক হয়ে গিয়েছিল। সেই মধুর স্বপ্নেরই রেশ এখনও তার চোখে তার চৈতন্যে লেগে রয়েছে বলে মনে হ'ল। কারণ এ সৌভাগ্য যে অচিন্ত্যনীয়, কল্পনাতীত।

বিহ্বল স্বপ্নালু দৃষ্টিতে চেয়ে আছে বাহ্‌রাম, অসহিষ্ণু বিশাখা আবারও ঠেলা দিল, 'ওঠো, ওঠো। তুমি উঠে দাঁড়াও—তোমার পায়ে পড়ি। আমি যে আর ভাবতে পারছি না। যে কোন মুহূর্তে যে ওরা এসে পড়তে পারে।'

এবার বাহ্‌রামের আর সন্দেহ রইল না। কিন্তু বিপদের চেয়ে—সর্বনাশা ভবিষ্যতের চেয়ে—এই অত্যাশ্চর্য স্বপ্নাতীত বর্তমানই তার কাছে বড় হয়ে উঠল।

সে সজোরে বিশাখার হাত চেপে ধরে বললে, 'বিশাখা তুমি এসেছ, তোমাকে তাহ'লে ওরা বন্দী করতে পারে নি? আঃ বাঁচলাম!'

তারপর নিজের হাতের মধ্যে ধরা একমুঠো জাফরান ফুলের মত সেই নরম হাতদুটোতে আর একটু চাপ দিয়ে বললে, 'কিন্তু কী আশ্চর্য, তুমি আমাকে ছুঁলে যে বড়! আমার যে বিশ্বাসই হচ্ছে না—তোমাকে কি সত্যিই হাত দিয়ে ধরতে পেরেছি?'

চাপা কান্নার আর্তস্বরের সঙ্গে আকুলতা মিশে অদ্ভুত একটা স্বর বেরোল বিশাখার কণ্ঠ দিয়ে; সে আবার অসহিষ্ণু মিনতির সঙ্গে বলল, 'আঃ কী ছেলেমানুষি করছ শাহ্‌জাদা! সময় যে একেবারে নেই! তোমার জন্যে ভেবে ভেবে আমার যে মাথা খারাপ হ'তে বসল! তুমি কি কিছুই করবে না—একটু ভাববারও চেষ্টা করবে না অবস্থাটা?'

'কিন্তু—তাই তো, তুমি এমন ভাবে—অন্ধকারে, শেষ রাত্রে—! সত্যিই তো, সেইটেই আমার ভেবে দেখা উচিত ছিল। ব্যাপার কি বল তো? আর তার আগে, যদি ছুঁয়েইছ তো, একটু এখানে বোস।'

টেনে, একরকম জোর ক'রেই, বিছানার একপাশে বসায় ওকে বাহ্‌রাম।

খুব একটা বাধা দেয় না বিশাখাও। এমন কি হাতদুটো যে এখনও বাহ্‌রামের হাতের মধ্যে বন্দী, তাও বোধ হয় তার মনে পড়ে না।

'ব্যাপার কি বল তো?' আবারও প্রশ্ন করে বাহ্‌রাম।

বিশাখা তখন কাঁপছে বেতসপাতার মত। সে কি শুধুই দুশ্চিন্তা, শুধুই ভয়?

নাকি একটা অজানা উত্তেজনাও?

বালিকা বয়সে যে উত্তেজনা, যে অনুভূতির কারণ জানার কথা নয়—তবু যা মাঝে মাঝে অনতিক্রান্ত বাল্যেও অনুভব করে কেউ কেউ—যা বয়স-পাত্র বিচার করে না, সময়ের পরিমাপ দিয়ে যা মাপা যায় না!

সে কাঁপন বাহুরোমও অনুভব করে।

আর এ বুঝি তার একেবারে অপরিচিতও নয়।

তার বালিকা বধূর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিনগুলিতে ঠিক এমনই কম্পন, মুঠোর-মধ্যে-ধরা নরম হাত দুটিতে এমনই স্বেদার্দ্রতা অনুভব করেছে সে।

সে বিশাখার আর একটু কাছে সরে এসে বসে। জোর ক'রে আশ্বাসের সুর টেনে এনে বলে, 'ভয় কি, এখনও তো আমি আছি তোমার পাশে। যতক্ষণ আমার জ্ঞান থাকবে, যতক্ষণ একফোঁটা রক্ত থাকবে আমার দেহে—তোমার কোন ক্ষতি কেউ করতে পারবে না।'

এত উদ্বেগের মধ্যেও হাসি পায় বিশাখার।

যেন সে নিজের বিপদের কথাই ভাবছে।

আর এই ম্লান মধুর হাসির মধ্যেই যেন কেমন ক'রে একটু শক্তি সঞ্চয় করে সে।

আর সময়ও যে নেই মোটে। যেমন ক'রেই হোক এ দুর্বলতা দূর করতে হবে।

কাঁপা গলায়, আস্তে আস্তে, থেমে থেমে কথাটা বলে বিশাখা।

দুপুরে এখান থেকে চলে গিয়েছিল সে—কিন্তু শুধুই নিভৃতে চোখের জল আর অসহায় দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে নয়। সে সূর্যপ্রসাদের কাছে কান্নাকাটি ক'রে তার হাতে-পায়ে ধরে তাকে পাঠিয়েছিল গ্রামের বাইরে—রাজধানী থেকে আসবার প্রধান রাস্তাটা পর্যন্ত এগিয়ে দেখে আসতে।

সূর্যপ্রসাদ যজ্ঞের কাঠ কেটে আনবার নাম ক'রে ঠাকুর্দার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে বেরিয়েছিল—কিন্তু সেই জন্যই ঘোড়া নিয়ে যেতে পারে নি। যজ্ঞের কাঠ অশ্বপৃষ্ঠে বোঝাই দিয়ে নিয়ে আসার নিয়ম নেই এ বাড়িতে—হেঁটে গিয়ে কাঁধে ক'রে আনতে হয়। সেই পৌরাণিক যুগের মতোই। পৌরাণিক কাহিনী শুনিয়ে উদাহরণ দিয়ে বিষ্ণুপ্রসাদ বলেন তাদের, এটা ব্রাহ্মণদের কর্তব্য।

সুতরাং যেতে-আসতে তার বহু সময় কেটে গেছে। সন্ধ্যার পর ফিরেছে সে। তাও তখনই কিছু বিশাখাকে সংবাদটা দিতে পারে নি। চারিদিকে বহু পরিজন। সকলের সামনে ভাই-বোনে গোপনে কথা কইলে স্বভাবতই তাদের সন্দেহ জাগত।

গভীর রাত্রে শুতে যাবার সময় খবরটা দিয়েছে সূর্যপ্রসাদ।

শুধু দেখেই আসে নি—শুনেও এসেছে অনেক। ছিপছিপে কিশোর সূর্যপ্রসাদ গাছের আড়ালে আড়ালে আত্মগোপন ক'রে একেবারে তাদের পিছনে চলে গিয়েছিল। চীরপাতায় পায়ের মচমচানি জাগে না, তাছাড়া খুবই লঘুপায়ে গিয়েছিল সে।

এই পর্যন্ত সংবাদ দিয়ে একটু থামল বিশাখা।

থেমে থেমে থতিয়ে থতিয়ে বলতে অনেকটা সময় লেগেছে তার।

একটু নিঃশ্বাসও বুঝি সঞ্চয় করা দরকার।

কিন্তু ইতিমধ্যে বাহ্‌রামও কিছুটা অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে।

আসন্ন বিপদের গুরুত্ব সে আব্‌ছা অস্পষ্ট কাহিনী থেকেই খানিকটা অনুমান করতে পেরেছে—পেয়েছে বড় রকমের একটা ঝঞ্ঝার পূর্বাভাস!

বিশাখা থামতেই সে অধীরভাবে বলে উঠল, 'কিন্তু কি দেখল আর কাকে দেখল সেইটেই আগে বল—তবে তো বুঝব?'

'বলছি শাহ্‌জাদা। আর দেরি হবে না।—রাজা বিজয়দেবের একদল সিপাহী—অন্তত পঞ্চাশজন হবে—গ্রামের বাইরে ঐ জঙ্গলটায় এসে বসে আছে আজ সকাল থেকেই।—খুব সম্ভব তারা বাবার সঙ্গেই এসেছে। এখন বুঝতে পারছি—বাবা সেদিন সোজা রাজধানীতেই গিয়েছিলেন, রাজাকে তোমার খবর দিয়ে এসেছেন। তোমার দুশমন সেই বাদশা—কী যেন নাম—ঘুরের মুহম্মদ বিন সাম—তাকে আরও খুশি করবার এমন সুবর্ণ সুযোগ কি রাজা ছাড়তে পারেন? তিনি বোধহয় তৎক্ষণাৎ বাবার সঙ্গেই সিপাই-গুলোকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। দাদা যা শুনেছে, তাতে এই বুঝেছে যে, এত কাণ্ড ক'রে ওদের ডেকে আনলেও সোজা তখনই ওদের সঙ্গে ক'রে এনে তোমাকে ধরিয়ে দেবার সাহস বাবার হয় নি। বাবা সময় নিয়েছেন ওদের কাছে। আজ ভোরে ঠাকুর্দা যখন স্নান ক'রে কেশবজীর মন্দিরে যাবেন—সেইসময় বাবা কী ইশারা করবেন, ওরা এসে আমাদের বাড়ি ঘেরাও ক'রে তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে। বাবা সেই সময়টা আর বাড়ি থাকবেন না—তিনিও ওদের আসবার ইঙ্গিত দিয়েই স্নান করতে চলে যাবেন ঝরণায়।'

বলতে বলতে শেষের দিকে ক্ষোভে, লজ্জায়, আশঙ্কায় গলা বুজে এসেছিল বিশাখার—এই পর্যন্ত বলে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল সে।

বাহ্‌রাম খবরটা শুনতে শুনতে যেন পাথর হয়ে গিয়েছিল।

কী ভাবছিল, কিছু ভাবছিল কিনা—তা সে যেন নিজেও তখন জানে না, এখন বিশাখার চোখের জলে তার সম্বিৎ ফিরে এল।

সে পরম স্নেহে বিশাখাকে জড়িয়ে ধরে একেবারে পাশে টেনে নিয়ে বললে, 'ছিঃ বিশাখা, তুমি কেঁদো না অমন ক'রে—তাহলে যে আমি কিছুই করতে পারব না, নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টাটাও না।'

'ঠিক বলেছ। না, কাঁদবার সময় নেই।'

চোখ মুছে বিশাখা ওর বাহুবন্ধন ছাড়িয়ে একেবারে উঠে দাঁড়ায়। স্নেহাস্পদ বন্ধুর গুরু বিপদে বালিকা যে কখন নারী হয়ে উঠেছে, তা বোধ করি সে নিজেও টের পায় নি।

'কাঁদিও নি তো এখনও পর্যন্ত, খবরটা শুনে বসেও থাকি নি।' বিশাখা যেন ব্যস্ত কাজের মানুষ হয়ে ওঠে অকস্মাৎ, 'শোন—দাদাকে বলে রাজী করিয়েছি। গ্রামের পিছনদিকে একটা পথ আছে, ঝরণা পেরিয়ে বনের মধ্যে

দিয়ে খানিকটা গেলেই সে পথ পাবে—ঐ বড় পাহাড়টার কোল দিয়ে চলে গেছে সে রাস্তা। কোনমতে বিশ ক্রোশ পেরিয়ে যেতে পারলেই এ রাজ্যের সীমানা শেষ, গাড়োয়ালের সীমানা শুরু। গাড়োয়ালের রাজা দিল্লীর রাজার আশ্রিত। ওখানে গিয়ে তোমাকে ধরতে সাহস করবে না আমাদের রাজা। সবাই ঘুমোলে আস্তাবল থেকে দুটো টাট্টু বার ক'রে আমরা তাদের ক্ষুরে ছেঁড়া-কাপড় বেঁধে নিঃশব্দে নিয়ে গিয়ে নদী পার ক'রে রেখে এসেছি। একটা টাট্টুর পিঠে ঝোলায় শুখা রুটি, কিছু শুখা ফল আর কিছু মাওয়া* রাখা আছে। জল পথেই পাবে। দাদা তোমাকে পাহাড়ের কোল পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসবে গোপনে। ফেরার সময় নদীর ওপারেই টাট্টু ছেড়ে দিয়ে সে ঘুরে এধার দিয়ে আসবে, মানে সে যে সঙ্গে গিয়েছিল তা কেউ টের পাবে না। তাছাড়া সন্দেহ হ'লেও দাদাকে বাবা বিশেষ কিছু বলতে পারবেন না, ঠাকুর্দার ভয় তো আছেই, তাছাড়া বাবা এ পৃথিবীতে যদি কাকেও ভালবাসে তো সে তাঁর ঐ ছেলেটিকে। তাছাড়া সে-ই তাঁর একমাত্র বংশধর, জলপিণ্ড দেবার লোক। তার কোন ক্ষতি করবেন না তিনি।'

কথাটা বলতে বলতেই স্তব্ধ হয়ে থেমে যায় বিশাখা।

দুজনের কানেই একসঙ্গে পৌঁছেছে শব্দটা—খুব দূর থেকে এলেও নিবাত নিস্তব্ধ নিশীথে শব্দটা স্পষ্টই শোনা গেল—কোথায় একটা ভোরাই পাখী ডাকতে শুরু করেছে।

'চল চল, আর একদম সময় নেই। বাবা এখনই উঠে পড়বেন। ঐ দ্যাখ, ভোরাই বাতাসও উঠেছে। রাত আর মোটে নেই। ইস্, আরও ঢের আগেই বেরোনো উচিত ছিল!'

'চল' বলে উঠে দাঁড়ায় বাহ্‌রাম। এখানে তার নিজস্ব বলতে বিশেষ কিছুই নেই। যে পোশাকটা পরে আছে সেটাও বিষ্ণুপ্রসাদের দেওয়া। নেবার কিছু নেই—পিছনপানে চাইবার মত কিছুই পড়ে থাকবে না। তবু এই ঘরটা যেন বড়ই প্রিয় হয়ে উঠেছে গত ক'মাসেই। অন্ধকারে যতটা দেখা যায়, একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে আবারও একবার 'চল' বলে পা বাড়াল বাহ্‌রাম।

একটা ছোট দীর্ঘনিঃশ্বাস আপনিই বেরিয়ে এল বুক থেকে। আর সেই নিঃশ্বাসের শব্দ আর-একটি কোমল কচি বুকে তরঙ্গ তুলে সেই বুকের অধিকারিণীর দুই চোখে ক্ষণিকের জন্য একটা বাষ্প সৃষ্টি করল। কুয়াশাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে পথ খুঁজে চলতে গিয়ে দরজার কাছের ক্ষীণ আলোটা ভাল ক'রে নজরে পড়ল না, অর্থাৎ সোজা পথটা দেখতে পেল না, একটা কপাটে ধাক্কা খেল বিশাখা। সামান্য একটু শব্দও উঠল। সে শব্দে দুজনেই কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল নিমেষের জন্য। সামান্য শব্দও অসামান্য প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করে এখানে এ সময়ে।

কিন্তু তখন আর সত্যিই সময় নেই। বাহ্‌রাম ব্যাপারটা বুঝে হাত বাড়িয়ে আন্দাজে ওর হাতটা ধরে বাইরে বার ক'রে নিয়ে এল।

---

* শুষ্ক ক্ষীর। যাকে খোয়াক্ষীর বলে

বাড়ির বাইরে বেরিয়ে বাগান। গাছের তলা দিয়ে দিয়ে ঘুরে পিছনদিকে যেতে হবে। বাইরের দিকের রাস্তা নিরাপদ নয়। কিন্তু বাগানের পথেও শুকনো আখরোট ও 'সেব্' গাছের পাতা বিছানো। পা পড়লেই মচমচ শব্দ হয়। এ সম্ভাবনা বুঝে নদীতীর থেকে ফেরবার পথেই যতটা সম্ভব শুকনো পাতাগুলো পথ থেকে তুলে ফেলে দিয়ে এসেছিল বিশাখা। কিন্তু হিমালয়ের কোলে এসব পাহাড়ী অঞ্চলে ভোরের বাতাস বড় প্রবল হয়। ইতিমধ্যেই আবার বহু পাতা উড়ে এসে পড়েছে। অন্ধকারে দেখাও সম্ভব নয় যে বাঁচিয়ে চলবে। অবশ্য দুজনেরই খালি পা—যতটা সম্ভব লঘুপায়েও চলছিল ওরা—তবু একেবারে নিঃশব্দে যাওয়া সম্ভব হচ্ছিল না কিছুতেই।

অনেকটা আসবার পর, বিষ্ণুপ্রসাদের বাগানের সীমানা থেকে বহুদূরে এসে একবার থমকে দাঁড়াল বাহ্‌রাম।

এতক্ষণ ঘাড় হেঁট ক'রে নিঃশব্দে ছুটেছে ওরা—পশুর মতো সমস্ত চিন্তাশক্তি যেন একটা আতঙ্কে ছিল স্তব্ধ—একটি মাত্র অর্থাৎ নিরাপত্তার চিন্তাতে ছিল আচ্ছন্ন। এইবার প্রশ্নটা মনে জেগেছে ওর, যা অনেক আগেই জাগা উচিত ছিল। কিন্তু উদ্বেগে, উত্তেজনায় ও দ্রুত হাঁটার পরিশ্রমে দুজনেরই ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে হাপরের মতো, কথা কওয়াই কষ্টকর। তাই দুটি তিনটি শব্দে মাত্র প্রশ্নটা সীমাবদ্ধ রাখতে হ'ল—যদিও তাতেই বোঝাল ঢের—'কিন্তু বিশাখা, তুমি?'

বিশাখারও তখন কথা বলার শক্তি নেই। উত্তর দেবার পূর্বে কয়েক মুহূর্ত থামতে হ'ল দম নেবার জন্য। ওড়নার প্রান্তে ললাট ও চোখের কোলের স্বেদবিন্দুগুলো মুছে নিতে নিতে অবশেষে অতিকষ্টে বললে, 'আমি—আমার জন্য ভয় নেই শাহজাদা—আমি এখনই ফিরে আসব। তোমাকে ওপারে পৌঁছে টাট্টুতে তুলে দিয়েই চলে আসব। আমাকে কেউ দেখতে পাবে না।···কিন্তু তুমি আর দাঁড়িও না—চল। এখনও বেশ খানিকটা পথ যেতে হবে—'

তবুও বাহ্‌রাম নড়ল না। বললে, 'কিন্তু সত্যিই তুমি নিরাপদে ফিরতে পারবে তো? কোন বিপদ হবে না? না হয় তুমি এখান থেকেই ফেরো—আমি ঠিক চলে যেতে পারব।'

'আঃ শাহ্‌জাদা, ছেলেমানুষী ক'রো না। চল চল, আমি ঠিক থাকব।'

চলতে চলতেই তবু আর একটা প্রশ্ন করে বাহ্‌রাম—বোধ করি তার অন্তরের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন সেটা এই মুহূর্তে, 'কিন্তু আর কি কোনদিন আমাদের দেখা হবে না বিশাখা? তোমাকে আর কোনদিন দেখতে পাব না? তোমার—তোমার মন-কেমন করবে না আমার জন্যে?'

'হয়ত করবে, কিন্তু তুমি বেঁচে আছ, নিরাপদে আছ—এইটেই আমার কাছে বড় কথা। এটা জানলেই আমি শান্তিতে থাকব।···আর তুমি—যদি কোনদিন আমার কথা মনে পড়ে তো এইটেই মনে ক'রো যে যতদিন আমি বাঁচব, যেখানেই থাকি যেমনই থাকি—নিত্য কেশবজীর কাছে তোমার জন্যে

দীর্ঘ পরমায়ু ও সুখ-শান্তি প্রার্থনা করব।'

বলতে বলতেই আবার ওর চোখে জল এসে পড়ল।

কিন্তু থামবার আর অবসর নেই, চোখটা মুছে নেবারও না। বাষ্পাচ্ছন্ন চোখে ছুটে চলতে গিয়ে বড় একটা পাথরে হোঁচট লাগল। এবার নিজেই হাত বাড়িয়ে বাহ্‌রামের হাতটা চেপে ধরে সামলে নিল বিশাখা।

ভোরের আলো ফুটে উঠেছে—আর একটুও দেরি করা উচিত নয়।

দু'জনে প্রায় দৌড়েই চলল নদীর দিক লক্ষ্য ক'রে।

'হে কেশবজী, যেন নিরাপদে ওকে পৌঁছে দিতে পারি ওপারে! যেন ঠাকুর্দার আতিথেয়তার সুনামে কালি না লাগে!'

যেতে যেতে প্রাণপণে ডাকতে লাগল বিশাখা, এ গ্রামের পুরদেবতা ললিতা-কেশবকে।

॥ ৯ ॥

ভোরাই পাখীর ডাক শোনার সঙ্গে সঙ্গে বিশাখার বড় যে ভয়টা হয়েছিল—বাবার ঘুম ভাঙবার, সেটা সম্পূর্ণ অমূলক। কারণ বৃন্দাপ্রসাদও ওদের মত জেগেই ছিল সেদিন সমস্ত রাত।

রাগের মাথায় যারা কোন অসৎ কাজ ক'রে ফেলে, তারা রাগটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই অনুতপ্ত হয়। কিন্তু বৃন্দাপ্রসাদ আদৌ অনুতপ্ত নয়, তার কারণ রাগ তার তখনও পড়ে নি বিন্দুমাত্রও।

তাছাড়া সে যেটা করেছে সেটাকেও অসৎ কাজ বলে মনে হয় নি তার তখনও পর্যন্ত।

যা উচিত, যা সঙ্গত তাই করেছে সে। তার বৃদ্ধ বাবা মোহগ্রস্ত হয়ে একটা বিষম অসঙ্গত কাজ করছেন, তারই প্রতিকারের জন্য সক্রিয় হয়েছে মাত্র।

আর সেই সক্রিয়তাটাই তাকে ঘুমোতে দেয় নি সেদিন।

তা ছাড়াও একটা বিরাট দায়িত্বও তার কাঁধে এসে চেপেছে।

রাজা তার কথা শোনামাত্র সঙ্গে অতগুলো সিপাহী দিয়েছেন, কিছুমাত্র দ্বিধা করেন নি। তেমনি এ-ও তাকে বলে দিয়েছেন যে, যদি বৃন্দাপ্রসাদের কথা সত্য প্রমাণিত হয় তাহ'লে ভালই—যথাসময়ে প্রচুর পুরস্কার পাবে সে, আর যদি তা না হয় তো মালিক বাহ্‌রামের পরিবর্তে তাকেই বেঁধে নিয়ে যাবে সিপাহীরা।

এবং বাহ্‌রামের থেকে একটু ভিন্ন ব্যবস্থার কথা শুনিয়ে দিয়েছেন রাজা বিজয়দেব তখনই। বাহ্‌রামকে ধরে আনলে বন্দী ক'রে পাঠানো হবে মুহম্মদ ঘুরীর কাছে—বৃন্দাপ্রসাদকে ধরে আনলে সোজা মশানে—একেবারে শূলদণ্ড দেবার ব্যবস্থা।

সুতরাং ভয়ও একটা ছিল বৈকি—প্রবল ভয়।

একটা ভালরকমের নৈতিক প্রচেষ্টা যে এমনভাবে নিজের জীবন-মরণ সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে, তা আগে কল্পনাও করতে পারে নি বৃন্দাপ্রসাদ। এ-

রকম জানলে হয়ত ক্রোধ প্রশমনের অন্য উপায় খুঁজত। হয়ত সোজাসুজি নিজেই কিছু একটা করত। অন্য কোন প্রতিকারের কথা চিন্তা করত। অন্তত দুবার অগ্রপশ্চাৎ ভাবত। কিন্তু এখন আর ফেরার পথ নেই। হাতের পাশা আর মুখের কথা—একবার বেরোলে আর তাকে ফেরানো যায় না।

যখন রাজদরবারে গিয়েছিল, তখন ওর মনের তার খুব উঁচু সুরেই বাঁধা ছিল—ও যাচ্ছে অন্যায়ের প্রতিকার করতে, যাচ্ছে রাজাকে উপকৃত করতে।

কিন্তু সেই অতিশয় সৎ প্রচেষ্টা যে এমনভাবে ওর ওপরই এসে পড়বে বিষময় ফলের বিভীষিকা নিয়ে, তা কে জানত!

যাই হোক, এখন প্রাণের ভয়টাই প্রবল। বিজয়দেবের ক্রোধী স্বভাব সর্বজনবিদিত—তাঁর হুকুম বদলাবে না। সুতরাং ছেলেটাকে ধরিয়ে দিতে না পারলে শূল অনিবার্য। বরং সেটা রাজার হুকুমে যতটা সম্ভব যন্ত্রণাদায়কই হয়ে উঠবে।

তাই একদিকে নিজের ব্যক্তিগত আক্রোশ, অপরদিকে নিদারুণ উৎকণ্ঠা বৃন্দাপ্রসাদকে ঘুমোতে দেয় নি। ঘুমোবার বৃথা চেষ্টাও করে নি সে। সোজাসুজি জেগে বসেই ছিল—উৎকর্ণ হয়ে।

আর ঘুমোতে পারে নি বলেই ছেলেমেয়ের ষড়যন্ত্রও তার অবিদিত ছিল না।

সূর্যপ্রসাদ আর বিশাখা যত নিঃশব্দেই আস্তাবল থেকে টাট্টু বার করার চেষ্টা করুক, সামান্য একটু শব্দ—অন্তত মাটিতে খালি-পা ঘষার শব্দও হয়েছে।

আর সেই নিবাত পার্বত্যরাত্রির নিঃসীম স্তব্ধতায় সেইটুকু শব্দই যথেষ্ট, বিশেষত উৎকণ্ঠ অতন্দ্র বৃন্দাপ্রসাদের সদাসতর্ক কানের পক্ষে। সে শুনেছে, কিন্তু বাইরে আসে নি—ঘরের জানলা খুলেই দেখেছে ওদের গতিবিধি। এবং এই গোপনচারীদের উদ্দেশ্যও বুঝতে বিলম্ব হয় নি একটি মুহূর্তও।

তখনই একটা কিছু বীভৎস কাণ্ড ক'রে বসবার কথা।

কিন্তু ক্রোধ যখন স্বভাবের শেষ সীমাও ছাড়িয়ে যাবার উপক্রম করে, তখন নতুন একধরনের স্থৈর্য লাভ করে মানুষ।

বৃন্দাপ্রসাদও সেই আশ্চর্য স্থৈর্য লাভ করল। বরং এদের সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার মধ্যে একটা পৈশাচিক উল্লাস বোধ করতে লাগল।

শেষ মুহূর্তে—একেবারে সব আয়োজন সম্পূর্ণ হওয়ার পর ওদের সাধে বাদ সাধবে সে।—

তারপর থেকে ওরা আর বৃন্দাপ্রসাদের নজর-ছাড়া হয় নি।

ওদের পিছু পিছু যায় নি সে, যাবার প্রয়োজন হয় নি। কোন্ পথে এ ঘোড়া গেল, আর কী এদের লক্ষ্য, তা বুঝে নিয়েছে বৃন্দাপ্রসাদ। ওরা দৃষ্টির বাইরে যাওয়ামাত্র সে নিজের ঘরের দরজা খুলে প্রাণপণ নিঃশব্দে বার হয়ে এমন একটা জায়গায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে—নিজেদের গৃহদেবতার

মন্দিরের ওপর, যেখান থেকে বাহ্‌রামের ঘর, ছেলেমেয়েদের গন্তব্যপথ, এমন কি নদীতীর পর্যন্ত পরিষ্কার লক্ষ্য চলে।

অত দূর থেকে বাহ্‌রাম ও বিশাখার কথাবার্তা সে কিছু শোনে নি বটে, কিন্তু বিশাখার দীর্ঘকাল ওর ঘরে থাকা আর হাত ধরে বেরোনই কন্যার মনোভাব ও সম্ভাব্য কার্য-কারণ উপলব্ধির পক্ষে যথেষ্ট।

বৃন্দাপ্রসাদ সেই নির্জন অন্ধকারে শব্দহীন আনন্দহীন একপ্রকারের অদ্ভুত হাসি হেসেছিল।

সে হাসি সাংঘাতিক সংকল্প-দ্যোতক। নিষ্ঠুর, নিষ্করুণ, কঠিন হাসি।

ওরা চোখের বাইরে চলে গেলে আর অপেক্ষা করে নি বৃন্দাপ্রসাদ। ঘরে গিয়ে খাপে-ঢাকা তলোয়ারখানা বার ক'রে আনতেও বেশী সময় লাগে নি। তারপর ওদের এগিয়ে যাবার জন্য আরও খানিকটা সময় দিয়ে অপর একটা সরল সোজা পথে রওনা দিয়েছিল নদীর দিকে।

এদিককার বন-জঙ্গল ওর নখদর্পণে, জীবনের চল্লিশ বছর সময়ের মধ্যে এই গ্রামের বাইরে মোট একমাস কালও কাটায় নি বোধহয়, সুতরাং পায়ে-হাঁটা-পথ ওর লাগে না। বনের মধ্যে দিয়েই স্বচ্ছন্দে যেতে পারে।

আর এদিক দিয়ে গেলে ওরা যতই আগে যাক, এই সংক্ষিপ্ত পথে ঠিক ঘোড়ায় চড়বার সময়টিতেই গিয়ে পৌঁছতে পারবে—বৃন্দাপ্রসাদ তা জানে।

সে আরও একবার হেসে উঠল। তেমনি শব্দহীন আনন্দহীন হাসি।

তবে তৃপ্তির হাসি বলা যায়।

যেন ভয়ঙ্কর বৈরনির্যাতন সফল হওয়ার তৃপ্তি লাভ করেছে সে।

॥ ১০ ॥

সংবাদটার সম্যক আক্ষরিক অর্থ অনুধাবন করতেই বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল বিষ্ণুপ্রসাদের।

তার পরও—অর্থাৎ শব্দগুলোর অর্থ উপলব্ধি হওয়ার পরও—বহুক্ষণ নির্বাক হয়ে চেয়ে রইলেন ছেলের মুখের দিকে।

কথাটা বিশ্বাস হ'ল না তখনও।

ভোরবেলা স্নান সেরে গৃহদেবতার পূজায় যাবার আগেই বধূমাতা এসে জানিয়েছেন কথাটা—সূর্যপ্রসাদ ও বিশাখাকে পাওয়া যাচ্ছে না কোথাও, আর সেই সঙ্গে বাহ্‌রামকেও না।

কিন্তু তাতে বিশেষ চিন্তিত হন নি তিনি।

ছেলেমানুষ—তিনজনে বন্ধুর মতো হয়ে গেছে—হয়ত ভোরে উঠে কোথাও বেড়াতে গেছে পূর্ব-পরামর্শ মতো। হয়ত—হয়ত শিকারেই গেছে। বৈষ্ণব পিতামহ মত দেবেন না জেনেই চুপিচুপি চলে গেছে।

একটু বরং হাসিই পেয়েছিল তাঁর।

বিশাখার মাকে সান্ত্বনা দিয়ে সেই কথাই বলেছিলেন, 'কোথায় গেছে পাহাড়ে-জঙ্গলে—পাখী ধরতে কি শিকার করতে—এখনই এসে পড়বে!'

বলেছিলেন বটে—কিন্তু একটু ভ্রূকুটিও ঘনিয়ে এসেছিল তাঁর প্রশান্ত ললাটে।

কথাটা ভাল নয়—আদৌ ভাল নয়। তিনি যতই সংসার-বিরাগী উদাসীন হোন, এটুকু সাংসারিক জ্ঞান তাঁর এখনও আছে।

তরুণ কিশোর বাহ্‌রাম, তার সঙ্গে এতটা মেলামেশা হয়ত ভাল হচ্ছে না। বিশেষ মুসলমান, বিধর্মী, বিজয়ীর জাত—বিশাখার বয়স হচ্ছে—ঠিক শিশুটি আর নেই, যদি বাহ্‌রামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে? সে সর্বনাশের কথাটা যে ভাবাই যায় না!···না, বড়ই ভুল করেছেন তিনি।

অবশ্য মেলামেশা করবার স্বাধীনতা তিনি দেনও নি। শুধু খাবারটাই পৌঁছে দিয়ে আসবার কথা বলেছিলেন। কিন্তু তার ফলে যে এ ঘনিষ্ঠতা হ'তে পারে এটাও তাঁর ভাবা উচিত ছিল।

বৃন্দাপ্রসাদ হয়ত সেইজন্যই ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

কথাটা যদি খুলে বলত ছোকরা!

না, এবার একটু সতর্ক হ'তে হবে।

এসব ভেবেছেন ঠাকুরঘরে উঠতে উঠতেই।

তারপর অবশ্য আর কিছু মনে ছিল না। ইষ্ট-পূজায় বসলে পার্থিব জগতের কোন কথাই তাঁর মনে থাকে না।

ইহজগতের সুখ-দুঃখ-বেদনা—সমস্ত রকম অনুভূতি দরবিগলিত অশ্রুর সঙ্গে ঈশ্বরের পায়ে নিবেদন ক'রে সব ভুলে যান তিনি।···

কিন্তু পূজা শেষ ক'রে মন্দির থেকে বেরোবার সঙ্গে-সঙ্গেই কথাটা আবার মনে পড়ে গেল।

অথবা না পড়ে উপায় রইল না আর। বেশ একটু রূঢ় ভাবেই মনে পড়ল।

ঠাকুরঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে বৃন্দাপ্রসাদ।

উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা, বিশৃঙ্খল বেশবাস, চোখ দুটি জবাফুলের মত লাল—আর সর্বাঙ্গে, হাতে, কাপড়ে, জামায় রক্ত।

লাল, তাজা রক্ত।

বাড়ির অপর বাসিন্দারা, পুরনারীরা ভীড় ক'রে এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের মুখ শুকনো, উৎকণ্ঠায় ব্যাকুল, কিন্তু কেউই কাছে আসতে বা কোন প্রশ্ন করতে সাহস করছে না।

দূরে যেন এক জায়গায় জড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তারা নিঃশ্বাস রোধ ক'রে।

কেবল বিশাখার মা মাটিতে পড়ে আছেন মূর্ছিত অবস্থায়—সম্ভবত দারুণ কোন অজ্ঞাত বিপদের আশঙ্কাতেই জ্ঞান হারিয়েছেন তিনি।

বিষ্ণুপ্রসাদ সব ক'টা সিঁড়ি নামতেও পারলেন না। যেন পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন তিনিও।

কোন প্রশ্নও করতে পারলেন না কাউকে।

অবশ্য তার দরকারও হ'ল না।

বৃন্দাপ্রসাদই আর একটু এগিয়ে এল সামনে—তারপর বাপের মুখের দিকে চেয়ে প্রচণ্ড জোরে একবার হেসে উঠল হা-হা করে।

বিকট পৈশাচিক হাসি, দুর্দান্ত পাগলের মতোই।

সে বিকট হাসি সেই শান্ত নির্জন উপত্যকায় বিকটতর প্রতিধ্বনি তুলে ঘুরে বেড়াতে লাগল এক অজ্ঞাত আতঙ্ক, নাম-না-জানা বিভীষিকার সৃষ্টি ক'রে।

সে হাসি শুনে ওধারে মেয়েরা অনেকে ডুকরে কেঁদে উঠল, এমন কি বিষ্ণুপ্রসাদের গায়েও কাঁটা দিল সে হাসির আওয়াজে।

কিন্তু তবু কোন প্রশ্ন করতে সাহস হ'ল না কারুর। কী বলবে ও, কী শুনতে হবে, ভয়ঙ্কর কী বার্তা—এই আশঙ্কায় কণ্টকিত হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল সবাই।

হাসি থামবার পর সকলের নীরব প্রশ্নের জবাব দিল বৃন্দাপ্রসাদ নিজেই।

বৃন্দাপ্রসাদ এইমাত্র প্রচণ্ড দুটো ভুল সংশোধন ক'রে এসেছে। বিধাতার ভুল এবং তার পিতার ভুল! বৃদ্ধ বয়সের মতিভ্রম থেকে—আর সে মতিভ্রমের শোচনীয় ও অবশ্যম্ভাবী পরিণাম থেকে পিতাকে রক্ষা করেছে সে।

বৃন্দাপ্রসাদ রাজা বিজয়দেবকে সংবাদ দিয়ে একদল ফৌজ এনেছিল মালিক বাহ্‌রামকে ধরিয়ে দেবার জন্য।

হ্যাঁ, তাই সে এনেছিল, তার জন্য তার কোন লজ্জা নেই—নেই কোন অনুতাপ। এক অন্যায়কে অপর অন্যায় দ্বারাই উৎপাটিত করতে হয়—কাঁটা দিয়ে তুলতে হয় কাঁটা—তা সে জানে।

কিন্তু আরও যে পাপ তার ঘরেই জমা হয়েছিল—তার ঐ নির্বোধ মতিচ্ছন্ন পিতার নির্বুদ্ধিতার জন্য, সেটাই সে জানত না। তার সমস্ত আয়োজন বানচাল হ'তে বসেছিল। সেই সঙ্গে যেতে বসেছিল তার জীবনও। অপঘাত মৃত্যুর সঙ্গে মিথ্যাচরণের দুর্নামও সইতে হ'ত তাকে।

তারই ছেলেমেয়ে, তার বে-জাতক বিশ্বাসঘাতক ধর্মভ্রষ্ট পুত্রকন্যা গোয়েন্দাগিরি ক'রে সেই খবর বার করেছিল এবং বাহ্‌রামকে জানিয়ে গোপনে তার পলায়নের সব ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিল।

কিন্তু বৃন্দাপ্রসাদ নির্বোধ নয়, অসতর্কও নয়। তুচ্ছ অপত্যস্নেহে বিগলিত হবার লোক তো নয়ই।

সে দূর থেকে, নিঃশব্দে সব লক্ষ্য করেছিল।

একেবারে শেষ মুহূর্তে হাতেনাতে ধরেছে ওদের।

বেইমান পুত্রকন্যাকে নিজের হাতে বধ ক'রে বাহ্‌রামকে বিজয়দেবের সিপাহীদের হাতে সঁপে দিয়ে এইমাত্র ফিরছে সে।

যে ব্রাহ্মণ এবং গুরুবংশের মেয়ে বিধর্মী পুরুষের হাত ধরে, আর যে ছেলে বাপের বিরুদ্ধে বিদেশীর হয়ে ষড়যন্ত্র করে—তারা কেউ ওর সন্তান নয়—অন্তত বৃন্দাপ্রসাদ তাদের সন্তান বলে স্বীকার করে না।

তাদের মুখদর্শন পাপ—তাদের বাঁচতে দেওয়া অন্যায়।

সেই জন্যই বৃন্দাপ্রসাদ স্বহস্তে সে পাপ ধ্বংস ক'রে দিয়ে এসেছে, আর কোন চিন্তা নেই। অঙ্কুরেই বিনষ্ট ক'রে দিয়ে এসেছে—বৃহত্তর পাপের সম্ভাবনা।

বক্তব্য শেষ ক'রে আবারও হা-হা ক'রে হেসে উঠল বৃন্দাপ্রসাদ, তেমনি পৈশাচিক বিকট হাসি।

॥ ১১ ॥

মেয়েদের মধ্যে একটা আর্তনাদ উঠল, কেউ কেউ ছুটে পালিয়ে গেলেন সেখান থেকে। আরও দু-একজন অজ্ঞান হয়ে পড়লেন।

শুধু বিষ্ণুপ্রসাদই কিছু করলেন না।

কিছু করতে পারলেন না।

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন বক্তার মুখের দিকে। কথাগুলোর অর্থ মস্তিষ্কের বুদ্ধিকোষে পৌঁছতে বেশ খানিকটা সময় লাগল তাঁর।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটু একটু ক'রে বুঝলেন।

না বুঝে বুঝি উপায়ও ছিল না।

ছেলের মুখ-চোখের চেহারা, ঐ হাসি, হাতে ও কাপড়ে রক্ত—এইগুলো থেকেই বুঝলেন।

ক্রমে বিশ্বাসও করতে হ'ল।

বিস্ময়-বিহ্বলতা ও অবিশ্বাস কাটতে প্রচণ্ড আঘাতের বিমূঢ় প্রতিক্রিয়ায় প্রথমটা সেই সিঁড়িতেই বসে পড়েছিলেন তিনি, আর কিছু করতে পারেন নি, কিছু বলতে তো পারেনই নি। মুখ দিয়ে শুধু একটা অস্ফুট শব্দ বার হয়েছিল, 'হে কেশব!'

অনেকক্ষণ আর কিছু বুঝতেও পারেন নি।

গৃহবাসীদের কান্নাও যেন মনে হয়েছিল দূরাগত কোন শব্দ।

সামনে বৃন্দাপ্রসাদের উন্মত্ত চেহারাটাও অপ্রাকৃত অবাস্তব কিছু বলে মনে হয়েছিল।

শোকও কি খুব একটা অনুভব করতে পেরেছিলেন? কী এবং কতটা ক্ষতি হ'ল,—এই বিপুল সর্বনাশের সম্যক পরিণামই কি উপলব্ধি করতে পেরে-ছিলেন? বোধহয় না। কেমন একটা বিমূঢ়তা, কেমন একটা জড়তা যেন আচ্ছন্ন অভিভূত ক'রে রেখেছিল তাঁকে।

কী করবেন, কী করা উচিত—পৌত্র-পৌত্রীর মৃতদেহের ওপর গিয়ে আছড়ে পড়বেন কিনা, কিছুই যেন তাঁর মাথাতে ঢুকছিল না।

ভেতর থেকে কোন প্রবল আবেগানুভূতির তাগিদও বুঝতে পারছিলেন না। সবটা কি তাহ'লে তাঁর পাথর হয়ে গিয়েছে?

এখন সর্বাগ্রে হয়ত প্রয়োজন ওদের সৎকারের ব্যবস্থা করা—বাড়ির সকলেই শোকবিহ্বল অভিভূত—তারা কেউ পারবেও না, করলে ওঁকেই

করতে হবে।

আঘাত? না আঘাতের কথা চিন্তা করার অধিকার তাঁর নেই। তিনি জ্যৈষ্ঠ—তাঁর কাছে যা কর্তব্য যা করণীয়—তা-ই শুধু সত্য।

ওরা ছিল তাঁর নয়নের মণি, তাঁর আত্মার আনন্দ—আজ তাদের শাস্ত্রোক্ত শেষকৃত্য তাঁরই করা উচিত।

কিন্তু তবু পারলেন না—কিছুই পারলেন না। তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আজ আর তাঁর কোন শাসন মানল না। স্নায়ুগুলো কোন ভ্রূকুটিতেই সক্রিয় হ'ল না। চিরকাল যা ক'রে এসেছেন—মনকে দমিয়ে রেখে নিজের কাজ ক'রে যাওয়া—আজ সে কোনকিছুই যেন ঠিক করতে পারলেন না।

ক্রমে বেলা বাড়তে লাগল।

গ্রামের লোক কান্নার শব্দ পেয়ে ছুটে এল সবাই।

পথে পথে জটলা হচ্ছে, নদীর ওপারে ভীড় জমে উঠেছে।

বৃন্দাপ্রসাদ ইতিমধ্যে বাগানে গিয়ে একটা সেব্‌গাছের* তলায় বসেছে গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে। এখনও মাঝে মাঝে তেমনি হেসে উঠছে সে আপনমনেই।

তেমনি প্রচণ্ড, তেমনি ভয়াবহ, তেমনি বিকট প্রতিধ্বনি-জাগানো হাসি—

অবশেষে আর একটি ব্রাহ্মণ, হরকিশোর, বিষ্ণুপ্রসাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। মাথা হেঁট ক'রে আস্তে আস্তে শুধু বললেন, 'কেশবজীর মন্দিরের এখনও দোর খোলা হয় নি গুরুজী। চাবিটা—'

হঠাৎ যেন ঘুম ভাঙল বিষ্ণুপ্রসাদের, 'দোর খোলা হয় নি—না? এখনও শয়ন থেকে তোলাই হয় নি যে। ইস্, বড্ড ভুল হয়ে গেছে—বড্ড ভুল হয়ে গেছে! চল আমি যাচ্ছি এখনই—।'

প্রায় ছুটেই চললেন বিষ্ণুপ্রসাদ।

প্রৌঢ় হরকিশোরকে রীতিমত দৌড়তে হ'ল তাঁর আগে গিয়ে পথ রোধ ক'রে দাঁড়াতে।

'কিন্তু গুরুজী—'

অবাক হয়ে যান বিষ্ণুপ্রসাদ।

একটু বিরক্তও হন যেন।

ভ্রূকুটি ক'রে তাকান হরকিশোরের মুখের দিকে।

'কিন্তু কি? পথ ছাড় হরকিশোর! বেলা হয়ে গেছে অনেক—আগে ভগবানের সেবা, তারপর নিজের পারিবারিক কাজ।'

অনেকক্ষণ পরে কর্তব্য-কর্মে নিজেকে উদ্বোধিত করতে পেরে যেন অনেকটা মানসিক বলও অনুভব করেন বিষ্ণুপ্রসাদ।

'কিন্তু গুরুজী'—আবার বলেন হরকিশোর, বলতেই হয় শেষ পর্যন্ত কথাটা। মনে মনে এই লোকটার জন্য যৎপরোনাস্তি বেদনা বোধ করলেও অন্য কোন উপায় খুঁজে পান না বলা ছাড়া। খানিকটা অকারণ মাথা চুলকে বিব্রত

* সেব বা আপেল গাছ।

ভাবে বলেন, 'কিন্তু আপনার যে অশৌচ পণ্ডিতজী, আপনার তো এখন ক'দিন আর সেবার অধিকার নেই !'

'ও,'অধিকার নেই, না ?'

অকস্মাৎ যেন একেবারে বিবর্ণ সাদা হয়ে যায় বিষ্ণুপ্রসাদের মুখ। কণ্ঠ হয়ে আসে স্খলিত। অতিকষ্টে উচ্চারণ করেন কথাগুলো।

সঙ্গে সঙ্গে আবারও যেন কিছু-পূর্বের অনড়তা বা জড়তা ফিরে আসে হাতে-পায়ে। সব জোর ফেলেন হারিয়ে।

'সত্যিই তো, বড় ভুল হয়ে গেছে। বড্ডই ভুল হয়ে যাচ্ছে আমার। সত্যিই বটে, আমার অধিকার নেই। আর আমার কোন অধিকার নেই কেশবজীকে সেবা করার। ছেলে—ছেলে করেছে ঠিকই, কিন্তু সে তো আমারই দায়িত্ব—আমারই দায়িত্ব।'

এতক্ষণে একটা কাঁপুনি ধরেছে তাঁর হাতে-পায়ে।

থর থর করে কাঁপছে তাঁর ঠোঁট দুটোও, কাঁপছে চোখের পাতা।

তারই মধ্যে কোমরের কাপড়ে গোঁজা চাবির থোলোটা বার ক'রে হরকিশোরের প্রসারিত হাতে আলগোছে ফেলে দেন বিষ্ণুপ্রসাদ।

'এই নাও হরকিশোর, তুমি যাও মন্দিরে। আজ নয় শুধু—আজ থেকেই সেবার ভার তোমার। ললিতাকেশবের সেবায় আর আমাদের কোন অধিকার রইল না।'

'এসব কথা কেন বলছেন গুরুজী, অশৌচের এই ক'টা দিন কেটে গেলেই তো—' ব্যাকুল হয়ে আরও কি বলতে যান হরকিশোর।

'না না, হরকিশোর—আর না—আর না। আর কোন দিন নয়। আমার বংশের আর কোন অধিকার নেই ঈশ্বরের সেবা করার। আমরা পতিত হয়ে গেছি—আমরা ব্রাত্য, আমাদের সমস্ত বংশ পতিত হয়ে গেছে। তুমি যাও, তুমি যাও। বড়ই দেরি হয়ে গেছে, অপরাধ হয়ে যাচ্ছে দেবতার কাছে।'

আর বাদানুবাদের অবকাশ না দিয়ে একেবারে পিছন ফিরে চলতে শুরু করেন বিষ্ণুপ্রসাদ।

স্খলিত পদে টলতে টলতে আর কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে যান তিনি—তাঁর বাড়ির দিকেই।

নিদারুণ কর্তব্য রয়েছে সামনে পড়ে, সে কর্তব্যপালন যে করতেই হবে। অযথা শোক-বিলাসের সময় আর তাঁর নেই।

॥ ১২ ॥

তবু প্রথমটা কেউ বুঝতে পারে নি।

বোঝা সম্ভবও ছিল না।

লোকজন ডেকে, ধীরভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নির্দেশ দিয়ে, বিহিত শাস্ত্রমতে পৌত্র-পৌত্রীর সংকারের ব্যবস্থা করল যে মানুষ অমন স্থির থেকে—অপঘাত মৃত্যুর জন্য বিশেষ করণীয় ক্রিয়াকলাপের কোনটা ভুল হ'ল না, এতটুকু

ভ্রান্তি, এতটুকু বিচ্যুতি ঘটতে দিলেন না যে কিছুতে—তাঁর মনে যে এই ছিল তা কে-ই বা অনুমান করতে পারে!

অশৌচান্ত পর্যন্ত স্বাভাবিক জীবনযাত্রার কোথাও কোন ব্যতিক্রম ঘটে নি। সেই প্রথম দিনটির প্রথম কয়েক দণ্ড ছাড়া প্রবল কোন শোকেরও চিহ্ন দেখেনি কেউ তাঁর মুখে।

প্রশান্ত, অনুদ্বিগ্ন মুখ।

ঈষৎ যেন থমথমে গম্ভীর—কিন্তু তার বেশী কিছু নয়।

বরং বাড়ির আর সকলে ঢের বেশী ভেঙ্গে পড়েছিল, ঢের বেশী কাতর হয়েছিল। সূর্যপ্রসাদের মা-র সেই প্রথম মূর্ছাই ভেঙ্গেছিল দুদিন পরে—তার পরও ঘন ঘন মূর্ছা হচ্ছে। অন্য পুরনারীরাও বিহ্বল। বিষ্ণুপ্রসাদের ছোট ছেলেটি পর্যন্ত দিনরাত কান্নাকাটি করছে।

শুধু বিষ্ণুপ্রসাদই নির্বিকার।

কিন্তু শোক যেমন নেই, তেমনি কারুর জন্য কোন উদ্বেগ কি দুশ্চিন্তাও নেই।

সান্ত্বনা দেবারও চেষ্টা করছেন না কাউকে।

শুধু যতটুকু করবার এবং যতটুকু যাকে দিয়ে যা করাবার—করছেন ও করিয়ে নিচ্ছেন।

সেই জন্যই অশৌচান্তের শেষ-কৃত্যটি হয়ে যাবার পরই যখন তিনি সহজভাবে বাড়ি থেকে বেরিয়ে নদীর দিকে গেলেন, তখন কেউ কিছু বুঝতে পারে নি।

অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ্য করে নি তাঁর আচরণে।

প্রথম সকলে একটু অস্বস্তি বোধ করল। যখন বেশ কয়েক দণ্ড, এমন কি এক প্রহর কাল কেটে যাবার পরও তিনি নদী থেকে ফিরলেন না—তখনই।

নদীতীরে লোক পাঠানো হ'ল।

বিষ্ণুপ্রসাদ সেখানে নেই।

তবে কি তিনি স্নান ক'রে মন্দিরে গেছেন?

মন্দিরে ছুটে গেল একজন।

না সেখানেও নেই, আদৌ যান নি। সেদিকে যেতেও দেখে নি কেউ।

এবার রীতিমত চিন্তিত হয়ে পড়ল সবাই।

চারিদিকে লোক পাঠানো হ'ল।

আশপাশের গ্রামে, আত্মীয়-স্বজনদের বাড়ি—এমন কি দূর শহরেও।

পরিচিতদের বাড়ি খোঁজ করা হ'ল।

অকারণ জেনেও অপরিচিতদের ডেকে প্রশ্ন করা হ'ল।

কিন্তু কেউ কোন খবর দিতে পারলে না।

বিষ্ণুপ্রসাদ নেই, তিনি যেন একেবারে উবে গেছেন তাঁর এই পরিচিত জগৎ থেকে।

এ বাড়িতে নতুন ক'রে শোকের ছায়া পড়ল।

বৃন্দাপ্রসাদের অর্ধোন্মাদ অবস্থা। জোর ক'রে স্নান করিয়ে দিলে করছে, খেতে দিলে খাচ্ছে। কিন্তু নিদ্রা নেই চোখে। যে কোন জায়গায় বসে থাকছে প্রহরের পর প্রহর—শুধু মধ্যে মধ্যে হাসছে আপনমনেই।

সেই ভয়ঙ্কর পৈশাচিক হাসি।

সুতরাং এক তার ছোট ভাই বলদেওপ্রসাদ অবশিষ্ট রইল এ বাড়ির পুরুষ বলতে। কিন্তু সে বেচারীও ছেলেমানুষ, এতগুলো আঘাতে সে-ও বিহ্বল হয়ে পড়েছে। বেশী কোন চেষ্টা-চরিত্র করা তার পক্ষেও সম্ভব নয়।

অগত্যা গ্রামের লোকদেরই অগ্রণী হ'তে হ'ল।

গ্রামবাসীদের আর মন্দিরের অন্য পূজারীদের।

কিন্তু তারাই বা কোথায় খোঁজ করবে ভেবে পেলে না কেউ।

তবু হাল ছেড়ে দেওয়ার আঘাতটা আরও অসহ্য বলেই একই স্থানে বার বার লোক পাঠাতে লাগল। যদিই থাকেন—যদিই কোন খবর মেলে!

কিন্তু বিষ্ণুপ্রসাদ একেবারে যেন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছেন। কোথাও কোন সূত্র পাওয়া গেল না তাঁর গমনপথের।

অবশেষে—যখন তাঁর আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছে সবাই—তখন দিন-চারেক পরে, অপ্রত্যাশিত ভাবে খবর পাওয়া গেল।

পাশের গ্রামের এক কৈলাসযাত্রী তীর্থ-পরিক্রমা শেষ ক'রে ফিরে এসেছেন—তিনি জানেন বিষ্ণুপ্রসাদের খবর।

বিষ্ণুপ্রসাদের সঙ্গে নাকি তাঁর পথে দেখা হয়েছে। একা একা পাগলের মতো, সঙ্গে কোন খাদ্য কি শয্যা না নিয়ে প্রায় ছুটে চলেছেন হিমালয়ের পথে।

যেন মহাপ্রস্থানের পথে ছুটে চলেছেন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির। শুধু তাঁর সে অবিচলিত প্রশান্তিটুকু নেই এঁর। অধীর অশান্ত ভাবে ছুটছেন এ বৃদ্ধ।

ঐভাবে যেতে দেখে এ ভদ্রলোক তাঁকে ফেরাবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু বিষ্ণুপ্রসাদ কোন কথাই শোনেন নি।

তাঁর পূর্বপুরুষদের মধ্যে কে একজন সাধক নাকি পবিত্র নন্দাদেবীর শৃঙ্গের কোন্ গুহায় সাধনা ক'রে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন—সেইখানেই যাচ্ছেন বিষ্ণুপ্রসাদ প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করতে।

তাঁর এ অদ্ভুত ও ভয়ঙ্কর সংকল্পের কারণ কি—এ প্রশ্ন করেছিলেন বৈকি কৈলাস-মানসের ঐ তীর্থযাত্রীটি।

তার উত্তরে বিষ্ণুপ্রসাদ জানিয়েছেন যে, তিনি এক মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত করতে যাচ্ছেন।

একাধিক মহাপাতক স্পর্শ করেছে তাঁকে—তাঁর বংশকে।

ব্রহ্মহত্যা, নারী-হত্যা, অতিথি-হত্যা, আশ্রিতের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতিজ্ঞাভঙ্গ। এতগুলি মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত করতেই চলেছেন তিনি—তাঁর নিজের ও তাঁর বংশধরদের হয়ে।

তুষানলই এর উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত, কিন্তু সে প্রায়শ্চিত্ত গৃহে থেকে করাই বিধি। দেশে বাড়িতে বসে সে কাজ করতে গেলে বাধা দিত সবাই, সে সম্ভব

হ'ত না।

এ ছাড়া আর যে বিধান আছে শাস্ত্রে—ইষ্টনাম জপ করতে করতে প্রয়োপবেশনে দেহত্যাগ করা—তা-ই করবেন তিনি।

সেই উদ্দেশ্যেই চলেছেন। পূর্বপুরুষের সিদ্ধিলাভের স্মৃতিপূত পুণ্য-ভূমিতে।'

স্থান চাই বসে জপ করার—উপবাস করার। সেই স্থানের খোঁজেই তিনি চলেছেন।

সময় বড় অল্প—পাছে পূর্ণ প্রায়শ্চিত্তের অবসর না পান, তাই এ অস্থিরতা—তাও বলেছেন তিনি।

পরিচিত তীর্থযাত্রীটির বহু অনুনয়-বিনয়, পীড়াপীড়িতেও নিজের সংকল্প ত্যাগ করতে রাজী হন নি তিনি। বলেছেন, 'এ পাতকের প্রায়শ্চিত্ত না করলে আমার বংশের আমার শিষ্যদের কারুর কল্যাণ নেই। উত্তর-পুরুষ-পরম্পরায় পাপের ফলভোগী হয়, সর্বনাশ টেনে আনে পূর্ব-পুরুষ-কৃত মহাপাতক। আমিই যখন এই পাপের জন্য মূলত দায়ী—তখন আমারই এ প্রায়শ্চিত্ত করা বিধেয়। তাছাড়া ইষ্টপূজা ছাড়া এখন আর আমার কোন কাম্য নেই—সেই পূজাতেই যখন বঞ্চিত হয়েছি তখন প্রাণ রাখবারও কোন অর্থ হয় না। ওদের জন্য চিন্তা ক'রে কী করব ? আমি বৃদ্ধ হয়েছি, এমনিও একদিন মরতাম—তখনও যা হ'ত, এখনও না হয় তাই হবে। বৃথা সেজন্যে চিন্তা ক'রে লাভ নেই। বরং আমার প্রায়শ্চিত্ত যদি আমার কেশব গ্রহণ করেন তো ওরা সুখে থাকতে পারবে—ওদের কল্যাণ হবে। আমার আর পার্থিব কোন দায়িত্ব আছে বলে মনে করি না। এখন যত শীঘ্র এই ঘৃণিত দেহটা ত্যাগ ক'রে আমার প্রভুর সঙ্গে মিলিত হ'তে পারি, ততই লাভ।'

এই সংবাদে সমস্ত গ্রামবাসী স্তব্ধ হয়ে গেল আর একবার।

আর একবার এক প্রচণ্ড শোচনীয় ঘটনার আঘাত অনুভব করল তারা।

এবং প্রচণ্ডতর কোন আঘাতের অজ্ঞাত একটা আশঙ্কায় পরস্পরের মুখের দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল শুধু।

কিছুই স্থির হ'ল না।

কী করা উচিত, এখন কী করণীয় সে আলোচনাটা পর্যন্ত কেউ করতে পারল না সেদিন।

সমস্ত গ্রাম যেন নিঃশব্দ শঙ্কায় প্রহর গুনতে লাগল।

॥ ১৩ ॥

সেইদিন মধ্যরাত্রে এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখলেন পূজারী হরকিশোর।

দেখলেন যে কেশবজীর সেবা করতে গিয়ে তিনি যেন বিগ্রহ খুঁজে পাচ্ছেন না।

কোন এক আশ্চর্য উপায়ে রুদ্ধদ্বার মন্দির থেকে মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী

দেবতা অন্তর্হিত হয়েছেন।

সারা গ্রামের লোক ভেঙ্গে পড়েছে, সেই সংবাদে সকলেই হায় হায় করছে—সকলেই খুঁজছে।

অবশেষে এক সময় হরকিশোরই দেখা পেলেন তাঁর।

কেশবজী যেন গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, গ্রামের সীমান্তে নদী পার হচ্ছেন, সেই সময় হরকিশোর ধরলেন তাঁকে।

ঠাকুরের ওষ্ঠাধর অভিমানে স্ফুরিত, দৃষ্টি ছলোছলো।

হরকিশোর হাত জোড় ক'রে বললেন, 'প্রভু, আমাদের কী অপরাধ হ'ল—আমাদের ত্যাগ ক'রে যাচ্ছেন? দয়া ক'রে ফিরে চলুন—আপনার পূজা হয় নি বলে সমস্ত গ্রামবাসী হাহাকার করছে—সকলেই এখনও পর্যন্ত উপবাসী। ভক্তদের প্রতি দয়া করুন।'

এই কথায় কেশবজীর বৈদূর্যমণির চক্ষুদুটি থেকে যেন অনল বর্ষিত হ'ল।

তিনি বললেন, 'কে আমার ভক্ত? আমার ভক্ত সেই একজন ছিল, তাকে তোরা তাড়িয়েছিস। তার পূজা ছাড়া আমার তৃপ্তি নেই। আমি যাচ্ছি তারই পূজা গ্রহণ করতে।'

অভিমান হরকিশোরেরও কিছু হ'ল।

তিনি আহত কণ্ঠে বললেন, 'কিন্তু প্রভু, আমরা তো তাঁকে তাড়াই নি। তিনি নিজেই গেছেন। বরং আমরা অক্লান্ত খুঁজেছি ক'দিন। আর আপনি তো সকলেরই মালিক, ইচ্ছে করলেই তো তাঁকে ধরে রাখতে পারতেন।'

'না, তোদের এ গ্রামে পাপ স্পর্শ করেছে। মহাপাপ। বিষ্ণুপ্রসাদের মত শুদ্ধাচারী ভক্তের পক্ষে এখানে থাকা সম্ভব নয়, তাই সে গেছে—আমিও তাই চলেছি। ভক্ত ছেড়ে ভগবানেরও থাকা সম্ভব নয়।'

হরকিশোরের চোখে জল এসে গেল এই অকারণ তিরস্কারে।

তিনি তো মনেপ্রাণে কোন অপরাধ করেন নি। গ্রামবাসীরাও সাধারণ ভাবে কোন দোষে দোষী নয়। কেশবজী তো ভগবান—তিনি কেন একের অপরাধে সকলকে সাজা দেবেন? এ কী অবিচার তাঁর?

হরকিশোর বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'আমরা কি কেউই আপনাকে ভক্তি করি না? একজনের পাপে আমাদের ত্যাগ করছেন কেন? কেন আমাদের পূজা গ্রহণ করবেন না আপনি? আমরা কি অপরাধ করলুম?'

তবুও ওদিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন ঠাকুর, 'বিষ্ণুপ্রসাদের পূজা ছাড়া আমার তৃপ্তি নেই হরকিশোর।'

কিছুক্ষণ নির্বাক দাঁড়িয়ে থেকে হরকিশোর এক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'বেশ, আমি কথা দিচ্ছি যেমন ক'রেই হোক তাকে ফিরিয়ে আনব। আপনি দয়া ক'রে ফিরে চলুন। আমি আজই যাত্রা করছি—যদি বিষ্ণুপ্রসাদকে ফিরিয়ে আনতে পারি তো ফিরব, নইলে আর আমি ফিরব না। আমাদের অপরাধে আমাদের উত্তরপুরুষরা যেন তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারে না বঞ্চিত

হয়। আপনি না থাকলে গ্রামের কী রইল ?'

মুচকি হাসলেন ললিতাকেশব।

আবারও তাঁর বৈদুর্যমণির চোখে আগুন জ্বলে উঠল একবার।

বললেন, 'বেশ, চল আমি যাচ্ছি। তোমাকে আমি বিমুখ করব না। কিন্তু যতক্ষণ না বিষ্ণুপ্রসাদ ফিরবে, আমি বিমুখ হয়ে থাকব।...আমাকে না ফেরালেই বোধহয় ভাল করতে হরকিশোর। উত্তরাধিকারের কথা বলছিলে না ? পাপের উত্তরাধিকার তার প্রায়শ্চিত্ত।'

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই যেন অন্তর্হিত হলেন কেশবজী।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই হরকিশোরের ঘুম ভেঙে গেল।

উদ্বেগে, উৎকণ্ঠায়, উত্তেজনায়—একটা চাপা অভিমানে ও ক্ষোভে তাঁর বুকের মধ্যেটা যেন আকুলিবিকুলি করছে তখন।

তিনি ঘর্মাক্ত কলেবরে ধড়মড়িয়ে বিছানায় উঠে বসলেন।

সাধারণত রাত্রের দেখা স্বপ্ন রাত্রি প্রভাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্মৃতির দিগন্তে মিলিয়ে যায়, একটা অস্পষ্ট ধারণা হয়ত থাকে কোন কোন দিন। কিন্তু আজ স্পষ্ট মনে পড়ল সব কথা।

একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় বুকে যেন হাতুড়ির ঘা পড়তে লাগল।

একবার মনে হ'ল যে, এ তাঁর গত সন্ধ্যায় শোনা বিষ্ণুপ্রসাদের মহাযাত্রার ঐ কাহিনীর প্রতিক্রিয়া।

মনে মনে ঐসব কথা চিন্তা করেছেন বলেই এই রকম স্বপ্ন দেখেছেন।

আবার এ-ও ভাবলেন যে, ক'দিন ধরেই তো বলতে গেলে ক্রমাগত ভেবেছেন এই সব কথা,—মনে মনে তোলাপাড়া করেছেন, বৃন্দাপ্রসাদের মহাপাপের ফলাফল—তারই পরিণাম হয়ত এই স্বপ্ন।

মোটকথা উত্তপ্ত মস্তিষ্কের কল্পনা ছাড়া এ কিছু নয়।

স্বপ্ন স্বপ্নই—স্বপ্ন আবার কবে সত্যি হয় ?

কিন্তু তবু ঠিক নিশ্চিন্ত হ'তে পারলেন না।

ইচ্ছে হ'ল, একবার সেই রাত্রেই দরজা খুলে দেখে আসেন মন্দিরটা—কিন্তু সাহসে কুলোল না। যদি অমঙ্গল হয় ?

তাছাড়া ললিতাকেশব নিত্য বৃন্দাবনে বিহার করতে যান—এমনও একটা কিংবদন্তী আছে। এ সময় উৎপাত করা ঠিক নয়।

এর আগে কে নাকি এক তরুণ যুবক ধৃষ্টতা বা দুঃসাহসের পরিচয় দিয়ে ঐ কাজ করতে গিয়েছিল—নিজের চোখে দেখে কৌতূহল মেটাতে চেষ্টা করেছিল মধ্যরাত্রে মন্দিরের দরজা খুলে—কিন্তু কী দেখেছিল সে কাহিনী আর কাউকে বলা সম্ভব হয় নি তার।

চোখের দৃষ্টি এবং মস্তিষ্কের সুস্থতা দুই-ই চলে গিয়েছিল সে হত-ভাগ্যের চিরকালের মতো।

কথাটা মনে পড়তেই শিউরে উঠলেন হরকিশোর, উদ্দেশে হাত তুলে প্রণাম করলেন।

অবশ্য, রাত্রি প্রভাতের খুব বেশী দেরিও ছিল না তখন।

কোনমতে দণ্ড-কয়েক সময় বসে বসেই কাটালেন তিনি—তারপর উত্তরের তুষারমৌলি গিরিদেবতার ললাটে ঊষার রক্ততিলক আভাসে মাত্র স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গেই উঠে পড়লেন শয্যা ত্যাগ ক'রে।

বাইরে তখন প্রচণ্ড বাতাস বইছে, তুহিনশীতল করকা-স্পর্শ হিমবাতাস। চর্ম-মাংস ভেদ করে সে হাওয়ার তীক্ষ্ণতা।

তবু আর এক মুহূর্ত বিলম্ব করলেন না হরকিশোর। আর কোন কারণেই যেন তাঁর ইতস্তত করার সময় নেই।

তিনি ছুটে চলে গেলেন নদীতে—স্নান সেরে দাঁতে-দাঁত-লাগা অবস্থাতেই কাঁপতে কাঁপতে এলেন মন্দিরে।

তখনও ভাল ক'রে ফরসা হয় নি এখানে—পাহাড়ের প্রাচীর ভেদ ক'রে প্রভাত নামে নি উপত্যকায়, তবু নজর চলে। সশব্দে মন্দিরের দোর খুলে ফেলে রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে ভিতরে প্রবেশ করতেই তাঁর চোখে পড়ল—

কেশবজীর মুখ ওদিকে ফেরানো!

ভগবান বিরূপ হয়েছেন!

'হে কেশব, এ কী করলে?'

অস্ফুট কণ্ঠে এই কথা ক'টি উচ্চারণ ক'রে হরকিশোর সেইখানেই বসে পড়লেন।

॥ ১৪ ॥

অনেক, অনেকক্ষণ ধরে ভেবে স্থির করলেন হরকিশোর, এ খবরটা আর কাউকে দেবেন না তিনি।

মিছিমিছি আতঙ্কগ্রস্ত হবে সকলে।

একটা অকারণ হৈ-চৈ, অকারণ কান্নাকাটি। তিনি তো ভগবানের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেনই—সে প্রতিজ্ঞা তিনি প্রাণপণে রক্ষা করবেন। যদি প্রয়োজন হয় তো জীবনের শেষবিন্দু রক্ত দিয়ে—শেষ শক্তিটুকু দিয়েও।

আজই যাত্রা করবেন বিষ্ণুপ্রসাদকে ফিরিয়ে আনতে।

হয় ফেরাবেন, নয়তো নিজেও আর ফিরবেন না—এই শেষ।

তাঁর প্রাণের বিনিময়েও কি দেবতার রোষ শান্ত হবে না?

মন স্থির করার সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত একটা প্রশান্তি ফিরে এল তাঁর।

শীতের কাঁপুনিও আর যেন রইল না।

বিগ্রহকে ঘুরিয়ে ঠিক ক'রে বসালেন।

তারপর ধীরে-সুস্থে স্নান-বেশ ইত্যাদি সেরে লাড়ুভোগ দিয়ে পূজা-আরতি-স্তব সেরে বাইরে এলেন তিনি।

যে ক'টি পরিবারের কেশবজীর পূজো করার অধিকার আছে—তাদেরই মধ্যে পালা ক'রে এক একজন ভোগ রান্না করে।

হরকিশোর পাকের ঘরে এসে উঁকি মেরে দেখলেন, আজ সুরযনারায়ণ

এসেছে ভোগ রান্না করতে।

মুখ উজ্জ্বল হ'ল তাঁর।

সুরযনারায়ণকেই তিনি খুঁজছিলেন মনে মনে। বড় নিষ্ঠাবান ছেলে এই সুরয—অথচ বয়সে তরুণ বলে কর্মদক্ষ, চটপটে।

ভোগ আজ এখনই রান্না হয়ে যাবে। অর্থাৎ তিনিও অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়ি শয়ন দিয়ে নেমে যেতে পারবেন।

হরকিশোর নিশ্চিন্ত হয়ে মন্দিরে ফিরে গেলেন।

লাড়ুভোগ সরিয়ে আচমন করিয়ে তিনি বসলেন গীতা ও ভাগবত নিয়ে।

প্রত্যহ একটি অধ্যায় ভাগবত ও সম্পূর্ণ গীতা পাঠ করতে হয় কেশবজীর সামনে বসে।

এ নিয়ম বিষ্ণুপ্রসাদই করেছেন, অপরকেও—যেদিন অপরের হাতে সেবার ভার এসে পড়ে সেদিন—এ নিয়ম পালন করতে হয়।

গীতা শেষ ক'রে ভাগবতের পুঁথি খুলতে শুরু করেছেন—দরজার কাছে কার ছায়া পড়ল।

কোন আগন্তুক বা দর্শনপ্রার্থী এসে দাঁড়িয়েছে নাটমন্দিরে।

এ এমন কিছু বিস্ময়কর ঘটনা নয়—সকালে স্নান সেরে অনেকেই দর্শন ক'রে যায় কেশবজীকে, পাঠ হচ্ছে শুনলে দু'চার দণ্ড বসেও থাকে বাইরে।

কিন্তু তবু আজ—কেন জানে—মুখ তুলে তাকালেন হরকিশোর। হয়তো মনের মধ্যেকার অস্থিরতা, একটা নাম-না-জানা শঙ্কা থেকেই গিয়েছিল মনে মনে। জোর ক'রে দূর করার চেষ্টা করলেও একেবারে তাড়াতে পারেন নি তাদের।

বাইরে তাকিয়ে সে শঙ্কা ও অস্থিরতা কমল না বিন্দুমাত্র, বরং নিমেষে তা বেড়েই গেল।

বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে সুরয, মুখে তার গভীর উদ্বেগ।

সে যে কোন আকস্মিক কারণেই উঠে এসেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই, কারণ এখনও তার দু'হাতে আটা মাখা—অর্থাৎ আটা সানতে সানতেই ছুটে চলে এসেছে।

মনে মনে ভগবানের কাছে ও ভাগবতের কাছে মার্জনা চেয়ে নিয়ে প্রণাম ক'রে মুখ খুললেন হরকিশোর, 'কি খবর সুরয? কিছু বলবে?'

কথা বলতে সুরযের বেশ একটু সময় লাগল। তার ঠোঁট দুটো কাঁপছে থরথর ক'রে—গলা দিয়ে যেন স্বর বেরোতে চাইছে না।

'চাচাজী—আমার—আমার ছোট ভাইটা মারা গেছে—ঘুমের মধ্যেই। এইমাত্র বাবা এসে খবর দিয়ে গেলেন। আমার তো অশৌচ লাগল—আর তো আমার দ্বারা ভোগ হবে না।'

বলার সঙ্গে সঙ্গে হু-হু ক'রে কেঁদে উঠল সে। এতক্ষণের কৃত্রিম স্থৈর্য ব্যাকুলতার কাছে আত্মসমর্পণ ক'রে সহজ হ'ল।

'সে কি!'

পুঁথিখানায় আবার কাপড় জড়াতে জড়াতে বলেন হরকিশোর 'সে কি—কী হয়েছিল! এই তো কালও সন্ধ্যায় তোমার বাবার সঙ্গে এসে আরতি দেখে গেল!'

জবাব দিতে আবারও সময় লাগল সুরযের। রুদ্ধ কণ্ঠ দিয়ে স্বর বেরোতেই চায় না।

অতিকষ্টে বলল, 'কী হয়েছিল কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। যেমন খেয়ে-দেয়ে শোয় তেমনিই শুয়েছে, রাত্রে উঠেওছে একবার। মাকে ডেকেছে, মা বাইরে দাঁড়িয়েছেন। আমি তো ভোরবেলা উঠে এসেছি আজ, এখানে সেবা আছে বলে—বেলা বাড়তে মা ওঠাতে গিয়ে দেখেন কাঠ হয়ে পড়ে আছে রেজাইয়ের মধ্যে।'

'রেজাই চাপা পড়ে নি তো? দম বন্ধ হয়ে-টয়ে'—আড়ষ্ট অভিভূত হরকিশোর অতিকষ্টে বলতে যান।

'না না। মুখ খোলাই ছিল। মুখে ঢাকা দিয়ে আমরা কেউ ঘুমোতে পারি না।'

'তারপর?' বাইরে এসে দাঁড়ান হরকিশোর। অনেকক্ষণ পরে আবারও যেন সেই কাঁপুনিটা টের পাচ্ছেন। বুকে একটা চাঞ্চল্য। যেন নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে।

হে কেশব! হে কেশব! মনের মধ্যে যেন অপর একটা সত্তা অবিরাম উচ্চারণ ক'রে যাচ্ছে। অকারণেই।

'বাবা তখনও বুঝতে পারেন নি। ছুটে গিয়ে বৈদ্যজীকে ডেকে এনেছেন। তিনিই এসে বললেন—।'

কথাটা মুখে উচ্চারণ করতে পারল না সুরয, আবারও কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। খানিকটা পরে কান্নার বেগ আবার একটু সামলে বলল, 'কিন্তু কী হয়েছিল, কী রোগ, তা তিনিও বলতে পারলেন না। সাপে কেটেছে সন্দেহ ক'রে ওঝাও ডাকা হয়েছিল—তারা বললে সাপ নয়। সাপে কাটলে নীল হয়ে যেত—এর দুই হাত ও পায়ের চেটো লাল—টকটকে রক্তের মত লাল হয়ে উঠেছে।'

'লাল! রক্তের মত লাল!'

অদ্ভুত ভয়াবহ একটা শব্দ বেরোল হরকিশোরের গলা দিয়ে।

কেমন একরকম চুপি চুপি প্রশ্নটা করলেন তিনি।

সেটা না আর্তনাদ, না হাহাকার, না আতঙ্কের সুর—বুঝি তিনেরই বিচিত্র সংমিশ্রণ একটা।

তারপর নিজের ললাটে নিজেই করাঘাত করতে লাগলেন বার বার, 'হে কেশব! হে কেশব! তবু তুমি ক্ষমা করলে না, তবু একটু সময় দিলে না। বিশ্বাস করতে পারলে না আমাকে!'

একটা অব্যক্ত অথচ অসহ্য যন্ত্রণায় যেন ছটফট ক'রে উঠলেন হরকিশোর। কুঁকড়ে কুঁকড়ে উঠতে লাগলেন যেন।

তাঁর মুখচোখের অবস্থা দেখে সুরয কিছুকালের জন্য নিজের শোক ভুলে গেল। ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এসে ধরল তাঁকে, 'গুরুজী, গুরুজী শান্ত হোন। শান্ত হোন।'

'শান্ত! হ্যাঁ বাবা, শান্ত হব বৈকি। কিন্তু সুরয, তুমি তো আর বাকী খবরটা দিলে না বাবা! আমি যে সেইটে শোনবার জন্যই অধীর হয়ে রয়েছি।'

'বাকী খবর?' বিহ্বল হয়ে প্রশ্ন করে সুরয। ঠিক যেন বুঝতে পারে না ওঁর বক্তব্যটা।

'হ্যাঁ। আর ক'টা মারা গেল! তুমি ছুটে যেতে পার একবার বেটা, দেখে আসতে পারি—আরও ক'টা বাড়িতে কান্নার রোল উঠল? আমি শুধু এখন সেই সংবাদটারই প্রতীক্ষা করছি যে! একটু কান পেতে শোন—কান্নার শব্দ পাচ্ছ না? এ কী শুধুই তোমাদের বাড়ির? না—না, আরও বহু, আরও বহু—খবরটা নিয়ে এসো না বাবা।'

একরকম ঠেলেই তাকে পাঠিয়ে দেন হরকিশোর।

বিহ্বল বিমূঢ় সুরয কতকটা যন্ত্রচালিতের মতোই নেমে যায়।

কিন্তু নেমে যেতে যেতেই শোনে—সত্যিই যেন চারিদিক থেকে অনেকগুলো করুণ বিলাপের সুর ভেসে আসছে।

যেন গ্রামের চারিদিকে বেজে উঠেছে মৃত্যুর রাগিণী।

॥ ১৫ ॥

স্তব্ধ হয়ে সেইখানেই দাঁড়িয়ে থাকেন হরকিশোর—নীচে ছবির মতো আঁকা তাঁর চিরপরিচিত জন্মভূমি; শান্তি ও সুখের নীড় ঐ গ্রামটির দিকে তাকিয়ে থাকেন একদৃষ্টে।

ছবি, হ্যাঁ—ওস্তাদ শিল্পীরই আঁকা ছবি; তাতে সন্দেহ নেই।

পাহাড়ে গ্রাম, উঁচু-নীচু পথ, উঁচু-নীচু জমি। তার মধ্যে সবচেয়ে উঁচু একটা টিলার ওপর এই ললিতাকেশবের মন্দির, অনেকগুলো সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হয় এখানে।

সুতরাং প্রায় গোটা গ্রামটাই নাটমন্দিরের চত্বর থেকে নজরে পড়ে।

হরিতে-হিরণে-সাদায় অপরূপ এক দৃশ্য। মাঠে মাঠে সোনালী ফসল, বাগানে-বাগানে ফল ও ফুলের গাছে গাঢ় সবুজের সমারোহ, তারই মধ্যে ছোট ছোট সাদা ও মেটে রঙের বাড়ি—সবটা জড়িয়ে যেন কোন শক্তিমান শিল্পীর আঁকা সার্থক চিত্র একখানা।

ইতিমধ্যে রোদ বেশ চড়ে উঠেছে।

তুষার-শুভ্র পর্বতশীর্ষ থেকে তপ্তকাঞ্চন-বর্ণাভা বিদায় নিয়েছে, প্রখর সূর্যকিরণে শ্বেতদ্যুতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে তা থেকে।

ঠিক তার নীচেই সবুজের সমুদ্র, আর সেই সবুজের বেষ্টনীর মাঝখানে ছবিতে আঁকা এই গ্রাম।

আর যেন সেই ছবির সৌন্দর্য বাড়াতেই তাকে তিনদিক দিয়ে বেষ্টন ক'রে রয়েছে শীর্ণ ছোট্ট পাহাড়ী নদীটি—এখান থেকে সাদা সুতোর মতো—শ্যামল সুন্দরের কণ্ঠে শুভ্র একফালি যজ্ঞোপবীতের মতোই দেখাচ্ছে তাকে।

শান্ত সমাহিত গ্রাম, তন্দ্রালু পরিবেশ।

চিরদিন যেমন দেখে আসছেন—তেমনিই।

কোনদিন এখানে কোন সমস্যা দেখা দেবে তা ভাবেন নি হরকিশোর, আজও ভাবা যাচ্ছে না। আজন্ম একই খাতে বইতে দেখেছেন এখানের জীবন-ধারা। বাঁধাধরা সে জীবন, একটি সুষম সঙ্গীতের মতই সুসম্পূর্ণ, মধুর।

আজও তো বাহ্যিক কোন পরিবর্তনই হয় নি। নিত্যকার সেই শান্ত-রূপটিই দেখা যাচ্ছে।

দু-একটি বাড়ি থেকে রসুইয়ের চিহ্নস্বরূপ সামান্য সামান্য ধোঁয়াও উঠছে—সে ধোঁয়াও সেইখানে ছোট ছোট কুণ্ডলির আকারে জমে রয়েছে।

তার ফলে আরও যেন মোহময় হয়ে উঠেছে ছবিটা।

সেদিকে চেয়ে বিশ্বাসই হয় না যে কোন কঠোর সংকট নেমে এসেছে তার মাথায়—সর্বনাশের খড়্গ উদ্যত হয়ে রয়েছে।

তবু কান্নার শব্দটাও অস্বীকার করা যায় কৈ ?

হরকিশোর কান পেতে শুনলেন ভাল ক'রে।

অন্তত পাঁচ-ছটি বাড়ি থেকে কান্নার রোল ভেসে আসছে।

এই পরিবেশের সঙ্গে মিলিয়ে দূরাগত কোন করুণ সঙ্গীত বলেই মনে করা চলত তাকে, যদি না হরকিশোর তার অর্থটা এমন মর্মান্তিকভাবে জানতেন।

এ কান্না ভুল বোঝবার কোন সম্ভাবনা নেই, এ কান্না একটি মাত্র ঘটনাই সূচিত করে।

আবারও অস্থির হয়ে উঠলেন হরকিশোর।

কে যেন আলকুশীর বীজ ছড়িয়ে দিয়েছে তাঁর সর্বাঙ্গে। সেই রকম অসহ্য যন্ত্রণায় এঁকে-বেঁকে উঠতে লাগলেন তিনি।

তারপর আর স্থির থাকতে না পেরে ছুটে নেমে এলেন নীচে।

কিন্তু বেশীদূর তাঁকে যেতে হ'ল না।

সুরযও ছুটে আসছে ওদিক থেকে।

সুরয আর তার সঙ্গে শোকবিহ্বল আতঙ্কবিমূঢ় পাঁচ-ছজন লোক।

হরকিশোরের অনুমান মিথ্যা নয়। আরও কয়েকটি বাড়িতেই এই আকস্মিক, অপ্রত্যাশিত ভয়াবহ মৃত্যু নেমেছে।

যেন রাত্রের অন্ধকারে কোন যমদূত এসে নিঃশ্বাস ফেলে চলে গেছে গ্রামের ওপর।

সে নিঃশ্বাস কোন রন্ধ্রপথে যে যে বাড়িতে ঢুকেছে, সেই সেই বাড়িতেই ঘটেছে এই ঘটনা।

রোগ নয়, সর্পাঘাত নয়, দুর্ঘটনা নয়—অজ্ঞান, অবোধ, অকারণ মৃত্যু।

প্রত্যেক ক্ষেত্রেই মরেছে একটি ক'রে বালক—প্রত্যেকেরই হাত-পায়ে গাঢ় রক্তচিহ্ন।

বংশনাশের লক্ষণ এ—এই শিশু বা বালকের মৃত্যু। সমস্ত গ্রামেরই অস্তিত্বনাশের পূর্বাভাস বুঝি এ ঘটনা।

আবারও একটা চিৎকার ক'রে উঠলেন হরকিশোর।

না, পাগলের চিৎকার নয়। নিদারুণ বেদনাহত মানুষের আর্তনাদ এটা।

মর্মন্তুদ বেদনার অভিব্যক্তি।

'সব মরবে, সব মরবে সুরেষ। একজনও বাঁচবে না এ গ্রামে। বুঝতে পারছ না, বুঝতে পারছ না বেটা—ভগবানের রুদ্ররোষ জেগেছে, অভিশাপ নেমেছে এ গ্রামে। এ রক্তচিহ্ন কিসের তা বুঝছ না? গুরুবংশের রক্তের ঋণ শোধ ক'রে যাচ্ছে এক-একজন ক'রে। মহাপাতকের মহাপ্রায়শ্চিত্ত এ। এ সইতেই হবে আমাদের। এ যে আমাদের কৃতকর্মের ফল।'

হাহাকার ক'রে উঠলেন তিনি।

ক্রমে আরও বহুলোক ভীড় ক'রে এল।

হতচকিত, আতঙ্কগ্রস্ত, বিস্ময়-বিমূঢ় হতভাগ্যের দল। এমনি চিরদিন এসেছে তারা—বিপদে আপদে দুর্দিনে—গুরুজীর কাছেই ছুটে এসেছে, এসেছে দেবতার কাছে।

বিষ্ণুপ্রসাদ চিরদিন সব সমস্যার সমাধান ক'রে দিয়েছেন তাদের উপদেশ দিয়ে, নির্দেশ দিয়ে, সান্ত্বনা দিয়ে।

আজও সেই অভ্যাসেই ছুটে এসেছে তারা।

আঘাতের আকস্মিকতাটা কেটে যেতে হরকিশোর শান্ত হলেন।

সব কথাই খুলে বললেন ওদের। আর গোপন করার কোন অর্থ হয় না।

বললেন তাঁর গতরাত্রির স্বপ্নের কথা, বললেন কেশবের বিমুখ হওয়ার কথা।

নিজের সংকল্পের কথাও বললেন।

বলতে বলতে আবার হাহাকার ক'রে উঠলেন, 'শুনলেন না, শুনলেন না ভগবান আমার কথা, একের পাপে আমাদের এতবড় শাস্তি দিলেন। প্রায়শ্চিত্ত করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েও রেহাই পেলুম না। কী হবে, এখন কী করব! কী করলে ঠিক প্রায়শ্চিত্ত হবে—কে বলে দেবে সেকথা!'

বিশ্বাসে-অবিশ্বাসে মেশা কাহিনী, লৌকিকে-অলৌকিকে মেশা ঘটনা।

তবু বিশ্বাস না ক'রেও উপায় নেই।

নিষ্পাপ ব্রাহ্মণ কিশোর-কিশোরীর রক্তপাত হয়েছে, সেই রক্তেরই চিহ্ন ফুটে উঠেছে ওই মৃত শিশুদের হাতে-পায়ে, তাদেরই হত্যার শোধ উঠছে এতগুলি শিশুর মৃত্যুতে।

অতগুলি মৃতের সৎকারের আয়োজনে, হাহাকারে ও বিলাপে সারা দিনই

যেন এক দুঃস্বপ্নের মধ্যে দিয়ে কেটে গেল সকলের।

কেউ কিছু ভাববারও অবসর পেল না, কোন কর্ম-পন্থতি নির্ধারণেরও না।

তাছাড়া, মনের সমস্ত শক্তি-বন্ধনই তখন শিথিল হয়ে এলিয়ে পড়েছে, কারুর পক্ষে কিছু গুছিয়ে ভাবা সম্ভব নয়।

অবশেষে একসময় সেই একান্ত তিক্ত ও অরুচিকর কর্তব্য শেষ হ'ল। আর তারপর নামল এক দুঃসহ ভয়াবহ রাত্রি।

সন্ধ্যার সময় গ্রামের প্রবীণরা এসে মিলিত হলেন মন্দিরের নীচের চত্বরে। সারা দিন ভোগ হয় নি ঠাকুরের—পুজা আরতি শয়ন কিছুই হয় নি।

অধিকাংশেরই অশৌচ। করবে কে ?

হরকিশোর দারুণ অভিমানে বেঁকে বসেছেন—তাঁকে যখন কেশবজী বিশ্বাস করলেন না—আর দুটো দিন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে পারলেন না, তখন বুঝতে হবে যে তাঁর সেবা কেবশজীর মনঃপুত নয়। তাঁর আর সেবার যোগ্যতা নেই।

তিনি আর পুজা করবেন না—কোনদিনই না।

অনেক খোঁজাখুঁজি অনেক তর্কবিতর্কের পর অবশেষে একটি বারো বছরের ছেলেকে ধরে বাইরে থেকে নির্দেশ দিয়ে সন্ধ্যারতি ও শয়নের কাজ সারা হ'ল। ভোগ বলতে একটু ধারোষ্ণ সদ্যোনীত দুধ নিবেদন ক'রে দেওয়া হ'ল শুধু। তখন আর রান্না করার ইচ্ছা বা অবসর কারুরই নেই ; শক্তি তো নেই-ই।

দেবতার শয়ন দেবার পর সভা বসল। এখন কী করা যাবে ? কী করা উচিত ? সকলের মুখেই এক প্রশ্ন।

কী করলে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে তা ঠাকুর বলেন নি। বলেছেন শুধু বিষ্ণুপ্রসাদকে ফিরিয়ে আনার কথা। কিন্তু যদি বিষ্ণুপ্রসাদ না আসেন ? তাহলে ?

তাহলে যে কী হবে তা কেউ জানে না।

প্রত্যেকেই প্রত্যেকের মুখের দিকে চায়।

আরও যেন একটা দুঃসহ আতঙ্কে সকলের মাথা গিয়েছে গোলমাল হয়ে—কেউই কিছু গুছিয়ে ভাবতে পারছে না।

যদি সত্যিই দেবতার রোষ হয়—আর তাইতো মনে হচ্ছে—তাহ'লে একদিনে কি শান্ত হবে ?

কে জানে আজ আবার কার অদৃষ্টে কি আছে !

আজ রাত্রের জন্য আরও কী অকল্পনীয় দুর্ভাগ্য অপেক্ষা ক'রে আছে !

সামনেই দুঃসহ অন্ধকার রাত্রি বিভীষিকার মতো দাঁড়িয়ে ; ওর অতল রহস্যময় বুকে আরও কী ভয়ঙ্কর উদ্দেশ্য আছে কে জানে !

হরকিশোর এতক্ষণ চুপ ক'রে বসে ছিলেন। বসেছিলেন তিনি মন্দিরের দিকে পেছন ক'রে। সারাদিন কিছুই খান নি—প্রসাদী দুধ একজন দিতে এসেছিল, মাথায় ঠেকিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এ গ্রামে কিছুই আর খাবেন

না তিনি—এক যদি বিষ্ণুপ্রসাদকে নিয়ে ফিরে আসতে পারেন তাহলেই আবার প্রসাদ পাবেন এ গ্রামে।

তাঁকেও আলোচনার মধ্যে টেনে আনবার চেষ্টা হয়েছিল কয়েকবার, কিন্তু কোন ফল হয় নি। তিনি তাঁর নীরবতা ভঙ্গ করেন নি একবারও।

বিষ্ণুপ্রসাদকে ফিরিয়ে আনা ছাড়া আর কোন প্রায়শ্চিত্তের কথা কেশবজীকে জিজ্ঞাসা করা সম্ভব কিনা—হরকিশোর জিজ্ঞাসা করবেন কিনা—কোন কোন শোকগ্রস্ত উৎকণ্ঠিত পিতা এ প্রশ্নও করেছিলেন।

কিন্তু হরকিশোর সাফ্ 'না' বলে দিয়েছেন। ঠাকুর স্বপ্নে তাঁকে দেখা দিয়ে বলেছেন। ইচ্ছা হয় তিনিই বলবেন। প্রশ্ন ক'রে উত্তর পেতে যাওয়া মূঢ়তা মাত্র।

সুতরাং তাঁকে বাদ দিয়েই আলোচনা চালাতে হ'ল এবং অনেকক্ষণ ধরে একটা যুক্তিবদ্ধ আলোচনা করার বৃথা চেষ্টা ক'রে অবশেষে একজন হরকিশোরকে আবার প্রশ্ন করলেন, 'ছোটা পুজারীজি, আপনি তা'হলে কি ঠিক করলেন?'

হরকিশোর কতকটা তন্দ্রাচ্ছন্নের মত বসে ছিলেন। এখনও গ্রামের মধ্য থেকে একটানা কান্নার কয়েকটা মৃদু সুর ভেসে আসছে। দূরাগত—তবে নিরবচ্ছিন্ন এবং স্পষ্ট। কান পেতে ছিলেন সেই দিকেই। এবার যেন সেই কষ্টদায়ক তন্দ্রা থেকে জেগে সোজা হয়ে উঠে বসলেন।

'আমি? আমি আজ রাত্রি প্রভাত হওয়ার আগেই রওনা দেব।'

'রওনা দেবেন—কিন্তু গুরুজীকে কি ফিরিয়ে আনতে পারবেন? আসবেন কি তিনি? আপনি কী তাঁর দেখাই পাবেন?'

এমনি অসংখ্য প্রশ্ন ওঠে অসংখ্য কণ্ঠে।

শান্ত ধীর ভাবে সব শোনেন হরকিশোর। তারপর একরকমের উদাস কণ্ঠে বলেন, 'জানি না। সত্যিই আমি কিছু জানি না। চেষ্টা করব—হয় তাঁকে ফিরিয়ে আনব, নয়তো ফিরব না, এই প্রতিজ্ঞা করেছি ঠাকুরের কাছে। সে কথা রাখব। তারপর তাঁর ইচ্ছে। আজই যাওয়া উচিত ছিল আমার, তখনই।—হয়ত সেই জন্যই—। অবশ্য যেতে যে পারি নি তাতে আমার কোন দোষ ছিল না। তাও ঠাকুর জানেন। তবে কাল আমি যাবই। আর দেরি হবে না।'

সকলেই চুপ ক'রে রইল।

অকস্মাৎ রাত্রির স্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে দূর বনভূমিতে মর্মর জাগিয়ে দমকা পাহাড়ে-বাতাস উঠল একটা।

হু হু বাতাস।

সে বাতাসে হাড় পর্যন্ত কেঁপে উঠল সকলের। শিউরেও উঠল কেউ কেউ।

কানে মাথায় চাদর মুড়ি দিয়ে সকলে উঠে পড়ল।

দেখা যাক ভাগ্যে কি আছে। যা আছে তাই হবে। আর ভাবা সম্ভব নয়—ভাবতেও কেউ পারছে না।

হরকিশোরও বাড়ির পথ ধরলেন।

মন্দিরের চাবি তাঁর কাছে রাখেন নি। কার কাছে রইল তাও খোঁজ করলেন না।

আর দরকার নেই তাঁর।

এ জীবনে হয়ত আর দরকার হবেও না।

হরকিশোর অন্ধকার নির্জন বনপথ ধরে যখন বাড়ির দিকে হাঁটছিলেন তখন একসময় যেন স্পষ্ট অনুভব করলেন অন্ধকারের মধ্যেই তাঁর আশেপাশে কারা ঘুরে বেড়াচ্ছে।

যেন অশরীরী অতৃপ্ত আত্মা কতকগুলো।

তাদের দীর্ঘশ্বাস এই হু-হু ঝোড়ো বাতাসের মধ্যেও পৃথকভাবে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

আরও বুঝি সাংঘাতিক কোন সর্বনাশের বার্তা রয়েছে তাদের ঐ নিঃশ্বাসে।

হরকিশোর নিজের অজ্ঞাতসারেই একটু জোরে পা চালালেন।

কিন্তু ঠিক নিজের পল্লীতে প্রবেশ করার পথেই বাধা পেলেন তিনি।

অপ্রত্যাশিতভাবে বাধা।

কে একজন পিছন থেকে তাঁর উত্তরীয় ধরে টানল।

'দাঁড়ান!'

চমকে উঠলেন একটু। ভয় তাঁর নেই—এখন এই অবস্থায় মরণের ভয় তো নেই-ই—তবু সহজাত সংস্কারেই চমকে উঠলেন যেন।

'কে?'

স্খলিত ভগ্ন কম্পিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন হরকিশোর।

'আমি।' যে তাঁকে পিছন থেকে টেনে দাঁড় করিয়েছিল, সে স্পষ্ট উত্তর দিল।

অন্ধকারে নক্ষত্রের আলোতে যতটা দৃষ্টি যায়, হরকিশোর মুখটা কাছে এনে প্রাণপণে চেয়ে দেখলেন—একটি কিশোরী বালিকা।

চিনতেও পারলেন তাকে।

মালতী।

তাঁরই দূর-সম্পর্কের ভাইঝি।

সূর্যপ্রসাদের সঙ্গে বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক হয়েছিল ওর। সূর্যপ্রসাদের জন্মমাস এবং সামনের পুরুষোত্তম মাস কেটে গেলেই ওর বিবাহ হবার কথা—আগামী বসন্তকালে।

সর্বসুলক্ষণযুক্তা এই রূপসী মেয়েটিকে বিষ্ণুপ্রসাদ চার বৎসর পূর্ব থেকেই চিহ্নিত ক'রে রেখেছিলেন পৌত্রের জন্য। তাঁর বংশের বাগ্‌দত্তা বধূরূপে।

'মালতী!'

অতিকষ্টে প্রশ্ন করেন হরকিশোর।

'হ্যাঁ, আমি। দাঁড়ান।' তার দুই চোখের আগুন এই অন্ধকারেই লক্ষ্য হয়। আকাশের তারার মতই জ্বলজ্বলে দুই চোখে যেন ঘৃণা আর বিদ্বেষ উপচে পড়ে।

সে বলে, 'কোথায় পালিয়ে যাচ্ছেন কাকা কর্তব্য অসম্পূর্ণ রেখে? কী হবে সে বন্ধকে ফিরিয়ে এনে? কেশবজী তুষ্ট হবেন? কখনও না। তাহ'লে তিনি আপনার প্রতিজ্ঞাতেই তুষ্ট হতেন। পাপের শোধ প্রায়শ্চিত্তে। হিংসার প্রায়শ্চিত্ত প্রতিহিংসা। সূর্যপ্রসাদ আর বিশাখার হত্যাকারীকে বলি না দিলে কেশবজী তৃপ্ত হবেন না কাকা।'

দুহাতে কান ঢাকেন হরকিশোর।

'এ কী বলছ মা! তুমি বালিকা, ভবিষ্যৎ জননী—তোমার উপর বহু সংসারের কল্যাণ নির্ভর করছে। তোমার মুখে এ কথা মানায় না। রক্তপাতে প্রভু তুষ্ট হবেন এ আমরা ভাবতেই পারি না। আমরা যে বৈষ্ণব। না মা, আমাদের প্রায়শ্চিত্তের বিধি অন্যরকম। তুমি শান্ত হও মা, তুমি ঘরে যাও।'

মালতী হাসল একটু। তাচ্ছিল্যের হাসি। বলল, 'গ্রামকে রক্ষা করার শেষ সুযোগ হারালেন আপনি। তবে আমি আমার পথ ছাড়ব না, এও জেনে রাখুন।'

আর একবার হাসল মালতী, এবার শব্দ ক'রে। তার পর বোধ হয় চলে গেল। বনপথে কোথায় কোন দিকে গেল, তাও হরকিশোর বুঝতে পারলেন না। অন্ধকারেই এসেছিল, আবার অন্ধকারেই মিলিয়ে গেল।

হরকিশোর আর একবার নিঃশ্বাস ফেললেন, 'হে কেশব! হে কেশব!'

॥ ১৬ ॥

হরকিশোরের কিন্তু সেরাত্রের শেষেও যাত্রা করা হ'ল না।

গত সন্ধ্যায় তাঁর প্রতিজ্ঞা করবার সময় বুঝি বিমুখ ভাগ্যদেবতা ধারে-কাছেই কোথাও দাঁড়িয়ে ছিলেন—আর হেসেছিলেন একটু, হরকিশোরের ঈষৎ স্পর্ধিত প্রতিজ্ঞায়।

অসহায় দুর্বল মানুষকে সে যে কত অসহায়, কত দুর্বল সেইটে বুঝিয়ে দেওয়াতেই বুঝি ভগবানের বেশী তৃপ্তি, বেশী আনন্দ।

হরকিশোরের পুত্র নেই। এক কন্যা—তার বিবাহ হয়ে গেছে। জামাইকে নিজের জমির খানিকটা দিয়ে বসত করিয়েছেন। বাড়ি থেকে খুব দূরে নয়—তবে নিজের বাড়ির সংলগ্নও বলা যায় না ওদের বাড়ি।

ঘর-জামাই রাখা ওঁর পছন্দ নয়, জামাইও তা থাকতে রাজী হয় নি।

তবু যতটা কাছে থাকে। একমাত্র মেয়ে। টান একটু থাকে বৈকি।

মন্দির থেকে ফেরার পথে একবার দাঁড়িয়েছিলেন মেয়ের ঘরের সামনে।

মেয়ে-জামাই বসতে বলেছিল, বসেন নি। ভালই আছে ওরা এতটুকু জেনে বিদায় নিয়ে চলে এসেছিলেন।

তাঁর প্রতিজ্ঞার কথা সবাই জানে।

ওরাও জেনেছে।

ছলছল করতে লাগল মেয়ের চোখ। কিন্তু বাবাকে চেনে বলে প্রতিনিবৃত্ত করবার চেষ্টা করল না।

তার একটু ভয়-ভয়ও করছে এটা ঠিক।

কেন কে জানে—মেয়ে বিশোকার কেমন মনে হয়েছিল যে সে হরকিশোরের মেয়ে, আর যেহেতু হরকিশোর ঠাকুরকে খুশী করতেই যাচ্ছেন ঐ অজ্ঞাত পথে—সেই হেতু তাদের কোন ভয় নেই।

ভয় বাবার জন্যই বেশি, কি হবে কে জানে!

বিপদসঙ্কুল দুর্গম পথ।

হরকিশোর সামান্য দু-একটা আশ্বাসের কথা বলে বাইরে থেকেই চলে এসেছিলেন।

বাড়িতে স্ত্রীর মুখও থমথম করছে—দুই চোখ লাল। কতকটা ভয়ে কতকটা বিরহে, কতকটা হরকিশোরের অমঙ্গল আশঙ্কায়।

হরকিশোর কিছু খাবেন না—তা গৃহিণী জানেন। তিনিও কিছু খান নি এতক্ষণ পর্যন্ত।

হরকিশোরই পীড়াপীড়ি ক'রে খাওয়ালেন তাঁকে।

তাঁর প্রতিজ্ঞার কারণ আছে, সে প্রতিজ্ঞা তিনি রাখবেন। সেজন্য গৃহিণীর উপবাস ক'রে দেহকে ক্লান্ত করার কোন অর্থ হয় না।

গৃহিণীও তাঁর তরফ থেকে বহু অনুনয় বিনয় ক'রে রাজী করিয়ে একটা ঝোলাতে কিছু ঝালমাখানো কড়া রুটি, কিছু ছাতু এবং কয়েক ডেলা পরিষ্কার গুড় দিয়ে দিলেন।

ঝোলার আর একদিকে রইল সামান্য পূজার তৈজস ও একখানা অতিরিক্ত বস্ত্র।

বার বার মাথার দিব্যি দিয়ে বলে দিলেন, হরকিশোর যেন গ্রামের সীমানা ছাড়িয়ে গিয়ে অবশ্য কিছু খেয়ে নেন।

তিনি যে প্রতিজ্ঞা করেছেন এ গ্রামের মধ্যেই তা প্রযোজ্য—গ্রামের বাইরে তা রাখতে হবে এমন কোন দায় নেই। তাছাড়া দেহ যদি সুস্থ-সবল না থাকে, কেমন ক'রে ফিরিয়ে আনবেন তিনি গুরুজীকে ঐ দুর্গম পথ দিয়ে?

হরকিশোর বিশেষ কিছু বললেন না।

বাধাও দিলেন না স্ত্রীকে।

বাধা দেওয়া বা বলার মত দেহ-মনের অবস্থা নয়।

শুধু বললেন, 'কাল ঘরে তালা লাগিয়ে বিশোকার বাড়িতে চলে যেও। গরু দুটোকেও নিয়ে যেও। ফিরতে কত দেরি হবে আমার তা তো বলতে পারি না।'

বিছানায় শুয়ে ইষ্টনাম জপ করতে করতে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলেন হরকিশোর।

গত ক'টা দিন কী ঝড়ই না বয়ে গেল গ্রামের ওপর দিয়ে!

কী নিদারুণ উত্তেজনা, কী দুঃসহ আঘাত !

বিশেষত আজ ।

উত্তেজনা ও আবেগেই আরও যেন দুর্বল হয়ে পড়েছেন তিনি, নইলে এমন তিন-চার দিন উপবাসেও তাঁর কিছু হয় না ।

বিশেষত মনের অবচেতনে বড় ভয়টা থেকেই গেছে—কে জানে আবার কাল সকালে কী শুনবেন !

তবে সকাল অবধি থাকবেন না তিনি এটা ঠিক ।

শেষরাত্রে শুকতারা দেখলেই বোঝা যাবে ভোর হচ্ছে—সেই সময়ই রওনা দেবেন তিনি ।

আর দেরি নয় ।

এই আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতেই—বুঝিবা অতিরিক্ত শারীরিক ক্লান্তি ও মানসিক অবসাদেই—কখন ঘুমিয়ে পড়েছেন ।

একেবারে ঘুম ভাঙল বাইরের দরজায় মুহুর্মুহু প্রবল করাঘাত ও আর্তনাদে ।

চমকে জেগে উঠে প্রথমটা যেন আতঙ্কেই বিহ্বল হয়ে গেলেন তিনি—তারপর গৃহিণীকে আলো জ্বালবার কথা বলে কোনমতে হাতড়ে হাতড়ে এসে অন্ধকারেই দোর খুলে দিলেন ।

না, ভুল হয় নি তাঁর ।

জন্মের প্রথম দিনটি থেকে একটু একটু ক'রে যাদের বড় ক'রে তুলতে হয় —বুকের রক্ত দিয়ে, জীবনের সমস্ত সাধ্য দিয়ে—তাদের কান্না ভুল হবার কথাও নয় ।

গাঢ় ঘুমের মধ্যেও এ কান্না কার তা বুঝতে পেরেই অমন বিহ্বল হয়ে গিয়েছিলেন ।

দোর খুলে কোন প্রশ্ন করতে হ'ল না । 'কে' এ প্রশ্ন তো অবান্তর, অনাবশ্যক ।

আর কিছু বলতেও হ'ল না ।

বিশোকার কোলে তার মৃত শিশুপুত্র । পিছনে জামাতা একটা মশাল হাতে এসে দাঁড়িয়ে ।

শোকে আর্তনাদ করছে না, ভয়ে ঠকঠক ক'রে কাঁপছে ।

শোক করার মত, আঘাতটা উপলব্ধি করার মতো অবস্থাও আর তার নেই । জড়, জন্তুর মতো হয়ে গেছে ।

'কী করলে বাবা তুমি ? এ আমার কী হ'ল ? কী পুজো করলে এতকাল আদিকেশবের ? আমারও এই সর্বনাশ কেন হ'ল ? কেন হ'ল ?'

হাহাকার ক'রে উঠল বিশোকা ।

ছেলের দেহটা প্রায় ছুঁড়ে বাপের পায়ের ওপর ফেলে দিয়ে নিজেও আছাড় খেয়ে পড়ল ।

কিন্তু এই তো শেষ নয় ।

ঐ যে গ্রামে আরও রব উঠেছে—বুকফাটা কান্নার।

না—এ গতকালের জের নয়; তা কেউ বলে না দিলেও বুঝতে পারলেন হরকিশোর।

এ টাটকা—এখনকার ঘটনার ফল। নতুন সর্বনাশ ঘটেছে—নতুন নতুন মৃত্যুর সংবাদ পাচ্ছেন তিনি ক্রন্দনের ঐ কলরোলে।

বিশোকার কান্নার শব্দে বহু লোক ছুটে এল।

গ্রাম ভেঙেই এল বলতে গেলে সকলে।

যাদের ছেলেমেয়ে মরেছে তারা মৃত সন্তান নিয়ে ছুটে এল।

'এ আমাদের কি হ'ল? এখন বলে দাও কি করব আমরা, কী করলে এ রোষ শান্ত হবে ভগবানের?'

সকলের মুখেই এক কথা।

সকলের মুখেই এই এক প্রশ্ন।

মেয়েদের মুখে অবশ্য।

পুরুষেরা হতবাক হয়ে গেছে। ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে তারা।

কাঁপছে ঠকঠক ক'রে—প্রথম দক্ষিণাবাতাস-লাগা বেতসপত্রের মত।

রক্তশূন্য সাদা হয়ে গেছে তাদের মুখ—যেন এক রাত্রের মধ্যে কোন ডাকিনী তাদের সকলের রক্ত শুষে নিয়েছে।

তারা কিছু ভাবতেও পারছে না। শোক প্রকাশ করতেও না। আঘাতের অনুভূতিটাও তীব্রভাবে উপলব্ধি করার শক্তি হারিয়েছে তারা।

সেই অজ্ঞাত মহামারীতেই মরেছে এরাও—সেই হাতে-পায়ে গাঢ় রক্তচিহ্ন, সেই এক ধরনের মুখের ভাব। বুঝি এতে কারও রক্ষা নেই। গ্রামে কারও বংশে বাতি দিতে থাকবে না কেউ।

পাথর হয়ে গিয়েছিলেন হরকিশোরও।

কোন জ্ঞান, কোন অনুভূতিই ছিল না যেন আর।

কী ঘটছে তাও ভাবতেও পারছেন না।

কোথায় একটা ভোরের পাখী ডেকে উঠল।

উত্তুরে বাতাস উঠেছে জোর।

মাথার ওপরে পাহাড়ের চূড়াগুলো ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা দেখা যাচ্ছে—জমাট ডেলাবাঁধা অন্ধকার ফিকে হয়ে এসেছে সেখানে।

শুকতারা কখন ঢলে পড়েছে পশ্চিম দিকের বড় পাহাড়টার আড়ালে, এতক্ষণ লক্ষ্য করে নি কেউ।

ক্রমে ফর্সা হ'ল একটু একটু ক'রে।

পাহাড়ের মাথা রাঙা হয়ে উঠল।

আর একটু পরে রক্ত-তিলকের মত একফালি রোদ এসে পড়ল উত্তরের বড় পাহাড়টার শিখরে।

প্রভাত আলোর সঙ্গে সঙ্গে গ্রামবাসীদেরও সম্বিৎ ফিরে এল একটু।

হাহাকার ক'রে কাঁদছিল যে মেয়েরা, তারা বুঝি শ্রান্তিতেই শান্ত হয়ে এসেছে।

পুরুষেরা এবার মেয়েদের থেকে পৃথক হয়ে এক জায়গায় এসে দাঁড়াল।

কী করা হবে এখন? কী করা উচিত?

সেই পুরনো নিরুত্তর প্রশ্ন।

তবে একটা বিষয়ে আর কোন দ্বিমত নেই যে, যা-কিছু ঠিক করতে হবে—আজই, এখনই। আর এতটুকু দেরি করা সম্ভব নয়।

তবু প্রশ্ন আর প্রতিপ্রশ্নে বেলা ই বাড়তে থাকে শুধু, কোন মীমাংসা হয় না। কিছুই ঠিক হয় না।

মীমাংসা খোঁজবার মতো, বিচার ক'রে কোনও পথ দেখে নেবার মতো একটুকুও শক্তি বুঝি কারুর আর অবশিষ্ট নেই।

মনে হ'ল—এমনি ক'রে বসে বসেই তারা মরবে।

এই 'উদ্যতবজ্র মহদ্ভয়' দৈবরোষের সঙ্গে যুদ্ধ করার চেয়ে, এই প্রত্যক্ষ সামনে-এসে-দাঁড়ানো মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করার চেয়ে বুঝি সোজাসুজি মরাই তাদের কাছে ঢের সহজ, এমন কি কাম্যও।

আর পারে না তারা, আর পারছে না!

॥ ১৭ ॥

কারুর মাথাতেই এই দুর্দশার, এই দুঃসহ দুঃখের প্রতিকারের কোন উপায় আসে না।

যখন প্রায় হতাশায় সবাই হাল ছেড়ে দিয়েছে তখন এক কাণ্ড ঘটল।

বিশোকা এসে প্রথম আছড়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই হরকিশোরের স্ত্রীও মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন।

কিন্তু তাঁর দিকে কেউ নজর দেয় নি। কে-ই বা দেবে?

কেউ অজ্ঞান হ'তে দেখে নি বলে কখন যে তাঁর জ্ঞান হয়েছে, তাও কেউ লক্ষ্য করে নি।

জ্ঞান হবার পরও অনেকক্ষণ মূর্ছাতুরভাবে বসেছিলেন চুপ ক'রে।

হঠাৎ তিনি যেন জ্যা-মুক্ত ধনুকের মত ছিটকে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

তারপর যা কখনও তিনি করেন নি—কেউ করে না এদেশে—তাই করলেন, সেই অনাত্মীয়বহুল পুরুষদের জমায়েতের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলল, 'চল আমরাও সকলে চলে যাই এ গাঁ ছেড়ে। আজই, এখনই। এই এক বস্ত্রে—যেমন আছি তেমনি। দেবতাকে পিছনে রেখে চলে যাই এসো। এ গ্রামে কেশবজীর অভিশাপ লেগেছে—এ গ্রামের কল্যাণ নেই আর। এখানে থাকলে কেউ বাঁচবে না।'

সকলেই অবাক!

এ গাঁ ছেড়ে চলে যাবে—সবাই, সকলকে নিয়ে?

কিন্তু তা কি সম্ভব?

প্রত্যেকেই নীরবে প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

হরকিশোরের স্ত্রী আবারও বললেন, 'চল, আমরাও সেখানে যাই—গুরুজী যেখানে গেছেন। তাঁকে সব কথা বললে, আমাদের সকলের এই দুঃখ দেখলে হয়ত তাঁর কৃপা হবে। তিনি যদি আমাদের ক্ষমা করেন তো ভগবানও ক্ষমা করবেন—তখন আমরা গুরুজীকে নিয়েই ফিরব।'

'কিন্তু তা কি সম্ভব মাতাজী?'

'কেন সম্ভব নয়? নইলে এমনি ক'রে অসহায়ভাবে বসে বসে নিশ্চিহ্ন হবে সবাই?···কেউ থাকবে না, কেউ বাঁচবার আশা রেখো না। এখন বংশ-ধররা যাচ্ছে, এর পর তোমরাও যাবে। রুদ্র রুষ্ট হয়েছেন, প্রবল তৃষ্ণা নিয়ে জেগে উঠেছেন—সকলকার রক্ত ছাড়া তাঁর পিপাসা মিটবে না।'

এবার মৃদু গুঞ্জন উঠল একটা। সে গুঞ্জনের ঢেউ এসে লাগল নারীদের মধ্যেও।

হ্যাঁ—কথাটা এ মন্দ বলে নি।

হয়ত এ-ই একটা বাঁচবার উপায় আছে এখনও।

গ্রাম ত্যাগ ক'রে গেলে হয়ত এই অভিশাপ আর এই অভিশপ্ত গ্রামের দূষিত আবহাওয়া এড়াতে পারা যাবে।

পথের বিপদ?

না হয় দু'চারজন মরবেই।

এখানে থাকলে সকলে মরবে, গেলে তবু হয়ত দু'চারজনেরও অন্ততঃ বাঁচবার সম্ভাবনা থাকবে।

যতই কথাটা আলোচিত হ'তে থাকে ততই যেন প্রস্তাবটার সম্ভাব্যতাটাও লোকের মনে লাগে।

ছোটখাটো বিরুদ্ধ যুক্তির মেঘ যে না উঠল তা নয়—ছোটখাটো মায়া, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র স্বার্থ—কার গরু ছেড়ে যাওয়ায় অসুবিধা, কার গর্ভিনী পুত্রবধূর সমস্যা—কারো বা আরও ছোট কোন বন্ধন—কিন্তু এসব যুক্তি ও অসুবিধার কাল্পনিক মেঘ অধিকাংশের মতের প্রবল ঝড়ে উড়ে গেল।

যেখানে সমূহ সর্বনাশ সামনে, সেখানে ছোটখাটো অসুবিধার কথা তোলে মূর্খতে।

আপৎকালে অনেক কিছুই ত্যাগ করতে হয়। কার কি ঘটি-বাটি, গরু-বাছুর পড়ে থাকবে তা ভাবতে গেলে আর চলবে না।

প্রাণ যেখানে যেতে বসেছে—বংশনাশের প্রশ্ন যেখানে মুখ্য—সেখানে কী আঁকড়ে ধরে থাকতে চাও তোমরা, ক'দিন ধরে রাখার আশা করো?

শেষে বহু আলোচনা বহু উত্তেজনা—চেঁচামেচি গণ্ডগোলের পর স্থির হ'ল যে তাই হবে, আজই অপরাহ্নে সকলে রওনা হয়ে যাবে।

শীতবস্ত্র এবং খাদ্য—এ-ছাড়া কেউ কিছু সঙ্গে নেবে না—পাহাড়ে-পথে যে-জিনিস অবশ্য নেওয়া দরকার তা-ই শুধু নেবে।

যেসব শিশু আজ মারা গেছে—স্থির হ'ল তাদের সকলকে একটা চিতায় শুইয়ে মুখাগ্নি দিয়েই রওনা হয়ে পড়বে। যতটুকু পোড়ে পুড়বে—যা না

পড়বে তা পড়ে থাকবে।

যারা গেছে তাদের কথা চিন্তা ক'রে—এখনও যারা আছে তাদের জীবন বিপন্ন করার কোন অর্থ হয় না।

পিছনে ফিরে তাকাবার আর অবসর নেই।

বাড়ি ? ঘর ? ফসল ? গোলা ? গরু ?

সব থাক।

গরু ছেড়ে দাও। গরু, ছাগল, ভেড়া যার যা আছে।

তারা চরে খাক।

যদি কোনদিন আবার ফিরে আসি, ফিরে আসতে পারি—তখন দেখা যাবে।

এখন আর কিছু নয়।

'কিন্তু কেশবজী ?' কে একজন প্রশ্ন করল যেন পিছন থেকে।

বোধ হয় সুরযের বাবা।

হরকিশোর সেই প্রত্যূষকাল থেকেই স্তব্ধ প্রস্তরবৎ দাঁড়িয়ে ছিলেন—একবারও নড়েন নি, একটা কথারও উত্তর দেন নি, এইবার তাঁর যেন টনক নড়ল।

তিনি হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, 'থাক, থাক ও পাথরের ঠাকুর পড়ে। যে শ্মশান রচনা করেছে সেই শ্মশানেই পড়ে থাক ও।'

না, না। বাপ্‌রে!

সবাই শিউরে উঠল কথাটা শুনে।

তা কখনও হয় ?

দেবতা নিরম্বু থাকবেন ?

একেই তো ওঁর রোষে পড়ে এই হাল হয়েছে—আবারও ওঁকে রুষ্ট করা!

কিন্তু এ সমস্যারও সমাধান ক'রে দিলেন হরকিশোরের স্ত্রী।

বললেন, 'ঠাকুর আমাদের সঙ্গেই যাবেন। ঠাকুরকে ফেলে যাবার কথা কে বলছে ? তবে পথে যতটুকু সেবা সম্ভব তাই হবে। তার বেশী করবই বা কি ক'রে, কি দিয়ে ?'

এইবার সবাই খুশী হ'ল।

স্থির হ'ল ব্রাহ্মণরা—এখনও যাদের অশৌচ হয় নি—পালা ক'রে বহন করবেন কেশবজীকে। তাঁরাই যথাসম্ভব সেবাও করবেন।

॥ ১৮ ॥

সে এক বিচিত্র দৃশ্য। অদ্ভুত অভিজ্ঞতা সকলের।

গ্রাম শূন্য ক'রে চলেছে সবাই—নর-নারী বালক-বালিকা—জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে। চলেছে নিরুদ্দেশের পথে, যেন এক দুর্নিবার আতঙ্ক তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাদের।

যেতেই হবে।

কোথায় যাচ্ছে তা ঠিক কেউ জানে না।

কী উদ্দেশ্য—তাও খুব স্পষ্ট নয়।

গুরুজীর দেখা না পেলে কী করবে? কিংবা যদি তিনি ফিরে আসতে রাজী না হন?

তা কেউ জানে না, কেউ অত ভেবে দেখে নি।

ওরা কি দেবতার রোষ থেকে পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে যাচ্ছে—না শান্ত করতে যাচ্ছে তাঁকে? কে জানে?

চল চল, শুধু এখন বেরিয়ে পড় তাড়াতাড়ি।

ভয়ঙ্করী কালরাত্রি নামবার আগে, মৃত্যুদূতেরা তাদের কৃষ্ণপক্ষ বিস্তার করার আগে—পালাও, পালাও!

গত দু'রাত্রির বিভীষিকা যেন আর তাদের স্পর্শ করতে না পারে, ক্ষতি করতে না পারে!

চলে গেল সবাই।

সত্যিই চলে গেল।

সূর্যাস্তের শেষ আভাটুকু পাহাড়ের চূড়ো থেকে মুছে যাবার আগেই সকলে নিরাপদে গ্রাম-সীমানা ছাড়িয়ে চলে গেল নদী পার হয়ে।

সকলেরই চোখে জল, বুকে হাহাকার।

অনেক প্রিয়বস্তু, অনেক আশার সামগ্রী ফেলে রেখে যেতে হল, রেখে যেতে হ'ল প্রিয়তম সন্তানদের।

সামনে অজানা পথ, অনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ।

তবু যেন একটা আশ্বাসও কোথায় অনুভব করছে ওরা।

হয়ত আপাততঃ প্রচণ্ড সর্বনাশটাকে এড়াতে পারবে, রক্ষা পাবে নিশ্চিত ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে।

তারপর যদি ভগবান মুখ তুলে চান তো ফিরতেও পারবে আবার একদিন।...এই আশা নিয়েই তারা সেই অভিশপ্ত গ্রাম, তাদের বহু পুরুষের বাসভূমি পেছনে রেখে অজানা বিপদসংকুল ভয়বহুল পথে পা বাড়াল। পেরিয়ে গেল নদী, ছেড়ে চলে গেল অভ্যস্ত পথের সীমানা।

সবাই চলে গেল একে একে।

তারপর একসময় সেই অভিশপ্ত মৃত্যুপুরীতে নেমে এল রাত্রির অন্ধকার। নিশ্ছিদ্র সূচীভেদ্য অন্ধকার।

কারণ কোন বাড়িতে কোন ঘরে সেদিন আলো জ্বলল না—জ্বলল না কোন পাকশালার চুল্লি।

দেবতার মন্দিরও রইল সন্ধ্যারতিহীন, নিষ্প্রদীপ।

হাহা করতে লাগল ঘর-দোর?

তার কোণে কোণে শুধু বুঝি লুকিয়ে রইল ভয়ঙ্কর নাম-না-জানা কোন বিভীষিকা।

রইল এক অকথিত অভিশাপ, আর সেই অভিশাপের নিত্যসঙ্গী একদল

অশরীরী প্রেত।

নির্জন নিশীথ রাত্রি।

একটু পরেই হু-হু হাওয়া উঠল—হিমালয়ের বিশেষ নৈশ হাওয়াটি।

সে হাওয়াতে শুধু হাড়ের মধ্যে মধ্যে কাঁপনই জাগায় না, মনের মধ্যে একটা অকারণ অস্থিরতার সৃষ্টি করে।

আতঙ্কের স্পর্শ লাগা এক রকমের অস্বস্তি।

এই অন্ধকার জনহীন পুরীতে সে হাওয়া যেন একটা সকরুণ আর্তনাদ তুলে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

সে হাওয়া থেকে আত্মরক্ষা করার তাগিদ নেই কারুর ; কেউ জানলাগুলো টেনে বন্ধ ক'রে দিচ্ছে না ভাল ক'রে।

মধ্যে মধ্যে এক একটা দমকা বাতাসে মালিক-পরিত্যক্ত ঘরবাড়ির জানলা-দরজাগুলো শুধু আছড়ে পড়ছে।

আর শব্দ উঠছে, মধ্যে মধ্যে যখন ভয় পেয়ে গৃহহীন গাভী আর নিরাশ্রয় কুকুরগুলো কেঁদে কেঁদে উঠছে।

তাছাড়া চারিদিক এত নিস্তব্ধ যে, কান পেতে থাকলে মাঠে ইঁদুর-গুলোর ঝগড়া করার কিচমিচ শব্দও শোনা যায়।

কিন্তু শুনবে কে ? মানুষ আর কেউ নেই সে গ্রামে। শুধু—

হ্যাঁ—শুধু যদি থেকে থাকে তো বৃন্দাপ্রসাদ।

তার খবর কেউ রাখে না। হয়ত সে গ্রাম ছেড়েই চলে গেছে কোথাও—হয়তো আত্মহত্যাই করেছে, কিংবা এখানেই পড়ে আছে এখনও।

এই নির্জন নিস্তব্ধ মৃত্যুপুরীতে—হয়ত এখনও আপনমনেই ঘুরে বেড়াচ্ছে চীরগাছের জঙ্গলে আর মধ্যে মধ্যে হেসে উঠছে, তার সেই আনন্দহীন, তৃপ্তিহীন অট্টহাসি।

যদি থাকে তো সে-ই রইল এই জনহীন শূন্য গ্রামে—ঐ অভিশপ্ত অশরীরী আত্মাদের সঙ্গী হয়ে, একমাত্র শরীরী মানুষ।

॥ ১৯ ॥

কিন্তু না, তাও ঠিক নয়।

আরও একজন ছিল।

কেউ লক্ষ্য করে নি তাকে। খোঁজও করে নি কেউ অবশ্য।

লক্ষ্য করার মতো, খোঁজ করার মতো কারুর মনের অবস্থা ছিল না।

ঠিক কে গেল আর কে পড়ে রইল—কে কে মরেছে আর কে কে বেঁচে আছে এখনও—এ হিসেব রাখার মতো মানসিক স্থৈর্য নেই কারুর।

সব হিসেবই যেন গেছে গুলিয়ে। যেমন প্রলয় রাতে মানুষের সব কীর্তি—তার সব সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনা, তার ছোট-বড় সব ইতিহাস কোথায় মিলিয়ে যায়।

নিজেরই কে কোথায় রইল সে কথা কেউ জানে না।

হয়ত আছে, হয়ত নেই। হয়ত বেঁচেই নেই। কে জানে?

কে কে যেন ম'ল না? কারা কারা যেন? ক'জন ম'ল বল তো? আমার কেউ মরেছে কি? আমার কোন আপন-জন?

এমনি উদ্‌ভ্রান্ত অসংলগ্ন প্রশ্নও করেছে কেউ কেউ। যারা করছে না, তাদের মনের মধ্যেও হয়ত অনুচ্চারিত থাকছে এই প্রশ্ন।

জানি না, কিছু জানি না। কে আছে আর কে নেই।

বিরক্ত ক্লান্ত উত্তরও ধ্বনিত হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে। কিম্বা অমনি অনুচ্চারিত থাকছে।

থাকে তো আছেই। একদিন খুঁজে পাবোই।

এই 'মৃত্যু-তরঙ্গিনী-ধারা-মুখরিত ভাঙ্গনের ধারে' এই মহাশোকের প্রদোষ অন্ধকারে ক্ষুদ্র শোকের ক্ষুদ্র স্বার্থের হিসেব কে রাখে?

রাখা সম্ভব নয়।

শুধু চল এখন—পালাও। বাড়ি ঘর ছেড়ে বেরোও।

দ্রুত, দ্রুত—আরও দ্রুত।

বেরিয়ে পড়ো, বেরিয়ে পড়ো—এই যে ছিল তখনকার মূল কথা, প্রধান নির্দেশ।

অন্ধকার হবার আগে, সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার আগে এ অভিশপ্ত গ্রাম ছাড়তে হবে—এইটেই বড় কথা, আসল কথা।

লগুড়াহত গড্ডলিকার মতো বেরিয়ে পড়েছিল তারা—শোকাহত জড়বৎ শত শত প্রাণী। সে ভীড়ে সে তাড়াতাড়িতে কে কোথায় ছড়িয়ে পড়ল, কার সঙ্গে গেল কে—তা দেখা বা সকলের হিসেব রাখার কথা মনেও পড়ে নি কারুর।

আর দরকারই বা কি?

সকলেই সকলের পরিচিত।

বাইরের লোক কেউ আসে নি এ গ্রামে দীর্ঘকালের মধ্যে।

যে এসেছিল সে চলে গেছে। সম্ভবত প্রাণ হারিয়েছে এতদিনে।

বহুদিন ধরে—বহু-পুরুষ ধরে এক জায়গায় বাস করছে; অনেকেই অনেকের আত্মীয়।

যারা আত্মীয় নয়, এক বর্ণের লোক নয়—তারাও দীর্ঘ-পরিচিত, আত্মীয়বৎ।

কাজেই কোন শঙ্কা জাগে নি কারুর মনে। হিসেব রাখার কথা মনে হয় নি।

বাঁচাটাই তখন আসল কথা।

কোনমতে বেঁচে থাকা—টিঁকে থাকা।

তারপর থিতিয়ে বসার, যার যার আত্মীয় একত্রে মিলিত হওয়ার ঢের সময় পাওয়া যাবে।

ঢের সময় পাওয়া যাবে আখেরী হিসেব-নিকেশের।
তত্ক্ষণ চল, শুধু এগিয়ে চল।
এ গ্রামকে পিছনে ফেলে, মৃত্যুপুরী ত্যাগ ক'রে।
সময় নেই, সময় নেই যে একটুও।
সূর্য ঐ ওধারের দূর বশিষ্ঠ শৃঙ্গের আড়ালে ঢলে পড়বার আগেই নদী পার হ'তে হবে।
ওপারে আছে জীবন, আছে আশ্বাস।
আছে আবার পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ। নূতন জীবন-পত্তনের সম্ভাবনা।

মালতীও জানত সেকথা
এই মনস্তত্ত্ব সেও বুঝেছিল।
তারই সুযোগ নিয়েছিল সে।
কিছুই করে নি—লুকোবার জন্য, আত্মগোপন করার জন্য, তার কথাটা ভুলিয়ে দেবার জন্য বিশেষ কোন চেষ্টাই করতে হয় নি তাকে।
হ্যাঁ, একসঙ্গেই বেরোতে হয়েছিল, তা নইলে তখনই কথা উঠত; সতর্ক সজাগ হ'তেন বাবা-মা।
নিঃশব্দে সাগ্রহেই বেরিয়ে এসেছিল সে, তার নিজস্ব ছোট্ট পুঁটুলিটি নিয়ে।
বরাবরই চলেছিল বাবা-মা ভাই-বোন চাচা-চাচীর সঙ্গে সঙ্গে।
একেবারে গ্রামের প্রান্তে এসে—যেখানে সকলে মিলিত হয়ে নদী পার হওয়ার কথা—সেখানে পেঁাছে সকলের ব্যস্ততার সুযোগে ভীড়ে মিশে গিয়েছিল।
তারপর—তাড়াতাড়িতে চলবার সময় একটু পিছিয়ে পড়া, একটু পাশ-কাটানো—আর তারই মধ্যে একসময় সেব্ গাছের বাগিচার ছায়াঘন পত্র-পল্লবের আড়ালে লুকিয়ে পড়া—এ আর এমন কঠিন কি?
নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেছিল সে, যতক্ষণ না শেষ গ্রামবাসীটি নদী পেরিয়ে ওপারের চেনার আর চীর গাছের জঙ্গলের আড়ালে মিলিয়ে যায়।
তার শেষ পরিচিত, আত্মীয়, বন্ধুজন।
এক সময় চলে গেল সকলেই। তার বাবা-মা ভাই-বোন, মামা-মামী। সকলেই তারা এ গাঁয়ের। চিরদিনের আপন। চোখ মেলে পর্যন্ত তাদের দেখছে। আপন বলে জেনেছে।
তারা কেউ আর রইল না এপারে পড়ে।
ওর খবর নিতে, ওকে বিপদ থেকে রক্ষা করতে—ভয়ের দিনে আশ্বাস দিতে কেউ অবশিষ্ট থাকল না।
কিন্তু তবু মালতী চলে যেতে পারল না।
পারল না ওদের সঙ্গে দল বেঁধে জীবনের দিকে, নির্ভয়ের দিকে,

নিরাপত্তার দিকে এগিয়ে যেতে।

মরণের ভয়ও পারল না তাকে ওদের সঙ্গে বেঁধে দিতে।

পারল না এ গ্রাম ছেড়ে যেতে বাধ্য করাতে।

তার কারণ ওর কিশোরী মন যাকে সব চেয়ে আপন বলে মনে করতে শিখেছিল, যাকে ভেবেছিল জীবনের সাথী, কখন মনে মনে কল্পনায় সমস্ত সুখ দুঃখ জীবন মরণ ইহকাল পরকাল জড়িয়ে দিয়েছিল তার সঙ্গে—সে-ই যে রইল এই গ্রামে পড়ে।

ঐ নদীতীরের শ্মশানঘাটে তার ভস্মমাত্র অবশেষ বাতাসে উড়ছে।

শেষ হয়ে গেছে তার সব।

তার সেই কিশোর কন্দর্পের মত রূপের, প্রথম-যৌবন-বিকশিত তরুণ শিবের মত দেবদুর্লভ তনুর আর কোন চিহ্নও নেই কোথাও।

তাকে ছেড়ে যাবে কেমন ক'রে?

ঐ মুষ্টিমেয় ভস্ম যে আজও এখানে আছে। ঐ তো তার শেষ অবলম্বন।

ওরই বা আর কী রইল ইহজীবনে? কিসের লোভে, কোন্ সুখের আশায় বাঁচবে সে?

হ্যাঁ, আনুষ্ঠানিক বিয়ে হয় নি বটে। শাস্ত্রমতে কোন আচার-অনুঠানের বন্ধনে বাঁধা পড়ে নি ওরা, সুতরাং সে রকম আর একটা বিবাহ এখন ওর আটকায় না। স্বচ্ছন্দেই হ'তে পারে—তবু ওর মন কি পারবে বধূবেশে গিয়ে অপর কোন তরুণের হাতে হাত দিতে?

না, না—সে সম্ভব নয়। কিছুতে সম্ভব নয়।

ভাবতেও যেন শিউরে ওঠে শরীর মন।

তাহ'লে নিজেকে দ্বিচারিণী মনে হবে। মনে হবে নিজেকে অসতী।

সতী মায়ের মেয়ে সে, সতীর পৌত্রী। সতীর দৌহিত্রী।

তার বংশে আজ পর্যন্ত এমন কোন কলঙ্ক, কোন পাপ স্পর্শ করে নি।

তার দ্বারাও করবে না। কোন দুর্নাম লাগতে দেবে না সে বংশের নামে।

সে মৃত্যুকেই বরণ ক'রে নিত এতদিন, চিরকালের মতো এই অদ্ভুত বিবাহহীন বৈধব্য বরণ করার চেয়ে মৃত্যু বরণ করা ঢের ঢের বেশী সহজ এবং কাম্য—শুধু পারে নি একটা কারণে।

এখনও একটি কর্তব্য বাকী আছে তার।

একটি মহান দায়িত্ব।

বেচারী সূর্যপ্রসাদের অকালমৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়া হয় নি এখনও।

সূর্যপ্রসাদের হত্যাকারী যে এখনও জীবিত।

পরোপকার করতে যাওয়ার, অপরের জীবন রক্ষা করতে যাওয়ার এমন পুরস্কার আর কেউ কখনও পায় নি—যেমন সূর্যপ্রসাদ পেয়েছে।

একটা মহান উদ্দেশ্য, সাধু প্রচেষ্টার পরিবর্তে পেয়েছে ঘৃণিত মৃত্যু; আততায়ীর হাতে ঘাতকের হাতে প্রাণ গিয়েছে তার।

তার সেই কোমল কিশোর প্রাণ বুঝি করুণ ব্যথিত নেত্রে তাকিয়ে আছে

মালতীরই দিকে। এই হত্যার, এই অন্যায়ের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য।

যদি কেউ না করে, যদি সারা গ্রামের লোকই ভুলে যায় তাদের অবশ্য কর্তব্য, ভুলে যায় যদি সেই নিষ্করুণ ইতিহাস—তবে মালতীকেই আসতে হবে এগিয়ে।

সে নারী, সে বালিকা—তার সাধ্য তার শক্তি একান্তভাবে সীমিত।

আর সেকথা তার চেয়ে বেশী কে জানে?

তবু প্রাণপণ চেষ্টা করবে সে। চেষ্টা করতে তো দোষ নেই।

না হয় সে চেষ্টায় সে প্রাণই দেবে।

তবু তো সূর্যপ্রসাদের আত্মা তৃপ্ত হবে, শান্ত হবে তার ক্ষোভ।

বুঝবে যে অন্তত একটি প্রাণ, একটি মানুষ জীবনমরণে তার প্রতি বিশ্বস্ত ছিল, তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে নি, ভুলে যায় নি তাকে।

বৃন্দাপ্রসাদকে বধ করা?—সে তো যখন-তখনই করতে পারত সে; এ কদিনে বহু সুযোগ পেয়েছে, পেয়েছে অনেকবার অনেক অবসর।

কিন্তু উন্মাদকে হত্যা ক'রে কি হবে? সে তো বুঝতেও পারবে না—কেন, কিসের জন্য নিহত হ'ল সে?

আর তাতে উপযুক্ত শোধ নেওয়াও হবে না—তার বন্ধু, তার স্বামী, তার দয়িতের অকাল-মৃত্যুর।

যে কাজে প্রাণ দিল সে, যে উদ্দেশ্যে সে মৃত্যুবরণ করল—সেই কাজকে সফল করতে হবে সকলের আগে।

সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে হবে।

শুধু সূর্যপ্রসাদ নয়—বিশাখাও তৃপ্ত হবে। কৃতজ্ঞ হবে তার প্রতি।

আর সেই একই কাজের দ্বারা বৃন্দাপ্রসাদের এতবড় ঘৃণিত আচরণ—এতবড় পাপও নিষ্ফল হয়ে যাবে।

সেইটে তাকে দেখিয়ে দিতে হবে, বুঝিয়ে দিতে হবে—পাগলকে আরও পাগল ক'রে দিতে হবে—অসহায় ব্যর্থ রোষে, প্রতিকারহীন চিত্তক্ষোভে; তারপর উঠবে তার প্রাণবধের প্রশ্ন।

আসবে তার প্রাণ-হননের কাল।

অর্থাৎ সর্বাগ্রে চেষ্টা করতে হবে—বাহ্‌রামকে বাঁচাবার। তাকে মুক্ত করবার।

যদি সম্ভব হয় অবশ্য!

কিন্তু সে কী এতদিন বৃথাই গুরুজীর কাছে শুনেছে যে, কোন কাজ যত্ন ক'রে সম্পাদন করার পরও যদি নিষ্ফল হয়—তবে তাতে কারুর কোন অক্ষমতা বা অপরাধ প্রকাশ পায় না!

॥ ২০ ॥

তখনও ওর সেই সব স্বজনদের, ওর গ্রামবাসীদের শেষ পদশব্দ দূরে বনান্তরালের স্তব্ধতায় একেবারে বিলীন হয়ে যায় নি, তখনও বোধহয় তাদের

শোকাহত কণ্ঠের অস্ফুট গুঞ্জন পর্বতের কন্দরে কন্দরে প্রতিধ্বনি তুলে মাথা কুটে মরছে—মালতী ঈষৎ অসহিষ্ণু ভাবেই সেবু বাগিচার ছায়ার আশ্রয় ছেড়ে বেরিয়ে এল।

এবার সে স্বাধীন, এবার সে মুক্ত।

আর কারুর কৌতূহলী সপ্রশ্ন দৃষ্টি থেকে নিজেকে আড়াল করতে হবে না। অপেক্ষা করতে হবে না কারুর অন্যমনস্ক হবার।

সে এবার নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে চলল তাদের পাড়ার দিকে—নিজেদের বাড়ির দিকে।

না, বিষ্ণুপ্রসাদের বাড়ির দিকেই।

দ্রুত নেমে আসছে অন্ধকার; এসব পাহাড়ে-জায়গায় সূর্য অস্ত যাওয়ার মাত্র অপেক্ষা, তারপরই যেন কোথা থেকে হুড়মুড়িয়ে নেমে আসে রাত্রি—রাজ্যের যত অন্ধকার সঙ্গী-সঙ্গিনীদের নিয়ে।

কিন্তু মালতীর মনে কোন ভয় নেই।

ভয় সে বহুদিনই ভুলে গেছে।

এক চিন্তায় নিজের সব সুখদুঃখ ভালমন্দর চিন্তা ডুবে গেছে।

কিছুরই পরোয়া করে না সে। নিজের প্রাণেরও না।

আর যার নিজের প্রাণের চিন্তা নেই, ভবিষ্যতের চিন্তা নেই,—ইহলোকের কোন বিপদ, কোন আশঙ্কাই তাকে ভয় দেখাতে পারে না।

মালতী সেদিক দিয়ে নিশ্চিন্ত।

তার নিজের বাঁচবার কোন ইচ্ছা নেই, জীবন সম্বন্ধে কোন আশা নেই, সুতরাং তার কোন ভবিষ্যৎও নেই।

আছে শুধু একটি কর্তব্য।

আর সেইটে সারতেই যাচ্ছে সে। তবে আর তার ভয় কিসের?

তাছাড়া এ পথ তার বিশেষ পরিচিত।

আবাল্য—আজন্মই পরিচিত এ গ্রামের সব পথঘাট।

অন্ধকারে অসুবিধা হয় না কিছু। পথ চিনতে ভুল হয় না।

এমন কি হোঁচট খাবারও প্রশ্ন ওঠে না।

সে খুবই দ্রুত চলতে লাগল। প্রায় ছুটে চলল সে।

ওর লঘু কোমল অনাবৃত পায়ের অতি মৃদু শব্দ—তবু সেই জনহীন নিঃশব্দ অন্ধকারে প্রতিধ্বনি জাগাবার পক্ষে তাই যথেষ্ট।

সেই প্রতিধ্বনিতেই ভয় পাবার কথা। আগের দিন হ'লে গায়ে কাঁটা দিত তার।

মনে হ'ত সদ্য অপহৃত প্রেতাত্মারা তার চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কিন্তু আজ গ্রাহ্যও করল না সে।

এমন কি বিষ্ণুপ্রসাদের ত্রিধাবিভক্ত বিরাট শূন্য বাড়িটাও কোন আতঙ্ক সৃষ্টি করতে পারল না তার মনে।

একাই বাইরের মহল, অন্দরমহল পেরিয়ে পিছনের আস্তাবলে চলে গেল।

সেই অন্ধকারেই বার ক'রে নিয়ে এল সূর্যপ্রসাদের নিজস্ব ছোট্ট ঘোড়াটাকে।

বৃন্দাপ্রসাদ পুত্রকন্যাকে হত্যা ক'রে বাহুরামকে সঁপে দিয়েছিল রাজা বিজয়দেবের সৈন্যদের হাতে—ওদের বাহন সে ঘোড়াটার কথা তার মনে পড়ে নি।

প্রয়োজনে লাগে নি বিজয়দেবের রক্ষী সৈন্যদেরও।

তার কথা কারুরই মনে পড়ে নি।

সে বেচারা একাই ঘুরে বেড়িয়েছে বনে বনে, পথে পথে।

তারপর—কদিন পরে নিজেই ঘুরে এসেছে তার পরিচিত প্রিয় আস্তাবলটিতে।

বোধ হয় ভেবেছে তার ক্ষুদে মনিবটি তাকে ভুলে গেলেও বাড়িতে ফিরেছে নিশ্চয়ই, এখানে এলেই সে এসে কাছে দাঁড়াবে। গায়ে হাত রাখবে, অত্যন্ত পরিচিত নামে ডাকবে।

কেউই তাকে লক্ষ্য করে নি, করেছিল শুধু মালতী।

সে জানে এই ভৈরোদাস কত প্রিয় ছিল সূর্যপ্রসাদের। কতদিন সকলের আড়ালে নির্জন প্রান্তরে নিয়ে গিয়ে মালতীকে ঘোড়ায় চড়া শিখিয়েছে সে। ঐ ভৈরোদাসের পিঠেই চড়িয়েছে তাকে।

'খবরদার ভৈরোদাস, মালতীকে ফেলে দিস নি যেন! তাহ'লে আর তোর মুখ দেখব না কোন দিন!'

কানে কানে চুপি চুপি বলে দিত সূর্যপ্রসাদ। আর সঙ্গে সঙ্গে সে ভেড়ার মতো নিরীহ, ভেড়ার মতোই শান্ত হয়ে যেত। নিশ্চিন্তে তার পিঠে সওয়ার হ'ত মালতী।

ভৈরোদাসের দুর্গতি দেখে মালতী সেদিন চোখে জল রাখতে পারে নি।

ওর নিজের ভালবাসা দিয়ে বুঝেছিল এই নির্বাক প্রাণীটির ভালবাসার গভীরতা।

কী কৃশই হয়ে গিয়েছিল ভৈরোদাস!

সম্ভবত এ কদিন কিছুই খায় নি সে। শুধুই মনিবকে খুঁজে বেড়িয়েছে। বনের ঘাস গাছের পাতাও রোচে নি তার মুখে।

দুই চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে গড়িয়ে চোখের কোণে গভীর কালো দাগ হয়ে গেছে।

সবার অলক্ষ্যে মালতীই গিয়ে তার পিঠে হাত দিয়েছে। মুখের লাগাম পিঠের জীন খুলে দিয়ে খেতে দিয়েছে তাকে। তখনও তার চার পায়ের খুরে কাপড় জড়ানো, নিজে হাতে খুলে দিয়েছে সে ন্যাকড়াগুলো।

তবু তখনও ভৈরোদাস তার ঘাস-দানায় মুখ দিতে চায় নি, মালতীই কানে কানে বলেছে, 'খেয়ে নে, খেয়ে নে ভৈরোদাস। তোর—আমাদের যে এখনও অনেক কাজ বাকী। সূর্যপ্রসাদের মৃত্যুর শোধ নিতে হবে যে বেটা!'

কী বুঝেছে কে জানে ভৈরোদাস, অথবা মালতীর পরিচিত কণ্ঠে ও স্পর্শে বুঝি সেই মনিবেরই স্পর্শ বোধ করেছে সে, অথবা পেয়েছে তার আগমনের আভাস—ডাবায় মুখ নামিয়ে খেয়েছে সে দানা-পানি-ঘাস।

তারপর থেকে কদিন এই আস্তাবলেই আছে সে।

কোনদিন খেতে পেয়েছে, কোনদিন পায় নি।

কিন্তু তবু কোনখানে নড়ে নি সে। শান্তভাবে অপেক্ষা করেছে সেই প্রিয় পরিচিত কণ্ঠটির, অভ্যস্ত পদশব্দের।

মধ্যে মধ্যে মালতীই এসে তদারক ক'রে গেছে, কানে কানে বলে গেছে, 'আর এই দুটো দিন বেটা, দুটো দিন চুপ ক'রে থাক। তারপর রইলুম তুই আর আমি। আর রইল আমাদের সঙ্গে তোর—তোর সূর্যপ্রসাদ, আর আমারও।'

একটু হেসেছে সে, শেষের কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে। কান্নার মতোই করুণ সে হাসি। প্রভাতের মলিন মালতীর দলে সঞ্চিত পূর্বরাত্রির বৃষ্টি-বিন্দুর মতো।

আজ যাত্রার আগে গোশালা থেকে গরু এবং আস্তাবল থেকে ঘোড়া খুলে দিয়ে গেছে সবাই। ভৈরোদাসেরও গলার বাঁধন খুলে বাইরে আনা হয়েছিল, কিন্তু বাড়ির লোকরা চলে যেতে আবারও সে আস্তাবলেই গিয়ে ঢুকেছে।

অপেক্ষা করছে নিজের জায়গাটিতেই।

সে বুঝি বুঝতে পেরেছে কেমন ক'রে যে, তার ডাক আসবে এইবার, প্রয়োজন হবে তাকে।

তাই মালতী গিয়ে 'ভৈরোদাস' বলে ডাকতেই এগিয়ে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। গলা বাড়িয়ে দিয়েছে মালতীর হাতের লাগামের দিকে।

লাগাম এঁটে জিন কষে পিঠে সওয়ার হয়ে উঠে বসে শুধু বলেছে মালতী, 'চল বেটা ভৈরোদাস, এবার আমাদের খেল শুরু করি আমরা'—সঙ্গে সঙ্গে যেন সব কথা বুঝেই চলতে শুরু করেছে ভৈরোদাস।

বাড়ির বাইরে এসে, খোলা পথে পড়ে সে চলা দৌড়ে পরিণত হয়েছে। নক্ষত্রবেগে ছুটেছে সে মালতীকে পিঠে নিয়ে।

ভীত অনভ্যস্ত মালতী দুহাতে তার গলা জড়িয়ে পিঠে শুয়ে পড়েছে—কিন্তু থামতে বলে নি একবারও।

বরং বহবা দিয়েছে, 'ঠিক আছে বেটা বাহাদুর! ঠিক আছে!'

মৃত্যুর ভয় আর নেই মালতীর, যা কিছু ভয় এখন ওর জীবনকেই।

ঠিক কোথায় যেতে হবে তা মালতীর জানা ছিল না।

কতদূর তা তো নয়ই।

যে পথে গেছে ওরা মালিক বাহ্রামকে নিয়ে, সে সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট ধারণা মাত্র ছিল।

রাজধানীর পথ যেটা—জম্মুতে যাবার সোজা রাস্তা—সেই পথেই গিয়েছে নিশ্চয়।

হয় রাজা বিজয়দেবের কাছে নিয়ে যাবে—নয়তো আরও দূরে, বিতস্তার তীরে যেখানে বিজয়ী ঘুরীর সৈন্যরা এখনও তাঁবু ফেলে আছে—সোজা সেইখানেই। কিন্তু সে পথ একই। অন্তত মালতী যা শুনেছে।

খানিকটা পর্যন্ত একই রাস্তা গিয়েছে—বেশ কদিনের রাস্তা—তারপর দুটো পথ দুদিকে ভাগ হয়ে গিয়েছে।

কোনদিক ওরা ধরবে অথবা বলা উচিত ধরেছে—সেটা সেখানে—সেই দুই রাস্তার মোড় পর্যন্ত না গেলে জানা যাবে না।

কিন্তু যতদূর মনে হয় বিজয়দেব একবার স্বচক্ষে না দেখে, আসামী সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় না হয়ে কখনও পাঠাবেন না তাঁর নূতন বন্ধু ঘুরের মুহম্মদ-বিন-সামকে এই শ্রেষ্ঠ উপহারটি।

সুতরাং ঐ দিকেই যেতে হবে।

এ পথটা ঠিক জানা না থাকলেও দিকটা ঠিক আছে। মোটামুটি জানা আছে কোনদিকে যেতে হবে। পাহাড়ে এত অগণন পথ নেই যে বড় রকমের কোন ভুল হবে।

সেদিক দিয়ে মালতী নিশ্চিন্ত আছে।

আর ভৈরোদাস তো চলেছে ঐ পথেই।

দেখা যাক না—কোথায় নিয়ে যায়।

কে জানে, হয়ত ভাগ্যই পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে!

॥ ২১ ॥

নক্ষত্রের আলো নক্ষত্রের আলোই। ঘোড়ার পক্ষে তাতে পথ দেখে চলা মুস্কিল, সুতরাং গ্রাম-সীমামা—এমন কি তার বাইরেও অভ্যস্ত পরিচিত পথ যতটা ঘোরা অভ্যাস আছে তার, ততটা পর্যন্ত বেশ চলল—তার পরই একটা বড় হোঁচট খেয়ে পড়ল সে।

আহত হ'ল একটু মালতীও।

কিন্তু চিন্তা ওর নিজের জন্য তত নয়—যতটা ভৈরোদাসের জন্য।

ভৈরোদাস যদি বড় রকমের চোট্ খায় তো ওর যে কাজই বন্ধ হয়ে যাবে—কোনদিনই তো সে ধরতে পারবে না বাহ্‌রামদের।

তারা যাচ্ছে ঘোড়ায় চেপে—তাদের কেমন ক'রে ধরবে ও পায়ে হেঁটে?

তারা যতই আস্তে যাক, যতই বিশ্রাম ক'রে ক'রে যাক্—পায়ে হেঁটে সে কোনদিনই তাদের কাছে পৌঁছতে পারবে না।

ব্যর্থ হবে তার এত আয়োজন—এত তোড়জোড়।

সে তাড়াতাড়ি উঠে অন্ধকারেই যতটা সম্ভব পরীক্ষা করল ভৈরোদাসকে।

না, আঘাত খুব বেশী নয়। অচল ক'রে দেবার মতো তো নয়ই।

তবু আর এগোনো ঠিক হবে না। এত দুঃসাহস ভাল নয়।

একবার অল্পে অব্যাহতি পেয়েছে—বার বার হয়ত না-ও পেতে পারে। হয়ত এটাই ঈশ্বরের হুঁশিয়ারী। ওর ঠাকুর্দা বলতেন, কোন বড় বিপদের আগে একটা ছোট বিপদ দিয়ে হুঁশিয়ার ক'রে দেন ভগবান। যে তাতে সতর্ক হয় সে বেঁচে যায়—যে অন্ধ কিংবা বোকা, সে আবারও ভুল করে আর মরে।

সামান্য অসতর্কতার জন্য অসামান্য বিপদ ডেকে আনা মূর্খতা ছাড়া আর কিছু নয়। কয়েক দণ্ডের জন্য অসহিষ্ণু হয়ে কাজ পণ্ড করে অর্বাচীনে।

সে ভৈরোদাসকে ধরে নিয়ে গিয়ে একটা চীরগাছের নিচু ডালে বেঁধে দিল।

তারপর ঝোলাতে হাত ঢুকিয়ে বার করল চকমকি পাথর আর সোলা। শুকনো পাতা-লতা জড়ো ক'রে আগুন জ্বালল তাতে।

দেখতে দেখতে সে আগুন বেশ জমকে উঠল। তাতে শুধু তাপই নয়, আলোও হ'ল খানিকটা।

সেই আলোতে খুঁজে খুঁজে কুড়িয়ে নিয়ে এল আরও কিছু শুক্‌নো পাতা, কতকগুলি শুক্‌নো ডালপালা।

পাতার আগুন দপ ক'রে জ্বলে ওঠে—আবার দপ ক'রেই নিভে যায় ; কতকটা ব্রাহ্মণের রাগের মতো—রহস্য করে বলতেন মালতীর নানী। তাকে জীইয়ে রাখতে গেলে চাই মোটা গাছের ডাল, মজবুত কাঠ কিছু। নানী বলতেন, গুঁড়ির আগুন হ'ল মেয়েছেলের রিষের আগুন, সহজে নেভে না।

ভৈরোদাসের এসব ভাল লাগছিল না।

এই অকারণ বিলম্ব তার পছন্দ নয়।

সে বার-কতক অসহিষ্ণু হ্রেষাতে জানাল প্রতিবাদ. অস্থির পদক্ষেপে জানাল চাঞ্চল্য।

সে যেতে চায়—এগিয়ে যেতে চায়।

সে বুঝি বুঝেছে এই প্রতিশোধের ব্যাপারটা। তাই তার এত অধীরতা।

মালতী উঠে এসে ওর গলা জড়িয়ে ধরল, কানের কাছে মুখ এনে বলল, 'বুঝি রে ভৈরো, বুঝি তোর মনের ভাব। কিন্তু উপায় কি বল্‌, এই পাহাড়ে পথে যদি আবার তুই পড়িস কোথাও—কী কাণ্ডটা হবে বল দিকি ? সব কাজই কি পণ্ড হবে না ? তার চেয়ে—এতদিনই যখন গেল আর দুটো দিন একটু ধৈর্য ধরে থাক। মনে রাখিস যে-কোন কাজেই সিদ্ধি পেতে হ'লে চাই ধৈর্য। যে কাজে যেতে তোর এত আগ্রহ—সেই কাজের জন্যেই তোকে যে সুস্থ থাকতে হবে বেটা। যাক্‌ না কেটে এই তিন পহর রাত—তারপর দেখব কাল সকালে কত ছুটতে পারিস !'

কী বোঝে ভৈরোদাস কে জানে, সে আশ্চর্য রকম শান্ত হয়ে যায়।

মালতী তার কানে কানে কথা বললেই বুঝি কেমন ক'রে পায় তার মনিবের একটা স্পর্শ—শান্ত হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে।

মালতী এবার ভৈরোদাসকে কিছু খেতে দিল।

ওর খাবার সে কিছু সঙ্গেই এনেছিল।

পথে আসতে আসতে ঝরনা থেকে জল খেয়ে নিয়েছে—জল আর লাগবে না। কিছু দানা দিলেই হবে।

ওকে খাইয়ে সে নিজেও কিছু খাবার বার ক'রে খেলো।

প্রাণধারণের মতো সামান্য কিছু।

বেঁচে যে থাকতেই হবে। নিষ্ফল হৃদয়াবেগে যারা শুধু কাঁদে আর মরে, যারা ভাগ্যের হাতে অসহায় ক্রীড়নক মাত্র—তাদের ওপর মালতীর বড় ঘৃণা।

আরব্ধ কাজ শেষ করার জন্য তাকে যা কিছু করতে হয় তা সে করবে। সেই জন্যই বাঁচা প্রয়োজন, তাই সে বাঁচবে।

তারপর—মরতে কেমন ক'রে হয় তাও সে জানে।

মরেই দেখিয়ে দেবে তা।

আহার শেষ ক'রে আগুনে আরও কিছু কাঠ ঠেলে দিল, তারপর আগুনের পাশে একটা বড় গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসল সে।

এমনি ভাবে বসে-বসেই প্রতীক্ষা করবে সেই অরুণোদয়ের—যুগ-যুগান্তর ধরে সকল দুঃখনিশার শেষে যে আশ্চর্য জ্যোতির্ময় অভ্যুদয় হয়—সকল প্রতীক্ষাকে সার্থক ক'রে।

এখন তাকে ঘিরে রইল এক অন্ধ তামসী নিশি, নিবিড় নিরন্ধ্র অন্ধকার আর এই নীরব বনস্থলী।

কিন্তু সত্যই কি নীরব এই অরণ্যানী?

কান পেতেও শুনতে হয় না—আপনিই কানে এসে প্রবেশ করে ক্রূর ক্রুদ্ধ অরণ্যের বিদ্বেষ-ভীষণ কণ্ঠস্বর—কত কী জানা-অজানা বন্যজন্তুর ডাক। শের আর ভালুর আওয়াজ সে চেনে, তার জন্য চিন্তাও নেই খুব। সন্ধ্যের পর থেকে অসংখ্যবারই তো শুনল সে আওয়াজ। সে জানে, বহুলোকের মুখেই শুনেছে যে শের ভালু আগুনকে ভয় করে—আগুনের ধারে-কাছেও ঘেঁষে না।

সেই জন্যই আগুন জেলেছে সে। আর প্রাণপণে জ্বালিয়েও রাখছে সে আগুন।

যাতে ঐ বহ্নিশিখা তার প্রজ্বলন্ত দীপ্তি দিয়ে তার চারপাশে নিরাপত্তার গণ্ডী রচনা করতে পারে।

মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখা জীবনের গণ্ডী।

যাতে ঐ হিংস্র শ্বাপদদের লোভ-নিষ্ঠুর নখদন্ত না ওদের কাছে পোঁছতে পারে—ওর আর ভৈরোদাসের।

কিন্তু শুধু শের বা ভালুই তো নয়—আরও তো অনেক আছে। আরও কত অজানা জীবের ডাকই তো সে শুনতে পাচ্ছে।

ভয়ঙ্কর সে সব শব্দ।

হয়ত অজানা বলেই এত ভয়ঙ্কর লাগছে, বুকের মধ্যে এমন হিম হয়ে যাচ্ছে বার বার।

কে জানে তারা কী জাতের জানোয়ার—আগুনের শাসন তারা মানবে

কিনা, ভয় পাবে কিনা পাবকের ভ্রূকুটিতে।

ভয় যতই হোক, চুপ ক'রে বসেই রইল সে স্থির হয়ে—ধ্যানমগ্না তপস্বিনীর মতো।

সে জানত সব রাত্রিই প্রভাত হয়—এ রাত্রিও হবে।

যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা হয়, যদি কেশবজী মনে করেন যে তার এ যাত্রার কোন সার্থকতা নেই, তাহ'লে তিনিই শেষ ক'রে দেবেন এ যাত্রা—এ চেষ্টা।

সংস্কার প্রবল—তাই বুকের মধ্যে গুরগুর করে—হিম শৈত্য নামে সমস্ত মনোবল আচ্ছন্ন ক'রে—কিন্তু তাকে আবার জয় করে সে।

স্থির হয়ে অপেক্ষা করে রাত্রি-অবসানের।

আর একসময় তা হয়ও।

সমস্ত অজানা বিপদ অশরীরী ছায়ার মতো মিলিয়ে যায় অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে। মাথার ওপরে দূর তুষার-শৃঙ্গে লাগে উষার লজ্জা-রক্তিমা, পথের রেখা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে ওঠে চোখের সামনে।

আঃ কী শান্তি! একেই বুঝি নবজীবন বলে!

সে উঠে চারিদিকে তাকাল।

কাছেই একটা ছোট্ট ঝরনা। পাহাড়ের গায়ে একটা সামান্য ফাটল থেকে ঝিরঝির ক'রে জল পড়ছে।

শীতল স্বচ্ছ জল, পুরাণবর্ণিত ভোগবতীর ধারার মতো স্নিগ্ধ ও সুপেয়।

মুখ হাত ধুয়ে আকণ্ঠ পান ক'রে নিল সে সেই জল।

গতরাত্রির ভয়ার্ত জাগরণ আর কোন চিহ্ন রেখে যায় নি—এই আবক্ষ পিপাসা ছাড়া।

নিজের জলপান শেষ হ'লে ভৈরোদাসকেও খানিকটা জল খাইয়ে নিল সে। অনভ্যস্ত অপটু হাতে কিছুটা দলাই-মলাইয়েরও চেষ্টা করল—তার পর কেশবজীকে স্মরণ ক'রে আবার সওয়ার হ'ল।

ইঙ্গিতমাত্রে ভৈরোদাস ছুটল তীব্রবেগে।

কালকের মতোই ভয়ে গলা জড়িয়ে শুয়ে পড়ল মালতী ওর পিঠের ওপর—কিন্তু গতি মন্থর করবার কোন চেষ্টা করল না।

ভৈরোদাসও এই অদ্ভুত সওয়ারীতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। সে ছুটেই চলল, ঐভাবে জড়িয়ে ধরা সত্ত্বেও।

পথ একটিই মাত্র—সামনে প্রসারিত।

সংকীর্ণ পাহাড়ী-পথ; উচ্চাবচ, উপলাকীর্ণ, বন্ধুর। প্রতি মুহূর্তেই পদস্খলনের সম্ভাবনা। কোথাও কোথাও পাশেই অতলস্পর্শী খদ—একবার এক লহমার অন্যমনস্কতা, সামান্যতম ভুল পদক্ষেপ নিশ্চিত মৃত্যুর মধ্যে টেনে নিয়ে যাবে।

কিন্তু তবুও ওরা কোন রকম সাবধান সতর্ক হবার চেষ্টা করল না—

এই মানব ও মানবেতর প্রাণীর অদ্ভুত জুটি।

ছুটেই চলল। তেমনি নক্ষত্রবেগে।

সময় নেই ওদের মোটে। বেশ কয়েকদিনের পথ এখনও অতিক্রম করতে হবে—এই দু'তিন দিনের মধ্যে।

থামলে চলবে না। আরাম করার অবসর নেই।

॥ ২২ ॥

দ্বিপ্রহরের দিকে একবার থামতে হয়েছিল অবশ্য। নিজের জন্য যত না হোক, ভৈরোদাসের জন্যই আরও বেশী।

ওকে একটু অন্তত নিঃশ্বাস নিতে দেওয়া দরকার। দরকার ওকে কিছু খাইয়ে নেওয়ার।

একটা ঝরনার ধারে অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত স্থান দেখে সে নেমেছিল।

ভৈরোদাসকে একটু বিশ্রাম নিতে দিয়ে সে নিজে স্নান সেরে নিয়েছিল। তারপর ভৈরোদাসকে দানা দিয়ে, ঝরনার পাশ থেকে কচি ঘাস তুলে দিয়ে ভাল ক'রেই খাইয়ে নিয়েছিল। দিয়েছিল পেটভরে জল খেয়ে নিতে। তারপর নিজেও একখানা শুক্‌নো রুটি চিবিয়ে আঁজলাভরে জল খেয়ে নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল আবার।

মোট বোধহয় দু-দণ্ডের বেশী লাগে নি, তবু মালতীর মনে হ'ল বড় বেশী বাজে খরচ হয়ে গেল এই সময়টা।

সে ভৈরোদাসের পিঠে সওয়ার হয়ে আগের মতোই শুয়ে পড়ে কানে কানে বলে দিল, 'জোরে বেটা ভৈরোদাস—জোরে। এই সময়টা পুষিয়ে নেওয়া চাই কিন্তু।'

ভৈরোদাসকে অবশ্য তা বলার প্রয়োজন ছিল না।

সে কী বুঝেছে কে জানে, বরাবরই চলেছে সে নক্ষত্রবেগে। কোথাও এক মুহূর্তের জন্যও শিথিল করে নি গতি।

প্রথমটা মালতীর ভয় হয়েছিল ওর জন্যই।

এই প্রচণ্ড পরিশ্রম—এই বিরাম-বিশ্রামহীন গতি—এ কি বেশীক্ষণ পারবে সহ্য করতে ভৈরোদাস?

ভেঙ্গে পড়বে না তো শেষ পর্যন্ত?

হয়ত আর একটু বিশ্রাম করতে দেওয়া উচিত ছিল বেচারীকে।

হয়ত এতটা জুলুম করা ঠিক হচ্ছে না।

এ চিন্তাটা ছিল অপরাহ্লের পূর্ব পর্যন্ত।

তার পর যেমন একটু একটু ক'রে সূর্যদেব পশ্চিম দিগন্তের দিকে হেলতে শুরু করলেন, অল্প অল্প ক'রে রোদ উঠতে লাগল চারিদিকের শৈলসানু ত্যাগ ক'রে তার শিখরদেশে—ছায়া ঘনিয়ে আসতে লাগল চারিদিকের গাছ-পালায় পত্রপল্লবে—হাওয়া হয়ে উঠল শীতলতর—তেমনিই একটু একটু ক'রে ও অনুভব করতে লাগল যে চিন্তা ওর নিজের জন্যও বড় কম নেই।

সুধুমাত্র মনের জোরেই—প্রবল ইচ্ছাশক্তিতেই গত কদিন দাঁড়িয়ে আছে সে, বাইরে অনুচ্ছ্বসিত নির্বিকার ভাব বজায় রেখে। কাল যে সারারাতই অমন সোজা হয়ে ঠায় বসে কাটিয়ে দিল, সেও সম্ভব হয়েছে সেই মনের জোরেই—সেই একমুখী সাধনা ও কঠিন ইচ্ছাশক্তিই আজ তাকে এই একটানা এতটা পথ ঘোড়ার পিঠের ওপর এই একান্ত কষ্টদায়ক ভঙ্গিমাতে বসে ছুটিয়ে এনেছে—কিন্তু তবু ইচ্ছাশক্তির, মনের জোরের একটা সীমা আছে।

সেই সীমাটাই কখন লঙ্ঘন ক'রে ফেলেছে মালতী তা সে জানে না।

মন যত বড়ই হোক, প্রত্যেকের মন তার নিজস্ব, তার দেহের খাঁচায় আবদ্ধ।

অর্থাৎ মানুষের মন তার দেহের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত। দেহের ওপর অনেকটা নির্ভরশীল।

দেহ যখন সুস্থ থাকে তখন মন অনেক কায়দা দেখায়। দেহ ভেঙ্গে পড়লে সেও পঙ্গু হয়ে পড়ে।

মনের জোর কতকটা শিশুর স্পর্ধার মতো।

স্নেহশীল আত্মীয়রা যেমন খানিকটা পর্যন্ত তাদের অত্যাচার হাসিমুখে সহ্য করেন, অনেকসময় প্রসন্ন মনেই প্রশ্রয় দেন, তার পর একেবারে অসহ্য হয়ে উঠলে একসময় ধমক দিতে বাধ্য হন, অনেকসময় চড়চাপড়ও মেরে বসেন।

তেমনি দেহও মনের অত্যাচার কিছুক্ষণ সহ্য করে—কিছুদিনও হয়ত। তার পর এমন একসময় আসে যখন থাবড়া মেরে তার শক্তির সীমা সম্বন্ধে তাকে সচেতন করতে হয়। তাকে বুঝিয়ে দিতে হয় যে—কতটা পর্যন্ত বাড়াবাড়ি চলে আর কতটা চলে না।

মালতীর দেহও তাকে যেন প্রথমে ভ্রূকুটি, পরে ধমক, একসময় থাবড়া মেরে তার শক্তির সীমা সম্বন্ধে, নিজের সহনশীলতা সম্বন্ধে সচেতন ক'রে দিল।

পিঠে অসহ্য ব্যথা, শরীরের সমস্ত গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে অসহনীয় যন্ত্রণা।

আর সহ্য হয় না। দুই চোখে রাজ্যের তন্দ্রা—সারাদেহ-শিথিল-করা ক্লান্তি নেমে আসছে। এ যন্ত্রণাও আর কোনমতে সওয়া যাচ্ছে না।

কাল যদি রাতটা ঘুমিয়ে নিতে পারত, অমন ঠায় আড়ষ্ট হয়ে অজানা জন্তুর ভয়াবহ ধ্বনির দিকে কান পেতে বসে থাকতে না হ'ত—তাহ'লে আজ অমন ভেঙ্গে পড়ত না শরীর।

সারাদিন ঘোড়ায় চড়ে ছুটে যাওয়া—সে শুনেছে অনেক জোয়ান পুরুষও, অভ্যাস না থাকলে সহ্য করতে পারে না। একে সে মেয়েছেলে, তায় সোজা হয়ে বসে থাকতে পারছে না, অত্যন্ত অসুবিধাজনক ভাবে উপুড় হয়ে যেতে হচ্ছে—সেও তো এই যন্ত্রণার আর এক কারণ। মেরুদণ্ডে এই যে অসহ যন্ত্রণা—এর জন্য বোধহয় ঐ সওয়ার হবার ভঙ্গীটাই বেশী দায়ী।

কিন্তু কারণ যা-ই হোক, এখন বিশ্রাম একটু চাই-ই।

আজ রাত্রে অন্তত যদি কোথাও একটু ঠেস দিয়েও ঘুমিয়ে নিতে না

পারে তাহ'লে কাল আর চলা যাবে না।

কাল তাহলে মূল্যবান দিনের আলো নষ্ট ক'রে দিবাভাগেই কিছুটা ঘুমিয়ে নিতে হবে।

অথচ সেটা হবে কতকটা আত্মহত্যার মতোই আত্মনাশা দুর্বুদ্ধি।

অনেকদিনের পথ এগিয়ে আছে তারা। তাদের ধরতে হ'লে দিনগুলো আর একটুও নষ্ট করলে চলবে না, একান্ত অত্যাবশ্যক যেটুকু, ভৈরোদাসকে খেতে দেবার সময়টুকু ছাড়া।

এধারে পার্বত্য সন্ধ্যা হু-হু ক'রে এগিয়ে আসছে।

দেখতে দেখতে অন্ধকার হয়ে এল চারিদিক।

পথের রেখা দেখে চলা একেবারেই অসম্ভব হয়ে এল।

এখনই থামতে হবে কোথাও।

কিন্তু সে কোথায়? কোথায় থামবে এই নির্জন নিবিড় বন-পথে, অরণ্যের এই ভয়াল নিস্তব্ধতায়? কোথায় সে পাবে একটু বিশ্রাম করার মতো নিরাপদ আশ্রয়?

ব্যাকুল হয়ে চাইল মালতী চারিদিকে।

ভৈরোদাসকে থামাতে হয়েছে, এভাবে চলা আর সম্ভব নয়।

অন্ধকারে দৃষ্টি চলে না ঠিকই, কিন্তু কানে আসছে একটানা একটা ঝিরঝির শব্দ। বাতাসেও টের পাচ্ছে এক রকমের আর্দ্রতা। অর্থাৎ জল আছে কোথাও, সামান্য হ'লেও ঝরণা আছে ধারে-কাছে।

বিশ্রাম নেবার পক্ষে সেদিক দিয়ে এ-ই ঠিক জায়গা।

কিন্তু আবারও সেই কালকের মতো বসে কাটাতে হবে—ভয়ে ভয়ে—অজানা আতঙ্কে কণ্টকিত হয়ে?

আজও একটু ঘুমোতে পারবে না? অন্তত এক প্রহর সময়ও?

হঠাৎ যেন কান্না পেয়ে গেল মালতীর।

নিজেকে বড়ই অসহায় মনে হ'ল।

মনে হ'ল প্রতিকূল ভাগ্যের তুলনায় সে বড় দুর্বল, বড় অকিঞ্চিৎকর।

তার বুঝি উচিত হয় নি এতটা সাহস করা।

এ পুরুষের কাজ, মেয়েদের—বিশেষ ক'রে তার মতো কোন সঙ্গীহীন অভিভাবকহীন কমবয়সী মেয়ের পক্ষে—এ একেবারেই দুঃসাহস, বাতুলতা।

তার বুঝি মরাই উচিত ছিল।

পথের মধ্যেই বসে পড়ল মালতী, ভেঙে পড়ল বলতে গেলে।

ভৈরোদাসও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তার চেয়েও বুঝি চিন্তিত হয়ে উঠেছে সে মালতীর জন্যে।

সে দাঁড়িয়ে রইল পাশেই চুপ ক'রে। শুধু ঘন ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে লাগল। আর যে কিছুই করবার নেই তার, আর কোন সাধ্যই নেই। ঈশ্বর তাকে শুধু দিয়েছেন ছুটে চলার শক্তি আর মানুষের প্রতি ভালবাসা। আর কিছু করতে পারে না সে।

অপরিসীম দৈহিক শ্রান্তি, সীমাহীন মানসিক অবসাদ এবং সর্বোপরি অকারণ একটা আত্মধিক্কার কিছুকালের জন্য অনড় অচল ক'রে দিল মালতীকে। সে তেমনি পথের ধুলো-কাঁকরের ওপর এলিয়ে পড়ে রইল স্থির হয়ে—তারপর একসময় নিজেকে যেন চাবুক মেরে সচেতন ও সক্রিয় ক'রে তুলল।

না, তাকে উঠতেই হবে।

ভাগ্যের কাছে এমন ক'রে হার মানবে না সে কিছুতেই।

এতটা যখন এসেছে, তখন শেষ অবধি যাবেও সে। তাতে অদৃষ্টে যা ঘটবার না হয় ঘটবে তা।

সে আজ আগুন জেলে রেখে—নিজের ও ভৈরোদাসের চারিদিকে আগুন জেলে এই বনের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়বে। তারপরও যদি বাঘ-ভালুকে খায় তো উপায় কি!

এমনিও মরবে—না হয় ওদের হাতেই মারা পড়ল! প্রাণটা যাওয়ার চেয়ে বেশী ক্ষতি তো করতে পারবে না!

আর যদি দৈবাৎ বেঁচে যায় তো আবার দুটো দিন বিশ্রাম দা নিয়েও ছুটতে পারবে।

কিন্তু তার আগে এখনই একটু আগুন জ্বালা দরকার।

শুধু নিরাপত্তার জন্যই নয়, আলোর জন্যও।

ঝরনাটা কোনদিকে তাই যে ঠাওর পাচ্ছে না।

জল খেতে হবে, তার চেয়েও বড় কথা ভৈরোদাসকে খাওয়াতে হবে।

শিথিল অবশ দেহটাকে টেনে কুড়িয়ে নিয়ে উঠে বসল মালতী।

আর ঠিক সেই সময়ই নজরে পড়ল, ওরা যেখানে বসে রয়েছে তার থেকে সামান্য একটু দূরে একটি আলোর রেখা—অর্থাৎ জনবসতির চিহ্ন।

প্রথমে মনে হয়েছিল চোখের ভ্রম।

নিজের ইচ্ছাতুর দৃষ্টির রসিকতা ওর দুর্ভাগ্যের সঙ্গে।

তারপর ভাবল জোনাকি।

কিন্তু কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে বুঝল যে, ও দুটোর কোনটা নয়—আলোই।

চোখের ভুল হ'লে এতক্ষণ ধরে তা চোখের সামনে থাকত না।

জোনাকি হ'লে সরে সরে যেত অন্তত। তাছাড়া সে জ্বলে আর নেভে, এমন একই জায়গায় স্থির হ'য়ে জ্বলে না।

এ মানুষের হাতে জ্বালা আলো—প্রদীপের শিখা।

নিকটেই তাহ'লে নিশ্চয় কারও কুটির আছে।

সেখানে আছে জীবিত আর জাগ্রত কোন মানুষ।

আছে আশ্রয় আর আশ্বাস। আছে নবীন জীবনের মন্ত্র।

আশার মতো সঞ্জীবনী সুধা মানুষের বুঝি আর কিছুই নেই।

স্খলিত শিথিল দেহ মালতীর নিমেষে সক্রিয় হয়ে উঠল।

অধীর আগ্রহে উঠে দাঁড়াল সে।

তারপর সেই ঘন-হয়ে-আসা নিবিড় আঁধারে—সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গে লেগে থাকা শেষ দিবালোকটুকুর প্রতিফলিত আভাসমাত্রে পথ দেখে দেখে এগিয়ে চলল সে—গাছপালা লতাপাতা সরিয়ে সরিয়ে, ধ্রুবতারার মতো সেই কম্পমান দীপশিখাটি লক্ষ্য ক'রে।

কোথাও কোথাও বন দুর্ভেদ্য, কোনও কোনও লতা দারুণ কঠিন—সরানো বা ছেঁড়া যায় না। কোথাও কোথাও কেটে-নিয়ে-যাওয়া কাঠের গুঁড়ির কোণ বেরিয়ে আছে সূচীতীক্ষ্ণ অস্ত্রের মতো, তাতে পা পড়ে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছে—কোথাও বা অদৃশ্য পাথরে হোঁচট লেগে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে—তবু এখন আর ভেঙ্গে পড়লে চলবে না, হতাশ হ'লেও না। ঐ দূরের আলোটিই তাদের জীয়নকাঠি, ওখানে যদি আশ্রয় নিতে পারে, যদি পারে আজকের রাতটি বিশ্রাম নিতে, তবেই আবার নতুন ক'রে বেঁচে উঠবে সে, তবেই তার সংকল্প সিদ্ধির সম্ভাবনা থাকবে।

আলোটা একটু একটু ক'রে কাছে এল।

ওটা যে আলোই—আলেয়া কি জোনাকি নয়, সে বিশ্বাসও দৃঢ়তর হ'ল সেই সঙ্গে।

আর সেই সঙ্গে ফিরে এল মনের মধ্যে নতুন বল। আবারও একবার দেহ হার মানল মনের কাছে।

পাহাড়ী পথ প্রায়ই প্রতারণা করে মানুষের চোখকে—যাকে মনে হয় হাতের কাছে, নাগালের মধ্যে, চলতে শুরু করলে তাই চলে যায় বহুদূরে—আপাত-সামান্য পথ কণ্টকর রকমের দূর হয়ে ওঠে।

আজও মালতীর অদৃষ্টেও তার অন্যথা হ'ল না।

কাছে কাছে মনে হয়েও বহুদূরে যেতে হ'ল তাকে।

তবু একসময় সে দূরত্বেরও ঘটল অবসান।

এতক্ষণের সাধনা এনে দিল সিদ্ধি।

অবশেষে সত্যি-সত্যিই সে আলোর সামনে এসে দাঁড়াল ;

কিন্তু এ কী আলো!

এ কী নিদারুণ পরিহাস করল ভাগ্য তার সঙ্গে!

পাহাড়ী বাঁশের একটা সুনিবিড় পুঞ্জ তার দৃষ্টিকে আড়াল ক'রে রেখেছিল বরাবর, একটি বিশেষ ফাঁক দিয়ে আলোটা দেখতে পেলেও আর কিছু দেখতে পায় নি তাই।

এখন একটি নাতিপ্রশস্ত পার্বত্য ঝরনা হেঁটে পেরিয়ে এসে বাঁশবনটাকে ঘুরে আলোর সামনাসামনি এসে দাঁড়িয়ে দেখল সেটা কোন কুটির নয়, আলোটাও নয় কোন দীপশিখা। আসলে কারা বনের মধ্যে একটা বড় বস্ত্রাবাস বা তাঁবু ফেলেছে আর সেই বস্ত্রাবাসের সামনে বড় বড় কাঠের গুঁড়ি

জড়ো ক'রে আগুন জেবলেছে।

মালতী দূর থেকে যেটা দেখেছে সেটা এই আগুনেরই আলো, ঘন বনের ভেতর থেকে দেখেছে বলে ওর প্রদীপের আলো মনে হয়েছে।

বস্ত্রাবাসে যারা ছিল তারা বহু দূর থেকেই ওর আর ভৈরোদাসের পায়ের আওয়াজ পেয়েছে। বিশেষ ক'রে ঝরনা পেরিয়ে আশার ছপছপ শব্দ তো বেশ প্রবলই—সুতরাং তারাও বিপদ আশঙ্কা ক'রে প্রস্তুত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে এদের প্রতীক্ষা করছে।

প্রত্যেকের হাতেই সুদীর্ঘ বর্শা—আর সেই অন্তত পাঁচ-ছটি বর্শার মুখ ঠিক মালতীর দিক লক্ষ্য ক'রেই স্থির, উদ্যত।

মালতীর মুখ থেকে একটা প্রায় অস্ফুট শব্দ আপনিই বেরিয়ে এল। আতঙ্ক ও আশাভঙ্গের বেদনা-মিশ্রিত আর্তনাদ একটা।

আতঙ্কের আরও কারণ ছিল।

নিবিড় অন্ধকারের মধ্য দিয়ে সে এসেছে—এই আগুনের আলোই তার কাছে যথেষ্ট উজ্জ্বল, তাতে সে এক নিমেষমাত্রে দেখে নিয়েছে—এই কটি লোক সকলেই যুদ্ধ-ব্যবসায়ী, সৈনিক। তাদের সর্বাঙ্গ বর্মে আবৃত, মাথায় ধাতুনির্মিত শিরস্ত্রাণ, কটিতে অসি, বাঁ হাতে বিরাট বর্ম।

এবং এরা কেউই এদেশী অর্থাৎ বিজয়দেবের সৈন্য নয়—এরা বিজাতীয়, বিদেশী। সম্ভবত বিধর্মীও।

মুসলমান সৈন্য কখনও দেখে নি মালতী—কিন্তু কে জানে কেন এদের দেখেই মনে হ'ল যে এরা সবাই মুসলমান। সম্ভবত ঘুরের মহম্মদ-বিন-সামেরই সৈন্য।

আর্তনাদটা বেরিয়ে এসেছিল অকস্মাৎ, আপনা থেকেই। কিন্তু তাছাড়া এদের দেখে পর্যন্ত যেন পাথর হয়ে গিয়েছিল মালতী, চোখে পলক অবধি পড়ে নি বোধ হয় তারপর।

ওদের অবস্থা কিন্তু তার বিপরীত। ওরা এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল পাথরের মতো স্থির ও একাগ্র হয়ে, এখন মালতী আলোর সামনে এসে পড়ায় আগন্তুক বলতে একটি সওয়ারহীন ঘোড়া আর একটি অসহায় নিরস্ত্র কিশোরী মেয়েকে দেখে নিশ্বাস ফেলে সহজ হ'ল। এবং আর এক পলক দেখে নিয়ে মেয়েটিকে নিরতিশয় সুশ্রী দেখে একপ্রকার জান্তব উল্লাসে সমবেত একটা পৈশাচিক ধ্বনি ক'রে উঠল।

যেন এইটেরই শুধু অপেক্ষা ছিল, শুধু এই আঘাতটুকুরই।

দেহ-মন একসঙ্গে ভেঙ্গে পড়ল মালতীর।

সে আর একটা অস্ফুট আর্তনাদ ক'রে সেইখানেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল—সেই উপলবিকীর্ণ কঠিন ভূখণ্ডের ওপর।

॥ ২৩ ॥

মালতীর অনুমান মিথ্যা নয়।

এরা ঘুরীরই সৈন্য। তবে এরা কোন রাজকার্যে বা রাজাদেশে আসে নি। এখানে এসে বনের মধ্যে গোপনে তাঁবু ফেলেছে বিচিত্র এক স্বার্থ-বুদ্ধিতে।

রাজা বিজয়দেবের কাছ থেকে সংবাদ যেতে, বন্দীকে নিয়ে যাবার জন্য মুহম্মদ-বিন-সাম বিপুল একদল সৈন্য পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু জম্মু পর্যন্ত পৌঁছতে হয় নি তাদের—পথেই এক জায়গায় বিজয়দেবের সৈন্যরা অপেক্ষা করছিল বন্দী মালিক বাহ্‌রামকে নিয়ে, সেইখানে এসে বন্দীদের ভার বুঝে নিয়েছে ঘুরীর সৈন্যরা।

তার কারণ বিজয়দেব সবচেয়ে তেজী দুই ঘোড়া দিয়ে স্বাস্থ্যবান সাহসী দুই অনুচর পাঠিয়েছিলেন, একজন এসে জম্মুর সৈন্যদের নিষেধ করেছে বন্দীকে রাজধানী পর্যন্ত নিয়ে যেতে, আর একজন ঘুরীর সৈন্যদের মুখ ফিরিয়ে দিয়েছে জম্মুর দিক থেকে এই দিকে।

সুচতুর বিজয়দেব এতদিনে ঘুরীকে চিনতে পেরেছেন ভাল রকমই। তার ক্ষমতারও একটা হিসাব পেয়েছেন।

তাই তিনি চান না যে কোন কারণেই ঘুরীর অনুচররা বেশীসংখ্যক তাঁর রাজধানীতে আসে।

তিনি চান না যে তারা দেখে যায় এর পথঘাট, এর প্রাচীর-প্রহরার দুর্বল অন্দিসন্ধি।

তিনি চান না যে তারা জেনে যায় এখানকার ঐশ্বর্যের পরিমাণ—তাঁর বা তাঁর প্রজাদের।

সুতরাং ঘুরীর সৈন্যদের হাতে কিছু সময় ছিল।

জম্মু পর্যন্ত যাওয়া-আসার সময় হিসাব ক'রে দিয়েছেন তাদের সেনা-নায়ক। দু'চারদিন বিশ্রামের সময়ও ধরে দিয়েছেন বৈকি।

এই সময়টা তারা ফিরিয়ে দিতে চায় নি মনিবকে বা মনিবের স্থলাভিষিক্তকে।

তাই বলে সময়টা নষ্ট করতেও চায় নি।

সময়কে অর্থে রূপান্তরিত করতে চেয়েছে।

অর্থ উপার্জনের সম্ভাবনাটাই যথেষ্ট; কিন্তু তা ছাড়াও কিছু লোভনীয় ছিল।

প্রমোদায়োজনও ছিল কিছু, ছিল সম্ভোগের লোভ।

অর্থ উপার্জন আর সম্ভোগ যদি একসঙ্গে এক উপায়ে হয়—সে তো আরও ভাল।

তারা দেখেছে মুহম্মদের খাস বাহিনীর নিজস্ব উট খচ্চর ও হাতীগুলি লুটের মালের ভারে নুয়ে পড়েছে; স্বর্ণ রৌপ্য মণিমাণিক্য—কত কি!

কিন্তু শুধু স্থাবর নয়, জঙ্গম ঐশ্বর্যও তারা সংগ্রহ করেছে কিছু।

বেশ কিছু-সংখ্যক নারী সংগ্রহ করেছে তারা। নিয়ে চলেছে দেশের দিকে।

পথে নিজেদের অবসর বিনোদন হবে, দেশে ফিরে গিয়ে পছন্দ হয় তো রাখবে—নইলে বিক্রী করবে।

ঘর কি গজনীতে সুন্দরী নারীর অভাব নেই সত্যি কথা—কিন্তু অধিকন্তু ন দোষায়।

তাছাড়া—তাদের চোখে অন্তত এদেশের মেয়ে বড় ভাল লেগেছে।

এ আর এক ধরনের রূপ, যা তারা দেখতে অভ্যস্ত সেরকম নয়। হয়ত সেই জন্য আরও লোভনীয়।

এ যেন সরোবরের নীলজলে সদ্য-উন্মীলিত প্রভাত-কমল।

এ যেন শুক্লসন্ধ্যায় সদ্য-ফুটে-ওঠা একমুঠো চামেলি ফুল।

তেমনি কোমল, তেমনি ভঙ্গুর, তেমনি উজ্জ্বল অথচ তেমনি সলজ্জ।

এদের কপোলে লাজরক্ত উষার নিত্য আবির্ভাব, এদের উদারবিস্তৃত চোখে অন্তহীন নীলসাগরের মায়া।

এদের মন আল্লার করুণার মতো—সর্বদাই সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত, পাত্রাপাত্র বিচার করে না। স্নেহ দয়া মায়ায় গড়া ফুলের পুতুল এরা।

এ বস্তু অধিকার ক'রে সম্ভোগ ক'রে সুখ আছে।

বিক্রী করাও লাভজনক।

গজনীর হাটে স্থানীয় বাঁদীদের চেয়ে ঢের বেশী চড়া দামে বিক্রী হবে।

এ সবই জানে এরা কিন্তু এখনও সে সুযোগ-সুবিধা পায় নি।

সুলতানের খাস সৈন্যরাই এসব সুবিধার অধিকারী। সাধারণ সৈন্যদের হুকুম নেই কোন প্রকার লুটতরাজের—না নারী না সম্পদ।

হঠাৎ এই আরণ্য ও পার্বত্য দেশে এসে সুযোগ যেন আপনি ধরা দিল ওদের কাছে।

পথ প্রশস্ত হয়ে গেল।

এখানকার মেয়েরা আরও রূপসী।

পঞ্চনদের সমতলবাসিনীদের চেয়ে এই পার্বতীরা ঢের ঢের লোভনীয়।

এখান থেকে কিছু সওদা ক'রে গেলে কী হয়?

নিজেদের কাজ চলে, দু'পয়সা মুনাফাও হয়।

বিজয়দেব টেরও পাবে না—জনপদ গ্রাম বা শহর ছেড়ে ওরা একটু আড়াল আব্‌ডাল থেকে যদি সংগ্রহ করে ওদের মাল।

পাহাড় আর অরণ্য, অরণ্য আর পাহাড় চারিদিকে। এর মধ্যে কত ছোট ছোট গ্রাম আছে, যাদের খবর রাজধানীতে পৌঁছবার আগে ওরা এই ভারতবর্ষ ছেড়ে বহুদূরে চলে যাবে।

কত গ্রাম্য মেয়ে নির্ভয়ে কাঠ কাটতে আসে, আসে বন্যফল সংগ্রহ করতে।

ঘোরাঘুরি করতে হবে না, খোঁজাখুঁজিও না; গ্রামের কাছাকাছি বনের মধ্যে শুধু ওৎ পেতে বসে থাকার ওয়াস্তা।

সেই মতলবই ভাল লেগেছে সকলের। সেই যুক্তিই মেনে নিয়েছে সবাই।

একশো জন মোট সৈন্য ওরা।

বন্দী তো একটি আঠারো-উনিশ বছরের কিশোর ছেলে।

সেও কেমন যেন ভেঙ্গেই আছে। একেবারেই ভেঙ্গে পড়েছে যেন।

কথাও কয় না কারুর সঙ্গে, মুখ তুলে তাকায় না পর্যন্ত কোন দিকে। চুপ ক'রে ঘাড় গুঁজে বসে থাকে সর্বদা আর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। চোখ তুললেও দৃষ্টিতে যেন এক সুগভীর আতঙ্কের ছাপ।

সবুক্তিগীনের রক্তের কোন প্রকাশ আর ওর মধ্যে নেই। সুলতান মামুদের বীর্য যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে ওর পূর্বপুরুষদের মধ্যেই।

ওর দীন মুষড়ে-পড়া হতাশ ভঙ্গী দেখে এক এক সময় ওদের সন্দেহ হয় যে, এ সেই বংশের সন্তান কিনা।

এ তো স্ত্রীলোকেরও অধম। বোধহয় এর হাতের বাঁধন খুলে দিলেও কোনদিন পালাবার চেষ্টা করবে না।

সুতরাং এতগুলো লোক মিলে ওকে ঘিরে বসে থেকে লাভ কি?

অসহায়, নিরস্ত্র বালক। পালাতে যদি চেষ্টাও করে, আর সে চেষ্টাতে যদি সফলও হয় তো কতদূরই বা যাবে? দু'চার ক্রোশ পার হবার আগেই ধরে ফেলবে ওরা, পায়ে ও কোমরে বেড়ি দিয়ে অচল ক'রে দেবে।

এখনও অতটা করে নি—ভূতপূর্ব রাজবংশের প্রতি ঐটুকু সম্মান এখনও বজায় রেখেছে।

অতএব স্থির হ'ল যে পাঁচিশজন মাত্র মূল তাঁবুতে থাকবে বন্দীকে নিয়ে, বাকী সকলে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে।

অতি সাবধানে ও সন্তর্পণে এগোবে ওরা, প্রকাশ্য জনপদ পরিহার ক'রে, রাস্তা ও গ্রামের কাছাকাছি বনের আড়ালে বসে থাকবে আত্মগোপন ক'রে।

ঊর্ণনাভ যেমন ক'রে লূতাতন্তু বিস্তার ক'রে স্থির হয়ে বসে থাকে শিকারের অপেক্ষায়, তেমনি।

সাতদিন সময় ধার্য হ'ল। এর ভেতর যার যা মিলবে, মিলবে। নইলে শুধু-হাতেই ফিরবে। ওর চেয়ে বেশী দেরি করা চলবে না কোন মতেই।

আর কোন মতেই সংবাদটা না ছড়িয়ে পড়ে।

এত অল্প লোকের ভরসায় এদেশের লোককে বিক্ষিপ্ত ক'রে তোলা চলবে না।

যতই নিরীহ আর যুদ্ধবিমুখ হোক এরা—ক্ষেপে উঠলে এই কটা সশস্ত্র লোকই বা কতক্ষণ?

তাছাড়া সংবাদটা সুলতানের কানে উঠলে আর রক্ষা থাকবে না।

এখনও বিজয়দেব তাঁর মিত্র রাজা।

অকারণে বিজয়দেবকে শত্রু ক'রে তুলতে চাইবেন না তিনি।
সে সম্ভাবনার যে কারণ হবে তাকেও সহজে ক্ষমা করবেন না।
অতএব সাবধান; খুব সাবধান।
উর্ণনাভের মতোই নিঃশব্দে কাজ সারতে হবে, কেউ না টের পায়, সংবাদটা না বাইরে ছড়ায়।

সেই যে কটি দল চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, বর্তমান দলটি তারই অন্যতম।
কিন্তু এদের দুর্ভাগ্য যে, আজ এই ষষ্ঠ দিন অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও একটি শিকারও ওদের জালে পড়ে নি। ধারেকাছেও আসে নি।
ওরা পরদেশী—এখানের পথঘাট, জনপদ গ্রাম বা নগর সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই নেই।
তারা জানে না যে তারা এমন একটা স্থানে এসে পড়েছে, যার কাছাকাছি কোন বর্ধিষ্ণু জনপদ নেই। জনপদ যাকে বলে এমন লোকালয়ই নেই আদৌ।
এ স্থানটা আরণ্য-সম্পদের জন্যই বিখ্যাত।
যে সম্পদ আহরণ করতে আসে পুরুষের দল, তাও দিনমানে।
কিন্তু এখন সে সময়ও নয়।
মালতী নেহাৎ দৈবপ্রেরিত হয়েই এসে পড়েছে। নইলে এখানে ছ-দিন কেন ছ-বছর বসে থাকলেও এমন শিকার পেত কিনা সন্দেহ।
এসব কথা এরা জানে না। তাই এদের কাছে ছ-দিনই মনে হয়েছে ছ-যুগ।
বহুদিনের ক্ষুধা এবং এই কদিনের প্রায় ব্যর্থ প্রতীক্ষার পর এই নিবিড় নির্জন নিশীথে এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে এমন লোভনীয় শিকারকে মুখের সামনে নিজে থেকে এগিয়ে আসতে দেখেই ঐ হতাশ ক্ষুধার্ত পশুর দল পৈশাচিক উল্লাসে চিৎকার ক'রে উঠেছিল।
যে চিৎকার শুনে মালতী মূর্ছিত হয়ে পড়ে।

এসব তথ্য মালতী সংগ্রহ করেছে অনেক পরে।
ওদের কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে—আকারে ইঙ্গিতে।
এরা এই ক'মাসেই স্থানীয় ভাষা বেশ আয়ত্ত করেছে; সুতরাং বুঝতে অসুবিধা হয় নি খুব একটা।
কিন্তু সে পরের কথা।
মূর্ছা ভাঙতেও মালতীর দেরি হয় নি।
তার কারণ ওকে পড়ে যেতে দেখেই একজন একটা হুঙ্কার দিয়ে উঠে বর্শা ফেলে ছুটে এসে কোলে তুলে নিয়েছিল।
সে পুরুষ এবং অশুচি স্পর্শে ওর সব জড়তা ও অবসন্নতা কেটে

গিয়েছিল, ছটফট ক'রে উঠেছিল ও। কিন্তু সেই বজ্র-কঠিন বাহুবন্ধন থেকে হাজার চেষ্টা করলেও রক্ষা পাওয়া সম্ভব ছিল না মালতীর পক্ষে, তবু রক্ষাই পেল সে শেষ পর্যন্ত।

বিধাতাই সদয় হলেন। দুঃখ ওকে ঢের দিয়েছেন, তাতেই বুঝি গত-জন্মের পাপ দূর হয়ে গিয়েছিল ওর। এতটা অপমান আর করবার দরকার হয় নি।

মানুষের ছটি প্রধান রিপু তার ধ্বংসের যেমন কারণ হয় তেমনি অপর মানুষকে রক্ষাও করে অনেক সময়।

সেই লোকটাকে শিকার অধিগত করতে দেখেই বাকী সকলে হুঙ্কার দিয়ে উঠল।

ঝাঁপিয়ে পড়ল ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রের মতো।

তারপর পশুতে পশুতে বাধল লড়াই।

কি নিয়ে লড়াই তা বুঝি ভুলে গেছে তখন ওরা।

পশুর সমস্ত হিংস্রতা, সকল নখদন্তই বেরিয়ে পড়েছে।

যে লোকটি মালতীকে তুলে নিয়েছিল সে ওকে প্রায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েই গিয়ে বর্শা কুড়িয়ে নিয়েছিল আবার।

কিন্তু তার জন্য যেটুকু সময় লেগেছিল সে সময়ের মধ্যে তার সঙ্গীরা অনেকখানি সুবিধা পেয়ে গেছে। সুতরাং অল্পক্ষণ পরেই তার মৃত বা অচৈতন্য রক্তাক্ত দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

তারপরও কিছুক্ষণ চলল লড়াই।

কে প্রথম সম্ভোগ করবে—তাই নিয়ে বিবাদ, তাই নিয়ে রক্তক্ষয়কারী আত্মনাশা যুদ্ধ।

কেউই চায় না অধিকার ছাড়তে।

কেউ এতটুকু কাল অপেক্ষা করতে রাজী নয়।

বহুদিনের ক্ষুধা তাদের।

কোমল উষ্ণ নারীমাংসও বড় লোভনীয়, বড় রুচিকর।

শেষে আরও জন দুই জখম হ'তে শান্ত হয়ে এল ওরা।

এতটা অকারণ ও অনর্থক রক্তপাতের পর বোধ হয় চৈতন্য হ'ল ওদের।

ওরা প্রথম প্রশ্ন করার অবকাশ পেল নিজেদের যে, এ কাজ কেন করছি!

আত্মীয়রক্তে আগুন নির্বাপিত হ'ল কতকটা। তখন গোল হয়ে বসল পরামর্শ করতে।

অনেক আলোচনা ও যুক্তিতর্কের অবতারণার পর স্থির হ'ল যে, ওরা কেউই এখন এই খাদ্যের দিকে লোলুপ রসনা প্রসারিত করবে না।

রাত পোহালেই তো ওদের মেয়াদ শেষ। ওরা ফিরেই যাবে শিকার নিয়ে ওদের ঘাঁটিতে। ওদের যিনি সাক্ষাৎ ওপরওয়ালা, তাঁর কাছেই নিবেদন করবে এ অম্লান পুষ্প, তারপর তিনি যা আদেশ করেন মেনে নেবে ওরা।

তিনি যদি প্রসাদ দেন তো গ্রহণ করবে ;—তাঁর নির্দেশ মতোই করবে।

অথবা তিনি যদি তাঁর ওপরওলার কাছে গিয়ে যে পুষ্প অর্ঘ্যস্বরূপ পৌঁছে দেন তো তাতেও আপত্তি করবে না ওরা।

তারা কিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্য হয়ত দাবি করবে—এতদিনের ধৈর্য, কষ্ট-স্বীকার ও পরিশ্রমের জন্য।

এই যুক্তিই মেনে নিল সকলে। তখন সুস্থ ও অক্ষত অবশিষ্টরা আহত মৃত বা মৃতবৎ সঙ্গী-বন্ধুদের দিকে মন দিল।

যদি এরা কিঞ্চিত সুস্থ, এমন কি বহনযোগ্যও হয়ে ওঠে সমস্ত রাতে—তাহ'লে রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গেই রওনা দেবে ওরা, হিসাবমতো ওদের প্রাপ্য আর একটা দিন—সপ্তম দিন—অতিবাহিত ক'রে যাবার চেষ্টা-মাত্র করবে না।

শিকার এসেছে বটে, কিন্তু আর যে খুব একটা দল বেঁধে কেউ আসবে না তা এই কদিনে বেশ বুঝতে পেরেছে ওরা।

তাছাড়া আর বুঝি রুচিও নেই।

নিজেদের মনের চেহারাটা দেখে নিজেরাই ভয় পেয়ে গেছে হয়ত।

॥ ২৪ ॥

মালতী বসে বসে দেখল সবই।

ভয়ে পাথর হয়ে গিয়েছিল সে। নইলে ওদের আপস লড়াইয়ের ফাঁকে হয়ত পালাতে পারত অনায়াসে।

ভয়ে—তাছাড়া অবসাদ ও ক্লান্তিতেও বটে।

বুঝিবা কেমন একটা হতাশ্বাসও অনুভব করছে সে মনে মনে।

মূর্ছার একটা প্রতিক্রিয়াও আছে।

উপলাস্তীর্ণ নদীতটে আছড়ে পড়ার ফলে সর্বাঙ্গে বেদনাও বোধ করছিল। সেই সঙ্গে দুদিনের ঘোড়ায় চড়ার ব্যথা তো আছেই।

কিন্তু সর্বোপরি ভয়।

নাম-না-জানা আতঙ্ক একটা—।সেইটেতেই পাথর হয়ে গিয়েছিল সে।

তার বুদ্ধি পর্যন্ত কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল।

কিছুই ভাল ক'রে ভাবতে পারছিল না।

শুধু মনে মনে কেমন যেন একটা অন্যমনস্ক, আত্মগত ভাবে ক্রমাগত ধিক্কার দিয়ে যাচ্ছিল নিজের নারীজন্মকে।

ধিক্ ধিক্! বৃথা তাদের আস্ফালন, বৃথা তাদের স্পর্ধা! মেয়েদের কোন ক্ষমতাই নেই। কিছুই পারে না তারা।

না আছে তাদের দেহে বল, না আছে তাদের মনে শক্তি।

বড় দুর্বল, বড় অসহায় তারা। তারা শুধু পারে ঘরের কোণে বসে কাঁদতে আর হাহাকার করতে।

তারও তাই করা উচিত ছিল।

হাহাকার করা, কাঁদা আর শেষ পর্যন্ত মরা। এই তাদের সাধ্য, এই তাদের কর্তব্য।

উচিত হয় নি তার এই দুঃসাহস করতে আসার।

এদের হুঙ্কার, এদের এই লোলুপ বীভৎস মূর্তি, এদের এই পৈশাচিক হিংস্রতা দেখেই দেহের সমস্ত রক্ত হিম হয়ে গেছে, গুর্‌গুর্ করছে ভয়ে বুকটা। অসাড়-করা ব্যথার মধ্যেও অনুভব করছে সমস্ত দেহে একটা অসহ্য কাঁপুনি।

এইটুকু শক্তি নিয়ে, এইটুকু সাহস নিয়ে এসেছে সে প্রতিশোধ নিতে! দিগ্বিজয়ী রাজার কাছ থেকে তাঁর বন্দী ছিনিয়ে নিতে!

ধিক্, ধিক্ তাকে! আর ধিক্ তার স্পর্ধাকে!

মন তার যতই দ্রুত কাজ ক'রে যাক্, দেহ কিছুই করতে পারল না। অনড় পঙ্গুর মতো একদিকে পড়ে রইল সে।

রণক্ষেত্রের মধ্যেই বলতে গেলে।

ওদের আঘাত দু'একটা তার ওপর এসে পড়াও আশ্চর্য নয়। আহতদের রক্ত তো ছিটকে এসে লাগলই বার-কয়েক। তবু সে নড়া তো দূরের কথা, সরে বসতেও পারল না। অসহায় বিমূঢ় দৃষ্টি মেলে সেই আধো-অন্ধকারে বসে দেখতে লাগল ওদের শ্বাপদ-হিংস্রতা।

তারপর লড়াই থামিয়ে যখন পরামর্শ-সভা বসল, তখনও চুপ ক'রে বসেই রইল সে।

কিছু বুঝল—কিছু বুঝল না ওদের যুক্তি-পরামর্শ।

বুঝল যখন পরামর্শ-সভা শেষ হ'লে একটা লোক ওর হাত দুটো ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধতে লাগল তখন।

প্রথমটা আতঙ্কে চীৎকার ক'রে উঠেছিল ও।

চরম সর্বনাশই আশঙ্কা করেছিল।

তবু বাধা দিতে পারে নি। বাধা দেওয়া হয়ত অসম্ভবই ছিল—চেষ্টাও করতে পারে নি।

শুধুই চীৎকার ক'রে উঠেছিল।

কিন্তু যখন তাঁবুর মধ্যে নিয়ে যাবার চেষ্টা না ক'রে ওকে বাইরেই একটা চীরগাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধল—তখন চুপ ক'রে গেল সে।

হয়ত কিছুটা আশ্বস্তও হ'ল।

সর্বনাশ নিশ্চয়ই আছে অদৃষ্টে, তবে সেটা তো একেবারে আসন্ন নয়—যা সে ভেবেছিল!

সময় যখন পাওয়া গেছে—তখন হয়ত শেষ পর্যন্ত এড়ানোও যেতে পারে সে দুর্ভাগ্য। কে বলতে পারে!

পশুটা বাকী সকলের কী সব নির্দেশমতো একটা পাত্রে ক'রে খানিকটা জল এনে সামনে রাখল ওর।

একটা হাত খুলে দিয়ে ইঙ্গিত করল জলের দিকে।

একটা পাতায় ক'রে গোটাকতক সেব্ এনে রাখল, আর খানকতক মোটা মোটা শুকনো রুটি।

প্রথমটা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল মালতী।

বিধর্মীর খাদ্য!

ঐ খেয়ে প্রাণ-ধারণ করবে সে? তার চেয়ে মৃত্যুই ভাল!

কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল, উদ্দেশ্য সিদ্ধি করতে হ'লে সক্রিয় থাকা দরকার। এখান থেকে, এদের হাত থেকে যদি মুক্তি পাবার চেষ্টা করতে হয়, তাহ'লেও—

আর সক্রিয় থাকতে হ'লে চাই দেহে কিছু প্রাণশক্তি।

সেই দুপুরে একখানা রুটি খেয়েছে সে, আর দু'আঁজলা জল।

তৃষ্ণায় আবক্ষ শুকিয়ে উঠেছে।

সম্ভবত ক্ষুধাতেই এত ক্লান্তি বোধ করছে সে।

দেহকে সবল রাখতে গেলে কিছু খাদ্য দেওয়া দরকার।

কিন্তু তাই বলে এদের দেওয়া জল? এদের দেওয়া খাদ্য?

ঘৃণায় সর্বশরীর শিউরে উঠল।

কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ল গুরুজীর কথা—আপৎকালে কিছুতেই দোষ নেই। তাছাড়া ফল কখনো অশুচি হয় না—জলও না।

গুরুজী বলতেন, জল নারায়ণ। জল কখনও কোন কালেই অশুচি হয় না নাকি।

আর ওর এই বর্তমান অবস্থার চেয়ে আপৎকাল আর কী হ'তে পারে?

সে একবার গ্রামগুরু বিষ্ণুপ্রসাদ আর গ্রামদেবতা ললিতাকেশবকে স্মরণ ক'রে হাত বাড়াল জলের পাত্রের দিকে।

জল পান করল আকণ্ঠ। তারপর দুটো সেব্ তুলে নিল। সুপক্ক মিষ্ট ফল। বলকারকও বটে।

পাষণ্ডটা দেখিয়ে দিল রুটির দিকে।

মালতী মুখ ফিরিয়ে নিল।

জীবনধারণের মতো খাওয়া তার হয়ে গেছে।

আর প্রয়োজন নেই।

কী বুঝল কে জানে, খানিকটা নির্বোধের মতো হেসে নিয়ে সে রুটির পাত্রটা সরিয়ে নিয়ে গেল।

তারপর আবার হাতটা বাঁধতে যাচ্ছিল, কে বুঝি পিছন থেকে বারণ করল। সম্ভবত বলল যে, 'আমরা তো আছিই, কী দরকার মিছিমিছি এত হাঙ্গামা করার?'

আর একবার অকারণ হা-হা ক'রে হেসে নিয়ে দড়িটা ফেলে চলে গেল সে।

পরের দিন সকালে একেবারেই ছেড়ে দিল ওকে। ইঙ্গিত করল প্রাতঃকৃত্য সেরে আসতে। দেখিয়ে দিল নদীর দিক।

স্বাধীনতা বৈকি। কিন্তু মালতী জানে যে,সজাগ সতর্ক হয়ে আছে ওরা। পালাবার এতটুকু চেষ্টা করলেই ওরা সচেতন হয়ে উঠবে।

ওরা সবল, সশস্ত্র ; ওদের প্রত্যেকের ঘোড়া আছে।

কোথায় পালাবে সে ওদের হাত থেকে ?

সুতরাং সে চেষ্টাও সে করল না।

মুখহাত ধুয়ে মাথায় জল দিয়ে এসে বসল।

ইতিমধ্যে ওরাই নিজেদের ঘোড়ার সঙ্গে ভৈরোদাসকে খাইয়ে নিয়েছে। অনেকদিন পরে কিছু দলাই-মলাইও জুটেছে তার অদৃষ্টে।

কাল মালতীর রুটি প্রত্যাখ্যান করা দেখেই বোধ করি ওরা ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে। এখানে এসে পর্যন্তই তো দেখছে—ভারতে পা দিয়ে পর্যন্ত।

বরং ওর ফল আর জল খাওয়াতেই ওরা কিছু বিস্মিত হয়েছিল।

ওরা নিজেরা তাই সকালে সেই মোটা মোটা পোড়া রুটির সঙ্গে ঝলসানো হরিণের মাংস আহার করলেও ওকে দেবার চেষ্টা করল না।

আগের দিনের মতো পাতায় ক'রে কটা সেব্, পাহাড়ী মিষ্ট ফল আরও কয়েকরকম এনে রাখল।

আজ আর ওদের পাত্রে জলও দিল না।

দেখিয়ে দিল নদীর দিক।

পেটভরেই ফল খেয়ে নিল মালতী। কোন দ্বিধা বা সঙ্কোচ করল না।

একবার যখন খেয়েছেই, তখন আর সঙ্কোচ ক'রে লাভ কি ? বরং দেহে একটু বল ফিরিয়ে আনাই দরকার। কে জানে অদৃষ্টে কী আছে, আজকের প্রভাত কী নবতর দুর্ভাগ্যের বোঝা বহন ক'রে এনেছে ওর জন্য!

আহারাদির পর ওরা তাঁবু তুলল ওখান থেকে।

সব সেরে গুটিয়ে নিয়ে খচ্চর ও ঘোড়ায় চাপান দিতে দিতে দুপুর গড়িয়ে গেল প্রায়।

তারপর ওরা রওনা দিল সেখান থেকে।

মালতীকেও উঠতে বলল ভৈরোদাসের পিঠে।

ওদের ভাষা জানে অনেকেই। অনেকটাই জানে—তাতে কাজ চলে যায় অনায়াসেই। তবু ইশারা ইঙ্গিতেই কাজ চলছিল বেশির ভাগ।

আজ সকালে ওদের মধ্যে মাতব্বর গোছের একজন—ইয়াসিন তার নাম—অন্তত মালতীর মনে হ'ল সেই নামেই ডাকছে তার সঙ্গীরা,—মালতীকে ডেকে সামনে দাঁড়াতে বলে জেরা করেছিল কিছু।

এই ইয়াসিন প্রায় পরিষ্কারই বলেছিল মালতীদের অঞ্চলের বুলি।

শহর বাজারের বুলির সঙ্গে দেহাতী বুলির যতটা তফাৎ থাকে তার চেয়ে বেশী নয়। সুতরাং বুঝতে কোনই অসুবিধা হয় নি।

ইয়াসিন জানতে চেয়েছিল তার কথা।

কী নাম তার, কোথায় কোন্ গ্রামে বাড়ি, কেন এমন ভাবে একা এই বিপদসঙ্কুল নির্জন পথে চলেছিল সে, এমন অদ্ভুত অস্বাভাবিক ভাবে ?

অস্বাভাবিক যে সেটা ওদের মতো প্রায়-নবাগতরাও জানে। এদেশের মেয়েরা—সাধারণ দেহাতী মেয়েরা অন্তত ঘোড়ায় বিশেষ চড়ে না।

মালতী শান্ত ভাবেই উত্তর দিয়েছিল ইয়াসিনের সমস্ত প্রশ্নের।

কেবল থেমেছিল একটি প্রশ্নের জায়গায় এসে।

সে প্রশ্নটা হচ্ছে উদ্দেশ্যর প্রশ্ন।

কেন চলেছিল সে একা এই বিপদসঙ্কুল পথে—এই প্রশ্নের জবাবটাই খুব সহজে দিতে পারে নি।

ইয়াসিন পুনরাবৃত্তি করেছিল প্রশ্নটার—ঈষৎ একটু কঠিন স্বরেই হয়ত।

আর ঠিক সেই সময়েই খেয়ালটা খেলে গিয়েছিল মাথায়।

কোন কারণ ছিল না কথাটা বলার, কোন যুক্তি তো নয়ই। বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নিয়েও বলে নি। একেবারেই খেয়ালের মাথায় বলে ফেলেছিল।

'মালিক বাহ্‌রামের সন্ধানে যাচ্ছিলুম।'

'মালিক বাহ্‌রাম !'

লাফিয়ে উঠেছিল ইয়াসিন।

শব্দটা কানে যেতে লাফিয়ে উঠেছিল ইয়াসিনের অন্য সঙ্গীরাও। তারা কথা না বুঝলেও নামটা বুঝেছিল বৈকি।

'মালিক বাহ্‌রাম ! তার মানে ? তার সঙ্গে তোমার কী ?'

'তার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলাম, মিলতে।'

'কিন্তু কেন, তাই তো জিজ্ঞাসা করছি। সে বিদেশী বিধর্মী, তুমি হিন্দুর মেয়ে। তাছাড়া তাকে চিনলেই বা কী ক'রে ?'

অসহিষ্ণু কণ্ঠে প্রশ্ন করে ইয়াসিন।

'মনের সঙ্গে যখন মনের মোলাকাৎ হয় তখন দেশ-ধর্মের গণ্ডী দিয়ে তাকে আট্‌কানো যায় না। তোমার এত বয়স হয়েছে, তাও জান না ?'

ঈষৎ অবজ্ঞার সুরেই বলে মালতী।

'তাকে চিনলে কি ক'রে ? এত মনের মোলাকাৎ হ'ল কোথায় ?'

'ওমা, তাকে যে আমাদের গ্রামে আশ্রয় দিয়ে রেখেছিলেন আমাদের গুরুজী বিষ্ণুপ্রসাদ ! ওর ছেলে রাজা বিজয়দেবের লোককে সেই খবর দেয়। তাতে বিজয়দেব কোথাকার কোন ঘুরের রাজার কাছ থেকে বকশিশ পাবার আশায় লোক পাঠিয়ে তাকে বেঁধে নিয়ে গেছে। তাই তো তার সঙ্গে মিলতে ঘরের বার হয়েছি।'

বিশ্বাসযোগ্য নয়, বিশ্বাস করা উচিতও নয়—তবু এ কথাগুলো সে সত্যি বলছে তাতেও তো কোন সন্দেহ নেই।

ওরাও তো এই রকম ইতিহাসই শুনেছে।

তাহ'লে কি সবটাই সত্যি বলছে ?

'তাহ'লে তুমি এত দেরি করলে কেন ? তাকে তো ধরে নিয়ে গেছে

অনেকদিন !'

'তুমি বুঝি সংসারে বাস করো নি কখনও ?' আশ্চর্যরকম সাহস বেড়ে যায় মালতীর, সে ধমকের সুরেই কথা বলে, 'ঘরকন্নার মধ্যে। তাহ'লে তুমি এমন কথা বলতে না। আমার মতো অল্পবয়সী মেয়ে—বিশেষত আমাদের দেশে আমাদের সমাজে—ঘর থেকে গ্রাম থেকে বেরোনো কি খুব সোজা ? আমার মাথার ওপর মা-বাবা-অভিভাবক নেই ? আমি কি স্বাধীন—পুরুষের মতো ? তাও পুরুষকেও কৈফিয়ৎ দিতে হয়। অল্পবয়সী হ'লে তো কথাই নেই···আসবার ব্যবস্থা করতে ঘোড়া পেতেই যে কত দেরি হয়ে গেল !'

তা বটে।

এ কথাগুলোও বিশ্বাসযোগ্য যে, তাও অস্বীকার করা যায় না।

ইয়াসিন একবার তার ছাঁটা ছুঁচলো দাড়িতে হাত বুলিয়ে নিলে।

'বেশ চলো, তোমার পেয়ারের লোকের সঙ্গেই মিলিয়ে দিচ্ছি।'

হাসল একটু ইয়াসিন। নিষ্ঠুর, পিশাচিক হাসি। দিনের আলোতে সে দেখেছে মালতীকে আজ। তার রক্তে আগুন ধরেছে তাই।

সে হাসি মালতী লক্ষ্য করল কিনা কে জানে—তার আচরণে বা কণ্ঠস্বরে অন্তত তা প্রকাশ পেল না।

সে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে সাগ্রহে বলল, 'দেবে, দেবে তার সঙ্গে মিলিয়ে ? তোমরা জানো সে কোথায় আছে ? তোমরাই বুঝি ধরে এনেছ তাকে ? তোমরাই তাহ'লে ঘুরের রাজার লোক ? সে—সে কোথায় আছে ? মালিক বাহ্‌রাম ভাল আছে তো ?'

'ভালই আছে। খুশ মেজাজে, বহাল তবিয়তে। আরও ভাল থাকবে সে —আগে সুলতানের সঙ্গে দেখা হোক !'

হা-হা ক'রে হেসে উঠল ইয়াসিন। কিন্তু সে হাসি আর যা-ই হোক—উল্লাসের নয়।

গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল মালতীর সে হাসির শব্দে।

তবু সে ভয় পেল না। মাথা উঁচু ক'রেই দাঁড়িয়ে রইল।

'চল ভাই, রওনা দেওয়া যাক্ এবার।'

হাসি থামিয়ে বলল ইয়াসিন।

রওনা হ'ল ওরা প্রায় দ্বিতীয় প্রহর নাগাদ।

মালতীকে ভৈরোদাসের ওপর চাপতে বলে ভৈরোদাসের লাগামটা নিজের হাতে রাখল ইয়াসিন। যারা অল্পস্বল্প আহত হয়েছিল তারা কী সব ঘাস গাছের পাতা বেটে ঘায়ে লাগিয়ে ঘোড়ার ওপর সওয়ার হ'ল। দুজন খুব বেশী জখম হয়েছিল, তাদের জন্যে করা হ'ল বিচিত্র ব্যবস্থা। বাঁশ কেটে চিরে চালিমতো তৈরী করা হ'ল, সেই চালিতে তাদের শুইয়ে চালিটা বেঁধে দেওয়া হ'ল ঘোড়ার পিঠে। সেই ভাবেই আধশোয়া ক'রে চলতে লাগল তারা। তাদের ঘোড়ার লাগামও এক এক জন ক'রে সুস্থ লোক নিজের হাতে রাখল।

সবাই রওনা হয়ে গেল।

যেতে পারল না শুধু একজন।

যে আগে এসে মালতীকে কোলে তুলে নিয়েছিল—সে-ই আর উঠতে পারল না।

আর পারবেও না কোনদিন।

একেবারেই ঘায়েল হয়েছিল সে।

তার সঙ্গী-বন্ধু-ঘাতকরা আজ সকালে তাকে এইখানেই মাটি দিয়েছে—মালতী তা বসে বসেই দেখেছে।

দেখেছে আর ললিতা-কেশবকে ধন্যবাদ দিয়েছে মনে মনে।

তিনিই রক্ষা করেছেন, নইলে রাক্ষসগুলোর অমন মতিগতি হবে কেন?

॥ ২৫ ॥

বড় তাঁবুতে পৌঁছতে ওদের মোট দুদিন সময় লাগল।

মধ্যে একটা রাত কাটাতে হ'ল বনের মধ্যেই।

রাত্রের একটা মায়া আছে।

অন্ধকারের মোহ আছে একটা।

বিশেষত সে অন্ধকার যদি ঝাপসা আলোয় বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে তো কথাই নেই।

এতগুলি ক্ষুধার্ত পুরুষের সান্নিধানে একটি কিশোরী মেয়ে।

সুশ্রী, ভঙ্গুর, লোভনীয়।

বিচিত্র আর রহস্যময় মেয়ে।

তার ওপর চারিদিকের অসংখ্য অগ্নিশিখার কম্পমান দ্যুতি তার মুখে-চোখে-সর্বাঙ্গে পড়ে তাকে আরও বিচিত্র, আরও রহস্যময় ক'রে তুলেছিল। চারিদিকের কয়েকজোড়া লোলুপ চোখ যেন লেহন করছিল সে রহস্যময়তা।

লোলুপতা ও বুভুক্ষা হিংস্র হয়ে উঠতে দেরি হ'ত না—যদি সকলেই না সমান অধৈর্য হ'ত।

দু-একজন উশখুশ করতেই অপরজনরা তলোয়ার বার করেছে।

খবরদার!

মুখে না বললেও, চোখে চোখে সেই হুঁশিয়ারীই ব্যক্ত হয়েছে।

সুতরাং সে রাত্রেও কোনমতে রক্ষা পেয়ে গেছে মালতী।

মনে মনে গুরুজীকে প্রণাম জানিয়েছে সে। প্রণাম জানিয়েছে ললিতা-কেশবকে।…

রাত্রি প্রভাত হ'তে প্রাতঃকৃত্য শেষ ক'রে আবার শুরু হয়েছে যাত্রা।

সেদিন পূর্বদিনেরই পুনরাবৃত্তি ক'রে গেছে মাত্র। এমন কোন স্মরণীয় ঘটনা ঘটে নি।

তারপর সন্ধ্যায় এসে পৌঁচেছে বড় তাঁবুতে।

তখনও অন্য দল সব ফিরে আসে নি।

মালিক বাহ্‌রামকে পাহারা দিতে আছে মোট জনাদশেক সৈন্য আর তাদের দলপতি কুৎব্‌।

কুৎব্‌ তখন সবেমাত্র শিকার ক'রে ফিরে স্নানাহার শেষ ক'রে একটু আরামের আয়োজন করছেন।

প্রথমত এখন কিছু ভাবতে হবে এবং সিদ্ধান্ত নিতে হবে এইটেই যথেষ্ট বিরক্তিকর, তার ওপর আবার তাঁর প্রধান বন্দী মালিক বাহ্‌রাম সংক্রান্ত ব্যাপার, বিপুল দায়িত্বের কথা।

তিনি অর্ধ-নিমীলিত নেত্রে সব শুনে হুকুম করলেন যে, সর্বাগ্রে উক্ত নওজোয়ান ছোড়ীকে গোসল করার পানি দেওয়া হোক, আর কিছু খানা। ওদের খানা যদি না খায় তো ফলই বরং বেশী ক'রে আনিয়ে দেওয়া হোক। আর নিরিবিলি একটু শোওয়ার ব্যবস্থাও যেন ক'রে দেওয়া হয়—একটা ছোট তাঁবু খালি ক'রে দিলেই হবে। যা শোনা যাচ্ছে, বহুদিনের পথশ্রম সহ্য করছে বেচারী—ধুলোময়লা আর উপবাসে মুখে কালি পড়েছে নিশ্চয়। একটু সাফ আর তাজা হোক আজকের রাতটা বিশ্রাম ক'রে—তারপর কাল সকালে তিনি ওকে ডেকে পাঠাবেন।

তবে হ্যাঁ, বেঁধে রাখার দরকার নেই বটে কিন্তু পাহারা না আল্‌গা রাখা হয়। হিন্দু নওজোয়ান লড়কী ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে নিজের পিয়ারাকে খুঁজতে বেরিয়েছে—ও বড় জবরদস্ত মেয়ে। খুব হুঁশিয়ার।

এই পর্যন্ত বলেই চোখ বুজলেন কুৎব্‌উদ্দীন। এইটুকুতেই যথেষ্ট কষ্ট হয়েছে তাঁর। আসলে সারাদিনের ক্লান্তির পর গরমজলে গোসল ক'রে উঠতেই তন্দ্রায় চোখ দুটি বুজে এসেছে। তারপর প্রচুর আহার এবং তদুপযুক্ত মদ্যপান করেছেন—দুটি অল্পবয়সী ছেলে দুদিক থেকে অঙ্গমার্জনা করছে—ফলে আরামে-আলস্যে তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয় ও চৈতন্য শিথিল হয়ে এলিয়ে পড়েছে—চোখ খুলে চাওয়াই যাচ্ছে না ভাল ক'রে। এ অবস্থায় বেহেস্তের হুরীও তাঁর কাছে তুচ্ছ, গৌণ।

মালতীর বুক কাঁপছিল বৈকি।

এখনই হয়ত বাহ্‌রামের সঙ্গে হবে মুখোমুখি—মিথ্যা ধরা পড়ে যাবে। তারপর শুরু হবে বিশ্রী জেরা আর জবাবদিহি। কী বলবে সে !

তারপর হয়ত এই ওপরওলার ভয়েই ঐ দুর্দান্ত রাক্ষসগুলো কিছু করে নি, কিন্তু ওপরওলা কি ছাড়বে ?

কিন্তু সেই পৈশাচিক কিছু ব্যবহারের বদলে এই রাজকীয় অভ্যর্থনা—স্নানের জল, সুস্বাদু সুমিষ্ট ফল এবং চারপাইয়ের ওপরে একটি প্রস্তুত শয্যা পেয়ে সে চমকে উঠল।

আবারও সে গুরুজী আর কেশবজীকে ধন্যবাদ দিলে।

আশ্বস্তও হ'ল একটু মনে মনে।

বার বার এই দারুণ বিপদে রক্ষা পাচ্ছে যখন, তখন শেষ পর্যন্তও হয়ত পাবে।

সে অনেকদিন পরে আরাম ক'রে স্নান করল। পোশাকটা বদলাতে পারলে ভাল হ'ত, ভৈরোদাসের পিঠের ঝোলাতে আছেও একপ্রস্থ, কিন্তু ওদের কাছে এটুকু অনুরোধ জানাতেও ওর ইচ্ছা হ'ল না—সুতরাং সেই পুরাতন ধূলিধূসরিত পোশাকটাই ঝেড়েঝুড়ে একটু পরল আবার এবং পেটপুরে আহার ক'রে টান মেরে বিছানাটা নামিয়ে ফেলে দিয়ে শুধু খাটিয়ার ওপরই শুয়ে পড়ল।

সম্ভবত ঐ দানবগুলোরই কারুর ব্যবহৃত শয্যা—ওতে শুতে ইচ্ছা হ'ল না।

যে বনের মধ্যে বসে রাত কাটিয়েছে—কঠিন কাঁকরের ওপর শুয়েছে—তার কাছে এই খাটিয়াই যথেষ্ট আরামদায়ক।

আরামেই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল সে—নিশ্চিন্ত হয়ে।

এটুকু সে বুঝেছে যে এদের ওপরওলার ভারী কড়া শাসন, তাঁর কাছে যখন খবর পৌঁচেছে তখন তিনি ছাড়া আর কারও অধিকার নেই তাকে কোনরকম বেইজ্জৎ করার।

পরের দিন সকালে নাস্তা করার পর মালতীকে তলব করলেন কুৎবুউদ্দীন সাহেব।

প্রথমটা অত কিছু ভাবেন নি। দুঃসাহসী মেয়ে, হুঁশিয়ার হয়ে জেরা করতে হবে এইটুকুই ধরে নিয়েছিলেন।

কিন্তু বন্দিনীকে দেখে চমকে উঠলেন তিনি।

স্নান আহার ও সুনিদ্রার পর পরিচ্ছন্ন মালতী তার সেই ধূলিধূসরিত সামান্য বেশেই অসামান্য হয়ে উঠেছে।

বন্দিনী যে শুধু অসম-সাহসিনী নয়, অসাধারণ রূপসীও—এটা কুৎবু আন্দাজ করতে পারেন নি।

কিছুক্ষণ শুধু চেয়েই রইলেন তিনি অবাক হয়ে।

চোখে পলক পড়ল না, নিঃশ্বাস পর্যন্ত রুদ্ধ হয়ে রইল অনেকক্ষণ।

বাহ্বা বা! এ মেয়ে যাকে ভালবাসবে তার নসীব ভাল সন্দেহ নেই।

কিন্তু ঐ মালিক বাহ্রামটা—মেয়েদের মতো যে নুয়েই আছে অহরহ, কথায় কথায় যার চোখে জল এসে যায়?

ছোঃ!

বড় অপাত্রে দিল্ দিয়েছ পিয়ারী—বড় অপাত্রে!

তোমার উচিত কোন দুঃসাহসী বীর, জোয়ান মরদকে দিল্ দেওয়া—দিগ্বিজয়ী কোন যোদ্ধাকে। তবেই ঠিক জোড় মিলবে।

আছে—হাতের কাছেই আছেও তো।

তিনিই তো আছেন।

সামান্য ক্রীতদাস থেকে দিগ্বিজয়ী সুলতানের বিশ্বস্ত সেনানায়ক হয়েছেন।

উমীদ আছে, একদিন কোন তখ্‌তেও বসবেন।

বসবেনই। রাজত্ব করার জন্যই খোদা তাঁকে পাঠিয়েছেন এ দুনিয়ায়—অপরের তাঁবেদারী করার জন্য নয়। এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিত।

কিন্তু—

না, এ মেয়ে যতই ভাল হোক, যতই তাঁর পাঠান রক্তে আগুন লাগাক, এ মেয়েকে সম্ভোগ করা চলবে না।

খবরদার! তাঁর স্বাভাবিক প্রবৃত্তির রাশ তিনি ছেড়ে দেন নি কখনও। বাসনা কামনা তাঁর প্রভু নয়—তিনিই ওদের প্রভু।

আর সে তুচ্ছ প্রবৃত্তির রাশ আল্‌গা দেন নি বলেই ক্রীতদাস থেকে আজ সেনাপতি হ'তে পেরেছেন।

তিনিই একদিন পা টিপতেন অপরের, আজ অপরে তাঁর পা টিপছে।

তিনি জানেন কোনখানে ইচ্ছাকে দমন করতে হয়, কঠোর হাতে রাশ টেনে ধরতে হয় চিত্তবৃত্তির।

এই মেয়েটিকে দেখামাত্র তাঁর দেহের রক্ত উত্তাল হয়ে উঠেছে, বহুদিনের ক্ষুধা জেগেছে স্নায়ুতে স্নায়ুতে—সহস্র রসনা বিস্তার ক'রে।

পাঠানের রক্তই শুধু নয়—তাতারের রক্তও আছে তাঁর ধমনীতে।

তাঁর ক্রীতদাসী মা জনৈক তাতার মনিবের সন্তানই গর্ভে ধারণ করেছিলেন।

তবু—

তিনি জানেন, সম্ভোগ যে কোন রকমেরই হোক না কেন—তার আনন্দ ক্ষণিকের। জিন্দিগীর দাম তার চেয়ে বেশী।

তাঁর দেহেই শুধু শক্তি নেই, মাথাতেও বুদ্ধি আছে। তিনি এই পশুগুলোর মতো দেহসর্বস্ব নন।

এবং চিরকাল বুদ্ধির দ্বারাই চালিত তিনি।

সেই বুদ্ধি তাঁর কানে কানে বলছে, সম্ভোগ ক'রো না একে—কাজে লাগাও। এই দুষ্প্রাপ্য ফুলটি কলঙ্কিত না ক'রে অম্লান অবস্থায় রাজার কাছে, মালিকের কাছে ভেট পাঠাও—আখেরে এ স্বার্থত্যাগ অনেক কাজের দেখবে।

সুদূর কল্পনায় মালিকের সেই প্রসন্ন দৃষ্টির আভাস পেয়ে প্রাণপণ চেষ্টায় আত্মসম্বরণ করলেন কুৎবুউদ্দীন।

ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে যথাসাধ্য কঠোর করলেন তাঁর দৃষ্টি, তারপর প্রশ্ন করলেন, এসব কি শুনছি, তুমি ঐ বেইমান অমানুষ মালিক বাহ্‌রামের জন্যে তোমার বাপ-মা সংসার দেশভুঁই ত্যাগ ক'রে বেরিয়ে এসেছ!'

'জী।' নতমুখে কিন্তু দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দেয় মালতী।

'তুমি এই আজগুবি কিস্‌সা আমাকে বিশ্বাস করতে বল?'

'সে আপনার মর্জি আর গরজ। আমি তো আপনাকে একথা বিশ্বাস করতে বলি নি। তাতে আমারই বা কি লাভ!'

কোথা থেকে এই দুর্দান্ত সাহস লাভ করে মালতী, কে এই কথাগুলো যুগিয়ে দেয় তা সে নিজেই ভেবে পায় না।

চমকে ওঠেন কুৎবও।

আবারও চমকে ওঠেন তিনি।

অবাক হয়ে যান।

এ রকম উত্তরের জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না।

বেশ একটু সময় লাগল তাঁর নিজেকে সামলে নিতে।

তারপর বললেন, 'কিন্তু তুমি আমার ফৌজী নওজোয়ানদের কাছে এ কথা বলেছ কেন?'

'ওরা জিজ্ঞাসা করেছিল তাই বলেছি। যা সত্য তাই বলেছি। অকারণ মিথ্যাই বা বলব কেন? মিথ্যা বলার রেওয়াজও আমাদের এ মুলুকে নেই। তাছাড়া—আপনাদের হাতে যখন পড়েছি, মরতে তো হবেই—যদি মরার আগে আমার মনের মানুষকে একবার দেখতে পাই, এই আশায় বলেছি।'

'দ্যাখো যত সহজে আমার এ মাথা-মোটা সিপাহীগুলোকে ভুলিয়েছ, তত সহজে আমাকে ভোলাতে পারবে না। তোমার মতলব কী বল দিকি। সাফ্ সাফ্ জবাব দাও। তুমি মহা শয়তানী—তা আমি এক লহমাতেই বুঝেছি।'

মালতী অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে চুপ ক'রে রইল, কোন জবাব দিল না।

'কী, তোমার এত বড় হিকমৎ? আমার কথার জবাব দাও না তুমি?'

কণ্ঠস্বরে যেন মেঘ গর্জন ক'রে উঠল।

কী ক'রে ধমক দিতে হয়, গলার আওয়াজে অপরের বুকের মধ্যে কাঁপুনি লাগাতে হয়, সে ইলম্ আছে বৈকি তাঁর—নইলে এদেরই তলোয়ারের জোরে উঁচু হয়ে থেকে এদের শাসন করতে পারতেন না—এই অর্ধ-বর্বরগুলোকে।

কিন্তু মালতী তখন মরীয়া, সেও দুচোখে আগুন জেলে সোজা তাকাল কুৎবের দিকে। বলল, 'আমার যা বলবার বলেছি—তারপর আপনার যা ভাববার আপনি ভাবুন! আমার একটা মতলব আছে এটা যখন বুঝতে পারছেন, তখন মতলবটাও নিজের মগজে খুঁজে পাবেন হয় তো! কিন্তু আমি আপনাকে খুশী করবার জন্য ঝুট বলতে পারব না। ভগবানের কাছে বেইমান হ'তে পারব না।'

এবার সত্যি সত্যিই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন কুৎব্।

দুই চোখে তাঁরও আগুন জ্বলল।

শুভ্র সুগৌর ললাটে সেই আগুনের বর্ণ-রেখাই বুঝি ছড়িয়ে পড়ল রক্তিমাভায়।

এতগুলি অনুচরের সামনে এই অপমান যদি তিনি সহ্য করেন, এই ধৃষ্ট জবাবের উপযুক্ত জবাব যদি না দিতে পারেন তো এদের শাসনে রাখবেন কেমন ক'রে?

তিনি ভয়ঙ্কর কণ্ঠে বললেন, 'আচ্ছা সাচ্-ঝুট এখনই পরখ করছি! যদি সাচ্ বলে থাকো তো অল্পে রেহাই পাবে, আর যদি ঝুট্ বলে থাকো তো

এখনই জ্যান্ত তোমাকে কুকুর দিয়ে খাওয়াব—আর তার আগে সকলের সামনে মেথর দিয়ে তোমাকে বেইজ্জৎ করাব! এই—কে আছ—ঘিয়াস্ যাও তো, এখনই সেই কুত্তাকে বাচ্ছা সেই মালিক বাহ্‌রামকে নিয়ে এসো।···উঃ, নাম রেখেছে আবার মালিক! মালিকই বটে—বান্দার বান্দা!'

মালিক বাহ্‌রাম এলে কী সুবিধা হবে তা বোধ করি কুৎবও ভেবে দেখেন নি অত।

কী করবেন আসলে তা-ই ভেবে পান নি তিনি, অত তাড়াতাড়িতে।

শুধু এইটে মনে ছিল তাঁর যে এখনই কিছু-একটা করা দরকার, নইলে তাঁর এই গোলামদের কাছে তাঁর মর্যাদা থাকে না। এখনই সকলের চোখে কৌতুক ফুটে উঠেছে—আর একটু পরেই মুখে হাত আড়াল দিয়ে হাসবে ওরা।

এতটুকু একফোঁটা একটা মেয়ের কাছে নাকাল হয়ে যদি তিনি হার মানেন, তাহ'লে ওরা যে মহা আস্পর্ধা পেয়ে যাবে—আর কি কেউ মানবে তাঁকে?

একটু সময় চাই তাঁর, কী করবেন ভেবে দেখার।

কেমন ক'রে মুখের মতো জবাব দেবেন এই ধৃষ্ট মেয়েটাকে।

প্রমাণ ক'রে দেবেন যে সত্যিই কোন গূঢ় মতলব আছে ওর।

আর সে মতলব সকলের আগে উনিই আন্দাজ করতে পেরেছেন—সকলকে বোকা বানালেও ওঁকে বানাতে পারেনি ও।

এটা যদি না করতে পারেন, ওর ঐ একরত্তি অথচ উদ্ধত কাঁচা মাথাটাকে যদি হেঁট করিয়ে দিতে না পারেন, তাহ'লে আর রক্ষা নেই।

ভয়ের, সম্ভ্রমের একটা আবরণ তৈরী ক'রে তার আড়ালে আছেন ব'লেই ওরা তাঁকে মাথায় ক'রে রেখেছে, সে অদৃশ্য সূক্ষ্ম জাল যদি ছিঁড়ে যায়—এক নিমেষে তিনি যে ওদের সমান হয়ে যাবেন!

তারপর আর তাঁর শাসন মানবে কেন ওরা?

সুতরাং ভেবে নিতে হবে কিছু একটা, অত্যন্ত দ্রুত ভাবতে হবে।

সেই সময়টুকু চাই।

সেই জন্যই বাহ্‌রামকে আনতে পাঠালেন তিনি, আর তাঁর জীবনের সত্যকার ইষ্ট বুদ্ধিদেবীকে ডাকতে লাগলেন প্রাণপণে, কিছু একটা উপায় বাতলে দেবার জন্য।···

বাহ্‌রামকে ডেকে কী সুবিধে হবে ওঁর, মালতীও তা বুঝতে পারে নি।

কিন্তু তবু তার সত্যিই ভয় ধরেছিল এবার।

এতক্ষণ ধরে তো বিরাট একটা ধাপ্পা চালিয়ে এসেছিল—নিরাপদেই।

কিন্তু এবার?

শেষরক্ষা কি হবে?

মালতীকে হয়ত চিনতেই পারবে না মালিক বাহ্‌রাম!

মালতী ওকে দেখেছে বহুবারই, কিন্তু গুরুজনদের শাসনের ভয়ে বিধর্মী তরুণ পুরুষের সামনে গিয়ে আলাপ করতে সাহস করে নি।

দূর থেকে হয়ত ওকে দেখেছে বাহ্‌রামও।

বিশাখাদের বাড়িতে যাতায়াতের পথে।

কিন্তু তাতে ওকে চিনে রেখেছে বলে তো মনে হয় না।

নাম ধাম পরিচয় কিছুই তো জানে না সে।

যদি অস্বীকার করে?

যদি মালতীর দিক থেকে কোন ইঙ্গিত করার সুযোগ মেলবার আগেই সে কোন উল্টো উত্তর দিয়ে বসে?

অবশ্য লাভ নেই তার এটা ঠিকই।

মালতীর উপকার হবে জানলে হয়ত মিথ্যাও বলবে সে—কিন্তু সেইটে জানানো যায় কী ক'রে?

নিশ্চয়ই এই নিদারুণ শোকে দুঃখে সে ম্রিয়মাণ হয়ে আছে, হয়ত ওর দিকে চাইবেই না। তার আগেই বলে বসবে, 'কই আমি তো ওকে চিনি না! কখনও পরিচয় হয় নি তো!'

অত মাথাও ঘামাবে না সে যে এর মধ্যে মালতীর কোন অভিপ্রায় থাকতে পারে—এই মিথ্যাভাষণের মধ্যে।

সে এমনই সরল আর উদাসীন যে, মালতী কেন এমন ক'রে দুঃসাহসের বশে বেরিয়ে এল বাড়িঘর ছেড়ে, তাও ভেবে দেখবার চেষ্টা করবে না।

ওঃ, শুধু যদি একবার চোখে চোখ মেলাবার অবকাশ পায় সে!

কোন রকমে এক লহমার জন্যও!

গুরুজী আর ঠাকুর কেশবজী এতটা অনুগ্রহ করলেন—এটুকু কি করবেন না?

তার এই বিব্রত এবং বিপন্ন অবস্থা আর কেউ লক্ষ্য না করলেও একজন করেছিলেন।

কুৎবের তীক্ষ্ণ-সন্ধানী চোখে কিছুই এড়ায় নি।

তার সেই মুখের ঈষৎ বিবর্ণতা, সুডোল ললাটের প্রান্তে ছড়িয়ে-পড়া চূর্ণ কুন্তলগুলিকে অবলম্বন ক'রে ফুটে ওঠা স্বেদকণার আভাস—কিছুই না।

সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন তিনি।

সোজা হয়ে উঠে বসে তাঁর শ্মশ্রুতে হাত বুলিয়েছিলেন একবার।

তাহ'লে ঠিক পথই ধরেছেন তিনি—ঠিক রাস্তায় চলেছেন!

এইবার শয়তানীকে দেখে নেবেন তিনি।

ওর এই গুস্তাকীকে কী ক'রে শায়েস্তা করতে হয়—তাও দেখিয়ে দেবেন।

না হয় এ পূজা সুলতানের কাছে পৌঁছবেই না শেষ পর্যন্ত।

সুলতান বহুদূরে আছেন।

তাঁর প্রসন্নতার চেয়ে এদের সম্ভ্রমের দাম আপাতত অনেক বেশী।

এরা দাপটে থাকলে তবে তাঁর চোখে থাকবেন কুৎব্।

যে বাঁদীকে সুলতান চোখে দেখেন নি, তার জন্য এমন কিছু আকুল হয়ে

উঠবেন না। যদি-বা কথাটা কানে যায়ও।

এমন তাঁর অনেক আছে।

তাছাড়া একটা ভালরকম জবাবদিহি তৈরী করাও বিশেষ কিছু কঠিন হবে না।

আপাতত এর ঐ উদ্ধত মাথাটাকে মাটিতে নামিয়ে দেওয়াই হ'ল প্রধান কাজ।

তিনি উৎসুক হয়ে তাঁর দরবারী তাঁবুর প্রবেশপথের দিকে চেয়ে রইলেন।

অবশ্য বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'ল না কাউকেই।

একটা তাঁবু থেকে আর একটা তাঁবু—কতটুকুই বা।

একটু পরেই মালিক বাহ্‌রামকে ঘিরে নিয়ে প্রবেশ করল তিন-চারজন প্রহরী।

ছিন্ন মলিন বেশ, রুক্ষ ধূলিধূসর মূর্তি।

কী চেহারাই না হয়েছে বেচারার!

সেদিকে চেয়ে চোখে জল এসে গেল মালতীর।

সেইদিন থেকেই হয়ত স্নান হয় নি, পোশাক বদলানোর কথা তো ওঠেই না!

খাচ্ছেও না হয়ত কিছু—অথবা খেতে পাচ্ছে না। নইলে অমন কঙ্কাল-সার হয়ে উঠবে কেন এই কদিনে!

কোমল ভঙ্গুর মন ওর মেয়েদের মতো—তা সূর্যপ্রসাদের মুখে অনেক-বারই শুনেছে মালতী। বিশাখাও কত হাসাহাসি করেছে তাই নিয়ে।

ওর পক্ষে সেদিনের সেই পৈশাচিক কাণ্ডকারখানা দেখার পর কোন খাদ্য মুখে তোলা কঠিন বৈকি।

বাষ্পাচ্ছন্ন চোখে চেয়েই রইল মালতী—যদি একবার মুখ তুলে বাহ্‌রাম ওর দিকে তাকায় এই ভরসায়, কিন্তু যেমন মাথা হেঁট ক'রে তাঁবুতে ঢুকেছিল সে—তেমনিই রইল, একবারও মাথা তুলল না।

সমস্ত প্রাণশক্তিই নিঃশেষিত হয়ে গেছে বেচারীর—প্রাণটা যে কেন এখনও আছে এইটেই আশ্চর্য।

বৃথাই এরা ওর হাতে দড়ি বেঁধে রেখেছে—আর ঘিরে রয়েছে প্রাণপণে।

একেবারে ছেড়ে দিলেও ও পালাত না—পালাতে পারত না।

নিজের আসন্ন সর্বনাশের দুশ্চিন্তার মধ্যেও মালতীর অন্তর ওর জন্যই যেন হাহাকার ক'রে উঠল।

আর তার সেই ক্ষণিক চিত্তবৈকল্যের মধ্যে শুনল, মেঘগর্জনের মতো ভয়ংকর শব্দে কি প্রশ্ন করলেন কুৎবু। তার ভাষা বুঝল না মালতী কিন্তু অর্থটা অনুমান করতে পারল।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই বিদ্যুৎশিহরনের মতো বুদ্ধিটা খেলে গেল মাথায়।

কিছুমাত্র প্রস্তুত ছিল না তার মনে, একটু আগেও অন্ধকারে দিশা খুঁজে

বেড়াচ্ছিল তার বিপন্ন হরিণী-মন। যেন চতুর্দিকে শিকারীর মধ্যে ছটফট করছিল একটু পথের জন্য।

সেই পথ এখন আপনিই অবারিত হয়ে গেল চোখের সামনে।

বাঁচবার হয়ত উপায় আর নেই-ই, তবু চেষ্টা ক'রে দেখতে দোষ কি ?

যদি বাঁচে তো দুজনেই বাঁচতে পারে।

একেই হয়ত বলে জীবন নিয়ে জুয়া খেলা।

তা হোক, আর তো উপায়ও নেই।

তা ছাড়া—এ হয়ত দৈবনির্দেশই, বুঝি সত্যই ললিতাকেশব তার সহায়, নইলে কথাটা হঠাৎ এমনভাবে মাথাতে আসবেই বা কেন ?

সে আর ইতস্তত করল না।

বাহ্‌রাম মাথা তোলবার বা কোন জবার দেবার আগেই চিৎকার ক'রে বলে উঠল সে, 'এ কাকে এনেছ তোমরা ? এ তো মালিক বাহ্‌রাম নয় !'

॥ ২৬ ॥

সমস্ত দরবার ঘর যেন এক নিমেষে স্তব্ধ হয়ে গেল। পাথর হয়ে গেল উপস্থিত সবাই।

হাত-পা নাড়া তো দূরের কথা, নিশবাস পর্যন্ত পড়ল না কারুর বেশ কিছুক্ষণ।

মালিক বাহ্‌রাম নয় ? কী সর্বনাশ !

কী বলছে এ বাওরা মেয়েটা !

অনুচ্চারিত এই প্রশ্ন সকলের কণ্ঠে কণ্ঠে মাথা কুটে মরতে লাগল—তবু কেউ একটি শব্দও করতে পারল না।

প্রচণ্ড, অচিন্তিতপূর্ব বিস্ময়ের আঘাতে সকলের বাক্‌শক্তিও বুঝি চলে গিয়েছিল সেই কটি মুহূর্তের জন্য।

'মালিক বাহ্‌রাম নয় ? কী বলছ তুমি ছোরী—হুঁশিয়ারীসে বল।'

অবশেষে কুৎবুই উচ্চারণ করলেন, সেই সকলের মনের অনুচ্চারিত প্রশ্নটি।

'না, এ মালিক বাহ্‌রাম নয়। এ অন্য লোক। ঠকেছো তোমরা। ঠকিয়েছে তোমাদের। হায়, হায় ! কী মরীচিকার পেছনে ছুটে এসে আমি এমন সর্বনাশ করলুম !'

কিন্তু তার বিলাপোক্তির দিকে আদৌ কান ছিল না কুৎবের। একটু আগে যে মর্যাদার প্রশ্নটা বিরাট হয়ে দাঁড়িয়েছিল—'নিদ্রাভঙ্গে ক্ষণিকের বিস্মৃত স্বপনের' মতো তা-ও কোথায় মিলিয়ে গেল, সে জায়গায় মানসচক্ষুর সামনে ফুটে উঠল প্রভুর ক্রুর ক্রুদ্ধ মুখ।

সর্বনাশ !

এই উন্মাদ মেয়েটার কথা যদি সত্য হয়, তার যে সর্বনাশ হবে তার পরিমাণ যে ভাবাই যায় না !

এতদিন ধরে বসে আছেন তাঁরা নিশ্চিন্ত হয়ে—নিজেদের আখের গুছিয়ে নেবার তালে, সেকথা মালিকের কানে গেলে রক্ষা আছে? এতকালের এত বিশ্বস্ততার কিছুমাত্র মূল্য মিলবে না—বোধকরি সকলকেই জীয়ন্ত অবস্থায় কুকুর দিয়ে খাওয়াবেন, যে শাস্তি একটু আগে কুৎবউদ্দীন মেয়েটার জন্য নির্দিষ্ট করছিলেন।

এবার ললাটের প্রান্তে ঘাম দেখা দেবার পালা কুৎবের।

'কী বলছ তুমি!' আবারও অসহায় বিহ্বল প্রশ্ন করেন কুৎব্।

অকারণ প্রশ্ন।

তারপর হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন বাহ্‌রামের দিকে, 'এই বেইমান কুত্তা, মাথা উঁচু কর্, মুখ তুলে তাকা! কী বলছ এ মেয়েটা—তুই মালিক বাহ্‌রাম নোস্?'

মুখ তুলে তাকাল বাহ্‌রাম নিজে থেকেই।

তারও বিস্ময়ের সীমা ছিল না।

কে এ মেয়েটি? এমন অদ্ভুত কথা বলছে?

মনে হচ্ছে একে যেন কোথায় দেখেছে সে। হ্যাঁ, ওখানেই দেখেছে নিশ্চয়, বিশাখাদের বাড়িতে, কিংবা আসা-যাওয়ার পথে বেড়াতে বেরোবার সময়।

কিন্তু ওর তো জানা উচিত যে সে-ই মালিক বাহ্‌রাম।

তবে এমন কথা বলছে কেন ও?

ও এখানে এলই বা কি ক'রে?

এরা ধরে এনেছে?

তবে কি সারা গ্রামটাই এরা ধ্বংস করেছে? এদের হাত থেকে কি তাহ'লে কেউ রক্ষা পায় নি?

তার জন্যই কি এদের সকলের সর্বনাশ হ'ল?

এমনি এলোমেলো অসংলগ্ন প্রশ্ন ওর মনে দেখা দিতে লাগল। ওর বিহ্বল দৃষ্টি আরও বিহ্বল হয়ে উঠল।

'বল, জবাব দাও। নইলে—কোড়ার চোটে জবাব কী ক'রে আদায় করতে হয় তা আমি জানি।'

আবারও গর্জন ক'রে উঠলেন কুৎবউদ্দীন।

বাহ্‌রাম শিউরে উঠল আতঙ্কে।

যে কোন প্রকার শারীরিক নির্যাতনেই তার বড় ভয়।

চিরকালই এমনি ভয় তার।

প্রাণটা নেওয়া ঢের সহজ, সে একটা আঘাতের ওয়াস্তা।

কিন্তু বেঁচে থেকে আঘাতের পর আঘাত সহ্য করা—সে বড় কষ্টকর।

ভয়ে ভয়ে মুখ তুলে তাকাল বাহ্‌রাম।

ভয়েই গলা শুকিয়ে এসেছে তার। জিভ্ আড়ষ্ট হয়ে গেছে।

সে অসহায় ভাবে একবার চাইল চারদিকে।

মালতীর মুখের দিকেও চাইল।

কিন্তু কোথাও কোন সান্ত্বনা পেল না সে।

সবচেয়ে বিহ্বল হয়ে পড়েছে সে মালতীর ব্যাপারটাতেই।

কী কঠিন উগ্র দৃষ্টি তার, কী জ্বলন্ত দুই চোখ!

বাহ্‌রাম কী অপরাধ করল ওর কাছে?

অপরাধ হয়ত করতে পারে, হয়ত তার জন্যেই ওর এই দুর্দশা।—কিন্তু তাকে চিনতে পারছে না কেন?

আর—যদি ওর এই বিশ্বাসই হয়ে থাকে যে সে মালিক বাহ্‌রাম নয়—তবে কেন এই প্রচণ্ড বিদ্বেষ?

কুৎব্ বললেন, 'গোলাম হায়দার, কোড়া আন—বেশ শক্ত আর মজবুত কোড়া!'

এ কী করছে শহ্‌রাম? কী সব খাপছাড়া কথা ভাবছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই আসন্ন বিপদের সামনে?

সে কোনমতে জড়িয়ে জড়িয়ে বলে উঠল, 'আমি তো—আমি তো মালিক বাহ্‌রামই। এ মেয়ে কে—একে আমি চিনি না, কেন এমন মিথ্যা কথা বলছে তাও জানি না।'

'মিথ্যা কথা?' ক্রুদ্ধা সর্পিণীর মতো যেন হিস হিস ক'রে উঠল মালতী। 'মিথ্যা কথা বলছ তুমিই। কই, স্পষ্ট আমার দিকে চেয়ে বল দিকি—তুমি মালিক বাহ্‌রাম!'

মনের মধ্যে বল পেয়েছে মালতী, সে বুঝেছে যে সত্য কথাও জোর ক'রে বলবার মতো মনের জোর নেই বাহ্‌রামের।

সে যত জোর দেবে বাহ্‌রাম তত বিহ্বল হয়ে পড়বে—আর সেইখানেই পাবে সে সুবিধা।

ওর বিহ্বলতাকে মিথ্যার প্রকাশ বলে ধরে নেবে এরা।

মালিক বাহ্‌রাম আরও বিব্রত হয়ে পড়ল। আরও জড়িত কণ্ঠে বলল, 'তুমি কেন এমন কথা বলছ তা আমি জানি না—তুমি, তুমি তো আমাকে চেন—তবে কেন বলছ যে আমি মালিক বাহ্‌রাম নই!'

এবার যেন আহত ব্যাঘ্রীর মতো লাফিয়ে উঠল মালতী, গর্জন ক'রে উঠে বলল, 'তবে যে তুমি এই এক লহমা আগে বলছিলে তুমি আমাকে চেন না—কেন একথা বলছি তা জান না! আর এখন বলছ আমি তোমাকে চিনি!'

ওর যে এতদূর অভিনয় করার শক্তি আছে, এত জোর দিয়ে এমন নির্জলা মিথ্যা বলতে পারে, তা কি মালতীই জানত?

হে ঈশ্বর, হে কেশবজী—আর একটু, আর একটু এমনি বুদ্ধি, এমনি সাহস দাও।

পিছন থেকে কুৎবউদ্দীন অদ্ভুত একটা শব্দ ক'রে উঠলেন।

কোন শব্দ উচ্চারিত হ'ল না—কিন্তু তাঁর মনের অবস্থাটা পরিষ্কার বোঝা গেল সে শব্দে।

ক্রোধ, ক্ষোভ, আতঙ্ক—আর সর্বোপরি একটা পৈশাচিক হিংস্রতা প্রকাশ

পেল সেই অদ্ভুত একটা আওয়াজে।

ক্ষেপে উঠেছেন তিনি। ক্ষিপ্ত সিংহের মতো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছেন।

কিন্তু সেই দুঃসহ ক্রোধ কোথাও কোন অনিষ্ট করার আগেই আবার চেঁচিয়ে উঠল মালতী।

'হ্যাঁ, চিনেছি তোমায়। এবার চিনতে পেরেছি। তুমি মালিক বাহ্‌রামের সেই দুধ-ভাই। আমাদের আশেপাশে কোথায় যেন লুকিয়ে ছিলে। নিশীথ রাত্রে দেখা করতে আসতে। বিশাখার মুখে শুনেছি সব কথা। একদিন মাত্র দেখেছিলাম তোমাকে—তাই চিনতে এত দেরি হচ্ছিল।'

দুধ-ভাই!

মালিক বাহ্‌রামের দুধ-ভাই!

কুৎব্‌ এই মেয়েটার সব ধৃষ্টতা ভুলে গিয়ে ওকেই প্রশ্ন করলেন, 'তাই যদি হবে তবে ওকে নিয়ে পালাচ্ছিল কেন ওরা? ওকে বাঁচানোর কী এত গরজ?'

'আশ্চর্য!' কণ্ঠে অবজ্ঞা আর অনুকম্পা একসঙ্গেই ঝরে পড়ে মালতীর, 'এই বুদ্ধি নিয়ে আপনারা কী ক'রে লড়াই করেন তা ভেবে পাই না! আসলে আপনাদেয় চোখে ধোঁকা দেবার জন্যই এত ষড়যন্ত্র। এ লোকটা মরতে এসেছে ওর মালিকের ছেলেকে বাঁচাবার জন্যে, নিজে প্রাণ দিয়ে মনিবের নিমকের দাম দেবার জন্যে। সোজাসুজি একে ধরিয়ে দিলে আপনারা সন্দেহ করতেন, জেরা করতেন, হয়ত কিছুটা খোঁজখবরও করতেন—তাই এমন ভাবে ঘটনাটা সাজানো হয়েছিল যেন সত্যিকারের মালিক বাহ্‌রামকেই সরাচ্ছে।...আমাকেও বলে নি ওরা—বিশাখা আর সূর্যপ্রসাদ। বেশ হয়েছে ওরা মরেছে। এই ক'রে ভেবেছিল বাহ্‌রামের ভালাবাসা কেড়ে নেবে আমার কাছ থেকে! মুখপুড়ী সর্বনাশী!'

অভিনয় নিখুঁত। আর তার সঙ্গে বাহ্‌রামের বিস্ময়ব্যাকুলতা মিশে সত্য সত্যই সত্য হয়ে উঠেছে মিথ্যাটা।

ভোলবারই কথা। কুৎব্‌ও ভুলেছেন।

কিন্তু তবু সম্পূর্ণ বুদ্ধিনাশ ঘটে নি তখনও।

যুক্তি একেবারে পরিত্যাগ করে নি তাঁকে।

তিনি বললেন, 'সবটা অভিনয় হ'তে পারে—আমাদের ঠকানোর আয়োজন হ'তে পারে—কিন্তু শুনেছি সেই বৃন্দাপ্রসাদ লোকটা তার নিজের ছেলেমেয়েকে কেটে ফেলেছিল রাগে—সেটাও কি মিথ্যা? ওরা কি আমার কাছে এসে মিথ্যা বলেছে—বিজয়দেবের লোকেরা? তুমি বলতে চাও, সেটাও অভিনয়? কিন্তু অভিনয় নিখুঁত করার জন্যে কেউ নিজের ছেলেমেয়েকে মেরে ফেলে না! বল এর কী জবাব?'

'না, সেটা অভিনয় নয়। আর বিজয়দেবের লোকেরাও আপনাকে মিথ্যা বলে নি।'

'তবে কী সেটা?'

এবার কুৎব্‌ও যেন একটু বিহ্বল হয়ে পড়েন।

কী বলতে চায় এ মেয়েটা ? কোন্ দিকে নিয়ে যাচ্ছে তাঁদের ?

এই একরত্তি বাচ্চা মেয়ে তাঁদের সব কজনকে বাঁদর-নাচ নাচাচ্ছে নাকি ?

ক্ষণিক অন্যমনস্কতার মধ্যেই কানে গেল মালতী বলছে, 'বৃন্দাপ্রসাদের প্রচণ্ড বিদ্বেষ ছিল বাহ্‌রামের ওপর। সে বাইরের ঐ ঘরটাতে বাসা নেবার পর একবারও বৃন্দাপ্রসাদ যান নি ওদিক। ওদিকে তাকাতেন না পর্যন্ত। কখনই ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখেন নি বাহ্‌রামের দিকে। তাই তিনি ওকে চিনতেও পারেন নি। এই নকল লোকটাকেই ভেবেছেন আসল বাহ্‌রাম। কাউকেই তো বলে নি তারা—সূর্যপ্রসাদরা, তিনি আর কী ক'রে জানবেন ? তাছাড়া তিনি তো ওদের কোন কথা বুঝিয়ে বলার, কি কোন কৈফিয়ৎ দেবার অবসর দেন নি, তারা ব্যাপারটা কি বোঝবার আগেই তলোয়ার দিয়ে কেটে ফেলেছেন। সেই জন্যেই জুচ্চুরিটুকু ধরা পড়ে নি—তাদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।'

এর পর আর অবিশ্বাস করা সম্ভব নয়। কুৎবও পারলেন না অবিশ্বাস করতে।

দুরন্ত ক্রোধে ও বিপুল দুশ্চিন্তায় তাঁর মুখে ক্রমান্বয়ে লাল-কালোর খেলা চলতে লাগল।

মনের সেই দুঃসহ ও দুই বিপরীতমুখী আবেগ দমন করতে কিছু সময়ও লাগল।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন তিনি।

চুপ ক'রে থাকতে বাধ্য হলেন।

মনে হচ্ছে ঐ বেইমান কুত্তার বাচ্চা—ঐ ছেলেটাকে আর এই সর্বনাশী মেয়েটাকে নিজের হাতে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলেন !

হিংস্র আরণ্য জন্তুর মতো ওদের উষ্ণ রক্ত পান করতে ইচ্ছা করছে তাঁর !

এমন কি ওদের ঐ নরম মাংসে দাঁত বসিয়ে খানিকটা কেটে নিয়ে ওদের চোখের সামনে চিবোতে পারলে হয়ত তাঁর এখনকার এই ক্ষিপ্ত হিংস্রতা, এই জিঘাংসা কিছুটা প্রশমিত হয়।

কিন্তু না, এখন তুচ্ছ হৃদয়াবেগকে প্রশ্রয় দিলে চলবে না। মনের তৃপ্তি-সাধনের চেয়ে যথার্থ ইষ্টসাধনই সর্বথা শ্রেয়—এ তিনি জানেন।

মনের চেয়ে মাথা ঢের বড়।

দাসত্ব যদি করতে হয় তো মাথারই করবেন—মনের নয়।

সবই জানেন—তবু বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল মনকে দমন করতে।

আস্তে আস্তে শান্ত ক'রে আনলেন মনের সহজ হিংস্রতা, শান্ত করলেন মুখভাব।

তারপর সেই স্থির শান্ত দৃষ্টি মালতীর মুখের ওপর নিবদ্ধ ক'রে বললেন, 'তোমার সঙ্গে যদি কিছু লোক দিই, তুমি সেই গ্রামে ফিরে গিয়ে বাহ্‌রামকে খুঁজে বার ক'রে ধরিয়ে দিতে পারবে ?'

'আমি !' যেন শিউরে উঠে দু-পা পিছিয়ে গেল মালতী, 'আমি ধরিয়ে

দেব বাহ্রামকে আপনাদের হাতে? কী ক'রে আশা করেন এটা।'

'দিতেই হবে। তা যদি দিতে পার তো তোমাকে ছাড়ব, নইলে তোমার রক্ষা নেই।'

কঠিন কণ্ঠে বলেন কুৎব্।

সে কণ্ঠ জঙ্গী নওজোয়ানদের প্রাণে ত্রাসে সঞ্চার করলেও মালতীর বুক একটুও কাঁপল না। সে অবজ্ঞার সুরে বলল, 'না-ই বা রইল রক্ষা! আমি যে নিজেকে বাঁচাবার জন্য এত ব্যস্ত তাই বা কে বলল আপনাদের? আপনি কি আশা করেন নিজের এই তুচ্ছ প্রাণটা বাঁচাবার জন্য আমার ভালবাসার লোকের সর্বনাশ করব? কোন মেয়ে করে?'

এবার সাংঘাতিক রকমের একটা ক্রূর হাসি ফুটে উঠল কুৎবের মুখে।

সে হাসির অর্থ বুঝতে কিছুমাত্র ভুল হবার কথা নয়।

একটিই মাত্র অর্থ হয় সে হাসির যে মৃত্যুটাই সব সময় মানুষের কাছে চরম বিপদ নয়।

মুখেও বললেন সেই কথাই, 'কিন্তু তুমি শুধু মৃত্যুর কথাই ভাবছ কেন? সেটা যে তুচ্ছ তা আমিও জানি। তাই সেক্ষেত্রে—যদি আমাদের কথা না শোন তো—বরং সাবধানে বাঁচিয়েই রাখব তোমাকে, যাতে প্রতিদিন তিলে তিলে দৈহিক মৃত্যুর চেয়ে বেশী মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করতে পার, যাতে মৃত্যু দেবার জন্যেই মাথা কোট তোমার খুদার কাছে। দ্যাখো—ভেবে দ্যাখো। বাহ্রামকে আমরা ধরবই, তুমি সাহায্য না করলেও ধরতে পারব শেষ পর্যন্ত ঠিকই, হয়ত কিছু দেরি হবে। কিন্তু তুমি যদি সাহায্য করো তো তুমি লাভবান হবে অনেক বেশী!'

এবার যেন একটু ভয় পেল মালতী, যেন বুঝল যে এযাত্রা এদের হাত থেকে তার পরিত্রাণ নেই—এদের কথা না শুনলে।

মাথাটা নীচু হয়ে গেল একটু একটু ক'রে, স্তব্ধ হয়ে গেল সে একেবারে।

এবারে কিছুটা তৃপ্ত হলেন কুৎব্।

পেরেছেন তিনি—হেঁট করিয়ে দিতে পেরেছেন ঐ মেয়েটার উদ্ধত দুর্বিনীত মাথা!

একটু সময় দিলেন তিনি।

পাকা খেলোয়াড়ের মতোই অপেক্ষা ক'রে রইলেন। মাছ বঁড়শী গিললে সুতোয় ঢিল দিয়ে খেলাতে হয়। একবার যখন বঁড়শী বিঁধেছে গলায়—তখন আর ছাড়াতে পাববে না।

খানিকক্ষণ তিনিও চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'কী করবে মনটা স্থির ক'রে ফ্যালো। সময় বড় কম আমাদের হাতে, এখনই রওনা হ'তে হবে।'

এবার মাথা তুলল মালতী। তবে সে গর্বোদ্ধত দৃপ্ত ভাব আর নেই তার—তা কুৎব্ লক্ষ্য ক'রে আরও খুশী হলেন।

ধমক-খাওয়া আদুরে শিশুর মতোই মুখ ক'রে মালতী বলল, 'কিন্তু সে কোথায় আছে কেমন ক'রে জানব আমি? যদি খুঁজে না পাই? এতদিন কী

আর সে চুপ ক'রে বসে আছে? নিশ্চয়ই পালাবার চেষ্টা করেছে সে ওখান থেকে!'

'তা আমিও জানি। সেই জন্যেই তো তোমাকে পাঠাচ্ছি ওদের সঙ্গে—যাতে অকারণ আমার লোকরা না হয়রান হয়। সে কোথায় গেছে কী ভাবে পালিয়েছে তা তোমার গ্রামের কেউ না কেউ নিশ্চয়ই জানে—আর সেটা তাদের কাছ থেকে বার করা তোমার পক্ষে খুব কঠিন হবে না। তোমার বাবা মা আছেন নিশ্চয়ই, তাঁরাই সাহায্য করতে পারবেন তোমাকে। তোমার এতবড় বিপদ দেখেও কিছু চুপ ক'রে থাকতে পারবেন না। একজন বিধর্মীর জন্য দুটো প্রাণ এর মধ্যেই গেছে—আরও যাতে না যায়, সেজন্য তাঁরা চেষ্টা করবেন নিশ্চয়ই।'

আবারও একটা বিচিত্র হাসি ফুটে ওঠে কুৎবের মুখে।

ক্রুর এবং কুটিল। তার সঙ্গে ধূর্ততা মাখা।

মালতী অবনত মুখে যেন আরও খানিকক্ষণ ভেবে দেখল কথাটা। তারপর হঠাৎ আবার মুখ তুলে বলল, 'ঐ লোকটাকে বলুন, ও যদি সঙ্গে যায় আর আমাকে সাহায্য করতে রাজী থাকে তো আমি চেষ্টা ক'রে দেখতে পারি।'

'তার মানে? ওকে আবার তোমার কী দরকার? নতুন কোন শয়তানী খেলতে চাও বুঝি?'

'এর মানে যদি না বুঝতে পেরে থাকেন তো বাহ্‌রামকে খুঁজে বার করবার দুঃসাহস আর করবেন না। এ কোন্‌খানে কোন্‌ গ্রামে কার বাড়ি লুকিয়েছিল তা আমরা জানি না—কেউই হয়ত জানে না, তাই বাহ্‌রামের পক্ষে এর জায়গায় সেইখানে লুকিয়ে থাকাই স্বাভাবিক। এ যদি সেই জায়গাটা দেখিয়ে দেয় তো অনেকটা কাজ হাল্‌কা হয়ে আসবে।'

তা বটে।

আশ্চর্য এ মেয়ে! মনে মনে তারিফ না ক'রে পারেন না কুৎব্‌। যা সব যুক্তি দেয় তা একেবারে অকাট্য, জবাব দেবার কিছু থাকে না।

না, এ মেয়েকে তিনি ছাড়তে পারবেন না—একে তাঁর চাই-ই।

কাজ উদ্ধার হোক আগে, তারপর একটা ছুতো ক'রে কথা ফিরিয়ে নেওয়া এমন কিছু কঠিন হবে না।

সে তিনি পারবেন খুব সহজেই।

তাই বলে সুলতানের কাছেও পাঠাবেন না তিনি।

এ মাল নিজের কাছে নিজস্ব ক'রে রাখতে না পারলে সুখ নেই।

মন নাকি বাতাসের চেয়েও দ্রুতগামী—এই চিন্তাগুলো মনে খেলে যেতে এক লহমাও সময় লাগল না।

মালতীর কথার উত্তর দিলেন তিনি সঙ্গে সঙ্গেই।

অবজ্ঞার সুরে বললেন, 'ওকে দিয়ে যা খুশী তাই করাতে পারব। এমনি না করে, দু'চার ঘা কোড়া পিঠে পড়লেই করবে। এই বেইমান, শুনলি এর কথা?'

খুব নির্বোধ লোকও বহুক্ষণ ধরে হাতড়াতে হাতড়াতে একসময় হঠাৎ এক একটা কথার গূঢ়ার্থ ধরে ফেলে।

বাহ্‌রাম সে রকম নির্বোধ নয়। সে শান্তি ও আরামপ্রিয় ভালমানুষ লোক। আবেগপ্রবণ কোমল মন তার। তাই সে বিহ্বল হয়ে পড়লেও একেবারে বুদ্ধি হারায় নি।

মালতীর এতগুলো মিথ্যা কথার মূলে যে কোন সূক্ষ্ম অভিসন্ধি আছে—হয়ত বা ওকে মুক্ত করারই অভিসন্ধি সেটা—তা এতক্ষণে একটু একটু ক'রে বাহ্‌রামের মাথায় গেছে।

তবু মুখ তুলে কথা কইতে সাহস হ'ল না তার।

মালতীর চোখের দিকে তাকাতে তো নয়ই। সে ঘাড় নেড়ে শুধু জানাল যে সে সবই শুনেছে।

'তোর সেই আস্তানা একে দেখিয়ে দিবি ভালমানুষের মতো। যদি না দিস—সঙ্গে কোড়া থাকবে।'

মাথা হেঁট ক'রেই আবারও সম্মতি জানাল বাহ্‌রাম নীরবে।

দেখাই যাক না এই রহস্যময়ী কোন্ দিকে নিয়ে যায় তাকে! কোন্ কূলে ভেড়ায় তার এই ফুটো প্রায়-ডোবা জীবনতরীটা!

কে জানে কী ওর মতলব। কেন এমন ক'রে অম্লানবদনে ঝুড়ি ঝুড়ি মিছে কথা বলে গেল?

কিন্তু মতলব যাই থাক, তার আর ক্ষতিবৃদ্ধি কি!

ওর কথাই বিশ্বাস করেছে এরা। সুতরাং এখন সত্য কথা বললেও বিপদ। সেইটেই কেউ বিশ্বাস করবে না। কোড়া খেতেই হবে হয়ত শেষ পর্যন্ত—মিথ্যা তো একসময় ধরা পড়বেই—কিন্তু এখন না বললে এখনই সেটা পিঠে এসে পড়বে।

প্রাণের মায়া আর নেই তার, এখনই মরতে পারে সে অনায়াসে।

কিন্তু ঐ বর্বরদের হাতে মার খাওয়া!

কোড়ার গাঁটগুলো কেটে কেটে বসে চামড়ায়।

চামড়া ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছোটে।

তাতে দেয় নুন।

কোড়া খেতে অনেককেই দেখেছে সে।

না না, তাতে দরকার নেই।

তা ছাড়া সে জানে না এর কী মতলব। যদি ওকে মুক্ত করাই মতলব হয়—আর সেটা শেষ পর্যন্ত হয়েই যায় তো—হয়ত আর কখনই কোড়া খেতে হবে না!

এই কথাগুলো ভাবতে ভাবতেই শুনল কুৎব্ আদেশ করছেন, 'তোমরা কুড়িজন সওয়ার যাবে এদের সঙ্গে। আগে পিছে তোমরা থাকবে—মাঝখানে এদের রাখবে। এদের বাঁধবার দরকার নেই, কোন বদমাসী করার চেষ্টা যদি দ্যাখো তো বাঁধবে। শুধু এদের ঘোড়ার লাগাম থাকবে তোমাদের কারুর হাতে।

চারদণ্ড সময় দিলুম তোমাদের, তার মধ্যে তোমরা কিছু খেয়ে, এদের খাইয়ে তৈরী হয়ে নেবে। তোমাদের ঘোড়াকে দানাপানি খাইয়ে কিছু রসদ দিয়ে ঠিক ক'রে রাখা হবে ততক্ষণে। সে অপরে করবে—তোমাদের সেজন্যে সময় নষ্ট করতে হবে না। গোলাম হায়দার তুমি যাবে—আর উনিশ জন লোক তুমি বেছে নাও। আজ যে দল এসে পেঁছিল তারা থাকবে আমার কাছে। আরও সবাই আসুক, আমিও এগোব ঐদিকে। যদি তেমন বোঝ কাউকে পাঠিয়ে দিও, আরও লোক দিতে পারব।'

'যো হুকুম!'

গোলাম হায়দার অভিবাদন ক'রে বেরিয়ে যাচ্ছিল, কী ভেবে ইঙ্গিতে নিরস্ত করলেন কুৎব্।

'হ্যাঁ শোন, ওদের গ্রাম—মানে যেখানে বাহ্‌রাম ছিল, এই মেয়েটা যেখানে থাকে—আগে সেখানটা ঘুরে যেও, কে জানে ওখানে আমরা খোঁজ করব না ভেবে যদি ওখানেই থাকে!'

হে ঈশ্বর, হে কেশব, তাহ'লে তুমি সত্যিই মালতীর সহায় আছ?

জয় গুরুজী!

ওদের গ্রাম! হায় রে, যদি জানত এই বর্বর জন্তুটা, ওদের গ্রামের কী অবস্থা এখন!···

এত উদ্বেগের মধ্যেও চকিতে একটু হাসি ফুটে উঠে মিলিয়ে গেল মালতীর মুখে।

॥ ২৭ ॥

তিনদিন ক্রমাগত চলে তৃতীয় দিনের সন্ধ্যাবেলা—অথবা বলা যায় সন্ধ্যার কিছু আগে—ওরা লালত্যকেশো গ্রামের প্রান্তে এসে পেঁছিল।

পথশ্রম ও অশ্বারোহণে অনভ্যস্ত মালতীর খুব কষ্ট হয়েছিল, কারণ তার আগেও কদিন ক্রমাগত ঘোড়ায় চড়ে চলতে হয়েছে তাকে। তার কোমর-পিঠ ফেটে যাচ্ছিল যন্ত্রণায়, আশঙ্কা হচ্ছিল যে এর থেকে হয়ত অপর কোন সাংঘাতিক রোগ জন্মে যাবে শরীরে, কিন্তু তবু গর্বিনী তার কষ্টের কথা কাউকে বলে নি। প্রাণপণে দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করেছে সব। বলা মানেই তো একরকম এদের অনুগ্রহ প্রার্থনা করা।

ছিঃ!

প্রাণ তো এমনিই যাবে, না গেলেও স্বেচ্ছায়ই দেবে সে—কারণ সূর্য-প্রসাদকে হারিয়ে তার এ জীবনের কোন মূল্য নেই। তাছাড়া বাগ্‌দত্তা মানে অর্ধ-বিবাহিতা—এ কথা কতদিন মা-র মুখে শুনেছে সে।

সুতরাং ধর্মত সে এখন বিধবা।

এই বয়স থেকে দীর্ঘকাল—হয়ত দীর্ঘজীবনই নির্দিষ্ট করেছেন বিধাতা তার জন্য—বৈধব্য ভোগ করা!

না, সে সম্ভব নয়।

প্রাণই যখন সে রাখবে না—এই দেহকে ত্যাগ করবে স্বেচ্ছায় জীর্ণ গাত্র-বস্ত্রের মতো—তখন এ দেহের একটু কষ্ট হ'লেই বা কি!

এই দেহটাই সব নয়।

সম্মান তার থেকে অনেক বড়।

সে সম্মান খোয়াতে রাজী নয় সে—ওদের কাছে একটু বিশ্রাম চেয়ে।

ওদের জানিয়ে দিয়ে যে সে ওদের মতো কষ্ট সহ্য করতে পারে না; বাইরে যতই দর্প দেখাক—ভেতরে ভেতরে সে সাধারণ সুকুমার নারী মাত্র।

তাই সে জোর ক'রেই ওদের সঙ্গে সমানে তাল রেখে চলেছে।

শুধু যখন খুব অসহ্য হয়েছে এক-একবার, কষ্টে চোখে জল এসে গেছে, তখন ওদের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে প্রাণপণে সে উদ্গত অশ্রু দমন করেছে এবং মনে মনে ঈশ্বরকে ডেকেছে, 'হে কেশব! হে কেশব!'

বাল্যকাল থেকে, জ্ঞান হওয়ার পর থেকে ঈশ্বরের ঐ একটি রূপ দেখতেই সে অভ্যস্ত—ঐ একটি নামই তার জ্ঞাত।

তবে অবশ্য রাত্রিগুলো পেয়েছে সে।

রাত্রে ওরা চলত না, কোথাও না কোথাও তাঁবু ফেলে বিশ্রাম করত।

একেবারে শেষরাত্রে উঠে মশালের আলোয় প্রস্তুত হয়ে আকাশে ঊষার আভাস লাগামাত্র যাত্রা শুরু করত। আবার সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে যাত্রা বন্ধ হ'ত।

রাত্রিগুলোতে পেয়েছে পরিপূর্ণ বিশ্রাম।

নিশ্চিন্ত হয়েই ঘুমিয়েছে সে।

কুড়িটি ক্ষুধার্ত দানবের দ্বারা পরিবৃত থেকেও কিছুমাত্র ভয় করে নি তার।

কারণ তীক্ষ্ন বুদ্ধিশালিনী মালতী লক্ষ্য করেছিল, কুৎবের চোখে ঐকান্তিক এবং তীব্র লালসা।

এটাও সে লক্ষ্য করেছিল যে সে লালসা সম্বন্ধে তার অনুচররাও সচেতন।

সুতরাং এখন আর এরা কেউ তাকে স্পর্শ করতে বা তার কোন ক্ষতি করতে সাহস করবে না।

যা কিছু বোঝাপড়া হবে—যদি তার দুর্ভাগ্যবশতঃ তার দুঃসাহসের সেই শোচনীয় পরিণামই হয়—সে হবে ঐ নেতার সঙ্গেই।

আর সেক্ষেত্রে কী করবে তা মালতীর জানাই আছে।

মধুর রভসরঙ্গে যখন সকল সতর্কতা শিথিল হয়ে আসবে—অথবা নিজের সকাম আলিঙ্গনের মধ্যে পেয়ে উন্মত্ত জন্তুটা যখন উন্মত্ততর হয়ে উঠবে—তখন আর কিছু না হোক, তার এই মজবুত তীক্ষ্ন দাঁতগুলো তো থাকবে! চুম্বন-ছলে ওর ঐ খাঁড়ার মতো নাকটা তো দাঁতে কেটে নিতে পারবে!

তারপর?

ওকে মারবে? অশেষ যন্ত্রণা দিয়ে শেষ অবধি বধ করবে?

কর্ক। মরতেই তো চায় সে।

আর যন্ত্রণা?

সব যন্ত্রণাই সহ্য করা যায়, যদি এটা জানা থাকে যে এর শেষে আছে মধুর শ্রান্তিহরা, সুপ্তিভরা মৃত্যু!

কথাটা চিন্তা করতে করতে কঠিন একটা হাসি ফুটে উঠল মালতীর বুকে।

না, অত কিছু করতে হবে না। সে জানে এযাত্রায় কেশবজী তার সহায়।

এই যাত্রার মধ্যে, এদের ক্ষণিক অন্যমনস্কতা বা পরস্পরের সঙ্গে গল্প-গুজবের ফাঁকে ফাঁকে একটা কাজ সে সেরে নিতে পেরেছিল।

তাদের গ্রামের অবস্থা, কেন কিসের উদ্দেশ্যে সে এমন ক'রে দিওয়ানার মতো ঘর ছেড়ে বেরিয়েছে—সেটা জানিয়ে দিতে পেরেছিল মালিক বাহ্‌রামকে।

ওদের যে খাস দেহাতী বুলি—গ্রাম্য ভাষা, তা বাহ্‌রাম কতকটা শিখেছিল বিশাখা-সূর্যর সঙ্গে কথা বলতে বলতে।

এরা তাতে অভ্যস্ত নয়।

এদেশী ভাষা কেউ কেউ শিখেছে বটে, তবে সে মোটামুটি।

যে দেশে এক এক ক্রোশ তফাতে তফাতে শব্দের উচ্চারণ এবং কথার টান পাল্‌টায় সে দেশের কোন এক বিশেষ গ্রামের টান বোঝা সাধ্য নয়।

মালতী তাদের গ্রাম্য বুলিতেই কথা বলেছিল।

বলেছিল অবশ্য খুব সতর্ক হয়েই। এক সময় দুটো একটার বেশী বলবার চেষ্টা করে নি।

তাও সিপাহীদের কথাবার্তা বা গল্পগুজব যখন ঘন হয়ে আসত, কিংবা কেউ কেউ গলা ছেড়ে গান ধরত—তখনই।

তবুও এক আধবার হঠাৎ ধরা পড়ে গিয়েছে বৈকি।

দলের নায়ক গোলাম হায়দার থাকত ওদের পিছনে।

পিছন থেকেই দৃষ্টি রাখা বেশী সহজ বলে।

সে-ই ধরে ফেলেছিল একবার।

কর্কশকণ্ঠে বলে উঠেছিল, 'খবরদার! খুব সাবধান! কী গুজগুজ করছ তোমরা, য়্যাঁ? বলি শলা-পরামর্শটা কিসের?'

একটু থমকে পিছিয়ে এসে গোলাম হায়দারের চোখের ওপর চোখ রেখে ইঙ্গিত ক'রে চাপা গলায় মালতী বলেছিল, 'ওর সঙ্গে কথা কয়ে ওকে বুঝিয়ে আমি ভেতরের কথাটাই টেনে বার করার চেষ্টা করছি সাহেব। এখন গোল ক'রো না, তাহ'লে ভয় পেয়ে যাবে।'

'হুঁ। তা বলছে কিছু।'

'এত সহজে বলে? যে অপরের জান বাঁচাবার জন্যে নিজের জান দিতে আসে—সে কী এত সোজা লোক? ওকে দেখতেই অমনি নরম কিন্তু যেখানে, ইমানের কথা—মনিবের নিমকের কথা, সেখানে ও খুব শক্ত! আর সেকথা

তোমাদের আর বোঝাব কি, তোমরা ইমানদার লোক—এর মর্ম তোমরাই তো ভাল বোঝ!'

এত বুদ্ধি এত কথা কে তার কণ্ঠে এমন ক'রে যুগিয়ে যাচ্ছে তা মালতী নিজেই ভেবে পায় না।

ইমানের কথাটায় কেমন যেন অপ্রতিভ হয়ে তখনকার মতো চুপ ক'রে গিয়েছিল গোলাম হায়দার।

শুধু একটা ঘোঁৎ-ঘোঁৎ মতো শব্দ করেছিল শুধু। সেটা মালতীর প্রতি আস্থা বা সন্দেহ-সূচক শব্দ—তখন বোঝা যায় নি।

বোঝা গিয়েছিল আর খানিক পরে।

ওদের আর একবার কথাবার্তার সূত্রপাতে সন্দিগ্ধ কণ্ঠে গোলাম হায়দার বলেছিল, 'তা যা কথা কইবে, সাফ সাফ বলো না! ওসব জংলী দেহাতী বুলিতে বলছ কেন? আমরা বুঝতে পারছি না—তাতে সন্দেহ হচ্ছে যে আমাদের বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র করছ!'

আবারও গলা নিচু ক'রে জবাব দিয়েছে, মালতী, 'তোমরা বুঝতে পারছ একথা জনেতে পারলে আর মুখই খুলবে না। এমনি হয়তো আমার অনুনয় বিনয়ে কিছু বলতে পারে—কিংবা কথার ফাঁকে দু'একটা কথা টেনে বার করতে পারি. কিন্তু তোমরা শুনছ জানলে একেবারে কুলুপ এঁটে মুখ বন্ধ করবে, শামুকের মতো গুটিয়ে যাবে। যে রোগের যা মন্তর—তোমরা এত বুদ্ধি ধরো আর এই সহজ কথাটা বুঝতে পারছ না?'

তা বটে।

এরপর কিছু বলতে যাওয়া মানে নিজের বুদ্ধিকেই অপমানিত করা।

সুতরাং চুপ ক'রে যেতে হয়েছিল গোলাম হায়দারকে।

মালতীরও আর বিশেষ বাধা হয় নি—যদিও সে তার পরও সতর্কতার ত্রুটি করে নি।

আগুনের সঙ্গে পাপের সঙ্গে সাবধানে খেলতে হয়, বেশী ঘাঁটাতে নেই—তা সে জানে।

অবশ্য বলাও সব হয়ে গিয়েছিল।

সব শুনে দুচোখ ভরে জল এসেছিল মালিক বাহ্‌রামের।

অতি কষ্টে কোনমতে সে অশ্রু আড়াল ক'রে রেখেছিল মালতী এদের চোখ থেকে। নইলে আরও কৈফিয়ৎ দিতে হ'ত, আরও মিথ্যার জাল বুনতে হ'ত।

হায় হায় করেছিল বাহ্‌রাম।

'আমার জন্যই এই সর্বনাশটা হ'ল। আমিই অভিশাপ হয়ে উঠলুম তোমাদের।···তোমরা অসময়ে আশ্রয় দিয়েছিলে, আমার প্রাণদান দিয়েছিলে, তার খুব প্রতিদানই দিলুম। ইস—এতগুলো প্রাণ! এতগুলো শিশুর প্রাণ! ···বা'জান বা'জান, কেন আমাকে তখন তোমার সঙ্গে মরতে দাও নি! তোমারও কোন কাজে এলুম না, মিছিমিছি এতগুলো সৎ সরল লোকের কী

সর্বনাশই না করলুম।'

কণ্ঠস্বর খুবই নিচু পর্দায় ছিল, তবু এই বিলাপোক্তি এদের কারুর কারুর কানে পৌঁচেছিল।

'কী বলছে ও জানোয়ারটা? মেয়েদের মতো নাকে কাঁদছে কেন?'

'শেষ পর্যন্ত ওর দুধভাইকে বাঁচাতে পারল না—শুধু তাই নয়, তার সঙ্গে নিমকহারামীও করতে হ'ল—এই দুঃখেই কাঁদছে!'

কৈফিয়ৎ দিয়েছিল মালতী।

আর ধমক দিয়েছিল বাহ্‌রামকে।

'এমনি ক'রে মেয়েদের মতো হায়-হায় করবে আর কাঁদবে বলেই কি তোমার কাছে ছুটে এলুম? বিশাখা তোমার জন্য প্রাণ দিল—তুমি কিছুই করতে পারবে না তার হত্যার প্রতিশোধ নিতে?'

চোখের জল ছেঁড়া ময়লা জামার হাতায় মুছে ফেলেছিল বাহ্‌রাম সঙ্গে সঙ্গে।

ঘোড়ার ওপর সোজা হয়ে বসেছিল সে।

কণ্ঠস্বরে—তার পক্ষে অভাবনীয়—দৃঢ়তা এনে বলেছিল, 'হ্যাঁ, করব। শোধ নেব মালতী। তুমি নিশ্চিন্ত থেকো, আমার যথাসাধ্য আমি করব। আমি ভীরু দুর্বল—হয়ত কাপুরুষও। কিন্তু বিশাখা, বেচারী বিশাখার হত্যার প্রতিশোধ নিতে যা কিছু করতে হয় আমি করব। তুমি দেখে নিও—এর নড়চড় হবে না, খুদা জামিন!'

মালতীর মুখে হাসি ফুটেছিল, পরিচ্ছন্ন তৃপ্তির হাসি—অনেকদিন পরে।

॥ ২৮ ॥

লাল্‌তা-কেশো গ্রামের প্রান্তে যখন ওরা পৌঁছল তখন সন্ধ্যা হয়-হয়।

দূর থেকে গ্রাম দেখিয়ে দিয়েছিল মালতী, এদিকের পাহাড়ে নেমেই।

দারুণ উৎসাহে এটুকু পথ প্রায় ছুটে এসেছে ওরা।

কিন্তু গ্রামে ঢোকবার মুখে সেই সব উৎসাহ সহসা নষ্ট হয়ে গেল।

যেন একটি উজ্জ্বল-হয়ে-ওঠা দীপশিখা এক ফুঁয়ে নিভিয়ে দিল কে।

এই গ্রাম?

গ্রাম তো নিশ্চয়ই।

ঘরবাড়ি যখন এতগুলো দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু এ কী গ্রাম?

শান্ত নিস্তব্ধ অন্ধকার। জনবসতির চিহ্ন পর্যন্ত শূন্য।

একটু ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে না কোথাও। জ্বলছে না কোথাও একটা আলো।

একটা কুকুরও ডেকে উঠল না—এতগুলো ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ পাওয়া সত্ত্বেও।

প্রাণহীন মৃত্যুপুরী।

তবে কি এ গ্রামে শুধু অশরীরী প্রেতরাই থাকে?

জেনেশুনে মারবার জন্যই এই প্রেতপুরীতে টেনে এনেছে মেয়েটা ?

আতঙ্কে, সন্দেহে, বিস্ময়ে—অভূতপূর্ব এই অভিজ্ঞতায় সকলে যেন ক্ষণকালের জন্য পাথর হয়ে উঠল।

এমন কি ঘোড়াগুলোও নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল—শব্দ করল না, কিংবা চাঞ্চল্য প্রকাশ করল না কোন প্রকার।

স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল মালতীও।

কিন্তু সে ভয়ে নয়, বিস্ময়ে নয়—আবেগে।

তার চিরপরিচিত পল্লী, তার জন্মস্থান।

আজন্ম শুধু এই গ্রামটির সঙ্গেই পরিচয় তার।

এর বাইরে একটা জগৎ আছে জানত, কিন্তু সে জগতে কোনদিন পা দেবার দরকার হয় নি—প্রয়োজন হয় নি তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখবার।

তার দেহ এই গ্রামের জলহাওয়াতেই একটু একটু ক'রে পুষ্ট হয়ে উঠেছে। তার কৈশোর পদ্মটি একটি একটি ক'রে দল মেলে বিকশিত হয়েছে এখানেই।

এইখানেই তার প্রাণ, তার সমস্ত সত্তা—জীবনের অর্থ খুঁজে পেয়েছে একদা।

তার প্রাণের আরাম, তার আত্মার আনন্দ—তার সুর্যপ্রসাদকে পেয়েছে।

এইখানকার মাঠে প্রান্তরে নদীতীরে তার সঙ্গে খেলাধুলো ক'রে বেড়িয়েছে আশৈশব।

তারপর একদিন এইখানকার বসন্ত-বাতাসেই মুকুলিত হয়েছে তাদের দুটি আত্মার প্রণয়কোরক।

একদিন এইখানেই শুনেছে যে তাদের শৈশবের খেলা পরিণতি লাভ করবে যৌবনের লীলায়।

জীবনলীলারও সঙ্গী হবে তারা পরস্পরের।

সেই দিনটি থেকে—বহুদিন পর্যন্ত—দিনের পর দিন রাতের পর রাত —সুমধুর স্বপ্ন-কল্পনার জাল বুনেছে এইখানে বসেই।

এখানকার ফুলের গন্ধে, পাখীর গানে, হিল্লোলিত শষ্যশীর্ষের বিচিত্র নর্তনে তার প্রাণের সুরও নিজের ছন্দ খুঁজে পেয়েছে—তার জীবনের স্বপ্ন পেয়েছে সার্থকতা।

তারপর একদিন এই মাটিতেই এক নিষ্ঠুর দানবীয় আঘাতে সে স্বপ্ন ভেঙ্গে খান খান হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে।

পরিসমাপ্তি ঘটেছে তার জীবনের সকল সফল সম্ভাবনার।

সব সুখ-সৌভাগ্যের অর্থ মূল্যহীন হয়ে পড়েছে।

সব প্রয়োজনও বুঝি গেছে ফুরিয়ে।

চোখ মেলে দেখেছিল এই গ্রাম হাসিতে আনন্দে, নাচে গানে, উৎসবে পূজায় সমারোহে প্রাচুর্যে বিকশিত শতদলের মতো প্রাণ-সরোবরে টলটল করছে।

সেই গ্রামই পরিণত হ'তে দেখল সে শ্মশানে।

তার জন্মভূমি।

তার পিতামাতার—পিতামহ-পিতামহীরও জন্মভূমি। আজ কোলাহল-হীন প্রাণস্পন্দনহীন মহা-স্তব্ধতায় পূর্ণ মহাশ্মশান।

বাষ্পাচ্ছন্ন চোখে সেদিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল তাই।

অকস্মাৎ সে স্তব্ধতা ভেঙ্গে অতি রূঢ় কর্কশ কণ্ঠ প্রশ্ন ক'রে উঠল, 'এ কী, এ কোথায় নিয়ে এলে আমাদের? আবার কী নতুন শয়তানি এ সব?'

গোলাম হায়দারেরই কণ্ঠ।

আতঙ্কের জড়তা কাটাতে অস্বাভাবিক জোর দিতে হয়েছে গলায়। তাতেই স্বভাব-কর্কশ কণ্ঠ কর্কশতর হয়ে উঠেছে।

কিন্তু এবার আর সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে পারল না মালতী।

কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে ঈষৎ রুদ্ধকণ্ঠে বলল, 'এই আমাদের গ্রাম, লালতা-কেশো। এইখানেই ছিল মালিক বাহ্‌রাম।'

'ঝুট্! আবার ঝুট্ বলছ তুমি!'

'সাচ। আমার ভগবানের দিব্যি। এই সেই গ্রাম।'

'কিন্তু এ গ্রামে লোক কোথায়? কোথাও তো জনবসতির চিহ্ন নেই। কোথায় গেল তোমার সব আত্মীয়স্বজন?

'কেমন ক'রে জানব? কিছুই বুঝতে পারছি না!'

'হুঁ—এ সব তোমার শয়তানি, চালাকি।'

'চালাকি ক'রে কতক্ষণ চালাব! একদিন তো ধরা পড়বেই। আমার সঙ্গে ভেতরে চলো—আমি প্রমাণ ক'রে দিচ্ছি।...আর ঐ দ্যাখো, আমাদের ভগবান ললিতাকেশবজীর মন্দির!'

নিচের দিকে অন্ধকার ঘনিয়ে এলেও মন্দিরের সু-উচ্চশীর্ষে সোনার চক্র তখনও দিনের আলোর আভায় ঝকমক করছে।

সকলেই দেখতে পেল তা একসঙ্গে।

মন্দির বলেও চিনতে পারবার কোন অসুবিধা নেই।

বিপন্ন গোলাম হায়দার নিজের শুকনো ঠোঁট দুটোয় একবার জিভ বুলিয়ে নিয়ে বাহ্‌রামকে প্রশ্ন করল, 'কেমন রে, এইখানে ছিল তোর দুধ-ভাই?'

মাথা হেলিয়ে বাহ্‌রাম জানাল, 'হ্যাঁ।'

'তা হ'লে গেল কোথায়—গ্রাম-কে-গ্রাম?'

চুপ ক'রে রইল দুজনেই।

'কী, কথা কইছ না কেন?'

'কী কথা কইব বলুন। আমি তো আজ সাত-আট দিন গ্রামছাড়া—কী হয়েছে কিছুই তো বুঝতে পারছি না।'

আর একটি সিপাহী—মুহম্মদ বিন্ বক্তিয়ার—গোলামের কাছে এসে বলল, 'আমি বুঝেছি গোলাম ভাই, পাছে ওদের চালাকি বা জুচ্চুরি ধরা পড়ে তাই বাহ্‌রামকে নিয়ে গ্রাম শূন্য ক'রে পালিয়েছে কোথাও।'

গোলাম হায়দার মালতীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'কেমন, এরা বলছে ঠিক?'

'তা হ'তে পারে। তাই হওয়াই সম্ভব।'

বক্তিয়ার আবারও বললে, 'এই কাফের মামদোগুলো বড় অদ্ভুত জীব। যাকে আশ্রয় দেবে একবার, তাকে বাঁচাবার জন্য না করতে পারে এমন কাজ নেই। সেদিনই গল্প শুনেছিলুম, এদের কে এক রাজা—অতিথি খেতে চেয়েছিল বলে নিজের ছেলেকে নিজের হাতে কেটে রান্না ক'রে খাইয়েছিল।'

'আঘ্।' বিচিত্র শব্দ ক'রে গোলাম হায়দার শিউরে উঠল কথাটা শুনে। তারপর একেবারে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'চল তাহ'লে অন্যত্র খোঁজ করা যাক। এ গ্রামে ঢুকে আর দরকার নেই।'

সর্বনাশ!

এবার সত্যসত্যই প্রমাদ গুনল মালতী!

তাহ'লে যে ওর এত আয়োজন সব পণ্ড হয়ে যায়।

এদের হাত থেকে অব্যাহতি পেতে গেলেও এ গ্রামে একবার ঢোকা দরকার।

তাছাড়া—তাছাড়া তার উদ্দেশ্য সফল করতে হ'লেও—

যে জন্য এত কাণ্ড তার—এত আয়োজন!

উন্মাদ বৃন্দাপ্রসাদ সম্ভবত আজও এ গ্রামেই আছে।

অন্তত গ্রামবাসীদের সঙ্গে যে সে যায় নি—সে বিষয়ে মালতী নিশ্চিত।

আর কেনই বা যাবে।

সে তো কিছু জানেই না।

গ্রাম যে জনশূন্য হয়ে গেছে, তাও হয়ত সে বুঝতে পারে নি।

আজও হয়ত কোন সেব্ গাছের তলায় বসে আপনমনে হাসছে, নয়ত এক শূন্য গৃহ থেকে আর এক শূন্য গৃহে ঘুরে বেড়াচ্ছে!

অবশ্য চলেও যেতে পারে কোথাও।

শেষ পর্যন্ত যদি সামান্য জ্ঞান এসে থাকে তো ওদের সন্ধানে বেরিয়ে পড়তে পারে।

কিন্তু সেটাও তো নিশ্চিতভাবে জানা দরকার।

আর তা জানতে গেলে এ গ্রামের মধ্যেটা একবার ঘুরে নেওয়া দরকার।

গুরুজীর বাড়ি, বাগান, মন্দির—আর, আর সেই' সাংঘাতিক নদীতীর।

সে অনেকের মুখেই শুনেছে যে বিষয়ীর আত্মা যেমন মৃত্যুর পরও নিজের ধনভাণ্ডারের বাইরে যেতে পারে না—তেমনি খুনীও হত্যাকাণ্ডের স্থান ত্যাগ করতে পারে না। ঘুরেফিরে সেইখানেই ফিরে আসে।

হয়ত সেইখানেই ঘুরছে বৃন্দাপ্রসাদ, কে জানে!

সুতরাং এখন যদি এ গ্রামে না ঢুকে অন্যত্র চলে যেতে হয়, তাহ'লে সব আশাই যে যায় নষ্ট হয়ে।...

অতিকষ্টে কণ্ঠের ব্যাকুলতা ও উদ্বেগ দমন করতে হয়।

ইতিমধ্যে গোলাম হায়দার এগিয়ে গেছে কয়েক পা। অপর সকলেও ফিরিয়েছে ঘোড়ার মুখ।

বাহ্রাম অসহায় ভাবে চেয়ে আছে তারই মুখের দিকে।

মালতী কোনমতে বলে ওঠে, 'কিন্তু সেটা কি ঠিক হবে? গ্রামটা ভাল ক'রে খ‍ুঁজে গেলে হ'ত না?'

'আর খ‍ুঁজে কী হবে? দেখছ না একটা জ্যান্ত কুকুর পর্যন্ত গ্রামে নেই!

'সেইটেই তো সন্দেহের কথা। এমন ক'রে তো গ্রাম শ‍ূন্য হ'তে পারে না। এত তাড়াতাড়ি সব মালপত্র নিয়ে গোর‍ুবাছ‍ুর ভেড়া নিয়ে কোথায় যাবে? অন্ততঃ দ‍ু'একটা জানোয়ারও তো ঘ‍ুরে বেড়াবে। আমার মনে হয় এটাই একটা ফাঁদ।'

মালতী মনে মনে জানে যে সাত আট দিন খেতে না পাওয়াতেই কুকুর-গ‍ুলো গ্রাম ত্যাগ করছে—নইলে এ নিস্তব্ধতার আর কোন কারণ নেই।

কিন্তু সে কথাটা এদের মনে করানো চলবে না।

এদের না স্বাভাবিক ভাবে মনে পড়ে সেই কথাটা—গ‍ুর‍ুজীর কাছে বরং সেই প্রার্থনাই জানাতে লাগল মালতী মনে মনে।

'ফাঁদ?' গোলাম হায়দার ভ্র‍ু কুঞ্চিত ক'রে প্রশ্ন করল, 'কিসের ফাঁদ? কি ফাঁদ?'

কিন্তু কথাটা যে মনে লেগেছে তার—তা ম‍ুখ দেখেই বোঝা গেল।

ততক্ষণে ঘোড়ার ম‍ুখও আবার ফিরিয়েছে সে।

'ফাঁদ না হ'লেও ফন্দী তো বটেই।'

'আরে ফন্দীটা কি তা-ই বল না!'

অসহিষ্ণ‍ু হয়ে ওঠে গোলাম হায়দার।

'কোথায় পালাবে ওরা বাহ্‌রামকে নিয়ে? একদিন না একদিন এই জালিয়াতি ধরা পড়বেই—এ ওরা জানে। তখন তোমরা আসল লোকের খোঁজ করতে আসবে এও স্বাভাবিক। কোথায় ওরা রাখবে বাহ্‌রামকে নিয়ে—যেখানেই যাবে সেখানে খ‍ুঁজে বার করবে তোমরা। তাই হয়ত তাকে এই গ্রামেই কোথাও রেখে সরে পড়েছে সবাই। হয়ত তাকে পাহারা দেবার জন্য দ‍ু-একজন শ‍ুধ‍ু আছে, নিঃশব্দে ঘাপটি মেরে। তারাই প্রাণধারণের মতো কিছ‍ু খানা যোগাচ্ছে। যে খানা আগ‍ুন জেবলে তৈরী করতে হয় না। বাকী সব এদিক-ওদিকে অন্য গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে। এ গ্রাম জনশ‍ূন্য শ্মশান হয়ে গেছে দেখলে নিশ্চয়ই তোমরা এখানে ঢ‍ুকবে না—খোঁজ করবে না, অন্য কোথাও চলে যাবে, বাহ্‌রাম—আমাদের অতিথি থাকবে নিরাপদ! এও তো একটা ফন্দী আঁটতে পারে সকলে!...সত্যিই তো—এই তো তোমরাও চলে যাচ্ছ, একবার নিজের চোখে না দেখেই!'

অকাট্য য‍ুক্তি। অস্বীকার করার উপায় নেই।

গোলাম হায়দার একটু যেন বিরক্ত হ'য়ে উঠল নিজের ওপরই।

কথাটা তারই মনে পড়া উচিত ছিল।

এমন ক'রে বার বার ঐ একফোঁটা মেয়ের কাছে হার মানাটা কিছ‍ু নয়।

সে ঈষৎ অপ্রতিভ ভাবে বললে, 'তা নয়, এখানে আসতুম ঠিকই। এদিক ওদিক ঘ‍ুরে দিনের বেলা ঢ‍ুকতুম। তা আজকের রাতটা না হয় এখানেই

তাঁবু ফেলা যাক্, কাল সকালে তখন—'

'কী বুদ্ধি, বাহ্‌বা বা! তোমাদের সেনাপতি এতগুলো ভেড়া না পাঠিয়ে একটা আওরৎ পাঠালেই ভাল করতেন!'

অপমানে অগ্নিবর্ণ হয়ে উঠল হায়দারের মুখ।

'সাবধান ছোকরী! মুখ সামলে কথা বলো।'

'তা নয় তো কী! এতগুলো লোক হুড়-দুড় ক'রে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে এলে—বাইশটা ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ তো কম নয়—সে শব্দ কি এতক্ষণ ওরা পায় নি বলতে চাও, মানে যদি সত্যিই কেউ গ্রামের মধ্যে থাকে? তোমরা সারারাত ধরে এখানে তাঁবু ফেলে খাবেদাবে ঘুমোবে আর ওরা তোমাদের হাতে ধরা দেবার জন্যে বসে থাকবে—না?'

'হুঁ!' গোলাম হায়দারের মুখ সংশয়ে কুটিল হয়ে ওঠে।

'এইটেই যে তোমাদের ফন্দী বা ফাঁদ নয়, কী ক'রে বুঝবে? সবাই যে ঘাপ্‌টি মেরে বসে নেই—আমরা ঢুকলেই চারদিক থেকে ঘিরে ধরবে না—তার প্রমাণ কি?'

সন্দিগ্ধ-কণ্ঠে জেরা করে সে।

'না, তার প্রমাণ কিছুই নেই। তবে মানুষকে অত বোকা না-ই বা ভাবলে!'

'তার মানে?'

'তারা কি জানে না যে তোমার মনিবের এই কুড়িজন লোকই সম্বল নয়, এদের মারলেই সব শক্তি শেষ হয়ে যাবে না? শুধু শুধু এই কুড়িজন লোককে মেরে বেশী বিপদ টেনে আনবে কেন মাথার ওপর? তার চেয়ে যদি নিঃশব্দে এড়িয়ে যেতে পারে সেই তো ভাল।...যাক্ গে— আমি আর অত বকতে পারি না। তোমার যা মর্জি তাই তুমি করো।'

'হুঁ!'

কথাগুলো খুবই খাঁটি, তবু যেন যেন গোলাম হায়দারের মনের সংশয় কাটতে চায় না।

হয়ত এই অন্ধকার নিস্তব্ধ গ্রামে ঢুকতে তার কেমন ভয়ই হচ্ছিল—সেই জন্যই এত যুক্তি, এত সংশয় তার।

সে একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, 'তা মালিক বাহ্‌রাম তোমার পেয়ারের লোক, তার জন্যেই তো তুমি বেঁহোশ দিওয়ানা হয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলে! এখন তাকে ধরিয়ে দেবার জন্যে এত ব্যগ্র হয়ে উঠেছ কেন? মতলবটা যেন তেমন ঠাওর পাচ্ছি না!'

উত্তর দিতে একটু সময় লাগে মালতীর।

উত্তর যখন দিল তখন তার গলায় আর আগেকার ব্যঙ্গ বিদ্রূপ অবজ্ঞা নেই।

গলা তার ভারী, আবেগরুদ্ধ হয়ে এসেছে।

অন্যদিকে চেয়ে—হয়ত বা চোখের জল গোপন করতেই—ধীরে ধীরে

বললে, 'তাকে তো তোমরা ধরবেই, সেই এতটুকু অসহায় তরুণের প্রাণ না নেওয়া পর্যন্ত যে তোমার দিগ্বিজয়ী মনিবের শান্তি হবে না, তা তো বুঝতেই পারছি। তাঁর সিংহাসনের ন্যায্য দাবীদারকে এ পৃথিবী থেকে সরাতে না পারলে তিনি স্বস্তি পাবেন না। আর তিনি যখন জিদ ধরেছেন তখন কেউই সে বেচারীকে বাঁচাতে পারবে না। মাঝখান থেকে আমার ইজ্জৎ যায় কেন! তাই আমার এ আগ্রহ। আমি মুক্তি চাই ইজ্জৎ বাঁচাবার জন্যে—জান বাঁচাবার জন্যে নয়। বাহ্‌রাম যদি যায় আমিও এ জান রাখব না, এটা জেনে রেখো।'

'তওবা তওবা! বিবি কী দেখেছ বল দিকি তার মধ্যে! এতটুকু একটা ছেলে—না তার কোন ক্ষমতা না তার একটু সাহস। শুনেছি মেয়েরও অধম সে। তার এই দুধভায়ের মতোই হবে হয়ত—আর তাই তো হওয়া উচিত, যে দুধের যা হিম্মৎ—তার জন্যে জান দেবে কেন? আমাদেব মুলুকে এমন ঢের মানুষ আছে—মানুষের মতো মানুষ তারা!'

মালতী কথা কইল না।

বোধ করি চরম অবহেলাভরেই চুপ ক'রে রইল।

গোলামও একটু বোকার মতো হেসে বললে, 'মরুক গে, আমার কী, যার যা পছন্দ।'

তারপর একটা ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলে—খুব সম্ভব গোপন চিত্তক্ষোভেরই দীর্ঘশ্বাস সেটা, এর দিকে হাত বাড়ানো চলবে না সেই জন্য চিত্তক্ষোভ—সঙ্গীদের দিকে ফিরে বললে, 'তাহ'লে ভাই সব, চল গ্রামে ঢুকে পড়া যাক। আল্লার নাম দিয়ে ঢুকি—তাঁর মর্জিতে যা আছে তাই হবে।'

আবারও তীব্র ব্যঙ্গ ছুঁচের মতো এসে বেঁধে হায়দারকে।

অতি তীক্ষ্ন কণ্ঠস্বর।

গলার আওয়াজ যে এমন বিঁধতে পারে মানুষকে, যুদ্ধ-ব্যবসায়ী স্থূল-বুদ্ধি গোলাম হায়দারের তা জানা ছিল না।

মালতী ছোট্ট একটি প্রশ্ন করল, 'সকলে মিলে, দল বেঁধে?'

ক্ষণেকের জন্য চোখ বুজে যেন আঘাতটা সামলে নিল হায়দার, তারপর একটু থতমত খেয়ে বলল, 'কেন, তাতে কী হয়েছে? দোষ কি?'

'না, দোষ কিছুই নেই। ভালই তো, তোমরা একদিক দিয়ে ঢুকবে—তারা আর দিক দিয়ে বেরিয়ে যাবে। কোন অসুবিধাই হবে না!'

থমকে দাঁড়িয়ে গেল হায়দার। বেকুফের মতো অসহায় ভাবে সঙ্গীদের মুখের দিকে চাইল।

ঠিক এই আঘাতটার জন্য প্রস্তুত ছিল না সে।

আজ তার নসীবটাই খারাপ পড়েছে।

যা করতে যাচ্ছে তাতেই ভুল খাচ্ছে এই খুদে ভীমরুলটার।

তাকে বাঁচিয়ে দিল বক্তিয়ার। বলল, 'এ ছোকরী ঠিকই বলেছে গোলাম ভাই। গ্রামে যদি সত্যিই মানুষ থাকে, আমাদের খবর তারা টের পেয়ে গেছে।

আমরা তাদের দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু তারা দেখছে। এভাবে গেলে হবে না, একেবারে চারদিক দিয়ে ঘিরতে হবে!'

'চারদিক দিয়ে ঘিরবে? একটা গ্রাম ঘিরবে এই কুড়িটা লোক?'

এতক্ষণে বুদ্ধিমানের মতো একটা কথা বলতে পেরে বেশ উৎফুল্ল হয়ে ওঠে গোলাম হায়দার।

'তার দরকার হবে না। গ্রামে ঢোকবার যা বেরোবার পথ বেশী নেই। ডান দিক দিয়ে ঘুরে যাও চারজন, একেবারে নদীর ধার পর্যন্ত চলে যাও, ওদিক দিয়ে না কেউ বেরোতে পারে। বাঁদিকে দু'দল যাও চার জন ক'রে—একদল ওদিক দিয়ে নদীর ধারে পড়, আর একদল মাঝখানে চওড়া রাস্তাটা পাবে, দেখবে সোজা ঐ দিকের পাহাড়টায় উঠে গেছে—সেই পথের মোড়ে দাঁড়িয়ে থাক। ঐ পথে না গেলে এই পথ—নয়তো নদী পার হ'তে হবে—আর কোন পথ নেই।'

'আর তোমরা? তোমরা এই তালে পালাবার পথ পরিষ্কার পেয়ে যাবে—না?'

গোলাম হায়দারের কণ্ঠে তীব্র শ্লেষ। কোথায় যেন একটু চাপা বিদ্বেষও ফোটে।

'আরে বোকারাম, বিশ থেকে বারো গেলে আট থাকে। আমরা দুজন তো তোমাদের সঙ্গেই থাকছি। আট জনে আমাদের পাহারা দিতে পারবে না?'

'বোকারাম' বিশেষণটা সামলাতে হয়ত সময় নিত, এবারও বক্তিয়ার সামলে নিল।

বলল, 'ঠিক আছে ঠিক আছে। ঠিকই বলেছে এ। তুমি এদের চোখে চোখে রাখ গোলাম ভাই, আগে পিছে ক'রে নাও চার চার জন। আমি যাচ্ছি নদীর দিকে, ওদিকে তোমরা দুদল বেরিয়ে পড়, আর দেরি ক'রে লাভ নেই। অন্ধকার হয়ে আসছে হু-হু ক'রে, একটু পরে আর নজর চলবে না। এসব কাজে মশাল জেলেও লাভ হয় না, মশালে বড় আলো-আধাঁরি হয়।'

সেই-মতোই ব্যবস্থা হয়ে গেল দ্রুত।

আর কথা বাড়াল না হায়দার।

যতই কথা বলছে সে ততই ঠকে যাচ্ছে। দরকার কি বার বার অপমান হয়ে?

কিন্তু অবাক হয়ে গেল মালিক বাহ্‌রাম।

মালতীর মতলবটা কিছুতেই সে ধরতে পারছে না কেন?

আঃ—এটুকু মেয়ের যা বুদ্ধি তার কণামাত্রও যদি তার থাকত!

ওর মতলবের যে তলই পাচ্ছে না সে।

এখানকার পথঘাট সবই সে জানে। মালতী তো নিখুঁত ভাবে, ওস্তাদ নেতার মতো নিজে থেকেই সন্ধান দিয়ে সে পথ আগলাবার ব্যবস্থা করছে—তবে ও পালাবে কেমন ক'রে?

কী ভাবছে ও, কী বুঝছে?

যদি কোন রকমে একটু ধরতে পারত বাহ্‌রাম !
অপরিসীম আত্মধিক্কার আকণ্ঠ ফেনিয়ে উঠতে লাগল তার।
ধিক্‌—তার পুরুষজন্মে ধিক, তার ধমনীর রাজরক্তে ধিক !
সত্যিই তার বাঁচা উচিত নয়।
তার বাঁচবার কোন অধিকার নেই।

॥ ২৯ ॥

তিন দল তিন দিকে চলে গেলে হায়দারের দল সাবধানে সামনে অগ্রসর হ'ল।

সংকীর্ণ পথ। দুদিকে নিবিড় বন।

চীরগাছ আর শালগাছই বেশী। ফলের গাছও আছে অনেক। সেব্‌ই অধিকাংশ।

এর মধ্য দিয়ে চারজন পাশাপাশি যাওয়া যায় না।

গোলাম হায়দার দুজনের পিছনে দু'জন—এইভাবে সাজাল তার লোক।

পর পর দুদল অর্থাৎ চারজন দিয়ে মাঝে দিল বাহ্‌রাম আর মালতীকে।

তার পিছনে আবারও দু দল, অর্থাৎ চারজন।

মালতীর ঠিক পিছনে রইল সে নিজে।

অর্থাৎ কোন রকম চালাকি করার না অবকাশ পায় মেয়েটা।

সে রকম দেখলে নারীবধেও ইতস্তত করবে না গোলাম হায়দার। উদ্যত বর্শা তো তার হাতেই রয়েছে !

ওপরওলাদের কাছে যা কৈফিয়ৎ দেবার তা সে দিতে পারবে।

বড় সাংঘাতিক মেয়ে।

সাক্ষাৎ সাপিনীর মতোই সাংঘাতিক।

খুব হুঁশিয়ার থাকা দরকার।···

সাবধানেই চলল গোলাম হায়দার।

খুব হুঁশিয়ারীর সঙ্গে—চারিদিকে চোখ রেখে রেখে।

কিন্তু এতক্ষণ ধরে কিংকর্তব্য আলোচনা ও কথা-কাটাকাটির মধ্যে দিনের শেষ চিহ্নটুকুও অন্তর্হিত হয়েছে চীরগাছের ডগা থেকে।

এখন শুধু সামান্য একটু আলোর আভাস লেগে আছে দূর পাহাড়ের মাথাগুলোয়।

চারিদিকের জঙ্গলে ঘন হয়ে এসেছে অন্ধকার।

ঝাপ্‌সা হয়ে যাচ্ছে দৃষ্টি ; সামান্য দূরেও নজর চলছে না।

ঐসব গাছের ফাঁকে কোন মানুষ লুকিয়ে আছে কিনা বোঝা কঠিন।

ভয়-ভয় করে ওদিকে চেয়ে, ছম-ছম করে গা।

মনে হয় এই নির্জন নিস্তব্ধ অন্ধকারে বুঝি অশরীরী কয়েকজোড়া চোখ তাদের লক্ষ্য করছে।

হয়তো ক্রুর শাণিত দৃষ্টি সে চোখে।

তবে সৌভাগ্যক্রমে একটু পরেই ওরা সেই ঘন বন কাটিয়ে একেবারে গ্রামের

মাঝে এসে পড়ল।

অপেক্ষাকৃত ফাঁকা জায়গা এটা।

অন্ধকারের রাজত্ব এখনও শুরু হয় নি এখানে।

বেশ ঘন বসতি, অনেকগুলো বাড়ি এক জায়গায়।

বাড়ি মানেই খানিকটা ক'রে বাগান।

গাছপালা এখানেও আছে, তবে নিরবচ্ছিন্ন নয়।

বাগানে শুধুই বড় গাছ থাকে না—ছোট বড় গাছ মিলিয়ে থাকে।

এখানে নিত্যপুজো করে সবাই, সুতরাং কিছু কিছু ফুলের গাছ আছে প্রত্যেক বাগানেই। আছে কিছু কিছু সব্‌জীর চাষ। শাকের ক্ষেত সর্ষের ক্ষেত এ তো আছেই।

সুতরাং ফাঁকাও আছে খানিকটা ক'রে।

আর ফাঁকা মানেই তো আলো।

এখানে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল হায়দার।

এতটা নিরাপদে আসতে পেরে বুঝি তার ভরসাও খানিকটা বেড়েছে।

সে ঈষৎ অসহিষ্ণুভাবে বলল, 'তারপর, কৈ কোথায় কে?'

'এখানে মানুষ বসে আছে জেনে তৈরী হয়ে বুঝি আমি এনেছি তোমাদের—শুধু দয়া ক'রে হাত বাড়িয়ে ধরবে বলে?'

ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে মালতী।

'কী বিপদ! তাই কি আমি বলেছি? এখন কী করতে চাও তাই বলো না ছাই!'

যেন মালতীই এ দলের অধিনেত্রী।

'আমি কেন করতে চাইব—করার কথা তো তোমারই। তুমিই তো পালের গোদা।'

'কী, আমি বাঁদর!···এর বড় আস্পর্ধা তোমার!'

'থাক থাক, ঝগড়া থাক। এদিকে আলো একেবারেই চলে যাচ্ছে।' যেন বয়স্কা অভিভাবিকার মতো দমিয়ে দেয় হায়দারের উদ্যত রোষ। বলে, 'দু-তিনজনকে হুকুম দাও না, চটপট সামনের বাড়িগুলো দেখে নিক। আমরা ততক্ষণ এখানে দাঁড়াই।'

গোলাম হায়দার কথা না বাড়িয়ে সেই রকমই ইশারা করল।

'যাক, কাজ আগে মিটে যাক তো, তারপর তুমিও রইলে আর আমিও রইলাম!' মনে মনে বলল সে।

কিন্তু একটা একটা ক'রে বাড়ি দেখা—সব ঘর, সব গোপন অন্দিসন্ধি—যত তাড়াতাড়িই করুক, অল্প সময়ে হয় না।

সামান্য একটু সময়ে দিয়েই মালতী বলে উঠল, 'ওরা এধার দেখুক না, ততক্ষণ চল না আমরা ওদিকের বাড়িগুলোয় খুঁজে দেখি। একেবারেই অন্ধকার হয়ে এল যে!'

তারপর বোধহয় মুহূর্ত-খানেক থেমেই, গোলাম হায়দারকে কিছু ভাববার বা উত্তর দেবার অবকাশ মাত্র না দিয়ে একটা বাড়ির দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলল, 'ঐ যে উঁচু জায়গার ওপর বড় বাড়িটা—ঐটেই গুরুজীর বাড়ি, যেখানে বাহুরাম ছিল। ওটা একবার দেখবে ?'

ভুলে গেল সমস্ত সতর্কতা গোলাম হায়দার। ভুলে গেল যে একটু আগেই মনে মনে বলেছে সে, এ মেয়ে সাপের চেয়েও সাংঘাতিক!

ভুলে গেল যে ওদের দুজনের ঘোড়ার লাগাম সর্বদা নিজেদের হাতে রাখার হুকুম আছে।

তেমন দেখলে বাঁধতেও পারে।

হঠাৎ মনে হ'ল যে মালতীই তাদের দলের নেত্রী। তাদেরই একজন।

অন্তরঙ্গ, বিশ্বস্ত সহচর।

'চলো চলো' বলে ব্যগ্র হয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলল সে সেই দিকে।...

মস্ত বড় বাড়ি বিষ্ণুপ্রসাদের—গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে বড় বাড়ি।

বহু পুরুষ ধরে ওঁরা এখানকার গুরু। গ্রামদেবতার সেবাইৎ।

বহু দান-ধ্যান করা সত্ত্বেও কিছু কিছু ক'রে ঐশ্বর্য জমতে বাধ্য।

ঐশ্বর্যের দায়ও আছে অনেক।

বহু লোকজন প্রতিপালন করতে হয়। বহু লোককে আশ্রয় দিতে হয়।

তাই প্রয়োজনেই ঘরের সংখ্যা বেড়েছে।

তিনমহল বাড়ি, বহু ঘর।

ঘোড়া থেকে নেমে পড়ে তিন-চারজন তিন-চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল, ঘরে ঘরে ঘুরে দেখতে লাগল।

ঘুরতে লাগল মালতী ও বাহুরামও।

তাদের বাধা দেবার কথা কারুর মনে হ'ল না।

এতক্ষণে একটা আস্থাও এসেছে ওদের ওপর।

আর তারা তো রইলই—কোথায় কতদূর পালাবে ঐ একফোঁটা মেয়ে আর ঐ রোগা দুর্বল ছেলেটা ?

মালতী এ বাড়ির সব ঘরই জানত।

কোথায় কী থাকে সব তার নখদর্পণে।

তার ওপর ওদের বাগ্দান উৎসব হয়ে যেতে সূর্যপ্রসাদের মা একদিন ঘুরে ঘুরে সব কিছু দেখিয়েছিলেন—ওর ভাবী শ্বশুরগৃহের সব কিছু।

মালতী তাই সোজা তাঁর ঘরেই গিয়ে হাজির হ'ল।

হ্যাঁ—আছে। সিন্দুকটা তেমনিই আছে।

কিছুই নিয়ে যায় নি ওরা।

সিন্দুকটাতে চাবি দেওয়ার কথাও মনে পড়ে নি কারুর।

ছুটে গিয়ে সিন্দুকটার ডালাটা তুলে ধরেই চিৎকার ক'রে উঠল মালতী।

ছুটে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

ততক্ষণে ওরাও ছুটে এসেছে—বাকী পাঁচজন।

'কী, কী হয়েছে? পেয়েছ ওদের?'

ব্যগ্র কণ্ঠে প্রশ্ন করে সবাই।

'আরে বাপ্‌রে! সিন্দুকভরা কত সোনা! সোনা আর জহরৎ! এত ধনরত্ন আমি কখনও দেখি নি। সব ফেলে চলে গেছে এমনি ক'রে—সিন্দুকে চাবিও লাগায় নি! বাপ্‌রে! বাপ্‌রে!'

বুঝি চিরকালীন নারীই কথা কয়ে ওঠে।

সোনা!

জহরৎ!!

জাদু-মন্ত্রের মতো কাজ করে শব্দ দুটো।

সবাই ছুটে গিয়ে ঘরে ঢোকে।

তবু যেটুকু সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারত—প্রথম যে লোকটি গিয়ে সিন্দুকের মধ্যে হাত পুরেছিল সে একমুঠো অলঙ্কার বার ক'রে বাইরে ধরে পৈশাচিক উল্লাসে চিৎকার ক'রে উঠল, 'ইয়া আল্লাহ্‌!'

ব্যস!

বাকী চারজনও গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সিন্দুকের ওপর। ঠেলাঠেলি মারামারি চলতে লাগল—পাঁচজনের মধ্যে। উন্মত্ত প্রতিযোগিতা, কে কত বাগাতে পারে!

ঠিক এই মুহূর্তটিরই অপেক্ষা করছিল মালতী। আবার তার দুই চোখে আগুন জ্বলে উঠল।

উল্লাসের আগুন, বিজয়গর্বের অহঙ্কার।

হয়ত প্রতিহিংসারও আগুন সেটা।

বাহ্‌রাম দাঁড়িয়েছিল হতবুদ্ধির মতো দরজার ওপরই—এক ঠেলায় তাকে বাইরে সরিয়ে দিয়ে চোখের নিমেষে কপাট বন্ধ ক'রে শেকল তুলে দিলে সে। সেকালের মজবুত দরজা, সহজে ভাঙবে না।

পাঁচজনই বন্দী হয়ে পড়ল ঘরে।

তারপর বাহ্‌রামের হাত ধরে একরকম তাকে টানতে টানতে প্রাঙ্গণে নিয়ে এসে বলল, 'শীগগির, শীগগির ঘোড়ায় চড়ো—আর এক লহমা দেরি ক'রো না!'

'কিন্তু পথ তো বন্ধ—তুমিই তো পথে পড়ে পাহারা বসিয়েছ!'

'সে ব্যবস্থাও আমিই করছি।' ঘোড়ায় চড়তে চড়তেই বলে মালতী—এই এই কদিনে বেশ অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে সে ঘোড়ায় চড়তে—'তুমি আমার সঙ্গে গলা মিলিয়ে চিৎকার করো দেখি—যতটা পার!'

'ভাই সব, শীগগির শীগগির! ধরা পড়েছে! শীগ্‌গির চলে এসো—'

হয়ত সে চিৎকারও ওদের কানে পৌঁছত না! কিন্তু একে বিজন পার্বত্য অঞ্চল—তায় রাত্রির স্তব্ধতা, সামান্য শব্দই প্রতিধ্বনিত হয়ে বিপুল শব্দে পরিণত হয়।

ওদিকে পাঁচটা লোক ঘরের মধ্য থেকে চিৎকার করছে।

তাদের কথা কিছু বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু শব্দটা ছড়িয়ে পড়ছে ঠিকই।
চেঁচাচ্ছে আর বন্ধ দরজায় লাথি মারছে।
দেখতে দেখতে তিনদিক থেকে অশ্বপদশব্দ উঠল।
ওরা আসছে।
'চলে এসো, চলে এসো! হ্যাঁ, এই দিক দিয়ে—পগার ডিঙ্গিয়ে আস্তাবলের পিছন দিয়ে—শিগগির!'
'কিন্তু ওরা তো আমাদের ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ পাবে! পিছু নেবে না?'
'আমাদের ঘোড়ার শব্দকে ওদের আওয়াজেরই প্রতিধ্বনি মনে করবে, ভয় নেই। কোনমতে নদীটা পেরোতে পারব ওরা ব্যাপারটা কি জানবার আগেই।'
চলতে চলতেই চাপা গলায় বলে সে।
তবু ভয় যায় না বাহ্‌রামের মন থেকে—সে চাপা করুণ কণ্ঠে বলে, 'কিন্তু তারপর? ওরা যদি পিছনে আসে, এখনই তো ধরে ফেলবে!'
'পাগল! আগে অতগুলো সোনা আর জহরতের ভাগ না নিয়ে কেউ আসবে না। ততক্ষণ আমরা ওধারের চীরগাছের জঙ্গলে পড়তে পারব না? এ ঘোড়া দুটো ভাল আছে—চল চল, ভয় পেয়ো না পিছিয়ে থেকো না, আর কিছু না হোক মরতে তো পারবে!'
তারপর যেতে যেতেই পিছন ফিরে মন্দিরের দিকে উদ্দেশে প্রণাম জানায় সে, 'কোন ভয় নেই। কেশবজী আমাদের সহায়, দেখছ না তিনিই পথ দেখিয়ে আনছেন! নইলে আমি এত শক্তি কোথায় পেতাম!'
দেখতে দেখতে নদীর ধারে এসে পড়ে ওরা।
নদী পেরিয়ে ওদিকের চীরগাছের ঘন জঙ্গলেও ঢুকে পড়ে একসময়।
তখনও গোলাম হায়দারের দল গ্রামের মধ্যেই চিৎকার করছে আর মশাল জ্বালবার আয়োজন করছে।

॥ ৩০ ॥

দুর্গম কষ্টসাধ্য দীর্ঘ পথ। দুঃসহ রকমের দীর্ঘ দিন ও রাত্রি। তারই মধ্যে চলেছে যাত্রীদল।
কোথায়—তা কেউ জানে না।
শুধু যেতে হবে এই তারা জানে।
কষ্টের শেষ নেই। তুষারের মধ্য দিয়ে চলা। অসহ শীত। খাদ্যদ্রব্য বিরল। যা এনেছিল তা শেষ হ'তে বসেছে।
ক্বচিৎ দু-একটি পাহাড়ী গ্রাম পড়ছে পথে। তাদের যা আছে নিঃশেষ ক'রে দিচ্ছে অবশ্য তীর্থযাত্রী অতিথিদের—কিন্তু সে আর কতটুকু?

তবু চলেছে ওরা।

বিষ্ণুপ্রসাদকে পেতেই যে হবে ওদের। তার আগে থামলে চলবে না কিছুতেই।

একটা আশ্বাস এই যে পথ ভুল হয় নি।

এই পথেই গিয়েছেন বিষ্ণুপ্রসাদ। যা দু-চারখানা গ্রাম পড়ছে—ঐ পথের ফেরৎ যে দু-একজন লোকের সঙ্গে পথে দেখা হচ্ছে—সকলের মুখেই খবর পাওয়া যাচ্ছে।

আকৃতি ও প্রকৃতির বর্ণনা মিলছে।—উদাসীন নিঃসঙ্গ প্রবীণ ব্রাহ্মণ, একবস্ত্রে চলেছেন এই দুর্গম পথে। গ্রামবাসীরা জোর ক'রে খাওয়ালে খাচ্ছেন —চাইছেন না কারুর কাছেই কিছু। এ বিবরণে বিষ্ণুপ্রসাদকে চিনতে দেরি হয় না একটুও।

কিন্তু তিনি গিয়েছেন একা—হাঁটতে শুরু করেছেন ক'দিন আগে। তাঁর নাগাল পাওয়া কঠিন বৈকি।

এ'দের সঙ্গে আছে বৃদ্ধ, শিশুর দল—আছে বহু মাল—আছেন দেবতা। তাঁর সেবা-পুজোতেই কতটা সময় চলে যায়।

তাছাড়া এই দুর্গম অনভ্যস্ত পথে হাঁটা—পা চলতেই চায় না অনেকের। তার ওপর দিন-দিনই অশক্ত হয়ে পড়ছে সবাই, গতি আসছে মন্থর হয়ে।

তবু একটা আশায় চলেছিল কোনরকম ক'রে—ফিরে যাবার আশা, আবার সহজ স্বচ্ছন্দ গার্হস্থ্য জীবন যাপন করার আশা। নিশীথ রাত্রির শেষে সূর্যোদয়ের আশা।

হঠাৎ সেই আশা যেন আরও উজ্জীবিত হয়ে উঠল। ত্রিশূল শৃঙ্গের কাছাকাছি একটা গ্রামে এসে শোনা গেল, যে উন্মাদ ব্রাহ্মণ একা নন্দাদেবীকে দর্শন করতে পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন তিনি পথে একটা সরোবরের ধারে অশক্ত হয়ে পড়েছেন।

আর উঠতে কি চলতে পারছেন না—হয়ত আর কোনদিনই পারবেন না।

কেউ কেউ তাঁকে তুলে আনবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তিনি রাজী হন নি।

কিছু খেতেও চাইছেন না।

বলছেন যে ঈশ্বরের নির্দেশ পেয়েছেন তিনি, এইখানেই তাঁর দেহ রাখতে হবে। প্রায়োপবেশনে সে দেহ ত্যাগ করবেন তিনি।

চল চল! জোরে চল আরও! গুরুজী জীবিত থাকতে থাকতে পৌঁছও!

একটা উৎসাহ-চাঞ্চল্যের সাড়া পড়ে যায় এ দলে।

এবার হয়ত ধরা কঠিন হবে না—এই কাজেই তো।

আর দেখা হ'লে, সব কথা বুঝিয়ে বললে, নিশ্চয় রাজী হবেন তিনি।

না হন তো অন্তত একবার তাঁকে দিয়ে পুজো করিয়ে নিলেই কেশবজী তুষ্ট হবেন। রোষ সম্বরিত হবে তাঁর।

সেদিন কেউ বিশ্রাম করে না।

প্রাণপণে হেঁটে গিয়ে পৌঁছয় কুন্ডের ধারে—সূর্যাস্তের অনেকটা আগেই।

তুষারে ঘেরা পাহাড় চারিদিকে, তার মধ্যে টলটলে স্বচ্ছসলিলা একটি সরোবর।

সরোবরের পাড়েও কোন কোন জায়গায় শ্বেতশুভ্র তুষার আছে কঠিন শীলার মত ডেলা পাকিয়ে।

দু'একটি আসল শীলাও আছে মধ্যে মধ্যে।

কাছাকাছি আসতে হরকিশোরেরই প্রথম নজরে পড়ল, সেই রকম একটি পাথরেই ঠেস দিয়ে চোখ বুজে একটি একান্ত শীর্ণ মানুষ বসে আছেন অবসন্ন ভাবে।

'গুরুজী!'

হরকিশোর ছুটে গিয়ে আছড়ে পড়লেন বিষ্ণুপ্রসাদের পায়ের ওপর।

'গুরুজী ক্ষমা করুন—রক্ষা করুন আমাদের। নইলে আর কোন উপায় নেই—কারুর সাধ্য নেই কেশবজীর রোষ থেকে আমাদের বাঁচায়।'

অতিকষ্টে ক্লান্ত বিষ্ণুপ্রসাদ চোখের পাতা খুললেন। জীবনীশক্তি নিঃশেষ হয়ে এসেছে তাঁর—প্রাণের জ্যোতি এসেছে স্তিমিত হয়ে।

'কে, হরকিশোর?' চিনতে একটু দেরিই হ'ল বুঝি। 'এ কি—তোমরা এত লোক এখানে কেন এলে? কী ক'রে এলে?'

ক্ষীণকণ্ঠে প্রশ্ন করেন বিষ্ণুপ্রসাদ।

হরকিশোর বোঝেন যে আর বেশী সময় নেই।

সংক্ষেপে বলেন সব কথা।

বিষ্ণুপ্রসাদকে খোঁজবার কথা, খোঁজ পাবার কথা—তাঁর স্বপ্নের কথা, দেবতার বিমুখতার কথা।

তারপর সেই ভয়ঙ্কর কালব্যাধি, সেই অজ্ঞাতপূর্ব মহামারীর বিবরণ দিয়ে তাঁর নিজের দৌহিত্রের মৃত্যুর পর কেমন ক'রে এই সিদ্ধান্তে তাঁরা পৌঁছান এবং কী কষ্ট ক'রে সমস্ত গ্রামবাসী এইভাবে বেরিয়ে পড়ে এই দীর্ঘ পথ অমানুষিক কষ্টের মধ্যে দিয়ে অতিক্রম ক'রে এসেছেন—সেই কাহিনী বিবৃত করেন।

তারপর আবারও দুই পা চেপে ধরেন—'গুরুজী, দোহাই আপনার—আপনি ফিরে চলুন। আমরা কাঁধে ক'রে নিয়ে যাব আপনাকে।'

চোখ বুজেই শুনছিলেন বিষ্ণুপ্রসাদ।

জেগে আছেন কি ঘুমিয়ে আছেন, তা বোঝা যাচ্ছিল না—এমন কি বেঁচে আছেন কিনা তাও যেন সন্দেহ হচ্ছিল এক একবার।

হরকিশোর থামবার পরও অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন তিনি। তারপর আবার চোখ খোলেন। বলেন, 'আর আমার সে সময় নেই হরকিশোর। আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে একেবারেই। অনেক আশায় ছুটে চলেছিলাম—কিন্তু খেয়াল ছিল না যে ভগবানের নিয়মের রাজ্য এটা, যে দেহটাকে ছুটিয়ে

নিয়ে চলেছি, তাকে সময়মতো আহার এবং বিশ্রাম দেওয়া দরকার। খুব সুস্থ ছিলুম চিরকাল তাই দেহটার কথা কখনও ভাবি নি। দর্পহারী কেশবজী একেবারে সেটাকে ভেঙে দিয়ে মনে করিয়ে দিলেন কথাটা।...মৃত্যু সামনে দাঁড়িয়েছে, আর কয়েকটা দণ্ড পর্যন্ত হয়ত পরমায়ু। মনে মনে খুবই কষ্ট হচ্ছিল হরকিশোর, আকুলি-বিকুলি করছিলুম—আর একবার কেশবজীকে দেখবার জন্য। ওঁর অসীম দয়া তাই নিজে এসেছেন, আর আমাকেও বাঁচিয়ে রেখেছেন। নিয়ে এস হরকিশোর, একবার দেখাও। নিশ্চিন্ত হয়ে শেষ নিশ্বাস ফেলি।'

'কিন্তু,—হরকিশোর ব্যাকুল হয়ে ওঠেন, 'আপনাকে একবার পূজাও যে করতে হবে গুরুজী, নইলে উনি তো তুষ্ট হবেন না। অভিশাপ তো যাবে না আমাদের ওপর থেকে।'

'পূজা!' ম্লান হাসেন বিষ্ণুপ্রসাদ, মুখের পেশী ও স্নায়ু অবসন্ন হয়ে পড়েছে বলে অপ্রবিকৃত দেখায় সে হাসি। বলেন, 'এখনও আমার পূজা নেবার এত শখ ওঁর? তবে নিয়ে এস—নিয়ে এস খুব তাড়াতাড়ি। এখানে এনে ধরো, একজন একটু জল নিয়ে এসো—আর তো কিছু নেই, জল দিয়েই পূজা শেষ করি।'

'না না, গুরুজী—পূজার সব আয়োজনই আছে। এনে দিচ্ছি।'

হরকিশোর ছুটে গিয়ে সেই আদিকেশব বিগ্রহকে নিয়ে আসেন। একটা শিলাখণ্ডের ওপর বসিয়ে তাড়াতাড়ি বার করেন পূজার সব আয়োজন।

চন্দন মাখানো তুলসী শুকিয়ে এনেছেন তাঁরা—এনেছেন পঞ্চপ্রদীপ ও ঘি।

সেই সামান্য উপচার ও সরঞ্জামই দ্রুতহস্তে সাজিয়ে দেন ব্রাহ্মণরা তাঁর সামনে।

একজন সরোবরের জল এনে তাঁর হাত ধুইয়ে দেন, তাঁর ইঙ্গিতে মাথাতেও দেন একটু। শিথিল কম্পিত হাতে যজ্ঞোপবীত জড়িয়ে দেন।

এই আয়োজন হ'তে হ'তেই বুঝি খানিকটা সঞ্জীবিত হয়ে ওঠেন বিষ্ণুপ্রসাদ। শক্তি একটু ফিরে আসে তাঁর। মুখ থেকে মৃত্যু-অবসন্নতা ও পাণ্ডুরতা মুছে যায় খানিকটা।

তিনি প্রসন্ন উজ্জ্বল মুখে তুলসী তুলে নেন, মন্ত্র উচ্চারণ করতে থাকেন কেশবজীর পায়ে দেবেন বলে।

এমন সময় পেছন থেকে একটা সামান্য আর্তনাদ ওঠে যেন—একটা কী ব্যস্ততা অনুভূত হয়। সঙ্গে সঙ্গে, ভাল ক'রে বুঝি পলক ফেলবারও আগে—কে একজন সবাইকে ডিঙিয়ে মাড়িয়ে সরিয়ে ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে আসে সামনে এবং চোখের নিমেষে, ব্যাপারটা কী ঘটল বোঝবার চেষ্টা করারও আগে, কেশবজীর মূর্তিটা বেদী থেকে তুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয় সরোবরের জলে।

বৃন্দাপ্রসাদ।

কবে কেমন ক'রে কখন থেকে যে সে এই যাত্রীদলের পিছু নিয়েছে, তা কেউ জানে না। কী খেয়ে বেঁচে আছে এতকাল, তাও সকলের অজ্ঞাত।

একবার মাত্র তার দিকে তাকিয়েই আবার অবসন্নভাবে এলিয়ে পড়লেন বিষ্ণুপ্রসাদ, মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল। পুজো করা আর তাঁর হ'ল না, এ দেহে কোনদিনই আর হবে না।

হরকিশোর শিউরে আঁতকে উঠলেন যেন।

'গুরুজী! গুরুজী! ··ছি ছি—করলে কি বৃন্দাপ্রসাদ—এততেও তোমার সাধ মেটে নি! শেষে পিতৃহত্যা করলে!'

কিন্তু ঠিক সেই সময়ই—হরকিশোরের আর্তকণ্ঠ নীরব হবার আগেই—পিছনে কার দ্রুত পদশব্দ জাগল। শোনা গেল কার রুষ্ট তর্জন—গ্রামবাসীদের কারও নয়, আর কারা ছুটে আসছে—এ তর্জন তাদেরই।

অবাক হয়ে চাইল সবাই।

চাইল উন্মাদ বৃন্দাপ্রসাদও।

আর চাইবার সঙ্গে সঙ্গেই দৃষ্টি স্থির এবং আতঙ্ক-বিস্ফারিত হয়ে উঠল তার।

মালিক বাহ্‌রাম।

মালিক বাহ্‌রাম ছুটে আসছে—হাতে তার উন্মুক্ত তরবারি।

পিছনে আসছে মালতী, তার দুই চোখে ঐ তরবারির চেয়েও শাণিত দৃষ্টি।

সেদিকে চেয়ে যেন পাথর হয়ে গেল বৃন্দাপ্রসাদ।

আবারও একটা হুঙ্কার দিয়ে উঠল বাহ্‌রাম। সেই শেষ মুহূর্তে বুঝি বিধাতা খানিকটা পৌরুষ দিয়েছেন তাকে—তার পূর্বপুরুষের রক্ত জেগেছে তার ধমনীতে।

বহু লোককে ডিঙ্গিয়ে লাফিয়ে তরবারি হাতে একেবারে সামনে এসে দাঁড়াল সে।

কী দেখল আর কী বুঝল বৃন্দাপ্রসাদ কে জানে, বুঝি নিজের নিয়তিরই দেখা পেল সে বাহ্‌রামের মধ্যে। কিন্তু অকস্মাৎ একটা দারুণ আতঙ্কে চিৎকার ক'রে উঠল। ভয়ার্ত পশুর মতোই আতঙ্কের একটা অব্যক্ত আর্তনাদ ফুটল তার কণ্ঠে। তারপরই সে একবার হেসে উঠল আপনমনে—হা-হা ক'রে।

প্রথম হাসির বেগ কমে আসতে আর একবার ভাল ক'রে চেয়ে দেখল পায়ের কাছে মৃত বাপের স্থির নিস্পন্দ দেহটার দিকে, তারপর আবারও হেসে উঠল হা-হা ক'রে। আরও পৈশাচিক, আরও ভয়ংকর, আরও প্রচণ্ড।

সেই প্রচণ্ড শব্দ বহু সহস্র হস্ত উচ্চে, হিমালয়ের এই নিভৃত নিস্তব্ধ শান্ত তুষাররাজ্যে প্রচণ্ডতর প্রতিধ্বনি জাগাল।

পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় সে প্রতিধ্বনি যেন আছড়ে আছড়ে মাথা কুটে

ফুটে ঘুরে বেড়াতে লাগল। বহুক্ষণ ধরে সে শব্দের রেশ লেগে রইল ওখানকার গতিহীন বাতাসে, সরোবরের নিস্পন্দ জলে এবং তুষারাবৃত কঠিন পর্বতগাত্রে।

আর সেই রেশ মিলোবার আগেই আর একটা ভয়ঙ্কর শব্দ উঠল, গুরু-গুরু গুম্-গুম্।

মেঘগর্জনের মতো, ভূমিকম্পের মতো শব্দ।

কিসের শব্দ, কী কারণ, কিছু না বুঝতে পারলেও সে শব্দ কানে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে একটা অজানা ত্রাসে কেঁপে উঠল সবাই।

আকাশে মেঘ নেই যে মেঘ ডাকবে। মাটিও তো কাঁপছে না। ভূমিকম্প উঠলে সরোবরের জলও ছলাৎছল করত—সেও তো তেমনি নিবাত-নিষ্কম্প স্থির। তবে?

শব্দটা কিন্তু বেড়েই যাচ্ছে নিমেষে নিমেষে!

প্রচণ্ড থেকে প্রচণ্ডতর হচ্ছে।

গুম গুম! গুম-গুম!

এরই মধ্যে কে যেন চেঁচিয়ে উঠল—'ঐ যে! ঐ যে!'

তারই অঙ্গুলিসঙ্কেতে সকলে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখল—ঠিক তাদের মাথার ওপরের এক অভ্রংলিহ শৃঙ্গ থেকে বিরাট—অন্তত কয়েক সহস্র মণ ওজনের—এক হিমানী সম্প্রপাত নামছে। আগে আস্তে আস্তে নামছিল—এখন যত নিচে নামছে ততই তার গতিবেগও যেমন বাড়ছে, তেমনি তার আকৃতিও।

আর তেমনি ভয়ঙ্কর শব্দ উঠছে তার এই প্রচণ্ড নিম্নগতির।

সকলে আর্তনাদ ক'রে উঠল ভয়ে, হাহাকার ক'রে উঠল। কেউ কেউ আত্মরক্ষার জন্য ছুটে গেল সরোবরে ঝাঁপ দিতে—কিন্তু কেউ বিশেষ কোন চেষ্টা করার আগেই আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যে নেমে এল সেই শীলীভূত তুষার। দেখতে দেখতে একটা গ্রামের সেই কয়েকশত প্রাণীকে নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিলে। তাদের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, শোক-হর্ষ সমস্ত সমাধিস্থ হয়ে গেল সেই সুবিপুল তুষার-স্তূপে।

বৃন্দাপ্রসাদের পৈশাচিক হাসির প্রতিক্রিয়া জেগেছিল পর্বতশৃঙ্গে—তারই ফল ঐ ভয়ঙ্কর হিম-প্রপাত।

সে বহুদিনের কথা।

বহু শতাব্দী কেটে গেছে তারপর। বহু রাজ্য ভাঙা-গড়া হয়েছে—বহু উত্থান-পতনের কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে মানবেতিহাসের পাতায়। কিন্তু ওদের কথা লেখে নি কেউ। সে কথা কেউ জানেও না। সেদিনকার সেই তীর্থযাত্রীদলের অস্থিমাত্র পড়ে আছে রূপকুণ্ডের চারিপাশে—মহানাটকের নীরব সাক্ষী তারা। অস্থি আর সেদিনের নিত্য প্রয়োজনীয় নিত্যসঙ্গী কয়েকটি বস্তুর ভগ্নাবশেষ। সামান্যতম চিহ্ন—সেদিনকার একদল নরনারীর

প্রাণ-স্পন্দিত জীবনযাত্রার।

সে লালতা-কেশো গ্রামও সম্ভবত আর নেই। হয়ত বহুকাল পরে গৃহ-সন্ধানী কোন মানুষের দল কিংবা পথশ্রান্ত কোন যাযাবর জাতি এসে বাসা বেঁধেছে সেখানকার শূন্য ঘরে ঘরে। হয়ত দিয়েছে কোন নতুন নাম সে গ্রামের। হয়ত কেশবজীর মন্দিরও ভেঙেচুরে মিলিয়ে গেছে মাটিতে—কিংবা সেখানে বসেছেন নতুন কোন বিগ্রহ, নতুন দেবতা।

কিছুই নেই তাদের—আর কোথাও কোন অস্তিত্ব নেই। বিধাতার রুদ্ররোষ শুধু তাদেরই সংহার করে নি—বিনষ্ট করেছে তাদের ইতিহাসও।

রানী কাহিনী

উৎসর্গ

পরমশ্রদ্ধাস্পদ

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার

মহাশয়কে

যিনি বর্তমান লেখককে বহু ঐতিহাসিক উপকরণের আনুকূল্য দিয়ে উৎসাহিত করেছেন—এবং যিনি চল্লিশ বছরেরও আগে বাংলা দেশের ইতিহাস রচনাকালে আশা ও কল্পনা করেছিলেন যে, পরবর্তীকালে কোন বাঙালী লেখক এই কাহিনী নিয়ে একটি সার্থক উপন্যাস রচনা করবেন।

॥ প্রাক্-কথন ॥

বাংলা দেশেরই কথা। বাঙ্গালীর একটি ছোট্ট রাজ্য। অতি নগণ্য তার আয়তন, রাজ্য বলাও হয়ত ভুল, পরবর্তীকালের হিসেবে বড় একটা জমিদারী বলাই উচিত।

সামান্য দেশ, তবু তার ইতিবৃত্ত সামান্য নয়।

পুরাকাহিনী? কে জানে তাকে কি বলা যায়! কাহিনী-কিম্বদন্তী-ইতিহাসে আজ এমনভাবে মেশামেশি হয়ে গেছে যে, তা থেকে আলাদা ক'রে কিছু বেছে নেওয়া যায় না—কতটুকু তার মধ্যে সত্য আর কতটুকু কল্পনা; সে কল্পনাই বা কার কল্পনা, কত যুগ কত শতাব্দী ধরে কত কবি কত রকম ক'রে কল্পনা করেছে আর তাদের সেই কবিচিত্তের রঙ মিশিয়ে ইতিহাসকে কিম্বদন্তীতে পরিণত করেছে, সাধারণ ছায়াছবি বহুবর্ণের চিত্র-সম্পদে রূপান্তরিত হয়েছে।

সে রূপান্তর বর্ণান্তরের কাজ আজও শেষ হয় নি, যুগে যুগেই নতুন নতুন শিল্পী এসেছেন, তাঁদের তুলি নিয়ে, নিজের মতো ক'রে দেখাবার চেষ্টা করেছেন বহুদিন আগেকার সে ছবিকে।

এর রাজ্য আর তার রাজারা কেউই আর নেই। বিলুপ্ত হয়ে গেছে তাদের বংশ, অথবা অন্য কোন বংশধারায় মিশে হারিয়ে গেছে। সাধারণ কোন ইতিহাসেও ধরা নেই তাদের নাম। বাংলা দেশের বিশেষ বিস্তৃত ইতিহাস খুললে জানা যাবে দু-একজনের নাম, দু-একটি কীর্তি-কাহিনী—এক-আধবার উল্লেখ পাওয়া যাবে।

তবু সেই তাদেরই নাম, তাদেরই কাহিনী আজ শুধু কিম্বদন্তীতে পরিণত হয় নি—বহু গাথা কাব্য নাটকের উপাদান যুগিয়েছে। এদেশে হয়ত তত নয়—ভিন্‌দেশে যত। ব্রহ্মদেশে বহু নাটক লেখা হয়েছে এই ছোট্ট দেশের ছোট ছোট ইতিকাহিনী নিয়ে, যুগে যুগে বহু কাব্য রচিত হয়েছে ওখানকার ভাষায়। আজও সে সব কাব্য-নাটকের সমাদর কমে নি, আজকের দিনের রঙ্গমঞ্চেও এই কাহিনী বা কিম্বদন্তী বা ইতিহাস নিয়ে রচিত নাটক অভিনীত হচ্ছে, বহু সহস্র দর্শকের মনোরঞ্জন করছে তা—বছরের পর বছর ধরে তাদের চিত্ত জয় ক'রে যাচ্ছে, উদ্বেলিত ক'রে তুলছে তাদের আবেগ আর আনন্দ।

কোথায় সে দেশ?

বলেছি তো—বাংলা দেশেই। বাংলার আজ যে অংশের নাম হয়েছে বাংলাদেশ, সেই পূর্ববঙ্গেরও পূর্বতম অংশে, বর্তমান কুমিল্লার পাঁচ মাইল বা আট কিলোমিটার পশ্চিমে যে নয়নাভিরাম পাহাড়টি,—পুরাকালের কোন

অখ্যাত কবি যার নাম দিয়েছিলেন ময়নামতী—সেই ময়নামতী পর্যন্ত বিস্তৃত যে পরগণা, আজও তার নাম পাটিকারা বা পাইটকারা, কোন কোন দলিলে পাইটকেরাও পাওয়া যায়—আজ থেকে এক হাজার বছর আগে ওখানেই ছিল স্বাধীন পট্টিকারা বা পট্টিকেরা রাজ্য।

আমরা জানি না অনেকেই। কারণ আমাদের স্কুল-কলেজের পাঠ্য ভারতের ইতিহাসে এসব কথা নেই। থাকা সম্ভবও নয়। কিন্তু ব্রহ্ম আর আরাকানের বহু গাথা কাহিনীতে এর উল্লেখ আছে।

এই দেশেরই এক রাজার করুণ মধুর প্রেমের উপাখ্যান নিয়ে ঐসব নাটক লেখা হয়েছে বর্মী ভাষায়। আজও যা সেখানের রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়, চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়ে লক্ষ দর্শকের মনোরঞ্জন করে—লেখা হয়েছে বহু গাথা বহু কাব্য। এখনও নতুন ক'রে লেখা হচ্ছে। কে জানে, অনাগত কালের আরও কত প্রতিভাধর কবি ও নাট্যকার কত অভিনব কল্পনায় রচনা ক'রে যাবেন বহুশতাব্দী আগেকার সেই পুরাতন প্রেমের কাহিনী; 'পুরানো সেই কিশোর প্রেমের করুণ ব্যাকুলতা' নতুন শক্তির নতুনতর জোয়ারে দর্শক ও পাঠক-চিত্তের ঘাটে ঘাটে ভেসে আসবে!

অনাগত কালের কথা আগামী দিনের জন্যে থাক। যা লেখা হয়েছে তাও কম নয়। সে সব কাব্য-নাটকের স্রষ্টারা কোন্ উপাদানের ওপর নির্ভর করেছিলেন তা কেউ জানে না। কে কতটুকু তথ্যের ওপর কতটা আপন মনের রঙ মিশিয়েছে—তাও না। এমন কি দেশ বা পাত্রের নামও গেছে পাল্টে। কেউ বলেছেন রাজ্যের নাম সারাওয়া—রাজধানী পটিক্কারা, কেউবা বলেছেন রাজ্যের নামই পাটেইক্কারা। কিন্তু বেশির ভাগ দলিলে বা পুঁথিতে বা নাটকে দেশের নামই ধরা হয়েছে পট্টিকের বা পট্টিকেরা বা পাট্টিকারা। আমরাও তাই ধরে নেব।

এই দেশেরই এক তরুণ রাজা আর ব্রহ্মের এক রাজকুমারী—ঐসব কাব্য-নাটকের নায়ক ও নায়িকা।

পরিবেশ বা পৃষ্ঠপটের এই সামান্য আভাস মাত্র দিয়েই আমরা বর্তমান কালের কাছে বিদায় নেব।

ফিরে যাব হাজার বছর আগে, কিছু ইতিহাস কিছু কিম্বদন্তী, কিছুবা আমাদের কল্পনায় রচিত সেই দেশে নিয়ে যাব আপনাদের, সেই মানুষদের মধ্যে। মহাকাল যে কাহিনী লিখে যাচ্ছেন অনন্তকাল ধরে, খণ্ডকালের পরিচ্ছেদে ভাগ করা—সহস্র বর্ষ আগের তেমনিই এক পরিচ্ছেদ হবে আমাদের আখ্যায়িকার উপজীব্য।

॥ গ্রন্থারম্ভ ॥

॥ এক ॥

পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ অরিদলন দেবান্বয়-কমল-বিকাশ-ভাস্কর, পট্টিকেরাধিপতি রাজা রণমল্লদেব সেদিন কিছু সুরাপান করেছিলেন।

মানে—সুরাপান তো নিত্যই করেন—সেদিন মাত্রাটা কিছু বেশী হয়ে পড়েছিল। অর্থাৎ আরও পরিষ্কার ক'রে বললে যা দাঁড়ায়—তিনি কিছু অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়েছিলেন।

অবশ্য মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়ারই দিন সেটা, এও মানতে হবে।

দিন, কাল এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা হিসেব করলে বরং তাঁর সংযমেরই প্রশংসা করতে হবে। তিনি যদি উন্মত্ত হয়ে উঠে প্রাকৃতজনের মতো উচ্ছৃংখলতা প্রকাশ করতেন—তাহলেও সেদিন তাঁকে কেউ দোষী বলে মনে করত না, অনুযোগ করত না।

কাম-মহোৎসবের সর্বশেষ দিন সেটা ; কালটা হ'ল মধুমাসের শুক্লপক্ষ, চতুর্দশী তিথি। শীতের জাড্য গেছে কেটে, দক্ষিণের ঈষদুষ্ণ সমীরণ কুঞ্জে-উদ্যানে বৃক্ষলতাকে পুষ্প-প্রগল্‌ভ ক'রে তুলেছে, ভ্রমররা হয়ে উঠেছে চপল, বকুল-বীথিকায় বাতাস হয়েছে গন্ধমদির, তরুণীদের চোখে জেগেছে লাস্য। শিশির দিনের শুষ্কতার পর ললাটে প্রথম স্বেদবিন্দু দেখা দিয়েছে—বিশেষ এক পরিশ্রমের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে তা। প্রকৃতি তাঁর মোহ বিস্তার করেছেন শুধ তরুণ-তরুণী নয়—অনেক প্রৌঢ়-প্রৌঢ়ার মনেও, এমনিতেই মানুষের মনে লেগেছে নেশার ঘোর।

উৎসবে উন্মত্ততার ছোঁয়া লেগেছে অপরাহ্নের কিছু আগে থেকেই। শুধু সুরা নয়—অন্য সুলভ ও প্রচলিত মাদকেরও ব্যবহার চলছে। তারপর অপরাহ্ণ যখন শেষ হয়ে এসেছে, পশ্চিমদিগন্ত ম্লান হ'তে হ'তে পূর্বদিগন্ত আলোকোদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে আবার, প্রভাতের মতোই অথচ প্রভাতের ঠিক বিপরীত—কারণ এ আলোয় অরুণাভার উষ্ণতা নেই, আছে জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধতা—তখন স্বভাবতই সকলে প্রতিদিনের জীবন গেছে ভুলে, মনের কোন্‌ আব্‌ছা দিগন্তে বাস্তবের রূঢ় সত্যগুলো গেছে মিলিয়ে—ইচ্ছাতুর এক স্বপ্নস্বর্গ রচনা ক'রে নিয়েছে নিজেদের মতো ক'রে।

এই একটি সন্ধ্যা, একটি রাত্রের জন্য অন্তত ভুলতে চেয়েছে তাদের দুঃখ-দুর্দশা, ভুলতে চেয়েছে আগামী দিনের প্রভাতকে—তার ক্ষুধা-তৃষ্ণা অভাব-অভিযোগ ব্যাধি-জরা প্রভৃতি সকল অনভিপ্রেত অনীপ্সিত সত্যসুদ্ধ, চেয়েছে উচ্ছল হতে, চেয়েছে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে, চেয়েছে এই রাত্রিটির সমস্ত সুধারস নিঃশেষে পান করতে। হিতাহিত অগ্র-পশ্চাৎ জ্ঞান হারিয়ে ফেলতেই চেয়েছে তারা।

আজকের এই মত্ততার কারণ বহুবিধ।

সুরা আর নারী—জ্ঞান হারানোর সর্বপ্রধান দুটি উপাদান—দুই-ই বড় সহজলভ্য আজ।

রাজা, রাজপুরুষ ও ধনী শ্রেষ্ঠীরা তাঁদের নিজ নিজ গৃহের আসব-ভাণ্ডার উন্মুক্ত ক'রে দিয়েছেন—একটু আয়াস স্বীকার করলেই বিনাব্যয়ে তা পান করা যায়।

কিন্তু এছাড়াও নেশার উপাদান আছে।

এই একটি দিন রাজ্যের সর্বত্র ধনী-দরিদ্র ভেদ মুছে যায়—সব গৃহেরই দ্বার আজ অবারিত, কুলনারীরা বিনাবাধায় বেরিয়ে পড়েন কুঞ্জোদ্যানে বা ছায়াঘন পুষ্পগন্ধামোদিত রাজপথে। কার সঙ্গে কার দেখা হচ্ছে, কে কার সঙ্গে কোন্ পথে হারিয়ে যাচ্ছে, সে হিসেব কেউ রাখে না।

অথবা পরের দিন নেশা কেটে গেলেও কোন অবাঞ্ছিত প্রশ্ন তুলে কটু সত্য উদ্‌ঘাটিত করার চেষ্টা করে না।

ফলে সুশ্রী তরুণীরা যখন কামোদ্দীপক অঙ্গভঙ্গীসহকারে রাজপথে বা পথিপার্শ্বের উন্মুক্ত প্রান্তরে নৃত্য করেন, নৃত্য করতে করতেই দল বেঁধে পথ বেয়ে কন্দর্পমন্দিরে অথবা এই উৎসবের জন্য নির্দিষ্ট কুঞ্জবাটিকয়ে যান, পরস্পরের প্রতি—স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে—জুগুপ্সিত উক্তি* করেন, তখন কে সম্ভ্রান্ত অভিজাত কি ব্রাহ্মণঘরের অন্তঃপুরিকা পুরললনা—আর কে নিতান্তই প্রাকৃত-জনদুহিতা তা বোঝা যায় না। যাকে 'হুল্লোড়' বলে—সেই ধরনের অসভ্য আচরণে কেউ কম যায় না।

দেখে মনে হয় এ ওদের সহজাত শিক্ষা, মেয়েদের। একান্ত অভিজাত পরিবারে বহু বাধা-নিষেধ নিয়ম-রীতির গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকে বলেই তাদের মিতভাষিণী, শিক্ষিতা, সংস্কৃতিযুক্তা যোষিতা বলে মনে হয়, সেই গণ্ডীর বন্ধন খুলে গেলেই আসল আদিমস্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ে।

এত রকমের নেশার আয়োজনে পুরুষ—বিশেষ তরুণ বয়সী যারা—একটু বেসামাল হবে বৈ কি!

রাজা রণমল্লদেবও পুরুষ—এবং বয়সে তরুণ।

বছরে এই একটা দিনই রাজা তাঁর প্রজাদের সঙ্গে একত্রে আনন্দ করেন, সাধারণভাবেই উৎসবের তরঙ্গে গা ভাসিয়ে দেন। এই-ই নিয়ম, বহুকাল থেকেই চলে আসছে এ রীতি। এ দিনে উৎসবের অঙ্গীভূত যে সব আচার-আচরণ তা যত অভব্য বা অশালীনই হোক, তার জন্য কেউ দোষ ধরে না। এমন কি সে আচরণ স্বয়ং রাজা বা অমাত্যদের প্রতি করলেও না।

তবু রাজা রণমল্লদেব, সম্ভবত রাজ-পদবীর মর্যাদা রাখতেই, রাজপরিচ্ছদ পরিহার ক'রে পথে বেরিয়েছিলেন। তাঁর উষ্ণীষ, তরবারি কিছুই ছিল না। বস্ত্র উত্তরীয়ও মহার্ঘ্য কিছু নয়—নিতান্তই সাধারণ। তাঁর রাজ্যের মধ্যবিত্ত

* খিস্তি

ঘরের যুবারা যে ধরনের ও যে মূল্যের বস্ত্র-অলঙ্কার পরে, সেই ধরনেরই সাধারণ বস্ত্রাদি সংগ্রহ করেছিলেন তিনি। সে বেশভূষায় মণিমাণিক্যের দ্যুতি ছিল না কোথাও, ছিল না সুবর্ণের চোখধাঁধানো দীপ্তি। একেবারেই সামান্য নাগরিকের বেশ ধারণ ক'রে ছিলেন—ছদ্মবেশে বেরিয়েছিলেন বলতে গেলে।

তৎসত্ত্বেও রাজাকে চিনতে অসুবিধা হয় নি কারও।

এমনিতেই রাজার একটা মহিমা তাঁকে সর্বদাই ঘিরে থাকে—যা বেশভূষা ব্যতিরেকেও তাঁকে স্বতন্ত্র বলে চিহ্নিত ক'রে দেয়—কিন্তু তাছাড়াও কিছু কারণ ছিল এক্ষেত্রে।

সে কারণ রণমল্লদেবের কান্তি ও দেহসৌষ্ঠব।

এদেশের অন্য তরুণদের সঙ্গে একেবারেই মেলে না তা। এদের মধ্যেও গৌরবর্ণ এবং সুগঠিত দেহ আছে অনেকের, কিন্তু সকলেই কিছু খর্বাকৃতি। পথে যারা বেরিয়েছিল, রণমল্লদেবকে ঘিরে যেসব বয়স্ক পরিচিতের দল পথ হাঁটছিল—এমন কি তাদের পরিবেশে আকৃষ্ট হয়ে মধুগন্ধোন্মত্ত মধুকরের মতো যারা চারিদিক থেকে এসে জড়ো হয়ে গুঞ্জন করছিল—মধুলোভীই বলতে হবে, কারণ এই বিশেষ দলটির প্রতিই যে অল্পবয়সী তরুণীদের বেশী অনুগ্রহ তা বোঝার কোন অসুবিধা ছিল না—তাদের মধ্যে সবচেয়ে যে দীর্ঘাকৃতি, রণমল্লদেবের মাথা তার মাথার থেকেও অন্তত এক বিঘত উঁচু।

এ আকৃতি ও গঠন রাজা পেয়েছেন তাঁর মাতুলদের কাছ থেকে।

ওঁর মা ছিলেন কান্যকুব্জের মেয়ে।

রণমল্লদেবের পিতা তাঁর বংশের 'পন' পাল্টাতেই এক কন্যাকে এনেছিলেন। একরকম বীর্যশুল্কেই এনেছিলেন বলতে গেলে।

তাঁর পরাক্রমের কাহিনী সুদূর উত্তর ভারতেও ছড়িয়ে পড়েছিল। কাহিনী বলাও ভুল, অনেকেরই প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটেছিল যুদ্ধ-উৎসুক রণকুশলী এই বাঙ্গালী রাজার বাহুবলের সঙ্গে। অনেক বড় বড় নৃপতিকেও একাধিকবার শরণাপন্ন হ'তে হয়েছে এই মীনভোজী খর্বাকৃতি ব্যসনপ্রিয় অর্ধ-বর্বর নরপতির। যাঁরা নিজেদের আর্য-বংশধর মনে করে এই পাণ্ডববর্জিত দেশের অর্ধ-অনার্যদের কৃপার চোখে দেখতেন, তাঁরা চক্ষু মার্জনা ক'রে ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখতে বাধ্য হয়েছিলেন অনেকেই।

সুতরাং কান্যকুব্জাধিপতি তাঁকে যথেষ্ট আগ্রহের সঙ্গেই কন্যা দান করে-ছিলেন।

ওঁর সঙ্গে কুটুম্বিতা করতে পেরে যেন নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন, এটাকে একটা মৈত্রী-বন্ধন মনে ক'রে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন।

রাজকুমারী এই অসম-বিবাহ ব্যবস্থায় আদৌ সুখী হন নি—তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু রাজারাজড়াদের ঘরে কন্যাদের বিবাহের সময় পাত্রীর সুবিধা-অসুবিধা ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথা চিন্তা করার রীতি নেই, রাজ্য ও রাজার সুবিধাই সেখানে প্রধান বিবেচ্য।

যুগে যুগেই এই নিয়ম চলে আসছে, প্রায় সব দেশেই। মুসলমান আমলে

হিন্দু রাজারা এই কন্যা-প্রেরণকে উৎকোচ হিসেবেই ব্যবহার করেছেন বেশির ভাগ। প্রবল পক্ষকে তুষ্ট করার উপায়রূপে দেখেছেন।

কান্যকুব্জের শিক্ষা-দীক্ষা-সংস্কারের সঙ্গে এদের একটুও মিল নেই, আহার্য ও আহাররীতিতে দুস্তর ব্যবধান—মৎস্য এদের প্রধান খাদ্য, কান্যকুব্জ মৎস্যকে কীটপতঙ্গের মতোই অখাদ্য বলে মনে করে—এমন কি নিজের মনের কথাও সেখানে বোঝানো যাবে না কাউকে, দুপক্ষের কেউই অপরের ভাষা জানে না—এসব তুচ্ছ আপত্তি রাজকার্যে অচল।

সুতরাং রণমল্লদেবের পিতা নির্বিঘ্নেই সেই দীর্ঘাঙ্গী ও সুগৌরাঙ্গী কন্যাটিকে দেশে আনিয়ে নিজেদের সামাজিক ও পারিবারিক প্রথা-অনুযায়ী বিবাহ করতে পেরেছিলেন।

বিবাহ-রাত্রিতেই মৎস্য-মুখ করতে হয়েছিল নববধূকে। সেদিন অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই তা উদ্গীরণ ক'রে ফেলেছিলেন তিনি—তবে সে অসুবিধা খুব একটা বেশীদিন স্থায়ী হয় নি, শেষ পর্যন্ত তিনিও মীনভোজিনী হয়ে উঠেছিলেন দস্তুরমতো, মৎস্য-রসিকাও।

এই মায়ের কাছ থেকেই বাঙ্গালীদুর্লভ গঠনসৌষ্ঠব লাভ করেছিলেন রণমল্লদেব।

সেই দেহ, সেই মুখশ্রী, সেই রকম দৈর্ঘ্য ও বলিষ্ঠ আকৃতি।

বর্ণেও অনেক পার্থক্য। এদের বর্ণ যত সুগৌর তাতে তত হরিদ্রাভা প্রবল। রাজার তুষারশুভ্র ত্বকে অরুণ-রক্তাভা।

কাজেই রাজা ছদ্মবেশ ধারণ করলেও নিজেকে গোপন করতে পারেন নি।

সাধারণ নাগরিকের পোশাকে সে অনন্যসাধারণ রূপ ঢাকা পড়ে নি, তার প্রাখর্যও কিছুমাত্র ম্লান হয় নি।

তবে সে ছদ্মবেশের সুযোগ নিয়েছে সকলেই।

হয়ত একটু বেশীমাত্রাতেই নিয়েছে।

তারা যে ওঁকে চিনতে পেরেছে একথা কেউ স্পষ্টভাবে জানায় নি। তার কারণ এ নয় যে, রাজা যেখানে পরিচয় গোপন করতে চেয়েছেন সেখানে সে পরিচয় প্রকাশ করা অন্যায়—রাজার ইচ্ছার প্রতি সম্মান দেখানো উচিত—এই বোধে তারা মৌনাবলম্বন করেছে।

তারা যে নিজেদের তীক্ষ্ন দৃষ্টি ও তীক্ষ্নতর বুদ্ধির বাহাদুরী নেবার লোভ সম্বরণ ক'রে বোকা সেজেই থেকেছে, তার কারণ রাজা বলে চেনবার কি চিনিয়ে দেবার পর আর তাঁর সান্নিধ্যে আসা কি তাঁকে স্পর্শ করা চলে না।

তারা বরং এই আপাত-অপরিচয়েরই সুযোগ নিতে চায়, পূর্ণমাত্রায় সম্ভোগ করতে চায় এই সন্ধ্যার বিশেষ সুবিধাটুকু। তাই রাজার সঙ্গে তার সাঙ্গোপাঙ্গ বয়স্যের দল যেখানে গেছে সেখানেই ভীড় ক'রে এসেছে তরুণীরা—শুধু রাজার মনোযোগ আকর্ষণ করার লোভে, তাঁর সামনে নিজেকে মেলে ধরে তাঁকে লুব্ধ করার আশায়।

এ সন্ধ্যা এ রাত্রের হিসেব কেউ রাখে না। কেউ চায়ও না।

মধুমাসের এই বিশেষ সন্ধ্যায়, কুঞ্জবীথিকার নবপুষ্পপত্রঘন বৃক্ষচ্ছায়ায় পথ হারানো কোন অঘটন নয়, অভিনব তো নয়ই।

এর আগেও বহু রাজা এই দিনে এমন বহুবার পথ হারিয়েছেন।

কে জানে, হয়ত আজও কোন ভাগ্যবতীকে সঙ্গিনী ক'র পথ-হারানোর খেলায় মেতে উঠতে পারেন এই দীর্ঘদেহী অনিন্দ্যকান্তি তরুণ শাসক।

সে পথ ভোলাতে রূপসীই যে হ'তে হবে তার কোন অর্থ নেই।

নেশার চোখে—প্রকৃতি ও সুরার দুরকম নেশায় উদ্‌ভ্রান্ত স্খলিত দৃষ্টিতে—কাকে কখন কার মনে লাগে তা কেউই বলতে পারে না।

এক এক সময় শুধুই একটি ভঙ্গী, একটু হাসি, একফালি চাহনি—পাগল ক'রে দেয় পুরুষকে, আবার পুরুষেরও বলিষ্ঠতার কোন বিচিত্র প্রকাশে, পৌরুষের কোন বিশেষ ইঙ্গিতে, অথবা অনেক সময় কেবলমাত্র তরুণ যুবার গায়ের গন্ধে মেয়েরা কুল-মান হিতাহিত-জ্ঞান বিসর্জন দিয়ে উন্মত্ত অধীর হয়ে উঠেছে—এমন ইতিহাসও বিরল নয়।

সেই আশাতেই রণমল্লদেবের দলটির প্রতি আজ তরুণী-সমাজের এত অনুগ্রহ।

দলপতির একটু ঘনিষ্ঠ হবার, একটু চোখে পড়ার জন্য তাদের এত আপ্রাণ চেষ্টা।

রাজা রণমল্লদেবেরও যে এই কন্দর্প-পূজার রাত্রিতে উৎসব উদ্‌যাপনের খেলায় অনাগ্রহ ছিল—তা নয়।

তিনিও বুঝি চেয়েছিলেন এমনি ক'রে কাউকে নিয়ে পথ হারাতেই।

মধ্যাহ্নের পর যখন তাঁর প্রাসাদের পিছন দিককার উদ্যান-দ্বার দিয়ে বেরিয়ে পথের ভীড়ে গা ভাসিয়েছেন তখন থেকেই তাঁর চোখ খুঁজে বেড়িয়েছে এমনি একটি মনের মতো সঙ্গিনী।

সুযোগ তিনিও নিয়েছেন তাঁর ছদ্মবেশের।

অনেক দেখেছেন, কাছ থেকেই দেখেছেন। কথা শুনেছেন তাদের, কাম-মদির চোখের আমন্ত্রণও পাঠ করেছেন কোন কোন মৃগাক্ষীর, কারও মুক্তাঝরা হাসির সঙ্গে নিজের ভরাটগলার হাসি মিলিয়েছেন।

সুরাপানের অজুহাতে জেনে-শুনে মত্ততা প্রকাশ করেছেন, তাদের অশালীন রিপু-উত্তেজক অঙ্গভঙ্গীর জবাব দিয়েছেন অশালীনতর ভঙ্গী ক'রে।

তবু একবারও মনে হয় নি যে, বয়স্যদের ছেড়ে তাদের কারও সঙ্গে একটু নিভৃত নির্জনতায়, অন্তরঙ্গ অন্ধকারে যান, ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন।

প্রায়-বেসামাল হয়ে পড়া মূল্যবান মাধ্বীর নেশাতেও তাঁর চোখে সে-রকম কোন রঙ ধরাতে পারে নি কেউ।

বরং রাত যত গভীর হয়ে এসেছে, নেশা আপনিই কেটে এসেছে একটু একটু ক'রে।

মেয়েগুলোর এই নির্লজ্জ গায়ে-পড়া তখন যেন অসহ্য বোধ হয়েছে আরও।

তিনি মধ্যে মধ্যে বৃক্ষচ্ছায়ার সুযোগ নিয়েছেন ঠিকই, তবে সে বিশেষ কাউকে নিয়ে পথ হারাবার জন্যে নয়, নারী-সঙ্গ পরিহার ক'রে বয়স্যদের সঙ্গে একটু নিভৃতালাপের উদ্দেশ্যেই।

শেষে এক সময় আর মনোভাব চাপতে পারেন নি।

তখন রাত্রি দ্বিপ্রহরের আরতি শেষ হয়ে গেছে, কন্দর্প-মন্দিরের কপাট বন্ধ ক'রে চলে গেছেন পূজারী। মন্দিরপ্রাঙ্গণ জন-বিরল হয়ে এসেছে।

অবশ্য অনেক আগে থেকেই মন্দিরে আসার আগ্রহ কমে গেছে মানুষের দেবতার পূজার থেকে উপলক্ষটার সুবিধা নেওয়ার দিকেই তাদের ঝোঁক বেশী।

চন্দ্রালোকের নীলাভ অস্পষ্টতা নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গেই পথে বেড়াবার বেশী আগ্রহ দেখা গিয়েছে লোকের—ফলে যারা নির্জনতা চায়, তাদের এখানে আসাই নিরাপদ হয়ে উঠেছে—আজকের এই উৎসব-কোলাহলের লক্ষ্যবিন্দু বা কেন্দ্রবিন্দু এই মন্দিরে।

রাজাও তা জানতেন। তাই তিনি কোনমতে উৎসবোন্মত্ত জনতার চোখ এড়িয়ে মন্দিরেই চলে এসেছেন। শ্রান্তভাবে উদ্যান-প্রাঙ্গণে একদা পুষ্পিত বকুলশাখার নিচে পাষাণ-বেদিকায় বসে পড়ে বন্ধু বলভদ্রকে সক্ষোভে বলেছেন, 'তাই তো বন্ধু, পৃথিবী থেকে সুন্দরী মেয়ে লোপ গেলে একেবারে? কোথাও কি আর মনের মতো কোন মেয়ে নেই?'

বেদিকার কাছেই শষ্পাচ্ছাদিত ভূমিতে এক চম্পককাণ্ডে ঠেস দিয়ে বসেছিল এক তরুণ যুবা।

অন্যমনস্কভাবে দূর্বাশীর্ষ দাঁতে কাটতে কাটতে কন্দর্প মন্দিরের স্বর্ণ-কলসমণ্ডিত চূড়ার দিকে চেয়ে ছিল, বোধ করি কাল প্রত্যূষে প্রথম সূর্য-কিরণস্পর্শে এর চেহারাটা কেমন দাঁড়াবে অনুমান করার চেষ্টা করছিল।

ভাবছিল জ্যোৎস্নারাত্রির মোহ আর স্বপ্ন ঘুচে গিয়ে রূঢ় বাস্তব যখন তার কর্কশ রুক্ষ চেহারা নিয়ে দেখা দেবে—তখন সুবর্ণের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পাবে সন্দেহ নেই, মন্দির-গাত্রের পাষাণভস্ম শুভ্রতা আরও প্রখর হয়ে উঠবে তাও ঠিক—তবু এত ভাল কি লাগবে?

নৈকট্যের তথ্যবহুল দীপ্তি বেশির ভাগ সময়ই অবাঞ্ছনীয়, তার থেকে দূর অস্পষ্টতা—যার ছায়াময় শূন্যতাকে মানুষ নিজের মনের কল্পনা আর মোহ দিয়ে ভরিয়ে নিতে পারে, এঁকে নিতে পারে ইচ্ছামতো রঙ দিয়ে—অনেক ভাল।

অন্যমনস্ক হয়ে থাকলেও রণমল্লদেবের খেদোক্তি যুবার কানে গেল।

যাওয়ার কোন বাধাও ছিল না, ছেলেটি যেখানে বসেছিল সেখানটা রাজার পাষাণ-বেদিকা থেকে ছ-সাত হাতের বেশী দূরে নয়, তাছাড়া রাজা চুপিচুপি বলারও চেষ্টা করেন নি কথাটা—বরং বন্ধুরা যাতে সবাই শুনতে পায় সেইভাবেই বলেছিলেন।

ছেলেটি দু-তিন মুহূর্তে ইতস্ততঃ করল, হয়ত অনাহুত এদের আলোচনায় যোগ দেওয়া উচিত হবে কিনা ভাবল—কিন্তু বোধ হয় শেষ পর্যন্ত তার নিজের জ্ঞানের অভিমানই প্রবল হয়ে উঠল, মুখ থেকে দুর্বা-শীর্ষটা নামিয়ে একটু ব্যঙ্গের সুরেই বলল, 'পৃথিবী কি তোমাদের এইটুকু এক টুকরো মাটির মধ্যেই শেষ হয়ে গেছে বন্ধু যে এই অর্ধ-নগর সামান্য একটা জনপদের নায়িকাদের দেখেই এতবড় একটা সিদ্ধান্ত ক'রে বসলে ? পৃথিবীর সীমা এটুকু নাকি ?…অষ্টকুলাচল-সপ্তসমুদ্র-শোভিতা বিপুলা এই ধরিত্রীর ক'টা মহাদেশ, ক'টা দেশ, ক'টা জাতির খবর রাখো ?…এদেশে কোন সুন্দরী মেয়ে তোমার চোখে পড়ল না বলেই ধরে নিলে পৃথিবী থেকে ঐ জাতটাই বিলুপ্ত হয়ে গেছে ? ধিক তোমাদের ! তোমরা বুঝি এই ছোট্ট দেশটার বাইরে কিছু কল্পনা করতে পারো না ?…বেশী দূরেই বা যেতে হবে কেন, বড় বড় দেশ মহাদেশ মহাদ্বীপের কথা ছেড়েই দাও, এই তো হাতের কাছেই পগান শহর, অরিমর্দনপুরের রাজধানী, দশটা দিন একটু টেনে হাঁটলেই বোধহয় পেঁছিনো যায়—অন্তত সেখানে গিয়ে একবার দেখে এসো না, সুন্দরী কাকে বলে !'

বলভদ্রর প্রায়-শূন্য উদর সকাল থেকে শুধু আসবেই পূর্ণ হয়ে এসেছে, ফলে তার চক্ষুও যেমন রক্তবর্ণ ধারণ করেছে—মেজাজও হয়ে উঠেছে তেমনি রুক্ষ, সে ভ্রূকুটি ক'রে রূঢ়কণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'কে হে বাপু তুমি, রাজার মুখের ওপর কথা কইতে এলে ! তাঁকে ধিক্কার দিতে আসো—তোমার স্পর্ধা তো কম নয় ? কী পরিচয় ? বিদেশী বুঝি ?'

ছেলে একটু ভয় পেয়েই গেল ।

আগের ঐ বক্তাটি যে এদেশের রাজা হ'তে পারেন তা একবারও ভাবে নি সে ।

কোন রাজা যে এমন চপল দায়িত্বজ্ঞানহীন উক্তি করতে পারেন তাও তার ধারণা ছিল না ।

তবু সে ক্ষমা-প্রার্থনার কোন চেষ্টা করল না, শুধু অপেক্ষাকৃত বিনম্র ভঙ্গীতে বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি বিদেশী, শিক্ষার্থী ।'

'কোথায় দেশ তোমার ?' আরও উদ্ধত রূঢ় হয়ে ওঠে বলভদ্রর কণ্ঠস্বর, 'কোথায় যাবে ? এখানে এসেছ কেন ? এত রাত্রে মন্দিরে কি করছ ? আমাদের কাছে কাছে ঘুরছ কেন ? গুপ্তচর বুঝি ?'

সোজা হয়ে বসে বলভদ্র, প্রশ্ন করতে করতেই ।

ছেলেটি এবার উঠে দাঁড়ায়, আরও দু-এক পা কাছে এসে বলে, 'আমি ব্রহ্ম দেশের লোক, আপনারা যাকে ব্রহ্ম বলেন । বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে ওদন্তপুর বিহার যাচ্ছি । আমার কাছে দেশের রাজার দেওয়া পরিচয়পত্র আছে, মহাশ্রমণের নামেও চিঠি আছে, আমার অধ্যাপকের লেখা—আমি যে গুপ্তচর নই তা তাতেই প্রমাণ হবে ।…আসবার সময় পগান হয়েই এসেছি, সদ্য দেখে এসেছি—সে আশ্চর্য রূপের কথা এখনও ভুলতে পারি নি—তাই

কথাটা বলে ফেলেছি। আমার অধ্যাপক আমাকে পগান তাম্রদীপ হয়ে পট্রিকেরের পথে যেতে বলে দিয়েছেন, বহু দ্রষ্টব্য স্থান নাকি পড়বে এ-পথে। তাছাড়া উত্তরদিকের পথ দুর্গমও বটে, বিপজ্জনকও। আমি দুদিন আগে এখানে পৌঁচেছি, স্থানীয় এক মঠে অতিথি হয়ে আছি। আজকের এই উৎসবের কথা অনেকদিন থেকেই শোনা ছিল, তাই এ দুটো দিন থেকে গেলাম। কালই আমি এখান থেকে রওনা দেব—বিক্রমশীলা হয়ে মগধের পথে।'

তারপর অপেক্ষাকৃত নিম্নকণ্ঠে স্বগতোক্তি করল, 'যে নির্লজ্জ বেলেল্লা-গিরি দেখলাম, না থাকলেই ভাল হ'ত, অনর্থক দুটো দিন নষ্ট হ'ল।'

আর কোন অনভিপ্রেত প্রশ্নের না প্রয়োজন হয় সেই জন্য নিজের সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য প্রায় একনিঃশ্বাসে বলে নিয়ে ছাত্রটি চুপ করল।

কাছে এগিয়ে আসাতে উভয় পক্ষেরই সুবিধা হয়েছে।

এই ছেলেটি বুদ্ধিমান, দৃষ্টি প্রতিভাদীপ্ত।

শিক্ষিত যে, তা কথাবার্তা ভাবভঙ্গীতেই প্রকাশ।

পূর্ব-দেশাগত, সেও মুখ-চোখ ও আকৃতিতে প্রতীয়মান।

ছেলেটিরও—এদের মধ্যে কে রাজা তা চিনতে অসুবিধা হয় নি, সে রণমল্ল-দেবের উদ্দেশে একটা নমস্কার ক'রে জোড়হাতেই দাঁড়িয়ে রইল।

বলভদ্রের প্রশ্ন করার ভঙ্গী এবং ছাত্রটির দীর্ঘ উত্তর অসহিষ্ণু রণমল্লদেবের ভাল লাগে নি। সময়ের অপব্যয় মনে হয়েছে।

তিনি উত্তেজিতভাবে উঠে এসে ছেলেটির অঞ্জলিবদ্ধ দুটি হাত চেপে ধরলেন, 'সে কে? ··তুমি আমার বন্ধু, বল বন্ধু কে সে, ঠিক কেমন? আমার আর ধৈর্য মানছে না!'

ছাত্রটি বোধ করি বুঝল এই নবলব্ধ তরুণ বন্ধুর মনের ভাব।

সম্ভবত প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই তার মন চলে গিয়েছিল সদ্য-অতীতে, স্মৃতি-বীণার তারে বেদনার্ত ঝঙ্কার তুলেছিল অপরপক্ষের এই আগ্রহ, রাজার মনোভাবের তরঙ্গ তার মনেও সমভাবের প্রতিতরঙ্গ সৃষ্টি করল, সে যেন কী স্বপ্নের ঘোরে মুক্তকণ্ঠে উত্তর দিল, 'সে কেমন? কী ক'রে বলব, সে কেমন? কবি হ'লে তার যোগ্য বর্ণনা হ'ত। শ্বেতপদ্মের মতো তার গায়ের রঙ, পূর্ণ-চন্দ্রের সুষমা তার মুখে, নীলপদ্মের পলাশের মতো তার চোখ, নবীন মেঘের মতো নীলাভ কৃষ্ণ তার কেশ—না না, সে রূপের বর্ণনা হয় না বন্ধু, তুমি দেখে এসো।'

'কিন্তু কোথায় পাব তাকে, বলো বলো—তার পরিচয়!'

রাজা আরও অধীর হয়ে ওঠেন। ছাত্রবন্ধুটির অঞ্জলিবদ্ধ হাতের ওপর মুঠিটা যেন বজ্রমুষ্টিতে পরিণত হয়।

তবু সে সেই কঠিন বন্ধন থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করে না। বরং সহজ কণ্ঠেই বলে, 'পগানের রাজা ত্রিভুবনাদিত্যর কন্যা স্বৈন্তী, সেবন্তী বলেই আমরা জানি—মানে শুনেছি। সম্রাট অনিরুদ্ধদেবের পৌত্রী।'

'অনিরুদ্ধদেবের পৌত্রী!' যেন চমকে ওঠেন রণমল্লদেব, 'অনিরুদ্ধদেবের নাম আমি শুনেছি। তিনি আমাদের দেশে এসেছিলেন একাধিকবার, আমার পিতামহের সঙ্গে তাঁর সখ্য ছিল। তাঁর সঙ্গেই বৈশালীর রাজকন্যার বিবাহ হয় না?'

'হ্যাঁ। ঠিকই শুনেছ বন্ধু।...তুমি আমাকে বন্ধু বলে সম্বোধন করেছ বলেই আমি তোমাকে তুমি বলছি—এতে কোন অপরাধ হচ্ছে না তো? যতই হোক তুমি এদেশের রাজা, আমাদের মিত্র-রাজ্য এ দেশ, তার শাসক তুমি।'

'না না, বন্ধু না, কোন অপরাধ হচ্ছে না।' রণমল্লদেব এবার তাকে দুহাতে জড়িয়ে টেনে পাশে বসালেন, 'রণমল্ল কথা একবারই মুখ থেকে বার করে, থুথুর মতোই তা আর ফিরিয়ে নেয় না। কিন্তু তুমি? বন্ধুর নামটা জানা হ'ল না তো?'

'আমার নাম থেইনকে-আহ, তোমাদের ভাষায় সিংহবাহু। আর তোমাদের ভাষাই বলি কেন, 'ব্রহ্মীদের নাম সবই তো ভারতীয়।'

এই বলে, ভাল ক'রে বসে আরও বিস্তারিত করল তার বক্তব্য: 'শাক্য-মুনির আগে থেকেই তোমাদের দেশের লোক ও-দেশে গেছে, নগর জনপদের প্রতিষ্ঠা করছে, নতুন এক মিশ্র সভ্যতা গড়ে তুলেছে। তবে মিশ্র হ'লেও তা প্রধানত ভারতীয় সভ্যতাই।...তারপর যেমন দিন গেছে, পূর্ব থেকে উত্তর-পূর্ব থেকে ভিন্ন ভিন্ন প্রবল জাতির আক্রমণ এসেছে, তারা বিজয়ীও হয়েছে কেউ কেউ, ভারতীয়রা পিছু হটে এসে প্রধানত আরাকান আর তাম্রদ্বীপে পগানে নতুন রাজ্য গড়ে তুলেছে।...তাহলেও উত্তর ব্রহ্মেও কিছু ভারতীয় বা মিশ্র জাতির লোক থেকে গিয়েছিল বৈকি,—তারা আবারও ঐ আক্রমণকারী-দের সঙ্গে মিলে-মিশে এক হয়ে গেছে। তাই খোঁজ করলে ভারতীয় রক্তেরও দেখা পাওয়া যাবে তাদের দেহের গঠনে, মুখশ্রীতে। সভ্যতা আর ধর্ম তো থেকে গেছেই। সেই জন্যেই উত্তর থেকে চীনের ধর্মমত বা তাদের প্রভাব ওখানে বিশেষ সুবিধা করতে পারে নি, ঋষি লাওৎজে আর কনফ্যুসি ফিরে গেছেন—শাক্যমুনিরই জয়জয়কার হয়েছে।

'আমরা যারা ব্রহ্মী বা পুন্য বলে পরিচয় দিই—তোমরা যাদের বল বর্মী—তারা আসলে ভারতীয়ই, হয়ত চল্লিশ কি পঞ্চাশ পুরুষের হিসেব ধরলে দেখা যাবে আমি তোমাদের জ্ঞাতি। আজ আমাদের ওখানে অনেক শাখা-প্রশাখা, তাদের নতুন নতুন নাম দেওয়া হচ্ছে—কিন্তু আমি যতটুকু জানি, যেটুকু পড়াশুনো করেছি—ভারতীয় রক্তই আমাদের ধমনীতে প্রবল, অধিকাংশ। আমরা তোমাদের কাছ থেকে অনেক কিছু নিয়েছি, ভাষা ধর্ম সভ্যতা সংস্কৃতি সব। আমাদের মধ্যে যারা শিক্ষিত বলে পরিচয় দিতে চায়, তারা সংস্কৃত কি পালি শিখতে বাধ্য। আমিও দ্যাখো কত যত্ন ক'রে শিখেছি তোমাদের ভাষা, নইলে এত কথা কইছি কি ক'রে? আর তা না হলে ধর্মশ্যস্ত্র-গ্রন্থই বা পড়তে যাব কোন্ ভরসায়?...সেই জন্যে এখনও এই দক্ষিণ ব্রহ্মে যারা রাজা হন সকলেই খাতাপত্রে ভারতীয় নাম গ্রহণ করেন।'

এই দীর্ঘ বক্তৃতা আদৌ ভালো লাগছিল না রণমল্লদেবের।

কিন্তু এমন একটু ফাঁক পাচ্ছিলেন না যে, বাধা দিয়ে থামিয়ে দেবেন।

এইবার, বোধ করি একসঙ্গে এতগুলো কথা বলে শ্রান্ত হয়ে সিংহবাহু একটু চুপ করতেই রণমল্লদেব বলে উঠলেন, 'ওসব কথা থাক বন্ধু। তুমি—তুমি অরিমর্দনপুরের কথা বলো। সেখানের রাজা আর সেই আশ্চর্য রাজপুত্রীর কথা।'

ততক্ষণে রাজার অনুচরদের মনেও কৌতূহল জাগ্রত হয়েছে ; তারা সিংহবাহু আর রাজাকে ঘিরে ঘনীভূত হয়ে বসেছে। তাদের মধ্যে থেকে একজন—দেবদত্ত বলে উঠল, 'নাহে ছোকরা, তুমিই সত্যিকারের ছাত্র, অনেক কিছু জানো দেখছি। আমাদের দেশের খবর আমাদের চেয়ে বেশি জানো। তোমার কথাগুলো বড্ড ভাল লাগছে। তুমি বলো—আমাদের রাজাধিরাজ যা বলছেন—পগানের কথা, ওদের রাজার কথা খুলে বলো। কেমন সে দেশ, সেখানের মানুষই বা কেমন! তুমি বলছ সুন্দরী—সত্যিই কি এত সুন্দর ও-দেশে আছে? আমরা তো জানি নাক চ্যাপ্টা, গোল গোল ছোট চোখ ওদের—তাদের মধ্যেও এমন সুন্দরী দেখেছ?'

'ঐ তো তোমাদের দোষ—', হেসেই জবাব দেয় সিংহবাহু, 'শোনা কথাতেই একটা ধারণা নিয়ে বসে থাকো। এই তো এখনই বললুম, ওদের মধ্যে ভারতীয় রক্তই বেশির ভাগ—অনার্যদের মতো সকলের চেহারা হবে কেন? তাছাড়াও যার যা দেশের চেহারার ধরন, তার মধ্যেই তারা সুন্দর একটা ধরে নেয়—এই তো স্বাভাবিক। সেইজন্যেই তো বলছি, সত্যি কি মিথ্যে—একবার চক্ষু-কর্ণের বিবাদটাই ভঞ্জন ক'রে এসো না!'

॥ দুই ॥

এবার সকলেই চেপে ধরল সিংহবাহুকে। আরও জানতে চায় তারা—ওর দেশ, ওদের দেশ সম্বন্ধে।

রাজার অত ইচ্ছে ছিল না, বয়স্যদের আগ্রহ দেখে চুপ ক'রে গেলেন। রাজা অনেক কিছু জানেনও। প্রতিবেশী রাজ্য সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা রাজ্যশাসনের প্রধান অঙ্গ।

সিংহবাহু জাঁকিয়ে বসে অরিমর্দনপুর আর সেখানকার রাজবংশের ইতিহাস বলতে শুরু করল।

দেখা গেল ছেলেটি কথা বলতে ভালবাসে। তাছাড়াও, বোধহয় অল্প বয়স বলেই, তার কতটা জ্ঞান তাও জানাতে চায়। মনে হ'ল সে যেন এই কথাগুলো বলবার জন্যে বহুদিন ধরেই ছটফট করছিল। বলতে পেরে বেঁচে গেল।

বেশ বিস্তারিত ক'রেই বলল সিংহবাহু। গল্প বলার মতো ক'রে। যা বলল, তার মর্মার্থ এই :

এখন যেখানে বিরাট নতুন পগান শহর গড়ে উঠেছে, আগে সেখানেই অরিমর্দনপুর বলে এক শহর ছিল। খুব সম্ভব প্রাচীনকালে প্যু-জাতীয়

রাজারা ঐ শহর প্রতিষ্ঠা করেন। তখন রাজ্যের নাম ছিল তাম্রদ্বীপ, ঐ অঞ্চলটাকে বলা হত তত্ত্বদেশ।

অনিরুদ্ধদেব কেমন ক'রে পগান বা অরিমর্দনপুরের সিংহাসনে বসলেন এবং ক্রমে প্রায় সমগ্র ব্রহ্মদেশের অধীশ্বর হলেন—তাঁরই প্রভাবে কেমন ক'রে দেশ থেকে অনাচার দূর হয়ে বিশুদ্ধ বৌদ্ধধর্মের প্রচার হ'ল আবার—সে সম্বন্ধে লিখিত প্রামাণ্য ইতিহাস নেই, ইতিহাসের স্থান পূর্ণ করেছে অসংখ্য ও বিচিত্র কিম্বদন্তী।

এমন কিছু কিছু বেশী দিনের কথা নয়—তবু সে-সব কিম্বদন্তীর কতটা সত্য আর কতটা উদ্ভট কল্পনা তা বলা শক্ত।

যে-গল্পটা সর্বাধিক প্রচারিত, মনে হয় যার মূলে কিছুটা সত্য আছে, তা এই ঃ

এই অরিমর্দনপুরের এক রাজা ছিলেন থেইনকে। থেইনকে অর্থাৎ সিংহ। ওঁর রাণী ছিলেন অসামান্যা রূপসী—কিন্তু থেইনকের সেদিকে বিশেষ কোন আকর্ষণ ছিল না, রাজকার্যও কিছু দেখতেন না। মৃগয়া করার নাম ক'রে বনে-জঙ্গলে-প্রান্তরে ঘোরাই ছিল তাঁর নেশা। এক এক সময় শিকারের নাম ক'রে বেরিয়ে গিয়ে হয়ত মাসাধিককালই অনুপস্থিত থাকতেন। অমাত্য এবং রাজপুরুষরা নিজেদের ইচ্ছামতো আর স্বার্থমতো রাজ্য পরিচালনা করতেন। রাজার ভাণ্ডারে টাকা থাকত না, অমাত্যদের উদর পূর্ণ হত।

তাঁর এই অবহেলায় রাণীর সবদিকেই কষ্ট হ'ত।

যুবতী নারী তাঁর কামনা মেটাবার অন্য পন্থা খুঁজবেন এ খুবই স্বাভাবিক। সে-পথের অভাবও ছিল না।

ইতিমধ্যে সরহন নামে এক চাষী গৃহস্থ খুব ধনী ও প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিল।

লোকটি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও কৌশলী। বুঝেছিল যে রাজ্য একেবারেই অভিভাবকশূন্য হয়ে পড়েছে, এক্ষেত্রে যার শক্তি ও বুদ্ধি আছে, সে অল্পায়াসেই অভিভাবক হয়ে বসতে পারবে।

আর সরহনের যখন কোনটারই অভাব নেই—তখন একবার অদৃষ্টকে যাচাই ক'রে দেখতে ক্ষতি কি ?

সেই চেষ্টাই দেখল সে—

এবং এই পথে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে আগে রাণীর দিকেই হাত বাড়াল, তাঁকে দলে টানবার চেষ্টা করল।

রাণী তো প্রস্তুতই ছিলেন একরকম।

এতকাল ভৃত্য ও দ্বারীদের দিয়ে তৃষ্ণা মেটাতেন, সরহনকে তো সে জায়গায় দেবতার আশীর্বাদ বলে মনে হ'ল।

সরহন সুপুরুষ, শক্তিমান, উচ্চাভিলাষী ও কূটকৌশলী, সবদিক দিয়েই সিংহাসনে বসবার উপযুক্ত। রাজ্যরক্ষা ও শাসন—দুটো কাজই থেইনকের থেকে ভাল পারবে।

তিনি সহজেই ধরা দিলেন সরহনের কাছে।

হয়ত রাজ্য বা সিংহাসনের প্রশ্নটা তাঁর কাছে গৌণই ছিল, হয়ত চিত্ত-দৌর্বল্যেরই কারণ ঘটেছিল। তিনিই প্রণয়াসক্ত হয়ে উঠেছিলেন। রাজ-সিংহাসনও যেমন শূন্য—তাঁর হৃদয়-সিংহাসনও তেমনি, সরহনের দ্বারা দুটি স্থানই পূর্ণ হতে পারবে, অনেক ভালভাবেই।

এবার একটা উপলক্ষের অপেক্ষা।

সে উপলক্ষ মিলতেও দেরি হ'ল না।

থেইনকে একদিন গ্রামাঞ্চলে ঘুরতে ঘুরতে ক্ষুধার্ত হয়ে পাশের ক্ষেত থেকে একটি শসা তুলে খেলেন।

এমন তো সকলেই খেয়ে থাকে। ক্ষেত্রস্বামীর বিনা অনুমতিতে একটা শসা নেওয়া এমন কোন গুরুতর অপরাধ নয়, কোন দেশেই একে চুরি বলবে না কেউ।

ও-জিনিসের কীই বা দাম, চার-পাঁচটা কড়ি দিলে এক কুড়ি পাওয়া যায়। ছাগল-গরুতেই খেয়ে যায় বেশির ভাগ, অযত্নে বেড়ার গায়ে ফলে থাকে।

তাছাড়াও থেইনকে দেশের রাজা—রাজ্যের সব জিনিসেই তাঁর অগ্রাধি-কার। তাঁর তো অনুমতি নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

কিন্তু এইটুকু উপলক্ষেই সরহনের কার্যসিদ্ধি হ'ল।

রাজা ভেবেছিলেন তিনি একা, দূরে দূরে যে ক'দিন থেকেই সরহনের প্রেরিত চররা তাঁর অনুসরণ করছে তা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি।

তারা যেন এই ঘটনারই অপেক্ষা করছিল, তারা ক্ষেত্রস্বামীর লোক সেজে—কথাটা মিথ্যাও নয়, কারণ ক্ষেতটা সরহনেরই—লাঠি-সোঁটা নিয়ে 'চোর-চোর' বলে চিৎকার করতে করতে এসে রাজার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং পিটতে পিটতে একেবারে মে'রেই ফেলল।

তার পর অবশ্য 'চোরে'র পরিচয় পাওয়া গেল, লোক-দেখানো অনুতাপও করল ওরা—কিন্তু তখন তো ওদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে গেছে ; যত লোকে যত খুশি হায়-হায় করুক—রাজা আর ফিরে আসবেন না।

সরহন এই সংবাদটির জন্যেই অপেক্ষা করছিল।

সে তৎক্ষণাৎ সদলবলে এসে প্রাসাদ দখল ক'রে নিজেকে রাজা বলে ঘোষণা করল এবং প্রচার ক'রে দিল যে, অশৌচের ক'টা দিন কেটে গেলেই সে বিধবা রাণীকে বিবাহ করবে। থেইনকের যেহেতু কোন সন্তান নেই সেহেতু রাণীই তাঁর উত্তরাধিকারী। আর রাণী যখন ওকে বিবাহ করছেন তখন সরহনের সিংহাসন অধিকার আদৌ বে-আইনী হ'তে পারে না।

এত কৈফিয়তের কোন প্রয়োজন ছিল না অবশ্য।

'অদৃশ্য রাজা'র প্রজা হয়ে থাকতে থাকতে সকলেই উত্ত্যক্ত ও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল।

রাজ-কর্মচারীদের অবিচার-অত্যাচারের বিরুদ্ধে নালিশ করা যায় এবং সে-সবের প্রতিকার করতে পারেন এমন একজন সক্ষম শাসকই তারা চাইছিল।

একজন কেউ সত্যি সত্যি শাসন করলেই তারা খুশী।

সরহন যদি সে-কাজ করতে পারে তো সিংহাসনে বসুক। প্রজাদের কারও আপত্তি নেই।

আপত্তি যাদের হবার কথা—অমাত্য বা সেনাপতি—তাদেরও কোন সুযোগ ছিল না। সরহন ইতিমধ্যেই বহু লোককে হাত ক'রে নিয়েছে, সৈন্য-সেনানায়ক সকলেই তার বাধ্য। রাজভাণ্ডার তো শূন্য—সরহনই সকলের বকেয়া বেতন চুকিয়ে দিয়েছে, কিছু বেশীও দিয়েছে।

রাজ্যের যারা প্রধান ব্যক্তি, তারা বহুদিন ধরেই সরহনের অনুগত, অর্থাৎ সিংহাসনে বসবার আগে থেকেই সে রাজা হয়ে বসেছে—তাকে সরাবে কে?

তার সঙ্গে বিবাদ করতে গিয়ে নিজের সর্বনাশ করতে কেউই রাজী হ'ল না। বুদ্ধিমানের মতো চুপ ক'রে গেল।...

'কিন্তু', সিংহবাহু হেসে বললে, 'ভারতের বহু পশ্চিমে কোন দেশে কে এক বড় গুরু দেখা দিয়েছেন—আমাদের শাক্যমুনির মতোই বড় সাধু একজন—যীশু না কী যেন তাঁর নাম—তিনি একটা ভাল কথা বলেছেন। কথাটা আমার অধ্যাপকের কাছ থেকেই শোনা—তিনি নাকি যীশুর উপদেশ লেখা একটা পুঁথিও পেয়েছেন—যীশু বলেছেন, তববারির দ্বারা যার অভ্যুত্থান হবে, তরবারির দ্বারাই সে বিনষ্ট হতে বাধ্য। সরহনেরও তাই হ'ল।'

মুখে কিছু না বললেও, সরহনের এই আকস্মিক অভ্যুদয় সামন্তদের একটুও ভাল লাগে নি।

বড় বড় সেনাপতি সামন্ত থাকতে একটা চাষার ছেলে রাজা হবে কেন?...

নেহাৎ তখন অতর্কিতে ঘটনাটা ঘটে গিয়েছিল, সকলের অজ্ঞাতসারে অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছিল সরহন, চুপি চুপি শক্তি সঞ্চয় ক'রে নিয়েছিল—তাই তখন কেউ বাধা দিতে পারে নি।

মনের অসন্তোষ কিন্তু সকলের মনেই তুষের আগুনের মতো জ্বলছিল একটু একটু ক'রে।

বহুদিন বাদে সরহনের প্রতিপত্তি একটু একটু ক'রে কমে আসতে—কমে আসতে বাধ্য, কারণ হঠাৎ-বড়লোক হলে অনেকেরই মাথার ঠিক থাকে না, সরহনও ধরাকে সরা দেখতে শুরু করেছিল, বিশেষ ওর দু'টি ছেলে এত উদ্ধত ও অশিষ্ট হয়ে পড়েছিল যে, সেনাপতি ও অমাত্যের দল বিষম বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন ভেতরে ভেতরে—সুযোগ বুঝে কাউঙ্গ পন্য বলে একজন সামন্ত রাজা বিদ্রোহী হয়ে উঠে সরহনকে আক্রমণ করলেন।

এও এত অতর্কিতে ঘটল যে সরহন প্রস্তুত হবার কোন সময় পেল না, শুধু পরাজিত হ'ল তাই নয়—কাউঙ্গ পন্যর হাতেই নিহত হ'ল।

সরহনের ছেলেদুটি তখন রাজধানীতে ছিল না। তারা নিজেরাই গুণ্ডা প্রকৃতির লোক, ঐ ধরনের একটা দলও তাদের হাতে থাকবে—এটা স্বাভাবিক। তারা—কাউঙ্গ পন্য নিজের অধিকার দৃঢ় করার আগেই, অন্য সেনাপতিদের

ভয় দেখিয়ে কিছু কিছু নিজের দলে এনে কৌশল ক'রে কাউঙ্গ প্যু আর তাঁর ছেলে অনউরথকে বন্দী করল।

তবে অন্য সামন্তদের ভয়ে একেবারে মেরে ফেলতে সাহস করল না—রাতারাতি মাথা কামিয়ে হলদে কাপড় পরিয়ে ভিক্ষু সাজিয়ে ফেলল এবং এক মঠে পাঠিয়ে কড়া পাহারায় নজরবন্দী ক'রে রাখল এবং সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যে ঘোষণা ক'রে দিল যে, সরহনকে হত্যা করার জন্য ওঁদের খুব অনুশোচনা হয়েছে এবং সেই কারণেই সংসার ত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছেন।

এর পর সরহনের বড় ছেলেটি সিংহাসনে বসল, কিন্তু বেশীদিন 'রাজ্‌গী করা' তার ভাগ্যেও ছিল না।

দৈত্যের মতো চেহারা, তেমনি স্বভাব আর তেমনিই ইন্দ্রিয়াসক্তি ছিল ওদের। অবিরাম অমিতাচারের ফলে ক্ষয়রোগ ধরল, আর তাতেই মৃত্যু হ'ল।

এর পর সিংহাসনে বসল সরহনের ছোট ছেলে।

এতদিন কাউঙ্গ প্যু আর তাঁর ছেলে অনউরথ সেই মঠেই বন্দী হয়ে ছিলেন, সেই অবস্থাতেই কাউঙ্গ প্যু মারা গেলেন।

বোধহয় রাজার তরফ থেকে পাহারায় শৈথিল্য এসেছিল। এতদিন পালাবার চেষ্টা না করায় রাজারা ধরেই নিয়েছিল যে সে ইচ্ছা ওঁদের নেই—তীক্ষ্নধী অনউরথ ধীরে ধীরে রক্ষীদের হাত ক'রে নিয়েছিলেন—তিনি এই সময় একদিন গভীর রাত্রে মঠ থেকে পালিয়ে, প্রত্যূষে সকলের অলক্ষ্যে একেবারে রাজার শয়নকক্ষে চলে গেলেন।

ভিক্ষুর বেশে কেউ তাঁকে চিনতে পারে নি, বাধাও দেয় নি কেউ।

রাজাকে জাগিয়ে অনউরথ তাঁকে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আহ্বান করলেন।

যুদ্ধ করা ছাড়া আর কোন উপায়ও তখন নেই, পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছেন অনউরথ, তাছাড়া সরহন-তনয়ের নিজের শক্তির ওপর অগাধ বিশ্বাস, সে তুলে আছাড় মেরে শেষ ক'রে দেবে স্পর্ধিত লোকটাকে।

কিন্তু অনউরথ অনায়াসে তাকে মেরে ফেললেন, এদিকে তাঁর দলবল প্রস্তুতই ছিল, বিজয়ী বীরের সিংহাসন দখল করতে কোন অসুবিধা হ'ল না।

অনউরথ নাম সংস্কৃত অনিরুদ্ধেরই অপভ্রংশ।

অনিরুদ্ধ যখন সিংহাসনে বসলেন অরিমর্দনপুর রাজ্য বলতে পগান শহরকে কেন্দ্র ক'রে সামান্য একটুখানি দেশ। অনিরুদ্ধের আমলেই রাজ্য সাম্রাজ্যে পরিণত হ'ল—প্রায় সমস্ত ব্রহ্মই তাঁর পদানত হ'ল একে একে। অনিরুদ্ধদেব নিঃসন্দেহে ব্রহ্মের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি।

কিন্তু অনিরুদ্ধ যখন প্রথম রাজা হলেন তখন তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা কিছুই ছিল না।

একেবারেই যাকে বলে জংলী, তাই ছিলেন।

বস্তুত সমস্ত পগান রাজ্যেই লেখাপড়ার বালাই ছিল কিনা সন্দেহ।

লেখাপড়া তো দূরের কথা—অক্ষরের সঙ্গেই সম্পর্ক ছিল না বিশেষ।

অনিরুদ্ধ রাজা হবার পরে একজন ব্রাহ্মণ ভিক্ষু দক্ষিণ ব্রহ্মের মোনদেশের রাজধানী থটন থেকে পগানে আসেন এবং রাজার সঙ্গে পরিচয় ক'রে আসল যা বৌদ্ধধর্ম—যাকে হীনযান বলে—সেই থেরবাদে তাঁকে প্রভাবিত করেন। ক্রমে অনিরুদ্ধ তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়ে তাঁকেই গুরুর পদে বরণ করেন।

এই সময় ও-অঞ্চলে মহাযানী বৌদ্ধদেরও একটা নিকৃষ্ট সম্প্রদায়—অরি নামে পরিচিত ছিল তারা—খুব উৎপাত করত।

এমনিতেই মহাযানী বৌদ্ধ যারা, তারা শাক্যমুনির আসল মতবাদ থেকে অনেক নিচে নেমে এসেছে, তান্ত্রিক ক্রিয়া-কলাপের দিকেই তাদের ঝোঁক বেশী।

সেই মতো নানা উদ্ভট দেবী-মূর্তি কল্পনা ক'রে বীভৎস উপকরণ ও উপায়ে পুজো করে। আসলে এগুলো ওদের কলুষিত কামনা মেটাবারই একটা পথ মাত্র।

অরিরা ছিল আরও এক কাঠি সরেস। তারা আবার এর সঙ্গে নাগধর্ম বলে নিকৃষ্ট ধরনের এক মত গ্রহণ করে নানা রকম কলুষিত আচরণে লিপ্ত থাকত। এরা কালো পোশাক পরত, লম্বা চুল-দাড়ি রাখত এবং মদ-মাংস-মেয়েছেলে নিয়ে দিনরাত হুল্লোড় করত। লোকের ধারণা ছিল ওরা নানা ধরনের মন্ত্র-তন্ত্র ও জাদু জানে; মারণ বশীকরণ তো তুচ্ছ, আরও অনেক রকম জানে ওরা; ওদের বিষনজরে পড়লেই ওরা সর্বনাশ করবে। সেই ভয়ে সকলেই ওদের মেনে চলত, ঘাঁটাতে সাহস করত না, যা-খুশি অত্যাচার করলেও নীরবে সহ্য করত।

গুরুর আদেশে অনিরুদ্ধদেব এদের বিরুদ্ধে অভিযান করেন ও শেষ পর্যন্ত ওদের সম্পূর্ণভাবে দমন করেন।

অরিরা কেউ পাহাড় অঞ্চলে পালিয়ে গিয়ে আত্মগোপন করে—কেউবা ওসব ধর্মাচরণের বুজরুকি ছেড়ে চাষবাস গার্হস্থ্যধর্মে মন দেয়।

এরপর অনিরুদ্ধদেব শিক্ষার দিকে মন দিলেন।

মোন রাজ্য তখন বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রে খুব অগ্রণী, এমনিতেও খুব শিক্ষিত সভ্য ছিল ওখানকার লোক। অনিরুদ্ধ মোনরাজ্য অধিকার ক'রে ওখানকার বহু পুঁথি নিয়ে এসে পড়াবার ব্যবস্থা করলেন, ওখানকার স্থপতি ও শিল্পীদের এনে বড় বড় প্রাসাদ ও মন্দির তৈরি করালেন।

এক কথায় পগান সব দিক দিয়েই শ্রেষ্ঠ শহর হয়ে উঠল।

এছাড়াও জলনিকাশী ব্যবস্থা, সেচ ব্যবস্থা—এসবও মোনদের কাছ থেকে শেখা ওদের। কিন্তু ঐশ্বর্যের দিক দিয়ে উন্নতি করার থেকেও জ্ঞানচর্চায় দেশকে উন্নত ক'রে তোলার দিকেই অনিরুদ্ধদেবের ঝোঁক বেশী ছিল। লেখা-পড়া, বিশেষ শাস্ত্রচর্চার যাতে প্রসার হয় সেজন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা ক'রে গেছেন বরাবর।

তাঁর শক্তি, যোগ্যতা ও বুদ্ধির খ্যাতি দেশের বাইরে ভারতবর্ষের সর্বত্র, চীনে এমন কি সুদূর সিংহলেও ছড়িয়ে পড়েছিল।

সিংহলের রাজা একবার পরাক্রান্ত শত্রুর আক্রমণে বিপন্ন হয়ে অনিরুদ্ধ-দেবেরই সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন।

এই অনিরুদ্ধদেবের এক মহিষী ছিলেন বৈশালীর রাজকন্যা পঞ্চকল্যাণী।

বৈশালীর রাজা স্বেচ্ছায় সাগ্রহে তাঁকে কন্যা দান করেছিলেন।

অনিরুদ্ধদেব যখন ভারতবর্ষে এসে বিবাহ ক'রে কন্যাকে নিয়ে যান—যাতায়াতের পথে সর্বত্রই তিনি বিপুল সমাদর লাভ করেছিলেন।

এই বৈশালী-দুহিতাই বর্তমান রাজা ত্রিভুবনাদিত্যের মা।

রাজা তাঁর মায়ের কাছ থেকেই সুন্দর মুখশ্রী পেয়েছেন। রাজকুমারী সেবন্তীর আশ্চর্য রূপের রহস্যও ঐ। শোনা যায় তাঁর পিতামহীর মতোই রূপসী হয়েছেন তিনি; তাছাড়া সেবন্তীর মাও ভারতবর্ষের কন্যা।

ত্রিভুবনাদিত্য সব দিক দিয়েই পিতার উপযুক্ত পুত্র। তিনি তাঁর দেশকে আরও ঐশ্বর্যশালী—আরও শক্তিমান ক'রে তুলেছেন। অনিরুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর কিছু বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল, ত্রিভুবনাদিত্য কঠোর হস্তে তা দমন করেছেন।

এদেশের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আরও নিবিড়। ভগবান তথাগতের জন্ম-ভূমি বলে এদেশের সব কিছুই তাঁর প্রিয়। বুদ্ধগয়ায় মন্দিরের জন্য তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছেন। বহু ভারতীয় বৌদ্ধ ভিক্ষু ও বৈষ্ণব সাধু তাঁর আশ্রয়ে বাস করে, তিনি প্রত্যহ আটজন সাধুকে স্বহস্তে পরিবেশন ক'রে খাইয়ে তবে নিজে আহার করেন। সম্প্রতি তিনি পগানে যে মন্দির তৈরি করিয়েছেন, ব্রহ্মদেশে তো নয়ই—সারা পৃথিবীতে তার তুলনা আছে কিনা সন্দেহ। এ মন্দিরের নক্‌শা ও পরিকল্পনাও তাঁর নিজের।

এই যার পিতা, অনিরুদ্ধদেব যার পিতামহ—সেই রাজকুমারী সেবন্তী সামান্যা কেউ নয়।

এইটে বোঝাবার জন্যেই এই ইতিহাসের অবতারণা।

ত্রিভুবনাদিত্যের পুত্রসন্তান নেই, সেবন্তী সিংহাসনের উত্তরাধিকারিণী। সেবন্তী শুধু রূপেই নয়—বিদ্যায়, শিল্পকলায়, সঙ্গীতে, নৃত্যে, এমন কি রাজনীতিজ্ঞানেও অদ্বিতীয়া। সব দিক দিয়েই এ মেয়েকে নারীকুলরত্ন বলা যায়।...

দীর্ঘ ইতিহাস বিবৃত ক'রে সিংহবাহু উপসংহার টানল, 'আমাদের দেশের পেলবতা আর গঠন, তোমাদের দেশের মুখশ্রী মিলিয়ে বিধাতা ঐ আশ্চর্য রত্ন সৃষ্টি করেছেন।...জানি না, এত বড় পৃথিবীর কীই বা জানি, তবু মনে হয় কোথাও বুঝি ওর তুলনা নেই।'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল সকলে। তারপর যেন মোহটা ভেঙে দেবার জন্যেই বলভদ্র বলে উঠল, 'তুমি বুঝি কবিতা লেখ ছোকরা! এ যা বলছ—এ তো বাস্তবে হয় না। এ তো কবির কল্পনা!'

সিংহবাহু রাগ করল না। আস্তে আস্তে জবাব দিল, 'তাকে দেখলে অ-কবিও কবি হয়ে যাবে। তবে এও জেনে রাখো, কোন কবির সাধ্য নেই যে, তার রূপের যথার্থ বর্ণনা করে। কোন পটুয়ার সাধ্য নেই যে, সে-রূপ

চিত্রপটে ধরে রাখে। সে অবিশ্বাস্য। আমি যে নিজে দেখেছি, তাও আমার যেন বিশ্বাস হচ্ছে না।'

রণমল্লদেব ওর দুটো হাত সবলে চেপে ধরলেন, 'তুমি কি আমাকে পাগল না ক'রে ক্ষান্ত হবে না?'

সিংহবাহু হেসে বলল, 'এই চুপ করলাম। আর বলব না।...'

সেদিন চতুর্দশী হলেও সন্ধ্যার পর থেকেই পূর্ণিমা পড়েছে। আকাশে তখন পূর্ণ চন্দ্র। প্রাসাদের ঘড়িতে একটু আগেই রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের ঘণ্টা বেজেছে, অর্থাৎ চাঁদ তখন মধ্যগগনে।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে সেদিকে তাকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে যেন আপন মনেই আবারও বলল সিংহবাহু, 'এই যে মধু-মাসের চাঁদ—এর চেয়েও সে সুন্দর, এর চেয়েও সুন্দর!'

রণমল্লদেব সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালেন, তাঁর পদক্ষেপে বা কণ্ঠে পূর্বের জড়তা আর নেই লেশমাত্রও, বললেন, 'আমি আজ রাত্রি-শেষেই পগান যাত্রা করব। মনস্থির ক'রে ফেলেছি। কিন্তু কোথায় কী ভাবে তার দেখা পাব, তা তো জানি না। কোথায় গেলে কী কৌশলে তার দেখা পেতে পারি, একটু বলে দাও দয়া ক'রে। আমি তো সে-দেশের কিছুই জানি না। অতবড় সম্রাটের দুহিতা—শেষ পর্যন্ত যদি দেখা না পাই!'

সিংহবাহু বলল, 'তাই বলে একা যাবে কি!...না না, এসব পাগলামি ক'রো না। হাজার হোক তুমি রাজা—গেলে রাজার মতোই যাবে। সেই তো সহজ।'

উপস্থিত সহচরদের মধ্যেও প্রতিবাদের গুঞ্জন উঠল। এতটা পথ, একা যাবে কি?

বলভদ্র বলল, 'এখন তোমার মাথার ঠিক নেই, মাধ্বীর প্রভাব এখনও ঠিক কাটে নি। এসব প্রসঙ্গ আপাতত থাক, প্রাসাদে ফিরে স্নান ক'রে নিদ্রা যাও, সকালে উঠে মাথা ঠাণ্ডা ক'রে আলোচনা করা যাবে।'

রণমল্লদেব সে কথায় কর্ণপাত না ক'রে সিংহবাহুকেই উত্তর দিলেন, 'পাগল তুমিই তো করলে বন্ধু! এখন পাগলামি ক'রো না বললে চলবে কেন?...আমি নেশার ঘোরে কথা বলছি ঠিকই—কিন্তু সে মাধ্বী কি আসবের অপ্রকৃতিস্থতা নয়—সে-সব কেটে গেছে বহুক্ষণ। এখন মাতাল হয়ে উঠেছি তোমার কথার নেশায়।...যেতেই হবে আমাকে, আজ না হয় কাল—বেশী দেরি করতে পারব না।'

'যেতে হয় যাও—কিন্তু তাই বলে একা যাওয়া কি সম্ভব! পথের বিপদ তো আছেই—কষ্টও তো কম নয়। লোকজন নিয়ে যাও—যদি একান্তই যেতে হয়।'

সিংহবাহু যেন নিজেকে বিব্রতই বোধ করে, রাজার কল্পিত বিপদের জন্যে দায়ী মনে করে কতকটা।

'কষ্ট তো করতেই হবে ভাই। রত্নের সন্ধানে গেলে দুর্গম পথেই যেতে হয়।...রাজা হিসেবে এ উদ্দেশ্যে যাওয়া যায় না। যে অনেক হাঙ্গামা, বহু বিলম্বের ব্যাপার। রাজা সেজে গেলে হয় বিজয়ী রূপে যেতে হয়, নয়তো অতিথি হিসেবে। আগে দূত পাঠাতে হবে, অনেক কৈফিয়ৎ দিতে হবে, কেন যেতে চাইছি—তাঁরা স্বভাবতই সন্দিগ্ধ হয়ে উঠবেন, সে সন্দেহের নিরসন হ'লে তবে তাঁরা নিমন্ত্রণ পাঠাবেন। সেভাবে গেলে রাজ-অতিথি হয়ে থাকা—সেও কতকটা বন্দীদশা, তাঁদের নির্দেশমতো চলা, বিস্তর লিখিত-অলিখিত রীতিনীতির জাঁতা-কলে পড়তে হত। হয়ত—আমার যে জন্যে যাওয়া তা-ই হয়ে উঠবে না। সোজাসুজি তো আর বলা যায় না—আমি তোমার মেয়েকে দেখতে এসেছি।...সে হয় না, গেলে গোপনেই যেতে হবে, পরিচয় গোপন ক'রে, ছদ্মবেশে।...তুমি এখন বলো শুধু—কোথায় কীভাবে তাকে দেখতে পাব?'

সিংহবাহু কিছুক্ষণ মৌন থেকে বলল, 'রাজকুমারী সেবন্তী প্রতি পূর্ণিমার সন্ধ্যায় নবনির্মিত আনন্দ মন্দিরে পূজো দিতে আসেন। আমিও এমনি এক পূর্ণিমার রাত্রেই তাঁকে দেখেছি। একটু কৌশল করলে কাছ থেকে ভালভাবেই দেখা যেতে পারে—কারণ মন্দিরে তিনি সাধারণ নাগরিকার মতোই আসেন, কয়েকটিমাত্র সহচরী নিয়ে। প্রহরী কি দেহরক্ষী—কেউ থাকে না।'

তারপর আর একটু চুপ ক'রে থেকে—কি যেন ভেবে নিয়ে বলল, 'আগামী পূর্ণিমাই তো বৈশাখী পূর্ণিমা, শাক্যমুনির জন্মতিথি। সেদিন নিশ্চয়ই আসবেন। যদি তার মধ্যে পৌঁছতে পারো তো দেখা পাওয়া কঠিন হবে না। সাধারণত অন্য পূর্ণিমায় রাজকুমারী যখন আসেন, ভীড় একটু সরিয়ে দেওয়া হয়। অবশ্য শ্রমণ অর্হৎ, ছাত্র, সাধু—এঁদের কিছু বলা হয় না, তবে এঁরা নিজেরাই সরে যান—কিন্তু বুদ্ধ-পূর্ণিমায় বহু লোক আসবে সন্ধ্যায় আলো দিতে, তখন ভীড় সরানো অসম্ভব। যদি সেদিন পৌঁছতে পার অনায়াসেই দেখা পাবে।'

'ধন্যবাদ। অজস্র ধন্যবাদ বিদেশী বন্ধু। নিশ্চয় পৌঁছব—যদি ইতিমধ্যে মারা না পড়ি। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। আগামী পূর্ণিমার রাত্রি আনন্দ মন্দিরেই কাটাব।'

'কিন্তু আমি যে বড় কুণ্ঠিত বোধ করছি রাজা!', অনুনয়ের সুরেই বলে সিংহবাহু, 'আমি যদি কথাটা না তুলতুম—! এমনভাবে—! তোমাকে হয়ত একটা ঘোর বিপদের মধ্যে ঠেলে দিলুম। এর জন্য কুণ্ঠা ও আত্মগ্লানির সীমা থাকবে না আমার।...আমারও আর অবসর নেই, অধ্যাপকের কাছে পত্র চলে গেছে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আমাকে ওদন্তপুর পৌঁছতেই হবে, নইলে আমিই ফিরে যেতাম আবার তোমার সঙ্গে—পথ দেখিয়ে।'

রণমল্লদেব বোধ করি অনাবশ্যক বোধেই এ-কথার কোন উত্তর দিলেন না, এমন কি সিংহবাহুকে একটা বিদায়-সম্ভাষণও জানালেন না, বিনাবাক্যে দ্রুত

প্রাসাদের পথ ধরলেন।

ব্যাকুল সিংহবাহু পিছু পিছু যাওয়ার খানিকটা বৃথা চেষ্টা ক'রে হতাশভাবে ফিরে এল। বলভদ্রকে বলল, 'কিন্তু এমনভাবে সত্যি-সত্যিই ওঁকে একা ছেড়ে দিও না তোমরা। কত কি দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন—অন্তত কয়েকজন সঙ্গে যেও—'

'পাগল হয়েছ তুমি! ও ক্ষেপে গেছে বলে আমরা তো ক্ষেপি নি!' বলভদ্রও উঠে প্রাসাদের পথ ধরল, 'আমি আর এই বন্ধু হরসুন্দর আর ওর নিজস্ব ভৃত্য বুধনাথ—এ তিনজন সঙ্গে যাবই। কেমন ক'রে এড়িয়ে যায় দেখি। এই রাত থেকেই আমরা ওকে ঘিরে বসে থাকব। আমাদের এড়িয়ে যেতে গেলে আমাদের বধ ক'রে যেতে হবে।'

॥ তিন ॥

সেই বৈশাখী-পূর্ণিমার রাত্রে রাজকুমারী সেবন্তীর আনন্দ মন্দিরে পূজা দিতে যাওয়া হয় নি।

তার কারণ, তাঁর পিতা ত্রিভুবনাদিত্য ক'দিন ধরে ভারতাগত যে সাধুদের সেবা করছিলেন, তাঁরা ঐদিন রাজা ও রাজ্যের কল্যাণে কয়েক প্রহরব্যাপী, অর্থাৎ পূর্ণিমা যতক্ষণ থাকবে, এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন।

সেখানে তাঁর বা তাঁর স্থলাভিষিক্ত কোন প্রতিনিধির উপস্থিত থাকা প্রয়োজন, নইলে এই হিতাকাঙ্ক্ষী সন্ন্যাসীদের অসম্মান করা হয়।

রাজার অনেক জরুরী কাজ পড়েছিল সেদিন।

বিশেষ সেদিন অপরাহ্ণে তিনি নিজেই অমাত্যসভার এক জরুরী বৈঠক ডেকেছিলেন।

চীন সম্রাটের অনুরোধে এই প্রথম পগান থেকে স্থায়ী রাজদূত পাঠানো হচ্ছে চীনের রাজসভায়। এঁদের দূত সদলবলে রওনাও হয়ে গেছেন। এখন সংবাদ এসেছে যে, চোলরাজাও চীনে দূত পাঠাচ্ছেন এবং একই দিনে দুই দূতকে রাজসভায় আহ্বান করা হয়েছে—সম্রাটের সঙ্গে পরিচয় করানোর জন্য।

চোলরাজা যদিচ ত্রিভুবনাদিত্যের শ্বশুর হন সম্পর্কে—তবু এ সংবাদে অরিমর্দনপুরাধিপতি রীতিমত অপমানিত বোধ করেছেন। পগানের দূত আর চোলরাজের দূতকে যদি চীন রাজসভা সমপর্যায়ে ফেলেন, সেটা পগানের পক্ষে মর্যাদাহানিকর বৈকি।

চোল সম্ভবত গায়ে পড়েই দূত পাঠাচ্ছে—চীনের আমন্ত্রণের অপেক্ষাও করে নি।

আত্মীয়তা স্থাপিত হয়েই এই বিপদ ঘটেছে—এখানকার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সংবাদও অনতিবিলম্বে চোল-রাজসভায় পৌঁছে যায়। তাদের চর যে ত্রিভুবনাদিত্যের অন্তঃপুরেই!

পগানের নিমন্ত্রণ এসেছে খবর পেয়েই যে চোলরাজের এই দৃষ্টিকটু ব্যস্ততা, সে সম্বন্ধে অন্তত ত্রিভুবনাদিত্যের কোন সন্দেহ নেই, চোলরাজ সর্বদা সমস্ত বিষয়ে পগানকে টেক্কা দেবার জন্য উদ্‌গ্রীব।

কিন্তু ত্রিভুবনাদিত্য এ ধৃষ্টতা আদৌ সহ্য করতে প্রস্তুত নন।

এখনই উপযুক্ত ব্যক্তি নির্বাচন ক'রে বিশেষ দূতরূপে একজনকে পাঠাতে হবে, তার জন্য দ্রুতগামী ডাকের ব্যবস্থা করতে হবে, সঙ্গে রক্ষী কয়েকজন ছাড়াও আর একজন ভাল লোক দিতে হবে, প্রথম ব্যক্তি যদি কোন কারণে অপারগ হয়ে পড়েন—অসুস্থ হয়ে বা দুর্ঘটনায়—তাহলে দ্বিতীয় ব্যক্তিটি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে কাজ চালাবেন ; দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে ঘোড়া যাবে না —সেজন্য কতকটা পথ খচ্চর ও বাকীটার জন্য চমরী গাইয়ের ব্যবস্থা রাখতে হবে ; এর পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যবস্থা—যেখানে যা চিঠিপত্র দিতে হবে লিখে, দূত দুজনকে ভাল ক'রে তালিম দিয়ে, ঠিক কি করতে হবে কি বলতে হবে, কোন্ কথার কি উত্তর দেওয়া প্রয়োজন—বুঝিয়ে দিতে হবে, তালপত্র, ভূর্জপত্র কি কাঁচা মৃৎপাত্রে নয়—চর্মপত্রে চিঠি লিখিয়ে তাম্রাধারে পুরে দিতে হবে—যাতে সহজে নষ্ট না হয়।

এক কথায় বিস্তর কাজ।

পগানের স্থায়ী রাজদূত পেঁছানোর আগে এই বিশেষ দূতের সেখানে পেঁছানো চাই।

নির্দিষ্ট দিনের আগে ত্রিভুবনাদিত্যের দাবী চীন মন্ত্রিসভায় উপস্থাপিত করা আবশ্যক।

পগানের বক্তব্য তাদের রাজদূত আর চোল-রাজদূতকে পরিচয় করার জন্য একই দিনে একই সঙ্গে রাজসভায় নিমন্ত্রণ করা চলবে না, পগানকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। তা যদি দেওয়া না হয়—পগান নিজেকে অপমানিত বোধ করবে এবং অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে হ'লেও রাজদূত প্রত্যাহার করতে বাধ্য হবে।

অপরাহ্ণ থেকেই ব্যস্ততা চলেছে, সারা রাতই হয়ত কেটে যাবে এ ব্যাপারে।

ডাক প্রস্তুত রাখার নির্দেশ নিয়ে লোক রওনা হয়ে গেছে দ্বিতীয় প্রহরের পরই।

নষ্ট করার মতো সময় একেবারেই নেই।

কাল কৃষ্ণা প্রতিপদ, যাত্রা করার পক্ষে অতিশয় শুভদিন। প্রত্যুষেই যাতে এই বিশেষ দূত যাত্রা করতে পারে, ঠিক অরুণোদয়ের শুভ মুহূর্তটিতে—সে ব্যবস্থা আজ রাত্রি তৃতীয়-যামের মধ্যে সম্পূর্ণ করা চাই, নইলে তারা ঠিক ঐ সময়ের মধ্যে যাত্রা করতে পারবে না।

সুতরাং যজ্ঞস্থলে আজ আর রাজার থাকা সম্ভব নয়।

রাজার স্থলাভিষিক্ত হ'তে পারেন যুবরাজ বা মহামাত্য।

যুবরাজ নেই, রাজা অপুত্রক—মহামাত্যও আজ থাকতে পারবেন না। অগত্যা রাজা সেবন্তীকেই থাকতে বলেছিলেন।

এই মেয়েটিকে পুত্রসন্তানের মতোই দেখতেন রাজা, সেইভাবেই তৈরী করেছিলেন। একদিন যে এই বিপুল রাজ্যের অধীশ্বরী হবে, সিংহাসনে বসতে হবে যাকে—তাকে রাজার মতোই শিক্ষা দেওয়া, প্রস্তুত করা উচিত, ত্রিভুবনাদিত্যের এই ধারণা ছিল।

সেইভাবেই সব রকম শিখিয়েছিলেন তিনি, মায় রাজনীতি পর্যন্ত।

সে পাঠ তিনি নিজে দিতেন। তত্ত্বটা নিভৃতে বসে শেখাতেন পাখীপড়ার মতো ক'রে, তাছাড়া হাতে-কলমে শেখানোর জন্য মন্ত্রণা সভাতেও ডেকে পাঠাতেন প্রায়ই, মধ্যে মধ্যে তার মতামত জিজ্ঞাসা করতেন—কতটা বুঝেছে রাজ্য-শাসনের মূলতত্ত্ব—বোঝবার জন্য।

যুদ্ধবিদ্যাটাও অবহেলা করেন নি, প্রয়োজন হ'লে যাতে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে সৈন্য চালনা করতে পারে, আক্রমণ, প্রতিআক্রমণ-কৌশল, ব্যূহ-নির্মাণ প্রভৃতির নির্দেশ দিতে পারে।

অর্থাৎ সর্বদিক দিয়েই সেবন্তী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবার মতো।

আজও সেই কারণেই তিনি কন্যাকে যজ্ঞস্থলে থাকতে বললেন, তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে।

অন্যদিন হ'লে সেবন্তী নিঃশব্দে পিতার আদেশ পালন করতেন, আজ একটু মৃদু প্রতিবাদ না ক'রে পারলেন না। বললেন, 'কিন্তু বাবা আজ ভগবানের জন্মতিথি, আজ সন্ধ্যায় একটু ফুল-ধূপ-দীপ দিতে যাবো না!'

'প্রাসাদে ভগবান তথাগতের মূর্তির অভাব নেই কন্যা', ত্রিভুবনাদিত্য প্রশান্ত মুখে জবাব দিলেন, 'ফুল আর ধূপ-দীপ সেখানেই দিতে পারবে। ভগবান অন্তরের পূজা গ্রহণ করেন, বাইরের আড়ম্বর নয়। আনন্দ মন্দির তো সদ্য-নির্মিত হয়েছে, এতকাল যে সোয়েজিগণ মন্দিরে পূজা দিত সকলে সে পূজা কি তাঁর কাছে পৌঁছত না?···তাছাড়া তিনি অন্তর্যামী, এ প্রয়োজন তিনি বুঝে ক্ষমা করবেন। এই সাধুরা আমার পূজ্য অতিথি, অর্হণীয়, আমাদের কল্যাণেই তাঁরা এ অনুষ্ঠান করেছেন, সেখানে আমরা কেউ-ই যদি উপস্থিত না থাকি—তাঁদের প্রতি অবহেলা দেখানো হয়। অথচ রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হওয়ার আগে আমি যে অবসর পাব, তা মনে হয় না। এই সময়টুকু তোমাকে থাকতেই হবে। আমি এলেই তোমার ছুটি।'

মনে মনে ক্ষুণ্ণ হ'লেও এরপর আর কিছু বলতে সাহস করেন নি রাজকন্যা সেবন্তী।···

এমনই দৈব, প্রতিপদের দিনও তাঁর যাওয়া হয়ে উঠল না।

সন্ধ্যার আগে থেকেই আকাশ কালো ক'রে মেঘ ঘনিয়ে এল—সঙ্গে সঙ্গে প্রবল ঝড় আর মুষলধারে বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি সেই সঙ্গে।

বর্ষণ যখন বন্ধ হ'ল তখন দেড় প্রহর রাত্রি উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। সেবন্তীর মনে হ'ল ভগবান তথাগতের রোষেই একই বাধা, কাল পূজা দিতে না যাওয়ার জন্য নিশ্চয়ই তিনি অপরাধ নিয়েছেন।

অথচ উপায়ই বা কি ! মনে মনে বার বার ক্ষমাপ্রার্থনা ও জপ করা ছাড়া সে রোষ শান্তির অন্য কোন পন্থাও মনে পড়ল না।

একেবারে দ্বিতীয়ার দিন মন্দিরে যাওয়ার সুযোগ মিলল।

এ রকম অ-দিনে রাজকুমারী পূজা দিতে যান না কখনই—আবার আগামী পূর্ণিমার দিন যাওয়া হবে—এই রকমই মনে করেছিল সহচরীরা।

রাণীও সে কথা বলেছিলেন—যাওয়া যখন হ'ল না পূর্ণিমায় তখন আর এখন গিয়ে লাভ কি—কিন্তু সেবন্তী এক রকম জোর ক'রেই গেলেন।

ভগবান তথাগত রুষ্ট হয়েছেন, তাঁর কাছে শুধু অন্তত একবার ক্ষমা-প্রার্থনার জন্যই যাওয়া প্রয়োজন।

সামান্য পূজার উপকরণ, শেষ মুহূর্তে তাড়াতাড়ি যা সংগৃহীত হ'ল এবং তিনজন মাত্র সহচরী সঙ্গে নিয়ে সেবন্তী রওনা হয়ে গেলেন।

তাও মন্দিরে পেঁছিতে একটু বিলম্বই হয়েছিল।

ইচ্ছে ক'রেই দেরি করেছিলেন রাজকুমারী। আজ কৃষ্ণা দ্বিতীয়া, বেশ কয়েক দণ্ড পরে চাঁদ উঠবে, অথচ জ্যোৎস্না উঠলে এ মন্দিরের সৌন্দর্য ঠিক যেন উপভোগ করা যায় না, পরিপূর্ণ রূপটি খোলে না।

জ্যোৎস্নায় মন্দির-সংলগ্ন বিশাল দীর্ঘকায় যে ছায়া পড়ে—সেদিকে চেয়ে চেয়ে যেন তৃপ্তি হয় না সেবন্তীর।

শুভ্র সুন্দর মন্দির ও তার সুউচ্চ স্বর্ণ-মণ্ডিত চূড়া চন্দ্রকিরণে শুধু উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে না, যেন নতুন রূপ পরিগ্রহ করে।

সে দীপ্তি চোখে দেখার থেকে সরোবরের কালো জলে তার প্রতিবিম্ব দেখে তৃপ্তি পাওয়া যায়।

অনেকক্ষণ ধরে দেখাও যায়।

তাছাড়া রাজা নিজে নক্সা এঁকে দেখিয়ে মন্দিরের চারিদিকে যে উদ্যান-শয্যা রচনা করিয়েছেন, স্বর্ণালঙ্কারের মধ্যেকার সুবৃহৎ হীরকখণ্ড বসানোর উপযুক্ত কারুকার্য ও মাণিক্য-মরকত সন্নিবেশের মতো—অন্ধকারে তার অসাধারণত্ব কিছুই বোঝা যায় না। বরং অনেক সময় সেই রহস্যাবৃত ছায়াময় বৃক্ষ-বিন্যাস ও লতাগৃহের দিকে চাইলে একটু ভয়-ভয়ই করে।

সুতরাং রাজকন্যা যখন পেঁছিলেন তখন মন্দির ও উদ্যান জনবিরল হয়ে এসেছে।

মন্দির এতক্ষণে বন্ধই হয়ে যায় অন্য দিন, রাজকুমারী আসছেন খবর পেয়েই মহাশ্রমণ অপেক্ষা করছিলেন।

আজ কোন উৎসবের দিন নয়, পূর্ণিমা তিথিও নয়, জনসমাগম এমনিতেই কম, সন্ধ্যায় যা দু'চারজন এসেছিল তারা দীপ ও ধূপ জেলে দিয়ে চলে গেছে, মন্দিরে জনপ্রাণীও আর নেই।

রাজকুমারী এটাকে ভগবানের আশীর্বাদ বলে মনে করলেন।

ভগবান শাক্যমুনি যে ওঁর বেশী অপরাধ নেন নি, এটাই তার প্রমাণ।...

তিনি পূজা নিবেদন ক'রে নিশ্চিন্ত মনেই উদ্যানে প্রবেশ করলেন।

আনন্দ মন্দিরে এসে সেবন্তী খানিকক্ষণ দীর্ঘিকাতীরে না বসে, কুঞ্জবীথি-পথে কিছুক্ষণ না ঘুরে কোনদিনই ফেরেন না এ সহচরীরা জানে, তবু আজ রাত্রেও যে তিনি প্রতিদিনের অভ্যাস বজায় রাখবেন—এ বোধহয় তারা ভাবে নি।

থাক চাঁদের আলো—রক্ষী-প্রহরীরা তো একেবারে সেই প্রধান প্রবেশপথে—জনশূন্য উদ্যানের অন্ধকার ছায়ায় এভাবে ক'টি রক্ষক-অভিভাবকহীন মেয়েছেলের ঘোরা কি উচিত?

বিশেষ পুষ্পিত বিশাল বিশাল গাছে ঢাকা উদ্যানপথ, তার দু'দিকে কুঞ্জগৃহগুলিও নিবিড় লতাচ্ছাদিত—চারিদিকেই যেন বড় বেশী ছায়া আর অন্ধকার বাগানটায়।

দিনের বেলা ভাল, রৌদ্রতাপের জ্বালা সইতে হয় না, রাত্রিবেলাও যদি সঙ্গে লোক থাকে তো একরকম—বিশেষ যদি মনের মতো লোক হয় তো কথাই নেই—কিন্তু একা তিন-চারটি তরুণী মেয়ের পক্ষে আদৌ ভাল নয়। রাজকন্য তো তাদের ভরসায় নিশ্চিন্ত আছেন, তারা কার ভরসা করে?

ওরই মধ্যে যে সহচরীটির বয়স বেশী, সে একবার সাহস সঞ্চয় ক'রে স্মরণও করাল, 'প্রাসাদে ফেরাই বোধহয় উচিত ছিল মহারাজ-পুত্রী, রাত প্রথম প্রহর উত্তীর্ণ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ।'

কোন বিপদাশঙ্কার দিক দিয়েই গেলেন না সেবন্তী, যে-সব অশরীরী 'ওঁরা' অন্ধকারে ঘোরাফেরা করেন—তাঁদের কথাও মনে পড়ল না। ঈষৎ ভ্রূকুটি ক'রে ব্যঙ্গের সুরে উত্তর দিলেন, 'প্রথম প্রহর উত্তীর্ণ হ'ল তো কি হ'ল—এরই মধ্যে ক্ষিদে পেয়ে গেল নাকি বেথালির?...তাহলে তুই ফিরে যা! নাকি খুকীর ঘুম পেয়েছে?'

এর পর আর কিছু বলা যায় না।

ওদের অন্তত সে দুঃসাহস নেই।

ও বিপদ তো আপাতত অদৃশ্য—মনিবের অসন্তোষ প্রত্যক্ষ, অনেক বেশী ক্ষতিকর। মনে মনে রাজার দুলালী কন্যার মুণ্ডপাত করতে ও সভয়ে এদিক-ওদিক চাইতে চাইতে তাদেরও সঙ্গে যেতে হ'ল।...

এক ভরসা শাক্য-মুনি, এইমাত্র তাঁকে প্রমাণ ক'রে এসেছে, তিনি যদি রক্ষা করেন।...

অনেকক্ষণ, প্রায় দু'আড়াই দণ্ডকাল, সরোবরের ধারে বসে—তাও বাঁধানো আলোকোজ্জ্বল ঘাটে নয়, তৃণাচ্ছাদিত বেত্রকুঞ্জ-ছায়ান্ধকার পাড়ে বসে—মন্দিরের প্রতিফলন দেখলেন সেবন্তী, তারপর উঠে অন্যদিনের মতো মন্দির-পরিক্রমার উদ্দেশ্যে সেই অজ্ঞাত-আতঙ্ক-ভরা ছায়াঘেরা পথই ধরলেন—এত রাতেও।

মন্দিরের দরজা বন্ধ ক'রে মহাশ্রমণও চলে গেছেন, ধারে-কাছে এমন কেউ নেই যে চিৎকার করলে শুনতে পাবে, ফটক তো কত দূরে তা এখন ভাবাই যাচ্ছে না, সেখান থেকে ওঁদের ডাক শুনে কেউ ছুটে আসবে সে-সম্ভাবনা নেই,

আছে শুধু গা-ছম-ছম-করা ছায়ার রাশি।

রাশি-রাশি ছায়া আর অন্ধকার সেই গভীর চন্দ্রালোকিত রাত্রে, যেন ওদের মনে হ'ল—জীবন্ত হয়ে উঠে—ওদের গ্রাস করার জন্য, বিপন্ন করার জন্য ওই পেতে বসে আছে।

দিনের আলোয় যা রমণীয়, ঈপ্সিত, এই সুমুখ জ্যোৎস্নারাত্রে সেই সুন্দর লতা-বিতানের ছায়া অশরীরী প্রেতমূর্তির মতো সঞ্চরণশীল মনে হ'তে লাগল, সেদিকে চাওয়ার শক্তি নেই—তবু যেন মনে হ'ল ছায়া নয়—কতকগুলো ছায়ামূর্তি, নিঃশব্দে হাসছে ওদের দিকে চেয়ে।...

তবু বিপদ প্রায় কাটিয়ে এসেছিল ওরা, কিন্তু ভগবান তথাগত সেই অন্য-সময় সুন্দর, এখন ভয়াবহ ছায়ান্ধকারের বিপদ কাটিয়ে দিলেও তাদের আশঙ্কা একেবারে মিথ্যা হ'তে দিলেন না, বোধ করি এই উদ্ধত আদুরী ধনীকন্যাটিকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দেবার জন্যই।

একেবারেই প্রস্তুত ছিল না ওরা, বুঝতেও পারে নি প্রথমটায়।

ডানদিকে পথের মোড় ঘুরতে একেবারে তাদের সামনে এসে পড়ল।

না, কোন কুঞ্জবিতানের ছায়ায়—পুষ্পিত চাঁপা শোণচাঁপা কি কর্ণিকার বৃক্ষের তলায় কাণ্ডের আড়ালেও নয়—চাঁদের আলোয় দাঁড়িয়ে পথের ওপরই একেবারে প্রস্তর-মূর্তির মতো নিস্পন্দ স্থির হয়ে রয়েছে তিনটি লোক—তিনটি পুরুষ!

বুঝতে পারে নি এই জন্যে যে, এ উদ্যানে সত্যকার প্রস্তর-মূর্তির অভাব নেই।

স্থানে স্থানে বিখ্যাত অর্হৎদের ও তথাগতের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে—প্রথম চোখে পড়তে সেই রকমই মনে হয়েছিল।

এরা যে বাগানের মধ্যে নয়, পথেরর ওপরই পথ রোধ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে, সেটা বুঝতে কয়েক মুহূর্ত দেরি লেগেছিল।

ঠিক সেই ক'মুহূর্ত দেরি লেগেছিল ভয় পেতেও।

তারপর অবশ্য প্রধান সহচরী ভেলুবতী চিৎকার ক'রে উঠতে চেষ্টা করল, কিন্তু অত্যধিক ভয়েই গলা দিয়ে স্বর বেরোল না।

ভয় সকলেই পেয়েছিল—রাজকুমারী ছাড়া।

কারণ এ-পথে এখন—এত রাতে কোন দর্শনাথীর থাকার কথা নয়, এদের কেউ এদিকে আসতেও দেখে নি।

অকস্মাৎ এভাবে দেখলে—অশরীরী কোন আত্মা ছায়া থেকেই মূর্তি পরিগ্রহ ক'রে বেরিয়ে এসে ওদের সামনে দাঁড়িয়েছে—মনে হওয়া স্বাভাবিক।

রাজকুমারী ভয় পান নি, কেননা তিনি ঐ অত্যল্পকাল মধ্যেই দেখে নিয়েছিলেন যে, পুরুষগুলি সন্ন্যাসী। পীতবাসধারী ভিক্ষু বা শ্রমণ নয়—হিন্দু সন্ন্যাসী। গৈরিক বহির্বাস, ললাটে বিভূতি-চিহ্ন, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা—বৈশাখের প্রস্ফুট জ্যোৎস্নায় চোখে না পড়বার কথা নয়। বিস্তর হিন্দু সন্ন্যাসী তাঁদেরই অতিথি হয়ে আছেন, এ বেশভূষা রাজকুমারী ভালই চেনেন।

তিনি তাই আর একটু এগিয়ে এসে দু'হাত জোড় ক'রে নমস্কার করলেন।

সন্ন্যাসীরাও কয়েক পা এগিয়ে এসেছিলেন ইতিমধ্যে, তাঁরাও হাত তুলে যথারীতি আশীর্বাদের মুদ্রা করলেন।

দূর থেকে বেশভূষা দেখা গেলেও মুখ-চোখ লক্ষ্য হয় নি ভাল, কাছে আসায় পরিষ্কার দেখা গেল।

সেই জ্যোস্নালোকেই যা দেখলেন ছদ্মবেশী সন্ন্যাসীদলের অধিনায়ক রণমল্লদেব—মূর্ছাহত হবার উপক্রম হ'ল তাঁর।

সিংহবাহু যতই বলুক, ঠিক এমনটি যে দেখবেন তা আশা করেন নি।

এ ক'দিন—এই এক মাস মানস-বিহঙ্গকে কল্পনার আকাশে বহুদূর পর্যন্ত পাঠিয়েছেন, যতদূর পাঠানো সম্ভব—কল্পনারও অকল্পিত দিগন্তে, তবু সে এ মূর্তি দেখতে পায় নি কোথাও।

মনে হ'ল ক্ষণকালের জন্য রণমল্লদেবের ধমনীতে রক্তপ্রবাহ বন্ধ হয়ে গেল, হৃদ্‌স্পন্দন পর্যন্ত একটা কি যে আঘাত লেগে স্তব্ধ হয়ে গেল কয়েক মুহূর্ত—সমস্ত স্নায়ু অবশ বিহ্বল হয়ে গেল।

রাজকুমারী সেবন্তীও পলকহীন নেত্রে তাকিয়ে ছিলেন তরুণ সন্ন্যাসীর দিকে—প্রায় নিশ্বাস রুদ্ধ ক'রে।

সন্ন্যাসী অনেক দেখেছেন, ভিক্ষু-শ্রমণ-অর্হৎ বৈষ্ণব অদ্বৈতবাদী—প্রত্যহই দেখছেন কিছু না কিছু—কিন্তু সন্ন্যাসীর গৈরিক বস্ত্র ও ভস্ম-প্রলেপনে মানুষের রূপ যে এমন আশ্চর্য উজ্জ্বল দেখায়, এমন বিভ্রান্তিকর সুন্দর—তা কখনও দেখেন নি। এমন কখনও ভাবেনও নি।

কোন মানুষকে দেখামাত্র প্রাণের বীণার সবক'টি তন্ত্রী এমন রিন-রিন ক'রে ওঠে, এমন সর্বেন্দ্রিয়-বিহ্বল-করা আবেগের সঞ্চার হয় মনে, এমন একটা অনির্বচনীয় সুখে অবশ হয়ে আসে দেহ—তাও কখনও অনুভব করেন নি।......

মনে হ'ল রাজকুমারীর, এই যে মানুষটি তাঁর সামনে এই জনহীন মন্দির পথে এসে দাঁড়িয়েছে এ তাঁর জন্ম-জন্মান্তরের সুহৃদ্‌, অনন্তকালের সঙ্গী, মনে হ'ল এর জন্যই এতকাল—জীবনের এই কুড়িটি বছর অপেক্ষা ক'রে আছেন।

মনে হ'ল এর পায়ে পড়ার জন্যই তাঁর এতকালের শিক্ষাদীক্ষা জীবন-শিল্প-নিপুণতা সঞ্চয় করা।

নিজেকে দেওয়ার জন্য যে সাধনা থাকে প্রত্যেক মানুষেরই—সেই সাধনার মূর্তিমান সিদ্ধি আজ তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, এই তরুণ সন্ন্যাসীর বেশ ধরে!

আরও মনে হ'ল এ তাঁর অপরিচিত কেউ নয়। চিরদিনের চেনা মানুষ এ, কিছুকালের জন্য অন্য কোথাও গিয়েছিল, এবার চিরকালের জন্য ফিরে এসেছে। কী করব, কী করা উচিত—এ নিয়ে আর ভাবার কিছু রইল না, এখন থেকে জীবন-তরণীর হাল এই অনন্তকালের নাবিকের হাতে তুলে দিলেই

নিশ্চিন্ত।...

এই জাগ্রত স্বপ্নে কতকাল গেছে তা কেউ জানে না।

মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল রাজকন্যার সহচরীরাও।

তাই স্থান-কালের বিচার ভুলে গিয়েছিল।...

দূরে কোথাও কী একটা শব্দ হ'ল বুঝি। সম্ভবত মন্দিরের প্রবেশপথে প্রহরী বদলের শব্দ।

অথবা বাইরে অপেক্ষমাণ রাজ-শিবিকার বাহকের দল অসহিষ্ণু হয়ে উঠে এঁদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য ইচ্ছে ক'রেই কোন শব্দ ক'রে থাকবে।

কিংবা দক্ষিণ-পূর্বাগত এক ঝলক সমুদ্র-বাতাস বড় বড় মুলসারি গাছ-গুলির পুষ্পিত শাখা-প্রশাখায় মর্মর শব্দ তুলল।

যা-ই হোক, এবার সম্বিৎ ফিরে এল এঁদের।

অগ্রবর্তী অধিনায়ক সন্ন্যাসীটি আরও দু'পা এগিয়ে এসে পরিষ্কার প্রাকৃতে বললেন, 'শুভমস্তু!...কল্যাণী তুমি কে জানি না, কিন্তু তোমার ভাগ্য শুভ। তোমার মুখের চন্দ্রমণ্ডলে বৃহস্পতির প্রভাব স্পষ্ট—স্থির কল্যাণ-বুদ্ধির চিহ্ন। তোমার ললাটের গঠন অপরিসীম সৌভাগ্যের দ্যোতক। চিবুক নাসিকার গঠনে আত্মবিশ্বাস, বিচারশক্তি ও দূরদৃষ্টির লক্ষণ। তুমি কোনদিন রাজসিংহাসনে বসে প্রজাশাসন করলেও আমি বিস্মিত হব না।...ভদ্রে, আমি ভারতীয় সন্ন্যাসী, যোগাভ্যাস ও তপস্যা ছাড়াও কিছু শাস্ত্রচর্চা করেছি। সেই সঙ্গে কররেখা ও হনুমান-চরিত্র গণনাও করেছি কিছু কিছু। বহুকাল এমন আশ্চর্য সুলক্ষণযুক্ত প্রতিভাদীপ্ত মুখ চোখে পড়ে নি।...তোমার বাঁ হাতখানি দেখতে পারি একবার? এই চন্দ্রালোকেই অবশ্য যতটা দেখা যায়—!'

বলতে বলতে—অনুমতির অপেক্ষা না ক'রেই—রাজকন্যার রক্তপদ্ম-কোরকের ন্যায় দেবকন্যা-দুর্লভ হাতখানি টেনে নিয়ে দেখার ভান করতে গেলেন।...

স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে রাজকন্যারও। সম্বিৎ ফিরে পেয়েছেন তিনি প্রায় একই সঙ্গে।

তিনিও বুঝতে পেরেছেন ব্যাপারটা—প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।

ক্ষিপ্রগতিতে হাতটা টেনে নিয়ে কঠিন কণ্ঠে বললেন, 'আমিও কিছু কিছু ভবিষ্যৎ গণনা করতে পারি। তোমাদের আশু ভবিষ্যৎ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, তোমরা অচিরেই প্রতারণার দায়ে ধর্মাধিকরণে অভিযুক্ত হবে—প্রতারণা, ছদ্মবেশ এবং দেশের রাজকুমারীর প্রতি অশিষ্ট আচরণের জন্য। এদেশে এসব অপরাধ গুরু বলে গণ্য হয় এবং এর শাস্তিও খুব কঠোর।... আরও যা দেখতে পাচ্ছি, তোমাদের জন্যেই এই মন্দির-উদ্যানের রক্ষীদের চাকরি যাবে এবং তারা কারাগারে নিক্ষিপ্ত হবে—কর্তব্যে অবহেলার অপরাধে।'

এই বলে তিনি ঘুরে অন্য পথ ধরে প্রস্থানোদ্যতা হলেন।

রণমল্লদেব কিছুমাত্র ভীত বা বিমর্ষ হলেন না। বরং একটু স্নিগ্ধ-মধুর

হাস্য করলেন। সে হাসির শব্দ অদূরবর্তিনীর শুনতে অসুবিধা হ'ল না।

রণমল্লদেব এবার ঈষৎ উচ্চকণ্ঠেই বললেন, 'তবে শুনে যাও রাজকুমারী, তোমার এ গণনা ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হবে। উষ্মা ও হঠকারিতা সমস্ত রকম বিদ্যাচর্চারই শত্রু। ভাগ্য-গণনার সু-ফলাফল গণনাকারীর স্থির-মস্তিষ্ক ও ধীর বিবেচনাশক্তির ওপর নির্ভর করে। আমি যা গণনা করেছি তা নির্ভুল। আমি আরও একটি ভবিষ্যৎ-বাণী উচ্চারণ করছি—ইতিমধ্যেই বিচার ক'রে নিয়েছি তোমার ললাট ও দৃষ্টি লক্ষ্য ক'রে—আজ থেকে পঞ্চরাত্রি বিগত হওয়ার পূর্বেই আজকের এই অশিষ্ট আচরণের জন্য অনুতপ্ত হবে তুমি —এবং এই প্রতারকের খোঁজ করবে। দেখা পাবেও তার—ঠিক এইখানে, আজ থেকে ষষ্ঠ রাত্রিতে, দ্বিতীয় যামের দুই দণ্ড অতিক্রান্ত হলে।'

রণমল্লদেবের চাপা এবং গম্ভীর কণ্ঠ সেই গভীর নিশীথে, জনহীন উদ্যান-পথে কোনো অদৃশ্য দেবতার অমোঘ আকাশ-বাণীর মতো বোধ হতে লাগল।

শব্দ উচ্চারণ বন্ধ হওয়ার বহুক্ষণ পর পর্যন্তও সেই কানন-বীথি-পথে দুপাশের অশোক, শোণচাঁপা, মুলসারি গাছের শাখা-প্রশাখা পত্র-পল্লবে যেন প্রতিহত আবর্তিত হতে লাগল তার ধ্বনি।

দ্রুত-প্রস্থানকারিণী সম্রাট-দুহিতা আর তাঁর সহচরীদের মনে হ'তে লাগল, সেই গম্ভীর কণ্ঠস্বরে উচ্চারিত সতর্কবাণী ভগবান শাক্যমুনির ক্রুদ্ধ অভিসম্পাত-বাণীর মতো মহাশূন্যে তরঙ্গিত প্রতিধ্বনিত হ'তে হ'তে তাদের পিছনে পিছনে এল—মন্দিরের প্রধান প্রবেশদ্বার পর্যন্ত।

সামনে রক্ষী ও অদূরে শিবিকাবাহকদের দেখে যেন বেঁচে গেল কুমারী কন্যাদের দল।

॥ চার ॥

সেবন্তী নিদারুণ ক্রুদ্ধ হয়েই প্রাসাদে ফিরলেন।

আরও উষ্ণতার কারণ—ফিরে আসার সময়কার ঐ সতর্ক বা ভবিষ্যৎ-বাণী।

শুধু তাঁর সহচরীদেরই নয়—তাঁরও মনে হয়েছে বার বার যে, এ যেন কোন দেবতারই উচ্চারিত সতর্কবাণী, অমোঘ ও অব্যর্থ।

মনে হয়েছে দৈববাণীর মতোই শব্দগুলো যেন তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করছে। দৈব-অভিশাপের মতো।

এমন কি মন্দির-দ্বারের বাইরে জনসমাকীর্ণতার মধ্যে এসে তাঁর সহচরীরা নিশ্চিন্ত ও প্রকৃতিস্থ হ'লেও তিনি হ'তে পারেন নি।

শিবিকার মধ্যে বসেও অব্যাহতি পান নি। মনে হয়েছে শব্দগুলো তাঁর কানের মধ্যে মাথার মধ্যে যেন কোন বিস্তীর্ণ শূন্যতায় প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। দূরে, খুব দূরে কোথাও—তবু তা স্পষ্ট।...

সহচরীরা ভেবেছিল রাজকন্যা যে পরিমাণ ক্রুদ্ধ হয়েছেন,—প্রাসাদে

পৌঁছেই মহাপ্রতিহারকে ডেকে পাঠিয়ে অভিযোগ করবেন। মন্দির-দ্বাররক্ষীদের সম্বন্ধে এবং ঐ ক'টি অসৎবুদ্ধি, সম্ভবত ছদ্মবেশী সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধেও।

কিন্তু কে জানে কেন—তিনি এ সম্বন্ধে একটি শব্দও উচ্চারণ করলেন না, তাঁর মুখের ভাব দেখে ওরাও সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে সাহস করল না। তবে নাকি অর্হৎদের অভিশাপ আছে, মেয়েদের উদরে কোন কথা গোপন থাকবে না—দিন-তিনেক পরে কানাঘুষায় কথাটা মহিষীর কানে পৌঁছেছিল, তিনি কন্যাকে প্রশ্নও করেছিলেন এ বিষয়ে। সেবন্তী সংক্ষেপে উত্তর দিয়েছিলেন, 'না-না, তাঁরা সন্ন্যাসীই, আমি বৃথা ভয় পেয়ে একটু রূঢ় আচরণ করেছিলাম। ও নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না।'

মাথা আর ঘামান নি মহিষী।

তিনি গৃহমধ্যের স্বল্পালোকে অত লক্ষ্যও করেন নি যে, কথাগুলো তাচ্ছিল্যভরে বললেও বলার সময় সেবন্তীর সুগৌর কপোলে কে যেন অলক্তক-রাগ মাখিয়ে দিয়েছিল।

মাথা না ঘামাবার আরও কারণ ছিল।

তাঁর এ কন্যাকে যে স্বামী পুত্রবৎ মানুষ করেছেন—তা তিনি জানেন। বহু রাজকার্যে নিজেই আদেশ-নির্দেশ দেয়, রাজ-অনুজ্ঞানামায় স্বাক্ষর করে। সুতরাং যদি কিছু ব্যবস্থা করার থাকত তো সে নিজেই আদেশ দিত, কারও অপেক্ষা করত না।

মহিষী নিশ্চিন্ত হয়েই চলে গিয়েছিলেন।

নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন নি সেবন্তী নিজেই।

কেন পারেন নি তাও জানেন না।

মনকে প্রশ্ন করেছেন বার বার, কিসের এ চাঞ্চল্য—তার কোন সদুত্তর পান নি।

তিনি কি ভয় পেয়েছেন? না, তা হ'তে পারে না, এসব নিতান্তই ছেলে-মানুষী কথা; অপরিণত-বুদ্ধি শিশুকে ভয় দেখানোর মতো। এ যে কোন ভবিষ্যদ্বাণী নয়, দৈব-সতর্কবাণী নয়—তা পাঁচ বছরের ছেলেও বুঝতে পারে।

তবে? কতকগুলো—বদলোক যদি না-ও হয়, অসৎ-উদ্দেশ্যে যদি না-ও এসে থাকে—চপলমতি দায়িত্বজ্ঞানহীন অলস ধনীসন্তানের রাজকন্যার সঙ্গে একটু আলাপ জমাবার ইচ্ছা, এর চেয়ে বেশী তো নয়।

অনুমানের ওপর, আত্ম-অহমিকার ওপর নির্ভর ক'রে কতকগুলো ফাঁকা কথার খধূপ ছাড়া আর কিছুই নয়।

না, ওসব কথার কোন গুরুত্ব নেই—তা তিনি জানেন।

অলস ধনীসন্তান, দায়িত্বজ্ঞানহীন, লঘুমতি—প্রথম প্রথম কতকটা নিজের ওপরই ক্রুদ্ধ হয়ে বিশেষণগুলো প্রয়োগ করেছিলেন মনে মনে। কিন্তু পরে নিজেই ভেবেছেন—ঠিক তেমন কি মনে হয়েছে? এখনও কি তা মনে হচ্ছে? সে ধরনের তরুণ ছেলে তো এ রাজধানীর পথে-ঘাটে অবিরতই ঘুরে বেড়ায়—তরুণী মেয়েরা যাদের কৌতুকলক্ষ্য—এদের কথা রাজপথে না হেঁটে বেড়ালেও

তিনি জানেন। শিবিকা থেকে লক্ষ্য করেছেন, বহুলোকের মুখেই শুনেছেন।

এরা ঠিক সে রকম নয়। তা রাজকন্যাও মানতে বাধ্য।

বিদেশী, ভারতীয় কোন সন্দেহ নেই। যদি সাধু বা জ্যোতির্বেত্তা না-ও হয়।

এত দূরদেশে এসে গভীর রাত্রি পর্যন্ত মন্দিরে বসে ছিল—যদি কোন তরুণী মেয়ে দৈবাৎ এসে পড়ে তার সঙ্গে কৌতুক—একটু লীলা করবে বলে? এত রাত্রে যে কারও আসার সম্ভাবনা নেই, তা কি ওরা জানত না?···

তবে কি তাঁর জন্যেই বসে ছিল?

কিন্তু তাই বা কি ক'রে হবে? তাঁরও সেদিন যাওয়ার কথা ছিল না। পূর্ণিমার বদলে দ্বিতীয়ায় যাবেন—এ তো কেউ জানত না, জানবার কথাও নয়।

তবে কি ওরা গুপ্তচর? প্রাসাদ থেকে সংবাদ সংগ্রহ ক'রে ওখানে অপেক্ষা করছিল তাঁর? সত্যসত্যই কোন অসদভিসন্ধি ছিল, তাঁকে বিপন্ন করার অভিপ্রায়?

না, গুপ্তচর বিভাগের অমাত্য বড়ই বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন, সেই সঙ্গে পর-রাষ্ট্রমন্ত্রীও। এই দুই পদেই অপর যোগ্যতর লোককে বসাতে হবে। এমন নির্ভয়ে নির্বাধায় ভিন্নদেশাগত গুপ্তচররা ঘুরে বেড়ায়, সোজাসুজি রাজ-অন্তঃপুরে—এ রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারিণীর দিকে হাত বাড়ায়—তাঁরা এর কোন খবরই রাখেন না। আশ্চর্য! এই সব অপদার্থ লোককে প্রচুর বেতন ও অসংখ্য সুবিধা দিয়ে বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ পদে বসিয়ে রাখার কোন অর্থই হয় না। অবিলম্বে এ বিষয়ে রাজাধিরাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন।···

অবশ্য, এও ঠিক—দুষ্ট অভিপ্রায়—তাঁকে বন্দী করা বা অপহরণ করার ইচ্ছাই যদি থাকবে, সে চেষ্টাই বা ওরা করল না কেন? তাঁর সঙ্গে তো আতঙ্কে অর্ধ-অচেতন ঐ তিনটি মেয়ে—ওরা সবল ষণ্ডাকৃতি তিন-তিনটে পুরুষ, হয়ত—যদি এ অভিপ্রায়ই ওদের থাকত তাহলে—কাছাকাছি অন্য লোকও ছিল, কোন লতাগৃহের অন্ধকার আশ্রয়ে অপেক্ষা করছিল; অনায়াসেই তো উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারত।

আর, তা ঠিক মনেও হয় না।

তিনটি লোকের বাকি দু'টিকে খুব ভাল ক'রে দেখেন নি। তাদের দিকে চেয়ে দেখারই তো অবকাশ মেলে নি, তারা কোন বাক্-নিষ্পত্তিও করে নি। তা হোক, তবু আবছা নজরে পড়েছে। দস্যু বা ঐ ধরনের মন্দ লোক বলে মনে হয় নি।

তাছাড়া ওদের মধ্যে যেটি দলপতির মতো, অগ্রবর্তী দীর্ঘদেহ যুবা-পুরুষটি—তার আকৃতি, অঙ্গ-ভঙ্গীর ঋজুতা, এবং কথাবার্তার দার্ঢ্যে নিঃসন্দেহে তাকেই দলপতি মনে হয়—সে যে কোন সাধারণ চপলমতি কৌতুকপ্রিয় কর্মহীন উদ্দেশ্যহীন অর্বাচীন নয়—এ তাকে দেখলেই বোঝা

যায়। সে বিষয়ে কোন সংশয়ের অবকাশ থাকে না।...

ভাবতে ভাবতে মন কখন অন্য সমস্ত বিবেচনা-বিতর্ক ছেড়ে সেই চন্দ্রালোকিত উদ্যান-পথে কয়েক-লহমার-জন্য-দেখা—সম্ভাব্য দলপতির চিন্তাতে চলে যায়, তা রাজকন্যা সেবন্তী বুঝতেও পারেন না।

ছদ্মবেশ তো বটেই। তবু সন্ন্যাসীর সেই ছদ্মবেশে কী অপরূপই না দেখাচ্ছিল লোকটাকে! সন্ন্যাসীর বেশে এত সুন্দর কাউকে দেখায়, দেখাতে পারে—তা কখনও ভাবেন নি সেবন্তী, কল্পনাও করেন নি। সন্ন্যাসী তো অনেক দেখেছেন—প্রত্যহই দেখছেন। ত্রিভুবনাদিত্য ধর্মরাজের অসাধারণ সাধু-শ্রমণ ভক্তির কথা সর্বজনবিদিত—দেশে তো বটেই, সুদূর ভারত সিংহল চীন গান্ধার সর্বত্র ছড়িয়ে গেছে, চারিদিক থেকে কত যে সন্ন্যাসী ভিক্ষু সাহায্যার্থী, ভিক্ষার্থী বা সম্মানার্থী হয়ে আসেন, তার তো হিসেবই নেই। এদের অনেককেই দেখেছেন, দেখেন।

তাদের মধ্যে সুশ্রী দেখেছেন বৈকি, তবু তারা কেউই এর মতো নয়। এ অসাধারণ, এ অনন্য।

দীর্ঘ সুগৌর দেহ, তাতে কাষায়-কৌষেয় বস্ত্র, শুভ্র সুন্দর ললাটে এবং প্রশস্ত বক্ষে বিভূতি ও চন্দন-চিহ্ন, দীর্ঘ আস্কন্ধলম্বিত ঘনকৃষ্ণকেশ, ঈষৎ শ্মশ্রু, কণ্ঠে পদ্মবীজের মালা এবং শুভ্র উপবীত। মরি মরি—কী সুন্দরই না দেখাচ্ছিল ওকে! মানুষের এত রূপ হয়!...ও যে সন্ন্যাসী নয়, ছদ্মবেশী—ঐ উপবীতটাই তার প্রমাণ। কাষায় বস্ত্র পরিহিত সন্ন্যাসীর কি উপবীত থাকে? কখনও তো কারও দেখেন নি সেবন্তী!

সে যাক্‌গে। ছদ্মবেশী বলে প্রমাণিত হওয়াই ভাল।

ও লোককে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী বলে ভাবতে ভাল লাগে না।

[কেন যে ভাল লাগে না তা অবশ্য সেবন্তীকে প্রশ্ন করলে কোন সদুত্তর তিনি দিতে পারতেন না তখনও।]

সন্ন্যাসী তো নয়ই, কোন সাধারণ লোকও নয়।

সেবন্তীকে চেনে। ওঁর জন্যেই অপেক্ষা করছিল নিশ্চয়।

কিন্তু কে ও, এত দুঃসাহস কিসের? কোন সাধারণ লোক হ'লে—যে ওঁকে চেনে—উনি যে আদরে লালিত সামান্য রাজকন্যা নন, রাজ্যশাসন-পরিচালন বিষয়ে যে ওঁর অনেকখানি হাত আছে জানে—ওঁর উষ্মা ও বিরক্তিতে ভয় পেয়ে যেত, অন্তত অমন ক'রে হাসতে সাহস করত না।

না, কোন সাধারণ লোক নয়। এই বয়সে অমন বলিষ্ঠ দৃপ্ত ভঙ্গী, অমন নির্ভীকতা সাধারণ লোকের হয় না। অমন গম্ভীর কণ্ঠ—আত্মবিশ্বাসে স্থির—আবাল্য আদেশদানে অভ্যস্ত না হ'লে তৈরী হয় না। নিশ্চয় কোন অভিজাত বংশের ছেলে। তাও কোন রাজপুরুষ বা শ্রেষ্ঠীর ঘরের নয়, রাজা বা সামন্তদের ঘরের ছেলে। রাজপুত্র অথবা রাজাই।

যত ভাবেন ততই অস্থির হয়ে ওঠেন।

এ রকম চিত্ত-চাঞ্চল্য কখনও বোধ করেন নি অরিমর্দনপুরের রাজকুমারী

—এ বিপুল রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারিণী।

তিনি সামান্য নারী, বালিকা বা কিশোরী বা তরুণী, সামান্য স্ত্রীলোকের মতোই আবেগ অনুভূতির বশ, সামান্য মানুষের মতোই একটা রূপজ মোহে এমন চঞ্চল আত্মহারা হতে পারেন—তা কখনও ধারণাও করেন নি।

অথচ আজ যে সেই অবস্থাতেই এসে দাঁড়িয়েছেন—তাতেও তো কোন সন্দেহ নেই। এ যেন নিজের কাছেই নিজে মুখ দেখাতে পারছেন না সেবন্তী। এ তাঁর কি হল!···

নানা চিন্তা-সংঘাতে, অবিরাম চিত্তযুদ্ধে দু'টো দিন কাটাবার পর মনের সঙ্গে বৃথা সংগ্রাম করার চেষ্টা ছেড়ে দিলেন সেবন্তী। সোজাসুজি সেই ক্ষণিকের দেখা বিদেশী তরুণ সন্ন্যাসীর চিন্তার কাছেই আত্মসমর্পণ করলেন।

কতটুকুই বা দেখেছেন, তাও তো চন্দ্রালোকে! কৃষ্ণা-দ্বিতীয়ার বিলম্বিত-উদয় তরুণ জ্যোৎস্নার নীলাভ আলোয় হয়ত যত সুন্দর দেখেছেন—দিনে ততটা লাগবে না।...ভাবতে ভাবতে নিজেই প্রতিবাদ ক'রে উঠেছেন নিজের মনে—না, আরও সুন্দর দেখাবে।···ভাল ক'রে তো দেখাই হয় নি। হয় নি, ভালই হয়েছে অবশ্য। হয়ত ভাল ক'রে দেখলে, দেখতে পেলে ঐখানেই মূর্ছিতা হয়ে পড়তেন।···

আরও যত চিন্তা করেন, অনন্যমনা হয়ে হৃদয়-দ্বারের সেই মুহূর্তকালের অতিথির যতই ধ্যান করেন—ততই নিঃসন্দেহ হন যে, সন্ন্যাসী কোন রাজপুত্র বা রাজাই। তা নইলে, অমন দীর্ঘ বীরত্বব্যঞ্জক যার চেহারা, অমন সুবিস্তৃত বিশাল যার বক্ষ, বাহুর পেশী যার অত সুউন্নত—তার হাতের স্পর্শ অমন আশ্চর্য কোমল হয় কী ক'রে? কোমল আর উষ্ণ?

হ্যাঁ, মুহূর্তের জন্য যে হাতখানা ধরেছিল—সেই হাতের সেইখানে এখনও সে স্পর্শ লেগে আছে। কোন মানুষের শুধুমাত্র হাতের স্পর্শ যে এত জাদু বিস্তার করতে পারে, এত সম্মোহিত অভিভূত করতে পারে, প্রতি রোমকূপে রোমকূপে যে এমন হর্ষ সঞ্চার করতে পারে—তাই বা কে জানত!

আর অত দীর্ঘ যার বাহু—অত সুগঠিত সরল, অত বিস্তৃত যায় হাতের পাতা, তরবারি-ধারণোপযোগী অত লম্বিত যার অঙ্গুলি—তার হাতের স্পর্শ অমন পারুষ্য-বর্জিত, অমন সুখদস্পর্শ হল কি ক'রে?

সেদিন রোষভরে তখনই টেনে নিয়েছিলেন হাতখানা—আজ সেজন্য পরি-তাপের শেষ নেই যেন। আরও কয়েক পলক অন্তত যদি থাকতে দিতেন তিনি, কোন অছিলায়! এত তাড়া করবারই বা কি ছিল!

আজ তো মনে হচ্ছে ঐ হাতের মধ্যে অনন্তকাল তাঁর হাতখানা বদ্ধ থাকলেও কোন ক্ষতি ছিল না, তিনি বরং তাতে সুখীই হতেন।···

আরও একদিন কাটবার পর চতুর্থদিনে যখন মানসিক অস্থিরতা অসহ্য

হয়ে ওঠে, আহার-নিদ্রার ইচ্ছামাত্র থাকে না, বিশুষ্ক বিবর্ণ হয়ে ওঠে মুখ, চোখের কোণের কালি সকলের দৃষ্টি-আকর্ষক হয়ে পড়ে—সহচরীরা নানা-রকম কানাঘুষো করতে থাকে—তখন একেবারে শেষমুহূর্তে মনে পড়ে যায় একটা কথা।

বোধ করি ওর এই নিদারুণ কষ্ট দেখেই ভগবান তথাগত সদয় হয়ে মনে করিয়ে দেন।

দাসী বেথালীর এক ভাই মন্দির-রক্ষকের কাজ করে।

বেথালী শুধু রাজকন্যার প্রিয় দাসী নয়—বিশ্বস্ত সহচরী, বয়স্যা।

বেথালীর মা ধাত্রীর মতো মানুষ করেছেন ওঁকে। বেথালী অন্তত ওঁকে কোন কারণে অপ্রতিভ বা অপদস্থ করবে না। সে হয়ত দিতে পারবে আসল খবরটা। সেবন্তী বেথালীকে নিভৃতে ডেকে পাঠান।

এই বুদ্ধিটাই বুঝি ভগবানের করুণা।

বেথালী সেদিন সঙ্গে ছিল, পরের অবস্থাটাও সে লক্ষ্য করেছে। দুই আর দুইয়ে চার মিলিয়েও নিয়েছে মনে মনে। সেদিনের সে তরুণ সন্ন্যাসীর আশ্চর্য রূপ দিবালোকের মতোই সকলের কাছে সুপ্রত্যক্ষ। বেথালী কিছু অন্ধ নয়। তার মনেও কি আর ঐ রূপ উত্তাল তরঙ্গের সৃষ্টি করে নি! সেবন্তীর মনোভাব তাই সে আগেই অনুমান করতে পেরেছিল। শুধু তাই নয়—যে কাজের ভার তাকে দেবেন বলে রাজকন্যা স্থির করেছেন সে কাজ সে অগ্রসর ক'রেই রেখেছে খানিকটা।

দৈবক্রমে তার ভাইও সেদিন সন্ধ্যাবেলা ওখানে প্রহরায় ছিল। সে ছিল তখনকার রক্ষীদলের অধিনায়ক। শুধু সেদিন নয়, পূর্ণিমার আগের দিন থেকেই তার পালা চলছে, গতকাল পর্যন্ত ছিল। তার কাছে জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে সবই জেনেছে বেথালী।

ঐ সন্ন্যাসী তিনজন এসে রাজকন্যার কথাই জিজ্ঞাসা করেছে। তিনি কখন আসেন, সাধারণত কতক্ষণ থাকেন—ইত্যাদি।

প্রচুর উপহার এবং পারিতোষিক দিয়েছে ওরা রক্ষীদের, বিদেশী কোন্ রাজার পরিচয়পত্র দেখিয়েছে, বলেছে ওদের দলপতি সেখানকার রাজার গুরু।

আসলে উৎকোচেই কাজ হয়েছে। এমন তো কিছু অসম্ভব প্রার্থনাও ছিল না ওদের। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর পর্যন্ত ওরা উদ্যানে বিশ্রাম করবে, সেই সময়ের মধ্যে ওদের না কেউ উত্যক্ত করে, কি উৎখাত করার চেষ্টা করে।

রাজকন্যাকে দেখার বড় কৌতূহল, তাও স্বীকার করেছে ওরা। খুব নাম-ডাক-খ্যাতি রাজকন্যার—দেশে-বিদেশে। তিনি নাকি খুব ভাগ্যবতীও। এমন ভাগ্যরেখা নাকি সাধারণত কোন মেয়ের হাতে দেখা যায় না—এক বড় ভাগ্যদ্রষ্টা অর্হৎ নাকি ওদের দেশে গিয়ে গল্প করেছেন।

বৈশাখী পূর্ণিমার দিন নাকি রাত্রি তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত ছিল ওরা। পরের দিনও এসেছিল, ঝড়-জলের মধ্যেই। সেও দ্বিতীয় প্রহর পর্যন্ত ছিল। তৃতীয় দিনে তো এঁদের দেখাই পেয়েছে।

শোনা গেছে—দলের লোকেরাই বলেছে—এই তিন দিন ঐ দলের প্রধান যিনি, তিনি নাকি উপবাস ক'রে ছিলেন। ভগবান শাক্যমুনির কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, রাজকন্যার দেখা না পেলে তিনি আর অন্নজল মুখে দেবেন না। দেখা যেদিন পেয়েছেন—সেদিন নাকি যাবার সময় প্রত্যেক রক্ষীকে সুবর্ণনিষ্ক পুরস্কার দিয়ে গেছেন একটি ক'রে। বলে গেছেন সেদিন ষষ্ঠদিনে আবার আসবেন।

বলে গেছে ষষ্ঠদিনে আবার আসবে!

দু'দিন আগেও শুনলে অসহ্য স্পর্ধা মনে হ'ত।

রক্ষীরা উৎকোচ খেয়েছে বিদেশীর কাছ থেকে—শর্ত ওঁকে দেখতে পাবার সহায়তা করবে, এ সংবাদও আগে শুনলে স্বর্গ-মর্ত্য-রসাতল একাকার করতেন, ঐ রক্ষীদের কঠোর শাস্তি না দেওয়া পর্যন্ত স্থির হতেন না।

কিন্তু আজ আর তেমন কিছুই মনে হ'ল না। এই চারদিনে ওঁর মানসিক দৃষ্টির বহু পরিবর্তন হয়ে গেছে। আজ মনে হ'ল উনিও তাদের ডেকে পারিতোষিক দেন! মনে হ'ল পাঁচদিন সময় না দিলেই ভাল করতেন সন্ন্যাসী!

হায়রে ভাগ্য! প্রথম যেদিন উষ্মাভরে চলে এসেছিলেন সেদিন স্বপ্নেও ভাবেন নি যে, সেই অপরিচিত লোকটার চাতুরী আর প্রবঞ্চনার কাছে আত্ম-সমর্পণ করবার জন্যই এত আকুল আর অধীর হয়ে পড়বেন—মাত্র তিন দিনের মধ্যেই।...

সত্যিই কি জাদু জানে লোকটা?

এই কি ভারতীয় মায়া? ইন্দ্রজাল?

একেই কি ডাকিনী-তন্ত্র বলে?

ঐ যে তাঁর পিতামহ ভ্রষ্ট সন্ন্যাসীদের দমন করেছিলেন—অরি না কি বলত যেন—এরা কি তাদেরই প্রেরিত কেউ? বশীকরণ বিদ্যার প্রয়োগ ক'রে গেল?...

ভয় হ'ল বৈকি। খুবই ভয় হ'তে লাগল।

তবু প্রতিনিবৃত্ত হবারও আর শক্তি নেই। সাধ্য নেই আর নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করবার।

যা হয় হবে, যত বিপদের সম্ভাবনাই থাক—ওঁকে সেখানে যেতেই হবে।

আর একবার তাঁকে না দেখা পর্যন্ত শান্তি নেই জীবনে, সুখ নেই, স্বস্তি নেই।...

ষষ্ঠদিনের প্রভাতে মনে হ'ল মুহূর্ত দণ্ড প্রহর বড় মন্থরগতিতে কাটছে। যখন মাত্র দ্বিপ্রহর—তখন বোধ হ'ল সূর্যদেব স্তব্ধস্তম্ভিত হয়ে গেছেন, দিন এক জায়গায় স্থির হয়ে আটকে আছে।...

সন্ধ্যা থেকে এক লহমাও স্থির হয়ে বসতে পারলেন না। বেথালীকে

বলাই ছিল, শিবিকা নয়—তার ভাই টাট্টুঘোড়া নিয়ে প্রাসাদ-কাননের পিছনের দ্বারে অপেক্ষা করবে—উনি আর ওরা দুই ভাইবোন সেই পথে বেরিয়ে আনন্দ মন্দিরে যাবেন।

সেখানেও প্রধান প্রবেশপথ দিয়ে যাতে না ঢুকতে হয় সে ব্যবস্থাও বেথালীর ভাই ক'রে রাখবে।...

অবশেষে যখন কৃষ্ণারাত্রির অন্ধকারে সত্যই প্রায়-ছদ্মবেশে পিছনের দরজা দিয়ে ষড়যন্ত্রকারীর মতো গোপনে রওনা হলেন রাজকুমারী—এক সম্পূর্ণ অপরিচিত বিদেশী যুবকের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য—তখন নিজের কাছেই সমস্ত ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য মনে হ'ল।

বার বার নিজেকেই শোনালেন, এ ভাল নয়, এ ভাল হ'ল না, এর ফল কখনই ভাল হবে না। এখনও ফিরে যাওয়া উচিত, এখনও উচিত ওঁর পিতাকে জানানো এবং ঐ লোকটির পরিচয় ও উদ্দেশ্য সংগ্রহ করা—কিন্তু তবু ফিরতে পারলেন না।

নিয়তির মতো কোন্ অদৃশ্য শক্তি অপ্রতিহতবলে তাঁকে আকর্ষণ করে নিয়ে গেল—হয়ত বা তাঁর সর্বনাশের দিকেই।

নিয়তিই—পরে জেনেছিলেন।

॥ পাঁচ ॥

ষষ্ঠ রাত্রির দ্বিতীয় যামার্ধে অপেক্ষা করার কথা। ঠিক সেইখানে, যেখানে ওঁদের প্রথম দেখা হয়েছিল।

সেইখানেই ছিলেন তিনি, পথের ওপরে নয়, পাশের শাম্বলে।

ঠিক সেইভাবে, পাষাণ-মূর্তিবৎ, নিশ্চল, নিস্পন্দ।

আজ আর জ্যোৎস্নার আলো নেই। উদ্যানের মধ্যে মধ্যে পথের মোড়ে মোড়ে স্ফটিকাধারে তেলের প্রদীপ জ্বলছে, সামান্যই তার আলো—তবু চিনতে ভুল হ'ল না।

সেই দীর্ঘ দেহ, সেই ঋজু ভঙ্গী। কিন্তু আজ একা, সঙ্গীরা সঙ্গে নেই কেউ, অথবা দূরে কোথাও, কোন লতাগৃহে বা বৃক্ষকাণ্ডের অন্তরালে আত্মগোপন ক'রে আছে।

সে যা-ই থাক, রাজকুমারীর আর এসব বিবেচনা কি দ্বিধাসঙ্কোচের অবকাশ নেই, শক্তিও নেই।

সে পথ ঘুচিয়ে দিয়েই এসেছেন।

শেষ মুহূর্তের বৃথা চিন্তাদ্বন্দ্বে তিনি বিশ্বাসী নন। সতর্ক হওয়ার আর অবসর নেই, বিবেক বা শুভবুদ্ধির চেতনাবাণীতে কর্ণপাত করার সময় পার হয়ে গেছে বহুক্ষণ।

ইতস্তত করলেনও না তিনি, ধীর পদক্ষেপে সোজাই এগিয়ে গেলেন—সেই

অপরিচিত মায়াবী বিদেশীর দিকে, একেবারে সামনে গিয়ে নতমস্তকে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন।

রাজা রণমল্লদেবও আজ আর কোন চাপল্য বা চটুলতা প্রকাশ করলেন না। অকল্পনীয় বিজয় তথা অভীষ্টসিদ্ধির এই অসাধারণ সৌভাগ্যেও বিন্দুমাত্র বিচলিত বা উচ্ছল হয়ে উঠলেন না, সেদিনের রূঢ়-ভাষার প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করলেন না, কোন অশোভন আচরণ বা ব্যঙ্গ-কৌতুক-বাক্য উচ্চারণ ক'রে নিজের বিজয়গর্ব উপভোগ করার জন্য ব্যস্ত হলেন না।

বরং—চিত্তের সর্বপ্রকার চাঞ্চল্য—গর্ব ও আনন্দ প্রকাশের প্রবল প্রলোভন—ধীর-স্থির ভাবেই দমন করলেন। রাজকুমারী বোধ করি নিজের অজ্ঞাতসারেই হাত দু'টি সামনের দিকে ঈষৎ এগিয়ে দিয়েছিলেন, সেদিনের সেই রোমাঞ্চকর স্পর্শের স্মৃতি তাঁর অবচেতনে তাঁকে প্ররোচিত ক'রে থাকবে—কিন্তু সেই রক্তকমলকোরক-সদৃশ দুর্লভ হাত দু'টি নিজের মুঠির মধ্যে গ্রহণ করবার দুর্নিবার লোভও সম্বরণ করলেন রণমল্লদেব।

ধীরে ধীরে এক-পা এগিয়ে এসে সেবন্তীর সামনে সেই উপল-বন্ধুর পথের উপরেই নতজানু হয়ে বসে, তাঁর হাতের প্রান্ত দু'টি মাত্র স্পর্শ ক'রে ধীরকণ্ঠেই বললেন, 'রাজকুমারী, তুমি আমাকে ক্ষমা করো। আমিও এক রাজ্যের রাজা, শাসক—নতজানু হয়ে আমার ধৃষ্টতা ও স্পর্ধার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করছি। তোমার রূপে অর্ধোন্মাদ তোমাদের দেশেরই একটি বিদ্যার্থী তোমার বর্ণনা দিয়ে আমাকে উন্মত্ত ক'রে তুলেছিল—তাই কাণ্ডজ্ঞানহীন অর্বাচীনের মতোই কোন সঙ্কোচ, কোন বিচার-বিবেচনা না ক'রে এক লক্ষ্যে ছুটে এসেছি শুধু। মূর্খ বর্বরের মতো আচরণ করেছি। তার চেয়েও অমার্জনীয় অপরাধ—সন্ন্যাসীর বেশ ও পরিচয়ের অমর্যাদা করেছি, তোমার প্রতিও দুঃসহ স্পর্ধিত আচরণ করেছি, কিন্তু যা করেছি তোমার জন্যেই করেছি—এই ভেবেই তুমি আমাকে মার্জনা করো।'

কে জানে কেন—দয়িতের এই দীন অনুতপ্ত বাক্যেই সম্ভবত—অকস্মাৎ রাজকুমারী সেবন্তীর দুই চক্ষু বাষ্পবারিতে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। তিনিও অগ্র-পশ্চাৎ কিছু চিন্তা না ক'রে, সেইখানে সেই কঠিন কঠোরস্পর্শ পথের ওপরই বসে পড়ে রাজার উষ্ণ কোমল লুব্ধ মুষ্টির মধ্যে নিজের হাত দু'টি সঁপে দিয়ে গাঢ়কণ্ঠে বললেন, 'ওসব কোন কথাই বিবেচনা করি নি। করলে আসতে পারতুম না। তোমার কাছে আজ না এসে আমার উপায় ছিল না! সর্বনাশের মধ্যে আসছি জানলেও—হয়ত এসেছিও তাই—তবু আসতে হ'ত। তুমি এবার আমাকে দয়া করো—'

আর কিছু বলতে পারলেন না রাজাধিরাজদুহিতা সেবন্তী। উচ্ছ্বসিত রোদনে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল, তিনি যেন প্রণামের ভঙ্গীতেই রণমল্লদেবের দিকে নত হলেন।

আর তা বুঝে—চোখের নিমেষে—রাজকন্যার সেই দেববাঞ্ছিত কমল-কোমল হাতদুটি ধরেই আকর্ষণ ক'রে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন তিনি। গাঢ়

রুদ্ধকণ্ঠে ডাকলেন, 'সেবন্তী!'

ঈষৎ কৃত্রিম কাশির শব্দ ক'রে জীবনের এক মধুরতম স্বপ্ন থেকে তাঁদের রূঢ় বাস্তবে নামিয়ে আনল বেথালী। বলল, 'ক্ষমা করবেন মহামান্য, কিন্তু এটা প্রহরী বদলের সময়। সব দিন বা সব সময় না হ'লেও—শুনেছি প্রায়ই বদলির ভার নেবার আগে নূতন প্রহরীর দল এ উদ্যান ঘুরে দেখে যায়। এভাবে আপনাকে দেখলে বহু অবাঞ্ছিত জনরবের সৃষ্টি হবে, মহারাজ-চক্রবর্তী অপদস্থ হবেন।'

চমকে, চমক ভেঙে নিজেকে সেই বহু-ঈপ্সিত জীবন-সার্থক-করা, জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আলিঙ্গন থেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন সেবন্তী, করুণ কম্পিত কণ্ঠে কেমন এক প্রকার অসহায়ভাবে বললেন, 'কিন্তু বেথালী—'

'ব্যস্ত হবেন না মহামান্যা, সে ব্যবস্থা আমি একটা ক'রে রেখেছি। মাননীয় অর্হৎ যদি আমাদের সঙ্গে এখন যান এবং অপরাধ না নেন—প্রয়োজনে বহু দীনতাই মেনে নিতে হয়—প্রাসাদোদ্যানের পিছনের যে দরজা দিয়ে আবর্জনা-সংগ্রাহকরা যাতায়াত করে, বাকী সময় যা বন্ধই থাকে—সেই দরজা দেখে চিহ্নিত ক'রে যান তো—কাল রাত্রি দ্বিতীয় যামের শেষে প্রাসাদে যখন ঘড়ি বাজবে, তখন ঐ দ্বার উন্মুক্তই দেখতে পাবেন। সেখানে আমিই উপস্থিত থাকব। উদ্যানের মধ্যে রাজাধিরাজের নিদাঘ-সন্ধ্যা-যাপনের যে ঘরটি বহু-কাল অব্যবহৃত পড়ে আছে, সে ঘর আমি আজই পরিষ্কার ও ব্যবহারযোগ্য ক'রে রেখে এসেছি। ঐ ঘরটির একটা বিশেষ সুবিধা এই, ওর একটা প্রেতবসতি জনশ্রুতি আছে, সেজন্যে পারতপক্ষে ওখানে কেউ যায় না। সম্ভবত উদ্যান-রক্ষক প্রহরীরা একসময় নির্জনতার সুযোগে ওখানে একটি গোপন সুরাপানের চক্র গড়ে তুলেছিল—সেই থেকেই এই প্রেত অপবাদ ছড়িয়ে পড়েছে। যাই হোক, সেখানে আপনারা নির্জনে আলাপ-আলোচনার যথেষ্ট সময় পাবেন। এক প্রহরকাল নিশ্চিন্তে কাটাতে পারবেন সেখানে।'

ইঙ্গিতটা ভাল নয়। স্পষ্টত অভিসারেরই আয়োজন। দুঃসাহসিক, বিপজ্জনক।

তার চেয়েও বড় কথা—একটা দাসীর কাছে দীনতা স্বীকার করা, তার ভ্রূকুটির অধীন হয়ে থাকা চিরকালের মতো। কোন কারণেই তাকে অসন্তুষ্ট করা চলবে না কোনদিন।

কে জানে এর কী মূল্য দিতে হবে! আরও কত দৈন্য স্বীকার করতে হবে পরে!

লজ্জা, অপমান ও দাসীর স্পর্ধিত ধৃষ্টতায় মুখ-চোখ উত্তপ্ত রাঙা হয়ে উঠল সেবন্তীর। কিন্তু কিছু বলতেও পারলেন না। তাঁর কিছু গুছিয়ে ভাবার, কি সিদ্ধান্ত নেওয়ার সাধ্য যেন চলে গেছে; কিছু আদেশ দেওয়ার ক্ষমতাও নেই। এখন থেকে সবটাই নির্ভর করছে তার এই দয়িতের উপরই।

তিনি বিহ্বল ব্যাকুল হয়ে তাই রণমল্লদেবের মুখের দিকেই তাকালেন।

এ ভঙ্গী রণমল্লদেবের বুঝতে বিলম্ব হ'ল না।

তিনি আবারও সেবন্তীর একটা হাত নিজের দুই হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে ঈষৎ অনুনয়ের ভঙ্গীতেই বললেন, 'অন্যায়, খুবই অন্যায়—তোমাকে বিপন্ন করা অকারণে ; সবই বুঝছি—কিন্তু সেবন্তী, তোমাকে যে ভাল ক'রে দেখাই হ'ল না। কত কী যে বলবারও ছিল!...একবার, একটা দিন—না হয় একটু দৈন্য স্বীকারই করলুম আমরা।...এটুকু দয়া ভিক্ষা চাইছি তোমার কাছে।'

সেই স্পর্শে, উষ্ণ কোমল অথচ বলিষ্ঠ মুষ্টির সামান্য চাপ লেগে, হাত দুটিই শুধু নিমেষে স্বেদার্দ্র হয়ে উঠল না, একটু শিউরে কেঁপেও উঠলেন সেবন্তী। একটা ছোট্ট দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'তোমার ইচ্ছা যদি তাই হয় তো হোক। আমার কোন ইচ্ছা বলতে তো তুমি রাখ নি কিছু।'

উদ্যানের মধ্যে এই নিদাঘবাটিকাটি তৈরী করিয়েছিলেন সম্রাট অনিরুদ্ধদেব তাঁর মহাপ্রয়াণের কিছু পূর্বে।

এখানে গ্রীষ্মের চন্দন-পঙ্ক-মিশ্রিত জলের মধ্যে একটি হস্তীদন্তখচিত পালঙ্ক পেতে দেওয়া হ'ত, তার উপর পুষ্পকেশরাকীর্ণ শয্যায় তিনি উপবিষ্ট বা অর্ধনিষণ্ণ থাকতেন। চারিদিকে সুগন্ধি ফুলের রচনা লম্বিত হ'ত—ফুলেরই পাখায় ব্যজন চলত। সে সময় পাশের বড় ঘরটিতে কিছু কিছু নৃত্যগীতের ব্যবস্থা থাকত। হয় প্রবীণ গায়করা গীতসভার আয়োজন করতেন, নয়ত কোন বিখ্যাত নর্তকী এসে সম্রাটকে নিজের কৃতিত্ব প্রদর্শন ক'রে ধন্য হ'ত।

এসব ব্যসনে ত্রিভুবনাদিত্যর রুচি ছিল না কোনদিনই। অনিরুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র শলু বা শল্যবজ্রাভরণ সিংহাসনে বসেন। শল্য খুব দুর্বলচিত্ত ও বিলাসী ছিলেন। তাঁর আমলে এ ঘর শুধু গ্রীষ্মে নয়—বারো মাসই উৎসবমুখর থাকত। সেই সংবাদেই উৎসাহিত হয়ে মোনরা বিদ্রোহ করে এবং পগান অধিকার ক'রে রাজাধিরাজ শল্যকে বন্দী ও বধ করে।

তখন ত্রিভুবনাদিত্য বালক মাত্র। বিদ্রোহীরা অগ্রসর হয়ে রাজধানীর দ্বারপ্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে গেছে সংবাদ পেয়ে ওঁর মা বৈশালীদুহিতা দেবী পঞ্চকল্যাণী ওঁকে নিয়ে উত্তরব্রহ্মে পালিয়ে যান, তাতেই ত্রিভুবনাদিত্যর প্রাণরক্ষা হয়। তারপর বহুকষ্টে পিতৃ-সিংহাসন পুনরুদ্ধার করতে হয় ওঁকে।

সেই কারণেই আরও—বিলাস-ব্যসন সম্বন্ধে এত বীতস্পৃহা ত্রিভুবনাদিত্যর। বস্তুত ওঁর সিংহাসন অধিরোহণ থেকেই এ-ঘর বা এ-মহল খালি পড়ে আছে। হয়ত বেথালীর কথাই ঠিক—কখনও হয়ত এখানে উদ্যানভৃত্যরা মৈরেয়* সেবনের আড্ডা করেছিল, তাই থেকেই এ মহল অশরীরী-অধ্যুষিত বলে অপবাদ রটেছে। কারণ যাই হোক, ঐ অপবাদের ভয়ে এখন

* প্রাচীন মদ্য-বিশেষ। ধাত্রী ফুল, গুড়, কাঁজি, দারুচিনি, তেজপাতা, এলাচ, নাগেশ্বর, মরিচ, শুঁঠ, বনমুগ প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত।

আর কেউই রাত্রের দিকে এ অঞ্চলে আসে না। সেদিক দিয়ে গোপন বা নির্জন সাক্ষাতের পক্ষে ঘরটি সম্পূর্ণ নিরাপদ।

বেথালী করেওছে অনেক।

স্ফটিক-গবাক্ষগুলিকে ঘননীল বস্ত্রে আবরিত করেছে—যাতে ভিতরের আলোকাভাস বাইরে না পৌঁছয়; ভিতরের ঘর মার্জনা ক'রে মহারাজ-চক্রবর্তীর বিস্তীর্ণ পালঙ্কে সুকোমল শুভ্র আস্তরণ বিছিয়েছে; বাতিদানে নয়, একটি থালায় অনেকগুলি বাতি জেবলে ঘরটিকে আলোকিত উজ্জবল ক'রে তুলেছে; বহুদিনের অব্যবহৃত বন্ধ ঘরে এক রকমের অরুচিকর গন্ধ হয় —সেজন্য ঘরের চারিদিকে কয়েকটি ঝুড়িতে বিস্তর সুগন্ধ পুষ্প এনে রেখেছে।

অর্থাৎ এমন কিছু আরামের আয়োজন করে নি যার চিহ্ন লোপ করতে অসুবিধা হয়—অথচ ঘরটি শুধু ব্যবহারযোগ্য নয়, চিত্তপ্রফুল্লকর ক'রে তুলেছে।...

এদের দুজনকে ভেতরে পৌঁছে দিয়ে খুব হাল্‌কা এক রকমের আরক জাতীয় পানীয় ও পানপাত্র হাতের কাছে রেখে দরজা বন্ধ ক'রে চলে গেছে বেথালী, আশ্বাস দিয়ে গেছে যে, সে বাইরেকার প্রবেশ-পথে পাহারায় রইল —তৃতীয় প্রহর পূর্ণ হওয়ার ঘণ্টা পড়লেই এদের সচেতন ক'রে দেবে। তার বেশী বিলম্ব করা উচিত হবে না। কারণ, তৃতীয় প্রহরের কয়েকদণ্ড পর থেকেই দাসী-চাকররা উঠতে শুরু করবে, উদ্যান-সেবকের দল কাজ করতে আসবে, পণ্যজীবীরা এই পথে প্রাসাদের নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভার পৌঁছবে। এ ঘর ব্যবহারের চিহ্ন পর্যন্ত তার পূর্বে মুছে দিতে হবে। বলা তো যায় না—দৈবাৎ যদি কেউ এদিকে এসে পড়ে!

অর্থাৎ সাড়ে সাত দণ্ড মাত্র সময়।...

প্রথমে দুজনেই নির্বাক হয়ে বসে রইলেন কিছুকাল।

দুজনেরই দুর্নিবার ইচ্ছা—দুজনকে ভাল ক'রে দেখেন। অথচ দুজনেরই অদমনীয় সঙ্কোচ—বিশেষ এই উজ্জবল আলোয় যেন রাজ্যের লজ্জা এসে ভর করেছে ওঁদের, এমন কি রাজা রণমল্লদেবকেও।

অবশেষে একসময় লজ্জা ও সঙ্কোচ দমন ক'রে চাইলেন দুজনেই।

দুজনেরই দৃষ্টি আবদ্ধ হয়ে গেল অতঃপর দুজনের মুখের ওপর। নির্নিমেষ-নেত্রে মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন শুধু।

এ বিস্ময়ের শেষ নেই। এমন যে দেখবেন তা গতরাত্রিতেও বুঝতে পারেন নি। সেদিনের চন্দ্রালোকেও না।

রণমল্লদেব মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে সিংহবাহু কিছুমাত্র অতিরঞ্জন করে নি। বরং—আজ, অপলকনেত্রে সেই দেববাঞ্ছিত দেবকন্যা-দুর্লভ অপরূপ মুখের দিকে চেয়ে মনে হ'ল—সে কমই বলেছে, অথবা বলবার, এ রূপের বর্ণনা দেবার ভাষা খুঁজে পায় নি।

সেবন্তীও ও নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়েই আছেন শুধু।

পুরুষ তিনি অনেক দেখেছেন। বাল্যকাল থেকেই দেখেছেন—রাজসভা-মন্ত্রণাসভায় তো বটেই, মন্দিরে আত্মীয়গৃহে—এমন কি পথেঘাটেও।

ওঁদের এদেশে অকারণ বাধা কিছু নেই—স্ত্রী-পুরুষ পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে থাকায়। ··

যা দেখেছেন তার মধ্যে সুশ্রী সুপুরুষও অনেক আছে। কিন্তু এমন কখনও দেখেন নি। এ একেবারে অতুলনীয়। এ সমস্ত পুরুষজাতি থেকে যেন স্বতন্ত্র, কল্পনাতীত। বিধাতা যেন নিজের শক্তির চূড়ান্ত পরীক্ষা করতেই এই পুরুষদেহ সৃষ্টি করেছেন। ক'রে তিনিও বিস্মিত হয়েছেন নিশ্চয়।

সেবন্তী এখনও পর্যন্ত ঠিক ধারণা করতে পারছেন না যেন—এমন কাউকে দেখছেন। চেয়ে দেখেও বিশ্বাস হচ্ছে না।

দেখার পর থেকেই নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আছে তাঁর, হাত-পা নাড়তেও ভরসা হচ্ছে না। ভয় হচ্ছে এ বুঝি কোন সুদুর্লভ সুখস্বপ্ন, এ মোহ এ তন্দ্রা ভেঙে গেলেই চোখের পলক পড়লেই এ দৃশ্য কোথায় মিলিয়ে যাবে—বাস্তবের কোন্ দূর দিগন্তে।···

চেয়ে থাকতে থাকতে আরও মনে হ'ল, সৃষ্টিকর্তা নরদেহের যা কিছু শ্রেষ্ঠ সম্পদ তিল তিল ক'রে সংগ্রহ ক'রে এই অপূর্ব বরদেহের সৃষ্টি করেছেন। মনে হ'ল যুগ-যুগান্তর এই মুখের দিকে চেয়ে থাকলেও তৃপ্তি হবে না। মনে হ'ল একবার মাত্র এঁর বক্ষে স্থান পেয়ে মরে গেলেও কোন ক্ষতি বোধ হবে না—অথবা তারপর এই বক্ষবিচ্যুত হয়ে বেঁচে থাকাটাই অস্বাভাবিক, অসম্ভব।···

অনেক—অনেকক্ষণ পরে বোধ করি এক দৃষ্টে চেয়ে থাকার শারীরিক ক্লান্তিতেই চোখ নামাতে হ'ল একসময়, সম্মোহটা নষ্ট হল।···

এর পর কথা।

এতক্ষণে কথা বলা সম্ভব হ'ল।

বলার ইচ্ছা তো উভয় পক্ষেই যথেষ্ট—শক্তিটা ছিল না।

এবার সেই শক্তি ফিরে পেলেন একটু একটু করে।

রাজা রণমল্লদেব নিজের পরিচয় দিলেন। নিজের রাজ্যটা কোথায়—বোঝাবার চেষ্টা করলেন।

এবার আর এক দফা বিস্ময়াভিভূত হওয়ার পালা। দেখা গেল এ বিষয়ে রাজকুমারীর ধারণা খুব স্বচ্ছ। দেশটা আরাকানের কোন্ দিকে, এখান থেকে কত দূরে, পট্টিকের রাজ্যের আয়তন কত, আনুমানিক প্রজাসংখ্যা—সমস্ত তিনি নিজেই বলে দিলেন।

চমক লাগাবার, সম্ভ্রম সৃষ্টি করবার ঝোঁকে উৎসাহিত হয়ে বলে যাচ্ছিলেন সেবন্তী, তিনি যে সামান্যা সুন্দরী নারী মাত্র নন, তার চেয়ে অনেক বেশী—এই পরিচয় দিয়ে অভিভূত করার আনন্দেই ; এখন রণমল্লদেবের দৃষ্টিতে মুগ্ধ বিস্ময় লক্ষ্য ক'রে গর্বে ও সুখে লজ্জারক্ত মুখখানি নত ক'রে বললেন, 'বাবা আমাকে চিরদিন পাশে পাশে রেখে রাজকার্য শিখিয়েছেন। বলতে গেলে সেই

শৈশব থেকেই। আর—প্রতিবেশী রাষ্ট্র সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা তো রাজ্য শাসননীতির প্রধান অঙ্গ একটা।

এইসব সাধারণ কথার মধ্যেই দুজনে সহজ হয়ে আসেন।

সেদিনের সেই মধু-পূর্ণিমার রাত্রে আসব-উত্তেজিত মস্তিষ্কে সিংহবাহুর কথার কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, কীভাবে সকল হিতাকাঙ্ক্ষীর কথা উপেক্ষা ক'রে তিনি উন্মত্তের মতো বেরিয়ে এসেছেন—দু'টি মাত্র বন্ধু আর একটি ভৃত্য সঙ্গে ক'রে, কীভাবে দ্রুত আসতে হয়েছে তাঁকে বৈশাখী পূর্ণিমার মধ্যে এখানে পৌঁছনোর জন্য ওঁকে দেখতে, পথে কি কি সাংঘাতিক বিপদের মধ্যে পড়তে হয়েছিল ; এখানে এসে পূর্ণিমার সন্ধ্যায় না পেয়ে কি পরিমাণ হতাশ হয়ে আত্মঘাতী হ'তে যাচ্ছিলেন, বন্ধু বলভদ্রর জন্যই কোনমতে রক্ষা পেয়েছেন ; তারপর কীভাবে ভগবান তথাগতের কাছে শপথ গ্রহণ করেছিলেন উপবাসী থাকার—এইসব বিচিত্র ও রাজকুমারীর কাছে রোমাঞ্চকর বিবরণের মধ্যে দিয়ে কখন যে পাঁচ দণ্ডকাল সময় কেটে যায়—দুজনের কেউই টের পান না।

একেবারে সচেতন হন—বাইরে থেকে দরজার কপাটে মৃদু করাঘাতের শব্দে।

বেথালী সবিনয়ে জানিয়ে দেয়, আর আড়াই দণ্ড মাত্র সময় অবশিষ্ট রইল।

অর্থাৎ এবার বিদায় নেওয়ার পালা।

সম্ভবত চিরদিনের মতো।

এই-ই প্রথম, এই এই-ইশেষ দেখা।

এ তো জানাই ছিল। এর ব্যতিক্রম যে সম্ভব নয়—তা দু'পক্ষই জানেন। অন্য রকম চিন্তা করাও যায় না। এইটেই যথেষ্ট অন্যায় হ'ল। ন্যায়, নীতি, রাজমর্যাদার দিক দিয়ে তো বটেই—ওঁদের ব্যক্তিগত ভবিষ্যতের দিক দিয়েও। দু-দুজন প্রত্যক্ষ সাক্ষী রইল এই নীতিবহির্ভূত সাক্ষাৎ ও আলাপের। হয়ত আরও কেউ কেউ জানল।

সেবন্তীর হাতদু'টি তখনও ধরা রণমল্লদেবের দুই হাতে।

রাজকন্যার মনে হয় এই অবস্থায় মৃত্যুই ভাল ছিল। এখনই, এই মুহূর্তে।

তিনি ব্যাকুল বিমূঢ় ভাবে চান রণমল্লদেবের মুখের দিকে। যেন সে মুখে, সেই দৃষ্টিতেই পথ খুঁজে পেতে চান মুক্তির, অসম্ভব কোন আশ্বাস চান।

কিন্তু রণমল্লদেবের দৃষ্টি দেখে ভয় পেয়ে যান সেবন্তী। পুরুষের চোখের এ চাহনি তিনি দেখেন নি, দেখার কারণ ঘটে নি। তবু বুদ্ধিমতী সেবন্তীর সে দৃষ্টি চিনতেও ভুল হয় না। যুগ-যুগান্তের আকুল অধীর তৃষ্ণা জেগেছে সেই আয়ত গভীর চোখে, ওষ্ঠের ভঙ্গীতে ফুটে উঠেছে এক নিষ্ঠুর ক্ষুধা।...

সেবন্তী ভয় পেয়েই হাত ছাড়িয়ে নিতে চান। কিন্তু এতক্ষণের উষ্ণ সুখদ বন্ধন কঠিন বজ্রমুষ্টিতে পরিণত হয়।

রণমল্লদেব বলেন, 'সেবন্তী, এই কি আমাদের শেষ দেখা ? এই বিদায়—চির বিদায়, চিরকালের মতো ?'

'হ্যাঁ প্রভু, আর তো কোন উপায় কোথাও নেই। এ তো জেনেই তুমি এসেছিলে। জেনেই এসেছ আজ।'

যেন মিনতির ভঙ্গীতে উত্তর দেন সেবন্তী।

'কিন্তু এভাবে—এইভাবে চলে যাবে ?' একটা যেন যন্ত্রণা জাগে রণমল্লদেবের কণ্ঠে, 'এ তো কিছুই পেলাম না তোমাকে, যেন মনে হচ্ছে প্রাণভরে দেখাও হ'ল না।···আরও একটা দুটো দিন কি দেখা হ'তে পারে না আমাদের ? অন্তত আর এক দিন ?'

সেবন্তীর চোখে জল কিন্তু কণ্ঠস্বরে এক বিপুল রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারিণীর যোগ্য দৃঢ়তা, 'আর এক কেন এক সহস্র দিন এভাবে দেখা হ'লেও তোমার তৃপ্তি হবে না। মিছিমিছি সে আরও জ্বালা, আরও কষ্ট। তার চেয়ে এ-ই ভাল।...শুধু এইটুকু জেনে যাও, তুমি যেখানেই থাকো—যত দূরেই থাকো—আমার আত্মা, আমার মন, আমার সমস্ত অস্তিত্ব - সুখ আনন্দ, প্রাণের যা কিছু আরাম—চিরদিন ক্রীতদাসীর মতো তোমার অনুবর্তন করবে। এখানে থাকবে শুধু দেহটা, যে সেবন্তীকে তুমি দেখে গেলে—আজ থেকে তার মৃত্যু ঘটল।'

'কিন্তু এর কি কোন প্রতিকার নেই ?' অধীর প্রশ্ন রণমল্লদেবের।

'না। কোন প্রতিকার আমার তো অন্তত চোখে পড়ছে না।'

'এই ভাবেই আমাদের বিদায় নিতে হবে ? কোন সাধ পূর্ণ না ক'রে ?'

চুপ ক'রে থাকেন সেবন্তী।

'আমি—আমাকে তুমি বিবাহ করতে পারো না ?···আমি যদি বিবাহের প্রস্তাব পাঠাই তোমাদের রাজসভায় ? আমিও স্বাধীন রাজা—এত বড় রাজ্য না হোক, তবু রাজ্য—সেখানকার মহিষী ক'রেই তোমাকে নিয়ে যেতে চাইছি।'

এক লহমার জন্য কি সেবন্তীর চোখ দু'টি আশার-অতীত-এক আশায় প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে ? বিপুল একটা সম্ভাবনার ছায়া খেলে যায় কি সে মুখে ? পরক্ষণেই কি আবার অপরিসীম একটা বিষণ্ণতা নামে।···

'মনে তো হয় না বাবা রাজী হবেন। তিনি অপুত্রক, অন্য কোন সন্তানও নেই। এই সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী হিসেবেই মানুষ করেছেন আমাকে।···আমার ওপর অনেক আশা তাঁর।'

নিরুত্তাপ হতাশ কণ্ঠে কতকটা যন্ত্রের মতো উত্তর দেন সেবন্তী।

সময় দ্রুত চলে যাচ্ছে। আর হয়ত এক দণ্ড সময়ও হাতে নেই।

বাইরে কোথায় একটা নিশাচর পাখী জানলার পাশ দিয়ে ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল। তার স্বভাব-কর্কশ শব্দ আবরিত রুদ্ধ গবাক্ষর মধ্য দিয়ে আরও অদ্ভুত বিকৃত শোনাল। মনে হ'ল যেন কোন অশরীরী আত্মা সচেতন ক'রে দিয়ে গেল তাঁদের।

সেবন্তী উঠে দাঁড়ালেন।

বোধ করি নত হয়ে প্রণামই করতে গেলেন রাজাকে।

বিদায়ের আগে শেষ প্রণতি।

আর এক মুহূর্তও অবসর নেই। চিরবিচ্ছেদের পূর্বে এই-ই শেষ ক'টি নিমেষ।...

রণমল্লদেবের মনে হ'ল সেই মুহূর্তে সমস্ত পৃথিবীটা একটা বিরাট ভূমিকম্পে ভেঙে গুঁড়িয়ে গেলে তিনি সুখী হতেন, নিশ্চিন্ত হতেন। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেন একটা বিপুল জলোচ্ছ্বাসে যদি এই রাজ্য, এই প্রাসাদ, এই সমস্ত জনতা—তার সঙ্গে ও'রাও দুটি প্রাণী—ভেসে মিলিয়ে যেতেন কোথাও।...

কিন্তু সে-সব কিছুই হয় না। এক সময় শুধু নির্দিষ্ট সময় শেষ হয়ে যায়।...

মৃদু কাশির শব্দ ক'রে এবার ঘরে ঢুকে আসে বেথালী।

'মহারাজ, আপনার অশ্ব প্রস্তুত। আমার ভাই বাইরে অপেক্ষা করছে।'

বিবশ শিথিল অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিকে যেন কুড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ান রণমল্লদেব।

তারপর বেথালীকে ইঙ্গিত করেন বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করতে।

কপাট রুদ্ধ হলে কাছে এসে দু'হাতে সেবন্তীর মুখখানি তুলে ধরেন, 'বৃথা ক্ষমা চাইবার আর চেষ্টা করব না সেবন্তী,একথা বলারও কোন প্রয়োজন নেই যে, তোমাকে বাদ দিয়ে আমার জীবনের আর কোন অর্থ কোন স্বাদ রইল না।.. শুধু একটা কথা বলে যাই, অতঃপর আমার যা কর্তব্য আমি পালন করব, তুমি একটু সাহায্য ক'রো আমায়।'

আর কিছু বলার অবসর ছিল না। অসহিষ্ণু বেথালী যবনিকার ওপারে ওদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য অবিরাম শব্দ ক'রে যাচ্ছে।

অবসর আর সত্যই নেই। আর একটু পরেই এই উদ্যানে বহু লোকের সমাগম হবে, সাধারণ কর্মজীবী মানুষ—যাদের রসনা ও কৌতূহল দুই-ই প্রবল এবং প্রখর।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাই রাজা রণমল্লদেবকে এক সময় বিদায় নিতে হয়।

যাওয়ার আগে শেষ মুহূর্তে কোন সম্ভাষণ পর্যন্ত ক'রে যাওয়া সম্ভব হয় না। ভাল ক'রে পরস্পরের দিকে চাওয়াও না।

সেবন্তীর চোখে তো বহুক্ষণই ধারা নেমেছে—পুরুষ এবং রাজা রণমল্ল-দেবের চোখও শেষ মুহূর্তে এমন বিশ্বাসঘাতকতা করবে—তাঁর ধারণা ছিল না। ঘর থেকে বেরোবার আগে একবার ফিরে তাকালেন—কিন্তু বাষ্পাস্পষ্ট দৃষ্টিতে একটা একাকার ঝাপ্‌সা মূর্তি ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না।

বুঝি এমনি বর্ণহীন আকৃতিহীন একাকার হয়ে গেল তাঁর জীবনও। যা কিছু আনন্দ আর আলো জীবনের, যা কিছু সুখ ও বর্ণাঢ্যতা সব পিছনে পড়ে রইল—কে জানে চিরকালের মতো কিনা!

॥ ছয় ॥

রাজা রণমল্লদেব অসম্ভবই সম্ভব করলেন।

তাঁর বিদায় নেবার ঠিক একত্রিশ দিনের দিন পট্টিকেরা থেকে দূত এসে পেঁৗছল পগান রাজসভায়। কী ক'রে এ সম্ভব হ'ল তা অনেক ভেবেও বুঝতে পারলেন না সেবন্তী, এ দ্রুততা কোন হিসেবেই আসে না। এতটা পথ যাওয়া আসা এবং দূত প্রেরণের নানারূপ প্রস্তুতি—সব মিলিয়ে এর থেকে ঢের বেশী সময় লাগার কথা।

সাধারণ কোন অপর রাষ্ট্রের দূত এলে—তাঁকে সম্বর্ধনা জানানোর জন্য যে বিশেষ অমাত্যসভা আহ্বান করা হয়, সেবন্তী তাতে উপস্থিত থাকেন। পট্টিকেরা থেকে দূত আসবার কথাও যথারীতি তাঁকে জানানো হয়েছিল, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার অছিলায় সে দায় তিনি এড়িয়ে গেলেন।

পট্টিকেরা থেকে দূত এসেছেন একজন—এ সংবাদ পাওয়ার পর থেকেই তাঁর মনে যে বিপুল ঝড় উঠেছে, আশা-নিরাশা কামনা ও কর্তব্যের যে দ্বন্দ্ব—তার আগে গত একমাসকাল অবিরত যে যুদ্ধ করতে হয়েছে তাঁকে নিজের সঙ্গে—দুঃসহ অন্তর্বেদনা সহ্য ক'রে বাইরের প্রশান্তি রক্ষা ও রাজকার্য বজায় দিয়ে যেতে হয়েছে—তাতে শরীর খারাপের কথাটা নিতান্ত মিথ্যা অজুহাতও নয়।

মহারাজ-চক্রবর্তী ত্রিভুবনাদিত্য ও তাঁর মহিষী—সেবন্তীর জননী—ওঁর নিরতিশয় ম্লান ও শুষ্কমুখ লক্ষ্য ক'রে বহুবার উদ্বেগপ্রকাশ করেছেন—সেবন্তীকে কোনমতে সে দায় এড়াতে হয়েছে।·· সেদিন সকালেও অনুযোগ করেছেন, 'তুই দিন দিন এমন শুকিয়ে যাচ্ছিস কেন? নিশ্চয় ভাল ক'রে খাচ্ছিস না, নয়তো কোন শক্ত অসুখ ধরেছে। আমার কাছে লুকোস নি মা, ঠিক ক'রে বল্। লজ্জা ক'রে দেহে ব্যাধি পুষে রেখে তো লাভ নেই, এক-সময় প্রকাশ পাবেই। তখন হয়ত চিকিৎসাই দুঃসাধ্য হয়ে উঠবে মাঝখান থেকে।' ইত্যাদি—

অতিকষ্টে সেবন্তীকে নিবৃত্ত করতে হয়েছে তাঁদের—সেই চিকিৎসক ডাকার প্রস্তাব থেকে।

অমাত্যসভায় না গেলেও অন্তরাল থেকে সে সভার কার্যকলাপ দেখার কোন অসুবিধা ছিল না। অন্তত সেবন্তীর ছিল না।

রাজদূতকেও চিনতে বিলম্ব হ'ল না তাঁর।

রাজার প্রিয় বয়স্য—বলভদ্র।

বাহকরা এসে পট্টিকেরা-রাজসভা-প্রেরিত উপঢৌকন ও সম্মান-উপহার দ্রব্যাদি সাজিয়ে দিয়ে বিদায় নেবার পর যথানিয়ম সৌজন্য ও কুশল-সমাচার বিনিময় হ'ল। সে পর্ব সমাপ্ত হ'লে প্রাকৃত ও ব্রহ্মীতে মেশানো ভাষায় পট্টিকেরার পরম ভট্টারক, পরমেশ্বর, অরিদলন, দেবান্বয়-কমল-বিকাশ-ভাস্কর

রাজাধিরাজ শ্রীশ্রীরণমল্লদেবের বক্তব্য নিবেদন করলেন রাজদূত মহাশয়।

কাব্যময় অলঙ্কার-সমৃদ্ধ ভাষা থেকে নির্গলিতার্থ যেটুকু উদ্ধার করা গেল তা এই যে—উক্ত পরমভট্টারক ইত্যাদি, পাট্টিকেরাধিপতি রণমল্লদেব পরম-ভাগবত ভগবান-তথাগত শ্রীচরণাশ্রিত মহারাজ চক্রবর্তী ত্রিভুবনাদিত্য ধর্মরাজের সর্বগুণান্বিতা শ্রীময়ী কন্যার পাণিগ্রহণ করতে চান। পরমভট্টারক ইত্যাদি পাট্টিকেরাধিপতির যোগ্যতা বিষয়ে সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। তিনি অতীব সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান, দুর্ধর্ষ যোদ্ধা, রাজনীতিকুশলী এবং সুপ্রাচীন রাজবংশজাত। তাঁর বংশতালিকা ও কীর্তি-কাহিনীর পূর্ণ বিবরণ তাঁর এই পত্রের সঙ্গে দেওয়া আছে, পরমভাগবত মহারাজ-চক্রবর্তী অনুগ্রহ ক'রে তাতে নেত্রাতিপাত করলেই সে বিষয়ে সম্যক অবগত হ'তে পারবেন।···

আর যাই হোক, রাজা বা অমাত্যরা কেউই ঠিক এ প্রস্তাবের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁরা ভারতবর্ষ থেকে কন্যা এনেছেন বহুবার, এমন কি ভারতের কোন কোন রাজা তাঁর পিতাকে ও তাঁকে—বিনা প্রার্থনাতেই কন্যা উপহার পাঠিয়েছেন, কিন্তু কোন ভারতীয় নৃপতি তাঁদের কন্যা প্রার্থনা করেন নি কোনদিন।

এ ধরনের অনুরোধ যে আসতে পারে তা-ই ভাবেন নি—সুতরাং কোন উত্তরও মাথায় ছিল না। দূতের বক্তব্য শেষ হ'তে তাই একটা অস্বস্তিকর নীরবতা নামল সে সভায়। সকলে স্তব্ধভাবে বসে বিমূঢ়ের মতো পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন। অবশেষে মহামন্ত্রী আর স্থির থাকতে পারলেন না। অনুচ্চকণ্ঠে পার্শ্ববর্তী মহাসান্ধিবিগ্রহিককে বললেন, 'ধূর্তটা মতলব এঁটেছে ভাল। জানে রাজার এই একটি মাত্র সন্তান, কোনমতে তাকে অন্তঃপুরজাত করতে পারলেই কান টানলে যেমন মাথা আসে, তেমনি এতবড় রাজ্যটা অক্লেশে এসে যাবে হাতে। আর পায় কে!'

কথাগুলো খুব মৃদুকণ্ঠে বলা হ'লেও রাজদূতের কানে গিয়েছিল। হয়ত সবটা ঠিক শুনতে পান নি। কিছু শুনে, কিছু মুখের ভাবে বক্তব্যটা অনুমান ক'রে নিয়েছিলেন। অথবা এই ধরনের একটা বিরুদ্ধ যুক্তির জন্য প্রস্তুতও ছিলেন তিনি পূর্বাহ্ণ থেকেই।

তিনি আর একদফা সবিনয় অভিবাদন ক'রে বললেন, 'পরমেশ্বর পরম-ভট্টারক প্রজারঞ্জক রাজাধিরাজ শ্রীশ্রীপাট্টিকেরাধিপতি এও বলে দিয়েছেন যে, আপনারা অনুগ্রহ ক'রে এ প্রস্তাবে সম্মত হ'লে তিনি এবং তাঁর ভ্রাতারা লিখিত প্রতিশ্রুতি দেবেন যে, তিনি বা তাঁর উত্তরাধিকারী স্থলাভিষিক্তগণ বংশপরম্পরায় কদাচ কস্মিনকালে কখনও এই বিবাহের অধিকারে অরিমর্দন-পুরের সিংহাসন দাবী করবেন না। সম্পূর্ণ তো নয়ই—আংশিক, এমন কি সামান্য কোন ভূখণ্ডও না।'

অপ্রীতিকর প্রসঙ্গে এইখানেই ছেদ টানা উচিত, বৃদ্ধ মহামন্ত্রী আবার এর উত্তরে কি বলে বসবেন কে জানে—অপর রাষ্ট্র বিশেষ প্রতিবেশী দেশ সম্বন্ধে সর্ববিষয়ে সর্বদা সতর্ক থাকা প্রয়োজন, সামান্য স্ফুলিঙ্গ বিপুল

ঝাড়বাগ্নি সৃষ্টি করে—ত্রিভুবনাদিত্য তাই সেরকম কোন অবসর দিলেন না কাউকে, ইঙ্গিতে সকলকে নিরস্ত ক'রে নিজেই কথা বললেন।

বললেন, 'মহামান্য পট্টিকেরার রাজদূত মহাশয়, আমাদের প্রিয় বন্ধু ও ভ্রাতা, মহারাজাধিরাজ রণমল্লদেব যে প্রস্তাব পাঠিয়েছেন তাতে আমরা নিঃসন্দেহে পরম আপ্যায়িত ও গৌরবান্বিত বোধ করছি। কিন্তু প্রস্তাবটি যে একান্ত অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক, আশা করি তা আপনিও স্বীকার করবেন। এর উত্তর এত দ্রুত দেওয়া যায় না—কারণ বহু কন্যার একটি হ'লে শুধু কন্যার ভবিষ্যৎ, তার সুখ-দুঃখের প্রশ্নই একমাত্র বিবেচ্য হ'ত। আমার এই একমাত্র সন্তান—এর বিবাহে স্বভাবতই এই বিপুল রাজ্যের বহু লক্ষ প্রজার ভবিষ্যৎ, তার সুখ-দুঃখের প্রশ্ন দেখা দেবে।......সুতরাং অন্তত একপক্ষকাল সময় না পেলে এ প্রস্তাবের সকল দিক বিবেচনা ক'রে দেখা সম্ভব নয়। আশা করছি এই অবসরটুকু দিতে আপনাদের কোন অসুবিধা বা আপত্তি হবে না।......আপনারাও দীর্ঘপথ অতিক্রম ক'রে এসেছেন—নিশ্চয়ই একান্ত পরিশ্রান্ত বোধ করছেন। আপনারাও বিশ্রাম করুন। আপনাদের ক্লান্তি অপনোদন ও চিত্ত-বিনোদনের যাবতীয় ব্যবস্থা করার জন্য ইতিমধ্যেই আমাদের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী যথাবিহিত আদেশাদি দিয়েছেন। আপনারা যদি এই সময়ের মধ্যে দেশের অভ্যন্তরভাগে কোথাও ভ্রমণ করতে চান, কিম্বা শিকারে যাওয়ার ইচ্ছা থাকে—সে আয়োজনও করা যেতে পারে। মোটের উপর কোন আদেশ বা অনুরোধ জানাতে আপনারা দ্বিধাবোধ করবেন না—এই আমার ব্যক্তিগত প্রার্থনা আপনাদের কাছে।'

রাজদূত পুনশ্চ অভিবাদন ক'রে বিদায় নিলে মহামাত্য ক্ষোভভরে, বললেন, 'বৃথা পক্ষকাল ধরে কতকগুলো নিষ্কর্মা লোককে বসিয়ে খাওয়ানো নৃত্যগীতের আয়োজন করা—অকারণ অর্থব্যয়। কালই উত্তর জেনে যেতে বলতে পারতেন। উত্তর তো জানাই—'

ত্রিভুবনাদিত্য এবার একটু বিরক্তিই প্রকাশ করলেন। বললেন, 'আমাদের মহামন্ত্রী বৃদ্ধ হয়ে পড়ে রাজনীতির প্রথম পাঠই ভুলে যাচ্ছেন—সেটা হচ্ছে সৌজন্য। প্রতিবেশী রাষ্ট্র ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপনের অনুরোধ জানিয়েছে—এক কথায় সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে অশিষ্টতা প্রকাশ করা হয়। তা করলে নিজেদেরই শিক্ষা-দীক্ষার শোচনীয় অভাব প্রমাণিত হ'ত।...অকারণে সামান্য অর্থব্যয়ের ভয়ে আমরা এমন অশোভন আচরণ, এমন অভব্যতা প্রকাশ করতে যাব কেন?'

তিরস্কৃত হয়ে মহামন্ত্রী বিরসমুখ ক'রে বসে রইলেন। আসলে কিছুদিন যাবৎই তাঁর বৃক্ক ঠিকমতো কাজ করছে না। রাজবৈদ্য বঙ্গদেশ থেকে কুলত্থকলাই ও গোক্ষুরবীজ আনিয়েছেন—তাতেও বিশেষ কোন ফললাভ হয়নি। তার ফলেই মন তাঁর সর্বদা তিক্ত হয়ে থাকে।......না, এবার অবসর নিতে হবে, নইলে মানসম্ভ্রম বলতে কিছু থাকবে না।......অবসর নিতে আপত্তি নেই তাঁর—কিন্তু তিনি সরে গেলে তাঁরই ভাই রাজস্বমন্ত্রীটা

এসে এই আসনে বসবে—তাতেই ঘোর আপত্তি। চিরদিন শত্রুতা ক'রে এল তাঁর—আর অকারণ মহারাজাধিরাজের তোষামোদ—তিনি জীবিত থাকতেই তাঁর মাথায় পা দিয়ে চলবে—এই চিন্তাই অসহ্য।

অন্তঃপুরে এসে স্নান-পূজা শেষ ক'রে একেবারে আহারে বসে কন্যার কাছে কথাটা পাড়লেন ত্রিভুবনাদিত্য।

খুবই সাধারণভাবে, প্রসঙ্গত।

মেয়ের যে এ বিবাহে মত থাকবে না—এ তো তিনি জানেনই।

কিন্তু সেবন্তী নতমুখে ভাতের থালায় দাগ কাটতে কাটতে বললেন, 'তা আপনার কি মত? স্থির করেছেন কিছু?'

রাজা কদাচিৎ বিস্মিত হ'লেও বিস্ময় প্রকাশ করা তাঁদের রীতিবিরুদ্ধ। ত্রিভুবনাদিত্যেরও সে শিক্ষার অভাব নেই। কিন্তু আজ তিনি এতদিনের সেই রাজ-শিক্ষা ভুলে গেলেন, তাঁর বিস্ময় গোপন করতে পারলেন না।

বিস্মিত হবার কারণ যথেষ্ট।

কন্যার মুখে এ আবার কি ধরনের কথা? এ সম্বন্ধে কোন দ্বিমতের অবকাশ আছে নাকি?

তীক্ষ্নদৃষ্টিতে মেয়ের আনত মুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'এ প্রশ্ন কেন করছ মা? এ সম্বন্ধে কোন বিবেচনা বা আলোচনার কারণ আছে কি? তোমাকে এ রাজ্যের বাইরে কোথাও বিবাহ দেবার তো প্রশ্নই ওঠে না!'

'আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন বাবা, এ প্রসঙ্গ আলোচনাকে নির্লজ্জতা বা ধৃষ্টতা বলে মনে করবেন না—কিন্তু বাইরে কোথাও বিবাহ দেওয়া এত অসম্ভব মনে করছেন কেন?'

'তার মানে? তুমি কি বলতে চাইছ কন্যা?'

এবার শুধু দৃষ্টি নয়—কণ্ঠস্বরও তীক্ষ্ন হয়ে ওঠে পগানের মহারাজ-চক্রবর্তীর।

মাথা আরও অবনত হয় সেবন্তীর অন্নপাত্রের ওপর, কিন্তু বলার ভঙ্গীতে বা গলার স্বরে কোন লজ্জা কি অপরাধবোধ প্রকাশ পায় না। বেশ শ্রুতি-গোচরভাবেই বললেন, 'মেয়ের বিয়ে দেবার সময় সাধারণত তার বাবা-মা তার সুখ-দুঃখ-ভবিষ্যতের কথাই চিন্তা করেন। আমার বিবাহের যে প্রস্তাব এসেছে সেখানে পাত্রের যোগ্যতা, সে পাত্রের সঙ্গে বিবাহ হ'লে আমি কতটা সুখী হবো অথবা হবো না—এইটেই প্রধান বিবেচ্য হওয়া উচিত নয় কি?... এ রাজ্যের বাইরে পাঠানো চলবে না—এটাই সবচেয়ে বড় কথা হয়ে উঠছে কেন? এখানে যদি কোন যোগ্য পাত্র পাওয়া না যায়—তবু এখানেই রাখতে হবে?'

ত্রিভুবনাদিত্য গম্ভীর হয়ে ওঠেন। ভাতের থালা সরিয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ নীরবে বসে থাকেন, তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'এজন্য তোমার কাছে কোন কৈফিয়ৎ দিতে হবে তা কখনও ভাবি নি সেবন্তী। আমি যা স্থির করব

তা তোমার মঙ্গলের জন্যেই করব—আমার ওপর সে পরিপূর্ণ বিশ্বাস আছে তোমার—এইটিই ধরে নিয়েছিলুম।...বেঁচে থাকলে অনেক আঘাত সইতে হয়, অনেক অভিজ্ঞতাও হয়—এ প্রবাদের সত্য ক্রমেই মর্মে মর্মে অনুভব করছি।'

পিতার এই স্পষ্ট বিরক্তিতেও কন্যা অনুতপ্ত হন না।

নতমস্তকে স্থির হয়ে বসে অপেক্ষা করেন—নিজের প্রশ্নের উত্তরের জন্য।

সে উত্তর দিতেও হয় রাজাকে।

ক্ষোভে দুঃখে বেদনায় অভিমানে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে বার বার, অভিমানই সর্বাধিক প্রবল, তবু শেষ পর্যন্ত খুলে বলতেই হয় কারণটা।

'এ সিংহাসনের তুমিই উত্তরাধিকারী, আমার একমাত্র সন্তান। তুমি অথবা তোমার পুত্রকন্যা, সম্রাট অনিরুদ্ধদেবের বংশধরই এ দেশ এ রাজ্য শাসন করবে—আমরা সকলেই তাই আশা করি। এ সিংহাসনে কোন বিদেশী বিধর্মী পশ্চিমা এসে বসলে আমার সেনাসামন্ত বা প্রজারা—কেউ সহ্য করবে না। তুমি চলে গেলেই বা এ রাজ্যের কি অবস্থা হবে? তোমাকে বিশ্বাস ক'রে, তোমার ওপর ভরসা রেখে রাজনীতি রাজকার্য শিখিয়েছি। রাজ্যের বিশেষ রাজনীতি—সব দেশেরই কিছু কিছু নিজস্ব সমস্যা, নিজস্ব নীতি থাকে, নিজস্ব বিপদ-সম্ভাবনাও,—সে তোমার সব নখদর্পণে। তুমি একা—কোন মন্ত্রী বা সামন্তর সাহায্য ব্যতিরেকেই—এ বিপুল রাজ্য যাতে শাসন করতে পারো—এইভাবেই প্রস্তুত করেছি তোমাকে। এখন তুমি চলে গেলে আমার প্রতি, তোমার দেশ ও জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে।...তা হয় না। তোমাকে এদেশীয় কাউকে—সৎপাত্র দেখে অবশ্যই—বিবাহ করতে হবে।'

এই বলে আর বাদানুবাদের অবসর না দিয়েই রাজা উঠে দাঁড়ান।

কিন্তু তিনি পেছন ফেরার আগেই তাঁর প্রিয়তমা কন্যা আর একটি মর্মান্তিক প্রশ্ন করেন, 'আমি মরে গেলে কি এ রাজ্য অচল হবে বাবা, না এ সিংহাসনে বসার মতো কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না?'

প্রথমবারের আকস্মিকতা কেটে গেছে। আঘাত যত গুরুতর, যত চিত্ত-ভেদীই হোক, বিস্ময় কি বেদনা প্রকাশ পায় না আর। শুধু বলেন, 'কাল্পনিক অবস্থার কথা চিন্তা ক'রে বাস্তবকে অস্বীকার করা যায় না রাজপুত্রী। রাজার ঘরে জন্মগ্রহণ করার কতকগুলো বিশেষ দায়িত্ব আছে—তা বোঝার মতো শিক্ষাও তোমাকে দিয়েছি। এ ধরনের অবান্তর প্রশ্ন আমাকে করার আগে নিজেকেই জিজ্ঞাসা করতে পারতে।'

আর এক মুহূর্তও দাঁড়ান না ত্রিভুবনাদিত্য, বজ্রগর্ভ মেঘের মতো অন্ধকার মুখ ক'রে বেরিয়ে যান।

তবু আঘাত যতই পান, মহারাজ-চক্রবর্তী ত্রিভুবনাদিত্য তাঁর নিজের দিকটাই চিন্তা করেছিলেন। ভেবেছিলেন এ ক্ষেত্রে তিনিই আহত পক্ষ, তাঁরই অভিমান বোধ করার কথা। অতঃপর কন্যাই এসে ক্ষমা-প্রার্থনা করবে, দোষ

স্বীকার করবে—এইটেই আশা করেছিলেন তিনি।

কিন্তু রাত্রে সংবাদ এল অন্যরকম। কন্যাই নাকি অন্নজল ত্যাগ করেছে। কারও সঙ্গে কথাও কইছে না—এ অদ্ভুত আচরণের কোন কারণও জানাচ্ছে না, কঠিন মুখে চুপ ক'রে বসে আছে শুধু।

সংবাদ আনলেন রাজমহিষী, সেবন্তীর জননী।

তাঁরই জ্বালা সর্বাধিক। মধ্যাহ্নভোজনের সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন না, পরিচারিকাদের মুখে সংবাদ পেয়েছিলেন—পিতাপুত্রীতে কথা-কাটাকাটি হওয়ায় রাজা অর্ধভুক্ত আহার্য ফেলে উঠে গেছেন, কন্যাও তাই।

সেকথা শুনে কন্যাকে তিরস্কার করতে এসে দেখেছেন তারও মুখ অন্ধকার, সেখানেও বজ্রবিদ্যুতের আভাস। সেবন্তীর এই দৃঢ়সম্বদ্ধ ওষ্ঠের রেখা তিনি ভালই চেনেন, অতিশয় কঠিন সঙ্কল্পের দ্যোতক। তখন আর কোন কথা বলেন নি, দুজনকেই শান্ত হবার অবকাশ দিয়ে গেছেন। ভেবেছেন আর খানিকটা সময় গেলে ব্যাপারটা কি ঘটল—মেয়েকেই জিজ্ঞাসা করবেন।

কিন্তু এখন যে সংবাদ পেলেন—তারপর আর চুপ ক'রে থাকা চলে না। মেয়ে সেই দ্বিপ্রহরে যে খেতে খেতে খাওয়া অর্ধসমাপ্ত রেখে উঠে গেছে—তারপর থেকে এখনও পর্যন্ত মুখে একটু জল পর্যন্ত দেয়নি। রাত্রেও কিছু খাবে না। কোন প্রকার শরবৎ, আরক, কি ফলের রস, মিষ্টান্ন—কিছুই মুখে তুলতে রাজী হয় নি। দাসী-সহচরীরা বার বার নিয়ে গেছে এবং ফিরে এসেছে।...

স্বামীর কাছে এই সমস্ত সমাচার নিবেদন ক'রে মহিষী সক্ষোভে বললেন, 'আমারই হয়েছে যত জ্বালা! আমাকে কেউ কোন কথা বলেও না, মানুষের মধ্যেই গণ্য করে না—তার বলবে কি? আমার থেকে দাসী-চাকরদের সঙ্গে বোধ হয় তোমরা বেশী কথা বলো, তারা তোমাদের বেশী খবর রাখে—অথচ তাল সামলাতে হয় শেষ পর্যন্ত দেখি আমাকেই।...নাও, কী করবে এখন করো! তোমাদের কী ব্যাপার, কিসের মন-কষাকষি তা তো জানি না, উপযাচক হয়ে আর কি করব বলো!...মনের মতো মেয়ে তোমার, নিজের মতো ক'রে তৈরী করেছ—তোমার অন্য কোন গুণ না পাক, তেজ রাগ জেদ—এগুলি পেয়েছে ষোল আনার ওপর আঠারো আনা। একবগ্‌গা ঘোড়ার মতো ঘাড় বেঁকিয়ে বসে আছে, ও ঘাড় সোজা করা আমার কর্ম নয়! যা করবার তুমিই করো গে যাও!'

রাজা ভ্রূকুটি ক'রে উত্তর দিলেন, 'তুমিই বা অকারণে এত উতলা হচ্ছ কেন? অল্পবয়সী মেয়ে—একদিন-দুদিন না খেলে মরে যায় না। থাক না, খেতে ইচ্ছে না হয় অত পীড়াপীড়িরই বা আছে কি? আমিও তো তার পর থেকে কিছু খাই নি!'

মহিষী একটা হতাশার ভঙ্গী ক'রে চলে গেলেন।

যেমন বাপ তেমনি বেটি, এদের মনের তল কোনদিন পেলেন না তিনি।...

ত্রিভুবনাদিত্য সত্যিই সেদিন এ ব্যাপারে কিছু করলেন না। রাত্রে নিজের ঘরে বসে কিছু আহারও করলেন—জানতেন যে সে সংবাদ কন্যার কাছেও পৌঁছবে। পরের দিন যথানিয়মে অমাত্যদের সঙ্গে কাজকর্ম নিয়েও বসলেন, যদিচ কাজ বেশী হয়ে উঠল না, অধিকাংশই পরের কোন একটা সময়ের জন্যে সরিয়ে রেখে মাথা-ধরার অছিলায় তাড়াতাড়ি অন্তঃপুরে চলে এলেন।

কিন্তু ভিতরে এসে স্নান-পূজা শেষ ক'রে উঠে যে সংবাদ পেলেন, তারপর আর চুপ ক'রে থাকা সম্ভব নয়।

শুনলেন রাজকন্যা সেদিন সকালেও কিছু আহার করেন নি এবং করবেনও না, বলে দিয়েছেন। উষাকালেই স্নান সেরে নিজের ঘরে ভগবান অমিতাভর মূর্তির সামনে বসে আছেন চুপ ক'রে অর্ধ-ধ্যানস্থ অবস্থায়। সেখানে সে অবস্থায় কেউ গিয়ে আহারের জন্য পীড়াপীড়ি করতে সাহসও করছে না।

মেয়েকে ডেকে পাঠালেন না, রাজা নিজেই সে-ঘরে গেলেন।

সেবন্তী বোধ হয় এই রকমই আশা করে ছিলেন, তিনি খুব একটা বিস্মিত হলেন না, সহজভাবে উঠে দাঁড়িয়ে পিতা এবং রাজাকে যথাবিহিত অভিবাদন জানালেন।

ত্রিভুবনাদিত্যও কোন প্রকার বৃথা বাক্যব্যয় না ক'রে একেবারেই কাজের কথা পাড়লেন, 'তুমি নাকি কাল থেকে অনাহারে আছ? আজও নাকি খাবে না বলেছ?'

সেবন্তী নিরুত্তরে দাঁড়িয়ে রইলেন।

'এর অর্থ?' পুনশ্চ প্রশ্ন করলেন মহারাজ-চক্রবর্তী।

এবার উত্তর দিলেন সেবন্তী, ধীর কণ্ঠে বললেন, 'শুনেছি প্রব্রজ্যা গ্রহণের আগে তিনদিন উপবাসী থেকে চিত্তশুদ্ধি করাই বিধি।'

'ও, তুমি বুঝি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবে?...তার আরও একটি বিধি আছে তা বুঝি তোমাকে বলে নি কেউ?' স্পষ্ট রোষ এবং ব্যঙ্গ রাজার কণ্ঠে, 'মেয়েদের ভিক্ষুণী জীবন গ্রহণের পূর্বে তার পিতামাতা—তাঁরা মৃত হ'লে অন্য অভিভাবকদের সম্মতি নিতে হয়—এ রাজ্যে এ রকমই নিয়ম।'

'চিত্তশুদ্ধির কাল শেষ হ'লে অবশ্যই সে অনুমতি প্রার্থনা করব।'

'পাবে আশা ক'রো?'

'না পেলে উপবাস ক'রেই থাকব, তাতে তো কোন বাধা নেই!'

সেবন্তীর কণ্ঠস্বরে দৃঢ় সংকল্প।

এবার বুঝি ত্রিভুবনাদিত্যের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। তিনি রূঢ় এবং রুষ্ট কণ্ঠে বলেন, 'কিন্তু কেন? এর অর্থ কি আমি জানতে চাই। আমি তোমার জন্যে অনেক করেছি, সাধারণ পিতৃ-কর্তব্যের অনেক বেশী করেছি। আশা করছি—এটুকু কৃতজ্ঞতা আমি দাবী করতে পারি যে—তোমার দুর্বোধ্য আচরণের কারণটা আমাকে বলবে।...তোমার এই দুর্বিনীত ব্যবহার প্রাসাদসুদ্ধ দাসী-চাকরদের আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে এতক্ষণে—এটা তোমার বোঝা

উচিত। আমি তোমার কাছে সরল সত্য উত্তর শোনবার জন্য অপেক্ষা করছি।'

'আপনার কাছে মিথ্যা বলার পাপ থেকে ভগবান শাক্যমুনি যেন আমায় রক্ষা করেন পিতা। আমি সরল সত্য উত্তরই দিচ্ছি, কাল পট্টিকেরা থেকে যে বিবাহের প্রস্তাব এসেছে সে প্রস্তাব যদি প্রত্যাখ্যাত হয়—আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করব, এই আমার সংকল্প। অন্য বিবাহে আমার রুচি নেই।' শান্ত কণ্ঠে উত্তর দেন সেবন্তী।

জীবনে অনেকবার অনেক রকম বিস্ময় বোধ করেছেন রাজা ত্রিভুবনাদিত্য, কিন্তু আজ যে বিস্ময়ের আঘাত পেলেন তার বুঝি তুলনা নেই। এই-ই প্রথম —তিনি নির্বাকও হয়ে গেলেন। বিহ্বল শূন্য দৃষ্টিতে মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। একটিও কথা বলতে পারলেন না। বলার মতো কোন বাক্য খুঁজে পেলেন না বুঝি। অনেক, অনেকক্ষণ পরে—রাজার নিজেরই মনে হ'ল এক যুগ, ত্রিভুবনাদিত্যের আড়ষ্ট অবশ কণ্ঠে স্বর-স্ফূর্তি হ'ল, আবারও বিমূঢ়ের মতো প্রশ্ন করলেন, 'তার মানে?'

প্রশ্ন করতে করতেই যেন সত্যটা অনুমানের আকারে অস্পষ্ট ঝাপ্সা ভাবে দেখা দেয় মনের মধ্যে।

তিনি পুনশ্চ প্রশ্ন করেন, 'এ প্রস্তাব যে আসবে তুমি জানতে? এ তোমার জ্ঞাতসারে হয়েছে?'

অবাধ্য ঘাড়-বাঁকা ঘোড়ার মাথা এবার নত হয়, নত মুখেই ঘাড় নাড়েন রাজকন্যা। জানতেন তিনি।

আজ কি বিস্ময়ের শেষ হবে না? হে ভগবান!

'সে কি! তুমি পট্টিকেরার কথা কার মুখে শুনলে? কে তোমার সঙ্গে এ ব্যাপারে যোগাযোগ করল?...এত কাণ্ড হয়ে গেল আর আমি কিছুই জানি না, আশ্চর্য তো!...না আমি বড্ডই বুড়ো হয়ে গিয়েছি, অথবা এ রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থাতেই ঘুণ ধরেছে কোথাও!'

আরো কিছুক্ষণ মূঢ়ের মতো চেয়ে থাকেন মহারাজ-চক্রবর্তী তাঁর এই তরুণী কন্যার দিকে। সত্যি সত্যিই ওর কাছে আজ নিজেকে বড় অজ্ঞ আর নির্বোধ মনে হয়।

সেইভাবে চেয়ে থাকতে থাকতেই আরও একটা কুটিল সংশয় দেখা দেয় তাঁর মনে। তীক্ষ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করেন, 'এই দেশের রাজাকে তুমি দেখেছ?'

নত মাথা নততর হয়।

আবারও ঘাড় নাড়েন সেবন্তী, দেখেছেন তিনি।

'দেখেছ? দেখেছ তাঁকে তুমি?...সে এদেশে এসেছিল?...কোথায় দেখলে তাঁকে? কে দেখাল?'

'আনন্দ মন্দিরে।' অস্ফুট উত্তর দেন সেবন্তী।

এবার আর ঔদ্ধত্য নেই তাঁর ভঙ্গীতে।

'এদেশে এসেছিল, আনন্দ মন্দিরে গিয়েছিল,—তুমি তাঁকে দেখেছ,

পট্টিকেরার রাজা বলে পরিচয় পেয়েছ, কে জানে আলাপ হয়েছে কিনা—আমি কিছুই জানতে পারলাম না!··· এক বিদেশী স্বাধীন রাজা এলেন, রাজকন্যা সে সংবাদ পেলেন—অথচ দেশের রাজা কোন খবরই রাখেন না! বাঃ, অতি উত্তম শাসনব্যবস্থা!···আমার মহাসন্ধি-বিগ্রহিকের বেতন বৃদ্ধি করতে হবে। সেই সঙ্গে কিছু নগদ পুরস্কারও দেওয়া উচিত।...বিশেষ যোগ্য ব্যক্তি সন্দেহ নেই!'

এবার আস্তে আস্তে মুখ তোলেন সেবন্তী, 'পট্টিকেরাধিপতি গোপনে ছদ্মবেশে এখানে এসেছিলেন—সন্ন্যাসীর বেশে। সন্ন্যাসীর তো এদেশে আসায় কোন বাধা নেই, সেই জন্যেই অমাত্যরা খবর রাখেন নি। তিনি নাকি আমার কথা শুনে আমাকে দেখতেই এসেছিলেন ঐভাবে। তিনদিন উপবাসী থেকে আনন্দ মন্দিরে অপেক্ষা করেছিলেন—'

'এত কাণ্ড হয়ে গেছে এর ভেতর? তা তুমি এত কথা জানলে কি ক'রে কন্যা? ছদ্মবেশেই যদি ছিল—তাকে চিনলে কি ক'রে? তোমাদের—তোমাদের তা'হলে বেশ ভালরকম পরিচয় এবং আলাপ হয়ে গেছে বলো!'

সেবন্তীর মুখ আরও নত হয়। তবু মিথ্যা বলার অভ্যাস নেই বলেই স্বীকৃতি-সূচক ঘাড় নাড়েন।

'বাঃ, চমৎকার! এই না হলে আমার কন্যা! এই জন্যেই তো পুত্রবৎ তোমাকে মানুষ করেছি—রাজা হওয়ার যা প্রথম পাঠ, রাজমর্যাদাজ্ঞান—পাখী পড়ানোর মতো ক'রে শিখিয়েছি!···আমারই ভুল, প্রদীপের নিচে অন্ধকার থাকবে তাই তো স্বাভাবিক। তোমার আচরণেই তো আমার সর্বাধিক অমর্যাদা হওয়া উচিত।'

ব্যঙ্গ-তিক্ত-কণ্ঠে কথাগুলো বলে তিক্ততর হাসি হাসেন ত্রিভুবনাদিত্য। পুনশ্চ প্রশ্ন করেন, 'তা এ নাটকটি অভিনীত হ'ল কোথায়? এই প্রাসাদেই নাকি? বলো বলো, আমি তাতেও বিস্মিত হব না। পরিচয়টা কোথায় হ'ল, এত ঘনিষ্ঠভাবে যে, তুমি তার প্রতি এতখানি প্রণয়াসক্ত হলে? হবার অবসর পেলে?'

'ঐ আনন্দ মন্দিরেই পরিচয় ঘটেছিল পিতা।' একটু থেমে যেন থতিয়ে থতিয়ে বলেন সেবন্তী।

'সেখানে ক'দিন তোমাদের দেখা হয়েছিল?'

'দু-দিন।'

মিথ্যা বলা হ'ল না। তেমনি সম্পূর্ণ সত্যও বলতে পারলেন না সেবন্তী। নিজের জন্য নয়, বেথালী আর তার ভাইকে রাজরোষে ফেলার কোন অধিকার তাঁর নেই।

অভিমানে, অপমানে, দুঃসহ ক্রোধে আবারও নির্বাক হয়ে যান মহারাজ-চক্রবর্তী। নিষ্ফল রোষে অধীরভাবে পায়চারি করতে থাকেন। কি করবেন, কি করলে এর শোধ উঠবে—কেমনভাবে কাকে একটা কঠোর শাস্তি দিলে এই দিক্‌দাহকারী জ্বালার কথঞ্চিৎ প্রশমন হয়—কিছুই স্থির করতে পারেন না।

তেমনি অস্থিরভাবে পদচারণা করতে করতে হঠাৎ থমকে থেমে গিয়ে একটা অসংলগ্ন, স্ত্রীজনোচিত প্রশ্ন ক'রে বসেন, 'সে কি খুব সুন্দর দেখতে? এই পাট্টিকেরার ধূর্ত রাজাটা?'

'হ্যাঁ বাবা', অতিকষ্টে লজ্জা জয় ক'রে মুখ তোলেন সেবন্তী, 'খুবই সুন্দর দেখতে। অত সুন্দর পুরুষ আমি আর কখনও দেখি নি। কিন্তু অনর্থক তাঁকে গালি দিচ্ছেন, ছদ্মবেশে এসেছিলেন ঠিকই, কিন্তু সেটুকু দুর্বলতা বাদ দিলে—স্বীকার করতেই হয়—তিনি কোন হীন কাজ করেন নি। ধূর্ততার আশ্রয় নিলে, কোন দুরভিসন্ধি থাকলে তিনি আমাকে অপহরণ ক'রেই নিয়ে যেতে পারতেন। তিনি বললে আমি অস্বীকার কি আত্মরক্ষা করতে পারতাম না।'

বোধহয় এইটুকু শোনাই বাকি ছিল।

দুর্জয় ক্রোধে ত্রিভুবনাদিত্যের দুই চক্ষু রক্তবর্ণ ধারণ করল, দুপাশের রগের শিরাগুলো দড়ির মতো ফুলে উঠল।

তাঁর মুখ দেখে মনে হ'ল অত আদরিণী কন্যাকে তিনি সেই মুহূর্তে আঘাত ক'রেই বসবেন!

কঠিন নির্মম কোন দৈহিক আঘাত!

অতিকষ্টে আত্মসম্বরণ ক'রে স্খলিতপদে অন্ধের মতো হাতড়াতে হাতড়াতে সেখান থেকে বেরিয়ে নিজের শয়নগৃহে চলে গেলেন। আর একটি কথাও বলতে সাহস করলেন না। নিজের ওপর কর্তৃত্ব হারিয়েছেন তিনি—আর কোন আস্থা নেই নিজের মর্যাদাজ্ঞানের, নিজের পদবী সম্বন্ধে সচেতনতার ওপর।

সেবন্তী তাঁর অবস্থা অনুমান করতে পারলেন বৈকি।

তিনি একটু সন্ত্রস্তভাবেই রাজার পিছু পিছু গেলেন। তাঁর আশঙ্কা হতে লাগল যে, রাজা শয্যায় পৌঁছবার পূর্বেই না মূর্ছিত হয়ে পড়ে যান কোথাও। ত্রিভুবনাদিত্য নিরাপদে তাঁর বিশ্রামগৃহে প্রবেশ করলেন দেখে আবার নিজের ঘরে ফিরে এসে ভগবান তথাগতের মূর্তির সামনে লুটিয়ে পড়লেন।

'এ কী দোটানায় আমাকে ফেললে ভগবান? এখন আমি কী করব. আমাকে বলে দাও—আমাকে বলে দাও?'

॥ সাত ॥

আবারও বিশেষ মন্ত্রণা-পরিষদ ডাকা হ'ল।

রাজসভার পিছনদিকের গোপন কক্ষে অমাত্যরা সমবেত হলেন সকলে।

বহুকাল এ কক্ষে কোন অমাত্য-সভা আহ্বান করা হয় নি। তিনটি শূন্য গৃহ পেরিয়ে এ ঘরে আসতে হয়। অমাত্যরা সকলে উপস্থিত হ'লে সেই তিনটি ঘরের দরজায় নিজ হাতে তালা বন্ধ করেন মহামন্ত্রী—অর্থাৎ কোন-

ক্রমেই না কোথাও থেকে এ সভার আলোচনা শোনা যায়। খুব জরুরী এবং গোপনীয় মন্ত্রণা না থাকলে এ ঘরে অমাত্যদের ডাক পড়ে না।

এই ঘরে সভার আয়োজন এবং রাজার অন্ধকার কঠিন মুখ দেখেই অমাত্যরা অনুমান করেছিলেন যে, বিশেষ কোন সংকট অবস্থা দেখা দিয়েছে কোথাও।

তাঁরা প্রথমে রাজ্যেরই বিপদাশংকা করেছিলেন। ভেবেছিলেন কোথাও কোন বিদ্রোহ দেখা দিয়ে থাকবে। অথবা কোন বিদেশী রাষ্ট্রের আক্রমণ আসন্ন। তাঁরা চীনের কথাই ভেবেছিলেন—রাজদূত প্রেরণের ব্যাপারে ত্রিভুবনাদিত্যর জিদে হয়ত তাঁরা অসন্তুষ্ট হয়েছেন।

এখন অরিমর্দনপুরাধিপতির মুখে এই সভা আহ্বানের উদ্দেশ্য শুনে তাঁরাও নির্বাক হয়ে গেলেন কিছুকালের জন্য।

স্তম্ভিত অবস্থা সকলকার। কিছু গুছিয়ে চিন্তা করা তো দূরের কথা—ক্ষোভ প্রকাশেরও যেন শক্তি নেই।

রাজা আনুপূর্বিক সব কথাই জানালেন তাঁদের। রণমল্লদেবের সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে আগমন; আনন্দ মন্দিরে ধর্ণা দেওয়া; সেখানে রাজকুমারীর সঙ্গে দুদিন সাক্ষাৎ—সব। বলার সময় শুধু একবার পররাষ্ট্র-বিষয়ক অমাত্যর দিকে তাকিয়ে একটু কঠিন ব্যঙ্গের হাসি হেসেছিলেন এইমাত্র—নতুবা অন্য কোন মতামত দেন নি।

বিপুল বিস্ময়ের প্রথম জড়তা কেটে যাওয়া মাত্র অমাত্যরা সরবে এক-যোগে প্রতিবাদ ক'রে উঠলেন। ক্ষোভে ও উষ্মায় ফেটে পড়লেন যেন।

'ব্যাটার কি স্পর্ধা! কী দুঃসাহস শয়তানটার!' 'সাক্ষাৎ মার—লোকটা! রাজপুত্রীকে ভোলাতে এসেছিল!' 'কী সাংঘাতিক ধূর্ত দ্যাখো! কী সাংঘাতিক চাল চেলেছে!' ইত্যাদি—

নিদারুণ মানসিক বিকলতায় রাজ্য-মন্ত্রণাসভায় মর্যাদার কথাও কারো মনে রইল না। নিতান্ত প্রাকৃত জন—পথের লোকের ভাষাই মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল সকলের।

এবং তারপর রাজা ইঙ্গিতে তাঁদের শান্ত হ'তে নির্দেশ দিলে, সকলে প্রায় একযোগেই জানালেন, 'এ হয় না, হ'তে পারে না। আমাদের সিংহাসনে কোন বিদেশীকে বসতে দেব না। আমাদের রাজকন্যাকে, এ সিংহাসনের উত্তরা-ধিকারিণীকে কোন বিদেশী নিয়ে যাবে—তাও সহ্য করব না।'

রাজা ত্রিভুবনাদিত্য উঠে দাঁড়ালেন।

এরা এখনও বোধকরি অবস্থার গুরুত্বটা বুঝতে পারছে না। ঘটনা কতদূর এগিয়ে গেছে—তাও না। তিনি যেন ঈষৎ বিরক্তই হলেন, এদের নির্বুদ্ধিতা ঠিক হয়ত নয়—বুদ্ধি ও চিন্তা-শক্তির মন্থরতায়। বললেন, 'আমি সব অবস্থা বুঝিয়ে দিয়েছি, এবার আপনারা কি করবেন স্থির করুন। আমার কন্যা—আমার পক্ষে কোন কঠোর সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন, আমি স্বভাবতই দুর্বল হয়ে পড়ব। সে দুদিন খায় নি—এটাই আমার পক্ষে বড়

বেদনাদায়ক, অস্বস্তিকর অবস্থা।...তাই বলে আপনাদের ওপর কোন বন্ধন বা নিষেধ রাখতে চাই না। আপনারা যা ভাল বুঝবেন তাই করবেন, আমি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে গেলাম।'

তারপর প্রস্থানোদ্যত হ'তে গিয়েও আর একটু থেমে বললেন, 'তবে একটা কথা আপনাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া কর্তব্য বলে মনে করি—আমার মেয়ে আমারই মেয়ে, তাকে ভয় দেখিয়ে কিছু সুবিধা আদায় করতে পারবেন না। সিংহাসনের লোভ তার নেই, প্রাণেরও ভয় করে না, বস্তুত সে মরতেই প্রস্তুত। এই বুঝে আপনাদের কর্তব্য স্থির করাই ভাল।'

মহারাজ-চক্রবর্তী অতঃপর সে মন্ত্রণাসভা থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন।

তাঁর ইঙ্গিতে মহামন্ত্রী উঠে তিন দফা দরজা তুলে দিলেন এবং তিনি বেরিয়ে যাওয়ার পর আবারও একে একে বন্ধ ক'রে নিজের আসনে ফিরে এসে বসলেন।

কিন্তু কেউই কোন কথা কইতে পারেন নি তখনও পর্যন্ত। পারলেনও না। রাজ্যের প্রধান আটজন অমাত্য নিশ্চল হয়ে বসে রইলেন। মাথার ওপর দায়িত্ব নেবার ও আদেশ দেবার লোক থাকলে কাজ করা বা মতামত দেওয়া অনেক সহজ—এ সত্যটা আজ বোধ করি প্রথম অনুভব করলেন তাঁরা। স্বাধীনভাবে কোন গুরুতর সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা অনেক, অনেক কঠিন।

অথচ এ এমনই সমস্যা, এ আলোচনা স্থগিত রাখার কি ত্যাগ করার উপায় নেই। যা করতে হবে এখনই করতে হবে। এবং কিছু একটা করতে হবেই। নইলে শুধু যে তাঁরাই রাজার কাছে অপদস্থ হবেন, অকর্মণ্য বলে প্রমাণিত হবেন তাই নয়—রাজ্যব্যাপী সংকটের কারণ ঘটবে। আর সে সংকটের জন্য সমগ্রভাবে দেশবাসীর কাছে, ইতিহাসের কাছে তাঁরা দায়ী সাব্যস্ত হবেন।

সেই বুঝেই তাঁদের এ আলোচনা শুরু করতে হবে। সফল না হলে কি হবে সে অবস্থা তাঁদের চিন্তা করারও সাহস নেই। সেই জন্যই আরও বিমূঢ়তা ও স্তব্ধতা।

সেবন্তীকে প্রস্তুত হবার বা কোন উত্তর ভেবে রাখবার সময় দেন নি ওঁরা।

রাজকন্যা জানতেনও না, তাঁর পিতা অতঃপর কোন্ পথ নেবেন।

তিনি যে এ ব্যাপারের সম্পূর্ণ দায়িত্ব অপরের ওপর ছেড়ে দিতে পারেন—তা কল্পনাও করেন নি সেবন্তী। আক্রমণ কিছু এলে তাঁর কাছ থেকেই আসবে, অথবা মা আসবেন কান্নাকাটি করতে—এইটেই ভেবে রেখেছিলেন।

অকস্মাৎ সেই দ্বিপ্রহর বেলায় ঘরের বাইরে অনেকগুলি লোকের, বিশেষ পুরুষের—পুরুষের পদক্ষেপ শুনলেই বোঝা যায়—পদশব্দ পেয়ে উপবাস-ক্লিষ্টা সেবন্তী শয্যায় ভাল ক'রে উঠে বসবার আগেই দাসী বেণুলী এসে সংবাদ দিল—রাজ্যের মহামাননীয় মন্ত্রীরা সকলে একযোগে তাঁর দর্শনার্থী

হয়ে এসেছেন, দ্বারের বাইরে অপেক্ষা করছেন তাঁরা।

তখন আর সসম্মান আমন্ত্রণ জানানো ছাড়া উপায় কি?

বরং সেবন্তীকেই তাড়াতাড়ি উঠে বেথালীর সঙ্গে হাত লাগিয়ে আসন পাতার ব্যবস্থা করতে হ'ল।

সকলে আসন গ্রহণ করলে সেবন্তীও তাঁদের সামনে আর একটি আসনে নতমুখে বসলেন।

বৃদ্ধ অভিজ্ঞ মহামন্ত্রী কিন্তু রীতি-অনুযায়ী কুশল প্রশ্ন, আশীর্বাদ ইত্যাদিতে বৃথা কালক্ষেপ করলেন না। তিনি জানেন যে, এ মেয়েকে সময় দেওয়া মানেই আত্মরক্ষার বর্ম এগিয়ে দেওয়া। একেবারেই তাই কাজের কথা পাড়লেন তিনি, 'মা, আমরা এই রাজ্যের আটজন অমাত্য, তোমার আটটি বৃদ্ধ সন্তান তোমার কাছে একটি ভিক্ষা চাইতে এসেছি।'

এই বলে কয়েক লহমা মাত্র সময় নিয়ে নাটকীয়ভাবে বললেন, 'আমাদের প্রাণভিক্ষা।'

চমকে উঠলেন সেবন্তী।

'ভিক্ষা' শব্দটা উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ওষ্ঠ দৃঢ়সম্বদ্ধ হয়ে উঠেছিল, কঠিন বাক্‌যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন তিনি—কিন্তু শেষের কথাটাতেই একেবারে হতচকিত হয়ে উঠলেন, বিস্মিত বিহ্বলভাবে মুখ তুলে চাইলেন মহামন্ত্রীর দিকে।

মহামন্ত্রী তেমনি ধীর গম্ভীর ভাবেই বললেন, 'মা, তোমার অভিলাষ আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা আমরা শুনেছি—তোমার পূজনীয় পিতৃদেব, আমাদের সকলের পিতৃস্বরূপ, মহারাজ-চক্রবর্তীর কাছ থেকে তুমি যাঁকে পছন্দ করেছ, যাঁকে পতিত্বে বরণ করতে কৃতসংকল্প, যাঁর জন্য এই বিপুল রাজ্যের দাবিও ছেড়ে দিতে প্রস্তুত—তিনি সর্বাংশেই তোমার যোগ্য, এ আমরা বিশ্বাস করি। তোমার বুদ্ধি, তোমার শিক্ষাদীক্ষা, সংস্কৃতি সম্বন্ধে আমাদের এটুকু আস্থা আছে। কিন্তু মা, অনেক সময় কর্তব্যের অনুরোধে অনেক প্রেয়, এমন কি শ্রেয় বস্তুকেও ত্যাগ করতে হয়, জেনে-শুনে নিজের ক্ষতি করতে হয়। এই পৃথিবীর—এ সংসারের এই-ই নিয়ম। তুমি এখানকার রাজকন্যা। এ রাজ্যের প্রতি—এ দেশ ও জাতির প্রতি তোমার কিছু দায়িত্ব আছে, কিছু ঋণ আছে এখানে। এখানকার রাজার তুমিই একমাত্র সন্তান। তোমার সিংহাসনে লোভ নেই আমরা তা জানি। কিন্তু তুমি চলে গেলে—তোমার পূজনীয় পিতৃদেব যতদিন জীবিত থাকবেন ততদিন কোন বিপদ ঘটবে না, কিন্তু তারপর—এই উত্তরাধিকারী নিয়েই দেশে নিদারুণ অরাজকতা দেখা দেবে। বহু লুব্ধ দাবিদার ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রের মতো ঝাঁপিয়ে এসে পড়বে, কেউই বিন্দুমাত্র স্বার্থত্যাগ করতে রাজী হবে না। ফলে গৃহ-যুদ্ধ অনিবার্য, আর তার ফলে তোমার পিতৃপিতামহের বহু যত্নে গড়া, বহু রক্তপাতে, বহু আত্মত্যাগে সমৃদ্ধ করা এই সাম্রাজ্য খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাবে। বহু প্রজাক্ষয় হবে। বহু মা সন্তানহারা হবেন, বহু স্ত্রীলোক বিধবা হবেন,

শিশুরা অনাথ হবে। দেশের জাতির সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

বলতে বলতে বলার পরিশ্রমে, অন্তরের আবেগে, বীভৎস পরিণামের কল্পনায় যেন কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে মহামন্ত্রীর, কয়েক নিমেষকাল থেমে একটু শক্তি সঞ্চয় ক'রে নিতে হয় তাঁকে। তবে সে কয়েক নিমেষই—রাজপুত্রীকে কোন অবসর বা অবকাশ কিছুই দিতে প্রস্তুত নন তিনি।

মহামন্ত্রী আবারও বলেন, 'তা ছাড়াও চারিদিকে বিদ্রোহীর দল সুযোগের অপেক্ষায় উন্মুখ হয়ে আছে। শুধুমাত্র তোমার পূজনীয় পিতৃদেবের অমিত শক্তিই তাদের নিরস্ত রেখেছে এতাবৎ। কেন্দ্রে সে-ই বা তত্তুল্য শক্তি না থাকলেই তারা মাথা তুলবে।·· তোমার জ্যেষ্ঠতাত রাজর্ষি বজ্রাভরণ কিছু কোমল ও দুর্বল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন,—তাঁর দয়ার্দ্র দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মোনরা এই বংশ কীভাবে উৎখাত করতে প্রয়াসী হয়েছিল তা তো তুমি জানই মা।'

এতখানি বলে, সম্ভবত আর একবার নিঃশ্বাস নেবার জন্যই একটু থামলেন মহামাত্য। তবে এবারও বেশীক্ষণ বিশ্রাম নিতে সাহস হ'ল না তাঁর। সেবন্তীকে বেশী চিন্তা করার সময় দেবেন না তিনি, এ তাঁর দৃঢ়প্রতিজ্ঞা। সেজন্য আবার তখনই বলতে শুরু করলেন, 'তাই মা, আমাদের সমবেত প্রার্থনা, যত কষ্ট, যত মর্মান্তিক দুঃখই হোক—তুমি আমাদের জননী, তোমার এই অগণিত লক্ষ লক্ষ সন্তানের মুখ চেয়ে এই আত্মত্যাগটুকু তুমি করো।·· তোমার যোগ্য বিবাহও আমরা ঠিক করেছি। তরুণ সেনানায়ক মলোৎথু বা মলয়শূর তোমাদের বংশেরই সন্তান, সম্রাট অনিরুদ্ধদেবের সম্পর্কে দৌহিত্র। তাছাড়াও—পিতার দিক থেকেও তাঁর এ সিংহাসনে কিঞ্চিৎ অধিকার আছে। এই শহরের মহান্ প্রতিষ্ঠাতা রাজা পিয়ংপিয়র বংশধর তিনি। তাঁর সঙ্গে তোমার বিবাহ হলে এ দেশ, এ রাজ্য ভয়াবহ অরাজকতা থেকে রক্ষা পাবে—জাতির মহতী বিনষ্টি নিবারিত হবে।'

মহামন্ত্রী তাঁর বক্তব্য শেষ ক'রে মৌন অবলম্বন করতে ঘরের মধ্যে একটা অখণ্ড নীরবতা নেমে এল। অমাত্যরা সকলেই যেন নিঃশ্বাস রোধ ক'রে চেয়ে আছেন রাজপুত্রীর দিকে। মহামন্ত্রীরও উদ্বেগের শেষ নেই। অনেকক্ষণ ধরে অনেক যত্নে এ বক্তৃতা ঠিক ক'রে এসেছেন তিনি—কিন্তু ত্রিভুবনাদিত্যের কন্যা কি এতেই কোমল হবেন?—এখনও তাঁর সংশয় ও শঙ্কার অবধি নেই।

অনেকক্ষণ পরে মাথা তুললেন সেবন্তী। না, কোন প্রতিবাদ, বিরোধিতা বা কোন উষ্ণ উত্তর নয়, সংক্ষেপে পাল্টা একটি অর্ধ-প্রশ্নই করলেন, 'আপনার বক্তব্য তো এখনও শেষ হয় নি মাননীয় মহামন্ত্রী।'

'শেষ হয় নি—?' বিস্ময় প্রকাশ করতে গিয়ে মধ্যপথেই থেমে যান মহামন্ত্রী, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মনে পড়ে যায় কথাটা। অপ্রতিভের হাসি হেসে বলেন, 'তুমি বুদ্ধিমতী, অসাধারণ বুদ্ধিমতী, তুমি ঠিকই ধরেছ মা। আমিই বুড়ো হয়ে পড়েছি, ভুলে যাই আজকাল অনেক কথা। এই কালই তো—মহা

রাজ-চক্রবর্তীর কাছে তিরস্কৃত হয়েছি, তিনিও আমার বার্ধক্যকেই দায়ী করলেন।···হ্যাঁ মা, আমাদের মূল ভিক্ষার কথাটাই বলা হয় নি। আমাদের প্রাণভিক্ষা বলতে সমগ্রভাবে তোমার প্রজ্ঞা-সাধারণের কথাও যেমন বলেছি, সেই সঙ্গে তোমার এই বিশেষ আটটি সন্তানেরও। মা, অপরাধ নিও না, এ তোমাকে ভয় দেখানোর জন্যে নয়—আমাদের সকলেরই বুকের রক্ত দিয়ে গড়া এ সাম্রাজ্য, এর সর্বনাশ আমরা উদাসীন দর্শক হিসাবে বসে দেখতে পারব না, তাই আমরা অতি দুঃখেই এখানে আসবার আগে ভগবান শাক্য-মুনির নামে প্রতিজ্ঞা ক'রে এসেছি, আমাদের অনুরোধ বা প্রার্থনা যদি প্রত্যাখ্যাত হয়—আমরা আনন্দ মন্দিরে বসে প্রায়োপবেশনে প্রাণ দেব।'

আবার সেই সর্বাত্মক নীরবতা।

ছুঁচ পড়ার শব্দ পাওয়া যায়—এ তো সাধারণ বর্ণনা, কোথাও একটা নিঃশ্বাসের শব্দ পর্যন্ত নেই।

এবারের নীরবতা দীর্ঘস্থায়ী, সেজন্য আরও অস্বস্তিকর।

এতে এঁদের আর করণীয় কিছু নেই, কোন বক্তব্য নেই।

যা বলবেন এবার—রাজকুমারী স্বয়ং।

তিনি নতমুখে স্থির হয়ে বসে। তাঁর অন্তরে যে কি প্রলয়ের ঝড় উঠেছে, তা তাঁর মুখ দেখে বোঝবার সাধ্য নেই কারও। তবে এ অমাত্য ক'জনই বয়স্ক, বহু অভিজ্ঞতা এঁদের—এঁরা অনুমান করতে পারছেন। সেজন্য কেউ কেউ নিজেদের অপরাধীও বোধ করতে লাগলেন মনে মনে। তাঁদের মনে হতে লাগল এক এক সময় যে, তাঁরা পরামর্শ ক'রে মতলব এঁটে, চারিদিকের সব দ্বার বন্ধ ক'রে খাঁচায় পুরে একটি বালিকাকে হত্যা করতে এসেছেন।···

অনেক—অনেকক্ষণ পরে মুখ তুললেন সেবন্তী।

চোখে মিনতি নেই। মর্মান্তিক দুঃখ কঠিন সংযমে বেঁধে রেখেছেন মনের মধ্যেই। শুধু সেই অতি-মানবিক প্রক্রিয়ায় চোখ দুটি রক্তবর্ণ হয়ে উঠেছে।

সেই আরক্ত চোখের দৃষ্টি মহামন্ত্রীর ঈষৎ লজ্জিত চোখের ওপর স্থির রেখে সেবন্তী বললেন, 'আমি আপনাদের আদেশ মেনে নিলাম।···তবে আমি ভাবছি আপনারা আমার সঙ্গে যাঁর বিবাহের ব্যবস্থা করেছেন, তাঁর কথা। আপনারা দুটি জীবনই নষ্ট করলেন হয়ত!'

আর কোন বাদানুবাদ, ধন্যবাদ, কি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন বা কোন কুশল প্রশ্নের অবকাশ দিলেন না সেবন্তী।

এঁরা এই উত্তরের আঘাত সম্যক সামলে নেবার আগেই তিনি উদ্দেশে সকলকে নমস্কার জানিয়ে নিজেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

রাজা ত্রিভুবনাদিত্য সংবাদটা শুনে বিস্ময় প্রকাশ করলেন, অমাত্যদের বুদ্ধিরও প্রশংসা করলেন।

এত সহজে কার্য উদ্ধার হবে তা তিনি আশা করেন নি!

অবশ্য এ সংবাদে তিনি খুব একটা সুখী হ'তে পারলেন না—এটাও ঠিক।

কারণ এঁরা কেউই তাঁদের কন্যাকে চেনেন না, এমন কি বোধহয় তার জননীও—তিনি যতটা চেনেন।

চির-আনন্দময়ী কন্যা তাঁর সম্ভবত চির-বিষাদিনী হয়ে গেল।

জীবন থেকে জীবনের মতোই আনন্দ চলে গেল হয়ত।

সেবন্তীর আবেগের তীব্রতা, ইচ্ছার প্রাবল্য, একমাত্র তিনিই বোঝেন, তিনিই পরিমাপ করতে পারেন। এ যে কতটা আঘাত লাগল ওর তা তিনি খুবই বুঝতে পারছেন।

অথচ উপায়ই বা কি? শুধু যদি নিজের আশাভঙ্গের প্রশ্ন হ'ত তো তিনি ত্যাগ স্বীকার করতে পারতেন। এখানে আরও অনেক, অনেক প্রশ্ন জড়িত। একটা সাম্রাজ্যের অগণিত প্রজার আশাআকাঙ্ক্ষার প্রশ্ন তো বটেই—তাঁর সমস্ত বংশের সম্মান-সম্ভ্রম আশা-ভবিষ্যৎ সর্বকিছু নির্ভর করছে এই বিবাহের ওপর। এখানে তিনি কন্যার হৃদয়ের প্রশ্ন বড় ক'রে দেখতে পারেন না।···

সুতরাং সুখী না হোন, নিশ্চিন্ত হলেন রাজা ত্রিভুবনাদিত্য।

বহিঃরাষ্ট্র-মন্ত্রীকে বললেন পাট্রিকেরাধিপতির পত্রের একটা সবিনয় উত্তর লিখে তাঁর দূতের হাতে অর্পণ করতে। লিখতে যে, এ প্রস্তাবে তাঁরা খুবই গৌরবান্বিত বোধ করছেন, এ প্রস্তাবের জন্য তাঁরা সকলেই সবিশেষ কৃতজ্ঞ। এ বিবাহ যে খুবই সুখের এবং অরিমর্দনপুরের কন্যার পক্ষে যৎপরোনাস্তি সৌভাগ্যের হ'ত তাতে সন্দেহ নেই; দুটি রাজ্যের এই মিলনে ভাবীকালের জন্য একটা মহান আদর্শও স্থাপিত হ'ত, প্রয়োজনে দুটি রাষ্ট্রই দুটি রাষ্ট্রের ওপর নির্ভর করতে পারত; কিন্তু দুঃখের বিষয়, রাজপুত্রী সেবন্তী দেবীর বিবাহ ইতিপূর্বেই অন্যত্র স্থির হয়ে গেছে, বাগ্‌দান সম্পূর্ণ, এক্ষেত্রে তাঁর অন্যত্র বিবাহ দেবার প্রশ্নই ওঠে না। আশা করি তাঁদের এ অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি সুগভীর দুঃখপ্রকাশে মার্জনীয় বোধ হবে, ইত্যাদি, ইত্যাদি—

মহামন্ত্রী বললেন, 'তারিখটাও ঐ সঙ্গে জানিয়ে দিলে হ'ত—মহামান্য মহারাজ-চক্রবর্তী!'

'তারিখ? দাঁড়ান, সে এখনও তো স্থিরই হয় নি!'

'দিন একটা আমরা মহাশ্রমণকে দিয়ে স্থির করিয়েই নিয়েছি।' সবিনয়ে কিন্তু একটু দৃঢ়কণ্ঠেই জানালেন মহামন্ত্রী, 'আজ থেকে ঠিক বাহান্ন দিন পরে ভাল একটি শুভদিন পাওয়া গেছে, যেন আমাদের মা-জননীর জন্যেই নির্দিষ্ট হয়ে আছে, সেই তারিখটিও দয়া ক'রে লিখে দেবার অনুমতি দিন।'

'বাহান্ন দিন!' চমকে উঠলেন রাজা, 'কিন্তু সে কি ক'রে হবে মহামন্ত্রী? আমার একমাত্র সন্তানের বিবাহ, সারা রাজ্যব্যাপী বিপুল উৎসব সমারোহ আশা ক'রে আছে সকলে—এত দ্রুত কি সে রকম আয়োজন সম্ভব হবে?'

'আমার ধৃষ্টতার অপরাধ নেবেন না মহারাজ-চক্রবর্তী, ঐ ওদেরই দেশ ভারতবর্ষে প্রচলিত দুটি সংস্কৃত বাক্য আছে—দুটি শ্লোকাংশ—"শুভস্য শীঘ্রম্" আর "শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি"! আমার এতখানি, এই একাশি বৎসর বয়স পর্যন্ত এর থেকে মূল্যবান বাক্য আর কিছু শুনি নি।···মহারাজাধিরাজ

আপনাকে আর কি বোঝাব, ব্যবহারিক বুদ্ধি আমার থেকে আপনার কিছু কম নয়—মেয়েদের মতি পরিবর্তিত হ'তে এক লহমার বেশী সময় লাগে না। কত কি হতে পারে, কত বাধা দেখা দিতে পারে তার কিছু ঠিকানা আছে!··· আপনিই বলেছেন আপনার কন্যা আপনার মতোই তেজস্বিনী, বুদ্ধিমতী, আর সে তো আমরা জানিই—ধরুন যদি এদেশ থেকে অন্তর্হিতাই হয়ে যান? আমাদের আটটি প্রাণের দায় নিতে হয় দেখে এখনকার মতো সময় নেবার জন্যই যে রাজী হন নি—তাই বা কে বলতে পারে?'

'না, আমার মেয়ে যদি কথা দিয়ে থাকে তো সে-কথা সে রাখবেই—এটুকু আমি জানি।'

ঈষৎ ভ্রূভঙ্গী ক'রেই উত্তর দেন ত্রিভুবনাদিত্য, কিন্তু কণ্ঠে যে খুব একটা চড়া সুর বাজে তা মনে হয় না।

এখানে যে সব অমাত্যরা আছেন, তাঁরা কেউই বয়সে তাঁর চেয়ে ছোট নন, কেউ কেউ তো তাঁর পিতার আমল থেকে পদাধিষ্ঠিত। বেশী বাহাদুরী করলে, এঁরা যদি এঁদের স্মৃতির পেটিকা খুলে বসেন—সেটা খুব রুচিকর হবে না তাঁর পক্ষে। মহামন্ত্রীর মুখ-চোখের ভাব দেখে মনে হচ্ছে ওঁর দিক থেকে আর কিছু বাগাড়ম্বর প্রকাশ পেলেই তিনি সেই পুরাতন প্রসঙ্গ উত্থাপন করবেন।

না, বেশী জল-ঘোলা করা ঠিক হবে না।

ওঁদের বংশের ধারাই এই।

মহান্ পিতা অনিরুদ্ধদেবও এ দোষমুক্ত ছিলেন না। ওঁর নিজের তো কথাই নেই। প্রেমই বলো আর কামনাই বলো—আবেগের ঢল নামলে আর রক্ষা নেই, সর্ববিধ্বংসী বন্যার আকার ধারণ করে দেখতে দেখতে, তখন আর কোন জ্ঞানই থাকে না। ওঁদের কামনার জোয়ার ভাদ্র মাসের অমাবস্যার মতো উত্তাল ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে, ষাঁড়াষাঁড়ির বানে পরিণত হয়।

এককালে তিনিও কোন কথা মনে রাখেন নি। ভালমন্দ, অগ্র-পশ্চাৎ, নিজের নিরাপত্তা—জীবনও তুচ্ছ হয়ে গেছে সে কামনাবেগের কাছে। যখন পিতার রক্ষিতার সঙ্গে প্রণয়ালিপ্ত হন, তখন তো একরকম মৃত্যুর সঙ্গেই পাঞ্জা লড়তে গিয়েছিলেন বলতে গেলে। সে যাত্রা যে জীবন রক্ষা পেয়েছিল সে নিতান্তই এই রাজসুখ ভাগ্যে ছিল বলে। তাঁর মহান্ পিতা তাঁকে পরোক্ষ ভাবে বধ করার কম চেষ্টা তো করেন নি!···তার ওপর, নির্বাসনকালে, রাজধানী ও রাজশক্তি থেকে বহুদূরে গিয়ে যখন গ্রামপ্রধানের কন্যা তাম্বুলার প্রণয়াসক্ত হয়ে তার কৌমার্য নষ্ট করেন—তখন, গ্রামসুদ্ধ লোক তাঁকে হত্যা করবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছে জেনেও তো সে মেয়েটির সঙ্গে মিলিত হবার ইচ্ছা দমন করতে পারেন নি। শতাধিক উত্তেজিত ব্যক্তি কুটিরের বাইরে অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে সমবেত হয়েছে, গৃহে অগ্নিসংযোগ করবে, না খুঁচিয়ে মারবে—এই আলোচনা চলছে জেনেও তিনি আলিঙ্গন শিথিল করেন নি, মেয়েটির ভয়ার্ত মিনতিতেও কর্ণপাত করেন নি।···

হায় রে! পিতৃশাসন তো এমনিই মানেন নি বিশেষ, তখন যদি তাম্বুলাকে বিবাহ করতেন—তাহলে আজ সেই ছেলেই অনায়াসে সিংহাসনে বসতে পারত—এমন ক'রে মেয়েটাকে কষ্ট দিতে হ'ত না। সে ছেলে আজও বেঁচে আছে, রাজকুমার বলে স্বীকৃতি পাবে না জেনেই বোধ হয় তার মা জোর ক'রে নাম রেখেছিল রাজকুমার—কিন্তু সেই সামান্য হিসেবের ভুলে রাজকুমারকে সত্যিই রাজকুমার করা গেল না। কোন দিনই সে রাজা হ'তে পারবে না এ রাজ্যের। কামজ জারজ সন্তান রূপেই পরিচিত হয়ে রইল চিরদিনের মতো। ..

যাক গে, আজ আর সে ভুলের জন্য অনুশোচনা ক'রে লাভ নেই। ঠিকই বলেছেন মহামন্ত্রী—"শুভস্য শীঘ্রম্!"

ত্রিভুবনাদিত্য বার বারই বলেছেন এঁদের—ওঁর মেয়ে ওঁর মতোই হয়েছে সব দিক দিয়ে। বলার সময় চরিত্রের দৃঢ়তার কথাই ভেবেছেন, এই দিকটা, কামনা ও আবেগের দিকটা, মনে পড়ে নি।...সব দিক দিয়ে ওঁর মতো হলেই তো বিপদ। মেয়েও কি আর জানে না—বাপের এই সব অসৎ-কীর্তির কথা!

সেই জন্যেই তো আরও সেবন্তীকে কোন রূঢ় কি কটু কথা বলতে পারলেন না, কোন শাসনের চেষ্টা করলেন না।

অপরাধী বিবেক বার বার ওঁর নিজের কথা স্মরণ করিয়ে দিল বলেই।...

রাজার প্রত্যক্ষ ও প্রবল আপত্তি না করাটাকেই মহামন্ত্রী সম্মতির লক্ষণ বলে ধরে নিলেন।

বাহান্ন দিন পরের সেই তারিখটিই রাজকন্যার বিবাহের দিন বলে ধার্য হ'ল।

সেই মতো দ্রুত উৎসবের আয়োজন শুরু হয়ে গেল রাজ্যব্যাপী, নিমন্ত্রণ নিয়ে দেশে দেশে দূত প্রেরিত হ'ল, রাজ্যের প্রত্যন্ত প্রদেশেও যাতে এ সংবাদ পেঁছিয় এবং সেখানেও উৎসব ও ভোজের আয়োজন হ'তে পারে, নিমন্ত্রিত গ্রামবৃদ্ধরা যাতে নির্বিঘ্নে রাজধানীতে এসে পেঁছিতে পারেন—সেজন্য সর্বত্র, সমস্ত রাজপথেই দ্রুতগামী ডাক বসানোর ব্যবস্থা করা হ'ল।

এক কথায়, আয়োজন-অবসরের এই কৃচ্ছ্রতার জন্য উৎসব-সমারোহের না কোন ত্রুটি ঘটে এবং সেজন্য নিন্দুকের রসনা না কোন অশোভন ইঙ্গিতে মুখর হয়ে ওঠে—অমাত্যরা সর্বাগ্রে সেই দিকেই মনোযোগ দিলেন।

ফলে মাত্র এক মাস কালের মধ্যেই সমস্ত অরিমর্দনপুর সাম্রাজ্য আনন্দ-চঞ্চল ও উৎসবমুখর হয়ে উঠল।

॥ আট ॥

তরুণ সেনাপতি মলয়সুর যৎপরোনাস্তি বিস্মিত বোধ করেন।

'রাজকন্যার দাসী? এখানে এসেছে? সে কি রে?...আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়? তুই ঠিক শুনেছিস?'

ভৃত্যকে বার বার প্রশ্ন করেন। কথাটা যেন কিছুতেই বিশ্বাস হ'তে চায় না তাঁর।

বিস্মিত হবার কারণও যথেষ্ট। সৈন্যাবাসের এ বাসস্থান, দাসী বা স্ত্রীলোকের আসবার মতো জায়গা নয়।

এর জন্য অবশ্য দায়ী এই সেনাপতিটিই। বিবাহের দিন স্থির হয়ে গেছে, সে দিনের খুব বেশী বিলম্বও নেই, তবু মলয়সুর সেনানিবেশের বাসগৃহ থেকে নিজ ভবনে যান নি এখনও।

তিনি জন্মযোদ্ধা, অনন্যোপায় হয়ে এ বৃত্তি নেন নি, যুদ্ধ ভালবাসেন বলেই নিয়েছেন। রণকৌশল শিক্ষা, তা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা তাঁর নেশা, যুদ্ধবিদ্যায় তাঁর আজন্ম অনুরাগ। ধনীর সন্তান, রাজবংশের রক্ত তাঁর ধমনীতে—অনায়াসে আলস্য ও বিলাসে জীবন কাটাতে পারতেন, কিন্তু ঐ ধরনের জীবনে তাঁর চিরদিনের ঘৃণা।

সেনানিবেশের এই পরিবেশ, অস্ত্রের ঝনৎকার, দৈনিক ব্যায়াম ও যুদ্ধাভ্যাস, নিয়মিত আহার, নিয়ন্ত্রিত জীবনযাত্রা—এই তাঁর আনন্দ, একেই তিনি যথার্থ জীবন বলে মনে করেন।

সেজন্য বিবাহের দিন ধার্য হওয়ার পর থেকে তাঁর দুশ্চিন্তার শেষ নেই। এর পর—নানা অছিলায় কিছু কিছু সময় সেনানিবেশে কাটাতে পারলেও—বেশির ভাগই থাকতে হবে রাজপ্রাসাদে। সেখানের সেই কৃত্রিম আবহাওয়ায়, অকারণ সুখভোগ ও স্বাচ্ছন্দ্যে তাঁর প্রাণ হাঁপিয়ে উঠবে তা তিনি বেশ বুঝতে পারছেন। এ বিবাহে তাঁর কোন হাত ছিল না, অভিভাবকেরা স্থির করেছেন, রাজা আদেশ দিয়েছেন—এ তো করতেই হবে। তা ছাড়া সেবন্তীকে তিনি দেখেছেন বেশ কয়েকবারই, ঐ অপরূপা নারীরত্ন তাঁর কণ্ঠলগ্না হবেন, ভাবতে খুব খারাপ লাগে নি—কিন্তু তবু, সৈনিক জীবনের এই রুক্ষতা ও ব্যস্ততার কাছে একসুরে বাঁধা রাজপ্রাসাদের সুখের জীবন বড়ই বর্ণহীন, বড় নীরস।

তাই শেষ যে দিনটি পর্যন্ত এখনো কাটানো যায় সেদিন অবধি এখানেই থাকবেন, এই সংকল্প ছিল তাঁর এবং অদ্যাপি সেই মতোই জীবনযাত্রা চালিয়ে যাচ্ছেন। আজও এই অপরাহ্ণে একটু ভ্রমণ সেরে ফিরে এসে সন্ধ্যায় তরুণতর সেনানায়কদের শিক্ষালয়ে যাবেন বলে চীনদেশাগত দর্পণের সামনে দাঁড়িয়ে বেশবাস ঠিক ক'রে নিচ্ছিলেন ··

অসুবিধা এখন থেকেই শুরু হয়ে গেছে। ছেলেগুলো কিছু বলতে পারে না, শুধু তাদের ওষ্ঠপ্রান্তে যে চাপা কৌতুক ফুটে ওঠে—সেটা লক্ষ্য ক'রেই তাদের মনোভাব বুঝতে পারেন মলয়সুর। আড়ালে কী বলছে তাও অনুমান করতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু কী আর করা যাবে—এমন অবস্থায় পড়লে ওপরওলা ও শিক্ষককে নিয়ে তিনিও কৌতুক করতেন। তার জন্য এখন থেকে যদি ওদের পাঠ দেওয়া বন্ধ করেন, কোনদিনই আর এর পর সামনে দাঁড়াতে বা পড়াতে পারবেন না।

রাজার জামাই হতে যাচ্ছেন, এটুকু তো সইতেই হবে।...

কিন্তু সে তো হ'ল—এ আবার কী বিপদ?

ভৃত্যরা যে এমন মূল্যবান সংবাদ গোপন রাখবে—এরকম অসম্ভব আশা মলয়সুরের নেই। আর আড়াই দণ্ডের মধ্যেই এই সেনানিবেশের কারও জানতে বাকি থাকবে না যে, রাজকন্যা এখন থেকেই তাঁর ভাবী স্বামীর কাছে দূতী প্রেরণ করছেন—হয়ত বা প্রেমপত্রসহ।

বিরক্তই হলেন মলয়সুর, যখন ঘটনার বাস্তবতা সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ রইল না।

এ আবার কী ক'রে বসলেন রাজকুমারী! এ কাজ কেন করতে গেলেন!

শুধু শুধু তাঁকে এ কী বিপদে ফেলা! কাল কি আর এ সেনানিবেশের কারও সামনে মুখ দেখাতে পারবেন?...

তবু রাজকন্যা স্বয়ং দাসী পাঠিয়েছেন, বিশেষ সংবাদ নিয়ে এসেছে সে—এ কথা শুনে আর তাকে ফিরিয়ে দেওয়া যায় না!

দেখা করতেই হ'ল।

এসেছে রাজকন্যার নিজস্ব দাসী বেথালী। কোন খৎ বা পত্র আনে নি, তার যা বক্তব্য মুখেই বলবে সে।

বক্তব্যও অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত।

অথবা বক্তব্য এটা নয়। সেবন্তীর যা বক্তব্য তা তিনি নিজেই বলবেন—সেই কথাটি বলার জন্যই এই দূতী-প্রেরণ।

রাজপুত্রী আজ একবার নিভৃতে সেনাপতি মলয়সুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান। তাঁর বিশেষ প্রয়োজন।

কাউকে জানানো চলবে না, একা দেখা করতে হবে।

সেনাপতির যদি আজ রাত্রে মন্দির-দ্বার বন্ধ হবার পর সোয়েজিগন মন্দিরে আসতে কোন অসুবিধা না হয়—রাজপুত্রী সেখানেই যেতে পারেন।

বিশ্বাস হওয়া কঠিন।

মলয়সুর নির্বোধ নন। তাঁর এই রাজকন্যার পাণিগ্রহণ আর এত বড় রাজ্যের সিংহাসনে বসা—বলতে গেলে একই ব্যাপার। এটা অনেকের কাছেই আনন্দ-সংবাদ নয়। বহু লোক যে এ সংবাদ শোনার পর তাঁর সম্বন্ধে বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠেছে তা তিনি ভালই জানেন।

এই আমন্ত্রণ তাঁকে হত্যা করা বা কোন ঘৃণ্য দুর্নাম দেওয়ার ষড়যন্ত্র হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।...

তিনি বেশ কিছুক্ষণ বেথালীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কিন্তু সে মুখ দেখে কিছুই বোঝা গেল না। রাজবাড়ির দাসী, মনোভাব মুখ থেকে নিশ্চিহ্ন মুছে ফেলার শিক্ষাই ওদের প্রথম পাঠ।

বীর মলয়সুরও অত কথার মারপ্যাঁচ জানেন না। তিনি শুধু একটি মাত্রই জেরা করলেন, 'রাজপুত্রী সোয়েজিগন মন্দিরে যান বলে তো শুনি নি, নতুন মন্দির হওয়ার পর থেকেই তো সেখানেই যাচ্ছেন!'

'সেই জন্যেই সোয়েজিগনের কথা বলেছেন তিনি, ওখানে বড় ভীড়, বহু রাত্রি পর্যন্ত মন্দিরে লোক-যাতায়াত থাকে। সোয়েজিগনে বড় একটা কেউ যায় না আজকাল, বিশেষ রাত্রে যেতেই চায় না।···তা ছাড়া সেখানে রাজ-কন্যাকে কেউ আশা করবে না, দেখলেও অন্য কোন মেয়ে ভাববে।'

মলয়সুর এবারও সোজাসুজি প্রশ্ন করলেন, বীর তিনি—কথাকে শর্করা-মণ্ডিত করতে শেখেন নি কখনই—ঈষৎ ভ্রূকুটি ক'রে বললেন, 'তা তুমি যে সত্য বলছ, তার প্রমাণ ?'

দেখা গেল সেজন্যও প্রস্তুত হয়ে এসেছে দাসী।

সে বক্ষ-বস্ত্রাভ্যন্তর থেকে একটি অঙ্গুরীয় বার করল।

চতুষ্কোণ মাণিক্যের অঙ্গুরীয়। সে মাণিক্যের মধ্যে একটি স্বর্ণশতদল খোদিত।

এ অঙ্গুরীয় মলয়সুর চেনেন। রাজার হাতে বহুবার দেখেছেন। রাজ-অঙ্গুরীয়।

শুনেছেন, আর একটিমাত্র এই অঙ্গুরীয় আছে—এরই যমজ, অবিকল ঠিক এই রকম দেখতে—সেটি রাজকন্যার কাছেই থাকে। রাজশক্তির প্রতীক হিসাবে।

অঙ্গুরীয়টি মলয়সুরের প্রসারিত হাতে দিয়ে বেথালী জানাল, সোয়েজিগন মন্দিরের পিছনে একটি প্রাচীন মুলসারি গাছ আছে, মন্দির-দ্বার বন্ধ হওয়ার দুই দণ্ড পরে রাজকন্যা সেখানে উপস্থিত থাকবেন।

আর কোন প্রশ্ন বা উত্তরের অবকাশ রাখল না বেথালী, সেনাপতিকে প্রণাম ক'রে চলে গেল।

এ অনুরোধ নয়—আদেশ বলাই উচিত। অনুরোধ হ'লেও প্রত্যাখ্যান করতে পারতেন না মলয়সুর। তাঁর বীরধর্মে, পুরুষধর্মে বাধত।

তিনি যে কোন বিপদ আশঙ্কা করছেন—শত বাস্তব সম্ভাবনা সত্ত্বেও প্রকাশ করা চলবে না কোনমতেই।

সুতরাং যেতেই হবে।

গেলেনও।

যথাসময়ে অর্থাৎ দ্বার বন্ধ হওয়ার আগেই মন্দিরে গিয়েছিলেন মলয়সুর। দর্শন পুজা সেরে, ফুল-বাতি নিবেদন ক'রে বাগানে বেরিয়ে পড়েছিলেন।

এ কিছু অস্বাভাবিক নয়, বন্ধ হওয়ার পরে এলেই বরং দৃষ্টিকটু হ'ত রক্ষীদের কাছে। এতদিনে ভাবী রাজ-জামাতাকে তারা সবাই দেখে নিয়েছে একবার ক'রে—যারা চিনত না, এখন তারা সকলেই চিনতে পারবে। গোপনে আসা কঠিন।

দর্শনের পর উদ্যানভ্রমণও স্বাভাবিক ঘটনা। বিশেষ এই শেষবর্ষার উদ্যান। বৃক্ষলতার ঘন পত্রপল্লবে যেন পূর্ণ যৌবনের ঐশ্বর্য। চারিদিকে

নিবিড় শ্যামলতার সমারোহ, শাদ্বলগুলিকে তো মনে হয় তৃণসমুদ্র ; সামান্য সজল বাতাসেও সেখানে বিপুল তরঙ্গের সৃষ্টি হয়।

সেনাপতি মলয়সুরের এই সময়টাই উদ্যানভ্রমণ ভাল লাগে। কোন কোন দিন তিনি কর্মহীন অপরাহ্ণে অরণ্যের দিকে চলে যান—নিবিড় লতাগুল্ম ঠেলে ঘুরে বেড়ান একা একা—বৃক্ষলতার দুর্ভেদ্য দুর্গ বিজয়ের স্বাদ অনুভব করেন।

তা ছাড়া—এ সময়েও সুগন্ধি পুষ্পের অভাব নেই। কদম্ব-যূথিকা-কেতকী-চাঁপা-মুলসারি—আরও কত কি! সব ফুলের নামও জানেন না মলয়সুর, কিন্তু এদের মিলিত গন্ধে যেন নেশা লাগে তাঁর। ক্ষণেকের জন্য উপলব্ধি করেন—যুদ্ধ জয় করা ছাড়াও জীবনে অন্য স্বার্থকতা আছে।...

অবশ্য আজ আর অতটা আনন্দের স্বাদ পেলেন না।

কৌতূহল ও কিছুটা দুশ্চিন্তাও—তাঁকে অন্যমনস্ক ক'রে রেখেছিল।

সময় অনুমান ক'রে বরং কিছু আগেই সেই মুলসারি গাছটি খুঁজে বার করলেন।

রাজকন্যা তার আগেই এসে থাকবেন, স্থির হয়ে অপেক্ষা করছিলেন সেনাপতির। দাসী বেথালী সঙ্গে ছিল, মলয়সুরকে দেখে ইঙ্গিতে তাকে দূরে সরিয়ে দিলেন।

রাজকন্যাকে চিনতে কোন অসুবিধা হ'ল না তাঁর ভাবী স্বামীর।

প্রথম কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, তখনও জ্যোৎস্না উঠে গেছে।

না হ'লেও চিনতে পারতেন বোধ হয় মলয়সুর। ও অপার্থিব লাবণ্য ভুল হবার নয়।

মুখের ওপর অবগুণ্ঠনের মতো একটা সূক্ষ্ম রেশমের আবরণ ছিল, সেনাপতিকে দেখে সেটা সরিয়ে দিয়েছিলেন সেবন্তী—সম্ভবত এঁর মনে যে সংশয় বা আশঙ্কা জাগতে পারে তা অনুমান ক'রেই।...

মলয়সুরের চিত্তে একটু দোলা লেগেছিল বৈকি।...

তরুণ সুদর্শন বীরের পক্ষে এটা মনে করা কিছু অস্বাভাবিক বা অপরাধজনক নয় যে, রাজকন্যা বিবাহ-অনুষ্ঠান পর্যন্ত অপেক্ষা করতে না পেরে—অধীর হয়ে একটু পূর্বরাগ-লীলার আয়োজন করেছেন।

কিন্তু যদি বা সে রকম কোন আশার সঞ্চার হয়ে থেকেছিল—মনের মধ্যে উত্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তা বিলীন হ'ল প্রায়।

সেবন্তী বৃথা কোন মধুর সম্ভাষণে এমন কি নিতান্ত সৌজন্য হিসাবে কুশল প্রশ্নেও কালহরণ করলেন না, কেমন এক ধরণের উত্তাপ আবেগহীন যন্ত্রবৎ কণ্ঠে বললেন, 'একটু মন্দিরেই যেতে হবে একবার!'

কিছুটা যেন থতমত খেয়ে গেলেন মলয়সুর। বললেন, 'মন্দির তো বন্ধ—'

'তা জানি, নাটমন্দিরে গেলেই হবে।'

বিমূঢ়, হয়ত বা কিছু বিপর্যস্ত, মন্থর পদে সেবন্তীকে অনুসরণ ক'রে ধীরে বহির্মন্দিরে এলেন।

বিশাল নাটমন্দির তখন সম্পূর্ণ জনহীন। শুধু থামের মাথায় তেলের প্রদীপ জ্বলছে, সারা রাতই জ্বলবে।

সেখানে পৌঁছে আবারও বিনা ভূমিকায় তাঁর বক্তব্য শুরু করলেন রাজকুমারী। মূল মন্দিরের অপরূপ কারুকার্যখচিত কাঠের রুদ্ধ কপাট-দুটোর দিকে চেয়ে আগের মতোই ভাবলেশহীন উত্তাপহীন কণ্ঠে বললেন, 'দ্যাখো, বিবাহের আগেই তোমাকে একটা কথা বলে রাখা আমার কর্তব্য বলে মনে করি। আমাদের এ বিবাহ হচ্ছে নিতান্তই রাষ্ট্রের প্রয়োজনে, দেশের ও জাতির প্রয়োজনে। তুমি আমার ভালবাসা ও প্রেম আশা ক'রো না। আমার পক্ষে তোমাকে ভালবাসা সম্ভব হবে না। তোমার কোন গুণের অভাবের জন্য নয়—আমি জানি তোমার মতো স্বামী পাওয়া অন্য যে কোন মেয়ের কাছেই সৌভাগ্য বলে মনে হ'ত—আমি ভালবাসতে পারব না তার কারণ, আমার মন অন্যে আসক্ত বলে। ইচ্ছে করলে আরও একটি বা একাধিক বিবাহ করতে পারো তুমি, আমি আপত্তি করব না, বাধা দেব না—বা তা নিয়ে অশান্তি ঘটাব না। তোমাকে অশ্রদ্ধা করব না—যদি কোনদিন পারি, সম্ভব হয়—ভালও বাসব হয়ত, তবে সে আশা কম। দেশ ও জাতির জন্য রাষ্ট্রের মুখ চেয়ে আমাদের দুটি জীবন নষ্ট হচ্ছে এইটেই মনে ক'রো। এ বিবাহ শুধুই কর্তব্য পালন।...একটি সন্তান অর্থাৎ উত্তরাধিকারী হয়ে গেলে—আমাদের আর কোন দৈহিক সম্পর্কও থাকবে না।...দ্যাখো, এর পরও যদি এ বিবাহে তোমার সম্মতি থাকে তো ভাল, নইলে অনায়াসে তুমি মহারাজ-চক্রবর্তীকে আমার এই বক্তব্য জানিয়ে প্রস্তাব ভেঙ্গে দিতে পারো। তার জন্য তোমাকে দোষী করব না।'

বলা শেষ ক'রে সেইভাবেই মন্দিরের রুদ্ধদ্বারের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন সেবন্তী। যে বীর যুবকটির জীবনে উদয়পথেই তিনি অস্তগমনের ছায়া এনে দিলেন, জীবনের সূচনাতেই টানলেন পূর্ণচ্ছেদ—বোধ করি চক্ষুলজ্জাতেই সেই সম্পূর্ণ নির্দোষ, অকারণে আহত মানুষটার দিকে চেয়ে দেখতে পারলেন না, সাহসও হ'ল না।

কারণ এ মারণাস্ত্র কিভাবে কতখানি আঘাত করল তা অনুমান করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়।...

আহত ব্যক্তির আঘাতটা সামলে নিতে দেরি হ'ল বৈকি।

কথাগুলোর শব্দার্থ বুঝতেই তো অনেকখানি সময় লাগল।

এ রকম কখনও ভাবেন নি। এ রকম যে প্রস্তাব আসতে পারে, সে ধারণা পর্যন্ত ছিল না। অন্য কোন বন্ধু-বান্ধবের জীবনেও এমন ঘটেছে বলে শোনেন নি কখনও।

সবটাই যে সুখস্বপ্ন দেখেছেন এ বিবাহ-প্রস্তাবের পর থেকে তা নয়, তবু স্বপ্ন কিছু দেখেছেন।

দেখা স্বাভাবিকও। তরুণ সুদর্শন বলিষ্ঠ যুবা, আসামান্যা সুন্দরীর সঙ্গে বিবাহের বাগ্‌দত্ত হওয়ার পরও স্বপ্ন দেখবে না, তা সম্ভব নয়—অন্তত রক্তমাংসের দেহে। কিন্তু সে স্বপ্নের সঙ্গে এ বাস্তবের কোথাও তো কিছু মিল নেই।…

সময় লাগবে তা সেবন্তীও জানতেন। তিনিও ব্যস্ত হলেন না, শান্ত-ভাবেই দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

মলয়সুর যদি একদিন বা দু'দিন সময় চাইতেন, তাহলেও কিছুমাত্র বিস্মিত হতেন না তিনি।

কিন্তু মলয়সুর তা চাইলেন না।

তিনি যথার্থ বীর, যুদ্ধের জয়-পরাজয়, আঘাত দেওয়া ও পাওরা—সহজে নেবার শিক্ষাই পেয়েছেন।

প্রায় এক দণ্ডকাল পাথরের মতো নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বললেন, 'তাই হবে রাজপুত্রী। জোর ক'রে তোমার কাছ থেকে কোনদিনই কিছু চাইব না। তুমি নিশ্চিন্ত হও।'

'শপথ করো। এই মন্দিরের দ্বার স্পর্শ ক'রে প্রতিজ্ঞা করো।'

এবার মলয়সুর কঠিন হয়ে উঠলেন। বললেন, 'রাজকুমারী, আমি যুদ্ধ-ব্যবসায়ী, রাজনীতিক নই। আমাদের কাছে প্রতিশ্রুতিভঙ্গ আত্মহত্যার নামান্তর। তবু শপথ যদি করতে হয় তো আমার অস্ত্র স্পর্শ ক'রেই শপথ করব। আমার সম্মান ও জীবন-মরণের সঙ্গী এই তরবারি স্পর্শ ক'রে প্রতিজ্ঞা করছি, এ বিবাহকে প্রয়োজনের বিবাহ হিসাবেই গ্রহণ করব, কর্তব্য হিসাবে—এবং স্বামীত্বের কোন অধিকারই কোনদিন জোর ক'রে তোমার কাছে দাবী করব না। ভগবানের ইচ্ছায় একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করলে আর তোমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে চাইব না।'

মলয়সুর আর অপেক্ষা করলেন না। ফিরে দেখলেনও না সেবন্তীর দিকে। হাত বাড়িয়ে তাঁর প্রায়-শিথিল হাতের মধ্যে সেই চতুষ্কোণ মাণিক্যের অঙ্গুরীয়টা গুঁজে দিয়ে ধীর পদক্ষেপে বেরিয়ে গেলেন।

মানুষটি যে তাঁর মৃত্যুদণ্ডই শুনে গেলেন এই মাত্র—তাঁর গতিভঙ্গী বা মুখের নিস্পৃহ ভাব দেখে কেউ অনুমান করতে পারত না তখন।

শৌর্যের বড় শিক্ষালাভ তাঁর হয়ে গেছে—আত্মদমনের শিক্ষা।

॥ নয় ॥

শিবিকা নিয়ে আসেন নি সেবন্তী, অবগুণ্ঠনে মুখ ঢেকে বেথালীর সঙ্গে পদব্রজেই এসেছিলেন। সেই ভাবেই ফিরলেনও আবার।

প্রাসাদোদ্যানের পিছনের সেই দরজা, আবর্জনা-পরিষ্কারকরা যে পথ দিয়ে যাতায়াত করে, যে পথে রাজা রণমল্লদেব এসেছিলেন একদা।

অত রাত্রে এদিকে কেউ থাকে না,—দরজা খোলা আছে কিনা তাও কারও খবর রাখার কথা নয়। সেইজন্য নিশ্চিন্ত হয়েই কপাট ভেজিয়ে রেখে চলে

গিয়েছিল বেথালী। এ পথ এত নির্জন, দরজার বাইরেও গাছে ও আগাছায় এত ঘন জঙ্গল চারিদিকে—মধ্যে একটুখানি মাত্র পায়ে-হাঁটা-পথ—যে, সহজে কেউ এদিকে আসে না।

প্রাসাদের প্রহরীরা ওদিকের উদ্যান-পথ দিয়ে ঘুরে চলে যায় প্রতি আড়াই দণ্ড অন্তর। এ দরজা খোলা আছে কিনা, জঙ্গলাকীর্ণ পরিত্যক্ত জমির ঘন গুল্মলতার মধ্য দিয়ে তা দেখা সম্ভব নয়।

সুতরাং নিশ্চিন্ত হয়েই গেছে ওরা, নিশ্চিন্ত হয়েই ঢুকেছে।

ভেতরে এসে দরজা ভাল ভাবে বন্ধ ক'রে বেথালী সেবন্তীর পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাবে—আগে আগে চারিদিক দেখতে দেখতে এগিয়ে যাওয়ার কথা তার—অকস্মাৎ একটা অস্ফুট ভয়ার্ত শব্দ ক'রে থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

দাঁড়িয়ে গেল বলা ভুল, পড়েই যেত হয়ত—যদি না পিছন থেকে সেবন্তী ধরে ফেলতেন।

ঠিক সামনেই—সংকীর্ণ পথে দু পাশে একটা প্রাচীন পনস গাছের সঙ্গে এদিকে একটা কনকচাঁপা আর কাঞ্চন গাছ জড়াজড়ি ক'রে জ্যোৎস্নারাতেও যেখানে নিবিড় অন্ধকারের সৃষ্টি করেছে—সেইখানে ঘন সবুজ উত্তরীয়ে সর্বাঙ্গ আবৃত ক'রে দাঁড়িয়ে আছে দীর্ঘকায় এক পুরুষ।

সেবন্তী ভয় পেলেন না।

যেটুকু আলোর আভা আছে— সেটুকু না থাকলেও তিনি চিনতে পারতেন। শুধু উপস্থিতিতেই টের পেতেন বোধ হয়।

এ ক'দিনের নিত্য-চিন্তার সঙ্গী—সকল চিন্তার কেন্দ্রপুরুষ, রণমল্লদেব।

চমকে তিনিও উঠেছেন, তবে এ চমকে ওঠা বেথালীর মতো ভয়ে চমকে ওঠা নয়—চিৎকার ক'রে ওঠবারও শক্তি লোপ পেয়েছে বেথালীর এই রক্ষা—সেবন্তীর এ চমক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, বিস্ময়ে বেদনায়, আশায় নৈরাশ্যে, আনন্দে আশঙ্কায়—তাঁর বক্ষ যেন একটা প্রবল ভূকম্পে কেঁপে লাফিয়ে উঠল, তাঁর প্রাণ যেন চল্‌কে উঠে ওষ্ঠের কাছে এসে স্থির হয়ে রইল কোনমতে, ধমনীতে রক্তস্রোত উত্তাল উন্মত্ত হয়ে উঠে অকস্মাৎ নিশ্চল হয়ে গেল। অগণিত অনুভূতির সংঘর্ষে ও সংঘাতে তিনিও যেন ক্ষণকালের জন্য মূর্ছাতুর অচেতন হয়ে পড়লেন।···

মুখ দেখা গেল না এঁদেরও—তবু রণমল্লদেবের বুঝতে অসুবিধা হ'ল না সেবন্তীর অবস্থা। তিনি এগিয়ে এসে বেথালীকে প্রায় রূঢ়হস্তে সরিয়ে সেবন্তীর হাত ধরলেন, অর্ধস্ফুট কণ্ঠে বললেন, 'চলো আমরা সেইখানে গিয়ে বসি।'

'না না না—'

যেন আর্তনাদ ক'রে উঠলেন সেবন্তী। মৃদু, খুব মৃদু, প্রায় অস্পষ্ট কণ্ঠ হ'লেও সে আর্তনাদের আকুলতা ও তীব্রতা কম নয়, 'আর না, আর না। আর সম্ভব নয়। আমাকে ক্ষমা করো, দয়া করো আমাকে। আমি এখন অন্যের বাগ্‌দত্তা—এখন নিভৃতে তোমার সঙ্গে দেখা করা অন্যায়, আমার পাপ,

অপরাধ হবে।'

চাপা গলাই কঠিন হয়ে ওঠে রণমল্লদেবের, 'তা তো হয় না সেবন্তী। এত সহজে আমাকে পরিহার করতে পারবে না।...আমি তোমার দ্বারপ্রান্তের ভিক্ষার্থী সারমেয় কিম্বা অব্যবহার্য জীর্ণ পাদুকা নই—যে অবহেলা প্রাপ্য বলে বিনা প্রতিবাদে মেনে নেব। অবজ্ঞা উপেক্ষা পেতে আমি অভ্যস্ত নই রাজকুমারী—আমরা রাজা, ক্ষত্রিয়-সন্তান, অবহেলাকে অপমান বলেই মনে করি আমরা—তার যোগ্য প্রত্যুত্তর দেওয়া আমাদের কাছে ধর্মাচরণ। ধর্ম জীবনের চেয়েও বড়।...বৃথা সময়ক্ষেপ ক'রে কোন লাভ হবে না দেবী, দু'চারটে কথা আমার শুনতেই হবে। আমিও তোমার মুখ থেকে শুনে যেতে চাই দু-চারটে কথা, আমার ভাগ্যের কথা।...আর সেটা যত তাড়াতাড়ি সেরে নেওয়া যায় ততই মঙ্গল, তোমার আরও বেশী।'

আবেগে আশঙ্কায় শুষ্ককণ্ঠে উত্তর দেন সেবন্তী, 'কিন্তু এখানে—এই পথের ওপর—'

'কে বলেছে পথের ওপর? তা কখনও সম্ভব! আর সে প্রশ্নই বা উঠছে কেন? আমাদের সে পুরাতন মিলনস্থান তো এখনও অবলুপ্ত হয় নি!'

ঈষৎ বিদ্রূপের আভাস রণমল্লদেবের কণ্ঠে।

বেথালী এবার প্রথম কথা বলে, 'কিন্তু তার পর থেকে আর তো সে ঘর খোলাও হয় নি, সেখানে কোথায় বসবেন, আলো পর্যন্ত নেই একটা—'

আবারও রণমল্লদেবের অর্ধস্ফুট কণ্ঠস্বর ব্যঙ্গ-শাণিত হয়ে ওঠে। বলেন, 'আমারও দু'চারজন অনুচর বান্ধব আছে ভদ্রে, তোমার মতো অত পরিপাটি শয্যা রচনা করতে না পারুক—বসবার মতো একটা আসন আর সেই সঙ্গে অন্তত একটুখানি আলোর ব্যবস্থা ক'রেই রেখেছে।...আমি সামান্য লোক হ'তে পারি বেথালী, তবে একেবারে অত নগণ্য নই—তোমাদের রাজকুমারী যতটা মনে করেন।...পায়ে যদি পড়ি ইচ্ছে ক'রেই পড়ব, তাই বলে যখন খুশি পায়ের ধুলোর মতো ঝেড়ে ফেলে দেবে—ঠিক সে বস্তু নই।'

আজ রণমল্লদেবই একরকম পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন ওঁদের। সেই যে হাতে হাত ধরেছিলেন সেবন্তীর, সে হাত ধরাই আছে এখনও, হাত ধরেই নিয়ে গেলেন স্বর্গগত সম্রাটের নিদাঘ-বাটিকায়।...

সেবন্তী ঘরে ঢুকে সবিস্ময়ে দেখলেন, আজও কাঠের চৌকীর ওপর তেমনি সুগন্ধি পুষ্পের রাশি। শুধু বাতির থালায় বাতির সংখ্যা কম এবং গবাক্ষের আবরণগুলোর কোন নবায়ন ঘটে নি; সেই পুরাতন পর্দাগুলোই টাঙ্গানো আছে—যা ছিল, যেমন ছিল।...

ওঁরা ভেতরে আসার পর বেথালীও ঢুকতে যাচ্ছিল, হাত আড়াল ক'রে তার পথ রোধ করলেন রণমল্লদেব। চোখের ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন—তাঁদের আলাপের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তির স্থান নেই। আগের দিনের মতো বাইরে পাহারায় থাকবে সে—সেইটেই বাঞ্ছনীয়।

তার পর তার মুখের ওপরই কপাট বন্ধ ক'রে ভারী পর্দাখানা ভাল ক'রে

টেনে দিলেন, যাতে বাইরে থেকে কান পেতে থাকলেও ভিতরের কথা না শোনা যায়।...

আবারও তেমনি পাশাপাশি বসলেন সেদিনের মতো। রণমল্লদেব ঈষৎ আড় হয়ে—যাতে সেবন্তীর নত মুখখানা দেখতে পান।

বাতির সংখ্যা একেবারে কম নয়, ঘরে বেশ উজ্জ্বল আলোই হয়েছে, দেখার কোন অসুবিধা নেই। তা ছাড়া অন্ধকার থেকেই এসেছেন ওঁরা, এই আলোই যথেষ্ট।

সময় অল্প তা রণমল্লদেব জানেন। শুধু রাজকুমারী বিপন্না হবেন তা নয়, তিনি হবেন আরও বেশী। তাঁর প্রতি এখানের শাসনকর্তারা কী পরিমাণে বিদ্বিষ্ট সে-সংবাদ গুপ্তচর মারফৎ আগেই পেয়ে গেছেন।

তাই একেবারেই কাজের কথা পাড়লেন। অনুযোগের সুরে বললেন, 'আমি আমার কর্তব্য পালন করেছি, কিন্তু তুমি? তুমি আমাকে সাহায্য করবে বলেছিলে—!'

'আমি আমার যথাসাধ্য করেছি। যদি এখানের সংবাদ পেয়ে থাকেন তো সে খবরও নিশ্চয় পেয়েছেন। তবে মানুষের—বিশেষ মেয়েদের সাধ্যের সীমা আছে।'

কোন জড়তা কি আড়ষ্টতা নেই সেবন্তীর গলায়।

বিস্ময় ও আবেগের সে প্রচণ্ড আঘাত, সেই উত্তাল তরঙ্গ প্রাণপণ চেষ্টায় দমন ক'রে নিয়েছেন রাজপুত্রী—শুধু, অন্তত রণমল্লদেবের মনে হ'ল—গলায় ঈষৎ একটু কম্পনের আভাস আছে।

রণমল্লদেব হাসলেন। তেমনি কঠিন ব্যঙ্গের হাসি। বললেন, 'বিবাহ এমন একটা ব্যাপার সম্রাটনন্দিনী, যা ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুতেই কেউ করাতে পারে না।...তুমি সত্যিই অবিচ্ছিন্ন উপবাস ক'রে পড়ে থাকলে শেষ পর্যন্ত মহারাজ-চক্রবর্তী কোমল হ'তে বাধ্য হতেন।...তাঁরও বহু ইতিহাস আমি ইতিমধ্যে সংগ্রহ করেছি। তুমি কিছু মনে ক'রো না—প্রণয় জিনিসটা তিনি বোঝেন ভাল।'

তারপর ঈষৎ গম্ভীরতর কণ্ঠে বললেন, 'তা বেশ তো, এখনও তো সময় আছে, এসব ফেলে চলো এখনই—এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে। আজ রাত্রি শেষ হবার পূর্বেই আমরা আরাকানের পূর্বদিকের তাম্পালি জঙ্গলে পৌঁছে যাব, সেখানে আমার একসহস্র সৈন্য অপেক্ষা করছে, আরাকানরাজও আমাকে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, তার পর, একবার দেশে পৌঁছে গেলে তোমাকে আর কেড়ে আনতে পারবেন না তোমার পিতা।'

এবার আরও স্পষ্ট, আরও দৃঢ় শোনায় সেবন্তীর কণ্ঠ।

বললেন, 'আপনি নিজে রাজা, একটা দেশের শাসক, আপনি জানেন রাজার ঘরে জন্মানোর কিছু দায়িত্ব আছে। তাঁদের ইচ্ছামতো সব কিছু করা যায় না। কেবল নিজের সুখ-সম্ভোগ-বাসনা-কামনার কথা চিন্তা করার অধিকার যতটা আপনার প্রজাদের আছে, ততটা আপনার নিশ্চয়ই নেই।...

যে রাজারা এ কথা বিস্মৃত হন তাঁরা রাজা পদবীর অযোগ্য। তাঁদের রাজত্বও বেশী দিন স্থায়ী হয় না।'

এই বলে এক নিমেষকাল থেমে আবারও বললেন, 'আমার দেশ, জাতি, আমার লক্ষ লক্ষ প্রজাদের সুখ-দুঃখ-ভবিষ্যৎ সব ভাসিয়ে দিয়ে যদি শুধুমাত্র নিজের কামনারই অনুসরণ করতাম—আপনিই কি আমাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারতেন—না আপনার সিংহাসনে বসাবার উপযুক্ত মনে করতেন? শুধু রাজপরিবারের লোক কেন, প্রতি মানুষের জীবনেই এমন এক একটি ক্ষণ আসে, যখন কেবল নিজের সুখ-সম্ভোগের কথা চিন্তা করা যায় না—আরও বহুলোকের সুখের কথা ভেবে আত্মবলিদান দিতে হয়।'

কোন সঙ্কোচ নেই, কোন জড়তা নেই রাজকন্যার কণ্ঠে। কোন অপরিচিত লোক শুনলে মনে করতে পারত বুঝি কোন বেদনাও নেই।

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থাকেন রণমল্লদেব। তারপর একরকমের ভগ্নকণ্ঠে বলেন, 'আমার বড় সাধ ছিল সেবন্তী তোমাকে আমাদের দেশে নিয়ে যাব—আমার দেশের মাটিতে তুমি পা দেবে, যে মাটিতে আমি জন্মলাভ করেছি।'

সেবন্তীরও কিছু সময় লাগে উত্তর দিতে। বোধ করি অন্তরের হাহাকার ও কণ্ঠে-উদ্গত অশ্রু সম্বরণ করতে হয় তাঁকে, তারপর আস্তে আস্তে বলেন, 'আমি মৃত্যুবরণ করলে যদি সব সমস্যার সমাধান হ'ত তাহলে সানন্দে তা করতুম। আমার এ বেঁচে থাকা মৃত্যুর অধিক—এইটুকু শুধু আপনি বিশ্বাস ক'রে যান, ভগবান তথাগত জানেন—আমি সত্য বলছি। কিন্তু আমার অন্য কোন উপায় ছিল না, উপায় নেই।'

'ভয় নেই কল্যাণী', ম্লান, ঈষৎ বিদ্রূপকরুণ হাসি হাসেন রণমল্লদেব, 'এ দুঃখ তোমার বেশী দিন থাকবে না। এ দেশের ভাবী রাজ-জামাতা সুদর্শন, সুপুরুষ—বীর যোদ্ধা। তাঁকে পাওয়া যে কোন মেয়ের পক্ষেই সৌভাগ্যের কথা।'

এ কথার মধ্যে যে বিদ্রূপ ছিল তা গায়ে মাখলেন না সেবন্তী, আগের কথার সূত্র ধরেই যেন বললেন, 'সেই দুঃখটাই আমাকে সব চেয়ে বেশী আঘাত করছে। অমন একটা মহৎ প্রাণ আমি নষ্ট ক'রে দিলুম। আমার প্রাণ বলি দেবার অধিকার আমার অবশ্যই আছে, কিন্তু তাঁরও—!...যদি সম্ভব হ'ত—শুধু তাঁর জন্যই এ বিবাহ বন্ধ করতুম।'

'এখন থেকেই তাঁর জন্য এত দুঃখিত হচ্ছো কেন রাজপুত্রী?' কঠিন হাসির সঙ্গে বলেন রণমল্লদেব, 'কালই হচ্ছেন সকল মর্মব্যাধির চিকিৎসক, কালে তোমাদের জীবন অবশ্যই পূর্ণ হবে, শুধু আমারই কোন আশা, কোন সম্ভাবনা, কোন অবলম্বন রইল না আর।'

এ অবিচার, এ অমার্জিত বিদ্রূপ কতখানি আঘাতে, কতখানি নৈরাশ্যে সম্ভব হয়েছে বুঝেই এর কোন কঠিনতর প্রত্যুত্তর দিলেন না সেবন্তী। শুধু স্খলিত বিষণ্ণ কণ্ঠে আস্তে আস্তে বললেন, 'আমি তাঁকে সব বলেছি। আমাদের জীবনে সুখ আর আনন্দ বলতে যে কিছু রইল না, থাকবে না—

এটা যে শুধুমাত্র কর্তব্যপালনের বিবাহ্ তা তিনি জানেন, আমার পক্ষে যে তাঁকে ভালবাসা সম্ভব হবে না, তাও। তিনি নিজের সম্মান আর অস্ত্রের নামে শপথ করেছেন, একটি সন্তান জন্মের পর আমার সঙ্গে আর কোনদিন কোন সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করবেন না।'

এবার স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকবার পালা রণমল্লদেবের।

এতটা আশা করেন নি তিনি, এতটা ভাবতে পারেন নি।

অনেকক্ষণ নিঃশব্দে কাটার পর সেবন্তী অকস্মাৎই উঠে দাঁড়ালেন। শুধু বললেন, 'আমি যাই!'

কোথায় মনের কোন্ গহন অন্তঃপুরে চলে গিয়েছিলেন রণমল্লদেব, বেদনার এক সীমাহীন নিস্তরঙ্গ সমুদ্রে ডুব দিয়েছিলেন—এখন যেন একটা প্রচণ্ড আঘাতে চমকে উঠলেন, ব্যাকুলভাবে চাইলেন একবার চারিদিকে, যেন মজ্জমান মন একটা কোন আশা বা আশ্বাসের অবলম্বন খুঁজছে প্রাণপণে। তারপর শুধু বিহ্বল কণ্ঠে একবার প্রশ্ন করলেন, 'চলে যাবে? এখনই চলে যাবে? কিন্তু কিছুই যে বলা হ'ল না সেবন্তী! কত কী যে বলবার ছিল!'

'থাক প্রভু। এ বলা আমাদের দুজনের কারও জীবনেই শেষ হবে না। এ আমাদের পরস্পরের মনে আপনিই পৌঁছবে, নিজের মন দিয়ে আমরা একে অপরের কথা বুঝব। সেই ভাল, অনেক ভাল।...এরকম সাক্ষাতে শুধুই যন্ত্রণা আর তিক্ততা।'

এর মধ্যে দু'তিন পা এগিয়ে গিয়েছিলেন সেবন্তী। ফিরে না এসে বা ফিরে গিয়ে ও'র দিকে না চেয়েই স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে কথাগুলো বললেন।

এই শেষ। এ জীবনে আর কোনদিন কোন কারণে বা উপলক্ষেই দেখা হবার সম্ভাবনা নেই।

এই কঠোর দুঃসহ সত্য অনুভব করার সঙ্গে সঙ্গে রণমল্লদেবের মনে হ'ল তাঁর পায়ের নিচের পৃথিবী দুলে কেঁপে উঠল।

যেন একটা প্রবল ভূমিকম্পে কেঁপে উঠলেন ধরিত্রী।

বাইরে না হোক, নিজের অন্তরেই বুঝি ভূমিকম্প বোধ করেন রণমল্লদেব। এক নিমেষে সব ওলট-পালট হয়ে যায়, যেন একটা মহাপ্রলয় ঘনিয়ে আসে তাঁর মনে।

সেই কয়েক লহমার জন্য সর্বপ্রকার বিচার-বিবেচনা, শিক্ষা-সংস্কৃতি-শালীনতা বোধ, বর্তমান-ভবিষ্যৎ, ইহকাল-পরকাল, পাপ-পুণ্য একাকার হয়ে যায়।

সর্বনাশের নেশায় প্রলয়ের নেশাতেই পেয়ে বসে তাঁকে। একটা প্রচণ্ড, সকল-কল্যাণচিন্তা-বিধ্বংসী কামনা আর দু'কূলপ্লাবী আবেগ ক্ষণকালের জন্য তাঁকে উন্মত্ত ক'রে তোলে, অন্ধের মতো, উন্মাদের মতোই দু'হাতে ধরে বলিষ্ঠ আকর্ষণে টেনে নেন সেবন্তীকে, নিজের দেহের উপর, বুকের মধ্যে—

আকুল চাপা আর্তনাদে মিনতি জানানোর চেষ্টা করেন সেবন্তী, প্রাণপণে

চেষ্টা করেন সেই বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করার।

রণমল্লদেব অপ্রকৃতিস্থ উন্মাদের মতোই রূঢ়কণ্ঠে দাঁতে দাঁত চেপে বলেন, 'তা হয় না রাজকুমারী, কিছুতে হয় না। এভাবে আমি চলে যেতে পারব না—নিঃস্ব রিক্ত হয়ে। সমস্ত জীবন আর প্রাণ এখানে রেখে শুধু মাংস-কঙ্কালের বোঝা টেনে ফিরে যেতে পারব না কিছুতেই। অন্ততঃ নিয়ে যাবার মতো কিছু থাক—'

বহুক্ষণ ধরে প্রাণপণসাধ্যে সেই সুকঠিন বাহুবন্ধন থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা করেন সেবন্তী, শেষ পর্যন্ত আর যখন শক্তি, সাধ্য বা ইচ্ছায় কুলায় না—অজ্ঞানের মতো, মূর্ছিতের মতোই সেই বহু-বাঞ্ছিত বহু-আকাঙ্ক্ষিত বক্ষে এলিয়ে পড়েন এক সময়।...

তারপর আর কেউ কিছু জানেন না।...

সেই সর্বনাশা তাণ্ডবে জ্ঞান হারান বুঝি দুজনেই।

কোন চিন্তা ভাবনা অনুভূতি—কোন কিছুই থাকে না কারো।

সব মানুষের জীবনেই বুঝি এমন মুহূর্ত আসে এক একবার, সর্বনাশের স্বাদ পেতে চায়।

মরে দেখতে চায় মৃত্যুটা কেমন।

ওঁদের দুজনের জীবনেও বোধ করি তেমনি মুহূর্ত এসেছিল সেই সময়টায়।

নতুবা নিঃশ্বাস-রোধ-করা আলিঙ্গনে নিষ্পিষ্ট হয়ে এমন তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলবেন কেন সেবন্তী?

বাইরে থেকে মৃদু করাঘাতে সচেতন করিয়ে দিল বেথালী। প্রাসাদের ঘড়িতে আজও তৃতীয় প্রহরের ঘণ্টা পড়ে গেছে।

কোনমতে অবশ শিথিল দেহটাকে তুলে উঠে দাঁড়ান সেবন্তী। নীরবে অসম্বৃত কেশ-বেশ সুসম্বন্ধ ক'রে নিয়ে বাইরের দিকে পা বাড়ান।

রণমল্লদেব তার আগেই উঠে উত্তরীয় সামলে গায়ে জড়িয়ে নিয়েছিলেন। কিছুদূরে আলোর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সেবন্তী পাশ দিয়ে চলে যাবার সময় শুধু বললেন, 'এ তোমার, তোমার অভিভাবকদের, এ রাজ্যের অমাত্যসভার ধৃষ্টতার উত্তর। আমাদের জীবন নিয়ে ইচ্ছামতো খেলা করার অধিকার আছে যাঁরা মনে করেন, তাঁদের এটা পাওনা ছিল। এর জন্য তোমার কাছে ক্ষমা-প্রার্থনা ক'রে অযথা নাটক করব না। তাছাড়া আমারও কিছু পাওনা ছিল, জীবনের পাথেয়।'

এ কথার কোন উত্তর দিলেন না সেবন্তী, রণমল্লদেবের দিকেও ফিরে তাকালেন না। নীরবে দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

দ্বিতীয় পর্ব

॥ ১০ ॥

এরপর বহুদিন কেটে গেছে। বহু বৎসর। মহাকালের সমুদ্রে বহু তরঙ্গ উঠেছে, আবার তাতেই বিলীন হয়ে গেছে। বহু মানুষ এসেছে এ পৃথিবীতে, বহু মানুষ চলে গেছে বিদায় নিয়ে।

সে মহামন্ত্রী, মহামন্ত্রী কেন—সে অমাত্যসভার কেউই আজ নেই। সম্রাট ক্যানজিত্থ বা ত্রিভুবনাদিত্য ধর্মরাজ দীর্ঘকাল রাজত্ব করার পর সাধনোচিত-ধামে মহাপ্রয়াণ করেছেন। সেবন্তীর পুত্র অলাঙ্গসিথু জয়সুর এখন পগানের সিংহাসনে।

অবশ্য সেবন্তী আজও বেঁচে আছেন। সে বেঁচে থাকাটা সেবন্তীর কাছেই বিস্ময়কর। এক এক সময় মনে হয়—তাঁর পাপের শাস্তি দেওয়ার জন্যই ভগবান শাক্যমুনি তাঁকে এতদিন বাঁচিয়ে রেখেছেন।

বিস্ময়কর এই জন্য যে, বাঁচবার কিছুমাত্র চেষ্টা করেন নি সেবন্তী। মৃত্যুরই সাধনা ছিল তাঁর।

সেই বিবাহের দিনটি থেকে—বিবাহের দিন কেন—মলয়সুরের সঙ্গে মন্দিরে দেখা হওয়ার পর থেকে—সেবন্তীর হাসিমুখ কেউ কখনও দেখে নি।

অলোকসামান্য সুন্দর মুখের প্রস্ফুট কমলটি চিরদিনের মতো শুষ্ক মুদিত হয়ে গিয়েছিল যেন; সুখ আনন্দ এসব অর্থহীন শব্দে পরিণত হয়েছিল তাঁর কাছে।

কোন উৎসবে যেতেন না তিনি, কোনদিন মহার্ঘ্য বেশভূষায় সজ্জিত হতে দেখে নি কেউ—এমন কি মন্দিরে পূজা দিতে যেতেন যখন, তখনও সামান্য বস্ত্রে যেতেন, তাঁর রাজ্যের দীনতম প্রজার স্ত্রীও যেদিন উৎসব-সজ্জা পরিধান করত, সেদিনও তাঁর সেই সাধারণ বেশভূষার কোন সুপরিবর্তন হ'ত না।

মলয়সুর সবই বুঝতেন। এ উদাসীনতা, এ বৈরাগ্য—এই শোক-পরিচ্ছদের অপমান তাঁকে মর্মে মর্মে আঘাত করত। বহু-জনশ্রুতি শুনেছেন এর মধ্যে, তাঁর সহধর্মিণীর মন কোথায় এ জন্মের মতো বাঁধা পড়ে আছে তাও জানেন।...

জানেন এখানে তাঁদের পরিচয় ও প্রণয়াসক্ত হওয়ার কাহিনীও। যা একাধিক ব্যক্তি জানেন—এমন চমকপ্রদ কাহিনী, বিশেষ রাজপরিবারের পক্ষে এমন এক লজ্জাজনক ঘটনার ইতিহাস—তা ক্রমে জনরবে পরিণত হবে না—এ সম্ভব নয়। বেথালী যেমনই হোক, তার ভাইও এ রহস্য জানত।...তাই জেনেছিলেন সবই। কিন্তু বীর তিনি, প্রকৃত বীরের মতোই ভাগ্যের হাতে এই পরাজয়, সমস্ত বেদনা, ঈর্ষার জ্বালা ও অপমান—কামনার নিরন্তর দহন

—নিঃশব্দে সহ্য করেছেন। দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী নারী, অশেষ গুণান্বিতা—বহু পুরুষের বহু বিনিদ্র রাত্রির স্বপ্ন-কল্পনার ধন তাঁর ঘরে, হাতের কাছে, হাতের মুঠোয় বলতে গেলে। অথচ তাকে স্পর্শ করা সম্ভব নয়। তৃষ্ণার্ত ওষ্ঠের সামনে সুধারসপূর্ণ পাত্র, তবু তাঁর কাছে তা চিরকাল অপেয় হয়ে রইল। সেই সামান্য ব্যবধান, একটি সন্ধ্যার শপথ বা অঙ্গীকারের ব্যবধানটুকু—ঘোচানো গেল না কিছুতেই। কোনদিনই সেবন্তী এসে নিজে থেকে ধরা দিলেন না, প্রসন্ন হলেন না।…

তবে সে অঙ্গীকার, সে শপথ তিনি রক্ষা করেছেন প্রকৃত মানুষের মতোই, না—মহান মানুষের মতো। নিজের চেয়েও তাঁর জন্যই বেশী দুঃখিত সেবন্তী। কোনদিন কোন অশিষ্ট আচরণ করেন নি মলয়সুর, করেন নি কোন অসম্মান। একটা অনুযোগও কখনও করতে শোনে নি কেউ কোনদিন।

যা নিজের অধিকার, ধর্মত যা নিজের প্রাপ্য—ধর্মত, ন্যায়ত—যা এতটুকু জোর করলেই নিতে পারতেন—কেউ দোষ দিত না, বরং সাধুবাদ দিত, জয়গান করত তাঁর বীর্যের ও পৌরুষের—তাও তিনি নিতে চেষ্টা করেন নি কোনদিন।

স্ত্রীর মর্যাদা, রাজ্ঞীর মর্যাদা পূর্ণভাবে বজায় রেখে গেছেন বরাবর—যতদিন বেঁচেছিলেন।

এ যে কী অমানুষিক শক্তির পরিচায়ক,—কী প্রচণ্ড যুদ্ধ যে করতে হয়েছে তাঁকে এ জন্য, দুর্জয় দুর্নিবার অথচ মানবদেহের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক কামনার সঙ্গে—আর সেই যুদ্ধেই যে প্রতিদিন ক্ষতবিক্ষত আহত হ'তে হ'তে অকালে তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে, তিলে তিলে পলে পলে—তার চেয়েও বড় কথা, যতদিন বেঁচে ছিলেন—নিত্য নিরন্তর শরশয্যার যন্ত্রণা অনুভব করেছেন, মৃত্যুই প্রার্থনা করেছেন একান্ত মনে—এ যে কী দুঃসহ অবস্থা তা একমাত্র সেবন্তীই জানেন। এর জন্যে প্রতিপদে নিজেকে অপরাধী বোধ করেছেন, প্রতি মুহূর্তে স্বামীর কাছে অত্যন্ত ছোট মনে হয়েছে নিজেকে, পতিহন্ত্রী বলে মনে হয়েছে—তবু কোন প্রতিকার করতে পারেন নি।

কর্তব্যের অনুরোধে সন্তান-কামনার দু'তিনটি দিন ছাড়া—পরে কোনদিন স্বেচ্ছায় এই অপবিত্র দেহ ও অন্যাসক্ত মন ঐ দেবতার মতো মানুষটাকে দিতে পারেন নি।

দুঃখিত হয়েছিলেন অনুতপ্ত হয়েছিলেন ত্রিভুবনাদিত্যও।

মেয়ের চিরম্লান মুখ, বৈরাগ্যের বেশ—এবং তরুণ জামাতার বেদনাবিদ্ধ ললাটে অকাল-বলিরেখা দেখতেন আর অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হতেন। মনে হ'ত—উচিত হয় নি, কোন প্রয়োজন ছিল না দুটি সুন্দর তরুণ প্রাণ এভাবে নষ্ট করবার। ঐ মলয়সুরকেই সিংহাসন দিয়ে যেতে পারতেন—অথবা তাঁর জ্ঞাতিদের মধ্য থেকে অন্য কোন ভাল ছেলে দেখে বেছে নিয়ে। এই তো এতকাল বাঁচলেন—

অনায়াসে আর একজনকে তৈরী ক'রে দিয়ে যেতে পারতেন। তাতে দু'-দুটো প্রাণ এমনভাবে নষ্ট হয়ে যেত না, তাঁকেও এমন দিনরাত দগ্ধ হ'তে হ'ত না। মেয়েকে সুখী করতে গিয়ে—রাজ্যে অধিষ্ঠিত দেখতে গিয়ে এ তার কি সর্বনাশ ক'রে বসলেন!

ইদানীং কেবলই মনে হ'ত তাঁর—তাঁরই কি ঠিক বুঝেছিলেন? সত্যিই এর প্রয়োজন ছিল? সেই পট্টিকেরার রাজাটাকেই যদি তাঁরা গ্রহণ করতেন, সে যদি ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন ক'রে চলে আসত—কে জানে তাঁর প্রজারা হয়ত মেনেই নিত রাজা বলে। হয়ত তাতে ভালই হ'ত এদেশের। কে জানে সে প্রাণটাও এমনি চিরকালের মতো নষ্ট হ'ল কিনা!...

লোকমুখে শুনেছেন সেও মারা গিয়েছে অল্পদিনের মধ্যেই।...ভাবতে ভয় হয়, নিজেকে অপরাধী দায়ী বলে বোধ হয়—সেও হয়ত আত্মহত্যাই করেছে।

মেয়ের বিবাহের পর দীর্ঘদিন বেঁচে ছিলেন ত্রিভুবনাদিত্য—কিন্তু তাঁর মুখেও আনন্দ কি হাসি দেখে নি কেউ বড় একটা। তিনিও ভগ্নহৃদয়েই মারা গেছেন। মৃত্যুর সময় শেষ কথা বলে গেছেন, 'আমাকে ক্ষমা কারো মা, আমাকে ক্ষমা করো। নইলে ভগবানের কাছে কোন্ মুখে গিয়ে দাঁড়াব?'

সেও বহুকালেয় কথা হয়ে গেছে। রাজমাতা সেবন্তীর বৈরাগ্যের বেশ বা চিরমলিন মুখ নিয়ে এখন আর কেউ মাথা ঘামায় না। বৈধব্য ও পিতৃহীনতাই কি যথেষ্ট কারণ নয় নিবিড় বৈরাগ্যের?

তা ছাড়া বয়সও হল বৈকি, মন এখন ঈশ্বরাভিমুখী হবে এই তো স্বাভাবিক।

এখনকার যারা তরুণ এমন কি মধ্যবয়সী, তারাও কেউ জানে না যে কবে থেকে, কেন এই রাজমাতা এমন প্রায়-ভিক্ষুণীর বেশ ধারণ করেছেন, এমন নিরন্তর বিষণ্নতা বহন ক'রে চলেছেন?

এককালে যারা এ নিয়ে আলোচনা করত, যারা এসব কথা জানত বা পরবর্তীকালে লোকমুখে শুনেছিল, তারাও কেউ বিশেষ নেই আর, যা দু'-চারজন এখনও আছে তারাও ভুলে গেছে এসব কথা। তাদের নিজেদের শোক-বিষাদ-দুঃখ-বেদনা জীবন-যুদ্ধ নিয়েই তারা যথেষ্ট বিব্রত। পরের কথা, বিশেষ রাজারাজড়ার ঘরের কথা মনে রাখবার সময় কোথায় তাদের?

এককালে যে এই বিষাদ-প্রতিমার মতো শোকার্তা মহিলার প্রস্ফুট শতদলের মতো সুন্দর মুখ স্বর্গের আনন্দ-সুষমায় ঝলমল করত, যেদিকে চাইলে লোকে কিছুকালের মতো নিজেদের সহস্র দুঃখ ভুলে যেত - সে কথা এখনকার কেউ জানে না। সে মুখ যারা দেখেছিল তারা সকলেই আজ মৃত।...

কোন উৎসবে বা সামাজিক অনুষ্ঠানে তো যোগ দিতেনই না সেবন্তী, পিতার মৃত্যুর পর মন্দিরে যাওয়াও বন্ধ করলেন। নিজের স্বতন্ত্র গৃহে একটি চৈত্যের মতো তৈরী করিয়ে নিয়েছিলেন, সেইখানেই দিন-রাতের সাতটি

প্রহর কাটত তাঁর—পূজাপাঠ আর শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠে। পিতামহ ও পিতা মোনদের দেশ জয় ক'রে এবং ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত ও সিংহল থেকে যাচঞা ক'রে বিপুল বৌদ্ধশাস্ত্র গ্রন্থসম্ভার সংগ্রহ করেছিলেন—এখন সেইগুলিই সেবন্তীর একমাত্র অবলম্বন।···আর সে গ্রন্থেরও তেমন আগ্রহী পাঠক বিশেষ কেউ নেই—সেবন্তীই বস্তুত তাদের একমাত্র পাঠিকা। শম্বুক যেমন কোন আঘাত পেলে নিজের খোলার মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নেয়—সেবন্তীও এই গৃহ ও শাস্ত্রগ্রন্থের শুক্তিকাবরণে সম্পূর্ণ আত্মগোপন করেছিলেন।

সেই স্বেচ্ছাবন্দিনী, একান্ত কূটস্থ রাজমাতাই যে সহসা তীর্থযাত্রার সঙ্কল্প করবেন—তা কেউ ধারণাও করতে পারে নি।

অবশ্য রাজা অলাঙ্গসিথু অনেকদিন থেকেই তাঁকে অনুরোধ করছেন, পীড়াপীড়িও করছেন বলা যায়—তীর্থভ্রমণে বেরোতে। এমন কথাও তিনি বলেছেন যে, রাজমাতা যদি ভারতে যেতে চান—লুম্বিনী, কুশীনগর, শ্রাবন্তী, রাজগৃহ, গয়া ও সারনাথ প্রভৃতি ভগবানের শ্রীচরণরজঃপূত স্থানগুলি দেখতে চান, সে ব্যবস্থাও তিনি ক'রে দিতে পারবেন। অনিরুদ্ধদেবের পৌত্রী, ত্রিভুবনাদিত্যের পুত্রী এবং জয়সুরের জননী তীর্থযাত্রায় যাবেন শুনলে পথের সমস্ত যানবাহন ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা সেখানকার স্থানীয় রাজারাই ক'রে দেবেন।

জয়সুর নিজে খুব ভ্রমণপ্রিয়—কোন দেশের কোন রাজাই বোধ হয় এত বিদেশভ্রমণ করেন নি এতাবৎকাল—সময় ও সুযোগ পেলেই তীর্থপর্যটন বা দেশভ্রমণে বেরিয়ে পড়তেন। সেই জন্যই তাঁর এত আগ্রহ মাকে পাঠাবার। কিন্তু কোন অনুরোধ-উপরোধ-অনুনয়েই সেবন্তী তাঁর কোটর ছেড়ে—বিষাদ ও অনুতাপের স্বেচ্ছাবৃত নির্মোক ত্যাগ ক'রে কোথাও বেরোতে রাজী হতেন না।

হঠাৎ এবার যে কেন রাজী হয়ে গেলেন তা কেউ জানে না। না, দূর কোনখানে নয়—দেশের মধ্যেই কয়েকটি স্থানে ঘুরবেন—কাছাকাছি। তাঁর পিতা ও পিতামহের জন্মস্থান, তাঁদের কীর্তি ও স্মৃতি-পূত স্থানগুলিই প্রধানত দেখে আসবেন—এই ইচ্ছা।

স্পষ্ট ক'রে কিছুই বললেন না। জয়সুরও বেশী কোন প্রশ্ন করলেন না। মা যে এতদিন পরে তাঁর এই অকারণ বন্দিদশা থেকে বেরোতে সম্মত হয়েছেন—এই ওঁর সৌভাগ্য। কোথায় যাবেন সেটা বড় প্রশ্ন নয়—এখান থেকে বেরোবেন, যেখানে হোক যাবেন—সেইটেই রাজার কাছে সব থেকে আনন্দ-সংবাদ।

প্রচুর লোকজন, মালপত্র, শিবিকা, যানবাহন ও বড় একদল রক্ষীসৈন্য সঙ্গে দিয়ে তিনি পাঠিয়ে দিলেন, পথে কোন অসুবিধা না হয়—সেজন্য সম্ভাব্য সমস্ত জায়গায় চিঠি দিয়ে দিলেন ও বিপুলসংখ্যক স্বর্ণ ও রৌপ্য-মুদ্রা দিলেন সঙ্গে।

প্রায় এক বৎসর ধরে ঘুরলেন সেবন্তী।

পরিক্রমার মতো ক'রেই গোটা রাজ্যটা ঘুরলেন প্রায়, তারপর এক সময় আরাকান সীমান্তে এসে কী মনে ক'রে আরাকানের রাজার অনুমতি চেয়ে পাঠালেন, পগানের রাজমাতা তাঁর রাজ্যের মধ্য দিয়ে পট্টিকেরা যেতে চান—যদি কোন বাধা না থাকে দয়া ক'রে জানিয়ে দিলে রাজমাতা বাধিত হবেন।

বাধা!

বাধা কিসের?

এ তো আরাকানেরই সৌভাগ্য!

আরাকানের রাজা রাজকীয় আড়ম্বরেই ওঁকে অভ্যর্থনা জানালেন—বার বার অনুরোধ করলেন তাঁর দেশে কিছুদিন বাস ক'রে যেতে—কিন্তু সেবন্তী রাজী হলেন না। তবে এই সৌজন্যের জন্য আরাকানরাজকে আশীর্বাদ জানালেন, প্রচুর উপঢৌকন দিলেন—একটি শ্বেত হস্তীও উপহার দিলেন তাঁদের সৌভাগ্য কামনায়।

তারপর একদিন পট্টিকেরার রাজসভায় দূত গেল, পগানের রাজমাতা আরাকানের পশ্চিম সীমান্তে এসে স্কন্ধাবার স্থাপন করেছেন—ইচ্ছাএখানকার রাজার সঙ্গে একটু পরিচয় করেন। পরমেশ্বর পরমভট্টারক পট্টিকেরাধিপতির অবসর হবে কি?

পট্টিকেরার নৃপতি যোধমল্লদেব আগেই সংবাদ পেয়েছিলেন।

আরাকান রাজসভা থেকেই সংবাদ এসেছিল, পগান রাজমাতার আসল লক্ষ্য পট্টিকেরা। শুনে পর্যন্ত অস্বস্তির সীমা ছিল না যোধমল্লদেবের। এই বয়সে এ রকম অদ্ভুত ভ্রমণের কথা কে কবে শুনেছে? তীর্থভ্রমণ নয়, পবিত্র ও প্রসিদ্ধ স্থান দর্শন নয়—শুধুই উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ানো!

এর অর্থ কি?

যৎপরোনাস্তি সন্দিগ্ধ ও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিলেন রাজা।

বৃদ্ধ রাজমাতার এখানে কি প্রয়োজন? এটা কোন তীর্থ নয়, কোন তীর্থে যাবার সোজা পথও নয়। এমন কিছু দ্রষ্টব্যও নেই এখানে। তবে?

বৃদ্ধাকে সামনে রেখে রাজা অলাঙ্গসিথু জয়সুর গুপ্তচর পাঠান নি তো?

নাকি আরও বেশী?

রাজমাতা সেবন্তী দেবী একান্তভাবেই ধর্মগতপ্রাণা, যথার্থ ভিক্ষুণীর জীবনযাপন করেন, মাসের অর্ধেকদিন তাঁর উপবাসে কাটে—এসব যা শুনে এসেছেন এতকাল—তা কি সমস্তই মিথ্যা তাহলে?

রাজ্যের রশ্মি তিনিই এখনও হাতে রেখেছেন, পুত্রের অন্তরালে তিনিই পরিচালনা করেন আসল রাজকার্য?…

সংবাদ সংগ্রহের, পট্টিকেরার অবস্থা ও অবস্থান দেখে যাবার ছল নয় তো এটা?

উদ্বিগ্ন পট্টিকেরাধিপতিও গুপ্তচর পাঠিয়েছিলেন। বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান ক'জন গুপ্তচর। তারা এসে সংবাদ দিল যে, বিস্ময় এখানকার শিবিরেও বড়

কম নয়। বৃদ্ধার এই ভ্রমণটাই তো একটা অবিশ্বাস্য এবং দুর্বোধ্য ব্যাপার। তার ওপর এত দেশ থাকতে পট্টিকেরায় আসা কোন কারণ বা উদ্দেশ্য তাদের মাথাতেও ঢুকছে না।

তথাপি হয়ত যোধমল্লদেবের অস্বস্তি যেত না, যদি না কথাটা এ রাষ্ট্রের প্রাক্তন মহাসান্ধিবিগ্রহিক বলভদ্রের কানে পৌঁছত—এবং তিনি ছুটে এসে রাজাকে সাদর অভ্যর্থনার পরামর্শ দিতেন।

বৃদ্ধ বলভদ্র অবসর নিয়ে পাহাড়ের ওপর তাঁর বিশ্রাম-নিকেতনে থাকেন। সেখানে সংবাদ পেঁছিতেই কিছু বিলম্ব হয়, এক্ষেত্রেও হয়েছিল—কিন্তু তার পর আর মুহূর্তকাল দেরি করেন নি তিনি।

যোধমল্লদেব বিস্মিত হয়ে বলভদ্রর মুখের দিকে তাকালেন, 'কিন্তু এখানে ওঁর আসার অর্থ কি আর্য? কিছুই তো বুঝতে পারছি না!'

বলভদ্র হেসে তাঁর পুরাতন অভ্যস্ত চোখের ভঙ্গী ক'রে বললেন, 'বাপু হে, এতকাল বিবাহিত জীবন-যাপন ক'রে এতগুলি পত্নীর সঙ্গে ঘর ক'রেও কি কোন শিক্ষা হয় নি তোমার? মেয়েদের মর্জির তল পেতে গেলে মেয়েছেলে হ'তে হয়—তাও মেয়েরাই মেয়েদের সব কথা বোঝে কিনা সন্দেহ। ওদের সব কার্যের কি যথাযথ কারণ খুঁজে পাও?...তবে তোমার আশঙ্কার কোন কারণ নেই, এক্ষেত্রে এই বিচিত্র অভিপ্রায়, এই আগমনের কারণটা আমি জানি। তোমার জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র স্বর্গত রাজাধিরাজের সঙ্গে ওঁর একটা বিশেষ সম্পর্ক ছিল—তা ভুলে গেলে?'

'সেই জন্যে এতকাল পরে—'

'হ্যাঁ, সেই জন্যে। সন্ন্যাসী শ্রমণদেরও শখ হয় মৃত্যুর পূর্বে একবার জন্মস্থান বা বাল্যের প্রিয় কোন স্থান দেখবার। এ সেই সাধপূরণেরই চেষ্টা। ...যাও যাও—সাদরে সাড়ম্বরে অভ্যর্থনা জানাও গে। পগান আমাদের মিত্র ও পৃষ্ঠপোষক রাজ্য, ওখানের রাজা অলাঙ্গসিথু-ও খুব মাতৃভক্ত শুনেছি। রাজমাতার প্রতি অসম্ভ্রম, অনাদর, অবহেলা—এমন কি ঔদাসীন্যও দেখানোর মানেই পগান রাজসভাকে বিদ্বিষ্ট ক'রে তোলা। এমন কাজও ক'রো না।'

বলভদ্রর অনুমান সত্য স্পর্শ ক'রে গেছে—তবু সম্পূর্ণ সত্যটা তিনিও জানেন না।

সেবন্তীর মনে একটি বাক্য, সকরুণ হতাশায় মাখা কয়েকটি শব্দের সমষ্টি—ইষ্টমন্ত্রের মতোই চিরস্মরণীয় হয়ে আছে, 'আমার বড় সাধ ছিল সেবন্তী, তোমাকে আমাদের দেশে নিয়ে যাব, আমার দেশের মাটিতে তুমি পা দেবে।' সেই স্খলিত ভগ্নকণ্ঠ, সেই বক্ষরক্ত-মন্থিত ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষার কথাগুলি—দৈববাণীর মতোই—আজও নিত্য কানে বাজে তাঁর।

মৃত্যুর পূর্বে দয়িতের সেই সাধ পূর্ণ করতেই এসেছেন তিনি। এই লক্ষ্যই তাঁকে তাঁর কূর্মের আবরণ থেকে, যোগিনী বা সাধিকার গুহা থেকে টেনে বার করেছে।

যোধমল্লদেব অবশ্য বলভদ্রর পরামর্শ উপেক্ষা করেন নি। অগ্রজের প্রিয় বন্ধু, এ রাজ্যের চিরহিতৈষী প্রবীণ অমাত্য—তাঁর কথার মূল্য রাজা বোঝেন। রাজা দাসদাসী খাদ্যসম্ভার পাঠিয়েছেন অতিথি সৎকারের জন্য ; বহু দূর থেকে বহু কষ্টে সংগৃহীত গঙ্গাজল—যদি পূজো দিতে লাগে—নিজে উপহার-স্বরূপ প্রণামী বস্ত্রাদি, প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য বৌদ্ধ পুঁথি, পূজোর অন্য উপকরণ নিয়ে গিয়ে দেখা করেছেন।

সসম্মানে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন রাজধানীতে পদার্পণের জন্য। আশ্বাস দিয়েছেন বার বার যে, দয়া ক'রে এলে প্রাসাদেও থাকতে হবে না, উদ্যানের মধ্যে একটি সদ্যনির্মিত গৃহ ছেড়ে দেবেন, রাজমাতা সেখানে আতিথ্য গ্রহণ করতে সম্মত হ'লে সেই গৃহে একটি বুদ্ধমূর্তিও স্থাপন করবেন।

সেক্ষেত্রে পগানের পুণ্যবতী রাজমাতার শুভ পদার্পণের স্মারক হিসেবে এ নবনির্মিত গৃহে স্থায়ী বুদ্ধমন্দির প্রতিষ্ঠিত করবেন রাজা।

সেবন্তী সম্মত হয়েছিলেন এ আতিথ্য নিতে।

শুধু দেশের মধ্যে যাবেন তাই নয়, প্রাসাদেও যাবেন তিনি, থাকবেন সেখানে এক সপ্তাহকাল। এ যাওয়া আজ খুবই বেদনাদায়ক—তবুও যাবেন, কর্তব্য পালন, স্মৃতি-তর্পণ হিসেবে।…

এলেনও তিনি।

আজও বুকের মধ্যে তাঁর এমন হাহাকার জাগা সম্ভব, এখনও এতখানি আঘাত অনুভব করার মতো অন্তরের অবস্থা আছে—এতদিনেও অসাড় পাষাণ হয়ে যায় নি, এখনও বহুদিনের-বসন্ত-বাতাসহীন-স্থির চিত্তসমুদ্রে এমন আলোড়ন উঠতে পারে, উত্তাল তরঙ্গ—এই ভেঙ্গে যাওয়া বুকেও এমন পিষে-যাওয়া মর্ম-বেদনা অনুভূত হয়—হ'তে পারে—এ তথ্য জানা ছিল না সেবন্তীর।

এ এক অভিনব অভিজ্ঞতা তাঁর।

রাজা যোধমল্লদেব অবশ্যই আদর-যত্নের কোন ত্রুটি রাখলেন না।

তিনি প্রায় নিত্যই যেতেন ওঁর কাছে—প্রণাম জানিয়ে কুশল প্রশ্ন ক'রে যেতেন।

সেবন্তীরও কিছু প্রশ্ন করার ছিল। করতে গেছেনও এ ক'দিন বার বার —কিন্তু পারেন নি। বহুকাল—দিন মাস বৎসর দশক—কয়েক যুগ ধরে এই প্রশ্ন মনে মনে জমে আছে। তবু কোথা থেকে রাশীকৃত লজ্জা ও সঙ্কোচ এসে করতে দেয় নি।

সে অনুচ্চারিত প্রশ্নের কিছু কিছু উত্তর নিজে থেকেই দিলেন যোধ-মল্লদেব। প্রসঙ্গত বা ইচ্ছে ক'রেই হয়ত প্রসঙ্গটা উঠিয়েছিলেন। তা থেকে যা সংগ্রহ করা যায়, আর দিলেন স্বর্গগত রাজার প্রিয় বয়স্য—প্রাক্তন অমাত্য একজন—বলভদ্রও। তিনিও এসেছিলেন দেখা করতে। এমন সময়ই এসে-ছিলেন যখন অন্য কোন দর্শনার্থী থাকবে না। আগেই নিভৃত-দর্শন প্রার্থনা জানিয়েছিলেন, সেই মতোই সময় নির্দেশ করেছিলেন রাজমাতা।

বলভদ্রকে চিনতে পারেন নি সেবন্তী। বলভদ্রই পরিচয় দিয়েছিলেন। নিজে থেকেই উত্থাপন করেছিলেন রাজা রণমল্লদেবের প্রসঙ্গ ।

পথের সম্বল একমাত্র আলো নিভিয়ে দিয়ে অন্ধকার পথে যাত্রা করলে যে অবস্থা হয়—সেই অবস্থাই নাকি হয়েছিল রণমল্লদেবের। জীবনপথে সর্বাধিক প্রয়োজন যে আলোটির—আশা-আনন্দের আলো—সেটি নিভে গিয়েছিল তাঁর। পগান থেকে দ্বিতীয়বারে রণমল্লদেব আর ফেরেন নি, ফিরেছিল একটা কঙ্কাল করোটি আর কিছু মাংসচর্ম।

এমন নিষ্প্রাণ, নির্জীব যে কোন মানুষ হয়ে যেতে পারে—মাত্র কয়েক-দিনে—তা তাঁকে সে অবস্থায় যে না দেখেছে সে বিশ্বাস করতে পারবে না।

সবচেয়ে প্রধান যে প্রশ্নটি সেবন্তীর ওষ্ঠে আবদ্ধ ছিল এতকাল, এরকম ক্ষেত্রে পৃথিবীর তাবৎ নারী যে উত্তরের জন্য আকুল হয়ে থাকে—সে উত্তরও দিলেন বলভদ্র। না, রণমল্লদেব বিবাহ করেন নি আর। বাঁচবারই কোন চেষ্টা করেন নি। বরং মনে হয়, সাধ ক'রে ইচ্ছা ক'রে মৃত্যুবরণ করার জন্যই এগিয়ে গেছেন বার বার—বিপদের মুখে, নিশ্চিত বিনাশের মুখে।

শুধু আত্মহত্যাটা করেন নি—কারণ শাস্ত্রে আছে আত্মহত্যা মহাপাপ। এ জন্মে এত জ্বলেছেন, মৃত্যুপারে গিয়েও অনন্ত নরকযন্ত্রণা আর সইতে রাজী ছিলেন না তিনি।

শেষে সেই ইচ্ছামৃত্যুই বরণ করেছেন বলতে গেলে। একটা যুদ্ধের সময়—জেনে বুঝেই—একা এগিয়ে গেছেন শত্রুর ব্যূহমধ্যে, কালান্তক যমের মতো শত্রুকে সংহার করেছেন ঠিকই—কিন্তু চারিদিকে যার শত শত সশস্ত্র শত্রু সে একা কতক্ষণ যুঝতে পারে?···সেইখানে স্বেচ্ছায় প্রাণ দিয়েছেন তিনি, বীরের মৃত্যু বরণ করেছেন। এমনভাবেই নিজের অনুচরদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন—যাতে তারা বিপদ বুঝে কাছে পৌঁছবার আগেই তাঁর অভিলাষ পূর্ণ হয়, আত্মহত্যার অভিলাষ।

পাষাণ-প্রতিমার মতোই বসে শুনেছেন রাজমাতা এ কাহিনী। কিছু যোধমল্লদেবের মুখে, কিছু বলভদ্রর মুখে। বলভদ্রর মুখেই বেশী। এত কথা যোধমল্লদেব জানেন না—বলভদ্র যতটা জানেন, পূর্বাপর সমস্ত ইতিহাস।

শুধু বলভদ্রর মুখে সেই স্বেচ্ছায় 'বীরের মৃত্যু' বরণ করার পুঙ্খানুপুঙ্খ ইতিহাস শুনতে শুনতে—ঘোড়া থেকে পড়ে যাওয়ার পরও কিভাবে শত্রুরা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করেছে ওঁর মৃতদেহের ওপর, ওঁর স্বপক্ষীয় সৈন্যবাহিনী পৌঁছবার আগে—সে প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ সমাপ্ত হবার আগেই অকস্মাৎ উঠে পাশের ঘরে চলে গেছেন সেবন্তী, কোন কারণ কি বিদায়-সম্ভাষণ না জানিয়েই।

বলভদ্র অর্ধদণ্ডকাল নীরবে বসে থেকে উঠে চলে এসেছেন। তিনিও বোধ করি এই আপাত-অশিষ্ট আচরণের জন্য কোন কারণ, কৈফিয়ৎ বা ক্ষমা-প্রার্থনা আশা করেন নি। এই সৌজন্য প্রকাশ না পেলেই বোধ হয় তিনি মনঃক্ষুণ্ণ হতেন।

তিনি নিশ্চিন্ত হয়েই উঠে এসেছেন। তাঁর কর্তব্য সমাপ্ত হয়েছে—বলতে গেলে যেজন্য এতকাল অপেক্ষা করেছেন। কোথায় বলভদ্রের মনের মধ্যে ধ্রুব-ধারণা ছিল যে, এ কথাগুলো একদিন তাঁকে বলতেই হবে—পগানের রাজপুত্রী—বর্তমান রাজমাতার কাছে।

আরও একটি স্বেচ্ছাবৃত দায়িত্ব ছিল তাঁর। মৃত রণমল্লদেবের অনামিকা থেকে ওঁদের ইষ্টদেবীর মূর্তি অঙ্কিত মাণিক্য-অঙ্গুরীয়ক খুলে রেখেছিলেন বলভদ্র নিজের কাছে। কেউই জানত না, সে শোকের সময় তাঁর পরিচ্ছদ কি আবরণ নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় নি—পরনে বা ছিল সবসুদ্ধই চিতায় তুলেছে তাঁর প্রিয় প্রজা-বন্ধু-অমাত্য-আত্মীয়গণ। হাতে আংটি ছিল কিনা, থাকে কিনা সাধারণত—কারও মনেও পড়ে নি।

সেই আংটিটি আজ এসে সেবন্তীকে দিয়ে গেলেন, দিয়ে গেলেন একটি সংবাদও সেই সঙ্গে—সেদিন, শেষ যেদিন দেখা হয় সেবন্তীর সঙ্গে, সেদিন রণমল্লদেব এই আংটিটি ওঁকে দিয়ে আসবেন, এইরকম নাকি ইচ্ছা ছিল। শেষমুহূর্তে দিতে পারেন নি—সে আংটি পরে থাকতে পারবেন না সেবন্তী এই আশঙ্কায়। কিন্তু পরে নাকি বার বার কথাটা বলেছেন বলভদ্রকে, ঈষৎ ক্ষোভের সঙ্গেই। সেই আংটিটি সংগ্রহ ক'রে রেখেছিলেন বলভদ্র—এতদিনে তা যথাস্থানে পেঁছে দিয়ে দায়মুক্ত হলেন।

॥ ১১ ॥

কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে কিনা—সেবন্তী তা জানেন না, যোধমল্লদেব তাঁর তিনটি অনূঢ়া কন্যাকে নিয়ে একদিন দেখা করতে এলেন।

বললেন, 'ওদের প্রণাম করাতে নিয়ে এলাম। আপনি ওদের গুরুজন, আশীর্বাদ করুন—সুপাত্রে পড়ুক।'

সাধারণভাবেই মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করছিলেন, কিন্তু কনিষ্ঠাটির মুখের দিকে চেয়ে সেবন্তীর হাত উঠেই রইল, কন্যাটির মাথাতে আর নামল না। অপলকনেত্রে চেয়ে রইলেন তার মুখের দিকে।

যোধমল্লদেবের সঙ্গে তাঁর জ্যেষ্ঠের সাদৃশ্য অবশ্যই আছে আকৃতিতে ও মুখাবয়বে—কিন্তু এখন প্রবীণ বয়সে সে সাদৃশ্যও কতকটা কল্পনাসাধ্য, অনেকখানিই বদলে গেছে, রণমল্লদেবের চেহারা এই বয়সে পেঁছিলে এরকম দাঁড়াত কিনা তা বলা কঠিন।

এই মেয়েটির কিন্তু আশ্চর্য সাদৃশ্য তার জ্যেষ্ঠতাতের সঙ্গে। সেই মুখ অবিকল—এক ছাঁচে ঢালা যেন।

যে ডৌল পুরুষের মুখে অপূর্ব সুন্দর, তা হয়ত মেয়েদের মুখকে যথেষ্ট রমণীয় ক'রে তোলে না—তবে সে অন্য কথা। সেবন্তী দেখছিলেন সেই মুখ, সেই হাসি, কথা বলার ভঙ্গীটি পর্যন্ত অবিকল সেই।

অনেক, অনেকক্ষণ নির্নিমেষ ও সতৃষ্ণনেত্রে চেয়ে থাকবার পর সস্মিত

ফিরল তাঁর। মনে পড়ল এভাবে একজনের দিকে চেয়ে থাকা খুবই অশোভন
—এ থেকে নানা অপ্রিয় আলোচনারও সৃষ্টি হ'তে পারে। তিনি একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে আত্মসম্বরণ ক'রে মেয়েটিকে আশীর্বাদ করলেন।

তারপর কিছু সৌজন্যমূলক কথাবার্তার পর মেয়ে তিনটি চলে গেলে হঠাৎ এফ অদ্ভুত প্রস্তাব ক'রে বসলেন রাজমাতা।

এ রকম করার কথা নয়।

এ তাঁর স্বভাববিরুদ্ধই। সেবন্তী চিরকালই ধীর স্থির। দীর্ঘকাল রাজ্য-পরিচালনার ব্যাপারে সক্রিয়ভাবে সংযুক্ত থাকার জন্যই এ শিক্ষাটি আরও পেয়েছেন—হঠকারিতা নির্বুদ্ধিতারই নামান্তর।

এ থেকে বহু বিপদ আসতে পারে, যারা সমাজের শীর্ষস্থানীয়, যাদের কর্মের বহুদূরপ্রসারী এবং স্থায়ী দায়িত্ব আছে, তাদের বিশেষ ক'রে—আবেগের বশে অকস্মাৎ কোন কাজ করতে নেই।

কিন্তু আজ সেবন্তীও মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হলেন—বয়সের জন্যই আরও বোধ হয়, অথবা দীর্ঘকাল চিত্তপীড়ন করার ফলেই—নিজের ওপর সে কর্তৃত্ব আর নেই। মন বুদ্ধি-বিবেচনার আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে।

এই মেয়েটিকে দেখে তাঁর এমনই একটা আলোড়ন দেখা দিয়েছে মনে, আবেগের প্রবল বান ডেকেছে, কোন্ দূর কণ্টকর স্মৃতি সেদিনকার সেই প্রথম যৌবনের চিত্তবিক্ষিপ্ত এনেছে যে—আর কিছু ভাববার বা ভেবে দেখবার কথা মনেও এল না। রাজমাতা একটু যেন ইতস্ততঃ ক'রে বললেন, 'সুপাত্র কিনা জানি না—আপনার ঐ কনিষ্ঠা কন্যা—কী যেন বললেন, তারা দেবী ?—ওর একটি পাত্র দিতে পারি এখনই।'

বলে কেমন একটু যেন উৎসুকভাবে, এ পক্ষ থেকে প্রত্যাখ্যানের আশংকায়, ভয়ে-ভয়েই চেয়ে রইলেন।

যোধমল্লদেব কিন্তু খুব উৎসাহিত হয়ে উঠলেন।

'তাহলে তো আমি বেঁচে যাই আর্যা, এখনও একজনকেও পাত্রস্থ করতে পারলাম না, এ যে আমার কী দুশ্চিন্তা, কাউকে বোঝাতে পারব না।··· বয়স হয়ে গেল অনেক—। আপনি দয়া ক'রে বলুন কে সে পাত্র ; আপনি যখন বলছেন নিশ্চয়ই সুপাত্র—কী ক'রে তাঁর কাছে কন্যাদায়ের প্রার্থনা জানাব, কী ভাবে যোগাযোগ হবে—সেটাও যদি অনুগ্রহ ক'রে বলেন—'

'পাত্র আমার পুত্র, অরিমর্দনপুরের মহারাজ-চক্রবর্তী—অলাঙ্গসিথু জয়সুর। তার জন্য তার হয়েই আমি আপনার ঐ কনিষ্ঠা কন্যাটি প্রার্থনা করছি।' শান্তভাবে উত্তর দিলেন সেবন্তী।

অলাঙ্গসিথু এখন প্রায় প্রৌঢ়, তারা দেবীর বয়স খুব বেশী হ'লেও সতেরো-আঠারো। কিন্তু তখন, বিশেষ রাজকন্যাদের বিবাহে, এসব ব্যবধান কোন বাধা বলে গণ্য হ'ত না কোন দেশেই। রাজকন্যাদের বিবাহ স্থির হ'ত রাজ্য ও রাজার সুবিধা-অসুবিধা বিচার ক'রে—অনেক সময়ই উপঢৌকন

বা পণ্য হিসাবে কন্যারা প্রেরিত হতেন বহুদূরে রাজসভায়—সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, অপরিচিত মানুষদের মধ্যে—কখনও বা উৎকোচ হিসেবে, সন্ধির সময় বিজয়ী পক্ষের ক্ষতিপূরণ হিসেবে।

যোধমল্লদেবও নিজেকে কৃতার্থ মনে করলেন।

এত বড় দেশের রাজা—একচ্ছত্র ও সার্বভৌম—স্বেচ্ছায়, অন্য কারণ ব্যতিরেকেই তাঁর কন্যাকে নিতে চাইছেন—এ তো সত্যই পরম ভাগ্যের কথা। তিনি আন্তরিক ভাবেই বললেন, 'সে তো আমার সৌভাগ্য দেবী। আমার, আমার কন্যার, আমার বংশের। যদি দয়া ক'রে পগনাধিপতি আমার কন্যাটিকে গ্রহণ করেন—আমি যথার্থ উপকৃত ও অনুগৃহীত হব।'

সেবন্তী এ সম্মান তাঁদের প্রাপ্য হিসেবে—সহজেই গ্রহণ করলেন। স্মিতমুখে বললেন, বোধ করি দীর্ঘকাল পরে এই প্রথম তাঁর মুখ প্রসন্ন দেখাল, 'বহুকাল পূর্বে আপনারা আমাদের দেশের কন্যা প্রার্থনা ক'রে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন, তারই কিঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে, আমি আপনাদের কাছ থেকে কন্যা প্রার্থনা ক'রে নিয়ে গেলাম।'

যোধমল্লদেব সুখী ও নিশ্চিন্ত হলেন। তবু পরের দিন একবার—বোধকরি মহিষীর পীড়াপীড়িতেই—বলতে গিয়েছিলেন, 'তা আমার জ্যেষ্ঠা দুহিতাও তো রয়েছেন, তিনিই সনধিক সুন্দরী বলে খ্যাত, ইচ্ছে করলে তাঁকেও নিতে পারেন—'

সেবন্তী তাঁর অভ্যস্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে উত্তর দিয়েছিলেন, 'না, আমার ঐ কনিষ্ঠাটিকেই নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা।'

এরপর আর কথা চলে নি।

তত্রাচ তার দু'দিন পরে স্বয়ং মহিষী এসে আকারে-ইঙ্গিতে একথাও জানিয়েছিলেন যে, তিনটি কন্যাকে দিতেও আপত্তি নেই তাঁর—যদি এঁরা দয়া ক'রে গ্রহণ করেন। কিন্তু সেবন্তী সে ইঙ্গিত বোধ করি ইচ্ছাপূর্বকই বুঝতে পারেন নি।

তারাকেই প্রয়োজন তাঁর। কী প্রয়োজন তা আর কাউকে বোঝানো যাবে না, হয়ত তিনি নিজেও বোঝেন না।

স্থির হ'ল রাজমাতা পগান অভিমুখে যাত্রা করার ঠিক দুই মাস কাল পরে রাজা তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র ও পুরোহিতের সঙ্গে তারা দেবীকে প্রেরণ করবেন। এখান থেকে পাত্রীকে নিয়ে যাওয়ার জন্য পগান রাজসভাই শিবিকা, হস্তী ও রক্ষী ইত্যাদি পাঠাবেন । তার যাবতীয় ব্যয়ভার ও দায়িত্ব তাঁদেরই।

সেবন্তী জানতেন না, তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি, তাঁদের জীবনে যে মর্মান্তিক বিচ্ছেদযন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে, তিনটি জীবন নিয়ে যে বিয়োগান্ত নাটক রচনা করেছে তাঁদের ভাগ্য—তিনি অজ্ঞাতসারে তারই এক পুনরাভিনয়ের ব্যবস্থা ক'রে গেলেন।

রাজকন্যা তারা দেবীরও এদেশে একটি বন্ধন ছিল।

অতি কোমল, অতি সূক্ষ্ম সে বন্ধন, অতিশয় ভীরু সে প্রেম।

এতকাল হয়ত তার বেশিটাই ছিল অবচেতনে, মর্মের গোপন একটি স্থানে, কিন্তু ছিল।

সেই বন্ধন ছিঁড়ে তাকে নিয়ে গেলেন সেবন্তী আরও দুই জীবনে বিয়োগান্ত নাট্যের সৃষ্টি ক'রে।...

রাজকন্যাদের মধ্যে এই কনিষ্ঠাটিরই পাঠে কিছু মনোযোগ ছিল। রাজা সেজন্য এটিকে একটু বিশেষ স্নেহের চোখে দেখতেন। ইচ্ছামতো উচ্চশিক্ষার সুযোগ যাতে সে পায় তারও ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলেন।

প্রধান রাজপুরোহিত পণ্ডিত ব্যক্তি, তাঁর নিজের বাড়িতে চতুষ্পাঠী আছে—তিনিই পড়াতেন তারা দেবীকে।

সেই সূত্রেই পরিচয় পুরোহিত-পুত্র তিলকের সঙ্গে।

তিলক শিক্ষায় অনেক অগ্রসর হয়ে গিয়েছিল এই বয়সেই—প্রায় একই বয়সী ওরা, তারা দেবীর চেয়ে হয়ত বছর দুইয়ের বড় হবে—পুজাপাঠেও বিশেষ দক্ষ। প্রাসাদের নিত্যকার পুজায় অনেক সময় তিলককেই পাঠাতেন পুরোহিত শঙ্করানন্দ, আর সেই সময়ই ব্যাকরণের পাঠ থাকলে তারাকে পড়িয়ে যেতে বলতেন।

ব্যাকরণে তিলক তার পিতার থেকেও অনেক বেশী অগ্রসর—এ বিষয়ে সহজ দক্ষতা ছিল তার। ক্রমে ব্যাকরণের সঙ্গে কাব্যও যোগ হয়েছিল। শুধু দর্শন আর স্মৃতিটা পুরোহিত রেখেছিলেন নিজের হাতে—সেই সঙ্গে কিছু ইতিহাস এবং গণিতও।

এইটুকু পরিচয় ঘনিষ্ঠতা পাঠচর্চার সময় যেটুকু।

প্রণয়ের কথা কেউ মুখে উচ্চারণ করে নি, আড়ালে-ইঙ্গিতেও জানায় নি পরস্পরকে, মানে ইচ্ছা ক'রে জানায় নি।

তবে এসব কথা অনেক সময় অকথিত থেকেও বলা হয়ে যায়।

চোখের দৃষ্টিতে উপচে পড়ে।

অতর্কিতে হাতে হাত ঠেকলে—পুঁথির পাতা ওল্টাবার সময়, অথবা ভূর্জপত্র কি তালপত্রে লেখার সময়—আঙুলে আঙুলে বিদ্যুৎ খেলে যায়, সর্বাঙ্গে পুলকশিহরণ ঘটে, কর্ণকপোল আরক্ত হয়ে ওঠে, ললাটের প্রান্তে কণ্ঠে স্বেদসঞ্চার ঘটে।

এইটুকু, এর বেশী নয়।

আসক্তি বা অনুরাগ—আসক্তির স্তরে তখনও বোধ করি পৌঁছয় নি ওদের গোপন ভীরু প্রেম—যা কিছু ছিল মনের গভীরে।

তিলে তিলে সঞ্চয় হয়েছিল তা, তিলে তিলে বেড়েছে।

এটুকু হ'তে বাধ্য।

তরুণ প্রিয়দর্শন তিলক পুজান্তে ললাটে বক্ষে চন্দনচিহ্ন ধারণ ক'রে কৌষেয়বস্ত্রে যখন শিক্ষকের আসনে এসে বসত—তখন তারা দেবীর মনে হ'ত বালার্কের আবির্ভাব ঘটল।

আর কিশোরী তারা দেবীর পবিত্র, নিষ্পাপ, শেফালি পুষ্পের মতো নির্মল কোমল মুখের দিকে চেয়ে ঈষৎ আরক্ত, স্বেদবিন্দু-বিজড়িত-কেশ-ললাটের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে—তিলকেরও ব্যাকরণ-সূত্র ভুল হয়ে যেত মধ্যে মধ্যে।

ইদানীং দুজনেই দুজনকে দেখে একটু উত্তেজিত, একটু চঞ্চল বোধ করত—সে-চাঞ্চল্য ঢাকতে অকারণ ব্যস্ততার আশ্রয় নিত, তাতেই ভুল হ'ত আরও।

কিন্তু সে অব্যক্ত প্রেম—সর্বনাশের মুখে, চিরবিচ্ছেদের চিরবিরহের সম্ভাবনার সামনে দাঁড়িয়ে আর অব্যক্ত নীরব রইল না।

প্রাসাদে যেদিন ঘোষিত হয়ে গেল তারা দেবীর শুভ-বিবাহ-সংবাদ, নির্ধারিত যাত্রার দিনটিও বিজ্ঞাপিত হ'ল—সেদিন আর নির্দিষ্ট সময়ে তিলক ওদের পাঠকক্ষে এল না। পূজা সমাপন ক'রে সোজা বাড়ি চলে গেল।

মন্দিরের পাশেই সার সার তিন-চারটি পাঠকক্ষ, রাজপুত্র রাজকন্যাদের জন্য—তার মধ্যে বেশির ভাগই খালি পড়ে থাকে, শুধু তারা দেবীই নির্দিষ্ট সময়ের বহু পূর্বে থেকে এসে পুঁথিপত্র সাজিয়ে বসে থাকে। সেদিনও ছিল, যদিচ পুঁথির একটি অক্ষরও পড়া যায় নি—নিরুদ্ধ চোখের জলে দৃষ্টি ঝাপ্সা হয়ে যাচ্ছিল বার বার—না হ'লেও, সেদিন কোন কাব্যের কোন শ্লোকেরই অর্থ বোধগম্য হবার মতো মানসিক অবস্থা নয় তার—কিন্তু তিলক এল না।

ঘরের পাশ দিয়েই চলে গেছে সম্ভবত, তবু এদিকে আসে নি।

কুলদেবতার মন্দিরে অর্চনার শব্দ নীরব হয়ে যাওয়ার বহুক্ষণ পরে সচেতন হয়ে উঠল তারা দেবী, তখন খোঁজ ক'রে শুনল, পূজাপাঠ শেষ ক'রে তিলক চলে গেছে অন্তত দুই দণ্ড আগে।

পরের দিন প্রত্যূষে দাসী পাঠাল তারা। আজ যেন তার অধ্যাপক নিশ্চয় আসেন, খুব জরুরী একটা প্রয়োজন আছে, একটা শ্লোকের অন্বয় করতে পারছে না কিছুতেই।

অগত্যা আসতে হ'ল তিলককে।

শুষ্ক ম্লান মুখ তার, ক্লান্ত অবসন্ন দৃষ্টি। অপরিসীম অন্তর্বেদনার চিহ্ন প্রতিটি কথার ভাবে, দেহের ভঙ্গিতে।

আসন গ্রহণ ক'রেই তিলক প্রশ্ন করল, বিষণ্ণ গম্ভীর কণ্ঠে, 'কৈ, কী শ্লোক দেখি—'

সে কথার উত্তর দিল না তারা। আজ আর তার শান্ত নম্র শ্রদ্ধানত ভাবটি নেই।

নেই কোন লজ্জাজড়িত সঙ্কোচও।

চরম সর্বনাশের সামনে ভীরু শশকও সাহসী নির্ভীক হয়ে ওঠে। সে বলল, 'কাল এলে না কেন?'

তিলক মাটির দিকে চোখ রেখে উত্তর দিল, 'শরীর ভাল ছিল না।'

'মিছে কথা।' শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলল তারা।

নিমেষে মুখ অরুণ-বর্ণ হয়ে ওঠে তিলকের। শ্রান্ত দৃষ্টিতে বিদ্যুৎ ঝলকে যায়।

সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু আত্মসম্বরণ করে। বলে, 'সম্পূর্ণ মিছে কথা নয়। অসম্ভব ক্লান্তি বোধ করছিলুম। সহসা জীবন উদ্দেশ্যহীন হয়ে পড়লে যেমন ক্লান্তি বোধ করে মানুষ।...কিন্তু সে কথা থাক—তোমার জীবনের নৌকো নতুন লক্ষ্যে যাত্রা করছে, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি সৌভাগ্যের তীরেই ভিড়ুক সে তরী—সুখ সমৃদ্ধি আনন্দের তীরে। আমাদের কথা আর চিন্তা না করাই ভাল।'

তারা একটুখানি চুপ ক'রে থেকে আস্তে আস্তে বলে, 'আমার অদৃষ্ট মন্দ, সে কি আমার অপরাধ?'

'মন্দ!' সত্যিই চমকে ওঠে তিলক, 'কী বলছ তারা, এতবড় রাজ্যের মহিষী হ'তে চলেছ—তুমি কি এ সৌভাগ্যে আনন্দিত নও?'

'কিসের মহিষী? বহু স্ত্রীর একজন। নবতমা—এই মাত্র বলতে পারো। শুনেছি রাজা বার্ধক্যের কোঠায় পা দিতে যাচ্ছেন, উপযুক্ত পুত্র আছে তাঁর। সে-ই সিংহাসনের ভাবী অধিকারী। এ যাওয়া কি সুখের যাওয়া? আমার সেখানে কি মর্যাদা—রক্ষিতা না হয়ে বিবাহিতা স্ত্রী, এর বেশী কিছু নয়।'

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইল তিলক, তার পর বলল, 'তোমার বাবা জানেন এসব কথা?'

'জানেন বৈকি। তিনি না জানলে আমি কার কাছ থেকে জানব?'

'তবু পাঠাচ্ছেন? জেনেশুনেও?'

'তিলক, যেদিন থেকে রাজার ঘরে জন্মেছি, সেদিন থেকেই জানি—মানে একটু জ্ঞান হবার পর থেকে যে—আমরা বোঝা মাত্র, ফেলে রাখা পণ্য। রাজা তাঁর সুযোগ-সুবিধা মতো সে বোঝা হালকা করবেন। সম্ভব হ'লে তার বিনিময়ে কিঞ্চিৎ সুবিধা-সুযোগ আদায় করবেন। অতি বৃদ্ধ কেন, শ্মশান-যাত্রী বা কোন প্রবল দস্যুর হাতে নিক্ষিপ্ত হ'লেও আমাদের বিস্মিত হ'তে, প্রশ্ন করতে বা দুঃখিত হ'তে নেই।'

চুপ ক'রে থাকে তিলক। মনে হয় ক্রমেই অবসন্ন হয়ে পড়ছে সে।

যতক্ষণ, ক্ষতিবোধ করার কারণ কেবলমাত্র যা কিছু ওরই ঘটেছে—আহত পক্ষ একমাত্র ও-ই—এই বোধটা ছিল, তখন এতখানি শূন্যতা অনুভব করে নি—বুকের মধ্যে এতটা কষ্ট।

অকস্মাৎ তিলকের মনে হ'ল পায়ের নিচে মাটি সরে যাচ্ছে তার। এ কি হ'ল—দুঃখিত হবার, অভিমান করার মতো অবলম্বনটুকুও রইল না তার!

'তিলক!' আস্তে ডাকে তারা।

তিলক চেষ্টা ক'রে চোখ তুলে চায় তার দিকে।

'তুমি কি আমার এই সর্বনাশা যাত্রাকে দুঃসহতর ক'রে তুলতে চাও?'

'না না, ছিঃ! এসব কথা কেন বলছ তারা?'

'তবে তুমি কাল আস নি কেন? আজও তো বোধ হয় আসতে না আমি

না ডেকে পাঠালে!'

'আর আমার আসার কি প্রয়োজন—আর তো পড়াশুনো হবে না—এই ভেবেই আসি নি।'

'এখনই তো প্রয়োজন বেশী তিলক; অন্ধকার ভবিষ্যতের পথে যাত্রা করছি; বিদেশ, বিজাতীয়র দেশ সেটা। তাদের শিক্ষাদীক্ষা ধর্ম সব আলাদা—এমন কি খাদ্যও। আমি তাদের ভাষা জানি না—শুনেছি ওদেশের খুব শিক্ষিত দু'চারজন সংস্কৃত কি প্রাকৃত ভাষা জানে—তাঁদের সঙ্গে ছাড়া কারও সঙ্গে কথাও বলতে পারব না। এ সময় তুমি ছাড়া আমার আর কে আছে, কে পাশে এসে দাঁড়াবে, কে একটু অভয় একটু সান্ত্বনা দেবে?··· তুমিও আমার অলীক অস্তিত্বহীন সৌভাগ্যে ঈর্ষিত হয়ে দূরে সরে রইলে!'

'ঈর্ষা! ছি ছি! তোমাকে যেদিন ঈর্ষা করব—জেনো তার আগে বৈদ্য ডেকে আমার মাথার চিকিৎসা করাতে হবে।'

'তবু তো সংবাদ শোনা মাত্র আমাকে ত্যাগ করলে।'

'ত্যাগ না তারা।' উত্তেজিত প্রতিবাদ করে না, ধীর বিষণ্ণ গভীর স্বরে উত্তর দেয় তিলক, 'এসব কথা বলা উচিত নয়, এসব কথা ভাবাও অন্যায়—কোন আশা কোথাও ছিল না—তবু আজ কথাটা স্বীকার করছি তারা, তুমি এখান থেকে চলে গেলে আমার জীবনে আশা আনন্দ আশ্রয় বলতে কিছু থাকবে না। জীবনটাই অর্থহীন হয়ে যাবে।···প্রথম যেদিন এটা বুঝেছিলুম সেদিনই দূরে সরে যাওয়া উচিত ছিল, পারি নি—সেটা আমার অপরাধ হয়েছে। তবু কোথায় একটা সূক্ষ্ম আশা ছিল। যদি এদেশের মধ্যে কোথাও তোমার বিবাহ হয়—কোন দিন কোন উপলক্ষে হয়ত দূর থেকেও তোমাকে দেখতে পাব। তুমি কুশলে আছ সুখে আছ জেনে সুখী হব। কিন্তু এ এমন জায়গায় যাচ্ছ—জীবনে হয়ত আর কোন দিনই দেখতে পাব না, একটা খবরও পাব না।···সেই জন্যই আঘাতটা এত নিদারুণ বেজেছে, এত শূন্যতা বোধ করছি। কাল এলে পড়ানো দূরের কথা, তোমার সঙ্গে কথাই কইতে পারতুম না।'

তারপর, একটু থেমে আবারও বলে, 'তবু এতকাল এইটে জানতুম, ধারণা হয়ে গিয়েছিল কেমন ক'রে যে, শান্তি না হোক সৌভাগ্যর মধ্যে যাচ্ছ। অতবড় রাজার মহিষী হ'তে যাচ্ছ। তুমি তোমার প্রাপ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হ'লে। নিজের অভাববোধ ক্ষতিবোধ যতই হোক—তুমি সুখী হবে, প্রতিষ্ঠিত হবে, এ একটা আশা ছিল। তখন এত কথা ভেবে দেখি নি। রাজার এত বয়স তাও জানতুম না, স্বার্থপর মন নিজের আঘাত নিয়ে ক্ষতি নিয়েই অকারণ অভিমানের জগৎ সৃষ্টি ক'রে নিয়েছিল। এখন আর তাও রইল না। তুমি এ কথাগুলো না শোনালেই বোধ হয় ভাল করতে তারা।'

মাথা নত ক'রে বসে থাকে তারা। তারও কথা কইবার সাধ্য নেই তখন। চোখ তুলে চাইবারও না, তার এতক্ষণের প্রাণপণে চেপে থাকা অশ্রু যেন বাঁধ ভেঙ্গে কপোল বক্ষ প্লাবিত করছে।

তিলকও মাথা নিচু ক'রে বসে ছিল বলে প্রথমটা টের পায় নি। অনেকক্ষণ অপর পক্ষকে নির্বাক দেখে একটু একটু ক'রে তারার দিকে চোখ তুলতে প্রথমেই চোখে পড়ল কোলের ওপর রাখা দুটি হাত ওর জলে ভাসছে, আর একটু পরে দেখতে পেল সেই দু'কূলপ্লাবী বন্যা।

সমস্ত মন প্রবল আলোড়নে দুলে কেঁপে উঠল তার, দুই চোখের সামনে সমস্ত সৃষ্টি যেন বিবর্ণ একাকার হয়ে গেল—সেই সময়টুকুর জন্য উভয়ের পদমর্যাদা ও সম্পর্কের দুস্তর ব্যবধানও মনে রইল না,—এতকাল যা কখনও করে নি, করতে সাহস করে নি, আজ তাই করল—দু'হাতে চিবুকটি ধরে মুখখানা উঁচু ক'রে ধরল রাজকন্যার। তারপর অশ্রুবিকৃত গাঢ় স্বরে বলল, 'আর আমার না আসাই ভাল তারা, এ যন্ত্রণা তোমার আমি সইতে পারব না ...তবে আজ এসে ভালই করেছি—আমার বাকী জীবনের পাথেয় আমি পেয়ে গেলাম—আমার ভালবাসার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিদান তোমার এই চোখের জল। আর আমার কোন শূন্যতাবোধ রইল না। এই স্মৃতিটুকু অবলম্বন ক'রে তোমার কথা চিন্তা ক'রে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারব।'

'আর আমি?' রোদনরুদ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করে তারা, 'আমি কি নিয়ে থাকব?'

'তুমি আর পিছনের দিকে চেয়ো না তারা, সামনের দিকেই চাও। তুমি রাজকন্যা, তোমার এ ভাগ্য তো তুমি জানই। যেখানে যাচ্ছ সেখানে তোমার ব্যবহারে, স্বভাবমাধুর্যে শ্রেষ্ঠ আসনটি লাভ করো—এই আশীর্বাদ করছি। তুমি সীতা-সাবিত্রী-দময়ন্তী, তুমি মহামায়া উমার দেশের মেয়ে—স্বামী-প্রেমে সব গ্লানি, সব ক্ষতি, সব অতৃপ্ত বাসনা—সেই সঙ্গে আমার স্মৃতিও ভুলে যাবে—যেন ভুলে যেতে পারো—আজ থেকে পূজার পর নিয়ত এই প্রার্থনাই করব।'

কথা শেষ ক'রে তিলক একেবারে উঠে দাঁড়ায়।

যেতে যেতে ফিরে দাঁড়িয়ে শুধু বলে, 'আমার কাছে কয়েকটি যা ভাল পুঁথি আছে দিয়ে যাব একদিন, সঙ্গে নিয়ে যেয়ো—তোমার বিবাহে আমার উপহার।'

'না না, তিলক।' সহসা ব্যাকুল হয়ে ওঠে তারা, 'না না, ঠিক তার উল্টোটাই করতে চাই আমি। এসবের কোন মূল্যই সেখানে হবে না, এসব পুঁথি নিয়ে গেলে তারা তাচ্ছিল্যের চোখে দেখবে। সেখানে পড়ার মতো বই মানেই শুনেছি বৌদ্ধ-শাস্ত্রগ্রন্থ। আমি এসব—আমার যা আছে—পুঁথিপত্রও তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব—তুমি রেখে দিও, আমার স্মৃতি। তুমি যদি কখনও কোন দিন কোন পুঁথি পড়ো কিম্বা আমার কোন ভাষ্য সংশোধন করো—আমি আমার দেহের রোমাঞ্চে তা টের পাব তিলক।...যেদিন ওখানে পশ্চিমা বাতাস বইবে, মনে হবে এই বাতাস তোমাকে স্পর্শ ক'রে সেখানে যাচ্ছে, সেদিন বাইরের বাতায়নপথে মাথা পেতে নেব সে বাতাস—তোমার আশীর্বাদ বলে।'

তিলক আর সহ্য করতে পারল না, দু'হাতে কান ঢেকে দাঁড়াল, মনে হ'ল এ কারো প্রেমের বাণী নয়, অন্তর-মথিত করা সুধারস নয়—এ যেন গলিত সীসার মতো, তীব্র বিষের মতো কি কানে ঢুকছে।

কিন্তু তারার কথা তখনও শেষ হয় নি। আরও বাকি আছে।

সে এবার কাছে এসে দাঁড়াল। স্বেদ-অশ্রুতে মাথা ঈষৎ কম্পিত একখানি হাত তিলকের বুকে রেখে বলল, 'আর—যেদিন শুনবে তোমার তারা মৃত্যু-শয্যায় কি মরেই গেছে, সেদিন একবার ওখানে যেয়ো। পথ যত দুর্গম যত কণ্টকরই হোক, যেয়ো একবার, লক্ষ্মীটি। যদি মরার পর পে'ছিও তবে একবার চিতাভূমি কি সমাধিভূমিতে—জানি না তো ওরা দাহ করে, না সমাধি দেয়—গিয়ে দাঁড়িও। একবার আমার নাম উচ্চারণ করো, একবার ডেকো আমার নাম ধরে। মাটিতে লিখো নিজের হাতে আমার নাম। সেইটুকু শোনবার আর দেখবার জন্যে আমার আত্মা অপেক্ষা করবে।'

আর দাঁড়াল না তিলক। দাঁড়াতে পারল না। বক্ষে এক বহু অভীপ্সিত দুর্লভ স্পর্শ উপভোগ করার জন্যও না। একরকম ছুটে পালিয়েই গেল সে—এই কিশোরী কন্যার অতি সুখকর সান্নিধ্য থেকে।

॥ ১২ ॥

মহারাজ-চক্রবর্তী অলাঙ্গসিথু জয়সুর বা জয়সূর্য কিছুক্ষণ শুধু মায়ের মুখের দিকে চেয়েই রইলেন নীরবে—কোন বাক্যস্ফূর্তি হ'ল না তাঁর।

তারপর অবশেষে যখন কথা বলার মতো অবস্থা ফিরে এল—বললেন, 'কী বলছেন মা, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না! ভুল শুনছি, না আমার মাথারই গোলমাল হ'ল—সেইটেই ভাবছি শুধু।'

রাজমাতা সেবন্তীর চিরবিষণ্ণ মুখে—হর্ষ নয়—ইদানীং গত কয়েকদিন একটা বিচিত্র দীপ্তি দেখা দিয়েছে যেন, পট্টিকেরা থেকে ফেরবার পর, মনে হচ্ছে যেন প্রগাঢ় অন্ধকারে তাঁর মন নূতন কোন আলো দেখতে পেয়েছে, মহা-শূন্যতার মধ্যে ঈষৎ একটু অবলম্বন। তার ফলে পূর্বের কর্তৃত্বের ভাবটাও যেন ফিরে এসেছে একটু।

তিনি পুত্রের প্রশ্নে তাই একটু ভ্রূকুটি ক'রেই উত্তর দিলেন—এ ভ্রূকুটিও তাঁর পক্ষে একেবারে নূতন—'কেন, না বোঝার মতো জটিল বা দুর্বোধ্য কিছু বলেছি নাকি? তোমার আর একটি বিবাহ দিতে চাই, পাত্রী আমি নিজেই দেখে পছন্দ ক'রে তাঁদের পাকা কথা দিয়ে এসেছি। এর মধ্যে কোন্ কথাটা বুঝতে তোমার অসুবিধে হচ্ছে?'

অর্থাৎ আর সংশয়ের কোন অবকাশ থাকে না।

যা শুনেছেন রাজা—ঠিকই শুনেছেন, বোঝারও কোন ভুল হয় নি।

জয়সুর অধিকতর বিস্মিত হয়ে বলেন, 'এই বয়সে আর একটা বিয়ে!··· কী বলছেন মা?...আবার নতুন ক'রে একটা বালিকার পাণিগ্রহণ?...তাও আবার বিদেশিনী!···না না, এ আপনি তামাশা করছেন!'

সেবন্তীর বলিরেখাঙ্কিত ললাটে ভ্রূকুটি ঘনতর হয়ে ওঠে, এবার তিনি একটু বিরক্তিই প্রকাশ করেন। বলেন, 'পুত্র, তোমার সঙ্গে আমার আর যা-ই হোক, তামাশা করার সম্পর্ক নয়। আমার আদেশ দেওয়ার কথা, তোমার কর্তব্য সেটা পালন করা। তোমার রাজকার্যে বা শাসন-ব্যবস্থায় এতাবৎ আমি একটি কথাও বলি নি কোন দিন। কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে—জানতে চাই নি। প্রথম বিবাহের পর যতগুলি বিবাহ তুমি করেছ নিজের ইচ্ছাতেই করেছ, আশীর্বাদ করার আগে তাদের কারও মুখও দেখি নি! তখন বয়সের কথা চিন্তা করেছ এতটা, এমন কথাও শুনি নি।...আজ আমি তোমার জন্য একটি বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক করায়—প্রস্তাবটা তামাশার মতো বোধ হচ্ছে কেন, সেটা বরং আমারই বুদ্ধির অগম্য হয়ে উঠেছে!'

জয়সুর অপ্রতিভ হন, একটু সঙ্কোচও বোধ করেন। আমতা আমতা ক'রে বলেন, 'না, মানে—প্রস্তাবটা এত আকস্মিক আর অপ্রত্যাশিত—এই বয়সে—আপনার মুখে যা শুনেছি সে বালিকা মাত্র—তার সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব করবেন, আমার এখনও ঠিক ধারণাতে আসছে না। সেই জন্যই হয়ত, অতিরিক্ত বিস্মিত হয়েছি বলেই, কিছু প্রগল্‌ভতা প্রকাশ ক'রে ফেলেছি —সে অপরাধ ক্ষমা করবেন। তবু, এখনও সবিনয়েই বলছি—আপনার এই বিচিত্র আদেশের অর্থ বুঝতে একটু অসুবিধাই হচ্ছে আমার।'

সেবন্তী উত্তর দিলেন, 'পরিণত বয়সে কিশোরী কন্যার পাণিগ্রহণ—এ বংশে নূতনও নয়, প্রথমও নয়। তোমার মাতামহ বৃদ্ধ বয়সে চোল রাজ-কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন; তাঁর বাবা যখন বৈশালী রাজতনয়াক বিবাহ করেন তখন তাঁরও বয়স প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমায় পৌঁচেছে। তোমার মাতামহ সেই পরিণত বয়সে পাণিগ্রহণেরই ফল। আর্যা পঞ্চকল্যাণী যখন সম্রাট অনিরুদ্ধদেবের পদাশ্রয় লাভ করেন তখন তিনি শুনেছি মাত্র পঞ্চদশী বালিকা। তাতে কোন ক্ষতি হয়েছে বলে মনে হয় কি তোমার? আর বিদেশিনী? এ বংশে ভারতবর্ষের কন্যা গ্রহণ সৌভাগ্যের দ্যোতক।'

তারপর, আর একটু থেমে ঈষৎ আহত, অভিমানরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'সে কন্যাকে আমি দেখে পছন্দ ক'রে পাট্টিকেরাধিপতির কাছ থেকে যাচঞা করে এনেছি। পাত্রী এতদিনে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছে—আমাদের পক্ষ থেকে উপযুক্ত আমন্ত্রণ, উপঢৌকন, যানবাহন ও রক্ষীদলের। তুমি এখন যদি অসম্মত হও, তাহলে আমাকে পৃথিবীর লোকের কাছে হাস্যাস্পদ ও অপমানিত হ'তে হবে—এবং সেক্ষেত্রে আমার আত্মহত্যা করা ছাড়া উপায় থাকবে না। অথবা আমাকে আবার সেখানে ফিরে গিয়ে পাত্রীর পিতার পায়ে ধরে ক্ষমাপ্রার্থনা করতে হবে, বলতে হবে যে এ দেশের রাজা—আমার পুত্রের হয়ে কোন প্রতিশ্রুতি দেওয়ার কোন অধিকার আমার ছিল না। আমি যা করেছি তা একান্ত অনধিকারচর্চা। কিন্তু সেও তো আত্মহত্যারই নামান্তর।'

জয়সুর যেন শিউরে উঠলেন, তাড়াতাড়ি নত হয়ে মায়ের পাদস্পর্শ ক'রে বললেন, 'ছিঃ ছিঃ, আপনি এ কী বলছেন মা!...আপনার ইচ্ছাই যথেষ্ট,

আমার কাছে দৈবাদেশের মতোই অলঙ্ঘ্য। স্পষ্ট আদেশ দেবারও কোন প্রয়োজন নেই। আপনি অপমানিত বা অপদস্থ হবেন আমি জীবিত থাকতে—এ কথা কল্পনাই বা করতে পারলেন কেমন ক'রে!...এ রাজ্য, এ সিংহাসন—আপনার জীবিতকাল পর্যন্ত—জন্ম-সূত্রে আপনারই, আপনি দয়া ক'রে আমাকে ভিক্ষা দিয়েছেন—সে কথা আমি কোনদিনই ভুলব না।...আপনি যখন বলছেন তখন—যেমন ব্যবস্থা করতে চান—তেমনই হবে। শুধু আমি একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না বলেই এই অপরাধটুকু ঘটে গেল।'

ততক্ষণে আবার রাজমাতার মুখে চিরাভ্যস্ত বিষণ্ণ প্রশান্তি নেমে এসেছে। তিনি নীরবে পুত্রের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন।

তারপর আর কোথাও কোন অসুবিধা ঘটে নি।

ঘটার কথাও নয়।

এ সমস্ত আয়োজনের জন্য রাষ্ট্রব্যবস্থা শাসনযন্ত্রের একটা অংশ প্রস্তুতই থাকে। নির্দেশমাত্র যন্ত্রের মতোই ঘুরতে থাকে তা।

এখান থেকে বধূকে আনার জন্য সিংহাসনযুক্ত হাতী, হাতীতে যদি অস্বস্তি বোধ করেন, কোমল শয্যাযুক্ত রেশমের ঘেরাটোপ দেওয়া শিবিকা, পট্টিকেরারাজের প্রতিনিধিদের জন্য অশ্ব, শিবিকা, খাদ্যবস্তু ও সেই সঙ্গে অশ্বারোহী রক্ষীর দল প্রস্তুত হয়ে নির্দিষ্ট দিনেই যাত্রা করল।

এ রাজ্যে উৎসব-আয়োজনেরও কোন ত্রুটি হ'ল না। দিকে দিকে লোক গেল বার্তা ও আদেশ নিয়ে। উপযুক্ত বর্ণাঢ্যতা ও উৎসবশোভার কোথাও কোন ত্রুটি ঘটবে না আর।

দেশের রাজা আর একটি বিবাহ করছেন—তার জন্য যা কিছু আয়োজন সবই সম্পূর্ণ করা হ'ল—যন্ত্রের মতোই, দিনরাত পরিশ্রম ক'রে।

সেবন্তী কাজটা ক'রে ফেলেছিলেন এক বহুদিনের নিরুদ্ধ হৃদয়াবেগের বশে।

যে রণমল্লদেবের স্মৃতি এক বহুদূর অস্পষ্ট অভ্যাসমাত্রে পরিণত হয়েছিল—তাঁর এই বিষণ্ণ বৈরাগ্যের মূল কারণ হিসেবে—মনের অবচেতনে একটা পৃষ্ঠপট রচনা ক'রে রেখেছিল মাত্র, মানুষটার সম্বন্ধে তীব্র আকাঙ্ক্ষা বা বেদনাবোধ তো ছিলই না, রক্তমাংসের দেহধারী প্রেমাস্পদরূপে ভাল ক'রে ভাবতেও পারতেন না আর, ভাবার চেষ্টা করলে একটা আবছা আদল মাত্র মনে পড়ত, তার বেশী নয়;—তারাকে দেখামাত্র সেই রণমল্লদেব, প্রথম বয়সের সমস্ত তীব্র কামনা, সুতীব্র বিরহবেদনাসুদ্ধ মনের মধ্যে জেগে উঠেছিল আবার।

ব্যথায় টনটন ক'রে উঠেছিল সমস্ত অন্তর, এক কোমল মধুর বেদনার আঘাতে ঝঙ্কৃত হয়েছিল হৃদয়ের তন্ত্রী।

এতকালের সুপ্ত হৃদয়াবেগ অকস্মাৎ জেগে উঠেছিল বলেই কিছুটা অপ্রকৃতিস্থ হয়ে উঠেছিলেন, প্রথম বয়সের হঠকারিতায় পেয়ে বসেছিল তাঁকে।

ভাল ক'রে কিছু ভাবার আগেই কথাটা বলে ফেলেছিলেন যোধমল্লদেবকে, ঐ কন্যা প্রার্থনা করেছিলেন।

তারপর অবশ্য আর ফেরার পথ ছিল না!

হাতের পাশা আর মুখের কথা—একবার বেরিয়ে গেলে আর ফেরানো যায় না, বিশেষ রাজা বা রাজক্ষমতাযুক্ত ব্যক্তিদের। তাঁদের কোন প্রতিশ্রুতি সম্মতি বা চুক্তি—মুখ থেকে বার হবার সঙ্গে সঙ্গেই তা জনসাধারণের জানা হয়ে যায়, রাষ্ট্রব্যবস্থার বিপুল যন্ত্রও চলতে শুরু করে। তখন সে প্রতিশ্রুতি ফিরিয়ে নেওয়া মানে সম্মান থেকে ভ্রষ্ট হওয়া।

সেবন্তী তা পারেন নি, বরং একরকম জোর ক'রেই ছেলেকে রাজী করিয়েছিলেন। করাতে হয়েছিল। নইলে ঘরে-বাইরে মুখ দেখানোর উপায় থাকত না।

কিন্তু বিবাহের আগে থাকতেই নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হ'তে শুরু করেছিলেন সেবন্তী।

দীর্ঘকাল সংসারের বাইরে বাস করলেও—এতকাল বাঁচার ফলে সংসার সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা কম ছিল না। বিশেষ প্রথম বয়সে বাবার সঙ্গে সঙ্গে থেকে রাজ্য-শাসনকার্য ভালভাবেই শিখেছিলেন ; বাবার মৃত্যুর পর অমাত্যদের অনুরোধ ক'রে নিজে সিংহাসনে না বসে ছেলেকে বসিয়েছিলেন—সে জন্য দীর্ঘকাল ছেলের পিছনে থেকে উপদেশ নির্দেশ দিয়ে এই বিপুল রাজ্য শাসনও করেছেন।

ফলে সাধারণ মানুষ এবং তাঁদের আত্মীয়-স্বজন অমাত্য-কর্মচারী—আশেপাশে যাঁরা থাকেন—সকলকেই ভালরকম চিনে নিয়েছিলেন।

সে জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা ভোলারও কোন কারণ নেই।...

সেই জন্যই অনুতাপ তাঁর। অনুতাপ আর আশঙ্কা।

জন্মকাল থেকে বুকের রক্ত দিয়ে যাকে তিলে তিলে বড় করেছেন সে ছেলের প্রতিটি ভঙ্গী—প্রতিটি অভিলাষ কামনা, তার চরিত্র ও স্বভাব—সম্পূর্ণ জানা আছে তাঁর।

নবীনা কিশোরী বধূকে পেয়ে রাজা যে অগ্রপশ্চাৎ সব ভুলে উন্মত্ত হয়ে উঠবেন সে বিষয়ে রাজমাতার বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না। বিশেষ তারা দেবী ধীর নম্র স্বভাবের মেয়ে, সুশ্রী, শিক্ষিতা, অশেষ গুণবতী। এমনিতেই প্রৌঢ় স্বামীর তরুণী ভার্যা মাথার মণি হয়ে ওঠবার কথা, তারার তো কাঁচা বয়স ছাড়াও বহু দাবী আছে সে ঐকান্তিক প্রেমের।

আর সেক্ষেত্রে পুত্রের প্রধানা মহিষী সায়ী যে ভয়ঙ্করী হয়ে উঠবে, এই অবস্থার প্রতিবিধানের জন্য যে স্বর্গ-মর্ত্য-রসাতল একাকার করবে—সে বিষয়েও রাজমাতা নিঃসন্দেহ।

সায়ী এককালে রাজার প্রিয়তমা ছিলেন। এখন আর আসক্তির সে প্রাবল্য না থাকলেও সে সময়কার বশংবদ ভাবটা রাজা ত্যাগ করতে পারেন নি, ওটা তাঁর স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে।

সায়ী যে পরিমাণ দাম্ভিক সেই পরিমাণই প্রতিহিংসাপরায়ণ, ষড়যন্ত্রপ্রিয়ও। রাজঅন্তঃপুরে সতীনদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক'রে অগ্রগণ্যা কর্ত্রী হয়ে থাকবার যতগুলি শিক্ষা—ভগবান সবই যেন তাকে দিয়ে এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। সে পদবীতে জ্যেষ্ঠা নয়, রাজার জ্যেষ্ঠ সন্তানেরও জননী নয়, তবু দীর্ঘকাল ধরে রাজা সব ব্যাপারেই তাকে প্রধানা ক'রে রেখেছেন—এখন আর সে পদাধিকার ফিরিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়।

রাজা যে রীতিমতো সায়ীকে ভয় ক'রে চলেন—সে তথ্যও রাজমাতার অজ্ঞাত নয়।

তার কারণ সায়ী রাজার অনুগ্রহ বা আসক্তির ওপর নির্ভর ক'রে বসে নেই। সে পিপীলিকা-ধর্মী মেয়ে—সূর্য-কিরণের দিন থাকতে থাকতে বর্ষার জন্য সঞ্চয় করতে হয় তা সে জানে। রাজার প্রথম দিককার প্রায়-মুগ্ধ অবস্থার সদ্ব্যবহার করেছে সে, রাষ্ট্রশাসন-ব্যবস্থায় বড় বড় পদগুলিতে নিজের অনুগত ও অনুগ্রহপ্রার্থী লোক এনে বসিয়েছে।

এমন কি প্রাসাদের ভিতরেও তার প্রভূত প্রভাব। রাজার দেহরক্ষীদলেরও যে অনেকে তার বেতনভুক—একথাও সেবন্তীর কানে পৌঁচেছে।

একমাত্র সেবন্তীই তার আয়ত্তের বাইরে আছেন এতাবৎকাল, বহু চেষ্টা ক'রেও রাজার মাতৃভক্তিকে টলাতে পারে নি সায়ী।

তা ছাড়া রাজ্যের প্রধানরা—রাজশক্তির প্রধান সহায় সামন্তর দল—সকলেই রাজমাতাকে দেবীর মতো শ্রদ্ধা করেন, ওঁর সঙ্গে কোন বিরোধিতা করতে গেলে তাঁদের বিরুদ্ধতায় আহত হয়ে ফিরে আসতে হবে—এতদিনে এটুকু বুঝে নিয়েছিল সায়ী। সেইজন্যেই এই বিবাহে সে বাধা দিতে পারে নি।

স্বয়ং রাজমাতা এর উদ্যোক্তা না হ'লে যে কোন প্রকারে হোক এ বিবাহ বন্ধ করত সে।

কিন্তু তা পারে নি।

পারে নি বলেই আরও বিদ্বিষ্ট—প্রায় হিংস্র হয়ে উঠেছে সায়ী।

তার মতো মেয়ে সহজে হালও ছাড়বে না—এর প্রতিবিধান করবেই।

রাজমাতা তাঁর স্বর্গত পিতার কাছ থেকে শুধু রাজনীতি নয়, জীবন সম্বন্ধে একটা সামগ্রিক শিক্ষা লাভ করেছিলেন।

শুধু অনুতাপ ক'রে কোন লাভ নেই, বিলাপ ক'রেও না—এ বোধটাও সে শিক্ষার অন্তর্গত।

তাঁর আশঙ্কা যে অমূলক নয়—তা তো রাজার এই বিবাহের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কন্যাকে দেখতে যা বিলম্ব, তারপর আর এ বিবাহে রাজার কোন অনিচ্ছা কি সঙ্কোচ প্রকাশ পায় নি।

বরং সমারোহের মাত্রাটা তিনিই বাড়িয়ে দিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত আড়ম্বর আর ব্যয়বাহুল্যের পরিমাণ এমন একটা জায়গায় পৌঁচেছে যা তাঁর প্রথম বিবাহেও কেউ কল্পনা করে নি।

তারপর অল্প বয়সের বিকাশোন্মুখ প্রথম যৌবনের মাদকতা ও প্রভাব তো আছেই—কন্যার লাবণ্যে, মার্জিত কথাবার্তায়, বেশভূষা চালচলনে উচ্চাঙ্গের রুচি প্রকাশে, শিক্ষায়—অর্থাৎ রূপ ও গুণ দুই কারণেই রাজা মুগ্ধ অভিভূত হয়ে পড়েছেন।

তাঁর যে আরও বহু মহিষী বা উপপত্নী আছে—একথা যেন ভুলেই গেলেন একেবারে, এমন কি রাজকার্যেও কিছু কিছু অবহেলা ও অমনোযোগ প্রকাশ পেতে লাগল।

এক কথায় তরুণী ভার্যাকে নিয়ে রাজা উন্মত্ত হয়ে উঠলেন।

এটা এমন কিছু অস্বাভাবিক নয়।

তেমনি অস্বাভাবিক নয়—রাণী সায়ীর ক্রূর প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি।

রাজমাতা নিদারুণ শঙ্কিত হয়ে উঠলেন।

ছেলের জন্য ততটা নয়—কারণ তিনি জানতেন সায়ী নির্বোধ নয়, আর তা নয় বলেই—রাজার শারীরিক কোন হানি করতে সে সাহস করবে না।

সায়ীর যা শক্তি তা রাজার সিংহাসনে আসীন থাকার ওপরই নির্ভর করছে অনেকটা, অর্থাৎ তাঁর বেঁচে থাকার ওপর।

রাজা না থাকলে তার এ প্রতিপত্তিও থাকবে না।

নতুন রাজা—তা সে নিজের ছেলেই হোক আর সপত্নী-পুত্রই হোক—সে কি মূর্তি ধারণ করবে সিংহাসন অধিকার করার পর—তা কেউ জানে না।

তাদেরও প্রত্যেকের পত্নী উপপত্নী আছে কয়েকটি ক'রে। সে স্ত্রীলোক-গুলির প্রভাবও কিছু উপেক্ষণীয় নয়।

না, রাজার জন্য সেবন্তীর ভয় নেই। ভয় ঐ কচি মেয়েটার জন্যই।

যাকে তিনিই একরকম জোর ক'রে এই বিপদের মধ্যে টেনে এনেছেন।

আগেকার দিন হ'লে তিনিই এর শেষ পর্যন্ত দেখতেন।

পুত্রবধূর সঙ্গে ক্ষমতার পাঞ্জা লড়তে পিছপাও হতেন না।

শরীর সুস্থ থাকলে, মাথা পরিষ্কার থাকলে—অন্য কোন প্রশ্নই উঠত না।

এটুকু ভরসা করতে পারতেন, পুত্রবধূ ওঁর প্রভাব ও প্রতিপত্তির সঙ্গে এঁটে উঠতে পারত না।

বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা ও তাঁর পদমর্যাদা—তিনটি প্রধান ক্ষেত্রেই উনি পুত্রবধূর থেকে ঢের বেশী শক্তিশালিনী।

সে যতই কুটিল আর কুচক্রী হোক—রাজা ত্রিভুবনাদিত্যের কন্যার কাছে হেরে যেতে বাধ্য হ'ত।

এই রাজ্য, এই রাজক্ষমতা—অরিমর্দনপুরের সিংহাসন—উনি ছেলেকে স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিয়ে তপস্বিনীর জীবনযাপন করেছেন, স্বামীর মৃত্যুর পর সমস্ত ভোগসুখ বর্জন করেছেন—সে কথা এদেশের লোক এখনও ভোলে নি। সে তথ্য ওঁকে এমন এক মহিমাময় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে যে, সেখানে কোন হীন কুমন্ত্রণার পৌঁছনো কঠিন।

কিন্তু সে সাহস আর সেবন্তীর নেই।

সাহস বা ভরসা।

সকল শক্তি সাহসের যা মূল—স্বাস্থ্য, সেটাই গেছে তাঁর।

'বয়সের ভার' কথাটার অর্থ এবার বুঝতে পারছেন।

এতকাল বোঝেন নি. এতখানি পরিণত বয়সেও এই যে বৎসরাধিকাল ঘুরে বেড়ালেন—তখনও জরার প্রকোপ কি বস্তু বুঝতে পারেন নি।

কিন্তু এইবার, গত কিছুকাল থেকেই, মনে হচ্ছে তিনি যেন বড় বেশী ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন, শরীর আর কোনমতেই বইছে না।

মনে হচ্ছে তিনি বহু—বহুদিন এ পৃথিবীতে এসেছেন, অনেক আগেই তাঁর চলে যাওয়া উচিত ছিল।

বড় বেশী দেরি করে ফেলেছেন অকারণ।

জীবনে যা কিছু তাঁর শ্রেয় ও প্রেয় অনেক আগেই নিঃশেষ হয়ে গেছে, তবু কি লোভে, কোন্ আশায় তিনি এতকাল বাঁচতে গেলেন?

শরীর খারাপ বলেই এই ধরনের চিন্তা মাথায় এসেছে—অথবা এই ধরনের চিন্তার ফলেই শরীর খারাপ হয়ে পড়ল—তা তিনি জানেন না; অথবা প্রত্যক্ষ জরা ও আসন্ন মৃত্যুরই ফল এটা; এই ক্লান্তিবোধ করার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হ'তে লাগল আর তিনি কিছুই করতে পারবেন না, তাঁর দিনও শেষ হয়েছে এবার।

মৃত্যুর পদধ্বনি তাঁর শরীরের মধ্যেই শুনতে পাচ্ছেন—শিরায় স্নায়ুতে হৃৎপিণ্ডে ধমনীর রক্তস্রোতে।

অর্থাৎ আর সময় নেই। বৃথা অনুতাপে নষ্ট করার মতো তো নেই-ই।

যদি কিছু করার থাকে—এখনই করা প্রয়োজন।

তিনি পারবেন না তারাকে কোন আশ্রয় দিতে বা রক্ষা করতে। কেউই হয়ত পারবে না—তবু যদি কোথাও কোন সম্ভাবনা থাকে, তাঁর এই নির্বুদ্ধিতার কিছুমাত্র প্রায়শ্চিত্তের উপায় বা সুযোগ—সেই সুযোগ সেই সম্ভাবনারই পূর্ণ সুবিধা নিতে হবে এবার, সর্বাগ্রে সেই কথাই চিন্তা করতে হবে।

কিন্তু অনেক ভেবেও এমন কোন উপায় চোখে পড়ল না।

এমন কোন সহায় এমন কোন শক্তিশালী বন্ধুর কথা মনে পড়ল না—যে এ বিপদে রক্ষা করতে পারে মেয়েটাকে।

একমাত্র যার কথা মনে পড়ল—সেও তাঁর মতোই জীবনের, পরমায়ুর স্বাভাবিক সীমা অতিক্রম ক'রে গেছে, তার ওপরও এতখানি ভরসা করা যায় না—কোনমতেই।

তবু তাঁকেই ডেকে পাঠালেন সেবন্তী, মজ্জমান ব্যক্তির তৃণাবলম্বনের মতো।

মলয়সুরের ভাই, ওঁর দেবর নরপতিসিথু।

তিনিও যথেষ্ট বয়স্ক হয়েছেন। এখনও সোজা হয়ে হাঁটেন ঠিকই, এখনও বর্শা বা শর নিক্ষেপে অনেকের থেকে ক্ষিপ্র ও অভ্রান্ত, তবু বয়সের ছাপ

জরার ছাপ তাঁর দেহে স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। তিনি যে আরও দীর্ঘকাল বাঁচবেন —সে আশা কম।

কিন্তু সেবন্তীয়ও আর কেউ নেই,—এমন বিশ্বস্ত, এমন অনুগত কেউ— যার ওপর এই ধরনের পুরস্কারের আশাহীন কোন কাজের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন।

এই মানুষটি—অশক্ত হোক, জরাগ্রস্ত হোক—প্রাণপণে, যতক্ষণ দেহে একবিন্দু রক্ত ও বক্ষে শেষ নিঃশ্বাসটি থাকবে—তাঁর দেওয়া ভার বহন করবে, এ তিনি নিশ্চিত জানেন।

এই নরপতিসিথুর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বড় বিচিত্র।

বিবাহের পর পরিচয়। রাজারাজড়ার ঘরে—বিশেষ মলয়সুররা বিরাট ধনী ও প্রভাবশালী সামন্ত বংশের সন্তান—এই ধরনের আত্মীয়তা ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয় কদাচিৎ।

তা ছাড়া যেখানে স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কটাই দূর এবং অনন্তরঙ্গ—বাহ্য, আপাতনিবিড়, লোকলজ্জা বাঁচাবার মতো পরস্পরের সম্মতিক্রমে তৈরী একটা আচরণের ক্রম মাত্র—সেখানে স্বামীর আত্মীয়দের সঙ্গে সম্বন্ধ শুষ্ক পরিচয়েই পর্যবসিত হবার কথা।

নরপতিসিথুর বেলায় কিন্তু তা হ'তে পারে নি, এর অন্যথা ঘটেছিল।

কারণ প্রথম থেকেই এই দেবরটি সসম্ভ্রম সহানুভূতি ও আন্তরিক প্রীতি নিয়ে পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

কেন, তা সেবন্তী জানেন না। অদ্ভুত মানুষ, তিলার্ধ-স্বার্থ-সম্পর্ক-শূন্য বিশ্বস্ত বন্ধু। সেই পরিচয় সেদিন না পেলেও জীবনভোর, দিনে দিনে পেয়েছেন—বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে।

সেবন্তীর দিক থেকে বন্ধুত্ব বা প্রীতি যেন আশাও করে নি তিনি, সেজন্য তাঁর কোন অভিমান বা ক্ষোভ ছিল না। স্বামীর সঙ্গে রাজকন্যার সম্পর্কটা আদৌ সপ্রেম নয় জেনে—কানাঘুষোয় কথাটা ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য এসব ক্ষেত্রে, যখন শ্বশুরকুলের সকলেই অল্পবিস্তর বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠেছিল— নরপতিসিথুর আনুগত্য বা সহানুভূতি বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় নি, বরং ক্রমে ক্রমে বেড়েই গেছে।

সেবন্তী জানেন—সেদিনও জেনেছিলেন কিছুকালের মধ্যেই যে— স্বাভাবিক প্রীতি নয়, তাঁর ভ্রাতৃবধূ সম্বন্ধে আরও গভীর কোন অনুভূতি বোধ করেন নরপতিসিথু। প্রথম দর্শনে প্রেম বা নিঃস্বার্থ ভালবাসা— কথাগুলো নিয়ে যার মনে যা তর্ক থাক, এই নরপতিসিথুকে দেখে সেবন্তীর অন্তত কোন সংশয় বা বিতর্ক ছিল না। তাঁর দিক থেকে কোন উৎসাহ বা আশ্বাস যে পান নি তা বলাই বাহুল্য—তবু তাতেও কিছুমাত্র অনুরাগ কমে নি নরপতিসিথুর।

সেই প্রথম যে চোখে চোখ পড়েছিল, সেদিনের সে মুগ্ধ দৃষ্টি থেকে

প্রেমের মোহাঞ্জন এ জীবনে কাটে নি নরপতিসিংহের। সেই আবেগ-থরো-থরো আকর্ষণ চিরদিন সমানভাবেই বোধ করেছেন।

কিন্তু তাই বলে কিছু দাবী করেন নি ভদ্রলোক কোন দিন। আশা তো করেনই নি। ওঁকে নিঃশব্দেই পূজো ক'রে গেছেন চিরকাল, প্রয়োজনের সময় ঠিক পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, প্রয়োজন শেষ হ'লে মূল্যস্বরূপ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য অপেক্ষা করেন নি, তৎক্ষণাৎ দূরে চলে গেছেন।

কখনও অকারণে নিজের উপস্থিতি দিয়ে শান্তিভঙ্গ করতে চান নি—সেবন্তীর নির্জনবাসের। তেমনি ডাকতেও হয় নি কখনও, দূর থেকেই লক্ষ্য রেখেছেন কখন প্রয়োজন হ'তে পারে, কখন হওয়া সম্ভব।

ভাইয়ের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহারে বিরক্ত বা ক্রুদ্ধ হওয়াই উচিত ছিল—কিন্তু কেমন ক'রে যেন—বোধ করি নিজের ঐকান্তিক ভালবাসার জাদুবলেই—ওঁর মনের অবস্থাটা বুঝে নিয়েছিছেন নরপতিসিংহ, বুঝেছিলেন যে, যে আঘাত দিচ্ছে সেও আঘাত কম সইছে না, তাই বরাবর সহানুভূতির চোখেই দেখেছেন ওঁকে ; দুঃখিত হয়েছেন বিচলিত হয়েছেন ওঁর এই নিঃসঙ্গতায়, এই স্বেচ্ছানির্বাসনে।

সেবন্তীর দিক থেকে বিনা অনুরোধেই নিজের বংশের অপর লোকদের বিদ্বেষ থেকে আড়াল ক'রে রাখার চেষ্টা করেছেন প্রাণপণে।

প্রেম ছাড়া এতখানি আত্মত্যাগ, এত নিঃস্বার্থ স্নেহ ও সেবা সম্ভব নয়—সেবন্তী তা জানেন।

ভালই বেসেছেন ওঁকে নরপতিসিংহ। নীরবে আশাহীন, ভবিষ্যৎহীন এক বিপুল প্রেম বহন করেছেন ওঁকে ঘিরে। কিন্তু কখও ঘুণাক্ষরে প্রকাশ করেন নি। প্রতিদান চান নি, কথাটা জানিয়ে প্রতিদানের দায়টাও চাপান নি, তাঁর জন্য সেবন্তীকে না কুণ্ঠিত সঙ্কুচিত বোধ করতে হয় কোন কারণে, অপরাধী বিবেকের তাড়না সহ্য করতে হয়—সে বিষয়েও পূর্ণ সচেতন ছিলেন।

এসবই জানেন সেবন্তী। চিরদিনই জেনে এসেছেন।

প্রতিকারের কোন পথ ছিল না, তাই করতেও পারেন নি।

মন যদি অন্যত্র না দেওয়া হয়ে যেত, তাহলে স্বামীকেই তো দিতে পারতেন, অমন দেবতার মতো স্বামী তাঁর।

আজও নিতে হবে বলেই ডেকেছেন নরপতিসিংহকে নির্লজ্জের মতো। স্থির জানেন যে, সাধ্য থাকলে আজও ওঁকে নিরাশ করবেন না, সাধ্যের অতীতই দেবেন বরং।

শুধু আজকের এই সাক্ষাৎ, এই নেওয়ার ব্যাপারে একটুখানি অভিনবত্ব আছে, একটুখানি নূতনত্ব।

এতদিন এ সম্বন্ধে দুজনেই সচেতন থাকলেও মুখে কেউ কোনদিন সে বিষয়ের উল্লেখ করেন নি।

আজ সেইটেই করবেন সেবন্তী, সেই সচেতনতার স্বীকারোক্তি।

সেই সঙ্গে কিছু ঋণ-স্বীকার, কিছু ক্ষমা-প্রার্থনা। এ ঋণ বহন ক'রে আর সৃষ্টিকর্তার দরবারে গিয়ে দাঁড়াতে চান না রাজমাতা, পরলোকে যাত্রা করতে। এই মিথ্যা অজ্ঞতার কপটাচারটা দূর করতে চান। সত্যকে মেনে নিতে চান সব সংকোচ দূর ক'রে।······

॥ ১৩ ॥

প্রথমেই সেই প্রসঙ্গ পাড়লেন সেবন্তী।

নরপতিসিংহ তাঁকে নমস্কার ক'রে অভ্যাসমতো আসন গ্রহণ করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শুরু করলেন ওঁর বক্তব্য।

বললেন, 'ভদ্র, সারা জীবন, যতদিন আমার বিবাহ হয়েছে প্রায় ততদিনই, আপনার কাছ থেকে বহু উপকার গ্রহণ করেছি। করা উচিত হয় নি—কারণ আমি জানতাম যে, সে ঋণ শোধ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু আমারও আর কোন উপায় ছিল না, সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারি স্বার্থচিন্তা-হীন এমন আপন লোক অন্য কেউ ছিল না।'

এ পর্যন্ত বলে—বোধ করি লজ্জা ও কুণ্ঠাতেই একটু থামলেন সেবন্তী। আজও, এই মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়েও, তাঁর কাগজের মতো সাদা মুখখানা সংকোচে অরুণবর্ণ ধারণ করল। নরপতিসিংহের দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে না এলে দেখে আজও মুগ্ধ হতেন।

ক্ষণকাল নীরব থেকে পুনশ্চ শুরু করলেন রাজমাতা, 'আজ আর অকারণ সংকোচ করব না, সে অবসর আর নেই। আজ এ কথাগুলো পরিষ্কার না হয়ে গেলে আর কোনদিনই হবে না। আমি জানতাম যে, আপনাকে শুষ্ক ধন্যবাদ দিয়ে কোন লাভ নেই। আপনি যে জন্য বার বার প্রয়োজনের সময় সহায়তা করেছেন সেটা আর যাই হোক—শুষ্ক ঋণ স্বীকার বা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের আশায় নয়। আমি জানি আপনি আমার প্রণয়প্রার্থী ছিলেন—আর সে প্রণয় আমার পক্ষে আপনাকে দেওয়া সম্ভব ছিল না। ও জিনিস কাউকে দেওয়া সম্ভব হ'লে আপনার দেবতুল্য অগ্রজকেই দিতুম। আমার জীবনে যত মানুষ দেখেছি—তাঁর মতো মহান ও মহৎ কেউ নয়, কিন্তু হতভাগিনী আমি তাঁকেও বঞ্চিত করেছি চিরকাল।

'করেছি তার কারণ—হৃদয়টা আমার বশে ছিল না, দীর্ঘদিন আগেই তা আর একজনকে দিয়ে নিঃস্ব হয়েছিলুম। সে সুপাত্র কি অপাত্র তা বিচার করি নি, করার অবস্থাও ছিল না। যা ছিল নিঃশেষে উজাড় ক'রে ঢেলে দিয়েছি তাকে। সেই অপরাধ—অপরাধ বলব না, কারণ জেনেশুনে কোন পাপ করি নি, বাধা দেবার শক্তি থাকলে অবশ্যই দিতুম—অপরাধ নয়, দুর্বলতা—সেই দুর্বলতার প্রায়শ্চিত্তই ক'রে গেছি চিরকাল, যতটা সাধ্য। সুকঠিন সে প্রায়শ্চিত্ত। ভগবান তার সাক্ষী আছেন। আপনারাও দেখেছেন তা।'

আবারও থামলেন রাজমাতা। দুর্বল রোগজীর্ণ শরীরে একসঙ্গে এত কথা বলার পরিশ্রম আর এতটা আবেগ সহ্য করা কঠিন, কণ্টকর।···তাই একটু থেমে বিশ্রাম নিয়ে পুনশ্চ বললেন, 'প্রতিদানের সামর্থ্য নেই জেনেও আপনার ভালবাসা—হ্যাঁ, আজ আর গোপন ক'রে কোন লাভ নেই, আপনার সেবা আপনার ভালবাসারই নামান্তর—গ্রহণ করেছি, তার কারণ স্বামীর মৃত্যুর পর আমারও আর কেউ ছিল না। আজও নেই—যার ওপর এমন নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে নির্ভর করতে পারি, যে আমাকে ঠকাবে না, বিরক্ত হবে না, যার আনুকূল্য ও সহানুভূতিতে স্বার্থের খাদ নেই।···এই হৃদয়হীন কৃতজ্ঞতাহীন স্বার্থপর আচরণের জন্য আজ আর ক্ষমা চেয়েও বোধ হয় কোন লাভ নেই; বহু অপরাধ ও ভুলের বোঝা বয়েই সৃষ্টিকর্তার দরবারে পৌঁছতে হবে, এও তার মধ্যে একটা। ভুল নয়—এ স্বার্থপরতা. অপরাধও।'

এতক্ষণ পরে এই প্রথম মুখ খুললেন রাজমাতার দেবর। বার্ধক্য-কম্পিত কণ্ঠে ধীরে ধীরে বললেন, 'দেবী—পরের কথা জানি না, আমার ব্যাপারে আপনার একটা ভুল হয়ে গেছে। ঋণ আপনার কিছু নেই, আমারই বহু ঋণ জমা হয়ে আছে আপনার কাছে। যদি যথার্থই আপনার কোন প্রয়োজনে এসে থাকি—যদি কোন সেবায় লাগতে পেরে থাকি—সে আমারই পাওয়া হয়েছে, আমার আশার অতীত লাভ, অপরিশোধ্য ঋণ। আপনার সেবার অধিকার পাওয়াই আমার জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার। আপনি তো জানেন, অকারণ মিথ্যা কখনও বলি না আমি, ওতে আমার বড় ঘৃণা। তা ছাড়া এই বয়সে আপনার সামনে কিছুতেই মিথ্যা বলব না—সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমার কাছে আপনার কোন ঋণ নেই, কোন অপরাধ বা ভুলও হয় নি।'

সেবন্তীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি প্রায়-শিথিল একখানি হাত তুলে আশীর্বাদের ভঙ্গী করলেন। তারপর বললেন, 'আপনি আমাকে নিশ্চিন্ত করলেন ভদ্র, জীবনের এই শেষক্ষণে আযাকে সুখী করলেন। অন্তত সে কৃতজ্ঞতাটুকু গ্রহণ করুন। বহু ঋণের ভার বহু অপরাধ বা দুর্বলতার দায় নিয়েই পরলোকে যাত্রা করতে হবে, আর তার বেশী দেরিও নেই—তবু সে বোঝার সামান্য অংশও যদি কমে—সেই আমার মহৎ লাভ।—তবে আপনি আমার ঋণ ছাড় দিলেও ভগবানের বিচারে ছাড় পাব কিনা সন্দেহ আছে আমার। আপনি বেশী নিয়েছেন কি আমিই বেশী নিয়েছি—সে বিচার আমাদের হাতে নেইও তো।'

অস্বস্থি বোধ করেন নরপতিসিংহ। এই বহুপূর্বে-প্রাপ্য কৃতজ্ঞতাও অসহনীয় বোধ হয়। বলেন, 'কিন্তু আপনার কি আদেশ তা এখনও জানতে পারি নি। আমাকে কী জন্য স্মরণ করেছিলেন?'

'হ্যাঁ, বলছি। আর দেরি করব না। আমারও দিন শেষ হয়ে আসছে, সব কাজ সেরে ছুটি নিতে চাই এবার।'

এই বলে, একটুখানি চোখ বুজে চুপ ক'রে শুয়ে থেকে—তিনি বহু

পূর্বের ইতিহাসে চলে গেলেন।

যা এঁরা নানানরকমে সন্দেহ ও অনুমান করেছিলেন কিন্তু নিঃসন্দিগ্ধ হতে পারেন নি, ঠিক সত্যটি জানতে পারেন নি—সেই ইতিহাসই দ্বিধা-সংকোচ-জড়িত কণ্ঠে থেমে থেমে—কখনও বা ভগ্ন স্খলিত স্বরে বিবৃত করলেন সেবন্তী। গলা কেঁপে গেল বার বার—লজ্জায় আবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল মাঝে মাঝে—ভুল হ'তে লাগল অজস্র। তবু দীর্ঘ সময় নিয়ে এক সময় সবই বললেন। পট্টিকেরার রাজা রণমল্লদেব, তাঁর আশ্চর্য তীব্র প্রেম, সে প্রেমে ব্যর্থতা, মলয়সুরের সঙ্গে অন্যায় চুক্তি—তার পর এই অভিশপ্ত মরুভূমিতুল্য শুষ্ক জীবন।···

সেই রণমল্লদেবের শেষ ইচ্ছা পূরণ করতেই, বৃদ্ধবয়সে পট্টিকেরা যাত্রা করেছিলেন তিনি—দয়িতের সেই অপূর্ণ—আশার অতীত আশা, আর সেই স্মৃতিতে, তারা দেবীর মুখাবয়বে রণমল্লদেবের সাদৃশ্য লক্ষ্য ক'রেই যে আবেগে জ্ঞান হারিয়েছিলেন, অগ্রপশ্চাৎ শুভাশুভ বিবেচনা না ক'রেই তাকে প্রার্থনা ক'রে বসেছিলেন পুত্রের জন্য—সে কথাও গোপন করলেন না।

'ভুলের পর ভুল, অপরাধের পর অপরাধই শুধু জড়ো ক'রে গেলাম—আমার জীবনভোর। এই একটা সরল নিষ্পাপ কাঁচ মেয়েকে টেনে এনে ফেললাম জেনেশুনে—এখানকার এই বিষেভরা নরককুণ্ডে। আমি জানি সায়ী কি ভয়ঙ্কর মেয়ে, সে কখনই সহ্য করবে না রাজার এই প্রবল নববধূ-প্রীতি, সে এর পৈশাচিক শোধ নেবে। তার বিদ্বেষের আগুনে রাজার হয়ত তত ক্ষতি হবে না—সে আগুন সেখানে পৌঁছলে সায়ীর নিজেরই ক্ষতি—কিন্তু ঐ একফোঁটা মেয়ে তারা, আগুনে জ্বলে-পুড়ে ছাই হবে।·· এটা আমার আগেই ভেবে দেখা উচিত ছিল।···সায়ীকে আমি বহুদিন থেকে চিনি, এও বেশ জানি যে, তার অসাধ্য কোন কাজ নেই। তার প্রতিহিংসাস্পৃহা সে চরিতার্থ করবেই। তার সে ঈর্ষার আগুন থেকে তারাকে রক্ষা করতে পারি সে ক্ষমতা আমার নেই। মানে এখন আর নেই···

'এ একরকম জেনেশুনেই মেয়েটাকে খুন হতে এনেছি আমি। ভদ্র, সেই অনুতাপেই দগ্ধ হচ্ছি দিনরাত, পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার সময় অন্য সমস্ত চিন্তার থেকে, ঈশ্বর চিন্তার থেকে, এই চিন্তাই বড় হয়ে উঠেছে—এ আমি কি করলুম, এ আমি কি করলুম!'

বলতে বলতে আকুল হয়ে কেঁদে উঠলেন সেবন্তী। কী অপরিসীম বেদনা এবং অনুতাপে যে দগ্ধ হচ্ছেন তিনি—এই কান্নাই তার প্রমাণ। সহস্র দুঃখেও তাঁর চোখে কেউ জল দেখে নি, সকল ব্যথা নিঃশব্দে বহন করার শিক্ষাই তিনি পেয়েছেন—রাজবংশের, অভিজাত-বংশের শিক্ষা এটা।

নরপতিসিংহ নীরবে বসে রইলেন অনেকক্ষণ। এই নারীর চোখের জল মোছাতে এককালে তিনি নিজের প্রাণ দিতে পারতেন অনায়াসে, হয়ত আজও পারেন, কিন্তু তাতে এই যন্ত্রণার উপশম হবে না। তার বেশী সাধ্য আজ নরপতিসিংহেরও নেই—এ দুঃখ ঘোচাবার সাধ্য, এর প্রতিকার করার সাধ্য।···

ঐ সুন্দর চোখের জল বুঝি আজও তাঁর বুকের রক্ত উদ্বেল ক'রে তুলল, আজও প্রচণ্ড ঝড় উঠল আবেগের—কিন্তু প্রাণপণে চিত্ত দমনই করলেন। অকারণে আকুলতা প্রকাশ করার অর্থ নিজের দৈন্য প্রকাশ করা।

অনেকক্ষণ পরে, সেবন্তী নিজেই একটু সামলে নিলে কথা কইলেন নরপতিসিংহ, 'কিন্তু ঐ ভয়ঙ্করী মেয়েছেলেটার হাত থেকে নতুন রাণীকে রক্ষা করি—সে শক্তি তো আমারও নেই দেবী। আগেও হয়ত ছিল না, রাজার অন্তঃপুরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার—এখন তো আরও নেই।...বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি, শক্তি-সামর্থ্য সবই চলে গেছে। সৈন্যবাহিনীর পরিচালনা ভার এখন ছেলেদের হাতে, তারা তাদের বুদ্ধি-বিবেচনা-ইচ্ছা মতো চলে। তা ছাড়া রাজার বিরুদ্ধে তাদের দাঁড়াতে বলা আমারও উচিত হবে না, তেমন শক্তিও তাদের নেই।'

'তা জানি', করুণভাবে হাসেন সেবন্তী, 'সে অনুরোধ করবও না। কিন্তু প্রতিকার না পারি—প্রতিশোধের একটা চেষ্টাও করব না বা করার কোন ব্যবস্থা ক'রে যেতে পারব না—এই অসহায় অবস্থাটাও যেন কিছুতে মেনে নিতে পারছি না।...একটা, একটা কিছু না ক'রে গেলে মরেও শান্তি পাব না নরপতিসিংহ।...জানি, এটা ছেলেমানুষী ছাড়া কিছু নয়—এই মনোভাব, তবু এই চিন্তাটাই মনের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছে।...হয়ত বয়স বেশী হ'লে মানুষ সত্যিই শিশুর স্তরে নেমে আসে—আমিও এসেছি, তবু আপনার কাছে আমার এই প্রার্থনা—এই শেষ শান্তিটুকু আমাকে দিয়ে যান। আপনি ছেলে-মানুষী বলে উড়িয়ে দেবেন না আমি জানি, আর আমারও শেষ ভিক্ষা আপনার কাছে, আর কোনদিন কোন অনুরোধ নিয়ে আপনার শান্তি নষ্ট করব না, বিড়ম্বিত করব না।'

'সেইটেই আমার সহ্যের অধিক দুঃখ বলে মনে হবে দেবী।' ধীরে ধীরে ক্লিষ্ট কণ্ঠে বললেন নরপতিসিংহ, 'আপনার কোন আদেশ পালন করতে পারব —এখনও বেঁচে থাকার এই তো একমাত্র সার্থকতা।...কিন্তু আপনার আদেশ এখনও জানতে পারি নি—'

'আদেশ নয়, ভদ্র, প্রার্থনা—অনুরোধ। যদি সত্যিই তারা দেবীর কোন অনিষ্ট করে ওরা, মেয়েটাকে মেরে ফেলে বা কোন কারাগারে পুরে রাখে—আপনি যেমন ক'রে হোক সেই খবরটা পট্টিকেরায় পেঁছে দেবেন, ওর বাপের বাড়ির দেশে। ওর বাবা কোন প্রতিকার করতে পারবেন না, এত বড় রাজ্যের সঙ্গে তাঁর মতো ক্ষুদ্র শক্তির বিবাদ সম্ভব নয়—সুতরাং তাঁকে সংবাদ না দিলেও চলবে। আপনি যদি পারেন—দয়া ক'রে ওদের যে কুলপুরোহিত—তাঁর ছেলে তিলককে সেই সংবাদটা দেবেন।'

পুরোহিতের ছেলেকে! চমকে ওঠেন নরপতিসিংহ, তাঁর সন্দের হয় কথাগুলো ঠিক শুনতে পান নি!

সে বিস্ময় সেবন্তী লক্ষ্য করলেন বলে মনে হ'ল না। তিনি বলেই চললেন আপন মনে, 'এখানে আসার পর একদিন তারাকে কাছে বসিয়ে ওর

বাপের বাড়ির গল্প শুনেছিলাম—এই তিলকের কথাই বলেছে ও প্রায় আড়াই দণ্ড ধরে। বুঝেছি ঐ তিলক ছেলেটিকে ও ভালবেসেছিল—হয়ত নিজের অগোচরেই—তিলকও ওকে ভালবাসে। এ আমার আর একটা অপরাধ নরপতিসিংহ—এই দুটি জীবন নষ্ট ক'রে দেওয়া। তিলক তরুণ, যা শুনেছি এখনও তাকে কিশোর বলা যায়। বোধ হয় কুড়ি বছরও বয়স হয় নি—তবু সে-ই আমার একমাত্র আশা, সর্বশেষ অবলম্বন।'

কথাগুলো সব মনের মধ্যে গুছিয়ে নিয়ে অর্থোদ্ধার করতে সময় লাগল নরপতিসিংহের।

তার পর তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, 'পট্টিকেরার রাজার পক্ষে যা সম্ভব নয়—তাঁর পুরোহিতের কিশোর পুত্রের পক্ষে তা সম্ভব হবে? অল্প বয়স, সহায়সম্বলহীন, যুদ্ধবিদ্যার কিছুই জানে না—শাস্ত্রচর্চাতেই কাল কেটেছে হয়ত, হয়ত কোন অস্ত্র-চালনাও শেখে নি কখনও—সে কি করবে?'

রাজমাতা হাসলেন।

সেই ক্ষণিকের জন্য মনে হ'ল বৃদ্ধার বলিরেখাঙ্কিত শিথিল-চর্ম মুখও যৌবনের দীপ্তিতে রমণীয় হয়ে উঠল।

যেন কোন আকাঙ্ক্ষিত স্মৃতি কয়েক মুহূর্তের জন্য যৌবনের সেই প্রণয়-মধুর দিনগুলি ফিরিয়ে দিল মনের মধ্যে। বললেন, 'নরপতিসিংহ, যে ভাল-বেসেছে তার অসাধ্য কিছু নেই। প্রেমাস্পদের জন্য কিছুই তার অকরণীয় নয়। ভালবাসার শক্তি অসীম, অনন্ত। বিশেষ বয়স যদি অল্প হয়—সে সাক্ষাৎ মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করতে পারে—অরিমর্দনপুরের রাজশক্তি তো ছার! ...যদি কেউ পারে সেই ব্রাহ্মণ-বালকই পারবে ভদ্র, তার প্রণয়াস্পদের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে।'

এইসব চিন্তার সঙ্গে যে পূর্বস্মৃতি জড়িত তার আবেগ সুতীব্র। তেমনি তার পরের প্রতিক্রিয়াও। রাজমাতা এতক্ষণ ধরে উত্তেজিত কথাবার্তার পর একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়লেন।

অনেকক্ষণ চোখ বুজে পড়ে রইলেন তিনি—সে অবসাদ কাটিয়ে নিতে। তারপর ইঙ্গিতে দেবরকে কাছে ডেকে বুকের জামার মধ্য থেকে সুবৃহৎ একটি মাণিক্যের আংটি বার ক'রে ওঁর হাতে দিলেন।

তারপর প্রায় চুপি চুপিই বললেন, 'এ অঙ্গুরীয় পট্টিকেরার স্বর্গগত রাজার—ওখানকার রাজশক্তির প্রতীক। এ আংটি হাতে থাকতে ওখানে অন্তত কোন ভয় নেই। হঠাৎ এমন সংবাদ আর প্রস্তাব নিয়ে গেলে অবিশ্বাস আসতে পারে তাদের মনে। এই আংটি তাদের দেখিয়ো—তারা বিশ্বাস করবে।... ভাই, আমার সময় ফুরিয়ে আসছে, আর হয়ত কারও সঙ্গে কথাও কইতে পারব না। বাইরের সংসার থেকে সম্পূর্ণভাবে আমাকে টেনে নিচ্ছেন ভগবান তথাগত।...তুমি আমাকে নিশ্চিন্ত ক'রে যাও—ভগবানের নাম ক'রে বলে যাও—আমার এই অনুরোধ রাখবে—।'

আংটি-সুদ্ধ স্নেহবতীর শীর্ণ শুষ্ক জরা-কম্পিত হাতটি চেপে ধরলেন।

নরপতিসিংহ। ঈষৎ গাঢ়কণ্ঠে বললেন, 'ভগবানের থেকেও বেশী—আমি তোমার নাম ক'রে শপথ করছি দেবী, যদি দেহে এতটুকুও শক্তি থাকে, যদি একেবারেই অসাধ্য না হয়—তবে নিশ্চয়ই তোমার এ আদেশ পালন করব।'

॥ ১৪ ॥

তবু সে আদেশ যে এত শীঘ্র পালন করতে হবে—কথাটা বলার সময় একবারও ভাবেন নি নরপতিসিংহ। আরাকানের দুর্গম অরণ্যপথে হস্তী-পৃষ্ঠে যেতে যেতে শারীরিক কষ্টে এক এক সময় যখন চোখে জল এসে যাচ্ছিল, দেহ বিদ্রোহ করছিল, তখন—সেই কথা, নিজের বিচিত্র ভাগ্যের কথাই ভাবছিলেন তিনি।

ওঁরই অদৃষ্ট, নইলে সেবন্তীই বা এত তাড়াতাড়ি মারা যাবে কেন? সেদিনও—ওঁদের সেই শেষ দেখা হওয়ার দিনও—এমন কিছু খারাপ দেখে আসেন নি ভ্রাতৃবধূর শরীর। পূজায় উপবাসে, নানাবিধ দুরূহ ব্রতপালনে সেবন্তীর দেহ শীর্ণ হ'লেও বরাবরই সুস্থ ছিল, বরং বেশ কষ্টসহ হয়ে উঠেছিল। সাধারণ কোন ব্যাধিতে কখনও ক্লিষ্ট হ'তে বড় একটা দেখে নি কেউ।

ইদানীং—এই বছর দুই-তিন হ'ল—দেশভ্রমণ থেকে ফিরে আসার পরই হঠাৎ যেন ভেঙ্গে পড়লেন কেমন।

নরপতিসিংহের উদ্যানে একটা জীবন্ত শালগাছে উই লেগেছিল। বাইরে মাটির কয়েকটি রেখা ছাড়া তার কোন লক্ষণ বোঝা যেত না সে গাছের দিকে চাইলে। তারপর ধীরে ধীরে গাছটি শুকিয়ে এল, নবপত্র-উদ্‌গমন কমে এল, পুরনো পাতাগুলি ঝরতে শুরু হ'ল—ডালপাতাগুলি নিষ্পত্র শ্রীহীন হয়ে গেল ক্রমে ক্রমে। তবু—যেদিন ভেঙ্গে পড়ল সেদিন সকালেও বোঝা যায় নি যে, এমনভাবে অন্তঃসারশূন্য হয়ে এসেছে ওর কাণ্ড, তখনও দু-একটি পাতা—হলদে হয়ে এলেও লেগে ছিল কোন কোন শাখায়। কিন্তু ভেঙ্গে যখন পড়ল—দেখা গেল ঐ অতবড় গাছটা গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে, কোথাও এক হস্ত পরিমাণ কাঠও অক্ষত অবশিষ্ট আছে কিনা সন্দেহ।

সেবন্তীর মৃত্যু দেখে নরপতিসিংহের সেই শালগাছটির কথাই মনে পড়ল।

মনে পড়ল একাধিক কারণে। উপমাটা শুধু সেবন্তীর দেহ নয়—অরিমর্দনপুরের সমগ্র রাজশক্তি সম্বন্ধেও প্রযোজ্য যেন।

যেন যত অশুভশক্তি এই পুণ্যবতী তপস্বিনী রাজমাতার মৃত্যুর জন্যই অপেক্ষা করছিল, এ রাজ্যের রাজলক্ষ্মীর অন্তর্ধানের—গৃধ্রের দল যেমন কোন মুমূর্ষু জন্তুকে ঘিরে তার শেষ নিঃশ্বাস ফেলার অপেক্ষায় বসে থাকে।

সেবন্তী সায়ীকে চিনতে ভুল করেছিলেন।

মানুষকে চেনার অর্থ নিজের মন দিয়ে বিচার ক'রে তার মানসিক গঠন অনুমান করা।

সেক্ষেত্রে যে বিচার করে সে তার নিজের মান-মতোই করে, কোন অসৎ ব্যক্তি সম্বন্ধে বিচার করতে গেলেও তার সেই মানের সর্বশেষ সীমা পর্যন্ত নামে বড় জোর—তার বেশী কল্পনা করতে পারে না।

সেবন্তীর পক্ষে তাই সায়ীর মানসিকতার স্তরে নামা সম্ভব হয় নি।

তিনি ভেবেছিলেন নিজের কল্যাণ ভেবেই ও স্বামীর কোন অনিষ্ট করবে না।

কিন্তু নিজের কল্যাণ সম্বন্ধে সায়ীর ধারণা দেখা গেল সম্পূর্ণ ভিন্ন।

অথবা এ উন্মত্ততা।

ঠিক এই শ্রেণীর উন্মত্ততা সম্বন্ধে কোন ধারণা ছিল না সেবন্তীর। থাকা সম্ভব নয়। তিনি যে মানুষদের দেখেছেন, যাদের কাছে মানুষ হয়েছেন, যাদের সঙ্গে ঘর করেছেন—তারা কেউই এ মানসিকতার মানুষ নয়।

অধিকাংশ সাধারণ স্ত্রীলোকের কাছেই পুরুষ একটা সম্পত্তি মাত্র। নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তির উৎসশক্তি। সম্পত্তি সম্বন্ধে যে সজাগ সতর্কতা—পুরুষ সম্বন্ধেও তাই।

প্রভাব-প্রতিপত্তিই ওদের প্রাণ।

সেই জন্যই এদের কাছে সপত্নী আর পুত্রবধূ একই স্তরের—প্রায় সমান ঈর্ষার পাত্রী।

তারা দেবী আসার পর তার প্রতি স্বামীর অত্যধিক আসক্তি এই ঈর্ষাই জাগ্রত করেছে সায়ীর মনে—সর্বনাশা দিকদাহকারী ঈর্ষা।

তারা দেবী সায়ীর প্রতিপত্তির বিন্দু অংশও কেড়ে নিতে উৎসুক নয়, কোন শক্তিই সে নিজের হাতে নিতে চায় নি। এখানের কোন কিছুতেই আগ্রহ নেই তার। কিছুই সে চায় নি স্বামীর কাছে কোন দিন, যা দিয়েছেন স্বামী নিজের গরজে দিয়েছেন—এ সবই সায়ীর জানার কথা, কারণ তারাকে সেবা করেছে যেসব দাসদাসী, নিরন্তর ঘিরে আছে যারা—তারা সকলেই সায়ীর বেতনভুক গুপ্তচর। সংবাদ সব নির্ভুল ভাবেই পেঁছিয়—তবু সায়ীর মনে সুখ নেই।

সে সর্বদাই দেখে—কল্পনা করে—চারিদিকের সসম্ভ্রম সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে উপেক্ষা ও অবহেলা ফুটে উঠতে। তার মনে হয় যে, ঠিক আগের মতো তাকে প্রসন্ন রাখার জন্য কেউ অত ব্যস্ত নয়। কল্পনা করে আর ঈর্ষার আগুনে অবিরত দগ্ধ হয়। ছায়ার সঙ্গে যে যুদ্ধ তার সমাপ্তিও নেই, শান্তিও নেই।

সেই ঈর্ষাতেই হিতাহিতজ্ঞান হারিয়েছিল সায়ী।

নিজের ভবিষ্যৎটাও চিন্তা করার মতো শক্তি ছিল না তার।

শুধুই প্রতিশোধের কথা ভেবেছে—সে প্রতিশোধের কোন প্রতিক্রিয়া ওকে এসেও আঘাত করতে পারে—তা ভাবে নি।

ছেলে নরধু বা নরসুরকেও নিজের মনের মতো ক'রে মানুষ করেছিল, অর্থাৎ একটি পিশাচ ক'রে তুলেছিল। সায়ী জানত এ রাজ্যের প্রধানদের ওপর সেবন্তীর প্রতিপত্তি ও প্রভাব কতখানি—তাই তাঁর জীবিতকালে কিছু

করতে সাহস করে নি—সেবন্তীর দেহ বোধ করি শীতল হবার আগেই নিজের কুচক্রজাল বিস্তার করতে আরম্ভ করল।

ওরই পরামর্শমতো নরথু তার বৈমাত্র অগ্রজকে বোঝাল যে, তাদের পিতা অলাঙ্গসিথু জয়সুর বৃদ্ধ হয়ে বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছেন,—রাজকার্য পরিচালনার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। এই লোকের হাতে রাজ্যশাসনের ভার থাকলে এই অরিমর্দনপুর সাম্রাজ্য—যা তাদের পূর্বপুরুষরা বহু যত্নে বহু রক্তপাতে গড়ে তুলেছিলেন—তা চূর্ণবিচূর্ণ, শতধা বিভক্ত হয়ে যাবে। এখনই চারিদিকে বিদ্রোহের সূচনা দেখা যাচ্ছে—আর দেরি হ'লে সে বিদ্রোহ দমনের শক্তি থাকবে না তাদেরও। বৃদ্ধ বয়সে জ্যেষ্ঠপুত্রকে রাজ্যাভিষিক্ত ক'রে অবসর নেওয়াই রীতি—জয়সুর অতিরিক্ত কাম এবং অস্বাভাবিক কামনা ও ভোগ-লালসার জন্য সে রীতি লঙ্ঘন করছেন। এখন রাজ্যের ও রাজবংশের কল্যাণের জন্যই উচিত এর প্রতিকার করা।

নরথুর জ্যেষ্ঠ অগ্রজ উচ্চাভিলাষী ও আরামপ্রিয় ছিল, কিন্তু উচ্চাভি-লাষকে সার্থক ক'রে তোলার মতো বুদ্ধি ছিল না তার। সে সহজেই নরথুর লোভের টোপ গিলল। তাকে সহায় ক'রে সামনে রেখে কয়েকজন ক্ষমতা-লোলুপ সামন্তর সাহায্যে প্রথমে পিতৃহত্যা করল নরথু—তার পর জ্যেষ্ঠাগ্রজের সিংহাসন আরোহনের দিন ঘোষণা ক'রে দিয়ে অভিষেকের কয়েকদিন আগে একদা নিজের প্রাসাদে আমন্ত্রণ জানাল—উৎসবের আয়োজন, নিমন্ত্রণ-প্রেরণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করবে বলে। নির্বোধ যুবরাজ অভিষেকের ঘোষণাকেই ভাইয়ের আনুগত্য ও প্রীতির প্রমাণ বলে ধরে নিয়ে নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে সে আমন্ত্রণ রক্ষা করতে এল—এবং বলা বাহুল্য, ঘাতকের হাতে প্রাণ দিল।···

কথাটা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নরপতিসিথুর সমস্ত দেহ যেন একটা অব্যক্ত অবর্ণনীয় যন্ত্রণায় কুঞ্চিত হয়ে উঠল।

মানুষ সিংহাসন-লোভে এমন কুকর্মও করতে পারে, পারা সম্ভব—সেইটাই যেন এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না।

এখানেও তিনি নিজের মানদণ্ডে মানুষকে বিচার করতে গিয়েই এত বিস্মিত ও বিচলিত হচ্ছেন। নইলে দেশে দেশে যুগে যুগেই এ ধরনের ঘটনা দেখা গেছে—এ নতুনও নয়, বিরলও নয়।

এই বিপর্যয় যখন ঘটছে তখন নরপতিসিথু শয্যাগত। বয়স ছাড়া কোন রোগ ছিল না এতদিন—সেবন্তীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে—হয়ত বা মানসিক কারণেই, নানান্ ব্যাধি এসে ভর করল তাঁকে।

এমনিও কিছু করার ছিল না অবশ্য। কারণ সেবন্তীর অনুরোধ বা আদেশ স্পষ্টই ছিল তারা দেবী সম্পর্কে। তারা দেবী বিধবা হলেন বটে, কিন্তু তাঁর মৃত্যু বা বন্দিদশা—যে দুটির বিশেষ ক'রে উল্লেখ করেছিলেন সেবন্তী—তার কিছুই ঘটল না। বরং নরপতিসিথু মনে করলেন—সে সম্ভাবনাই আর রইল না। স্বামীর ভাগ দেওয়ার প্রশ্ন না থাকলে ঈর্ষাই বা

থাকবে কেন ? স্বামীর মৃত্যুতেই সব বিদ্বেষের অবসান হয়ে যাবে এবার।

কিন্তু নরপতিসিথু মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হলেন, তিনিও চেনেন নি সায়ীকে। যে নারী জননী কল্যাণময়ী,—সে-ই যদি ক্ষমতাপ্রিয়তা স্বার্থপরতায় উন্মত্ত হয়ে ওঠে—রক্তলোলুপ পিশাচীতে পরিণত হয়, সে যা পারে কোন পুরুষের পক্ষে তা কল্পনা করাও সম্ভব নয়।

সায়ী রাজমাতা হয়ে বুঝেছিল যে, তাতে আগের চেয়ে কর্তৃত্ব কিছুটা বেশী হাতে এসেছে বটে—পূর্ব গৌরবের, মানে তারা দেবী আসার আগে পর্যন্ত যে অপ্রতিহত ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রাধান্য ভোগ করেছে—তার কিছুই ফিরে পায় নি সে।

সিংহাসনারূঢ় রাজার প্রিয়তমা মহিষীর গৌরবের বা মর্যাদার সঙ্গে রাজমাতার গৌরবের তুলনাই হয় না। চাঁদে আর মাটির প্রদীপে যতটা তফাৎ—ততটাই পার্থক্য এই দুই পদমর্যাদায়।...

এখনই নরথুর দ্বিতীয়া স্ত্রী—ওকে নিত্য প্রণাম করতে আসা বন্ধ ক'রে দিয়েছে, সহচরীদের কাছে নাকি বলেছে, পতিঘাতিনীর নিঃশ্বাসে বিষ থাকে, ওর সামনে গেলে শরীরে কেমন জ্বালা অনুভব করে সে।

সায়ী যে এ অপমানের শোধ তোলবার চেষ্টা না করেছে তা নয়, আকারে-ইঙ্গিতে কথাটা পেড়ে ছেলের মন বুঝতে গেছে—সুবিধে হয় নি।

এই বধূ ভেলুবতীর অনুপম রূপ-লাবণ্যে নরথু মুগ্ধ, মোহগ্রস্ত হয়ে আছে। দেখা গেল—সেখানে কোন কৌশল খেলতে গেলে হিতে বিপরীত হবে।

বাপের স্ত্রীর থেকে নিজের স্ত্রীর মূল্য কিছু বেশীই হয়ে থাকে এ সংসারে—তা ছাড়া নরথু সায়ীর হাতে-গড়া সার্থক সৃষ্টি, তার অকরণীয় দুষ্কার্য কিছু নেই।

বেশী বাড়াবাড়ি করতে গেলে বিরক্তিটা ওদিকে না গিয়ে এদিকে আসাও বিচিত্র নয়।

সক্রিয় বিরক্তি।...

এদিকে কোন সুবিধে করতে না পারায় বোধ করি সব জ্বালাটাই তারা দেবীর ওপর এসে পড়েছিল।

জ্বালার কারণ বহুবিধ।

রাজ্যের প্রবীণ অমাত্য ও সামন্তের দল সায়ীর ওপর নিদারুণ বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠেছে, সেটা সায়ীর কাছে গোপন করারও চেষ্টা করে না তারা।

যদিচ সুকৌশলে সর্বত্র প্রচার করা হয়েছে যে, যুবরাজ স্বয়ং পিতৃহত্যা করেছে সিংহাসন পাবার লোভে—এবং সেই অনাচার ও পাপ সইতে না পেরেই বাধ্য হয়ে নরথুকে ভ্রাতৃহত্যা করতে হয়েছে—তবু এই নারকীয় ঘটনার আসল চাবিকাঠিটি কে ঘুরিয়েছে—তা জানতে কারুরই বাকী ছিল না।

তার ফলে, আত্মীয় কুষ্ঠরোগী হ'লে যেমন মিষ্ট মিথ্যা বাক্যে ভুলিয়ে লোকে তার সঙ্গ পরিহার করে, তেমনিভাবেই ওকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছে সবাই।

এই অপমান ও হেনস্তার একটিই মূল কারণ—তারা দেবী।

সায়ীর জীবনে যেন ধূমকেতুর মতো এসে পড়ল সর্বনাশী।

ছারখার বিনষ্ট ক'রে দিল জীবনটা।

তারা না এলে ওর প্রভাব-প্রতিপত্তি এমনভাবে চলে যেত না, আর সেই জ্বালায় অস্থির হয়ে পতিহত্যার মতো নারকীয় পাপও করতে হ'ত না।

তা ক'রেও লাভ তো কিছু হ'ল না—ক্ষতি হ'ল ঢের।

কে জানে উষ্মায় এমন হিতাহিতজ্ঞানশূন্য না হ'লে, একটু ধৈর্য ধারণ ক'রে থাকলে হয়ত এত কাণ্ড কিছুই করতে হ'ত না, চাই কি কৌশলে ঐ ডাকিনী মেয়েটাকেই সরানো চলত, আর সেক্ষেত্রে শোকার্ত বৃদ্ধ তাঁর পূর্ব-প্রণয়িনীর কাছেই ফিরে আসতেন।

এ—একূল ওকূল দুই-ই গেল সায়ীর!

এর শোধ সে নিতে চাইবে বৈকি!

সেই জালই বিস্তার করতে শুরু করল সে।

তারা দেবীকে রাজার আদেশে রাজমাতার প্রাসাদে নিয়ে আসা হ'ল। অকারণে একটা বিধবা স্ত্রীলোকের জন্য একটা পৃথক বাসার ঠাট সাজিয়ে রাখার কোন যুক্তি নেই—এই কথাই রাজাকে বোঝাল সায়ী।

তারপর, হাতের মধ্যে পেয়ে শুরু করল অকথ্য নির্যাতন। মৌখিক অপমান, বাক্যবাণই বেশী। তার সঙ্গে প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার অনভ্যস্ত নানা কষ্ট।

সায়ী চেয়েছিল তারাকে দিয়েই একটা অপরাধ করাতে—যাতে তাকে শাস্তি দেবার একটা উপলক্ষ পাওয়া যায়। হ'লও তাই। তারা স্বভাবত শান্ত নির্বিবাদী মেয়ে। কিন্তু একটা প্রচলিত কথা আছে—গর্তের নিরীহ ব্যাঙকেও অবিরাম খোঁচালে সে মুখ খোলে—ক্যাঁক্‌ ক'রে উঠে প্রতিবাদ করে। তারারও একদিন অসহ্য হয়ে উঠল। সায়ী কী একটা তুচ্ছ কারণে বলে বসল, 'তুমি এ বংশের দাসী হবারও যোগ্য নও। নামেই রাজকন্যা—তোমার বাপের রাজত্ব কতটুকু? এ প্রাসাদের চাকর-দারোয়ানরা ওর থেকে বেশী চাকরান জমি ভোগ করে।···ইতর ছোট ঘরের মেয়ে—নেহাত ভাগ্যের জোরে হঠাৎ এত বড় রাজার ঘরে এসে পড়েছ—রাজবংশের যোগ্য আচার-আচরণ শিখবে কি ক'রে! ইত্যাদি—

আর সামলাতে পারল না তারা। তিক্ত উগ্র কণ্ঠে উত্তর দিল, 'থাক, ঢের হয়েছে, বংশের জাঁক আর ক'রো না। এ বংশের কীর্তি যত ঢাকা থাকে ততই ভালো। স্বয়ং অনিরুদ্ধদেব, ত্রিভুবনাদিত্য—এঁদের কেলেঙ্কারী চরিত্র-হীনতার কাহিনী আমাদের দেশের চাষী-মজুররা পর্যন্ত গল্প ক'রে হাসা-হাসি করে।···তোমার স্বামী, ঐ নরপশু নরথুর বাবা—কার ছেলে—তার খবর রাখো? জারজ পুত্র!···তার স্ত্রী হয়ে আবার বংশের অহঙ্কার করতে এসেছ! আমার জ্যাঠামশাইয়ের ঔরসে আমার শাশুড়ীর কুমারীকালের

ছেলে !…বিশ্বাস না হয় আমার জ্যাঠামশাইয়ের এই ছবি দিচ্ছি, তোমার ঘরে তো স্বামীর যৌবনকালের ছবি আছে—পাশাপাশি রেখে মিলিয়ে দ্যাখো গে।'

এই বলে তারা তার পেটিকার মধ্য থেকে হাতীর দাঁতের ওপর আঁকা—পট্টিকেরার স্বর্গগত রাজা রণমল্লদেবের একটি ছোট ছবি ফেলে দিল, সায়ীর সামনে।…

এই সুযোগই খুঁজছিল সায়ী। ছবি সে কুড়িয়ে নিল না, মিলিয়ে দেখলও না—তার যা উদ্দেশ্য, তা সিদ্ধ হয়ে গেছে। সে মাথার চুল খুলে দীনবেশে কাঁদতে কাঁদতে রাজার কাছে গিয়ে অভিযোগ করল, দাসী-চাকর সকলের সামনে ঐ ডাইনীটা জোর গলায় বলেছে রাজা নরথু জারজ সন্তানের পুত্র, তার পিতা—সায়ীর মহান স্বামী ব্রহ্মগৌরব নৃপতি অলাঙ্গসিথু নাকি—পট্টিকেরার রাজা ও ওর জ্যাঠামশাই রণমল্লদেবের জারজ পুত্র !! এ শুধু বর্তমান রাজা ও স্বর্গগত রাজারই অপমান নয়—সায়ীর দেবীতুল্যা শ্বশ্রূ-মাতা ও তপস্বিনীশ্রেষ্ঠা সেবন্তীরও নিদারুণ দুঃসহ অপমান। এর প্রতিকার না হ'লে সায়ী এই ঘৃণিত প্রাণ আর রাখবে না—ছেলের সামনেই আগুনে পুড়ে মরবে।

যে পিতৃহত্যা করতে পারে তার পক্ষে নারী-হত্যা বা বিমাতাহত্যা এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। নরথু ক্রোধে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে তখনই উঠে তারা দেবীর মহলে গেল, হাতে তলোয়ার খোলাই ছিল—মহলে ঢোকার আগেই খুলে রেখেছিল—সুতরাং ঘটনাটা কি ঘটছে ভাল ক'রে কেউ বোঝবার আগেই তারা দেবীর মাথা তাঁর স্কন্ধচ্যুত হ'ল।…

ঘটনা ঘটবার আগে সুযোগ পেলে কেউ বাধা দিত কিনা কে জানে—যখন ঘটেই গেল, তখন আর প্রতিবাদ ক'রে লাভ কি, রাজার অপ্রীতিভাজন হওয়া শুধু শুধু। প্রতিবাদ করা খুব সহজও ছিল না। মায়ের পরামর্শে নরথু পিতৃহত্যার আগে সৈন্যদের প্রচুর প্রতিশ্রুতি দিয়ে হাত করেছিল, সিংহাসনে বসার পর তাদের প্রাপ্যাদি প্রায় দ্বিগুণ ক'রে দিয়েছে, সমস্ত সাধারণ সৈন্য এখন রাজার অনুরক্ত। সেনাপতি বা সামন্ত-সর্দারদের আদেশেও কেউ তার বিরুদ্ধে যাবে না।

সুতরাং আরও একটা অনাচার নীরবে মেনে নিল সবাই—ভগবান তথাগতের উপর সমস্ত দায় চাপিয়ে দিয়ে।

নরপতিসিথুকে এবার বেরোতেই হয়। অপটু রোগজীর্ণ ভগ্ন দেহটাকে কোনমতে শয্যা থেকে টেনে তুলে তিনি যাত্রার জন্য প্রস্তুত হন। ছেলেরা নিষেধ করে, আত্মীয়রা বিস্মিত হয়। এমন কি রাজা সুদ্ধ সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে। নিতান্ত সম্পর্কে পিতামহ, তায় বিপুল ধনী ব্যক্তি বলে—বহু আশ্রিত অনুগত রাজার ও শক্তিশালী সামন্তর নিকট-আত্মীয় বলেই—বাধা দিতে সাহস করে না।

কোথায় যাবেন, কী এমন প্রয়োজন পড়ল নরপতিসিথুর তা কেউ জানে না। শুধু উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে আরাকানের দিকে যাবেন—এই শুনল সকলে। সেই মতোই যাত্রার আয়োজন হ'ল। যাতায়াতে মাস-তিনেক লাগবে—এইটুকু মাত্র বললেন নরপতিসিথু। সেটা বলা দরকার—কারণ সেই পরিমাণ রসদের ব্যবস্থা করতে হবে।

আসলে কী প্রয়োজন, প্রয়োজন আদৌ আছে কিনা তা নরপতিসিথুও জানেন না। যা হবার হয়েই গেছে। এখন প্রতিশোধ নিয়ে কিছু লাভ হবে না।

তা ছাড়া, যেখানে যাচ্ছেন সেখানে কোন প্রতিকার-ব্যবস্থার উপায় আছে কিনা সন্দেহ।

অনাচারীই হোক, পাপীই হোক—নরথু প্রবল পরাক্রান্ত। তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে, দাঁড়াতে সাহস করবে পট্টিকেরায় কে এমন আছে?

সম্ভবত কেউই কিছু করতে পারবে না। যাঁর কথায়, যাঁর অনুরোধে উনি যাচ্ছেন—বেঁচে থাকলে তিনিই হয়ত নিষেধ করতেন যেতে। মৃত্যুপথ-যাত্রিণীর মতিভ্রম হয়েছিল বলেই এমন উদ্ভট অনুরোধ করেছিলেন—সে বিষয়ে নরপতিসিথুর কোন সংশয় নেই।

তবু ওঁকে যেতেই হবে—উনি বাক্যদত্ত।

আর এমন লোককেই বাক্য দিয়েছেন যে—উন্মত্ততা হ'লেও ওঁর পক্ষে তা রক্ষা না ক'রে উপায় নেই।

এখন শুধু ওঁর একটিমাত্র কামনা—ভগবান শাক্য-মুনির কাছে যে, ওঁর যেটুকু করণীয়, সেই সুদূর কোন্ দেশে এই বার্তাটুকু যেন পৌঁছে দিতে পারেন, ততদিন যেন দেহটা সবল আর সক্রিয় থাকে, অন্তত প্রাণটা যেন থাকে—সেই শেষ কর্তব্য সারা পর্যন্ত।

॥ ১৫ ॥

পগান শহরের সর্বত্রই কথাটা ছড়িয়ে পড়ল। লোকের মুখে মুখে এক কথা : ভারতবর্ষ থেকে এক তরুণ ব্রাহ্মণ জ্যোতির্বেত্তা এসেছেন, তিনি নাকি সর্বজ্ঞ, বয়সে তরুণ হ'লেও জ্ঞানে প্রবীণ—মানুষের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান সব তাঁর নখদর্পণে।

না, সন্ন্যাসী তিনি নন।

পরনে কাষায় বস্ত্র নেই। কেশ জটাসম্বন্ধ বা তনুও ভস্মাচ্ছাদিত নয়। অথবা মুণ্ডিত মস্তক পীতবস্ত্রধারী ভিক্ষুও নন ইনি।

নিতান্তই স্নাতক ব্রাহ্মণের বেশ, কার্পাস বস্ত্র ও উত্তরীয়—দুই-ই শ্বেতশুভ্র, ললাট ও বক্ষ শ্বেতচন্দন-শোভিত, আস্কন্ধলম্বিত মেঘকৃষ্ণ কেশ—অতি সুপুরুষ ও সুশ্রী।

অনেকেই—বিশেষ মেয়েদের—তাঁকে দেখলে নাকি প্রভাতসূর্যের কথা মনে পড়ে, তেমনিই জ্যোতিষ্মান।

কেউ কেউ এমনও বলছেন, বালার্ক তো কথার কথা—এ প্রত্যক্ষ বলেই আরও দীপ্তিময়, দীপ্যমান।

এই তরুণ জ্যোতির্বিদের সঙ্গে নাকি আরও তিনজন শিক্ষার্থী ব্রহ্মচারী এসেছে। তারাও অল্পবয়সী ও সুশ্রী, ব্রাহ্মণ তো বটেই। এরা যে সকলেই সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান, সংস্কৃতিবান—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কথাবার্তা, চালচলনে আভিজাত্যের লক্ষণ সুপরিস্ফুট। সর্বোপরি এরা সকলেই শাস্ত্রজ্ঞ, পণ্ডিত—অবশ্য এই বয়সে যতটা হওয়া সম্ভব।

দু'একজন সংস্কৃতজ্ঞ কোবিদজন এদেশেও আছেন, তাঁরা ভারতীয় পণ্ডিতের আগমনবার্তা পেয়ে কেউ কেউ উপযাচক হয়ে আলাপ করতে গিয়েছিলেন। সকলেই সন্তুষ্ট হয়ে ফিরেছেন। শূন্যগর্ভ বৃথাগর্বী পাণ্ডিত্যাভিমানী নয়—যথার্থ শিক্ষিত, অধিকতর শিক্ষাভিলাষী, জ্ঞানপিপাসু।

তা ওঁরা এখানে কেন এসেছেন—এ প্রশ্নও করেছেন কেউ কেউ।

এঁরাও সরল উত্তর দিয়েছেন। প্রধান উদ্দেশ্য দেশভ্রমণ। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য জ্ঞান আহরণ।

ওঁরা শুনেছেন যে, জ্যোতির্বিদ্যা—বিশেষ ফলিত জ্যোতিষশাস্ত্রে এখানের বৌদ্ধ ভিক্ষু বা অর্হৎগণ অনেক অগ্রসর, সম্রাট অনিরুদ্ধদেব বিভিন্ন রাজ্যের মঠমন্দির থেকে সেই সব দেশের পণ্ডিতদের লেখা বিস্তর দুষ্প্রাপ্য পুঁথি সংগ্রহ ক'রে এনে পগানের মঠ ও মন্দিরকে সমৃদ্ধ ক'রে তুলেছেন।

বিশেষ মোনরা এ বিষয়ে অসামান্য পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন—তাঁদের সেই বহু-পুরুষের গবেষণা ও শাস্ত্র-চর্চার ফল দুর্লভ পুস্তকরাশির সবগুলিই এখন পগান শহরের বিদ্যৈশ্বর্যে পরিণত হয়ে তার গৌরব-কারণ হয়ে উঠেছে। সেই লোভেই এঁদের পগানে আগমন।

এ সব কথাই সত্য, অবিশ্বাস করার কোন কারণ নেই।

সকলে তাই বিশ্বাসও করেছেন।

বিশেষত এঁদের যিনি প্রধান অধ্যাপক—তিনি বাদে বাকী তিনজনেই নিত্য বিভিন্ন মঠে ও মন্দিরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, বিহার ও বিদ্যায়তনসমূহে গিয়ে জ্যোতিষশাস্ত্র সম্পর্কিত গ্রন্থাদির খোঁজ নিচ্ছেন।

আরও বিশ্বাস হয়েছে—পরীক্ষা করে বাজিয়ে দেখে।

আশ্চর্য আশ্চর্য কথা বলেন, এঁদের তরুণ আচার্য এমন সব গোপনীয় কথা বলে দেন করকোষ্ঠী বা রাশিচক্র বিচার ক'রে—যা কারও জানবার কথা নয়।

যারা খুব অবিশ্বাস নিয়ে গেছে—পরিহাস করার জন্য প্রস্তুত হয়ে—তারাও ধন্য-ধন্য করতে করতে ফিরেছে সবাই।

সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছে যে, একেবারে নিখাদ সোনা, এর মধ্যে বিন্দুমাত্র মেকী কি ভেজাল নেই। এত অল্প বয়সে এমন শক্তিমান কেউ কখনও দেখে নি।

ফলে ভাগ্য-জিজ্ঞাসু দর্শনার্থীর সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। আরও

ভেঙে পড়ত, হয়ত শহরের অর্ধেক লোকই এত দিনে ওদের বাসায়—আনন্দ মন্দিরের অতিথি-নিবাসে এসে হানা দিত, যদি না এঁদের তরফ থেকেই একটা বাধা থাকত।

এঁদের বোধ হয় এ অভিজ্ঞতা পূর্বে অন্য দেশেও হয়েছে, এই ব্যাকুল ভবিষ্যৎজ্ঞানেচ্ছু দর্শকের ভীড়।

তাই পূর্বাহ্ণেই সতর্ক হয়ে এঁরা দর্শন নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করেছেন একটা।

কারণ দেখিয়েছেন যে, আচার্যের সময় অল্প, পূজা-পাঠ-অধ্যয়ন, পুঁথি নকল প্রভৃতিতে অনেকটা সময় লাগে—এ ছাড়া অধ্যাপনার কাজ তো আছেই—সুতরাং একটি নির্দিষ্ট সময়, অপরাহ্ণের সাড়ে সাত দণ্ডকাল ছাড়া তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়া সম্ভব নয়।

তাও যদি যারা আগে আসবে তারাই দর্শন পাবে এই ধরনের ব্যবস্থা থাকত তো, বোধ করি কারও কিছু বলবার ছিল না। এঁদের রীতিনিয়ম কিছু অন্যরকম, কতকটা যথেচ্ছাচারিতার মতো। অন্তত তিন দিন আগে ছাত্রদের কাছে নাম লিখিয়ে আসতে হবে, তাঁরা সময় নির্দিষ্ট ক'রে দেবেন, সেই সময় ও তারিখ ছাড়া দেখা হবে না, এ কথা পূর্বাহ্ণেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এই মর্মের একটি লেখনও সঙ্গে-আনা প্রশস্ত ভূর্জপত্রে লিখে অতিথি-শালার বাইরে টাঙ্গিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ফলে, বহু লোকই প্রত্যহ হতাশ হয়ে ফিরতে লাগল। অবশ্য তাতে ঔৎসুক্য এবং আগ্রহ কিছুমাত্র কমল না, নিত্য বহু লোক ঐ সাক্ষাৎকারের সময় বাইরে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতে লাগল।

কেউ হাত দেখিয়ে বা কোষ্ঠী দেখিয়ে বেরিয়ে আসামাত্র এরা তাকে ঘিরে ধরে এবং জানতে চায়—কী রকম গণনা করে এই প্রায়-বালক জ্যোতিষীঠাকুর। যা শোনে—সকলেই অভিভূত, মুগ্ধ—তাতে আগ্রহ বেড়েই যায় আরও।...

শেষে একদিন এই তরুণ পশ্চিমদেশীয় জ্যোতিষীর খ্যাতি সাধারণের গণ্ডী ছাড়িয়ে অসাধারণ্যে গিয়েও পৌঁছল।

রাজপ্রাসাদের পরিখা-প্রাচীর সান্ত্রী পাহারা ভেদ ক'রে স্বয়ং রাজমাতার কানেও কথাটা উঠল যে, ভারতবর্ষ থেকে এক আশ্চর্য জ্যোতিষী এসেছেন, তাঁর গণনা অভ্রান্ত, তিনি ত্রিকালজ্ঞ, সর্বদর্শী।

রাজমাতা সায়ীর কৌতূহল ও ঔৎসুক্য প্রবল হয়ে উঠল। তিনি এই জ্যোতিষী সম্বন্ধে আরও সংবাদ সংগ্রহ করার আদেশ দিলেন। অধিকতর তথ্য।

সংবাদ যা পেলেন তাতে ঐ একই কথা সমর্থিত হ'ল, এই তরুণ পণ্ডিত অসামান্য শক্তিধর, ঐশীশক্তির অধিকারী বললেও অত্যুক্তি হয় না!

নামও জানা গেল এই মায়াধর ঐন্দ্রজালিক গণৎকারের—তিলক আচার্য। দেশ—সুদূর পশ্চিমে, বিক্রমশীলায়।

রাজমাতা সায়ী আর স্থির থাকতে পারলেন না। কৌতূহলে অস্থির

হয়ে উঠে এক বার্তাবাহক প্রেরণ করলেন।

রাজমাতা স্বয়ং আচার্যদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান, ওঁর কখন অবসর হবে জানলে তিনি শিবিকা প্রেরণ করবেন ওঁকে নিয়ে যাবার জন্য।

আচার্য বার্তাবাহকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন না, তাঁর প্রধান ছাত্র বাসুদেব জানিয়ে দিলেন যে, আচার্যদেবের পক্ষে রাজপুরীতে গিয়ে রাজমাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা সম্ভব হবে না, তবে যদি তিনি দয়া ক'রে এই অতিথিশালার বাসভবনে আসেন, তাঁর ইচ্ছা জানালে সেই সময় আচার্য কোন কাজ রাখবেন না, রাজমাতার শুভাগমন প্রতীক্ষা করবেন।

বিদেশী তরুণ যুবকের এই ধৃষ্টতায় রাজমাতা বিরক্ত হয়ে অধর দংশন করলেন; কিন্তু তার প্রস্তাবে সম্মত হওয়া ছাড়া কোন উপায়ও দেখতে পেলেন না।

প্রথমত বিদেশী, তার প্রতি কোন অসম্মানসূচক আচরণ করা যায় না—কে জানে, সে অসৌজন্যের ফলাফল কতদূর পৌঁছবে।

দ্বিতীয়ত বলপ্রয়োগ করলে তাকে শাস্তি দেওয়া যেতে পারে—কিন্তু ভবিষ্যৎ জানার কোন সুবিধা হবে না তাতে।

সেটা মস্তিষ্ক থেকে বার করার কোন যন্ত্র আবিষ্কৃত হয় নি।

সুতরাং তিনি এই অবমাননা নীরবে পরিপাক ক'রে দিন-দুই পরে পুনরায় এক দূত প্রেরণ করলেন—রাজমাতা আচার্যের প্রস্তাবেই সম্মত আছেন। একদিন মধ্যাহ্নে সময় দিলে তিনিই আসবেন ওঁকে দর্শন করতে।

তিলক এইটেই চাইছিল।

এই জন্যই তার এত আয়োজন, এত অভিনয়, এত জাল বিস্তার করা।

বাক্যদত্ত শুধু তো নরপতিসিংহই ছিলেন না, বাক্যদত্ত তিলকও যে!

তারা দেবীর শেষকৃত্য যে করতে হবে ওকে। নইলে তার আত্মা তৃপ্ত হবে না, স্বর্গে যেতে পারবে না।

সে আত্মা এইখানে 'নিরালম্ব বায়ুভূতো' অবস্থায় অপেক্ষা করছে তিলকের জন্য—শেষ তর্পণের আশায়।

তার নাম লিখতে হবে এখানে—তার শ্মশানশয্যায়—তিলকের প্রতিশ্রুতি আছে তারার কাছে।...

নরপতিসিংহ অবশ্য আগে তিলকের কাছে যান নি।

রাজনীতির কতকগুলো অলিখিত আইন আছে; রাজবংশের লোক, রাজার আত্মীয় বিদেশে গেলে সেখানকার রাজার সঙ্গেই আগে সৌজন্য-বিনিময় করতে বাধ্য। নরপতিসিংহও তাই আগেই রাজা যোধমল্লদেবকে সংবাদ পাঠিয়েছিলেন। যোধমল্লদেব কন্যার শ্বশুর হিসাবে সম্মান জানাতে স্বয়ং রাজ্যসীমা পর্যন্ত প্রত্যুদ্গমন ক'রে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন, সবিনয়ে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিজের প্রাসাদে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন—কিন্তু নরপতি-সিংহ তা যান নি।

তিনিও সবিনয়ে ও সসম্মানে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন সে আতিথেয়তা।

করজোড়ে, লজ্জিত নতমুখে, শোকার্তকণ্ঠে বলেছিলেন, 'আপনার এ আতিথ্য নিতে পারলে আমিই সবচেয়ে সুখী হতাম মহামাননীয় পট্টিকেরাধিপতি, ক্রমাগত চলে এত দূর এসেছি, পথশ্রমে খুবই ক্লান্ত, আপনার আশ্রয়ে থেকে বিশ্রাম করতে পারলে শরীরটাও হয়ত একটু সবল হ'ত—হয়ত আরও কয়েকটা দিন বাঁচতে পারতাম।···কিন্তু সে অধিকার আমার নেই। আমি—মানে আমার বংশই আপনাদের কাছে অপরাধী—শত্রু হয়ে গেছে। রাজন, আপনি যদি আমাকে এই মুহূর্তে বধ করেন তো আপনার কিছু মাত্র অন্যায় হবে না, আমিও হাসিমুখে আপনাকে আশীর্বাদ করতে করতে মরব।'

বলতে বসেও যেন মুখে বাধে শেষ মুহূর্তে।

একটু থেমে মাথা আরও নত ক'রে বলেন, 'আমার পৌত্র, বর্তমান পগানাধীশ্বর নরসূর শুধু তার পিতা—আমার ভ্রাতুষ্পুত্র মহান নৃপতি অলাঙ্গসিথুকে এবং নিজের অগ্রজকে হত্যা ক'রেই ক্ষান্ত হয় নি, তার বিমাতা, আপনার কন্যা তারা দেবীকেও বিনা অপরাধে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে।··· যদি সাধ্য থাকে আপনি প্রতিশোধের জন্য প্রস্তুত হোন, আমি সর্বতোভাবে আপনাকে সাহায্য করব, পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব। আমার সন্তানরা, আমার যা সৈন্যাদি আছে, আমার অর্থ—সব কিছুই আপনার ইচ্ছার বা আদেশের অপেক্ষায় প্রস্তুত থাকবে।...আমার ভ্রাতৃজায়া মহামান্যা সেবন্তী দেবী, যিনি আপনার কাছ থেকে রাণী তারা দেবীকে যাচ্ঞা ক'রে নিয়ে গিয়েছিলেন—তাঁর অন্তিম অনুরোধ—এই অনাচারের শোধ যেন ওঠে। তাতে তাঁর বংশ লোপ পেয়ে যায় সেও ভাল।'

চমকে ওঠেন যোধমল্লদেব, শিরে করাঘাত ক'রে সেইখানেই বসে পড়েন।

এসব কোন কথাই তিনি শোনেন নি।

জামাতা অলাঙ্গসিথু নিহত হয়েছেন, হত্যাকারী নরসূর এখন পগানের সিংহাসন, এইটুকু মাত্র সংবাদ পেয়েছিলেন।

তারার মৃত্যু-সংবাদ এখনও পর্যন্ত এদেশে পৌঁছয় নি।

বহুক্ষণ পরে, কথা বলার মতো শক্তি ফিরে পেতে, বিস্মিত যোধমল্লদেব প্রশ্ন করেছিলেন, 'তবে কি রাজমাতা সেবন্তী দেবী এহত্যাকাণ্ড দেখে গেছেন? কিন্তু আমরা যে শুনেছিলাম তিনি আমার জামাতার আগেই—'

'পার্থিব দৃষ্টিতে দেখেন নি সেবন্তী দেবী, সুদূরপ্রসারী দিব্যদৃষ্টিতে এই পরিণাম দেখে যেতে পেরেছিলেন। সেজন্য তাঁর অনুশোচনারও সীমা ছিল না। ঐ সরলা অপাপবিদ্ধা বালিকার এই শোচনীয় দুর্দশা তাঁর জন্য ঘটল—তিনিই এর জন্য মূলত দায়ী—এই ভেবে মৃত্যুকালে অত্যন্ত অশান্তি ভোগ ক'রে গেছেন।···শেষ পর্যন্ত আমাকে এই কাজের ভার দিয়ে—আমাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়ে তবে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তাঁর অন্তিম ইচ্ছা ও অনুরোধ, এই পাপের যেন শাস্তি দেওয়া হয়, এই অনাচারের যেন শোধ ওঠে, অন্তত সে চেষ্টা করা হয়।'

একে একে সব কথাই শুনেছেন যোধমল্লদেব।

নরপতিসিংহ কিছুই গোপন করেন নি। যতটা তিনি প্রত্যক্ষভাবে জানতেন, যতটা লোকমুখে শুনেছেন—এবং যেটা তাঁর অনুমান—সব যথাযথ বলেছেন পট্টিকেরাধিপতিকে।

এমন কি বহু পূর্বের কথাও—সেবন্তীর এই উপযাচিকা হয়ে কন্যা প্রার্থনার মূলে কোন্ মনোভাব কাজ করেছিল সে কথাও এত দিন পরে যোধমল্লদেব জানতে পারলেন।

কিন্তু সে যাই হোক, প্রতিশোধ তিনি নিতে পারবেন না। তাঁর যা বাহিনী, খুব বেশী হ'লেও তিনি সহস্রের বেশী সৈন্য তাঁর নেই, তাও অধিকাংশই পদাতিক, সামান্য কিছু রণহস্তী—এই মাত্র সাকুল্য শক্তি তাঁর। তা ছাড়া, যুদ্ধ মানে প্রচুর অর্থ ব্যয়, পট্টিকেরার রাজকোষের এমন সামর্থ্য নেই যে, ঐ তিন হাজার লোকেরও অরিমর্দনপুর অভিযানের ব্যয় বহন করে। তা না হ'লেও—এই ক'টি লোক নিয়ে পাহাড়-পর্বত ডিঙ্গিয়ে যুদ্ধযাত্রার কথা চিন্তা করাও বাতুলতা। সে রাজ্যের প্রচণ্ড শক্তি ক্ষয় হ'তে হ'তেও যা অবশিষ্ট আছে—দশটা পট্টিকেরার সাধ্য নেই যে, সমবেতভাবে তার সামনে দাঁড়ায়।

নরপতিসিংহকেও স্বীকার করতে হ'লে—এ যুক্তির যাথার্থ্য।

একটাও অসমীচীন কথা বলেন নি যোধমল্লদেব। সত্যই এ চেষ্টা বাতুলতা ছাড়া কিছু নয়। আর সে তো তিনি এখানে আসার আগেই জানতেন। বলেও ছিলেন সেবন্তী দেবীকে।

সুতরাং এ ক্ষেত্রে তাঁর অবশিষ্ট যে কর্তব্য—বরং বলা যায় প্রধান কর্তব্য—সেইটেই পালন করলেন। রাজার অনুমতি নিয়ে লোক দিয়ে তিলককে ডেকে পাঠালেন। ওকে জানাতে পারলেই তাঁর ছুটি—সেবন্তীর কাছে দায়মুক্ত।

তিলকের কাছেও কিছুমাত্র রেখে-ঢেকে বললেন না। রাজা যোধমল্লদেবকেও যা বলেছিলেন, পূর্বাপর সমস্ত ঘটনা, ঘটনার সূত্রপাত বা আদিপর্বসুদ্ধ খুলে বললেন।

দীর্ঘ পুরাবৃত্ত বিবৃত ক'রে, সেবন্তী দেবীর শেষ অনুরোধ এবং তিলক সম্বন্ধে তাঁর আশা বা ধারণার কথাটুকুও জানিয়ে নরপতিসিংহ ওঁর বক্তব্য শেষ করলেন।

আশ্চর্য এই, অন্তত তিলকের কাছে আজও এ ঘটনা নিদারুণ বিস্ময়কর ও সুগভীর অর্থবহ—এ জীবনে ওই তাঁর সর্বশেষ কথা বলা।

সেই যে মৌন অবলম্বন করলেন, আর একটিও কথা বলেন নি নরপতিসিংহ।

অস্ফুট একটা যন্ত্রণাসূচক শব্দ ক'রে সেইখানে সেই আসনের ওপরই ঢলে পড়েছিলেন।

তারপর আরও দু'তিন দিন বেঁচে ছিলেন, কিন্তু বাক্শক্তি ফিরে আসে

নি। ঐ দুর্বল শরীরে ক'দিন যে বেঁচেছিলেন সেটাই যথেষ্ট আশ্চর্য—কারণ এই ক'দিনই তাঁর মস্তিষ্ক থেকে অবিরাম রক্তক্ষরণ হয়েছে—কিছুতে, কোন চিকিৎসাতেই সে রক্তপাত বন্ধ করা যায় নি।...

প্রিয়তমার শোচনীয় মৃত্যু-সংবাদে যথেষ্ট আঘাত পেয়েছিল তিলক, কিন্তু এই হিতাকাঙ্ক্ষী স্নেহশীল ধর্মভীরু প্রেমিক বৃদ্ধের মৃত্যুতেও কম আঘাত বোধ করে নি।

এই লোকটি ভেতরে ভেতরে একেবারে ভেঙ্গে এসেছিলেন। তবু প্রাণপণ বলে, সুদ্ধমাত্র ইচ্ছাশক্তিতেই যেন এতকাল ধরে এই দীর্ঘ বিপদসঙ্কুল কণ্টকর পথ অতিক্রম ক'রে এসেছেন—এই সংবাদটুকু পৌঁছে দিয়ে কর্তব্য পালন করতে।

কর্তব্য পালন বলাও ভুল—প্রেমাস্পদের অন্তিম ইচ্ছাটুকু পূরণ করতে।

যেন এইটুকুর জন্যই প্রাণটা ধরে রেখেছিলেন তিনি।

ইচ্ছামৃত্যু পিতামহ ভীষ্মের মতো—কাজ শেষ হওয়া মাত্র সেটা ত্যাগ করলেন, অপ্রয়োজন জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের ন্যায়।

কেন জানি না তিলকের মনে হ'ল—বৃদ্ধ আগেই মারা গিয়েছিলেন—সেবন্তী আর তারার আত্মাই ওঁর মৃতদেহটাকে টেনে এনেছে এতদূর। ওকে প্রতিশোধে উদ্বুদ্ধ উত্তেজিত করতে।

এ মৃত্যু যেন ঈশ্বরের ইঙ্গিতও, তাঁর ইচ্ছাতেই বৃদ্ধ একান্ত ভগ্নদেহে এই সংবাদটি ওকে পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন।

অর্থাৎ তিলকের ওপর আরও একটি মৃত্যুর দায় এসে চাপল।

প্রতিশোধ প্রচেষ্টার আরও একটি প্রবল কারণ।

॥ ১৬ ॥

তারার শোচনীয় মৃত্যু-সংবাদের পূর্বাপর ইতিহাস বেশ ধীরভাবেই শুনেছিল তিলক। ধীরভাবেই বসে দেখেছিল কর্তব্য সমাপনান্তে নরপতিসিথুর অন্তিম-শয্যা গ্রহণ।

বিলাপ করে নি, উষ্মা প্রকাশ করে নি, উত্তেজিত হয় নি—এমন কি এক-ফোঁটা চোখের জলও ফেলে নি।

পাথরের মতো বসে শুনেছিল, অথবা শুনে পাথর হয়ে গিয়েছিল।

প্রচণ্ড আঘাতের ফলে অনুভূতির শক্তি পর্যন্ত ছিল না।

দেহটাই শুধু স্তম্ভিত হয়ে যায় নি, মস্তিষ্কসুদ্ধ নিষ্ক্রিয় হয়ে চিন্তা-শক্তি লোপ পেয়েছিল কিছুকালের জন্য।

কি শুনল, কি ঘটেছে, কি ঘটছে—কোন জ্ঞানই ছিল না, কিছুই বোঝে নি, বুঝতে পারে নি।

এই শিলীভূত জড়তার মধ্য দিয়েই দু'তিনটে দিন কেটেছে।

বাবা-মা অনেক রকমে নানা কথায় চেতনা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছেন—কোন ফল হয় নি।

ওঠে নি, খায় নি, কারও সঙ্গে কথা বলে নি, বাবা-মার কথারও উত্তর দেয় নি।

তাঁরা, তিলকের অন্তরঙ্গ বন্ধুরা—যাঁরা ওদের প্রণয়-ইতিহাসের খবর রাখে—বার বার কাঁদাবার চেষ্টা করছে, কেউ একবিন্দু জল আনতে পারে নি, শুষ্ক প্রায়-অচেতন দুটি চোখে।

তারপর—সহসা সে নিজেই সচেতন সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

যেন একটানা একটা দীর্ঘ নিদ্রা থেকে জেগে উঠে সব জাড্য ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে এক নিমেষে।

নরপতিসিংহের মৃত্যু-সংবাদই যেন এক প্রবল প্রত্যাঘাতে তার পূর্ব আঘাতের স্তম্ভিত অবস্থা কাটিয়ে দিয়েছে।

তবু তখনই ব্যস্ত হয়ে ওঠে নি। কোন রকম অধীরতা প্রকাশ করে নি। তার মুখে-চোখে এক্ষেত্রে স্বাভাবিক কালিমা ছাড়া শোকের কোন চিহ্নও আর খুঁজে পায় নি কেউ।...

আসলে যে সত্যই নিদ্রা না হোক, স্বপ্ন থেকেই জেগে উঠেছে, সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

কিন্তু স্বপ্নই কি ?

এই তিনদিন তিনরাত্রি তার চোখের পাতায় তন্দ্রা নামে নি। সকলেই দেখেছে তা, স্থির দৃষ্টি মৃত্তিকায় নিবদ্ধ ক'রে বসে আছে।

সুতরাং স্বপ্ন বলবে কি ক'রে!

সে দেখেছে, স্পষ্টই দেখেছে—তারা দেবী, তার দুটি আয়ত লোচন অভিমানের অশ্রুভরা, এইখানে সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলছে, 'কৈ, তুমি এলে না ? কথা দিয়েছিলে যে আমাকে, মনে নেই ? আর কতকাল অপেক্ষা করব ? ওরাও থাকতে দিল না, তুমি যদি না যাও—আমি কোথায় দাঁড়াব, কার কাছে আশ্রয় নেব ?'

হয়ত স্বপ্ন, হয়ত কল্পনা—মায়া, মতিভ্রম—যাই হোক, তাতেই ওর জড়তা কেটে গেছে,—এক সুতীব্র আঘাতে জ্ঞান হারিয়েছিল যেমন, তেমনি আর এক আঘাতে স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়-শক্তি ফিরে পেয়েছে আবার।

উঠে সহজভাবেই স্নানাহার করেছে, তারপর অন্তরঙ্গ বন্ধুদের নিয়ে আলোচনায় বসেছে।

সব দিক বিবেচনা ক'রে, হিসাব ক'রে আটঘাট বেঁধে কাজ করতে গেলে যতটা স্থৈর্য ও ধৈর্য প্রয়োজন—তার কিছুমাত্র অভাব ঘটে নি।

কোন বিপদকে উড়িয়ে দিতে চায় নি, কোন অকারণ ঝুঁকি নেওয়ার কথা ভাবে নি।

শুধু যে-বন্ধুরা ওর সঙ্গে যেতে চেয়েছে তাদের সতর্ক ক'রে দিয়েছে যে, ওদের এ যাত্রা অবধারিত মৃত্যুর দিকে। একটা দৈব অনুকম্পা ছাড়া বেঁচে ফিরে আসার কোন সম্ভাবনা নেই।

সুতরাং যে যাবে সে যেন সেই কথাই চিন্তা ক'রে যায়।

সাধারণত তরুণ প্রাণ এসব কথাই চিন্তা করে না। এখনও করল না।

তাদের রাজকুমারীর প্রতি অবিচার হয়েছে আগাগোড়া।

বিদেশে বিভুঁয়ে বিজাতীয় বিধর্মীর সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়েছে—বাপের চেয়েও বয়সে বড় এক প্রৌঢ়ের সঙ্গে।

তাতেও দুর্ভাগ্য-দুর্দশার শেষ হয় নি—অকাল-বৈধব্যের সঙ্গে সঙ্গে এসেছে সপত্নীর দাসী হয়ে জীবন-যাপন করা, শত লাঞ্ছনার অন্নগ্রহণ—তারপর এই বিনাদোষে বিনা কারণে অপঘাত মৃত্যু।

তরুণ প্রাণে করুণা, সহানুভূতি, প্রতিশোধ-স্পৃহা জাগাবার পক্ষে এই-ই যথেষ্ট।

এ ওদের কাছে জাতির অপমান, দেশের অপমান।

তার ওপর সে রাজকুমারী তাদের বন্ধুর জীবন-সর্বস্ব, জীবনের একমাত্র দীপশিখা, বেঁচে থাকার একমাত্র কারণ।

তিলকের সবক'টি বন্ধুই দৃঢ়সংকল্প—যদি তিলক যায়, তারাও ওর সঙ্গে যাবে।

মরতে হয় সকলে মরবে।

কাজ সফল ক'রে কেউ ফিরে আসতে পারে ফিরবে—তারা মৃত সঙ্গীর জন্য দুঃখ করবে না।

অনেক কষ্টে তিলক তাদের নিবৃত্ত করল।

অনেক লোক নিয়ে যখন যাওয়া সম্ভব নয়—অর্থাৎ সৈন্যবাহিনী নিয়ে অভিযান—তখন বেশী লোক যাওয়া উচিত হবে না কোন মতেই।

হঠাৎ এতগুলো বিদেশী লোক গেলে নানারকম সন্দেহ দেখা দেবে সেখানকার অধিবাসীদের—শাসনকর্তারা সতর্ক হয়ে উঠবেন—নজর রাখবেন তাদের ওপর। তার ফলে হয়ত ওদের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

সে অনেক ভেবে সাতটি সঙ্গী বেছে নিল। মোট আটজন। যদি দুদলে ভাগ হয়ে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে শহরে প্রবেশ করে, অতটা দৃষ্টিকটু হবে না।

বাকী সকলকে বলল, 'যদি আমরা ব্যর্থ হই—তোমরা যা পারো ক'রো। নতুন কোন প্রচেষ্টা—নতুন পথে। সে জন্যেও তোমাদের এখানে থাকা দরকার।'

মন স্থির ক'রে রাজার কাছে গেল তিলক, অনুমতি চাইতে।...

রাজা প্রথমটা চমকে উঠেছিলেন।

ব্যাকুল হয়ে ব্যস্ত হয়ে নিষেধ করেছিলেন এমন দুঃসাহসিক কাজ করতে, এমন নিশ্চিন্ত আত্মহত্যার মধ্যে যেতে।

কিন্তু এক কথায় তাকে নিরুত্তর ক'রে দিল তিলক।

শান্ত অথচ অনমনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে অবিচল প্রতিজ্ঞায় প্রদীপ্ত দৃষ্টিতে উত্তর দিল, 'আমরা আত্মহত্যা করতেই যাচ্ছি রাজাধিরাজ, মৃত্যু অবধারিত জেনেই যাচ্ছি। যদি সফল হই, যদি আমাদের দেশের রাজরক্তের মূল্য আদায়ও করতে পারি—তাহলেও নিজেদের প্রাণরক্ষা সম্ভব হবে বলে আশা রাখি না।

...আর মহারাজ-চক্রবর্তী যদি এ যাত্রায় বাধা দেন—তাহলেও আমাদের জীবনের আশা করবেন না, কারণ আমরা ইষ্টদেবতার নামে শপথ করেছি—হয় এ অন্যায় হত্যার শোধ নেব, নয়তো নিজেদের প্রাণ দেব—এর কোন অন্যথা হওয়ার উপায় নেই।'

সে কথা শুনে, সেই স্থির অচঞ্চল দৃষ্টির দিকে চেয়ে নির্বাক হয়ে গেলেন রাজা যোধমল্লদেব।

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'তবে যাও, কি আর বলব!...কিন্তু তোমরা এই মাত্র আটটি বালক—কিভাবে ঐ প্রবল শত্রুকে বিনষ্ট করার ভরসা রাখছ—কোন্ পথে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবে মনস্থ করেছ—কিছু জানতে পাব না?'

তিলক মাথা হেঁট ক'রে করজোড়ে জানায়, 'আপনি যদি আদেশ করেন অবশ্যই বলতে হবে। তবে শত্রু যেখানে এত প্রবল, একেবারেই অসমসংগ্রামে যাত্রা করছি—সেখানে মন্ত্রগুপ্তি একান্ত প্রয়োজন নয় কি মহারাজ? কোথা দিয়ে কোন্ কথা প্রকাশ হয়ে পড়ে কেউ জানে না।'

'তবে থাক!' আর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন রাজা, 'কিন্তু—আমি তোমাদের কোন সাহায্যও করতে পারি না, আমার দিক থেকে করার কি কিছুই নেই?'

'আপনি আমাদের আশীর্বাদ করুন মহারাজাধিরাজ—যেন দেশের নামে, আপনার নামে না কোন কলঙ্ক-কালিমা লেপন করি—যেন আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ ক'রে দেশমাতৃকার কাছে আত্মবলিদান দেওয়ার মতো মনের জোর শেষ পর্যন্ত থাকে। আপনার আশীর্বাদই আমাদের বড় সহায়।'

'তোমাদের আশীর্বাদ করার স্পর্ধা আমি রাখি না বৎস। আমার যা করা উচিত ছিল আমি পারলাম না—তোমরা সেই কাজের ভার নিয়েছ, বীর তোমরা, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি তোমাদের ব্রত সফল করুন।'

তিলক আর তার তিন বন্ধু জ্যোতিষাচার্য এবং তাঁর ছাত্ররূপে যেদিন পগানে প্রবেশ করল, তার কয়েকদিন আগেই ওর অন্য চারজন সঙ্গী ভিক্ষুর বেশে এ শহরে এসে গেছে।

তারা চারজনে ছড়িয়ে পড়ে অন্য অন্য মন্দিরে বা বিহারে আশ্রয় নিয়েছে।

এ দলের সঙ্গে ও দলের যে কোন সম্পর্ক আছে—তা কারও অনুমানমাত্র করা সম্ভব নয়।

পথে দেখা হ'লেও কেউ কাউকে চিনতে পারে না—নিতান্ত অপরিচিতের মতো তাকিয়ে দেখে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

শুধু এরা, মানে তিলকের সঙ্গী ছাত্রবেশী অনুচররা যখন শিক্ষার্থীর ভূমিকা নিয়ে মঠে-মন্দিরে-বিহারে ঘোরে পুঁথি দেখার নাম ক'রে, তখন—সেই একই কাজে নিযুক্ত থাকা অবস্থায় গোপন সংবাদ আদান-প্রদান হয় দু' দলে।

অনেক চিন্তা ক'রে, এই ভাবে—বলতে গেলে ব্যূহ রচনা করেছে তিলক।

অনেক ভেবে দেখেছে সে। তিনটি পরিচয়ে বিদেশী পুরুষের রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশ সম্ভব, তিন ভাবে। চিকিৎসক, জ্যোতিষী আর সন্ন্যাসী।

চিকিৎসক হিসাবে খ্যাতি লাভ করতে গেলে কিছু শাস্ত্রজ্ঞান দরকার, রোগ নিরাময় করা ফাঁকির কাজ নয়। সন্ন্যাসী সাজা অপেক্ষাকৃত সহজ—তবে সেক্ষেত্রেও কিছু আধ্যাত্মিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। সাধনমার্গে অন্তত খানিকটা অগ্রসর না হ'লে—শুধু মিথ্যা জুয়াচুরির বলে সন্ন্যাসীর খ্যাতি রাজকর্ণে পৌঁছানো কঠিন।

এদেশে ভিক্ষু সন্ন্যাসীর যে রকম প্রাচুর্য, তাতে বেশীক্ষণ ফাঁকি চালানোও বিপজ্জনক, ধরা পড়ার সম্ভাবনা প্রতিপদে।

অতএব বাকী থাকে জ্যোতিষী পরিচয়। তিলক জ্যোতিষশাস্ত্র কিছু অধ্যয়ন করেছে, ও বিষয়ে একেবারে গণ্ডমূর্খ নয়।

তাছাড়া, এতে আশু বিপদের সম্ভাবনা কম।

অতীতটা যদি কোনমতে ঠিক ঠিক বলা যায়—তাও ষোল আনা মেলার প্রয়োজন নেই—কিছু কিছু মিললেই হ'ল—তাহ'লে আর চিন্তা নেই।

ভবিষ্যৎ মেলানোর পালা তো ভবিষ্যতে, সেটা একটু দূরে সরিয়ে রাখলেই হ'ল।

'আজ থেকে দু'মাস পরে তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হবে, ন'মাস পরে তোমার শত্রু বশ্যতা স্বীকার করবে, দু'বৎসর পরে তোমার ঘরে মহাপুরুষ সন্তান আসবে'—এ সব আশ্বাসের কোন মার নেই।

অন্তত ঐ ক' মাসের আগে যাচাই করার কোন প্রশ্নই উঠছে না।

তাও—না মেলে, মুক্তি পাবার সহস্র পথ খোলা। 'কী করবে, হওয়ারই তো কথা! মঙ্গল বক্রী হয়েই তো—।'

কিম্বা, 'তোমার গোচরটা যে শুদ্ধ নয়, সেই জন্যেই।...বৃহস্পতি তোমার ষষ্ঠে পূর্ণ দৃষ্টি রেখেছে। সিদ্ধি তো অবশ্যম্ভাবী, মনে হয় রবিটা নীচস্থ বলেই—। ওহো, তোমার লগ্নটা কি যেন—কর্কট না? তাই তো বলি! তখন অতটা মনে ছিল না—কর্কট লগ্নের জাতককে যে এই চার মাস রাহু একেবারে মাথায় পা দিয়ে ডুবিয়ে রেখেছে—।' ইত্যাদি—।

আরও ভাল, উল্‌টো চাপ দেওয়া—'নিশ্চয় তোমার জন্ম-সময়টা ঠিক ঠিক বলো নি, অথবা জন্মস্থানটায় কিছু গোলমাল আছে নিশ্চয়—এখানে জন্মাও নি। মাকে জিজ্ঞাসা ক'রে এসো দিকি।'

না, ভবিষ্যৎ নিয়ে বিন্দুমাত্র আশঙ্কা নেই, প্রয়োজন যা—ভূত অর্থাৎ অতীতকালের খবরটি সঠিকভাবে বাতলানো।

পূর্ব-জীবনের ঘটনা কিছু কিছু বলে দেওয়া।

তাও কিছু কিছু সাধারণ ব্যাপার আছে, 'আচ্ছা, পনেরো-ষোল বছরের সময় কি আপনার কোন কঠিন পীড়া হয়েছিল?'—এ প্রশ্ন নিঃসঙ্কোচে করা যায়। এক বছরে কোন পীড়া হবে না এ সম্ভব নয়, আর নিজের পীড়া কে

না কঠিন ভাবে?

তেমনি ধরুন যদি প্রশ্ন করেন—'আপনার একুশ বাইশ বছর বয়সের সময় খুব কি একটা আশাভঙ্গ ঘটেছিল?'

একুশ বাইশ বছরটা এমন বয়স—যখন মানুষের আশার অন্ত থাকে না।

প্রেমের ক্ষেত্রে, কর্মক্ষেত্রে—মানুষ নানা রকম স্বপ্ন দেখে ঐ সময়টায়—তার কিছু না কিছু ব্যর্থ হ'তে বাধ্য।

আপনি প্রশ্ন করলে ভবিষ্যৎ-জ্ঞানেচ্ছু ঠিক ভেবে ভেবে সেইগুলো বার করবে।

কিন্তু এই ধরনের আন্দাজে-ঢিলছোঁড়ায় কাজ চালানো যায়—খ্যাতি লাভ করা মুশকিল।

কিছু কিছু নির্ঘাৎ সত্য বলতে হবে—যা তার একান্ত গোপনীয়, যা তার হৃদয়ের গভীরে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলেছে।

যথার্থ গণনা ক'রে এসব বলতে গেলে যতটা শিক্ষা প্রয়োজন ততটা তিলকের নেই।

সেই জন্যই সে অন্য পথ ধরেছে। কৌশলের পথ।

ওরা সারাদিনই ঘুরছে, পাড়ায় পাড়ায়, রাস্তায় রাস্তায়, অগণিত মানুষের সঙ্গে মিশেছে।

ওদের পক্ষে এইসব কৌতূহলী ভাগ্য-জিজ্ঞাসুদের সম্বন্ধে কিছু না কিছু চমকপ্রদ তথ্য আহরণ করা দুরূহ কাজ নয়।

গৃহভৃত্য, ঈর্ষী আত্মীয়-প্রতিবেশী, স্থানীয় পণ্য-ব্যবসায়ীরা—নিন্দা করার জন্য উন্মুখ, উৎসুক।

বিদেশী জ্যোতির্বিদের সন্ধান পেয়ে যারা ভাগ্যবিচার করাতে আসে তারা নিতান্ত সামান্য লোক বা কেওকেটা কেউ নয়। একটু অবস্থাপন্ন ধনী ব্যবসায়ী, জমিদার, কি রাজপুরুষদের পক্ষেই এ কৌতূহল চরিতার্থ করা শোভা পায়।

আর সেই জন্য—তাদের সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করাও সহজ।

এই কারণেই কাজের চাপের অজুহাতে কয়েক দিন সময় নেওয়া—সংবাদ সংগ্রহের জন্য।

খুব অল্প ক্ষেত্রেই—জন দুই-তিন হয়ত হবে মোট—তিলকের গুপ্তচর-চক্র কোন সংবাদ পায় নি, (শুধু চারজন ভিক্ষুই নয়, এই তিন শিক্ষার্থীও কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করছে বৈকি!) সে-সব জায়গায় নিজের বিদ্যার উপর ভরসা ক'রে কপাল ঠুকে এগিয়ে গেছেন আচার্যদেব, দৈব সহায়—মোটামুটি মিলেও গেছে, স্বভাব, মানসিক গঠন ও অতীতের দু-একটি বিশেষ ঘটনা। যারা গেছে শ্রদ্ধান্বিত হয়েই ফিরেছে।

অবশ্যই এ জাল এই সব লোকের জন্য পাতা হয় নি—শৃগাল শশকের জন্য নয়—সুবৃহৎ হিংস্র জন্তু—ব্যাঘ্র ঋক্ষাদির জন্যই এত আয়োজন।

সে আশাও অচিরকাল মধ্যে সফল হ'ল। রাজমাতা স্বেচ্ছায় দীনতা:

স্বীকার ক'রে ধরা দিলেন ফাঁদে।

তিলক যেতে অস্বীকার করায় তিনি নিজেই এলেন ওর কাছে ভাগ্য গণনা করাতে।

॥ ১৭ ॥

রাজমাতা অবশ্য একা আসেন নি। ভাইকে সঙ্গে এনেছিলেন।

ওদের নিয়ম-অনুসারে তিলক তাঁকে ফিরিয়ে দিতে পারত।

তাতে রূঢ়তা প্রকাশ পেত হয়ত, তবুও ওঁদের তরফ থেকে কিছু বলার থাকত না।

কিন্তু তিলক তা করল না।

রাজমাতুল বর্তমানে এ দেশের কর্তা-ব্যক্তিদের অন্যতম। অচিরকাল মধ্যে তিনিও দর্শনার্থী হ'তে পারেন এই ভেবে সে ইতিমধ্যেই তাঁর সম্বন্ধে প্রচুর সংবাদ সংগ্রহ করেছিল।

সুতরাং তিলকের বন্ধু বাসুদেব এই নিয়মভঙ্গের অনুরোধের জন্য কিছু মিষ্ট তিরস্কার ক'রে শেষ পর্যন্ত দুজনকেই ভেতরের ঘরে নিয়ে গেল, যেখানে কৃষ্ণ অজিনাসনে তরুণ আচার্যদেব উত্তরাস্য হয়ে বসে আছেন।

দক্ষিণে তামার যজ্ঞস্থালীতে তখনও হোমাগ্নি ধূমায়িত; শান্ত গম্ভীর বদন, স্থির আত্মসমাহিত দৃষ্টি।

কিছুকাল সেইভাবেই বসে রইলেন তিন জন। নিতান্ত অর্বাচীন এই আচার্যকে দেখে অবিশ্বাস আসারই কথা, কিন্তু কে জানে কেন ভাই-বোন দুজনের মনেই একটু সম্ভ্রমের উদয় হ'ল, অকারণেই কিছুটা আশংকারও আভাস জাগল। তাঁরা যেন একটু বিব্রত ভাবেই চুপ ক'রে অপেক্ষা করতে লাগলেন—আচার্যদেবের অবসর ও প্রসন্নতার।

অবশেষে তিলকই মৌন ভঙ্গ করল, 'আপনাদের কোন জন্মকুণ্ডলী আছে?'

দুজনেই মাথা নাড়লেন, নেই।

'জন্মদিন, তিথি-নক্ষত্র, বার, জন্মস্থান এসব জানা আছে?'

'তা আছে। কিন্তু নিয়ে তো আসি নি! সব ঠিক স্মরণেও নেই।' ভয়ে ভয়েই উত্তর দিলেন রাজমাতা।

বিরক্তিতে ভ্রূকুটি করল তিলক, 'ভাগ্য-গণনা করাতে এসেছেন—তার কোন উপকরণই আনেন নি। আশ্চর্য!'

'আমরা—মানে শুনেছিলাম—আপনি হাত দেখেই—'

'হ্যাঁ, তাও বলি। কিন্তু সে গণনা ষোল আনা অভ্রান্ত হবে এমন আশা করবেন না। যাক্, দেখি আপনার হাত!'

ইঙ্গিত করলেন রাজমাতুলকেই।

তিনি ব্যস্ত হয়ে কাছে এগিয়ে এসে ডান হাতখানা বাড়িয়ে দিলেন।

অনেকক্ষণ ধরে দেখল তিলক। তারপর চোখ তুলে ওঁর চোখের উপর

স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে বলল, 'আপনি মনের গোপনে বহু দিন ধরে যে উচ্চাশা বহন করছেন, তা সফল হওয়া কঠিন। এই প্রশ্নেরই উত্তর আপনার জানার ইচ্ছা—অথচ ভরসা ক'রে প্রকাশ্যে প্রশ্ন করতে পারছেন না, কেমন তো ? যাক্, আপনি ভীত হবেন না, সে উচ্চাশার বিবরণ এখানে আমি দিতে চাই না·· সাফল্যের প্রধান প্রতিবন্ধক যাকে মনে করছেন—তার জন্য চিন্তা নেই, সে অতি শীঘ্র আপনিই সরে যাবে—ব্যাঘাত আসবে অন্যত্র, সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত স্থান থেকে।'

রাজমাতুলের মুখ পাংশুবর্ণ হয়ে উঠল। সেই কয়েক নিমেষকালের মধ্যেই কপালে বড় বড় ফোঁটায় ঘাম দেখা দিল, তিনি অনেক চেষ্টা করলেন কথা বলবার, কিন্তু বারকতক ঠোঁটটাই নড়ল শুধু—গলা দিয়ে কোন স্বর বেরোল না।

ইতিমধ্যে তিলকের দৃষ্টি কঠোর এবং কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ হয়ে এসেছে।

সে নির্মমভাবে বলে চলল, 'আপনার এ আশা বা কামনা পৈশাচিক বললেও অত্যুক্তি হয় না। এতটা অকৃতজ্ঞতা মানুষের ধারণার অতীত। অবশ্য সে আপনার ব্যাপার—আপনার কৃতকর্মের ফল আপনিই ভোগ করবেন, তার ঋণও আপনাকে শোধ করতে হবে। ঠিক এমনিই এক কারণে আপনার অগোচরে আপনার প্রবল শত্রু ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করছে। আপনি যে অসহায় মেয়েটির সর্বনাশ ক'রে তাকে জীর্ণ পাদুকার মতো এই নিষ্করুণ সংসারে নিক্ষেপ করেছেন—অনায়াসেই তাকে গৃহে স্থান দিতে পারতেন। আপনার অগণিত স্ত্রী ও উপপত্নীর মধ্যে একজন হয়ে থাকতে পেলেই সে বেঁচে যেত—কিন্তু যেহেতু তার পিতা নিতান্ত দরিদ্র, আপনারই নগণ্য কর্মচারী একজন, আপনার অনুগ্রহের মুখাপেক্ষী, জানেন কোন দিনই কোন প্রতিবাদ কি অনুযোগ করতে সাহস করবে না—তাই অবহেলাভরে নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই তাকে ত্যাগ করেছেন—সামান্য কিছু অর্থ সাহায্য দেবার কথাও মনে পড়ে নি আপনার।···আপনার শত্রু সেই সূত্রেই মাথা তুলেছে, সেইখান থেকেই আপনার সাংঘাতিক বিপদ আসন্ন। যান—এখনও যদি পারেন তো কিছু প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করুন গে, নইলে সর্বনাশ অনিবার্য !'

তবুও রাজমাতুল—স্বর্গগত রাজার শ্যালক একটি শব্দও উচ্চারণ করতে পারলেন না। অসহায়ভাবে হাতের উল্টো পিঠে ঘাম মোছবার চেষ্টা করতে গিয়ে দৃষ্টিটাই লবণাক্ত ও ঝাপ্সা ক'রে তুললেন শুধু।

শেষের দিকে যখন তিলকের কণ্ঠ কঠোর থেকে কঠোরতর হয়ে উঠছে, একটা অব্যক্ত যন্ত্রণাসূচক শব্দ মাত্র বেরিয়েছিল গলা দিয়ে—যেন ওকে থামাবার জন্যই অনুরোধ করতে চাইছিলেন—এখন ওর বক্তব্য শেষ হ'তে বিনাবাক্যব্যয়ে উঠে অন্ধের মতো হাতড়াতে হাতড়াতে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন—তিলককে তো কিছু বলতে পারলেনই না—নিজের ভগ্নীকেও একটা সম্ভাষণ ক'রে গেলেন না।

তিলক এবার কঠিন একটা ব্যঙ্গের হাসি হেসে রাজমাতার দিকে তাকাল।

সে চাহনির অর্থ যেন—এখনও নিজের ভাগ্য-গণনার শখ আছে? জানতে চাও নিজের কথাও?

নারীর মুখও ততক্ষণে বিবর্ণ হয়ে উঠেছে, তারও ললাটের কোণে কোণে স্বেদ-কণাগুলি বৃহৎ বিন্দুর আকার ধারণ করছে। সে কেমন একটু ক্ষমা-প্রার্থনার ভঙ্গীতেই বলল, 'ও—ও যে এমন দুর্বৃত্ত তা জানতুম না, জানলে কিছুতে নিয়ে আসতুম না। আমাকে ক্ষমা করবেন।'...

তারপরই সাগ্রহে অনুনয়ের ভঙ্গীতে বলল, 'আচ্ছা—আপনি যে ওর উচ্চাশার কথা বলছেন,—সে কি সিংহাসনের লোভ? আমার ছেলের অনিষ্ট কামনা করছে ও?'

তিলক শীতল কঠিন কণ্ঠে বলল, 'একজনের কথা আর একজনের সঙ্গে আলোচনা করার রীতি নেই—আমাদের এ কাজে। তা করলে কেউই ভরসা ক'রে কোন দিন আমাদের কাছে আসত না।...আপনি দয়া ক'রে আপনার কথাই আলোচনা করুন।'

সায়ী অপ্রতিভভাবে হাতটা বাড়িয়ে দিতে যায়। তিলক বলল, 'স্ত্রীলোকের হাত ধরে কররেখা দেখায় আমার গুরুর নিষেধ আছে। আপনি এই পাশে এসে মাটিতে হাত মেলে ধরুন—তাহলেই হবে।'

অস্ত্র যার হাত দিয়েই স্পর্শ করুক—তারা আর তার স্বামীর আসল হত্যাকারী যে এই স্ত্রীলোকটা তা জানতে বাকী ছিল না তিলকের।

অভিনয়ের জন্য যতই যা করুক—ওর হাত ধরে কররেখা দেখতে পারবে না কিছুতেই।

অন্যদিন অন্য কোন ক্ষেত্রে হ'লে সায়ীর রোষানলে বোধ হয় ভস্ম হয়ে যেত সে ব্যক্তি, যে এ ধরনের কথা কইত।

আজ বড়ই বিপাকে পড়েছে ও।

জোর ক'রে আর যা ই হোক, নির্ভুল ভাগ্য-গণনা করানো যায় না।

অথচ ভাইয়ের দুর্দশা দেখার পর কৌতূহল আরও উগ্র হয়ে উঠেছে।

নিজের হাত না দেখিয়ে ফিরে যেতে পারবে না সে কিছুতেই।

অগত্যা উঠে এসে সুবোধ বালিকার মতো পাশে বসে সামনে হাতটা মেলে ধরতে হয় মাটিতে রেখে।

এবারও অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে দেখে তিলক কররেখাগুলো। তার পর চোখ তুলে সায়ীর মুখের দিকে চেয়ে বলে, 'কী জানতে চান আপনি?'

'আমার ভাগ্য—মানে—আমার ভবিষ্যৎ কেমন যাবে—'

'ভাল না। আপনার সৌভাগ্যের দশা চলে গেছে, এখন যে গ্রহের দশা পড়েছে সে আপনার প্রতি অনুকূল নয়। আপনি একটা গোপন আশার বশে খুব একটা গর্হিত কাজ করেছেন—কিন্তু সে আশা আপনার পুরোপুরি সফল হয় নি। আপনি এই আশার বশে যতই যা করুন—আপনি পূর্ব সৌভাগ্য আর কোনদিন ফিরে পাবেন না।'

রাজমাতা সায়ী কেমন যেন একটা অবশ-অবশ ভাব বোধ করে।

দেখতে দেখতে ঘামে ভেসে যায় তার সর্বাঙ্গ, তালু শুষ্ক হয়ে ওঠে, কথা কইতে কণ্ট হয়।

অতি কণ্টে উচ্চারণ করে, 'আশা সফল না হোক, এমনি দিন আমার কেমন যাবে?'

তিলক ক্ষণকাল মৌন থেকে বলে, 'ভাল তো বিশেষ দেখছি না।···তবে একটা কথা—স্ত্রীলোকের ভাগ্য অনেকখানিই—স্বামী বর্তমানে স্বামীর ভাগ্যের ওপর, বৈধব্যদশা ঘটলে পুত্রের ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে। স্বামী তো আপনার নেই—আপনার হাতে পতিহন্ত্রী রেখা রয়েছে, আপনার বৈধব্য-দশা তো আপনার স্ব-কৃত হওয়ার কথা—সে যাক্‌গে, এখন আপনার ভাগ্য পুরোটা জানতে গেলে আপনার পুত্রের কোষ্ঠী বা কররেখা বিচার করা আবশ্যক।·· মোটামুটি আপনার হাতে যা দেখছি—সামনে বিপুল অন্ধকার, ঘন দুর্যোগেরই আভাস। আপনি—আপনি একটু সাবধানেই থাকবেন। ভাগ্য আর প্রসন্ন হবে বলে মনে হয় না—এখন অপ্রসন্নই হয়ে থাকবে বহুদিন।'

সায়ী আরও দু'একটা প্রশ্ন করল—অধিকাংশই নিজের বিগত জীবন সম্পর্কিত গোপন ঘটনার কথা। অর্থাৎ পরীক্ষা ক'রে দেখতে চায়—তিলকের গণনা কতটা নির্ভরযোগ্য।

তিলক বুঝল তা। আরও নির্মম হয়ে উঠল সে।

সায়ী সম্বন্ধে বহু তথ্যই ইতিমধ্যে তার সংগৃহীত হয়ে আছে।

নরপতিসিথু যথেণ্ট বলে গেছেন—এখানে এসেও অসন্তুষ্ট সাধারণ প্রজাদের কাছ থেকে অনেক শোনা গেছে, তার মধ্যে অবশ্যই কিছু অতিরঞ্জন আছে, সেগুলো বাদ দিয়ে সম্ভাব্য তথ্যগুলোই ব্যবহার করল তিলক।

অনেক কটু কথা বলল, সায়ীর মনের কুৎসিত নগ্ন চিত্র উদ্ঘাটিত করল।

সায়ী আর শুনতে পারল না। সেও শুষ্ক একটা বিদায়-সম্ভাষণ মাত্র ক'রে বিদায় নিল।

যথেণ্ট শোনা হয়েছে তার। আর শোনার সাহস নেই।

এ ছেলেটা সত্যই সর্বজ্ঞ, বেশী ঘাঁটালে আরও কি বলে বসবে কে জানে!

সে ওড়নায় ঘাম মুছতে মুছতে মুখভাবকে যতটা সম্ভব সহজ ক'রে বেরিয়ে এলেও তার মুখের বিবর্ণতা ও হাত-পায়ের মৃদু কম্পন কারও অগোচর রইল না।

রাজমাতা বেরিয়ে গিয়ে শিবিকায় উঠলে একজন অনুচর একটি থালায় ক'রে একথালা স্বর্ণমুদ্রা এনে তিলকের সামনে রাখতে যাচ্ছিল, তিলক কিছু বলার আগেই বাসুদেব বাধা দিল, 'আমাদের আচার্যদেব কারও কাছ থেকে ভাগ্য-গণনার জন্য কোন পারিশ্রমিক নেন না—এ তোমার রাজমাতা কি শোনেন নি? এখনই ফিরিয়ে নিয়ে যাও, নইলে উনি খুব অসন্তুষ্ট হবেন।'

সে লোকটি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইল—কেউ বিনাস্বার্থে বিনা পারিশ্রমিকে এই ভূতের পরিশ্রম করে, তা তার অভিজ্ঞতার বাইরে। বিশেষ একথালা—শতাধিক—স্বর্ণমুদ্রা এই উত্তরীয়ধারী ব্রাহ্মণ অনায়াসে ছেড়ে দিল কোন্ ভরসায়? আরও কি চায় এ?

এর পর আর বিলম্ব ঘটল না।

তিলক যা আশা করেছিল ঠিক সেই মতোই ঘটনার চাকা ঘুরল।

সায়ীর আসবার ঠিক দুদিন পরেই রাজপ্রাসাদ থেকে রাজার নিজস্ব সচিব এলেন আচার্যদেবের সঙ্গে দেখা করতে—স্বয়ং অরিমর্দনাধিপতি আচার্যের সাক্ষাৎপ্রার্থী।

রাজাকে বলা যায় না—অতিথিশালায় এসে ভাগ্য গণিয়ে যেতে।

এতটা বাড়াবাড়ি ঠিক নয়!

তিলকও সে চেষ্টা করল না—বলল, 'আপনার সুবিধামতো সময় বলে যান, আমি প্রস্তুত থাকব।'

দেখা গেল রাজার তাড়া কিছু বেশী। মায়ের মুখে শুনেছে নরথু—অবশ্যই নিজের গোপন পাপ-বাসনার গূঢ় ইতিহাস খুলে বলে নি সায়ী, তবু যেটুকু বলা সম্ভব হয়েছে সেটুকুই যথেষ্ট—আচার্যের প্রায়-অলৌকিক শক্তির কথা।

নির্ভুল গণনা, নির্ঘাৎ সত্য-ভাষণ।

রেখে ঢেকে বলতে জানে না—যা শুনলে খুশী হয় লোকে।

রূঢ় কঠোর সত্য অনায়াসে বলে দেয়।

পারিতোষিকের লোভে গণনা করে না বলেই হয়ত এতটা সম্ভব।

অর্থে যার কিছুমাত্র লোভ নেই, সে-ই এমন অপ্রিয় সত্য বলতে পারে।

তবু, শুধু মায়ের কথাতেই এতটা শ্রদ্ধা হ'ত না।

কিছু প্রত্যক্ষ প্রমাণও পেয়েছে নরথু।

পাপের পথে যে উন্নতি লাভ করে—তার মনে সদাই শঙ্কা—সদাসতর্ক থাকে সে।

ভাগ্য-গণনার ইতিহাসের মধ্য থেকে মাতুলের দুরভিসন্ধির ইঙ্গিতটুকু গ্রহণ করতে বিলম্ব হয় নি ওর।

কী সে অভিসন্ধি তা তিলক স্পষ্টভাষায় না বললেও সায়ী বুঝেছে।

বুঝেছে তার ছেলেও।

মা স্পষ্টভাষায় বুঝিয়ে দেওয়ার আগেই আঁচ করেছে। চোখে চোখে মিলেছে দুজনের। একই সন্দেহে কুটিল হয়ে উঠছে দুজনের দৃষ্টি। জটিল হয়ে উঠেছে ভ্রূভঙ্গী।

ভাই প্রিয়পাত্র সন্দেহ নেই, পুত্র প্রিয়তর। বিশেষ পুত্র যতক্ষণ সিংহাসনে আছে ততক্ষণ সে রাজমাতা অন্তত। ভাইয়ের মনে কি আছে তা কে বলতে পারে!

সাগ্নী অবসন্নভাবেই ছেলের দিকে চেয়ে ঘাড় নেড়েছে।

অর্থাৎ এখনই কোন সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত।

তারপর আর বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট করে নি সে, সঙ্গে সঙ্গে মাতুলকে বন্দী করিয়েছে, সেই সঙ্গে তার বহুসংখ্যক অনুচর বা পাপসহচরদের।

প্রহরীরা এদের বাড়িতে ঢুকে বাড়ির জিনিসপত্র তছনছ ক'রে বহু গোপন পত্র ও পরিকল্পনা, নির্দেশপত্র ইত্যাদি সংগ্রহ করেছে এবং ঐসব অনুচরদের কোতোয়ালীতে আনিয়ে অমানুষিক নির্যাতন করেছে।

সে নির্যাতন বেশীক্ষণ সহ্য করতে পারে নি তারা—স্বীকার করেছে ষড়যন্ত্রের কথা।

গোপনে ভাগিনেয়কে হত্যা ক'রে তার পথেই তার সিংহাসন অধিকার সব আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ করেছিলেন রাজার মাতুল মহোদয়। আর সাত-আট দিন সময় পেলে ব্রহ্মের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়, নতুন নাম সংযোজিত হ'ত, এমন নিখুঁতভাবেই সব ব্যবস্থা করা হয়েছিল।...

নরথু সকলকেই সন্দেহ করত—কেবল এই মাতুলকে অতটা করে নি।

কারণ সে সিংহাসনে বসার পর মাতুলই একরকম মহামাত্যের কাজ করছে—যদিচ নামে আর একজন মহামাত্য আছেন। তিনি এখন নামধারী এবং বৃত্তিভোগী মাত্র। তিনিও সদা শঙ্কিত, কখন এটুকুও চলে যায়!

নরথু এখন বুঝল যে, কাউকেই বিশ্বাস করা উচিত হয় নি।

মাতুলকে কঠোর শাস্তি অবশ্যই দেওয়া হবে—কিন্তু, স্বতঃই মনে হয়—আরও কোথায় কে কি করছে কে জানে!

আসলে এই ঘটনা থেকেই তিলক সম্বন্ধে শ্রদ্ধা হয়েছে নরথুর।

এ জ্যোতিষী যে সামান্য নয়—তা বলতে গেলে নিজের জীবনের মূল্যে বুঝেছে।

সে সেই রাত্রেই তিলকের কাছে সংবাদ পাঠাল, যদি আচার্যদেবের অসুবিধা না হয়—রাজা পরের দিন দ্বিপ্রহরে অমাত্যসভার অধিবেশনের পরই তাঁর সঙ্গে বসতে চান। আচার্যদেব অনুমতি দিলে সেইভাবেই শিবিকা প্রেরণ করা হবে।

তিলক উত্তর দিল দ্বিপ্রহরে যে-সব দর্শনপ্রার্থীকে আসতে বলা হয়েছে—তাদের হতাশ করা অন্যায় হবে, যদি রাজা অসন্তুষ্ট না হন, তিনি যেন দয়া ক'রে অপরাহ্নে এক সময়ে শিবিকা প্রেরণ করেন।

অগত্যা তাই করতে হ'ল নরথুকে।

তিলক আর বাসুদেব এসে পৌঁছল সন্ধ্যার মাত্র পাঁচ-ছ' দণ্ড পূর্বে।

আচার্য আর তার প্রধান ছাত্রকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হ'ল—রাজার নিজস্ব বিশ্রাম কক্ষে—সেখানে রাজা, রাজমাতা, প্রধানা মহিষী এবং রাজার বালকপুত্র মাত্র উপস্থিত ছিলেন। সকলেই ভাগ্য-গণনার জন্য উৎসুক, ব্যগ্র—আশা ও আকাঙ্ক্ষায় শুষ্কমুখে অপেক্ষা করছেন।

তিলক প্রথমে মহিষীর হাত দেখল। তার পর যুবরাজের।

কিছু কিছু বলল—ভূত এবং ভবিষ্যৎ।

অতীতের কথা মিলে গেল বেশির ভাগই, ভবিষ্যতের গণনাও তাই সত্য বলে মনে হ'ল।

এবার স্বয়ং রাজার পালা।

সাধারণভাবেই রাজার হাত দেখতে শুরু করেছিল তিলক—স্বাভাবিক প্রশান্ত মুখে—কিন্তু কিছুক্ষণ দেখার পরই গম্ভীর হয়ে উঠল সে, ললাটে ভ্রূকুটি ঘনিয়ে এল।

অনেকক্ষণ ধরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে, কিছুক্ষণ তীক্ষ্নদৃষ্টিতে রাজার কপালের দিকে তাকিয়ে থেকে, হাতের পিছন দিকটা দেখে—একটা যেন দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে হাতটা ছেড়ে দিল তিলক, তার পর মাথা হেঁট ক'রে নীরবে বসে রইল।

ওর ভাব-গতিক দেখে উপস্থিত সকলেরই মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল, রাজার তো বিশেষ ক'রে।

তবু ওরা ভেবেছিল তিলকই নিজে থেকে বলবে কিছু।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা ক'রে থাকার পরও ওপক্ষ থেকে কোন শব্দ উচ্চারিত না হ'তে নরথু আর ধৈর্য ধরতে পারল না। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'কী হ'ল, কি দেখলেন?'

তিলকের ভ্রূকুটিবদ্ধ দুই চোখ তখনও পাথরের মেঝেতে স্থির নিবদ্ধ।

যেন গম্ভীর চিন্তাতে মগ্ন সে। সেইভাবে, মুখ তুলেই সে ঘাড় নাড়ল, 'ক্ষমা করবেন মহারাজ-চক্রবর্তী, আপনার ভাগ্য আমি গণনা করতে পারব না। আমাকে বিদায় দিন।'

'সে কি! সে কি!'

সকলে একসঙ্গে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

ব্যস্ত ও সন্ত্রস্ত।

রাজার মুখ তো একেবারে রক্তহীন পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করেছে ততক্ষণে।

সে আর থাকতে না পেরে তিলকের দুটি হাত সবলে চেপে ধরল, 'না না, আচার্যদেব, আমাকে এমন ক'রে নিদারুণ সংশয়ের মধ্যে ফেলে রেখে দগ্ধাবেন না। যদি কোন বিপদ আসন্ন বুঝেই থাকেন—দয়া ক'রে আমাকে বলে দিন, যাতে আমি তার জন্য কিছুটা প্রস্তুত থাকতে পারি।'

তিলক এইবার চোখ তুলল।

নরথুর চোখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'রাজা, সৌভাগ্যের দিন আপনার বিগতপ্রায়, দুর্ভাগ্যের কৃষ্ণছায়া পড়েছে আপনার ললাটে—যার দৃষ্টি আছে সে-ই দেখতে পাবে।···সাংঘাতিক, খুবসাংঘাতিক বিপদ আসন্ন। এত কুকর্মের ফলে যে সিংহাসন আপনি পেয়েছেন, সে সিংহাসন আপনাকে আর ধারণ করবে কিনা সন্দেহ, এমন কি আপনার জীবন—পরমায়ু সম্বন্ধেও আমি কিছু স্থিরনিশ্চয় বলতে পারছি না।'

মহিষী শুনতে শুনতেই প্রায় চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলেন, সারীর মুখে রক্তের

লেশ পর্যন্ত রইল না। তাঁর যেন কান্নার ক্ষমতাও লোপ পেয়েছে।

নরথু আরও ব্যাকুল হয়ে উঠল, 'দোহাই, দোহাই আচার্য, ভগবান শাক্যমুনির দোহাই—ঠিক ক'রে বলুন, আমার কি মৃত্যু আসন্ন? আমি কি আর বাঁচব না?'

তিলক তার অভ্যস্ত অনুত্তেজিত ভঙ্গীতে উত্তর দিল, 'রাজন, ঐ জন্যই আমি কিছু বলতে চাই নি। আমি অকপটে স্বীকার করছি—এসব গণনা এত অল্প সময়ে নির্ভুলভাবে করা যায় না। আমি যে একেবারে ঠিক বলছি তা না-ও হ'তে পারে। নির্ভুল গণনা সময় এবং নিভৃতি-সাপেক্ষ।...আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমার কথা বিশ্বাস ক'রে ভয় পাবার প্রয়োজন নেই। দৈব বলবান, ভগবান্‌কে ডাকুন—ঈশ্বরের ইচ্ছা হ'লে সব বিপদ কেটে যাবে।'

তিলক বিদায় নেবার ভূমিকা হিসাবে উঠে দাঁড়াবার উপক্রম করে।

মহানৃশংস দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাজা নরথু এবার সোজাসুজি তিলকের পা-ই চেপে ধরে দু'হাতে, 'আচার্যদেব আমাকে স্তোক দিয়ে ভোলাবেন না, আমাকে আমার সর্বনাশের পরিমাণটা জানতে দিন। ঠিক ক'রে বলুন কি ঘটবে! যত অশুভ ভবিষ্যদ্বাণীই করুন—আমি তার জন্য আপনার ওপর ক্রুদ্ধ কি বিরক্ত হবো না, বরং প্রচুর পুরস্কার দেব।'

তিলক যেন স্পষ্টতই বিরক্ত হয়ে ওঠে, 'আমি অর্থের জন্য কারও ভাগ্য-গণনা করি না মহারাজ-চক্রবর্তী, পুরস্কারের লোভে আপনার এখানে আসি নি। শিক্ষা সম্পূর্ণ না হ'লে কোন পারিশ্রমিক বা পুরস্কার নিতে পারব না—গুরুর নিষেধ আছে।...যা জানতে চান আমি এমনিই বলছি।...বিপদ সত্যই আসন্ন, মৃত্যু আপনার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। সে বিপদ বা মৃত্যু কোথা থেকে আসবে, তাকে রোধ করা যাবে কিনা, তা এত সহজে বলতে পারব না। সেজন্য চাই নিভৃত অবসর, আপনাকে বহুক্ষণ সময়ও দিতে হবে। কোন আত্মীয়-স্বজন বা অনুচরের সামনে এ ধরনের গণনা সম্ভব নয়।

'যত সময় চান আমি দেব'—নরথু ব্যগ্রভাবে বলে, 'একেবারে একাই গণনা করতে পারবেন। দুই-পুরু লোহার দরজা দেওয়া গোপন মন্ত্রণাগৃহ আছে—এই প্রাসাদেই, যদি বলেন তো এখনই সেখানে যেতে পারি আমরা।'

উৎসুকভাবে দীন অনুনয়ের ভঙ্গীতে বলে নরথু।

'না, এখন হবে না। সারাদিনে বহুলোকের কাজ করেছি, অনেক গণনা, অনেক কথা—মন বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। চিন্তাকে একাগ্র করতে পারব না।...কাল সকালে পুজোর পর আসতে পারি। আপনিও যদি স্নান পুজো সেরে উপবাসী থাকতে পারেন তো ভাল হয়। তবে গণনায় বিলম্ব হবে, আমি আগেই বলে রাখছি, ব্যস্ত হওয়া চলবে না। পুঁথি-পত্র এনে মিলিয়ে দেখতে হবে, শুধু হস্তরেখা নয়, ললাট-রেখার সঙ্গে—'

'তাই হবে, তাই হবে। কিন্তু—কাল সকালে, বেশী বিলম্ব হয়ে যাবে না তো?'

নরথু যেন ভয়ে পাগল হয়ে উঠেছে।

তিলক হাসে একটু—এই প্রথম, মধুর একটা হাসি দেখা যায় তার মুখে—বহুদিন পরে।

বলে, 'অনেক বিলম্ব এমনিই হয়ে গেছে, এক রাত্রে আর কি এসে যাবে?'

অতিথি-ভবনে ফিরে তিলক তার তিন বন্ধুকে নিয়ে বসল। বলল, 'তোমরা আজ রাত্রেই—চাঁদ ওঠবার আগে এখান থেকে রওনা দাও। শহরের বাইরে জঙ্গলের মধ্যে পৌঁছে তোমরা পরস্পরের মাথা কামিয়ে দিও, ক্ষুর তো সঙ্গেই আছে, পীতবস্ত্রও—সেখানে এই সাদা কাপড় ছেড়ে ভিক্ষুর বস্ত্র ধারণ করবে, তার পর সাদা কাপড় উত্তরীয়গুলো শুকনো পাতা জড়ো ক'রে তার সঙ্গে পুড়িয়ে দেবে, অত কেউ টের পাবে না। শুকনো পাতা তো পোড়ানোই হয়—তার সঙ্গে কার্পাসতন্তুর ভস্মাবশেষ মিশে আছে কিনা—অত কেউ লক্ষ্য করবে না।···মুণ্ডিত মস্তক পীতবস্ত্র, অর্থাৎ ভিক্ষুর বেশে নিরাপদে দেশে ফিরে যেতে পারবে। যারা এখানে দেখেছে তারাও সহজে চিনতে পারবে না।'

তারপর একটু থেমে বলল, 'শম্ভু গৌরীশ্বর ওরা আজ ভোরেই রওনা হয়ে গেছে। ওদের আলাদা আলাদাই চলে যেতে বলেছি। ধীরে সুস্থে—বিহারে মন্দিরে আতিথ্য নিতে নিতে। ওদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ কেউ জানে না—জড়াতেও পারবে না। আরাকান সীমানার মধ্যে ঢুকে গেলে ওরা আবার একত্র হতে পারবে—আরাকান নিরপেক্ষ রাষ্ট্র, তাছাড়া ওখানকার রাজাও আমাদের আত্মীয়—এই নরপিশাচটার ওপর ওদেরও নিদারুণ ঘৃণা। ওখানে পৌঁছলে তোমরা নিরাপদ।'

ওর বন্ধুরা নীরবে বসে শুনছিল ওর কথা, এখন কুঞ্জেশ্বর ঘাড় নাড়ল। বলল, 'আমরা মরি তো একত্রে মরব—বাঁচি তো একসঙ্গেই ফিরব—এই প্রতিজ্ঞা ক'রে বেরিয়েছি,—আমরা তোমাকে একা ছেড়ে যাব না।'

তিলক ব্যস্ত হ'ল না। সে এদের চেনে, এভাবে এদের পাঠানো যাবে না। সে বলল, 'বাঁচার জন্যেই তোমাদের এগিয়ে যাওয়া দরকার। যে ঘটনা আমরা আশা করছি তা যদি ঘটাতে পারি—তার পর দল বেঁধে এখান থেকে কিছুতেই বেরোনো যাবে না। বরং আমি একা থাকলেই পালাতে পারব কোনমতে, চাই কি স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশেও। দল বাঁধলে এদের দৃষ্টি এড়াবার কোন উপায় থাকবে না।'

আরও কিছুক্ষণ বাদানুবাদ, যুক্তি-প্রতিযুক্তি প্রয়োগের পর স্থির হ'ল যে, বাসুদেব তিলকের সঙ্গে থাকবে, বাকী দুজন এই সন্ধ্যার পরই রাত্রের আহার সেরে বেরিয়ে পড়বে—যাতে মধ্যরাত্রের আগেই নগর-সীমার বাইরে ঘন অরণ্যে প্রবেশ করতে পারে।

বাসুদেবের থাকা প্রয়োজন, তিলকের—ওদের সকলের—উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য।

একা একজন শত্রুর সামনে দাঁড়ানোও নিরাপদ নয়।

কাল যদি তিলক ব্যর্থ হয়—তীরে এসে তরী ডোবানো হবে। পরে আবার যে কেউ এমনভাবে কাজ সারতে পারবে তা মনে হয় না।

তা ছাড়া, বাসুদেব তিলককে একা রেখে যেতে রাজী হ'ল না।

দৃঢ়তার সঙ্গেই স্পষ্ট জানিয়ে দিল, 'একা যেতে হয় আমাকে হত্যা ক'রে রেখে যেয়ো, নইলে আমি তোমার সঙ্গ ছাড়ব না।'

বন্ধু-সৌভাগ্যের গৌরবে চোখ ছল-ছল করতে লাগল তিলকের। সে একটা তৃপ্তি ও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে চুপ ক'রে গেল।...

রাত্রে স্বপ্ন দেখল—পট্টিকেরার প্রাসাদের সেই পাঠকক্ষে সে আর তারা পাশাপাশি বসে আছে।

তারা বলছে, 'না, আর আমি কোথাও যাব না, আমি তোমার, আমি না থাকলে তোমাকে কে দেখবে, খুব কষ্ট হবে তোমার; রাজসুখে আমার দরকার নেই, তোমার সঙ্গে পর্ণকুটিরে থাকব সে-ই আমার রাজসুখ। তুমি আমাকে ত্যাগ ক'রো না—করবে না তো!'

আরও দেখল, সে যেন কাব্য পড়াচ্ছে। মেঘদূত। তারা নির্নিমেষ নেত্রে ওর দিকে চেয়ে আছে—কিছুই শুনছে না। তিলক মৃদু তিরস্কার করতে বলছে, 'কবির বৃষ্টিবিন্দুর থেকে তোমার ললাটের স্বেদবিন্দু ঢের বেশী বাস্তব।'

এই বলে সে নিজের আঁচলে ওর ললাট ও কণ্ঠের স্বেদরেখা মুছিয়ে আঁচল দিয়েই ব্যজন করছে।

পরের দিন দীর্ঘাকৃতি কয়েকটি পুঁথি রক্তবস্ত্রে জড়িয়ে নিয়ে তিলক আর বাসুদেব যখন প্রাসাদে পৌঁছল তখন পূজা শেষ ক'রে উঠে নরথু অধীর অপেক্ষায় পায়চারি করছে ওদের জন্যে। পূজার ঘরেই ওদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখান থেকে রাজা নিজেই পথ দেখিয়ে কয়েকটি ঘর ও অলিন্দ পেরিয়ে গোপন মন্ত্রণাকক্ষে নিয়ে গেল।

একটি পুরু ইস্পাতের দরজা, তা বন্ধ করলে একখানা নিরন্ধ্র দেওয়ালের খালি ঘর, তরে শেষে আর একটি অমনি পুরু দরজা।

সেটা পেরোলে যে ঘর পড়ে—তাতেও কোন গবাক্ষ নেই, শুধু খুব উঁচু কয়েকটি ঘুলঘুলি মতো আছে—তাও তার বাইরেটা অনেকখানি বেড় জুড়ে মোটা ঘনসম্বন্ধ লোহার শিক দিয়ে ঘেরা, সেখান থেকে ঘরের মধ্যে কি মন্ত্রণা হচ্ছে—কারও শোনা সম্ভব নয়।

ঘর ঠাণ্ডা রাখার জন্য অন্য ব্যবস্থা, দেওয়ালের কোল দিয়ে জলের লহর বইছে, ঠাণ্ডা নদীর জল—ডাকের প্রথার ক্ষেপে ক্ষেপে ওপরে তুলে তা এইভাবে বওয়ানো হচ্ছে।

ওরা ঘরে ঢোকার পর নরথু দুটি দরজাই বন্ধ ক'রে তাতে নিজের হাতে কুলুপ লাগিয়ে দিল।

চাবিটা রাখল ভিতর দিকে দেওয়ালে-কাটা একটা কুলুঙ্গিতে।

বাইরের আলো উপরের গবাক্ষ দিয়ে সামান্যই আসে—সেজন্য অমনি অসংখ্য কুলুঙ্গিতে বাতি জ্বালার আয়োজন আছে। তবে তার তাপ না ভেতরে আসে—কৌশলে তারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভেতরের দিকে সাদা স্বচ্ছ পাথরেরই আচ্ছাদন দেওয়া, বাইরের দিকে তেমনি বাতাস আসা ও ধোঁয়া বেরোবার পথ রাখা হয়েছে—সেও নিরাপদ আবেষ্টনী দিয়ে ঘেরা।

এক কথায়—এখানকার কোন শব্দ বাইরের কৌতূহলী কানে পেঁছানোর সম্ভাবনা নেই।

ঘরের চারিদিকে অমাত্যদের বসবার জন্য কাঠের চৌকী আছে, তার উপর গদিপাতা, দেখা গেল সেগুলো আগেই একদিকে সরিয়ে রাখা হয়েছে, মাঝখানে প্রশস্ত খালি জায়গাতে তিনখানি আসন পাতা—গণনা করতে গেলে মেঝেয় বসাই সুবিধা।…

এর আগে পূজার ঘরে ঢোকার সময়ই ভৃত্যরা তিলক আর বাসুদেবের পা ধুইয়েই দিয়েছিল, সুতরাং এখানে একেবারেই আসন গ্রহণ করল ওরা।

নরথু আগেই বসে পড়েছিল—পাছে বৃথা সৌজন্যে খানিকটা সময় নষ্ট হয়।

রাজা আসন গ্রহণ না করলে তার সামনে আর কারও বসার রীতি নেই।

তখনই পুঁথি খুলল না তিলক, স্থিরদৃষ্টিতে রাজার মুখের দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ।

তারপর বলল, 'আপনার হাত আমি কাল ভালভাবেই দেখেছি মহারাজ-চক্রবর্তী। আপনার জীবনে অতি সংকটকাল এসেছে। যে রাজ্যের জন্য, সিংহাসনের জন্য আপনি এত দুষ্কার্য করলেন—সে রাজ্য সে সিংহাসন আপনার ভোগে আসবে না ; লোকক্ষয়কারী কাল আপনার সমীপবর্তী, মৃত্যু আপনার শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে—অপঘাত মৃত্যু আপনার আসন্ন।'

গতরাত্রে ঘুমোতে পারে নি নরথু। আহারেও রুচি ছিল না, সুতরাং বিবর্ণ হয়েই ছিল মুখ। আরও সেই বিবর্ণতার সঙ্গে চোখের কোণে সুগভীর কালিমা বীভৎস দেখাচ্ছিল।

এখন সে মুখ আরও বিবর্ণ, শ্বেত পাথরের মতোই সাদা হয়ে গেল। বলতে গেলে চোখের নিমেষে বড় বড় ফোঁটায় ঘাম দেখা দিল।

সে কিছুক্ষণ ভয়ে কথাই কইতে পারল না—বার বার চেষ্টা সত্ত্বেও না। শেষে যখন কোনমতে স্বর বার হল—ব্যাকুলভাবে কান্নার মতো শব্দ বেরোল নরথুর গলা দিয়ে, বলল, 'কোন মতে, কিছুতে কি তার অন্যথা হয় না ?'

তিলক বলল, 'ব্যস্ত হবেন না পগানাধিপতি, অন্যথা হয় কিনা তাই দেখার জন্যই এগুলো এনেছি।' পুঁথিগুলোর দিকে হাত দিয়ে দেখাল সে, 'আর এক-দণ্ড কালের মধ্যেই জানা যাবে—আপনার পরমায়ু তার অস্তিত্বের সীমায় পেঁচিছে কিনা।'

বলতে বলতেই সে ইঙ্গিত করল বাসুদেবকে। পুঁথির আচ্ছাদন-বস্ত্র অপসারিত করবার।

বাসুদেব ঠিক পাশে বসেনি তিলকের—যেন স্বাভাবিকভাবেই ওর বাঁদিকে ঈষৎ একটু পিছিয়ে বসে ছিল। পুঁথিগুলো ছিল ওর ডানদিকে—তিলকের আড়ালে।

ইঙ্গিত পেয়ে সে সেইদিকে ঘুরে বসে পুঁথির পুলিন্দাটি অনাবরিত করতে লাগল।

সময় নেই মোটেই।

এবার যা করতে হবে দ্রুত, খুবই দ্রুত।

সময়ের নির্ভুল হিসাবের ওপরই নির্ভর করছে—ওদের কর্মের, ওদের ব্রতের সাফল্য।

এক নিমেষ এদিক-ওদিক হ'লেই সব আয়োজন, এত ক্লেশ-স্বীকার ব্যর্থ হবে যাবে, ইতিহাস যাবে পাল্‌টে।

দ্রুতই হাত চালাল বাসুদেব।

পুঁথির উপরকার রক্তবস্ত্রখানি খুলে ফেলল, বোধ হয় নরথু ভাল ক'রে চেয়ে দেখবার আগেই।

কিন্তু আচ্ছাদনী সরাতে যা বেরোল তা তালপত্রে লেখা কোন পুঁথি নয়—আয়তনে ছোট তীক্ষ্ণধার তিনখানি অসি, খড়্গাকৃতি। আরাকানের দিকে এই ধরনের ছোট ছোট তরবারি তৈরী হয়, আকারে ছোট হ'লেও তীক্ষ্ণধার এবং ভারী। সংকীর্ণ জায়গার মধ্যে যুদ্ধ করার উপযুক্ত অস্ত্র।

চোখের নিমেষেই দুটি খড়্গ নিয়ে উঠে দাঁড়াল দুজন। তিলক কঠিন-গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও নরথু। সম্মুখ যুদ্ধেও তোমাকে মারতে পারতুম—একাই। সে শিক্ষা আমাদের আছে। কিন্তু পিতৃহন্তা, মাতৃহন্তা, নারীহন্তার সঙ্গে যুদ্ধ করলে অস্ত্রশিক্ষা অপমানিত হবে। তোমার মতো ঘৃণিত অপরাধীকে বধ করাই রীতি, তাই বধ করলাম।'

বলতে বলতে একসঙ্গে দুজনের খড়্গ এসে পড়ল নরথুর দেহে, দু'দিক থেকে।

ভীত-সন্ত্রস্ত নরথু, ঠিক কি ঘটছে তা বোঝার আগেই, আহত হয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

তবু তখনও প্রাণ ছিল, আহত অবস্থাতেই পালাবার চেষ্টা করছিল হামা দিয়ে দরজার দিকে—কিন্তু তিলকের খড়্গ আরও একবার নেমে এল; এবার ওর কণ্ঠে। দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল নরথু, ওর ঘৃণ্য মাথাটা ছিটকে গিয়ে পড়ল দেওয়ালের কোলে প্রবাহিত লহরের মধ্যে—জলের প্রবল টানে ভেসে গিয়ে নালির মুখে আটকে রইল।

কিছুক্ষণ, বোধ হয় দণ্ডের এক অষ্টমাংশ সময় দুজনেই স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মৃতদেহটার দিকে চেয়ে।

তখনও কবন্ধের বুকটা ওঠা-নামা করছে, একেবারে স্থির হয় নি।
এই ওদের প্রথম নরহত্যা।
তবু স্তম্ভিত হয়ে থাকার সে-ই একমাত্র কারণ নয়।
এত সহজে, এমন অনায়াসে—সত্যিই যে ওদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে তা ভাবতে পারে নি ওরা, হয়েছে যে, তাও যেন বিশ্বাস হচ্ছে না।...
প্রথম সম্বিত ফিরল তিলকেরই।
তার আরও একটা কাজ যে বাকী আছে! আর একটি অবশ্য-কর্তব্য!
কবন্ধের গলনালীতে হাত দিয়ে সেই রক্তে সে পাথরের মেঝেতে একটি নাম লিখল—'তারা দেবী'।
তারপর অস্ফুটকণ্ঠে বার বার উচ্চারণ করতে লাগল, 'তারা, তারা, তারা! আমি তোমার মৃত্যুর শোধ নিয়েছি তারা, তোমার তিলক তোমাকে ভোলে নি, তোমার নির্দেশ সে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। তোমার প্রেমের মূল্য সে শোধ করেছে।'
আরও কতক্ষণ এইভাবে আপন মনে বকত সে—কে জানে, বাসুদেব পিছন থেকে ওর কাঁধ ধরে ঝাঁকানি দিল, 'তিলক, তিলক! কী করছ, আর যে সময় নেই!'
সঙ্গে সঙ্গেই প্রকৃতিস্থ হ'ল তিলক, 'য়্যাঁ—? হ্যাঁ হ্যাঁ, আর সময় নেই বটে!'
সে বেশ সহজভাবেই এবার হেঁট হয়ে পরিত্যক্ত অস্ত্র দুটি তুলে নিল আবার, লহরের জলে ধুয়ে নিয়ে একখানা বাসুদেবের হাতে দিয়ে বলল, 'এসো, আমরা পরস্পরকে একই সঙ্গে আঘাত করি।...দেখো, সাবধান, লক্ষ্য-ভ্রষ্ট না হয়।'
বাসুদেব রুদ্ধ দরজার দিকে চাইল একবার। বলল, 'কিন্তু একটু চেষ্টা ক'রে দেখবে না—? গোপনে হয়ত বেরোনো যেত এখনও?'
'না', দৃঢ়ভাবে ঘাড় নাড়ল তিলক, 'আমরা দুজনেই ব্রাহ্মণ। বিশ্বাস-ঘাতকতা ক'রে নরহত্যা করেছি, আমাদের এ প্রাণ আর রাখা উচিত নয়।... ও যা-ই হোক, বিশ্বাস ক'রে আমাদের এই নিভৃত জায়গায় এনেছে; একটি রক্ষীর ব্যবস্থা রাখে নি, পালাবার বা বাইরে থেকে সাহায্য আসার পথ বন্ধ করেছে, আমাদের ওপর একান্ত নির্ভয়ে।...তুষানলে প্রাণ দেওয়াই এ পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত। সে যখন সম্ভব নয়—তখন এইভাবে অস্ত্রাঘাতে মরাই ভাল, নিরুপায় ভেবে ভগবান ক্ষমা করবেন।'
বাসুদেব আর কিছু বলল না।
মৃত্যু জেনেই তো এসেছে।...এখান থেকে বেরিয়ে যদি নিরাপদে পালাতে না পারে—যদি ধরা পড়ে—সেও মৃত্যু অনিবার্য, তার সঙ্গে অবর্ণনীয় লাঞ্ছনা।
তার চেয়ে এ ঢের ভালো।
সে দৃঢ়-করে অস্ত্র ধারণ করল। দুজনেই প্রশান্ত মুখে, ধীরে সুস্থে বেশ

হিসাব ক'রে লক্ষ্য করল দুজনের কণ্ঠ—তারপর, এক সময় বিদ্যুৎবেগে দুজনের খড়্গাই দুজনের দেহে এসে পড়ল—একসঙ্গে…

মেঝেতে যেখানে 'তারা' নাম লিখেছিল একটু আগে—রক্তের অক্ষরে, সেইখানেই লুটিয়ে পড়ল তিলকের দেহ, ওর রক্তে ধুয়ে মুছে গেল সে নাম, কোন প্রাকৃত-জনের চোখে পড়ে উপহাসের কারণ হবার কারণ রইল না।

সমাপ্ত